পশ্চিমবঙ্গের মন্দির

পশ্চিমবঙ্গের মন্দির

শম্ভু ভট্টাচার্য

মনন প্রকাশন
৩০, বিধান সরণি
কলকাতা—৭০০ ০০৬

PASCHIM BANGER MANDIR

A WORK ON

The Temples of West Bengal, *By*
Shambhu Bhattacharyya

প্রকাশক : ব্রজগোপাল মাইতি
৩০, বিধান সরণি, কলকাতা — ৭০০ ০০৬
ফোন ঃ ৩৩-২২১৯৯৬৬৯

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০০

প্রচ্ছদ চিত্র
ভট্টমাটির পঞ্চরত্ন মন্দির

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা
সুজয় চক্রবর্তী

অলংকরণ
পঞ্চানন চক্রবর্তী

রেখাঙ্কন
দেবজিৎ ভট্টাচার্য এবং
শুভজয় দত্ত

পরিবেশক ও প্রাপ্তিস্থান
দে বুক স্টোর
শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট

মুদ্রক ঃ
সত্যনারায়ণ প্রেস, ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলকাতা—৭০০ ০০৬

কম্পোজ : কৌশিক বসু
ফোন ঃ ৯৮৭৪৪৮৫১০৪

বাবা, পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী

এবং

মা, সুবাসিনী দেবীর

চবণ-স্মৃতিতে

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

সুসময় (কাব্যগ্রন্থ)

মানব সম্পর্কের কবিতা (গবেষণা গ্রন্থ)

নিবেদন

বিগত দু'দশকেরও বেশি সময়কাল ধরে শুধু পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার সবকটি জেলাতেই নয়, ট্রেকিংপথের উচ্চ হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বহু মন্দির সরেজমিনে খুঁটিয়ে দেখার ভাগ্য আমার হয়েছে। ঐ সৌভাগ্যের পশ্চিমবঙ্গীয় অংশ নিয়ে এই বই—'অংশ' শব্দটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, আপন বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে রক্ষা করেও, বঙ্গীয় মন্দিরকলা মৌর্যযুগ হতে একান্ত ভাবেই সর্বভারতীয় মন্দির আন্দোলনের অঙ্গীভূত। মন্দিরের সর্বভারতীয় 'ভাষা' ই বাংলার মন্দিরের 'ভাষা'। আমরা ভুলতে পারি না যে ঐ সর্বভারতীয় অনুভবটির পিছনে আছে অন্তত দেড় হাজার বছরের মেধা, মনন ও অনুধ্যান। মন্দির একটি 'আর্কিটেক্চারাল ডিজাইন' বা 'স্থাপত্য নক্সা' মাত্র নয়—তার চেয়ে বেশি, ঠিক যেমন মহৎ কবিতা ছন্দ, অলঙ্কার ও পঙক্তির সমাহার-মাত্র নয়, তার চেয়ে বেশি; এবং আমরা জানি যে, ঐ 'বেশি'-টুকুই শিল্পের প্রাণ।

উপরে বলা তথ্যটি আমাকে প্ররোচিত করেছে 'হিন্দু মন্দির' সম্পর্কে স্টেলা ক্র্যামরিশের বিখ্যাত গবেষণার মর্মবস্তুটি গভীর শ্রদ্ধার সাথে এই বইয়ের প্রাকপঠন-রূপে ব্যবহার করতে, এবং তা এই সহজ কারণে যে, এ বিষয়ে এর চেয়ে ভাল কিছু আমার জানা নেই।

"জাতীয় জীবনের সামগ্রিক কর্মপ্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে মন্দিরগুলি নির্মিত হইয়াছিল"—পণ্ডিত হিতেশরঞ্জন সান্যালের এই উক্তিটিও* আমার কাছে অতীব শ্রদ্ধার বস্তু। দেখা দরকার মন্দিরগুলি তাদের নিজ নিজ সময়ের কোন সাক্ষ্য দিচ্ছে বা মন্দিরগুলির শরীরে তখনকার সমাজ কোন চিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

* বাংলার মন্দির, 'সমকালীন' নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন, ৪র্থ খণ্ড, আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত, করুণা প্রকাশণী, ১৪১৩, পৃ. ১৩।

অতএব একদিকে তত্ত্ব, দর্শন, শিল্প ও স্থাপত্য এবং অন্যদিকে সমাজ-সম্পর্ক— সেই সমাজ যা অনন্যপূর্ব চলিষ্ণুতার সঙ্গে বহন করছে কয়েক হাজার বছরের পুরাতন, অথচ পূর্ণ সজীব ও প্রাণবন্ত একটি ঐতিহ্যকে। হাজার বছরেরও বেশি সময়কাল ধরে একই মন্ত্রে, একই আচারে, একই আবেগে ও একই রকম শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজাপাঠ চলছে এমন মন্দির ভারতে অপ্রতুল নয়। শুধু তা-ই নয়, ভারতের যে কোনো প্রান্তের যে কোনো ভগ্ন-পরিত্যক্ত মন্দিরে এখনই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলে এখনই সেই পুরাতন মন্ত্র ও আবেগে পূজাপাঠ শুরু হয়ে যাবে। এর অর্থ হল ভারতের জীর্ণতম ও ভগ্নতম মন্দিরটিও ঠিকঠাক আমাদেরই মতন জীবন্ত। 'কীর্তি' -টি 'পুরা', প্রাণটি দারুণভাবে বর্তমান। এই হল কারণ যার জন্য প্রাচীন গ্রীস বা রোমের মন্দির স্থাপত্য যে মাপকাঠিতে বিচার করা হয়, ভারতের মন্দির সে মাপকাঠিতে বিচার করা চলে না—প্রাচীন গ্রীস ও রোমের মন্দির মৃত, প্রাচীন ভারতের মন্দির জীবিত।

এই বইয়ের দুটি পর্ব, কিন্তু প্রথম পর্বটিকে দ্বিতীয় পর্বের ভূমিকা জ্ঞান করলে সুবিচার করা হবে। প্রথম পর্বে তত্ত্ব, দর্শন, স্থাপত্য ও অলঙ্করণ-শিল্প-বিষয়ে সাধারণ আলোচনা আছে—এর মধ্যে অলঙ্করণ-শিল্প মূল পরিকল্পনা বহির্ভূত। চালারীতির সম্যক উপলব্ধির জন্য বাংলার খড়োচালের মাটির ঘর বিষয়ে একটি পরিচ্ছেদ যুক্ত হয়েছে। এছাড়া বাংলার মন্দিরের পরম্পরাটি ধরার চেষ্টায় আদি কাল হতে ধারাটিকে স্মরণ করার প্রয়াস করা গেছে যেমন, তেমনই শৈব-বৈষ্ণব-শাক্ত লৌকিক ধারাগুলি পাশাপাশি দেখার চেষ্টা হয়েছে সমাজ মনটির সন্ধানে, ঐ মনের খোঁজেই উদ্ধার করা হয়েছে কয়েকটি ব্রতছড়া এবং বাংলা ভাষায় লিখিত চারটি অনন্য কবিতা। সমাজ পরিবেশটির প্রত্যক্ষ স্পর্শ পাওয়ার আশাতেই উদ্ধার করা হয়েছে উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকে প্রকাশিত কিছু সংবাদ, ঐ শতকেরই ষাটের দশকে প্রকাশিত একটি বিখ্যাত নক্সার অংশ ও সত্তরের দশকের সঙের ছড়ার দুটি অংশ। আমরা দেখছি যে উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকেও প্রকাশিত পুস্তকের ৯৮ শতাংশই ধর্মপুস্তক; শিব প্রতিষ্ঠা, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, মন্দির-প্রতিষ্ঠা, ঘাট-প্রতিষ্ঠা, পূজা, চূড়াকরণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে; দুর্গোৎসবের ফুটানির পরে বাবুর বহুমূল্য তালুক নিলাম হচ্ছে, অন্যদিকে নিরন্ন মানুষেরা বৌ মেয়ে বেচে খাচ্ছে আর সদ্য বিধবাদের (কোনো কুলীন মরলে ঝাঁক ধরে) জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে 'সতী' করা হচ্ছে; ঐ শতকেরই ষাটের দশকেও বাবুগিরি

অব্যাহত ও সত্তরের দশকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রভাবে শ্লীলতা-অশ্লীলতা তর্ক দেখা দিচ্ছে ও হিন্দু আচারের নানা 'বিজ্ঞান-সম্মত' ব্যাখ্যা হাজির হচ্ছে—এসব হতেই পূর্ববর্তী শতকগুলির সমাজ-পরিবেশের আন্দাজ মেলে। এ ছাড়াও এই পর্বে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে থাকা লৌকিক দেবীদেবতাদের মন্দিরগুলিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছি কারণ এতেই বোঝা যায় লোক-সাংস্কৃতিক মন্দিরগুলির পরিধি ও বণ্টন। এ-ই হলো এই বইয়ের দ্বিতীয় পর্বের পশ্চাদ্ভূমি। দ্বিতীয় পর্বে আছে আমার পক্ষে যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব হয়েছে তত বেশি সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গীয় মন্দিরগুলির পঞ্জিকরণ—এই পঞ্জি প্রথমত স্থাপত্যরীতি অনুসারী; দ্বিতীয়ত কালানুক্রমিক—এমন কালানুসারী পঞ্জি ছাড়া কোনো রীতির উৎপত্তি, প্রসার, বিবর্তন ইত্যাকার বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত ভাবনা সম্ভব নয় বলে আমার মনে হয়েছে, তৃতীয়ত সটীক এবং বিশেষ ক্ষেত্র-সমূহে শুধু স্থাপত্য নয়, আঞ্চলিক সংস্কৃতি বিষয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সহ—এতে একদিকে স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্য ও বিপুল স্থাপত্য-বৈচিত্রের ছবি যেমন ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে, তেমনই নানা অঞ্চলের নানা স্বরূপ একটু একটু করে ধরা দিতে দিতে এক সময়ে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেরই সংস্কৃতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক স্পষ্টতর হতে থাকে; চতুর্থত, প্রতিটি ক্ষেত্রের পথনির্দেশিকা-সহ—এক্ষেত্রে আমি চেয়েছি ক্ষেত্রে পৌঁছাতে আমি যে সব অসুবিধায় পড়েছি পাঠক যাতে সেইসব অসুবিধায় না পড়েন সেদিকে দৃষ্টি দিতে।

এবার অন্য কথা। মন্দির-স্থাপত্যগুলির ক্ষতি হচ্ছে দু প্রকারে—অবহেলায় আর সংস্কারের নামে রূপ বদল করে। প্রথম ক্ষেত্রে ভগ্নাবশেষের মধ্যেও আদি সংস্থানের কিছু স্বরূপ বজায় থাকে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আদি রূপ ও ইতিহাস দুই-ই লোপ পায়। এ বিষয়ে মন্দির গবেষণার অন্যতম প্রধান অগ্রদূত ডেভিড ম্যাকাচিয়নের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তাঁরই অন্যতম প্রধান প্রেরণাদাতা, স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ রায় লিখেছেন :

> "David's indignation at the neglect of temples was as deep as his despair at some of the drastic and tasteless attempts at their preservation. Both David and I loved Bakreswar with its weird proliferation of moldy crumbling temples around the holy hot springs. I went there first in 1962. When I returned two years later, I found all the

temples had in the meantime been given a coating of whitewash and painted pink. This, I was told, was preservation. I reported this to David. He went promptly to check, came back, drafted a sizzling letter of protest, went round on his bike calling on 'eminent intellectuals', and succeeded in persuading them to put their signatures to the letter." ('Preface' by Satyajit Ray to 'Brick Temples of Bengal From The Archives of David McCutchion', Ed. George Michell, Princeton University Press, 1983, P. XII)

সত্যজিৎ রায়ের উদ্বেগ ও ম্যাকাচিযনের তৎপরতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের সচেতনার প্রয়োজন এখন অনেক বেশি, কারণ অবস্থা এখন আরো খারাপ।

তালপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা

শম্ভু ভট্টাচার্য

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব (১৭-১৭০)

দ্বিতীয় পর্ব (১৭১-৪৬৪)

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।।
[বিজ্ঞান যাঁর সারথি, যাঁর মন প্রকৃষ্টগ্রহণে
সমর্থ ও নিয়ন্ত্রিত, তিনিই পথ পার হন,
বিষ্ণুর পরম পদও তাই।]

—কঠ উপনিষদ, প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় বল্লী, মন্ত্র ৯

জ্ঞাপন

প্রুফ দেখার ক্লান্তিকর কাজে সহযোগিতা করেছেন পরম শ্রদ্ধাভাজন ডঃ কাশীনাথ দত্ত।

মুর্শিদাবাদের বড়নগরের 'চারবাংলা' মন্দির-ক্ষেত্রে বসে অনির্বচনীয় টেরাকোটা-ফলকগুলির অনুপম ড্রয়িং নিয়েছেন শিল্পী পঞ্চানন চক্রবর্তী—সেগুলির পাঁচটি সন্নিবিষ্ট করতে পেরে কৃতার্থ হয়েছি—অলঙ্করণের জন্য ব্যবহৃত মন্দির-টেরাকোটার ড্রয়িংগুলিও তাঁর।

পশ্চিমবঙ্গের মন্দিরের সন্ধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত বিভিন্ন জেলা গেজেটিয়ার ও জেলা-পুরাকীর্তি গ্রন্থমালার কাছে ঋণ অপরিশোধ্য।

মন্দির দেখতে বহু ক্ষেত্রে একা যেতে হয়েছে, কিন্তু দেশব্যাপী আরও বহু অনুসন্ধান-যাত্রায় সাহচর্য দান করেছেন অঞ্জলি ভট্টাচার্য (তালপুকুর), পঞ্চানন ও অনিমা চক্রবর্তী (লালবাগ), তমাল ভট্টাচার্য (তালপুকুর); সঞ্জয়, সোমা ও হৃষীক দত্ত (তালপুকুর); সুজয় ও গার্গী চক্রবর্তী (মুর্শিদাবাদ); বিভাস, দীপ্তি ও দেবজিৎ ভট্টাচার্য (তালপুকুর), উমাশঙ্কর ভট্টাচার্য ও প্রয়াতা অলকানন্দা ভট্টাচার্য (কুলটি) সাধন রক্ষিত (সাগরদীঘি), বারাকপুরের পীযূষকান্তি ঘোষ (প্রয়াত), শিবেন সাহা, দীপাঞ্জন ঘোষ, সৈকত চট্টোপাধ্যায়, অপূর্ব ঘোষ ও ঋত্বিক চক্রবতী এবং পাতুলিয়ার সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

মোটর সাইকেলে আমাকে নিয়ে সারাদিন ঘুরে গ্রামের পরে গ্রামে মন্দিরের পরে মন্দির দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন সরোজ চট্টোপাধ্যায় (জাড়গ্রাম, বর্ধমান), দেবাশিষ বিশ্বাস (দশঘরার বিশ্বাস পরিবার, হুগলী), মলিন ঘোষ (নিয়াল্লিশপাড়া, মুর্শিদাবাদ), নিতাই সর্বজ্ঞ (সিউড়ি, বীরভূম) এবং শেখ তাঞ্জিলাল (রামপুরহাট, বীরভূম)।

সত্যনারায়ণ প্রেস ও বিশেষ করে শ্রী মাণিক পাত্রের অবারিত সহযোগিতা আমাকে বল দিয়েছে।

আমার আকৈশোর বন্ধু অঞ্জলি ভট্টাচার্যের জেদ ও উৎসাহ ছাড়া এই বই কিছুতেই লেখা ও ছাপা হতো না।

—শম্ভু ভট্টাচার্য

প্রথম পর্ব

প্রাকপঠন; খড়োচালের মাটির ঘর; প্রেক্ষিত; মন্দির-সাক্ষ্যে বাঙালি হিন্দু সমাজ, ব্রতছড়া; কবিতা; সমাজ-সাক্ষ্য (১৯ শতক); লৌকিক দেবীদেবতার মন্দির; মন্দির-স্থাপত্য; অলঙ্করণ-শিল্প।
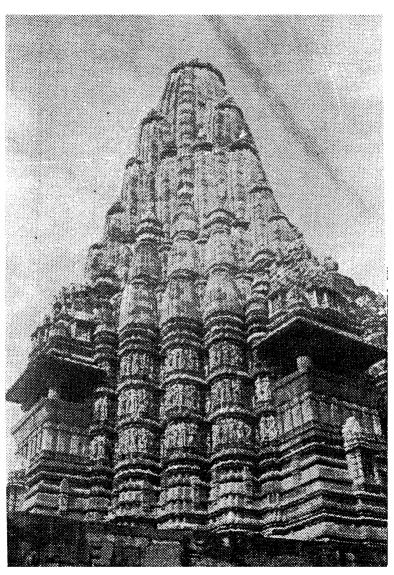
মূল শিখর, কন্দরিয় মহাদেব মন্দির, খাজুরাহো

প্রাকপঠন

স্টেলা ক্র্যামরিশ

হিন্দু মন্দির : তত্ত্ব, স্থাপত্য ও শিল্প

[দুই খণ্ডের মহাগ্রন্থ 'THE HINDU TEMPLE'-এ উপস্থাপিত সন্দর্ভ]

উদ্বোধন

বিশ্ববন্দিতা স্টেলা ক্র্যামরিশের মতই তাঁর মহাগ্রন্থ 'দ্য হিন্দু টেম্পল'*-এর পরিচয় লাগে না। শুধু হিন্দু মন্দিরেব 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া' ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বের দিকগুলি বোঝাব কাজেই নয়, ভারতীয় মন্দিব-স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও তাবৎ শিল্পকলার অপার মহিমা এবং অনন্ত সৌন্দর্যেব রহস্য অনুভবের কাজেও মহাগ্রন্থটির খণ্ড দুটির বিকল্প নেই।

উৎসরূপে তিনি ব্যবহার করেছেন 'ঋগ্বেদ', 'শুক্ল যজুর্বেদ' ও 'অথর্ববেদ'-সহ 'সংহিতা', 'ঐতরেয়', 'শতপথ', 'তৈত্তিরীয়'-সহ ব্রাহ্মণ; আরণ্যক, প্রাচীন উপনিষদ সমূহ, 'সূত্র সাহিত্য', ব্যাকবণ, নিরুক্ত, বরাহমিহিবের 'বৃহৎ-সংহিতা ও মহাবীরের 'গণিত-সারসংগ্রহ'-সহ প্রাচীন জ্যোতিষ-গ্রন্থসমূহ, যোগ ও বেদান্ত সাহিত্য, রামায়ণ ও মহাভারত, 'অগ্নি-পুরাণ', 'কালিকাপুরাণ', 'লিঙ্গ পুরাণ', 'মৎসপুবাণ', 'বিষ্ণুধর্মোত্তর', 'বিষ্ণুপুরাণ' প্রভৃতি সহ পুরাণ সাহিত্য; 'হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র', 'কামিকাগম', 'ঈশানশিবগুরুদেব-পদ্ধতি', 'মহানির্বাণতন্ত্র', 'তন্ত্রসমুচ্চয়'-সহ আগম ও তন্ত্রসাহিত্য, 'দেবীমাহাত্ম্য', ও 'সৌন্দর্যলহরী'-সহ স্তোত্র সাহিত্য, 'অমরকোষ' ও 'বাচস্পত্যে'র মতো কোষগ্রন্থ, 'মনু-স্মৃতি', 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র', 'কামসূত্র', 'হর্ষচরিত' ও 'রঘুবংশে'র মতো সাহিত্য এবং প্রায় সমগ্র বাস্তুশাস্ত্র যাব মধ্যে আছে 'ময়মত', 'ভুবনপ্রদীপ', 'বৃহৎশিল্পশাস্ত্র' 'কাশ্যপশিল্প', 'মানসার', '..নসোল্লাস', 'মনুষ্যালয়চন্দ্রিকা, 'পৌরাণিকবাস্তুশান্তিপ্রয়োগ', 'রূপমণ্ডন', 'শিল্পরত্ন', 'সমরাঙ্গনসূত্রধার' 'শিল্পশাস্ত্র', 'নারদীয় বাস্তুপুরুষবিধান', 'বাস্তুবিদ্যা', 'বিশ্বকর্মাপ্রকাশ', 'বাস্তুরাজবল্লভ' প্রভৃতি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মেগাস্থিনিস থেকে হিউ-এন-সাঙ্ প্রমুখ বিদেশী পর্যটকগণের বিবরণ, প্রাচীন লেখ, মুদ্রা, উৎখনিত ও এখনও টিকে থাকা প্রাচীন স্থাপত্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য—ইত্যাদি।

---

* Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Limited, Delhi, Reprint 1996; First Published, Calcutta University, 1946

"সর্ব অধিবাস যাঁর শরীরে আশ্রিত, যিনি ব্রহ্মপুত্র, যিনি সকল ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করেন, ভূভার যাঁর মস্তকে অর্পিত, নগর-মন্দির-গৃহ-সরোবর-কূপাদি সবকিছুর সন্নিবেশে যাঁর সান্নিধ্য অনুভূত হয়, যিনি সর্বসিদ্ধি প্রদান করেন, যিনি প্রসন্নবদন ও বিশ্বম্ভর, যিনি ইন্দ্র-কে বরদান করেন, সেই ভগবান বাস্তুপতি পরমপুরষকে নমস্কার।"

—'পৌরাণিকবাস্তুশান্তিপ্রয়োগ'।

[Stella Kramrisch কর্তৃক উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত 'The Hindu Temple', Vol. I, P. 66]

"পরমাত্মার দুটি রূপ : প্রকৃতি এবং তাঁর রূপান্তরিত প্রকাশ, বিকৃতি। বিকৃতি হলো সেই আকার যা ব্রহ্মাণ্ড ছেয়ে আছে।" —বিষ্ণুধর্মোত্তর'।

[প্রাগুক্ত, vol. II, P. 298]

'মন্দিরের আকৃতি হলো প্রকৃতি।" —'অগ্নিপুরাণ'। [প্রাগুক্ত, P. 300]

"প্রাসাদ (মন্দির) হলো শিব ও শক্তির একাত্মক প্রকাশ....অতএব ধ্যেয় এবং পূজ্য।"

—'ঈশানশিবগুরুদেবপদ্ধতি'। [প্রাগুক্ত vol I, P. 130]

"প্রাসাদ (মন্দির) পুরুষরূপে পূজ্য"। —'শিল্পরত্ন'। [প্রাগুক্ত, vol II, P. 359]

"তুমিই পূণ্য ও যশ দান কর .... সকল পবিত্র ক্ষেত্র তোমার ভিতর।"
—মন্দিরের উদ্দেশে স্তব, 'মহানির্বাণতন্ত্র।' [প্রাগুক্ত, vol. I, P. 142, Foot Note 40]

"The Hindu temple is a synthesis of many symbols. By their superposition, repetition, proliferation and amalgamation, its total meaning is formed ever anew."
—Stella Kramrisch [Ibid, P 166]

"The temple is the concrete shape (murti) of the Essence ; as such it is the residence and vesture of God. The masonry is the sheath (Kosa) and body. The temple is the monument of manifestation. The devotee who comes to the temple, to look at it, does so as a 'seer', not as a spectator."

—Stella Kramrisch [Ibid, P. 165]

তত্ত্ব

বাস্তুশাস্ত্র

হাজার বছরের বেশি সময়কাল ধরে মন্দিরের অধ্যাত্মবাদ বিষয়ে গ্রন্থরচনার কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকৃত মন্দির-নির্মাণের পাশাপাশি চলেছিল। এই গ্রন্থগুলির উদ্দেশ্য ছিল মন্দিরগুলির আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক ভিত্তিটি প্রস্তুত করা—ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং ভারতের নানা অঞ্চলে নানা বৈচিত্রের মধ্যেও এই দার্শনিক ভিত্তিটি রয়ে গেছে।

স্থাপত্য-বিজ্ঞানরূপে বাস্তুশাস্ত্র বহুকাল মৌখিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আচার্য বরাহমিহির কর্তৃক সংকলিত 'বৃহৎ-সংহিতা' ঐতিহাসিকভাবে প্রথম সময়-নির্ধারণযোগ্য (খ্রিষ্টিয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ) গ্রন্থ। 'বিষ্ণুধর্মোত্তর' মোটামুটি খ্রিষ্টিয় সপ্তম শতকের এবং 'তন্ত্রসমুচ্চয' পঞ্চদশ শতকের গ্রন্থ—মাঝে বযেছে অমূল্য আরও বহু গ্রন্থ।

'স্থাপত্যশাস্ত্রবেদ'—একই সাথে কলা ও বিজ্ঞান

মন্দির-স্থাপত্য একই সাথে কলা এবং বিজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান এবং প্রয়োগ উভয়েরই লক্ষ্য এখানে এক—মোক্ষলাভ। হিউ-এন-সাঙ্ একারণে স্থাপত্য-বিদ্যাকে পাঁচটি ঐতিহ্যানুমোদিত বিজ্ঞানের দ্বিতীয়টি বলেছেন, অন্যদিকে শুক্রাচার্য একে ৬৪ কলার অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও হয়তো মন্দিরগুলির কিছু উপযোগিতা ছিল, কারণ মেগাস্থিনিস ক'টি রাষ্ট্রপরিচালিত মন্দির ছিল, এমন বলেছেন। আবার বাস্তুশাস্ত্রীদের মতে স্থাপত্যশাস্ত্র একই সঙ্গে 'জ্যোতিষ' এবং 'কল্প' (বৈদিক বিধান ও প্রয়োগজ্ঞাপক সূত্রাত্মক শাস্ত্র)। বাস্তুশাস্ত্র শেষাবধি 'ফলিত জ্যোতিষ'। ববাহমিহির তাই 'বৃহৎ-সংহিতা'য় লিখেছেন : ''ব্রহ্মা থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত ঋষিদের নিরবচ্ছিন্ন ধারা যে বাস্তুজ্ঞান ও স্থাপত্যবিদ্যা আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত রেখেছে, তা-ই জ্যোতিষশাস্ত্রী ও জ্যোতির্বিদগণেব প্রীত্যর্থে মৎ-কর্তৃক ব্যাখ্যাত হবে।'' সবচেয়ে বড় কথা, ঐতিহ্যানুসারে স্থাপত্যশাস্ত্র যুক্ত তন্ত্রের সাথে এবং তন্ত্র যুক্ত অথর্ববেদের সাথে—এই হিসাবে স্থাপত্যশাস্ত্র অথর্ববেদেব উপবেদ—'স্থাপত্যশাস্ত্রবেদ'।

'তীর্থ' এবং 'ক্ষেত্র'

মৃত্যুর আগে জীবনে অনেক যাত্রাক্ষেত্র থাকে, কিন্তু ভারতে মৃত্যু এমন একটি যাত্রাক্ষেত্র যা মোক্ষ নিয়ে আসে না। যাঁদের পরমজ্ঞান উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয় মেধা, অধ্যবসায় ও তপস্যা আছে তাঁরা মোক্ষলাভ করেন, যাঁদের নেই তাঁরাও অন্য উপায়ে মোক্ষলাভ করতে পারেন—তীর্থযাত্রা হলো এমন একটি উপায়।

ঋগ্বেদ অনুসারে 'তীর্থ' শব্দটির একটি অর্থ 'অবতবণপ্রদেশ' বা নদী প্রভৃতিব জলে অবতবণের পথ বা ঘাট এবং খেয়াঘাট। মন্দির হলো 'তীর্থ', মন্দির মাত্রই 'তীর্থ'—খেয়াঘাট যেমন নদীর এক পাড় থেকে অন্যপাড়ে যাওয়ার 'ক্ষেত্র', মন্দিরও তেমন মর্ত্যালোক থেকে অমর্ত্যালোকে পাড়ি দেওয়াব 'ক্ষেত্র', মন্দির তাই অধ্যাত্মযাত্রার খেয়াঘাট, 'তীর্থ'। অন্যদিকে, 'ক্ষেত্র' হলো এমন জায়গা যেখানে একটি 'উপস্থিতি' অনুভূত হয়। কেমন হবে 'ক্ষেত্র'-টি?

'ক্ষেত্র'-টি হবে মানুষ এবং দেবতাদের মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ, সুতরাং সৌন্দর্যমণ্ডিত। মুখ্য হলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। এর কারণ ব্যাখ্যায় বরাহমিহির 'বৃহৎ-সংহিতা'-য় কাশ্যপের উদ্ধৃতি

দিয়ে লিখেছেন : "দেবতারা সর্বদা লীলা করেন এমন স্থানে যেখানে কাছাকাছি কুঞ্জকানন আছে, পাহাড়-পর্বত আছে, ঝর্ণা আছে এবং সেইসব নগরে যেখানে আনন্দ উদ্যান আছে।" সমগ্র বাস্তুশাস্ত্রে এর প্রতিধ্বনি আছে, যেমন, 'বিষ্ণুধর্মোত্তর' অনুসারে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবে দুর্গে, বিশিষ্ট নগরীতে, উদ্যানে, অরণ্যে, পুকুরপাড়ে, পাহাড়শীর্ষে, মনোহর উপত্যকায় এবং গুহায়—এমনসব জায়গায় দেবতারা থাকেন—যেখানে নদী বা পুকুর নেই সেখানে দেবতারা থাকেন না।

আবার, বাইরের প্রকৃতির কোথাও না হয়ে 'তীর্থ'-টি এবং 'ক্ষেত্র'-টি মানুষের মনের গভীরেও থাকতে পারে—'মানসতীর্থ'। 'জ্ঞান' হলো 'সত্য', জল হলো সত্যের প্রতীক—'মানসতীর্থে' থাকে জ্ঞান-রূপ জল ও নদী (বহমান জ্ঞানের প্রতীক)। একারণে ভারতে 'তীর্থ' অসংখ্য, আবার একারণেই কোনও তীর্থে না গেলেও চলে।

'মন্দির' শব্দটির প্রতিশব্দ

'মন্দির' ('মন্দিরম্') শব্দটির সর্বাধিক প্রচলিত প্রতিশব্দ দুটি : (১) 'বিমান'—'বিগত মান (মাপ/মাত্রা, উপমা) যাঁর'। পরমতত্ত্ব (Supreme Principle) সমস্ত মাপ, মাত্রা ও উপমার অতীত, তাঁর অনুকৃতিরূপে মন্দিরও 'বিমান'। আবার 'ঈশানশিবগুরুদেবপদ্ধতি'-তে বলা হয়েছে যে 'পরমতত্ত্ব' অমেয় এবং 'অনুপম' হলেও তাঁর জাগতিক প্রকাশ 'মেয়' বা মাপযোগ্য। ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত কিছুকে নিখুঁত মাপ ও স্থানে থাকতে হয়, মন্দিরেরও তাই. সুতরাং 'বিশেষ মান যার' এই অর্থে মন্দির 'বিমান'। দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির-অর্থে 'বিমান' শব্দটি বহুল প্রচলিত। (২) 'প্রাসাদ'—প্রকৃষ্ট 'সদ:' বা 'সদস' ('যজ্ঞস্থান'/'যজ্ঞমণ্ডপ') যার তা হলো 'প্রাসাদ' বা মন্দির। আবার দেবতাদের 'প্রসন্ন করে ('প্রসিদন্তি') বলে মন্দির 'প্রাসাদ' ('শিল্পরত্ন')। ভিলসার গরুড় স্তম্ভলিপি, বারহুতের রিলিফ্ প্যানেল (আনু ৫৩০ খ্রীঃ), মিহিরগুলের গোয়ালিয়র লিপি (৫৩৩ খ্রীঃ) প্রভৃতিতে মন্দির বোঝাতে 'প্রাসাদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন প্রাচীন লেখ ও বাস্তুশাস্ত্রে মন্দিরের আরও যেসব প্রতিশব্দ মেলে তার কিছু হল : 'দেবায়তন', 'দেবালয়', 'দেবকুলম্' 'ভবনম্', 'স্থানম্', 'বেশ্ম' বা 'বেশ্মন', 'কীর্তনম্', 'হর্ম্য', 'বিহার', 'দেব-ধিষ্ণ্য', 'সুরস্থান', 'চৈত্য', 'অর্চা-গৃহ', 'বিবুধ আগার', 'সৌধ', 'ধাম', 'সদন', 'বাস', 'বাস্তু', 'বাস্তুক', 'আস্পদ', 'আশ্রয়', 'নিলয়', 'নিকেতন', 'গেহ', 'গৃহ', 'আগার', 'লয়' প্রভৃতি।

মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

মিহিরগুলের গোয়ালিয়র লিপি (৫৩৩ খ্রি:)-তে বলা হয়েছে যে তিনি 'তাঁর মাতা-পিতা এবং তাঁর নিজের পুণ্যলাভের জন্য শৈলময় প্রাসাদ' নির্মাণ করলেন। 'অগ্নিপুরাণে' বলা হয়েছে ভাগ্য বা বাহুবলে যাঁরা ধনবান তাঁদের পুণ্যলাভের জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য তবে কোনও ধনহীন ব্যক্তি যদি দেবতার জন্য পর্ণকুটিরও নির্মাণ করেন, তবে তিনি একই পুণ্য বা মোক্ষলাভ করবেন। অতএব পুণ্য বা মোক্ষলাভই মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

নিয়মাতিরেক (Supererogation)

প্রতিষ্ঠাতা যিনিই হোন, যাঁরাই মন্দিরটি দর্শন করবেন বা যখনই দর্শন করবেন, তাঁরাই তখনই একই পুণ্যের ভাগী হবেন। এইভাবে মন্দির প্রতিষ্ঠা তার উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে যায়—তাই এটি একটি 'নিয়মাতিরেক'।

মন্দির-প্রতিষ্ঠা হলো যজ্ঞ-সাধন

জাতবেদ অগ্নির শিখা যেমন যজ্ঞের হবি পরমপুরুষের কাছে নিয়ে যান, যজ্ঞাগ্নি-শিখার মত মন্দির শিখরগুলিও তেমনই ভক্তের প্রার্থনাকে সূর্য-চন্দ্র-তারকাহীন উর্ধ্বলোকে সেই নাম ও আকারহীন সত্তার দিকে চালিত করে—মন্দির-প্রতিষ্ঠা তাই যজ্ঞ-সাধন।

যজমান (কারক/প্রতিষ্ঠাতা)

'আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে' মন্দির-প্রতিষ্ঠাতাকে উপরের কারণে বলা হয়েছে 'যজমান'—যিনি 'যজন' বা 'যজ্ঞ' করেন। যজমানই হলেন 'কারক' যিনি 'স্থপতি' বা 'কর্তৃ'-কে দিয়ে কাজটি করান।

স্থপতি (কর্তৃ) ও তাঁর যোগ্যতা

পরমতত্ত্বের ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করেছেন বিশ্বকর্মা—যজমানের ইচ্ছা ও পৃষ্ঠপোষকতায় মন্দিব করেন স্থপতি (কর্তৃ)। মন্দির হলো ব্রহ্মাণ্ডের অনুকৃতি, অতএব স্থপতি মর্ত্যের বিশ্বকর্মা। স্থপতিকে হতে হবে সচ্চরিত্র, শরীর ও মন উভয় দিক থেকেই অসাধারণ ভারসাম্যমণ্ডিত, অসীম ধৈর্য্যশীল, বিনয়ী, আত্মপ্রত্যয়ী, প্রত্যুৎপন্নমতি অর্থাৎ হঠাৎ সমস্যা দেখা দিলে তাৎক্ষণিক বুদ্ধিতে সমস্যা সমাধানে সক্ষম, সর্বোপরি বাস্তুশাস্ত্রসমূহের তত্ত্ব ও প্রয়োগ উভয়-ক্ষেত্রেই পারঙ্গম। আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে মালবের রাজা ভোজ 'সমারাঙ্গনসূত্রধার'-এ লিখেছেন : ''যে ব্যক্তি বাস্তুশাস্ত্র ও বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ কিন্তু প্রয়োগবিদ্যায় অনভিজ্ঞ তিনি কর্মক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে কাপুরুষের মত মূর্ছা যাবেন, যে ব্যক্তি প্রয়োগবিদ্যায় নিপুণ কিন্তু শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের মানে জানেন না তিনি অন্ধের মতন; যিনি একাধারে শাস্ত্র ও বিজ্ঞানসমূহে সুপণ্ডিত এবং অতীব প্রয়োগদক্ষ যদি তাঁর আরও থাকে 'প্রত্যুৎপন্ন' এবং 'প্রজ্ঞা' তবেই কাজ শেষ হলে নিজেরই সৃষ্টি দেখে তিনি সবিস্ময়ে বলে উঠবেন : 'বাহ্, এমন কি করে হলো যে আমি এটি নির্মাণ করলাম!''

বাস্তুপুরুষমণ্ডল

ব্রহ্ম হলেন পরমতত্ত্ব (SUPREME PRINCIPLE), মন্দির তাঁর প্রকাশ। পরমতত্ত্বের 'প্রকৃতি' নাম ও আকারশূন্য, তাই দৃশ্যাতীত। ব্রহ্মাণ্ড ও জগৎরূপে তাঁর 'আকৃতি' হলো 'বিকৃতি' ('বিষ্ণুধর্মোত্তর')—কিন্তু মন্দিরের 'আকৃতি'-র, মধ্যেই অনুভূত হয় তাঁর 'প্রকৃতি' ('অগ্নিপুরাণ')। এসবই হয় 'বাস্তুপুরষমণ্ডলে'র জন্য এবং 'বাস্তু' হলো 'উচ্ছিষ্ট'—তাবৎ ব্রহ্মাণ্ড হলো 'উচ্ছিষ্ট':

> উচ্ছিষ্টে নাম রূপং চোচ্ছিষ্টে লোক আহিত:।
> উচ্ছিষ্ট ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ বিশ্বমন্ত: সমাহিতম্।।
> উচ্ছিষ্টে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বং ভূতং সমাহিতম্।
> আপ: সমুদ্র উচ্ছিষ্টে চন্দ্রমা বাত আহিত:।।

—'' নাম এবং রূপ হলো উচ্ছিষ্ট। বিশ্ব (লোক) হলো উচ্ছিষ্ট। ইন্দ্র এবং অগ্নি হলেন উচ্ছিষ্ট। ব্রহ্মাণ্ড হলো উচ্ছিষ্ট। স্বর্গ ও মর্ত্য হলো উচ্ছিষ্ট। তাবৎ অস্তিত্ব হলো উচ্ছিষ্ট।।''

—অথর্ববেদ সংহিতা, একাদশ কাণ্ড, চতুর্থ অনুবাক। প্রথম সূক্ত।

পরমতত্ত্বের ইচ্ছার চর্বণে সৃষ্ট তাবৎ অস্তিত্ব, তাবৎ অস্তিত্ব তাই 'উচ্ছিষ্ট'। যদি কোনো

কিছু নিজের মধ্যে পূর্ণ হয় তবে তা সমাপ্ত এবং অবশিষ্ট ('উচ্ছিষ্ট') কিছুই থাকে না। কিন্তু যদি কোনো কিছু শুধু নিজের মধ্যেই পূর্ণ ও সমাপ্ত না হয়ে অবশিষ্ট ('উচ্ছিষ্ট') কিছু রাখে তবে তার শেষ নেই—ঐ অবশিষ্টটুকুই হলো 'বীজ', যা কিছু রয়ে যায় ও যা কিছু তা হতে সৃষ্ট হয়, তার 'উপাদান-কারণ'। যজ্ঞের অগ্নি সব কিছুকেই গ্রহণ বা দগ্ধ করেন, শুধু যজ্ঞস্থানটুকু থেকে যায়—যজ্ঞস্থানটুকুই অবশিষ্ট বা 'উচ্ছিষ্ট'। এই হল 'বাস্তু'—এখানেই 'বাস্তুপুরুষ' রূপে পরমতত্ত্ব নেমে আসেন।

'ভূ' (পৃথিবী) দেবীরূপে মাটিকে ধারণ করেন। এই মাটিই হলো 'ভূমি' যার উপরে সমস্ত স্থাপত্যের ক্রিয়াসংস্কারগুলি পালিত হয় এবং "এই হলো জায়গা যেখানে মর ও অমরগণ 'বাস' করেন" ('ময়মত')। অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত স্তরবিন্যাস হলো বস্তু, 'বস্তু'-তে থাকে ঐ 'বাস' করার স্থান, 'বাস্তু'। 'ময়মত' অনুসারে 'বাস্তু' চার প্রকার . 'ভূমি' (জমি), 'প্রাসাদ' (মন্দির, রাজবাড়ি/ তেমন বৃহৎ অট্টালিকা), 'যান' এবং 'শয়ন'। 'বস্তু' থেকেই সব কিছু হয়, 'বস্তু'-তেই থাকে 'বাস্তু' ('প্রাসাদ' প্রভৃতি স্থাপত্য)। এখানে 'বাস্তু' হলো পরিকল্পিত স্থাপত্যক্ষেত্র, নিয়ম অনুসারে এর আকৃতি চতুরস্র (Square) এবং পূর্ণ শব্দটি হলো 'বাস্তুপুরুষমণ্ডল'।

'বাস্তু' অতএব সমস্ত অস্তিত্বের পরিকল্পিত ও শুদ্ধ মান বা মাপসম্পন্ন আয়তন এবং এ হিসাবে পরমপুরুষের প্রতীকস্বরূপ।

'পুরুষ' হলেন 'উত্তম-পুরুষ' বা 'পরমপুরুষ'—'অপরা-প্রকৃতি'। তাঁর বহু হওয়ার ইচ্ছার জন্যই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সুতরাং তিনি সৃষ্টির 'নিমিত্ত কারণ', এবং তাঁর 'বস্তু' হতেই জগতের সৃষ্টি, অতএব তিনিই এর 'উপাদান-কারণ।' তাঁর স্বরূপ অনুসারেই ক্ষেত্র ও স্থাপত্যের পরিকল্পনা হয় এবং স্থাপত্যটি, অর্থাৎ 'প্রাসাদ' বা মন্দিরটি, তাঁরই 'আকৃতি'।

'মণ্ডল' হলো বহুভুজ বা বহুকোণ-বিশিষ্ট একটি সংবৃত ছক। এর মূল আকার হলো চতুরস্র, তবে এর প্রতীকবাদ বজায় রেখেই একে ষষ্ঠকোণ, অষ্টকোণ বা বৃত্তের আকারে রূপান্তরিত করা যায় ('বৃহৎ-সংহিতা')।

দেখা গেছে যজ্ঞস্থান হলো 'উচ্ছিষ্ট' এবং অবশিষ্ট এবং এখানেই পরমতত্ত্ব নেমে আসেন। এই-ই হলো 'বাস্তু'—পরমতত্ত্ব এখানেই অবতরণ করেন বলে বাস্তু হলো 'ব্রহ্মপুত্র'। বৈদিক যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ বেদী হলো 'উত্তরবেদী', 'উত্তরবেদী' চতুরস্র (Square), 'বাস্তুপুরুষমণ্ডল' তাই চতুরস্র, গর্ভগৃহ-ও তাই চতুরস্র—চতুরস্র 'বাস্তুপুরুষমণ্ডল'-কে যেহেতু কখনও কখনও অন্য আকারে পরিণত করা যায়, গর্ভগৃহকেও যায়, তবে তা প্রথমত চতুরস্র আকারেরই রূপান্তর, দ্বিতীয়ত কিছুটা বিরল ও ব্যতিক্রমী। অন্যান্য জ্যামিতিক আকার গতি ও উত্তেজনাময় আর তাই মরজীবনের প্রতীক—চতুরস্র সিদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, আর তাই অমরত্বের প্রতীক কেননা তা অটল, স্থির, পূর্ণসাম্যঋদ্ধ। অতএব 'বাস্তুপুরুষমণ্ডল' চতুরস্র সংবৃত ছক। ছকটি আবার কতগুলি চতুষ্কে উপবিভক্ত—দিক ও অবস্থান অনুসারে এগুলির প্রত্যেকটিতে একজন করে দেবতা থাকেন, এঁরা 'পার্শ্বদেবতা' বা 'আবরণ দেবতা'। কিন্তু 'বাস্তুপুরুষমণ্ডলের' ছকটির ঠিক কেন্দ্রস্থলটি 'ব্রহ্মস্থান' বা 'ব্রহ্মপুর' :

"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশতস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।।"

"—এই ব্রহ্মপুরে একটি ক্ষুদ্র পদ্ম আছে, একটি গৃহ যাতে একটি ক্ষুদ্র আকাশ আছে। তার মধ্যে যা আছে তাকে অন্বেষণ করতে হবে, তাকেই বিশেষ ভাবে জানার ইচ্ছা করতে হবে।"

—'ছান্দোগ্য উপনিষদ; অষ্টম অধ্যায় প্রথম খণ্ড, প্রথম মন্ত্র।

"যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোহন্তর্হৃদয আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রানি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি।।"

—" বাইরের আকাশ যতখানি, হৃদয়ের আকাশও ততখানি। স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়েই এর মধ্যে। অগ্নি ও বায়ু, সূর্য ও চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রসমূহ এবং দেহবান আত্মার ইহলোকে নিজের বলতে যা আছে ও যা নেই তার সবই আছে এর মধ্যে।"

—'ছান্দোগ্য উপনিষদ', অষ্টম অধ্যায় প্রথম খণ্ড, তৃতীয় মন্ত্র।

আচার্য শঙ্করের ভাষ্য অনুসারে 'ব্রহ্মপুর' হলো শরীর, হৃদয় হলো 'পদ্ম' এবং এই হৃদয়ে আছে 'আকাশ'—'হৃদয়াকাশ'—যা বাইরের আকাশের সমান, এই-ই 'বাস্তুপুরুষমণ্ডলের' 'ব্রহ্মস্থান' বা 'ব্রহ্মপুর'। এই হলো আবার যজ্ঞবেদী—এখানেই নেমে আসেন পরমতত্ত্ব, সীমার মাঝে অসীম হয়ে তিনি ধরা দেন প্রতীকী বিগ্রহে। যা বাঁধে তা 'যন্ত্র' ('যম্' থেকে নিষ্পন্ন, অর্থ: বন্ধন, নিয়ন্ত্রণ)—'বাস্তুপুরুষমণ্ডল' নামহীন ও আকারহীন পরমতত্ত্বকে প্রতীকীভাবে একটি মন্দিরের সঙ্গে বাঁধে (আকাশলিঙ্গম্/'চিদম্বরম্)।

পরমতত্ত্বের অবতরণের কথা নানা মীথের মাধ্যমে চলিত আছে, এগুলির মধ্যে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে ৫১টি জায়গায় পড়ে ৫১টি পীঠ সৃষ্টির কাহিনী সর্বাধিক পরিচিত। তবে 'বৃহৎ-সংহিতা', 'মৎসপুরাণ', ঈশানশিবগুরুদেবপদ্ধতি এবং 'স্কন্দ পুরাণে' পৃথক পৃথক মীথের সাহায্যে পরমতত্ত্বের অবতরণের কথা বলা হয়েছে।

এমন কল্পিত হয় যে, পরমতত্ত্ব পরমপুরুষ বাস্তুপুরুষরূপে অবস্থান করেন 'বাস্তুপুরুষমণ্ডলে'র ছকে—তিনি মাথা নামিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকেন, অন্যদিকে যজ্ঞাগ্নিশিখা প্রজ্বলিত থাকে ঊর্ধ্ব-মুখে এবং আকাশে ধ্রুব নক্ষত্র নিচের দিকে তাকিয়ে বাস্তুপুরুষের মাথার চারপাশে ঘুরতে থাকে—অর্থাৎ যজ্ঞাগ্নিশিখার বা মন্দির-শিখরের রেখা ধরে 'বাস্তুপুরুষমণ্ডল' হতে সোজা আকাশের দিকে তাকালে দৃষ্টি যায় প্রথমে 'মেরু' (পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে কল্পিত পৌরাণিক পর্বত, এর পৃষ্ঠদেশ স্বর্গ, 'সুরালয়') ও তারপর আরও অনন্ত ঊর্ধ্বলোকে সূর্যচন্দ্রতারকাহীন, নাম ও আকারহীন পরমতত্ত্বের দিকে, যিনি সবকিছুর কারণ কিন্তু নিজে কিছু নন। আবার ধ্রুবনক্ষত্র থেকে দৃষ্টি নামাতে নামাতে ক্রমে মন্দিরশিখর ও তারপর যজ্ঞাগ্নিশিখার রেখা ধরে নিচে তাকালে চোখে পড়বে 'বাস্তুপুরুষমণ্ডলের' কেন্দ্রস্থিত 'ব্রহ্মপুর' বা 'ব্রহ্মস্থান' অর্থাৎ মন্দিরের গর্ভগৃহ ও সেখানে স্থিত প্রতীক-বিগ্রহের দিকে, যাতে অবতীর্ণ হয়েছেন পরমতত্ত্ব।

অধিকাংশ বাস্তুশাস্ত্রে (যেমন : 'বৃহৎ-সংহিতা', 'মৎসপুরাণ', 'কামিকাগম,' 'ঈশানশিবগুরুদেব পদ্ধতি', 'হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র,' 'সমরাঙ্গনসূত্রধার', 'কাশ্যপশিল্প' ও 'মনুষ্যালয়চন্দ্রিকা') বলা হয়েছে যে, বাস্তুপুরুষমণ্ডলে' বাস্তুপুরুষের মাথা আঁকতে হবে উত্তর-পূর্ব দিকে, দু-একটি বাস্তুশাস্ত্রে বলা হয়েছে পূর্ব দিকে। অধিকাংশ বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে বাস্তুপুরুষের পদযুগল উপাসিত হবে দক্ষিণ-পশ্চিমে। এভাবেই, বিভিন্ন বাস্তুশাস্ত্রের বিধানে ছকের কেন্দ্রস্থিত 'ব্রহ্মস্থান' বা 'ব্রহ্মপুরের'

চারপাশের চতুষ্কগুলির সংখ্যা, সংস্থান, সন্নিধান ও তাতে অবস্থিত দেবতাগণ-বিষয়ে পার্থক্য আছে—তবে কেন্দ্রটি সবসময়েই 'ব্রহ্মপুর' বা 'ব্রহ্মস্থান'।

একইভাবে, দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরগুলিতে যতটা প্রকৃত এবং আক্ষরিক অর্থে 'বাস্তুপুরুষমণ্ডলের' তত্ত্বটির প্রযোগ দেখা যায়, উত্তর ভারতে ততটা নয়—তবে মূল তত্ত্বটি সর্বত্র এক।

সর্বোপরি মনে রাখতে হয় যে, 'বাস্তুপুরুষমণ্ডল' মন্দিরের ভূমি-নকশা (ground plan) নয়, নির্মাণ-নকশা (Building plan)-ও নয়, কিন্তু দার্শনিক ও তাত্ত্বিক দিক থেকে 'বাস্তুপুরুষমণ্ডল'-ই সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে।

নমুনা হিসেবে, পরমশ্রদ্ধেয়া ক্র্যামরিশ 'বাস্তুপুরুষমণ্ডলে'র বিবিধ যে ছকগুলি উপস্থাপিত করেছেন সেগুলির একটি নিচে দেওয়া হলো :

VĀSTUPURUṢAMAṆḌALA

PILIPIÑJĀ

PĀP RĀKSASĪ

CARAKĪ

JAMBHAKA

ROGA	AHI	MUKHYA	BHALLĀTA	SOMA	BHUJAGA	ADITI	DITI	AGNI
PĀPA-YAKSMAN	RUDRA						ĀPA	PARJANYA
SOṢA		RAJA-YAKSMAN	PRTHIVIDHARA			ĀPA-VATSA		JAYANTA
ASURA		MITRA	BRAHMĀ			ARYAMAN		INDRA
VARUṆA								SŪRYA
KUSUMA-DANTA								SATYA
SUGRĪVA		INDRA	VIVASVAN			SAVITR		BHRŚA
DAU-VĀRIKA	JAYĀ						SAVITRA	ANTAR-IKSA
PITARAH	MRGA	BHRṄGA-RAJA	GAN-DHARVA	YAMA	BRHAT-KSATA	VITATHA	PŪSAN	ANILA

PŪT

DĀRI

ব্রহ্মাণ্ডের অনুকৃতি এবং সম্মুখদেশহীনতা

পরমতত্ত্ব গর্ভগৃহে নেমে আসেন বলেই মন্দির ব্রহ্মাণ্ডের অনুকৃতি। ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ জগৎ (Macrocosom), মন্দির অণু জগৎ (Microcosom)। ব্রহ্মাণ্ডের সম্মুখদেশ/পৃষ্ঠদেশ বলে কিছু হয় না। গর্ভগৃহের দ্বারের দিকটি ছাড়াও অন্য তিনটি দিকেও থাকে বা থাকতে পারে প্রতীকী নকল দরজা ও গবাক্ষ, শিখরের চারদিকের দেয়ালও একই রকম—দূর থেকে সব দেয়ালকেই একই রকম লাগে, বোঝাই যায় না প্রবেশদ্বারটি কোনদিকে। মন্দির ব্রহ্মাণ্ডের অনুকৃতি বলেই এমনটি হয়েছে।

গর্ভগৃহ

মন্দিরের যে কক্ষে প্রতীক-বিগ্রহে অবতীর্ণ পরমতত্ত্ব বিরাজ করেন, সেটি 'গর্ভগৃহ'। গর্ভগৃহ হলো "প্রাসাদের গর্ভ"। এটি সাধারণত একটি ক্ষুদ্র কক্ষ, 'বাস্তুপুরুষমণ্ডল' ও তৎপূর্বে 'ছান্দোগ্য উপনিষদ'-কথিত 'ব্রহ্মপুর' বা 'ব্রহ্মস্থান'। উদাহরণত, খাজুরাহোর জগৎ বিখ্যাত 'কন্দরিয় মহাদেব' মন্দিরের মণ্ডপ-সহ প্রাসাদের দৈর্ঘ্য হলো ১০২ ফুট ৩ ইঞ্চি কিন্তু গর্ভগৃহের দৈর্ঘ্য মাত্র ১২ফুট। স্বল্প সংখ্যক ব্যতিক্রম ছাড়া গর্ভগৃহ সবসময়েই চতুরস্র এবং পর্বতের গুহার মত অন্ধকার। গর্ভগৃহে প্রবেশ হলো এই পৃথিবী থেকে আরেক পৃথিবীতে— দেবতাদের পৃথিবীতে— প্রবেশ। এ হলো 'আরোহণ', এই 'আরোহণ'-ই আবার 'মূল প্রকৃতি'-তে 'অবরোহণ'।

উপরে বলা 'মূল প্রকৃতি' হলো 'মাতৃগর্ভ'। গর্ভগৃহে প্রবেশ তাই আবার মাতৃগর্ভে পুনঃপ্রবেশ এবং গর্ভগৃহ হতে নিষ্ক্রমণ হলো পুনর্জন্মলাভ। এই নারীসত্তায় গর্ভগৃহ হলো 'ভ্রূণগৃহ' এবং 'অব্যক্ত'-এর আগার। মন্দির প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান তথা ক্রিয়াসংস্কারগুলিও এই ইঙ্গিত দেয়। যেমন, মন্দির-প্রতিষ্ঠার প্রথম আচার হলো 'গর্ভাধান'—মাটিতে, অর্থাৎ মাতা বসুন্ধরার গর্ভে 'বীজবপণ' বা 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা' করা হয়, স্থানটি হলো গর্ভগৃহের একমাত্র এবং গুরুভার 'ঘনদ্বার' বরাবর। এই-ই হলো মন্দিরের 'হিরণ্যগর্ভ'। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, নাগররীতির মন্দিরের রেখ শিখরের একটি প্রতিশব্দ হলো 'মঞ্জরী' যার অর্থ 'কিশলয়'—কিশলয় যেমন মৃত্তিকাগর্ভ হতে নির্গত হয়ে আকাশের দিকে ধাবিত হতে হতে একসময় মহাবৃক্ষে পরিণত হয়, তেমনই গর্ভগৃহের চারটি দেওয়াল 'অন্তরিক্ষ'—যা অন্তর (মধ্যে) ঈক্ষ (দৃশ্য) হয় অর্থাৎ যা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে দৃশ্য হয়—সেই আকাশমুখী হয়। এই ভাবে গর্ভগৃহের দেওয়াল চারটি মৃত্তিকাগর্ভ হতে অন্তরিক্ষের ঊর্ধ্বতম লোকে আসীন পরম কারণের অভিমুখী হয়।

যে বহির্জগতে আমরা বাস করি তা মন্দিরের সামনেকার চারদিক খোলা মণ্ডপের মতো উন্মুক্ত, অসংখ্য প্রশ্নে আতুর ও অনিশ্চিত— কিন্তু গর্ভগৃহ স্থির, আচঞ্চল এবং নিশ্চিত কেননা তা 'ব্রহ্মপুর' বা 'ব্রহ্মস্থান'।

যখন আলোক সৃষ্টি হয়নি তখন ছিল শুধুই অন্ধকার, এই অন্ধকারের গর্ভ হতেই জন্ম নিয়েছিল আলোক— গর্ভগৃহ তাই অন্ধকার।

আবার 'ব্রহ্মস্থান' বলেই সমগ্র প্রাসাদের মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ়, সবচেয়ে মজবুত ও সবচেয়ে

স্থায়ী নির্মাণ হলো গর্ভগৃহ। এর নিশ্ছিদ্র স্থূল দেওয়াল একদিকে বহির্জগতের সমস্ত অশুভ এবং অরিষ্ট প্রভাব, মোহ, বিভ্রান্তি ও চিত্তবিক্ষেপ হতে গর্ভগৃহকে রক্ষা করে এবং অন্যদিকে দেবতার সঙ্গে ভক্তের 'নিভৃত' মিলনের জন্য তাকে 'গোপন' রাখে। একারণেই প্রায় সর্বক্ষেত্রে গর্ভগৃহের একটি মাত্র গুরুভার দ্বার—'ঘনদ্বার'।

ইতোমধ্যে যেমন দেখা গেছে—শ্রেষ্ঠ বৈদিক যজ্ঞবেদী চতুরস্র, 'বাস্তুপুরুষমণ্ডল' চতুরস্র, তার কেন্দ্রের 'ব্রহ্মপুর' বা 'ব্রহ্মস্থান' চতুরস্র—তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গর্ভগৃহ চতুরস্র।

অন্য আকারের গর্ভগৃহ

'বাস্তুপুরুষমণ্ডল'-কে যেমন অন্য আকাবে রূপান্তরিত করা যায়, গর্ভগৃহের ক্ষেত্রেও তাই। সম-চতুরস্র (আয়তাস্র) গর্ভগৃহ আছে খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত গুজরাটের প্রভাস পাটানের নিকটবর্তী বরাহ/দশ অবতার মন্দিরে, ভুবনেশ্বরের বৈতল দেউলে, গোয়ালিয়রের 'তেলী কা মন্দিবে' এবং সাঁচির ৪০/৪৫ কি. মি দূরের গয়রাসপুরের ভগ্ন মন্দিরে। মালাবার অঞ্চলের শিব-মন্দিরগুলিতে আয়তবৃত্ত বা ডিম্বাকার গর্ভগৃহ দেখা যায়।

মাটির নিচের গর্ভগৃহ কি মুসলমান আক্রমণের ফল?

অনেক সময়ে মাটিতে গভীর গর্ত করে গর্ভগৃহ নির্মাণ করা হয়। কখনও কখনও এখানে জলও থাকে ('অম্বুলিঙ্গ')। কিন্তু এজাতীয় গর্ভগৃহেব প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত যে মন্দিরগুলিতে আছে সেই মন্দিরগুলি—যেমন গুজরাটের মেধেরার সূর্যমন্দির বা ত্রিচিনোপলির জম্বুকেশ্বর মন্দির—নির্মিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় দশম শতকে, অর্থাৎ মুসলমানরা এদেশে শাসকশক্তি হওয়ার আগে। অতএব, মুসলমান আক্রমণের ভীতি নয়, একদিকে গোপন-নির্জন সাধনার প্রয়োজন এবং অন্যদিকে পার্বত্য গুহার স্মৃতি হয়তো এর মূলে ছিল।

চার্চ ও বৌদ্ধ-মন্দিরের সঙ্গে গর্ভগৃহের পার্থক্য

পাশ্চাত্য বাস্তুবিদদের সমস্যা ছিল সমাগত ভক্তদের সমবেত প্রার্থনার মন্দ্রিত ধ্বনি ও ছন্দ যাতে ঠিকমত প্রতিধ্বনিত হয়ে ভাবগম্ভীর পরিবেশ-সৃষ্টিতে সমর্থ হয়, এমন হলঘব নির্মাণ করা। একই কারণে চার্চসৃষ্টির অনেক আগে হতেই বৌদ্ধ-মন্দিবগুলিতে অর্ধবৃত্তাকার বা পিপা-সদৃশ ছাদ সম্পন্ন চৈত্য-হলঘরগুলি নির্মিত হয়ে আসছিল। কিন্তু হিন্দুধর্মে সমবেত পূজার বা Congregational Worship-এব স্থান নেই—এখানে পূজা একান্তভাবে ভক্ত ও ভগবানের ব্যাপার, এখানে পূজা হলো একক ভক্তের আত্মনিবেদন, উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ (অনেক সময়, যেমন দক্ষিণ ভারতে, একক পুরোহিত ভক্তের প্রতিনিধিত্ব করেন)। এমনকি বৈষ্ণবদের কীর্তনও হয় মন্দির-সংলগ্ন মণ্ডপে, গর্ভগৃহে নয়। গর্ভগৃহ একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ যেখানে মাত্র একজনই প্রবেশ করতে পারেন।

মন্দির-বিষয়ে প্রাচীন শৈব তত্ত্ব

১০০০ খ্রীষ্টাব্দেব কাছকাছি সময়ে লিখিত 'ঈশানশিবগুরুদেবপদ্ধতি' গ্রন্থে শৈব দৃষ্টিতে 'প্রাসাদ' বা মন্দিরের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইভাবে :

প্রাসাদ বা মন্দিরের মন্ত্র হলো 'নাদ'। নাদ হল বিশ্বের আদি বস্তুকণা সমূহের 'উপাদান-কারণ।' শিবতত্ত্বই পরমতত্ত্ব। ব্রহ্ম, যিনি কর্তা-কর্ম, জ্ঞানী-জ্ঞাত, কাল ইত্যাকাব সমস্ত কিছুরই বহু ঊর্ধ্বে, হলেন 'চিদ্‌ঘন', পরম ঘনীভূত চেতনা, তাই তিনি অটল এবং স্থিব ('অচলাসন')। যা ঘনীভূত, জমাট, তাতে সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় শূন্যস্থান থাকেনা। শিবের সঙ্গে তাই আছেন শক্তি, এবং শক্তি শিব হতে পৃথক নন। শক্তি হলেন শিবের 'ইচ্ছা' 'জ্ঞান' এবং 'ক্রিয়া'। তাই শক্তি গতিশীল ('চলাসন')। শক্তি একই সাথে 'পরা' এবং 'অপরা'—শিবশক্তি রূপে তিনি 'পরা', ব্রহ্মাণ্ডের প্রসবিত্রী রূপে তিনি 'অপরা'। 'বিন্দু'-রও তাই দুটি রূপ—'সূক্ষ্ম' এবং 'স্থূল'। 'সূক্ষ্ম' রূপে, 'বিন্দু' হলেন 'নাদ' যা 'মোক্ষ'-দান করে, 'মোক্ষ' হলো 'শূন্য'। মন্দির-শিখরের সর্বোচ্চ বৃত্তাঙ্কটি হলো 'বিন্দু'-র প্রতীক। 'শূন্য'-রূপে শক্তি সেই আধার, গর্ভ, যেখানে 'বীজ' রূপে সৃষ্ট হয় ব্রহ্মাণ্ড। মন্দির (প্রাসাদ) হলো 'নাদ'-এর প্রতীক। মন্দিরেব মন্ত্র, ভূমিনকশা, স্থাপত্য সবকিছুই এই সত্যকে প্রদর্শন করে। গর্ভগৃহের চারপাশে ও উপরে যে স্থাপত্য গড়ে ওঠে তা-ও এই অর্থ বহন করে।

'প্রাসাদ পুরুষ রূপে পূজ্য'

'বিষ্ণুধর্মোত্তর'-এ বলা হয়েছে, পরমপুরুষের 'প্রকৃতি'-র ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী প্রকাশ হলো 'বিকৃতি'। 'অগ্নিপুরাণ'-এ বলা হয়েছে, "মন্দিবের 'আকৃতি' হলো 'প্রকৃতি"। এর অর্থ হলো মন্দির নাম ও আকারহীন পরমতত্ত্বেরই প্রতীকী 'আকৃতি'। 'শিল্পরত্ন'-এ তাই বলা হয়েছে, 'প্রাসাদ (মন্দির) পুরুষ রূপে পূজ্য'। ব্রহ্মাণ্ড এবং মানুষ দুই-ই আছে পরমতত্ত্বের প্রকাশের মধ্যে। ব্রহ্মাণ্ড ও মানুষ তাই অনুকল্প এবং সমার্ঘ। 'পুরুষ' এই রূপে ব্রহ্মাণ্ড এবং মানুষের 'প্রতিমা'। পুরীতে শয়ন করার মতো (যাস্ক, 'নিরুক্ত') পরমতত্ত্ব 'দেহে জীবরূপে শায়ী;' তাই তিনি 'পুরুষ।' 'বাস্তুপুরুষমণ্ডল' হলো সেই জাদু ছক (magic diagram) বা পুরীর নকশা যা 'যন্ত্র' বা যা 'বাঁধে' এবং সেই রূপে পরমপুরুষকে 'প্রাসাদ' বা মন্দিরের সঙ্গে 'বাঁধে'। একারণেই মন্দিরের 'আকৃতি' হলো 'প্রকৃতি' এবং একারণেই মন্দির 'পুরুষ' ও সেই রূপেই পূজ্য। ঈশানশিবগুরুদেবপদ্ধতি-তে একই ভাবে বলা হয়েছে, 'প্রাসাদ (মন্দিব) হলো শিব ও শক্তির একাত্মক প্রকাশ .... অতএব ধ্যেয় এবং পূজ্য'।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকের সিরপুর প্রস্তরলেখতে বলা হয়েছে, মন্দিরের আকৃতির মধ্যে 'এই বিস্ময়কর সংসারের' উঁচু-নিচু সমস্ত জীব ও আকৃতি বর্ণিত হয়। 'বাস্তুপুরুষমণ্ডলে' সমস্ত দেবতাদের মুখ থাকে 'ব্রহ্মপুর' বা 'ব্রহ্মস্থানের দিকে— মন্দিরেব চারপাশে থাকে দেবতাদের মূর্তি। অমঙ্গলকর অসুর দমিত হচ্ছে ও দিব্য শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। মন্দির-গাত্রের উন্নতানত অংশগুলি (যেমন মধ্যপ্রদেশের 'নীলকণ্ঠেশ্বর' মন্দিরে) যেন 'সময়' নামক বইয়ের পৃষ্ঠা। মন্দিবের কেন্দ্রীয় থামটি লাইট-হাউসের মতো চারদিকের মূর্তিগুলির মাধ্যমে আলোক বিকিরণ করে। মন্দির-শীর্ষের বিশাল পতাকা যশ বিকীর্ণ করে। এইভাবে, মন্দিব হলো পরমপুরুষের

প্রকাশ। একারণেই 'মহানির্বাণতন্ত্র'-এ মন্দিরেব উদ্দেশে স্তব রচনা করে বলা হয়েছে : 'তুমিই পুণ্য ও যশ দান কর .... সকল পবিত্র ক্ষেত্র তোমার ভিতর।'

মন্দিরের চক্ষুদান

মন্দির-প্রতিষ্ঠার ক্রিয়া-সংস্কারগুলিও উপরের তাৎপর্য বহন করে। মন্দির-নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পরে, একদিন উষাকালে প্রধান স্থপতি বিমানের উপর আরোহণ করে সোনার সূচ দিয়ে মন্দিরের চক্ষুদান ('নেত্রমোক্ষ') করেন। এরপর 'স্থাপক' বা পৃষ্ঠপোষক মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা ('হৃৎপ্রতিষ্ঠা') করেন এবং শুরুর সময়ের মতো আবার 'অঙ্কুরার্পণ' ও মন্দিরের 'বীজবপণ', অনুষ্ঠান হয়। এই ভাবে পরমতত্ত্ব মন্দিরেব 'দেহে জীবরূপে শায়ী হন'।

'দর্শন করা' ও তার তাৎপর্য

'দর্শন করা' ব্যাপারটি ভারতীয় মানসে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ—বিগ্রহ ও মন্দির উভয়েরই চক্ষুদান-('নেত্রমোক্ষ') অনুষ্ঠানের অর্থ তীর্থযাত্রী বা ভক্ত যখন মন্দির বা তার গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের স্বরূপে পরমতত্ত্বকে 'দর্শন' করছেন, তখন সেই মন্দির বা বিগ্রহে অবতীর্ণ নাম ও আকারহীন পরমতত্ত্ব তীর্থযাত্রী বা ভক্তকে 'দর্শন' করছেন—ফলত তীর্থযাত্রী বা ভক্ত একই সঙ্গে দর্শন' করছেন ও 'দৃষ্ট' হচ্ছেন। 'দর্শন' আবার সত্যকে চেনার ছয়টি দিক, 'ষড়দর্শন'—'ন্যায়', 'বৈশেষিক', 'সাংখ্য', 'যোগ', 'মীমাংসা' এবং 'বেদান্ত'। 'যোগ' ছাড়া বেদান্ত উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু মন্দির ও বিগ্রহ উভয়ের মাধ্যমেই প্রত্যক্ষ দর্শন হয় বলে তা যোগের অগ্রগামী।

সারতত্ত্ব

হিন্দু মন্দির হলো বহু প্রতীকের সংশ্লেষণ। সেগুলির আরোপণ, পুনরানয়ন, বহুপ্রজন এবং মিশ্রণের ফলে এর সামগ্রিক অর্থ সব সময়ে নব নব রূপ পরিগ্রহ করে, কিন্তু মূল ভাবটি কখনো বদলায় না। মূল ভাবটি এই রকম : মন্দির হলো চেতনার ঘনীভূত 'মূর্তি'। এভাবে, মন্দির হলো ভগবানের বাড়ি। স্থাপত্য এর কোশ এবং শরীর। মন্দির, সুতরাং হলো, নাম ও আকারহীন ব্রহ্মের জাগতিক প্রকাশের যশস্তম্ভ। ভক্তগণ মন্দির 'দর্শন' করতে আসেন, দেখতে আসেন না।

স্থাপত্য

উপাদান : (ক) ইট

"হে অঙ্গিরস কন্যা
তুমি অভগ্ন, অনাহত ও পূর্ণাকার,
হে ইষ্টক, তুমি আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফল দান কর।।"

'অগ্নিপুরাণ' এবং 'হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র'-তে উপরের মন্ত্র সহযোগে মন্দিরের 'ইষ্টকন্যাস' ও প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। বেদ অনুসারে অঙ্গিরসগন হলেন জাতবেদ অগ্নির অনুচর এবং এঁদের কন্যাগণ হলেন বৈদিক যজ্ঞবেদীর ইট আর তাই মন্দিরেরও ইট। বৈদিক যজ্ঞের বেদী ইট পেতে তৈরি হতো বলে ইট হলো 'যজ্ঞতনু'। ইট হয় মাটি হতে, মাটি আসে পৃথিবীর গর্ভ হতে—'পৃথিবী অজেয়, তাই ইটও অজেয়' ('শতপথ ব্রাহ্মণ')। সর্বাগ্রে সৃষ্ট বলে পৃথিবী 'বাক্', তাই মাটি 'বাক্' আর তাই ইটও 'বাক্' ('শতপথ ব্রাহ্মণ')। একারণেই ইটও 'দেবী'— 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'-য় তাই ইটের উদ্দেশে প্রার্থনা : 'হে দেবী! হে, ইষ্টক! তোমার উদ্দেশে আমাদের এই যজ্ঞাহুতি!' 'শতপথ ব্রাহ্মণে' বলা হয়েছে যে, দেবতারা 'ইষ্ট' (আহুতি/নৈবেদ্য) -দ্বারা 'প্রজাপতি'-কে অগ্নিতে স্নান করালেন এবং এই 'ইষ্ট' পরিণত হলো 'ইষ্টক'-এ। এইসব কারণে মন্দির তৈরীর উপাদানগুলির মধ্যে 'অগ্নি-স্নাত' বা আগুনে পোড়ানো ইটের মর্যাদা সবচেয়ে. বেশি, প্রকৃতপক্ষে মন্দির তৈরীর অন্য দুই প্রধান উপাদান, পাথর এবং কাঠকেও 'ইট' জ্ঞানেই ব্যবহাব করা হতো—ভিতের প্রথম পাথরকে বলা হতো 'আদ্যেষ্টক' বা 'প্রথমেষ্টক' এবং পাথরের মন্দিরেরও হতো 'ইষ্টকন্যাস।'

প্রাচীনতম ইটের মন্দির

মৌর্যযুগে (খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে) নির্মিত ও রাজস্থানের জয়পুর জেলার বৈরাটে উৎখনিত একটি বৌদ্ধ মন্দিরের চারপাশে ইটের দেয়ালের প্রমাণ আছে। খ্রিষ্টিয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতকে নির্মিত ও উত্তর প্রদেশের কানপুর জেলার ভিতরগাঁওয়ে অবস্থিত ইটের বৃহৎ মন্দিরটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে; মহারাষ্ট্রের শোলাপুর জেলায় ও অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলায় খ্রিষ্টিয় সপ্তম শতকে নির্মিত ইটের মন্দির-স্থাপত্যের প্রমাণ আছে। একই সময় নির্মিত হয় মধ্যপ্রদেশের সিরপুর জেলার ইট-নির্মিত 'লক্ষ্মণ মন্দির'। খ্রিষ্টিয় অষ্টম শতকের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হলো বাংলাদেশের পাহাড়পুরের উৎখনিত বৌদ্ধ মন্দির।

মশলা দিয়ে ইট গাঁথার প্রথম নিদর্শন

মধ্যপ্রদেশে সাঁচির অনতিদূরে বিদিশার প্রান্তবর্তী 'হেলিওডোরাসে'র স্তম্ভের কাছে উৎখননে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে নির্মিত একটি নির্মাণে মশলা দিয়ে ইট গাঁথাব প্রাচীনতম প্রমাণ মিলেছে।

ইটের লিঙ্গভেদ

কোনো কোনো বাস্তুশাস্ত্রে ইটের ওজন, ঘনত্ব, মাপ প্রভৃতি (যেমন : 'সঞ্চিত,' 'অসঞ্চিত' এবং উপসঞ্চিত') বিচার করে ইটকে পুংলিঙ্গ, 'স্ত্রীলিঙ্গ' ও ক্লীবলিঙ্গ'—এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে।

ইট—বাস্তুশাস্ত্রে বহুল আলোচিত

বৈদিক আচার ও বিধানে ইটের বিপুল গুরুত্বের কারণে 'বিষ্ণুধর্মোত্তর,' 'ময়মত' প্রভৃতিতে ইট নির্মাণের আচার-বিধি ও পদ্ধতি বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা আছে।

উপাদান : (খ) পাথর

বৈদিক ক্রিয়াসংস্কারে পাথরও হলো ইট

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে পাথরের কোনো জায়গা নেই। পাথরকে সম্মান জানিয়ে কোনো বৈদিক বা বৈদান্তিক মন্ত্রও নেই। তাই পাথরের খণ্ডগুলিকে ইট জ্ঞান করেই মন্দির-নির্মণে ব্যবহার করা হতো। পাথরে নির্মিত মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠার মন্ত্র ছিল ইটের মন্দির প্রতিষ্ঠারই মন্ত্র। ভিতের প্রথম পাথরকে বলা হতো 'আদ্যেষ্টক' বা 'প্রথমেষ্টক'। প্রথম পাথরটি বসানোর নাম হলো 'ইষ্টকন্যাস'। বলা বাহুল্য, বৈদিক যজ্ঞবেদীতে ইটের বিপুল গুরুত্ব এবং তাঁর স্মৃতিই এর কারণ।

পাথরের মন্দিরের ক্রিয়া-সংস্কার

আগেই দেখা গেছে যে, পাথরের মন্দির-প্রতিষ্ঠাতেও বৈদিক ঐতিহ্যেরই প্রতিফলন ঘটত। মাটির গভীরতম প্রদেশে প্রথিত হতো 'আধারশিলা' যা প্রতীকী অর্থে মন্দির-স্থাপত্যটিকে ধারণ করে স্থায়িত্ব বিধান করত। সমগ্র রীতি ও প্রতীকটি এসেছে 'অধ্বর্য্যু' (যিনি 'অধ্বর' বা যজ্ঞের নেতা)-কর্তৃক যজ্ঞবেদী নির্মানের ক্ষেত্রে অনুসৃত রীতি থেকে। রীতিটি এইরকম : প্রথমে যজ্ঞবেদীর কেন্দ্রে আত্মারূপে রাখা থাকত একটি ঘাসের কুণ্ডলী (লক্ষণীয় ভাবে, এর আনুষ্ঠানিক নাম 'ইষ্টক'), এর উপরে থাকত 'স্বর্ণচক্র'-এর প্রতীকরূপে পদ্মপাতা, তার উপর প্রতীকী 'স্বর্ণপুরুষ', তার উপরে আবার প্রাকৃতিক ছিদ্র-সম্পন্ন একটি পাথর এবং পূর্বদিকে বিধিসম্মত দূরত্বে বিছানো কিছু পদ্মফুলের উপরে রাখা থাকত একটি জীবন্ত কচ্ছপ। বিষ্ণু-অবতার কচ্ছপের উপরের খোলাটি 'অন্তরিক্ষ'-এর প্রতীক আর নিচের খোলাটি ছিল মর্ত্যলোক তথা 'সংসার'-এর প্রতীক। মন্দিরের ক্ষেত্রে 'স্বর্ণপুরুষ'-এর স্থান নিয়েছে 'শক্তিকলস।'—স্মরণযোগ্য যে, বাংলাদেশের মহাস্থানের কাছে গোকুল নামক গ্রামে উৎখননে একটি প্রাচীন মন্দিরের ভিতের চার স্তর নিচে পাওয়া গেছে ১২টি ছিদ্র-সমন্বিত একটি 'আধারশিলা' যেটির কেন্দ্রীয় ছিদ্রের গায়ে উন্নতানতভাবে 'বুটি' (emboss) করা আছে একটি 'স্বর্ণবৃষ।'

মন্দির-নির্মাণে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যবহৃত পাথর

মন্দির-নির্মাণে প্রাচীন যুগ হতে ব্যবহৃত হচ্ছে . মধ্যভারতে বেলেপাথব (sand stone); পশ্চিম ভারতে মূলত চুনাপাথর (lime stone) ও মার্বেল (marble); দাক্ষিণাত্যে একটি বিশেষ ধরণের আগ্নেয়শিলা (trap), পরবর্তী চালুক্যদের সময়ে সূক্ষ্ম বুনট-সম্পন্ন কালো শ্লেট পাথর (chlorite, যা রাজমহল পাহাড় থেকে সংগ্রহ করে বাংলার ইটের মন্দিরের দরজার ফ্রেম নির্মাণেও ব্যবহৃত হতো); আরও দক্ষিণে গ্রানাইট এবং উড়িষ্যায় বেলে পাথর এবং গৈরিক পাথর (laterite)।

পাথর মণ্ডন এবং ধাতব আংটা ব্যবহার

মৌর্য যুগের স্তম্ভগুলিতেই প্রথম পাথর ধরে রাখার জন্য ধাতু (ব্রোঞ্জের আংটা বা তামার সন্দর্শ) ব্যবহৃত হয়; কিন্তু তার বেশ পরেও ধাতব আংটা ছারাই পাথর সাজিয়ে মন্দির

নির্মাণের রেওয়াজ ছিল। গুপ্তযুগে মধ্যভারতে খুব বড় বড় পাথরের চাঁই যত্নসহকারে মণ্ডন করে বা চেঁচে কোনো রকম মশলা বা আংটা ছাড়া ব্যবহারের রীতি ছিল। প্রথম যুগের চালুক্য ও চোলদের সময়েও মশলা বা আংটা ছাড়াই বেলেপাথর ব্যবহৃত হতো। উড়িষ্যার কোনারকের সূর্যমন্দিরের (ত্রয়োদশ শতক) মণ্ডপের অন্তরাচ্ছাদনে পাথরের মধ্যে লোহার জালিকা (grid) ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রাচীনতম পাথরের মন্দিরের লেখ্য প্রমাণ

মথুরায় প্রাপ্ত একটি লিপিতে (Mora well inscription) মহাক্ষত্রপ সুদাস খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে একটি 'শৈলদেবগৃ(হ)' নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছেন কিন্তু এখন সেটির চিহ্ন নেই। একই সময়ের ও রাজস্থানের উদয়পুর জেলার নাগরিতে প্রাপ্ত একটি লিপিতে রাজা সর্বতাত-কর্তৃক 'সঙ্কর্ষণ বাসুদেব'-এর জন্য একটি 'পূজাশিলা-প্রাকার' বেষ্টিত 'নারায়ণ বাটিকা' নির্মাণের কথা আছে। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধের মিহিরগুলের গোয়ালিয়র লিপির 'শিলাময় প্রাসাদ'-এর কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

পাথরে নির্মিত প্রাচীনতম মন্দির

এখনও দাঁড়িয়ে আছে পাথরে নির্মিত এমন প্রাচীনতম মন্দিরের মধ্যে আছে : মধ্যপ্রদেশের সাঁচির ১৭ নম্বর বলে কথিত সমতল ছাদ-বিশিষ্ট মন্দির (পঞ্চম শতক), মধ্যপ্রদেশেরই টিগাওয়ার গুপ্তযুগীয় মন্দির, এরাণের বিষ্ণু মন্দির, পান্না জেলার একটি মন্দির, ভূমারের শিব মন্দির, নাচনার পার্বতী মন্দির এবং সৌরাষ্ট্রের জামনগর জেলার 'গোপ' মন্দির (সবই পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকীয়) এবং কর্ণাটকের বাদামির কাছে 'মহাকুটেশ্বর' মন্দির (ষষ্ঠ শতক)।

পাথর-ব্যবহারে জাতিভেদ প্রথা

'ময়মত' অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং পাষণ্ডী (বেদবিরোধী, যেমন বৌদ্ধ)-দের মন্দির-নির্মাণের উপাদানরূপে পাথর ব্যবহারের অধিকার আছে, কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্রদের এই অধিকার নেই। অন্যদিকে 'বিষ্ণুধর্মোত্তর'-এর বিধানে বর্ণক্রম অনুসারে মন্দির নির্মাণে ব্যবহৃত পাথরের রং হবে : ব্রাহ্মণ—সাদা, ক্ষত্রিয়—লাল, বৈশ্য—হলুদ এবং শূদ্র—কালো।

পাহাড়-কাটা মন্দির (Rock-cut Temples)

মন্দির-নির্মাণ-সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান অনেক বেশি কঠোর হওয়ায় পাহাড়-কাটা মন্দিরের ক্ষেত্রে হিন্দুদের অভিনিবেশ হয়েছিল বৌদ্ধ তো বটেই, জৈনদেরও পরে। (অবিভক্ত) ভারতের ১২০০টি গুহা মন্দিরের মধ্যে ৯০০টি বৌদ্ধ, ২০০টি জৈন ও মাত্র ১০০টি হিন্দু। কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্রে' বলেছেন যে নিভৃত সাধনার জন্য হিন্দু সাধক-সন্ন্যাসীরাও পার্বত্য গুহা-কন্দর পছন্দ করতেন, কিন্তু প্রথম হিন্দু গুহা মন্দিরটি খোদিত হয় ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে, মধ্যপ্রদেশের ভিলসার (বিদিশার লাগোয়া) উদয়গিরিতে। লক্ষনীয়ভাবে, বিখ্যাত হিন্দুগুহামন্দির বা পাহাড়-

কাটা মন্দিরগুলিকেও বাইরের পাথর কেটে প্রথাগত মন্দিরের আকার দেওয়া হয়েছে—যেমন, মহাবলীপুরমের মন্দির (সপ্তম শতক) বা ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দির (অষ্টম শতক)। এক্ষেত্রে স্মরণে রাখা দরকার যে, পাহাড় কেটে 'ফর্ম' দেওয়া যায় কিন্তু পাহাড়ে 'ফর্ম' জন্মায় না। সমতল ছাদের মন্দির বা গর্ভগৃহের ধারণাও পাহাড় থেকে আসেনি যদিও আপাতদৃষ্টিতে অমন মনে হতে পারে।

উপাদান (গ) ঃ কাঠ

অথর্ববেদে বলা হয়েছে যে, শাখা যেমন বৃক্ষের অঙ্গে লেগে থাকে, তেমনই সর্বদেবতাগণ জ্যেষ্ঠ ব্রহ্ম বলে কথিত স্কম্ভের শরীর থেকে উৎপন্ন হয়ে তাঁর শরীরেই লগ্ন থাকেন ('স্কম্ভং তং ব্রুহি কতমঃ স্বিদেবসঃ'—'অথর্ববেদ সংহিতা', ১০। ৪। ১। ৪)। ঋগ্বেদের একটি সূত্র ধরে 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে' বৃক্ষকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। 'গীতা'-র পঞ্চদশ অধ্যায়ে উপরে (অর্থাৎ ব্রহ্মে) শিকড় এবং নিচে শাখাপ্রশাখা (জগৎ ও সংসার)—এমন বৃক্ষের রূপক আছে। সর্বইচ্ছাপূরণকারী কল্পবৃক্ষের কথা আছে অনেক জায়গায়। কাঠের দার্শনিক ও প্রতীকী মূল্য তাই অনেক। এ[illegible], গাছের কাণ্ড যেন ব্রহ্মাণ্ডকেই ধারণ করে, অন্যদিকে বাঁশ প্রভৃতি সহজেই বেঁকে এবং ভারী কাঠকেও কৃত্রিমভাবে বেঁকানো যায়—এভাবেই তৈরী হয় প্রতীকী খিলান ও তোরণ যার তলা দিয়ে যাওয়া হলো অসত্য হতে সত্যে, অন্ধকার হতে আলোয় যাওযা।

কাঠ ব্যবহারের ক্রিয়াসংস্কার

বৈদিক ক্রিয়াসংস্কারের দিক হতে খাদ (Quarry) থেকে পাথর তোলাকে গাছ কেটে কাঠ সংগ্রহের মতই মনে করা হতো। পাহাড় কেটে তৈরী করা গুহামন্দিরগুলিকে গাছের কোটরের সঙ্গে এক করে দেখা হতো। গাছ ও পাথর কাটার আগে যে মন্ত্রপাঠ করা হতো তা-ও এই কারণে ছিল এক বা প্রায় এক।

কাঠ-নির্মিত প্রাচীন মন্দির

হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলার ভারমোরে অষ্টম শতকের প্রথম দিকে নির্মিত কাঠের মন্দিরটি ভারতে সংরক্ষিত কাঠের মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বপেক্ষা প্রাচীন। কেরলের মালাবার উপকূলে চতুর্দশ শতকে নির্মিত কাঠের মন্দির রক্ষিত আছে। সহজবোধ্য কারণে অন্য প্রায় সব কাঠের মন্দিরই লোপ পেয়েছে। প্রমাণ আছে যে, ইট এবং পাথরের মন্দিরেও দরজার পাল্লা ছাড়াও কারুকার্যমণ্ডিত স্তম্ভ, অন্তবাচ্ছদন (সীলিং) প্রভৃতি কাজে কাঠ ব্যবহৃত হতো; স্তূপ, মন্দির প্রভৃতির সামনে কাঠের স্তম্ভশোভিত মণ্ডপের প্রমাণ আছে (যেমন খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে রাজস্থানের জয়পুর জেলার বৈরাটের বৌদ্ধ মন্দিরে); এছাড়া ইট বা পাথরের ভিতের উপরেও যে কাঠের উপরিকাঠামো নির্মিত হতো এমন প্রমাণও যথেষ্ট। বারহুতের বিখ্যাত পাথর-খোদাই প্যানেলে (খ্রিষ্টপূর্ব ১০০) কাঠের মন্দিরের অনুকৃতি আছে।

উপাদান (ঘ) ঃ পলস্তারা (Plaster)
বজ্রলেপ/সুধাশিলা

ইট বা পাথরকে 'সুযুক্ত' করার জন্য ব্যবহৃত হতো পলস্তারা—'বজ্রলেপ' বা 'সুধাশিলা'।

'বজ্রলেপ' শব্দটিই বোঝাচ্ছে যে, এই 'লেপ' বা পটিটির উদ্দেশ্য হলো স্থাপত্যটিকে 'বজ্রদৃঢ়' করে স্থায়িত্ব দান করা। 'লেপ'-টি ভেষজ ও প্রাণিজ দুরকমই হতে পারতো। ভেষজ হলে, ব্যবহৃত হতো গঁদ, ধূপ, ধুনা, শিরিষ প্রভৃতি। প্রাণিজ হলে, পশুর চামড়া, সিং ইত্যাদি। এছাড়াও ব্যবহৃত হতো শাঁখের গুড়ো ও এক ধরণের সাদা মাটি (Kaolin)। বাস্তুশাস্ত্রগুলিতে 'লেপ' তৈরির বিধানের অভাব নেই। সব ক্ষেত্রেই মিশ্রণটি তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে ব্যবহারের আগে দুই থেকে চার মাস ফেলে রাখার নির্দেশ ছিল। মিশ্রণটি হতো দুধের মতো সাদা, অত্যুজ্জ্বল, অনেকটা হাতির দাঁতের রঙের—'সুধাশিলা' শব্দটির তাৎপর্যও হলো এই। স্মর্তব্য যে 'সুধা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো অমৃত, জ্যোৎস্না এবং চুন—'লেপ'-টি শিলা বা পাথরকে চুনের মতো সাদা ও জ্যোৎস্নাময় করে তুলত বলেই হয়তো এর নাম ছিল 'সুধাশিলা'। এই সাদা, মোলায়েম পলস্তারা দিয়ে ইট বা পাথরের (বা অনেক সময় একই স্থাপত্যে—নিচে পাথর, উপরে ইট, যেমন দেখা যায় সুদূর দক্ষিণে ও আহ্‌মেদনগরের মতো নিকট দক্ষিণে) স্থাপত্যের উপরে প্রলেপ দেওয়া হতো। অলংকরণের কাজেও পলস্তারা ব্যবহৃত হতো (যেমন আহ্‌মেদনগরের মন্দিরটিতে ভাস্কর্যগুলি পলস্তারার ও ইলোরার বিখ্যাত কৈলাসনাথ মন্দিরের মূর্তিগুলি পাথরের কিন্তু তাদের গয়নাগাটি পলস্তারার)।

আচ্ছাদনরূপে টেরাকোটা

মন্দিরগাত্র আবৃত বা আচ্ছাদিত করার কাজে পলস্তারার মতোই ব্যবহৃত হতো টেরাকোটা ফলক। বলা বাহুল্য, প্রায় সব ক্ষেত্রে ইটের মন্দিরে টেরাকোটা-সজ্জা স্বাভাবিক ছিল। এর নিদর্শন বহু, যেমন গুপ্তযুগে নির্মিত দেওগড় এবং পাহাড়পুরে স্তূপের ইট খোদাই শিল্প ও ১৯ শতক পর্যন্ত বাংলার মন্দির অলংকরণ শিল্প।

এক উপাদানের গুণ অন্য উপাদানে পরিণয়ন (Transubstantiation)

ইট, পাথর, পলস্তারা বা তার উপরে রঙীন চিত্রণ—সবই উপলব্ধি-প্রকাশক উপাদান। এই ব্যাপারটিই ব্যবহৃত একটি বস্তুর প্রাকৃতিক বা নিজস্ব গুণকে অতিক্রম করে যায় এবং তাকে করে তোলে একটি চিত্রকল্প (Image) ও ধ্যানের প্রতিমা (vision)। 'মাটি চিরস্থায়ী কিন্তু মাটিতে তৈরী বস্তুগুলি নয়' ('ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ')। কিন্তু মাটি, ইট, কাঠ, এমনকি কিয়ৎ পরিমাণে পাথরের বড় বড় চাঙড়ও মন্দিরের 'ফর্ম' বা অনুপাত প্রাপ্ত হলে নিজেদের মূল প্রাকৃতিক অবস্থাকে অতিক্রম করতে পাবে। এইভাবে একটি উপাদানের গুণের অন্য উপাদানেও পরিণয়ন ঘটতে পারে বা ঘটে থাকে—উদাহরণত; বাঁশের 'কোর' (curve) বা বাঁক কাঠ, ইট বা পাথরের নির্মাণে নকল করা হলো—উপাদান বদলে গেল কিন্তু আগের উপাদানের গুণটি পরের উপাদানে আরোপিত হওয়ায় 'ফর্ম' ও 'মানে' একই থাকল। এইভাবে বাঁশের গুণ অন্য উপাদানে নীত হলো এবং এইভবেই কাঠ, ইট বা পাথরের স্থাপত্যে বাঁশের নমনীয়তা নামক গুণটিকে স্থায়িত্ব দান করা হলো। শিল্প এটা করে। শিল্পে এই স্থায়িত্ব হলো 'ফর্মে'র একটি গুণ এবং এই গুণটি আসে স্মৃতি থেকে।

স্থাপত্যের ক্রিয়াসংস্কার : 'পৃথিবীর গর্ভাধান'

'পুরুষ' রূপে মন্দির নির্মিত হওয়ার আগে 'গর্ভাধান' নামে একটি বৈদিক ক্রিয়াসংস্কার পালিত হতো। এতে মন্দিরের 'বীজ'-সহ একটি পাত্র গর্ভগৃহের দরজার ডানদিকে ইটের (বা পাথরের) প্রথম স্তরের উপরে বসানো হতো। এই পাত্রটি হলো 'গর্ভপাত্র' যেটি সাধারণত তামার হতো, তবে সোনা বা রূপারও হতে পারতো—স্মর্তব্য যে, সূর্যের স্বর্ণবলয়ের প্রতীকরূপে সোনার মর্যাদাই ছিল সবচেয়ে বেশি, তবে তামা মনে হয় ছিল সোনার বিকল্প। গর্ভাধানের ক্রিয়াসংস্কারের উল্লেখ ঋগ্বেদেই আছে। একজন মহিলার মতোই ভূমিতে 'বীজ' প্রোথিত করে 'পৃথিবীর গর্ভাধান' ঘটানো হতো এবং গর্ভের মতোই পৃথিবী স্ফীত হতো অর্থাৎ মন্দিরটি আকাশপানে ফুলে উঠতে থাকতো। ভিৎ কাটা হলে তার মেঝেতে অনন্ত নাগ অঙ্কিত হতো, তার ফণার উপবে রাখা হতো 'গর্ভপাত্র'—এর চারকোণা ঢাকনার উপরে অঙ্কিত হতো 'পৃথিবীমণ্ডল', সমস্ত জীবিত প্রাণীই প্রতীকি অর্থে পৃথিবীমণ্ডলের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এভাবে ঘটত 'পৃথিবীর গর্ভাধান' তথা 'অঙ্কুরার্পণ।'

•

স্থাপত্যরীতির উদ্ভব

মন্দির-স্থাপত্যবীতির উদ্ভবের সূত্র তিনটি : (১) 'চিতি' বা 'বেদী'; (২) নব্যপ্রস্তর যুগের বিশেষ ধরনের ও মুখ্যত সমাধিগৃহ (Dolmen) এবং (৩) পটমণ্ডপ বা অস্থায়ী আবাস (Tabernacle)। এবার এই তিন দিকে একে একে দৃষ্টি দেওয়া যায় :

প্রথমত, গুরুভার 'পীঠ'-এর উপরে থাকা গর্ভগৃহের 'ভিত্তি' এবং 'চিতি' বা 'বেদী' বা 'বেদিকা'। 'চিতি' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো : অগ্নির আধাররূপে ইটের নির্মাণ এবং এটি একটি সমচতুষ্কোণ আয়তক্ষেত্র। স্থাপত্যে বেদী একটি গোটা নির্মাণের নিম্নভাগও হতে পাবে আবার উল্লম্ব (vertical)-ভাবে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা দেয়ালের যে কোনো এককের 'ভূমি' বা তলদেশও হতে পারে—যা উপরে আছে 'বেদী'-র অবস্থান তার সাপেক্ষে। উত্তর ভারতীয় রীতির মন্দিরগুলিতে নিচেও যেমন থাকে 'বেদী', উপরেও তেমনই থাকে 'বেদী' যার উপরে থাকে 'আমলক' এবং 'কলস।' 'বেদী' বৈদিক যজ্ঞবেদী বা 'চিতি'-র স্মৃতি বহন করে। মন্দির-শিখরগুলি যজ্ঞাগ্নিশিখার স্মৃতি এবং প্রতীক। স্মৃতি এখানে প্রতীকটি দান করেছে, ফর্মের কারিগরী উৎসটি নয়। 'প্রাসাদ' বা মন্দির হল 'চিতি' আর তাই এ হলো 'চৈত্য।'

দ্বিতীয়ত, 'Dolmen' হলো নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষদের একটি নির্মাণ যা আসলে হল তিনটি বড় মাপের পাথরের চাঙড় খাড়াখাড়ি দাঁড় করিয়ে তার উপরে অনুভূমিকভাবে আর একটি বৃহৎ ও আস্ত পাথরের চাঙড় চাপিয়ে দেওয়া—ফলে তিনদিক নিরেট পাথরের দেয়ালে রুদ্ধ হলো, একদিক দরজার মতো খোলা রইল। মুখ্যত সমাধির জন্য হলেও মন্দির প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও 'Dolmen' নির্মিত হতো। মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী সমাজে ঐতিহাসিক কালের পূর্ব হতেই 'Dolmen' নির্মিত হয়ে আসছে। গোণ্ড, খাসি, মুণ্ডা, ওরাঁও, ভীল, কুরম্ব, মালয়রান প্রভৃতি উপজাতীয়গণ এখনও সমাধি, পূজা, ব্রত প্রভৃতি কারণে

'Dolmen' বানান। আরেকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দেখা যায় বাদামি থেকে মহাকুটেশ্বরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে : মেয়েরা ব্রত, মানসিক প্রভৃতি কারণে পাথরের ছোট ছোট ঘর তৈরী করেন এবং ওগুলি ভেঙে পড়লে ঐ পাথর আবার একইভাবে ব্যবহৃত হয়। পুরাতন 'Dolmen'-এর শিব-মন্দির-রূপে ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত দক্ষিণ ভারতে যথেষ্ট (যেমন কুম্বদুরু, কল্যানদুর্গ, অনন্তপুর প্রভৃতি)। এই সুপ্রাচীন 'Dolmen'-গুলিকে মূল নিদর্শন (Prototype) করেই আসে সমতল ছাদবিশিষ্ট মন্দিরের ধারা যা সাধারণ বিশ্বাসের বিপরীতে মূল ধারার মন্দিরের পাশাপাশিই চলে এসেছে (স্মরণীয় গুপ্ত ও চোল যুগের সমতল ছাদের মন্দিরগুলি—তবে সাঁচি, এরাণ বা টিগাওযার প্রাগুক্ত দৃষ্টান্তগুলি হলো আদিম ধারার শিল্পের দ্বারা উন্নত হওয়ার দৃষ্টান্ত)। উত্তর ভারতীয় শিখর মন্দিরের গর্ভগৃহ বা দক্ষিণ ভারতীয় 'বিমানে'র অভ্যন্তরে (কোনো কোনো ক্ষেত্রে একের উপরে আর এক) চতুষ্কোণ 'চত্বর' সমতল ছাদবিশিষ্ট ঘর-রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। 'অগ্নিপুরাণে' বলা হয়েছে 'চত্বরে শিব বর্তমান থাকেন'।

তৃতীয়ত, পটমণ্ডপ (Tabernacle)। বাঁশ, তালপাতা প্রভৃতি দিয়ে দেবস্থান নির্মাণের কোনো প্রাচীন বিবরণ নেই—তবে বৈদিক যুগে চারকোণে বাঁশ পুঁতে ও সামনের দিক ছাড়া অন্য তিন দিক বড় বড় তালপাতা প্রভৃতি দিয়ে ছেয়ে দীক্ষাদান ও পূজার জন্য ঘর বাঁধা হতো—এই উঁচু ও উল্লম্ব বা খাড়াভাবে দাঁড় করানো বাঁশের মাথাগুলি এক জায়গায় করে বাঁধা হতো, ফলে তা দেখতে হতো ঠিক শিখর মন্দিরের মতো। এইভাবে চারকোণে পোঁতা বাঁশের মাথাগুলি ভিতরের দিকে বেঁকিয়ে একত্র বাঁধার ফলে সামনের দিকে পুরাতন ধারার শিখর মন্দিরে যেমনটি দেখা যায় তেমন তীক্ষ্ণশীর্ষ ত্রিভুজের মত দ্বার সৃষ্ট হতো এবং অন্য তিন দিক পাতা দিয়ে ছাওয়া থাকায় নিম্নাংশটি দেখতে হতো চতুরস্র গর্ভগৃহের মতো, একই সঙ্গে আবার শীর্ষ দেশটি দেখতে হতো বক্ররেখ (Curvilinear) শিখরের মত। সর্বোপরি একত্র বাঁধা বাঁশের ডগাশীর্ষগুলি আকাশের দিকে চোখা ও একমুখী হয়ে বিরাজ করতো। এই একমুখীনতা প্রতিষ্ঠাতার ('যজমান'/কারকের) একাগ্রতার প্রতীক (এক সঙ্গে বাঁধা বাঁশ চারটির ডগাগুলি যেমন পৃথক হয়েও এক-অগ্র অবস্থায় পরিণত)। এই কারণেই 'হস্তিপৃষ্ঠ', 'চৈত্য' প্রভৃতি সমস্ত ফর্মকে পিছনে ফেলে শিখর-রীতিই মন্দির কলার সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ ফর্ম হয়ে উঠেছে।

পর্বতের রূপকল্প

'বৃহৎসংহিতা,' 'মৎসপুরাণ' প্রভৃতি প্রাচীনতম বাস্তু শাস্ত্রগুলিতে যে ২০ প্রকার মন্দিরের কথা আছে তার প্রথম তিনটি হলো পর্বতের নামে—'মেরু', 'মন্দর' এবং 'কৈলাস'। 'মেরু' হলো পৌরাণিক পর্বত যার গাত্রে দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গের অধিষ্ঠান, 'মন্দর' পর্বতকে দেবতা ও অসুরগণ সমুদ্রমন্থনকালে মন্থনদণ্ডরূপে ব্যবহার করেন এবং কৈলাস পর্বত হলো মহাপবিত্র শিবক্ষেত্র। অন্যদিকে, ৪৩৭-৩৮ খ্রিষ্টাব্দের মান্দাসোর শিলালিপিতে সংশ্লিষ্ট সূর্য মন্দিরটিকে পর্বতোপম বলা হয়েছে; বিশ্ববর্মণের (ঝালওয়ার, মালব) গঙ্গাধর প্রস্তরলেখতে সংশ্লিষ্ট বিষ্ণুমন্দিরটিকে কৈলাস বলা হয়েছে; বিজয়সেনের দেওপাড়া লেখতে সংশ্লিষ্ট প্রদ্যুম্নেশ্বরের

মন্দিরকে পর্বত আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে যে, মধ্যদিনের সূর্য তার উপরে বিশ্রাম করেন। সুউচ্চ মন্দিরকে পর্বত জ্ঞান করার এমন প্রচীন লেখ্য-প্রমাণ বহু।

পার্বত্য গুহার স্মৃতি

গর্ভগৃহ মন্দির-রূপ পর্বতের গুহা আর তাই তা একাধারে 'রহস্য' ও 'চিদম্বরম্'। 'গুহা' শব্দটির মধ্যেই 'গুপ্ত' এবং 'গুহ্য' শব্দদুটির দ্যোতনা রয়েছে। গুহারূপী গর্ভগৃহ থেকে মন্দির পর্বতের মতোই ঊর্ধ্বমুখী হয়। প্রকৃতপক্ষে, মধ্যপ্রদেশের পান্না জেলার নাচনার অষ্টম-নবম শতকীয় পার্বতী মন্দিরের দেয়ালে পর্বতগাত্রের 'রিলিফ'-ভাস্কর্য আছে। সাধনার জন্য নিভৃত পার্বত্য গুহা সাধু-সন্ন্যাসীরা পছন্দ করতেন—মন্দিরের অন্ধকার গর্ভগৃহকে পার্বত্য গুহা ভাবা হয়তো তারই স্মৃতির কারণে।

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ গুণের প্রকাশ

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে সমস্ত কিছুই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণের প্রকাশ। গর্ভগৃহ তমঃ গুণ—যখন আলোক ছিল না তখন ছিল শুধুই অন্ধকার। অন্ধকারের গর্ভ হতেই আলোকের সৃষ্টি। গর্ভগৃহ আলোকের উৎস তাই এর গুণ তমঃ। মন্দির-শিখর সত্ত্ব ও তার পরিধি রজঃ গুণ প্রকাশ করে।

'বেণুরন্ধ্রবৎ'

উত্তর ভারতীয় শিখর-মন্দিরের শিখরগুলির ভিতরের দিকটি ফাঁপা—'বেণু' বা বাঁশের ভিতরের অংশ যেমন ফাঁপা বা রন্ধ্রপূর্ণ হয়। আবার ফাঁপা বাঁশের মাঝে মাঝে 'বন্ধন' বা গাঁট থাকে তেমনভাবেই তুঙ্গ শিখরের চারটি দেয়ালের মধ্যে ভিতরে ভিতরে থাকতে পারে বলবর্ধক বন্ধন। একারণেই বিভিন্ন বাস্তুশাস্ত্রে শিখরকে বলা হয়েছে 'বেণুরন্ধ্রবৎ'!

'বিন্দু'

উত্তর ভারতীয় রীতিতে শিখরের আমলকের উপরে থাকে চূড়ান্ত পত্রপুষ্প (Finial)—'স্তূপিকা' যার সর্বপার্শ্বে ও উপরে অবস্থান করে 'অন্তরিক্ষ'। এইভাবে, শিখর-শীর্ষের সর্বোচ্চ স্থানটি হলো 'বিন্দু'—'প্রকাশ' এবং 'অপ্রকাশ'-এর সন্ধিস্থল যা 'শক্তি'-র মতোই একই সাথে 'পরা' এবং 'অপরা'। মন্দির 'শিব ও শক্তির একাত্মক প্রকাশ' বলেই এমন হয়। দক্ষিণ ভারতীয় 'হর্ম্য'-ও একই অর্থ বহন করে।

মন্দির 'গৃহ', 'যশস্তম্ভ'

মন্দির-স্থাপত্যের আরও গভীরে প্রবেশের আগে বুঝে নেওয়া দরকার যে, মন্দির কোনো মতেই মানুষের বাসযোগ্য 'গৃহ' বা 'ভবন' ('Building') নয়—'ভগবানের যশস্তম্ভ' (Monument)। প্রকৃতপক্ষেই, বাইরে থেকে দেখলে শিখর-মন্দিরকে একটি অতিগুরুভার (massive) যশস্তম্ভের ('Monument'-এর) মতো দেখায় এবং কোনো 'গৃহ' বা 'ভবনে'র ('Building'-এর) মতো দেখায় না। ক্ষুদ্র ও অন্ধকার গর্ভগৃহের নিরেট ও অতিগুরু দেয়ালও একই ইঙ্গিত দেয়। এর কারণ 'প্রাসাদ' বা মন্দির হলো 'চিতি'—বৈদিক যজ্ঞবেদীর স্মৃতি আছে এর মূলে।

অধিষ্ঠানের উপরস্থ নির্মাণ (Superstructure)

'শিখরস্য তু ভেদেন সর্বেষাং ভেদমুহিশেৎ'

'শিখরের ভেদ হতে সবের (সব মন্দির স্থাপত্যের) ভেদ দেখানো যায়'

—'ঈশানশিবগুরুদেবপদ্ধতি।'

ভারতবর্ষে মন্দির-স্থাপত্যের সর্বাধিক স্বীকৃত ধারা দুটি : (১) উত্তর ভারতীয় রীতি, অর্থাৎ 'কণ্ঠ' ('গলা' / 'গ্রীবা')-এর উপরে 'আমলক' এবং 'স্তূপিকা' সহ ভিতরের দিকে বাঁক নেওয়া শিখর, এবং (২) দক্ষিণ ভারতীয় রীতি, অর্থাৎ 'গ্রীবা' ('কণ্ঠ'/'গলা')-এর উপরে 'ক্ষুদ্র অল্প বিমান' সহ পিরামিডাকৃতি 'হর্ম্য'।

আদি 'Dolmen' দিয়েছে পাথরের দেয়াল এবং সমতল ছাদ; এর পাথরের দেয়াল উর্ধ্বমুখী হয়েছে। মন্দিরের পরিধি 'মণ্ডপ', 'পার্শ্ব', বা 'আবরণ' দেবতাদের মন্দির, প্রাকার প্রভৃতি নিয়ে প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু উপরে লক্ষ্য মাত্র একটি— নাম ও আকারহীন পরমতত্ত্ব, আর তাই মন্দির-শিখর খাড়া, 'উল্লম্ব' এবং একাগ্র। ঠিক এই কারণেই বক্ররেখ শিখর এবং পিবামিড হলো মন্দির-স্থাপত্যের দুটি অনিবার্য রূপ।

'প্রাসাদ'-বিষয়ে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধারণার মধ্যে পার্থক্য

শিখর-মন্দিরের সাক্ষাৎ মেলে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম ষষ্ঠ শতক থেকে, বাস্তু শাস্ত্রের সাক্ষাৎ মেলে খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে— কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার হলো এর আগে নির্মিত বৌদ্ধ স্তূপগুলির (যেমন সাঁচির বা বারহুতের) বিলিফের কাজে একটিও একাগ্র শিখর বা পিরামিডাকৃতি বিমান-সম্পন্ন মন্দিরের অনুকৃতি নেই। সম্ভবত বৌদ্ধরা 'প্রাসাদ' বলতে মন্দিরের সাথে 'রাজবাড়ি' বা 'Palace'-ও বুঝতেন। আগেই দেখা গেছে যে হিন্দু মন্দির কিছুতেই মানুষের বসবাসের জন্য নয় এবং এও দেখা গেছে যে, হিন্দু মন্দির অর্থে 'প্রাসাদ' হলো প্রকৃষ্ট 'সদ :' অর্থাৎ যজ্ঞমণ্ডপ যা দেবতাদের প্রসন্ন করে ('প্রসিদন্তি')।

হিন্দু মন্দির-স্থাপত্যে বৌদ্ধ প্রভাব

বৌদ্ধ প্রভাব আছে এমন হিন্দু স্থাপত্য হ(?) (১) 'হস্তিপৃষ্ঠ' বা বৌদ্ধ চৈত্যের মত পিপা-সদৃশ ছাদ-সম্পন্ন স্থাপত্য, যেমন অন্ধ্র প্রদেশের চেজার্লের 'কপোতেশ্বর' মন্দির (ষষ্ঠ শতক); (২) 'খাখড়া'—এ হলো একটি আয়তাকার স্থাপত্য যার শীর্ষে থাকে খিলানের মতো আকৃতি-বিশিষ্ট (Vaulted) চূড়া—মহাবলীপুরমের (প্রাচীন মামল্লপুরমের) ভীমরথ (৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ), আলমোড়ার যগেশ্বরের 'নন্দাদেবী মন্দির' (অষ্টম-নবম শতক), ভুবনেশ্বরের বৈতল দেউল বা 'কপালিনী মন্দির' (৮৫০খ্রিঃ) ও গোয়ালিয়রের 'তেলী কা মন্দির' প্রভৃতি হলো 'খাখড়া' রীতির স্থাপত্যের দৃষ্টান্ত। (৩) সাঁচি ও বারহুতের রিলিফের কাজে এক প্রকার গম্বুজ-সম্পন্ন মন্দিরের অনুকৃতি (যেমন 'নাগ' বা 'অগ্নি' মন্দির) আছে—কিন্তু এগুলি প্রকৃতপক্ষে সাধু-সন্ন্যাসীদের 'পর্ণকুট' বা 'পর্ণশালা'। হিন্দু স্থাপত্যে এর প্রভাব সামান্য। (৪) দক্ষিণ ভারতীয় রীতিব 'ক্ষুদ্র অল্প বিমানে'র অনুকৃতি সাঁচি ও বারহুতের রিলিফের কাজে আছে—

কিন্তু এগুলি মন্দিরশীর্ষ, পূর্ণ মন্দির নয় এবং প্রায় সবক্ষেত্রেই এগুলি নিরেট এবং ঠাসা।— যাই হোক বৌদ্ধ প্রভাবিত রীতিগুলি হিন্দু স্থাপত্যে কখনোই জনপ্রিয়তা লাভ করেনি এবং ব্যতিক্রম রূপেই থেকে গেছে।

দক্ষিণ ভারতীয় রীতি

দক্ষিণ ভারতীয় রীতিতে সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো তিনটি : (১) ক্রমশ পিছোতে থাকা 'ভূমি' বা তলগুলি হলো প্রধান ভারবাহী অঙ্গ; (২) শেষ 'ভূমি'-টির উপরে থাকে একটি 'বিমান' বা 'হর্ম্য'-এর পূর্ণাবয়ব অনুকৃতি, বলা যেতে পারে মন্দিরের উপরে আরেকটি ছোট মন্দির বা 'বিমান'—এই কারণেই এর নাম 'ক্ষুদ্র অল্প বিমান'—আর পিরামিডের খাড়া দেয়ালের মাথায় বসানো থাকে বলে একে বলা হয় 'High Temple'। কিন্তু আকৃতি মন্দিরের মতো হলেও এটি কোনো মন্দির নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি সম্পূর্ণ অনারোহনযোগ্য এবং এর ভিতরটি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ঠাসা তথা নিরেট। (৩) প্রত্যেক 'ভূমি-'র আবার থাকে নিজস্ব বেষ্টন (enclosure/rampart) , এতে থাকে মন্দিরের অনুকৃতি— পূর্ণ বিকশিত ও সর্বোচ্চ মন্দিরের ১৬টি 'ভূমি' বা তল থাকে এবং যদি প্রতি তলে ছয়টি পূর্বকথিত অনুকৃতি থাকে তাহলে ১৬ x ৬ = ৯৬টি অংশ হল। তাঞ্জোরের 'বৃহদীশ্বর শিব' মন্দিরটি দেখলে বিষয়টি বোঝা যায়। কর্ণাটকের বিজাপুর জেলার বাদামিব নিকটবর্তী 'মহাকুটেশ্বর' মন্দির (৬০১ খ্রি:)-ক্ষেত্রে সপ্তম-অষ্টম শতকে নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয়—উভয় রীতিরই স্থাপত্য আছে, বোঝা যায় তখন এখানে পরীক্ষা নিরীক্ষার পালা চলছিল। মহাকুটেশ্বরের মতোই নিকটবর্তী আইহোল, বাদামি, ও পট্টডকলে চালুক্য রাজবংশের প্রথম যুগের মন্দিরগুলিতেও এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিদর্শন আছে।

যথাযথ ও যথাশোভন

দক্ষিণ ভারতীয় বাস্তুশাস্ত্র সমূহে যা বলা হয়েছে তারই নির্যাস আছে দ্বাদশ শতকীয় মেরুবর্মণ লিপিতে— সমগ্র মন্দির-সংস্থানকে, অর্থাৎ মূলমন্দির, চারিপাশের 'আবরণ-দেবতাদের মন্দির, প্রাকার, গোপুরম সমস্ত কিছুকে হতে হবে 'ক্ষুদ্র অল্প বিমানে'র সঙ্গে নিখুঁত পরিমিতির প্রকৃষ্ট মান অনুসারে। সবকিছুকেই হতে হবে 'ক্ষুদ্র অল্প বিমানে'র সঙ্গে 'যথার্হম্ তু যথাশোভম্'— যথাযথ তথা যথাশোভন।

পিড়া রীতি

'পিড়া' শব্দটির অর্থ হলো 'পিড়ি' বা কাঠের আসন। ছাদ এখানে পিড়ির মতন কিন্তু ক্রমহ্রস্বায়মানভাবে ধাপে ধাপে উঠে যায়। সারনাথ, নালন্দা, খাজুরাহো প্রভৃতির রিলিফের কাজে এর প্রতিকৃতি আছে। বাংলার পালযুগীয় চিত্রকলাতেও এমন দৃষ্টান্ত আছে। বোঝা যায় যে বাংলা, বিহার এবং মধ্য ভারতে বাঁশ, খড়, তালপাতা প্রভৃতিতে তৈরী এমন পর্ণকুটির অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু উড়িষ্যায় মর্যাদার দিক থেকে এই রীতির খানিকটা

অবমূল্যায়ন ঘটে—মূল 'প্রাসাদ' (বড় দেউল')-এর বদলে এই রীতির প্রয়োগ হয় 'মণ্ডপ', মন্দির-দ্বার ('গোপুরম্') প্রভৃতিতে। ভুবনেশ্বরের 'ভাস্করেশ্বর' মন্দির এই দিক থেকে ব্যতিক্রম কারণ এখানে মূল 'প্রাসাদ'টিই পিড়া রীতির যদিও বক্ররেখ শিখরের আদলও এটিতে আছে। যাই হোক, কাথিয়াওয়াড়, ময়ূরভঞ্জ এবং গঞ্জামে পিড়া রীতির মূল মন্দিরের দৃষ্টান্ত আছে, এমনকি কর্ণাটকের জেলাগুলিতেও এর দৃষ্টান্ত আছে (যেমন, আইহোলের একটি মন্দির)। দাক্ষিণাত্যে এই রীতিকে বলা হয় 'কদম্ব' রীতি।

আবেষ্টন (Enclsoure, Rampart)

বৌদ্ধ স্থাপত্যে চারদিকে 'কোষ্ঠ' বা 'কুট-সমন্বিত প্রাকার, মাঝে মুক্ত অঙ্গন ও মুক্ত অঙ্গনের কেন্দ্রে মূল স্তূপ (যেমন আছে গান্ধারের 'তখত্-ই-বহই-এ)—এমন ধারা দেখা যায়। পল্লব আমলে তৈরী মহাবলীপুরমের 'Shore Temple' এবং বিখ্যাত বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির (৭১০ খ্রি:)-এ চারদিকে প্রাকার 'আবরণ দেবতা' বা পার্শ্ব-দেবতাদের মন্দিরের আবেষ্টন ও প্রাকার ও মাঝে মূল মন্দির—এই রীতির প্রয়োগ ঘটেছে। আসলে দক্ষিণ ভারতে 'বাস্তুপুরুষমণ্ডলের' ছকটি—চারপাশে নিজ নিজ অবস্থানে পার্শ্বদেবতাগণ ও মাঝে 'ব্রহ্মপুর'—অনেক নিবিড়ভাবে অনুসৃত হতো। একারণে শুধু চারপাশেই নয়, ভিতরে মূল 'প্রাসাদ'-কে ঘিরে আরও একটি পৃথক প্রাকারও অনেক সময় থাকত। দক্ষিণ ভারতের বাস্তুশাস্ত্রগুলিতে বলা হয়েছে যে এমন প্রাকারের সংখ্যা সাতটি পর্যন্ত বাড়ানো যায়—বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দিরে' প্রকৃতপক্ষেই সাতটি প্রাকার আছে। বিপরীতে উত্তর ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদৌ কোনো প্রাকারই ব্যবহৃত হয়নি।

'গোপুরম্'—প্রাসাদের থেকেও তার অধিক উচ্চতার ব্যাখ্যা

'গোপুরম্' হলো সমগ্র মন্দির-ক্ষেত্রের প্রবেশদ্বার। ১০০০ খ্রিষ্টাব্দে তাঞ্জোরের 'বৃহদীশ্বর শিব' মন্দিরে শিখরের সর্বোচ্চ উচ্চতা (১৯০ ফুট) অর্জনের পর থেকে 'গোপুরম্'-গুলির উচ্চতা বাড়তে থাকে, ক্রমে 'গোপুরম্'-গুলির উচ্চতা মূল প্রাসাদকে অনেকটাই ছাড়িয়ে যায়—ব্যাপারটি বিস্ময়কর কেননা 'প্রাসাদের' উচ্চতাই সর্বাধিক হওয়া উচিত। এর ব্যাখ্যা সম্ভবত এই যে, এক্ষেত্রে 'গোপুরম্,' আবেষ্টন, 'আবরণ' বা 'পার্শ্ব' দেবতাদের মন্দির, মূল মন্দির সহ সমগ্র মন্দির-ক্ষেত্রটিই 'প্রাসাদ' এবং তুলনায় ছোট মূল মন্দির ও তার তুলনায় আরও অনেকটাই ক্ষুদ্র 'গর্ভগৃহ' হলো 'ব্রহ্মপুর -ছান্দোগ্য উপনিষদে যেমন আছে—'সেখানে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে বিরাজ করে একটি পদ্ম।'

'সান্ধার' এবং 'নিরন্ধার' মন্দির

প্রদক্ষিণ পথটিকে দেয়ালের অঙ্গীভূত করা একটি সর্বভারতীয় রীতি। যে সমস্ত মন্দির বা প্রাসাদে আভ্যন্তরীণ প্রদক্ষিণ পথ থাকে—সেগুলিকে 'সান্ধার' এবং যে গুলিতে প্রদক্ষিণ পথ থাকে না বা বাইরের দিক থেকে থাকে—সেগুলিকে 'নিরন্ধার' বলা হয়।

মুক্ত অঙ্গন-বিশিষ্ট মন্দির (Hypaethral Temples)

'আবরণ দেবতা' বা 'পার্শ্ব দেবতাদের অবস্থান-ক্ষেত্র দু'প্রকারের হতে পারে; (ক) মূল প্রাসাদেরই চারপাশের দেয়ালের বাহির্গাত্রের 'কুট' বা 'প্রকোষ্ঠে', যেমন কর্ণাটকের পট্টডকলের

'বির‍ূপাক্ষ', কুক্কনুরের 'নবলিঙ্গ' ও সোমনাথপুরের 'কেশব'; কাশ্মীরের 'মার্তণ্ড' (সূর্য); মাউন্ট আবুর বিখ্যাত জৈন মন্দির প্রভৃতি মন্দির-স্থাপত্যে। (খ) 'কুট' বা 'প্রকোষ্ঠে'র বদলে চারপাশে পৃথক পৃথক মন্দিরও আবেষ্টনের কাজ করতে পারে—এগুলিই হলো মুক্ত অঙ্গন বিশিষ্ট মন্দির (Hypaethral Temples) এবং পূর্ণ সংস্থান-রূপেও মুক্ত অঙ্গন বিশিষ্ট মন্দির দেখা দেয়। এগুলিরও আছে নানা ধারা :

(১) **চৌষট্টি যোগিনী মন্দির** : চৌষট্টি যোগিনী হলেও এগুলিতে ৮১টি পর্যন্ত মন্দির থাকতে পারে। মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহো, ভেরাঘাট (জব্বলপুর) ও ঝাঁসির কাছে দুদহিতে এবং উড়িষ্যার রানিপুর-ঝড়িয়ালে এর দৃষ্টান্ত আছে। এর মধ্যে খাজুরাহোব সংস্থানটি আয়তাকার, ভেরাঘাট ও রাণিপুর ঝড়িয়ালে বৃত্তাকার। রাণিপুর-ঝড়িয়ালে সংস্থানের কেন্দ্রে 'ব্রহ্মপুর'-রূপে শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন—চারপাশে বৃত্তাকারে আছেন যোগিনীবৃন্দ।

(২) **আটটি মন্দিরের গুচ্ছ** : সিরপুর (মধ্যপ্রদেশ, জেলা রাইপুর) মন্দিরগুচ্ছ (সপ্তম শতক), দক্ষিণ ভারতের নবম শতকীয় মেলমলই নর্ত্তমলই, পুডুকোট্টাই প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত শিব মন্দিরগুলি আটটি মন্দিরের গুচ্ছ-রূপেই পরিকল্পিত হয়েছিল; রাজস্থানের দামনারের পাহাড়-কাটা মন্দিরটিও এই ধারার।

(৩) **পঞ্চায়তন** : এই রীতিতে অধিষ্ঠানের চারকোণে চারটি তুলনায় ছোট মন্দির থাকে এবং মাঝে থাকে বৃহত্তম মূল মন্দির। ওসিয়ার (রাজস্থান, জেলা যোধপুর) তিনটি মন্দির (অষ্টম-নবম শতক), খাজুরাহোর 'লক্ষ্মণ মন্দির' (৯৫০ খ্রিঃ) ও 'বিশ্বনাথ মন্দির' (১০০০ খ্রিঃ), ভুবনেশ্বরের 'ব্রহ্মেশ্বর মন্দির' (১০৬০ খ্রিঃ) ও নাসিকের কাছে সিন্নরের 'গন্ধেশ্বর মন্দির' (ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিক)—প্রভৃতি এর উদাহরণ।

(৪) **১০৮ মন্দির** . পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কালনার ক্ষেত্রটি বৃত্তাকার এবং বর্ধমান শহরের নবাবহাটের ক্ষেত্রটি আয়তাকার।

এসব ছাড়াও পশ্চিমবাংলায় 'জোড়া শিব', 'দ্বাদশ শিব' প্রভৃতি নানা সংখ্যার মন্দিরগুচ্ছ আছে—এগুলি ধর্মীয় স্থাপত্যের একটি প্রাচীন ও নিরবচ্ছিন্ন ধারার প্রতিনিধিত্ব করে।

বক্ররেখ (Curvilinear) শিখর

'শিখর' শব্দটির নানা অর্থ

'শিখর' শব্দটির নানা অর্থ। 'শৈলাগ্র', 'শৃঙ্গ', 'কুট' ইত্যাকার অর্থে মন্দির-শিখরকে পর্বতের চূড়ার সঙ্গে উপমিত করা হয়। শব্দটির আর অর্থ শিখাযুক্ত—'শিখা' হলো মস্তকমধ্যস্থ কেশগুচ্ছ, চূড়া বা জুটিকা, সোজা কথায় টিকি বা চৈতন। এছাড়াও 'শিখর' শব্দটির অর্থ হলো 'শিরস্' ও 'শীর্ষ'—উভয়তই অর্থ হলো 'মস্তক'। মন্দির-শিখরের সঙ্গে পর্বত-শিখরের বৃহৎজাগতিক (Macrocosmic) অনুষঙ্গের মতোই মানুষের মাথার বা শিখার অণুজাগতিক (Microcosmic) অনুষঙ্গটিও গুরুত্বপূর্ণ।

বৈদিক পর্ণশালা দিয়েছে 'ফর্ম', কারিগরী নয়

আদিম 'Dolmen' শিখরের আদি রূপ হতেও পারে, বাঁশ-পাতার বৈদিক 'পর্ণকূট' বা

'পর্ণশালা'-র কারিগরি ইট বা পাথরের নির্মাণে আচল। পর্ণশালা দিয়েছে 'ফর্ম' বা আকারের ধারণাটি—কারিগরি নয়।

নির্মাণ-সমস্যা—ভার কমানো বা নিয়ন্ত্রণ—'বেণুকোশ'

সুউচ্চ ও বক্ররেখ শিখর নির্মাণের ঘোর সমস্যা ছিল শিখরের বিপুল ওজন নিয়ন্ত্রণ করা। গুজরাটের বাস্তুশাস্ত্রগুলিতে যে ২০ প্রকার শিখরের কথা আছে সেগুলি ভিতরে ভিতরে ফাঁপা ও ঠাসা দুইই হতে পারতো, কিন্তু এই দুই পদ্ধতির আলাদা কোনো তাৎপর্য নেই— প্রযুক্তিগত ও কারিগরি কারণেই এমন পার্থক্য হতো। সহজ কথায় ভিৎ বা অধিষ্ঠানের উপর ভার কমাবার প্রয়োজনে শিখরকে ফাঁপা রাখা হতো। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরে গর্ভগৃহের উপরে একটি ফাঁপা কক্ষ আছে নিচের গর্ভগৃহেরই মতন, হয়ত এর উপরেও অমন আরও একটি কক্ষ আছে নিচের গর্ভগৃহেরই মতন, হয়ত এরও উপরে অমন আর একটি কক্ষ আছে। তামিলনাড়ুর 'বৈকুণ্ঠ পেরুমল' মন্দিরেও একের উপরে এক ক্রমে গর্ভগৃহ আছে একই কারণে। বাঁশের ভিতরে লম্বিত ফাঁপা জায়গা থাকে ও শক্তি-বৃদ্ধির জন্য তার মাঝে মাঝে গাঁট থাকে। শিখর তাই 'বেণুকোশ'। বাস্তুশাস্ত্রীগণ যে একে 'বেণুরন্ধ্রবৎ' বলেছেন তা আগেই দেখা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, 'গবাক্ষ' ও 'শুকনাসা' প্রভৃতির আসল কাজও হলো শিখরের ওজন কমানো।

নির্মাণ পদ্ধতি—'কদলিকা-করণ' (Corbelling)

শিখর নির্মিত হতো সাধারণত 'corbelling' পদ্ধতিতে অর্থাৎ দেয়াল থেকে উদ্গত ভারবাহী ঝোড়ার মতো কায়দায় লহরের উপর লহর সাজিয়ে—'তন্ত্রসমুচ্চয়ে' এই পদ্ধতিকে বলা হয়েছে 'কদলিকা-করণ'। কদলি বা কলাগাছ, রম্ভাতরু', যেমন পরতের পর পরত বাকলে গঠিত কাণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তেমন কায়দায় ইট বা পাথর সাজিয়ে শিখরটি নির্মিত হতো বলেই পদ্ধতিটির নাম 'কদলিকা-করণ'। 'কদলিকা-করণের সঙ্গে ব্যবহৃত হতো করিকাঠের ('Trabeat'-এর) মতন 'বীম'—এ আসলে ছিল ইট বা পাথর 'স্তূপীকৃত' বা 'piling' করার মার্জিত কৌশল। 'আর্চ' (Arch) বা খিলান ব্যবহৃত হয়নি।

পটি (Tie-plates) : 'রত্নমুড়', 'গর্ভমুড়' প্রভৃতি

শিখরের উপরের ও নিচের অংশে থাকে একটি করে অনুভূমিক 'পটি' বা 'horizontal tie-plate'। ওড়িশি পরিভাষায় উপরের পটিটিকে 'রত্ন মুড়' এবং নিচের 'পটি'টিকে 'গর্ভমুড়' বলা হয় (স্মর্তব্য, ওড়িশী 'মুড়' হলো বাংলায় 'মুড়া' বা 'মুড়ো'—'মাছের মুড়ো')। 'পটি' বা 'tie-plate' দুটি যথাক্রমে গর্ভগৃহ হতে শিখরকে ও 'স্কন্ধ' থেকে 'রত্ন' বা চূড়াকে বহন করে বলেই ঐ নাম। উড়িষ্যায় ঐ দুটি পটির মাঝে থাকে আরও দুটি 'পটি'— 'বলিমুড়' এবং 'লখিমুড়।' তবে, গর্ভগৃহের 'সীলিং' বা 'গর্ভমুড়ে'র নিচে 'বলিমুড়' ও তারও নিচে 'লখিমুড়' যদিও অনুভূমিকভাবে থাকে, তবুও বাইরে থেকে তাদের দেখা যায় না।

শুকনাসা, তিলক, গবাক্ষ, ঝম্পসিংহ

'শুকনাসা' হলো 'প্রাসাদে'র সামনের দিকে গর্ভগৃহের 'সীলিং'-এর কিছু উপরস্থ 'শুক' বা টিয়াপাখির ঠোঁটের মত উদগত অংশ—'নাসা' বা 'নাসিকা'। এটি ইট বা পাথরের একটি ত্রিকোণাকৃতি গাঁথনি বিশেষ (pediment) কিন্তু তা কোনো মতেই গবাক্ষ নয়। অবশ্য এতে গবাক্ষের মতোই 'জাল' থাকে—'জাল' বলতে বোঝায় কারুশিল্প-মণ্ডিত 'জালিকা', 'net-work'। এর সঙ্গে থাকতে পারে 'তিলক' বা 'কুট' অর্থাৎ দেয়ালগাত্রে মন্দিরের ক্ষুদ্র অনুকৃতি। এর সাথে 'রত্নমুড়ে'র নিচে থাকতে পারে আয়তাকার জানালা—গবাক্ষ—যেখান থেকে 'গণ্ডি' অর্থাৎ শিখরের মধ্যেকার 'বেণুকোশ' বা ভিতরেব ফাঁপা অঞ্চলে বায়ু প্রবেশ করে। উড়িষ্যায় 'শুকনাসা'-র উপরে দেয়াল থেকে উদগত থাকে লম্ফমান সিংহ বা 'ঝম্পসিংহ'।

বক্ররেখ শিখরের ভূগোল

ভারতের মন্দিরগুলির মধ্যে পাঁচ ভাগের চারভাগই বক্ররেখ শিখর-সম্পন্ন স্থাপত্য। সাধারণভাবে কৃষ্ণা নদীকে বক্ররেখ শিখর রীতির দক্ষিণতম সীমা মনে করা হয়—প্রকৃতপক্ষে আরও দক্ষিণে, তুঙ্গভদ্রা নদীতীর পর্যন্ত বক্ররেখ-শিখর মন্দিরের দেখা মেলে। অন্যদিকে, ইলোরার পাহাড়-কাটা মন্দির হলো দক্ষিণ ভারতীয় রীতির উত্তরতম সীমা।

বক্ররেখ শিখরের উদ্ভব কি পিরামিড থেকে?

একথা সত্য যে, ভিতরপানে বাঁক (inward curve)-টুকু ছাড়া দক্ষিণ ভারতীয় পিরামিডের সঙ্গে উত্তর ভারতীয় 'গণ্ডি'-র পার্থক্য খুবই কম। তথাপি, পিরামিড থেকে বক্ররেখ শিখরের উদ্ভব হয়নি কারণ পিরামিডকে উপর থেকে চাপলে বা সঙ্কুচিত করলে বক্ররেখ আকার সৃষ্ট হয় না।

গাছপালার খিলান ভগবানের ঘরকে আচ্ছাদিত করে

দাঁড়িয়ে থাকা কলাগাছের সুদীর্ঘ পাতার বক্রভাবে ঝুলে থাকা, বাঁশ-ঝাড়ের প্রান্তিক বাঁশগুলির খিলানের মতো বেঁকে ঝুলে থাকা প্রভৃতি থেকেই বক্রশিখরের ধারণা এসেছে; বৈদিক পর্ণশালা (যার চারকোণে পোঁতা বাঁশের মাথাগুলি এক জায়গায় করে বাঁধলে শিখর-মন্দিরেব মতো দেখাতো) দিয়েছে একাধারে 'গর্ভগৃহ' ও 'গণ্ডির' রূপ—এইভাবে প্রকৃতিব খিলান, গাছপালার খিলান, ভগবানের ঘরকে পারগত এবং আচ্ছাদিত করে।

শিখর-মন্দিব যা নয়

শিখর-মন্দির কি কি নয় তা স্মরণে রাখা সুবিধাজনক। (১) মণ্ডপ প্রভৃতির শিখর হয় না (একমাত্র 'প্রাসাদে'রই হয়)। (২) শিখর ছাদ নয়। (৩) 'প্রাসাদ' কোনো 'Building' বা 'ভবন' নয়। (৪) ইউরোপীয় স্থাপত্যে এর কোনো নিদর্শন নেই।

'শিখরার্থম্ হি সূত্রানি' (শিখরের জন্যই সূত্রসমূহ)

শিখর পবিত্রতম স্থাপত্য এবং শিখরভেদেই 'প্রাসাদে'র রূপভেদ হয়। এ কারণেই বাস্তুশাস্ত্র-সমূহে শিখরের সূত্র-নিরূপণে গভীব অভিনিবেশ লক্ষিত হয়। বক্ররেখ শিখর নির্মাণের জন্য 'হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র' এবং 'অগ্নিপুরাণ'-এ 'চতুর্গুণ সূত্রের কথা বলা হয়েছে—'শিখরার্থম্ হি

সূত্রানি চত্বারি বিনিপাতয়েৎ' ('অগ্নিপুরাণ'), 'শিখর নির্মাণের জন্যই চার প্রকার সূত্র অভিনিবিষ্ট হয়েছে।' 'অধিষ্ঠান' থেকে 'স্কন্ধ' পর্যন্ত সূত্রগুলি আঁকা হবে এবং 'অগ্নিপুরাণ' অনুসারে 'শুকনাসা'র উপরে শিখরের মধ্যাঞ্চলে থাকবে লম্ফমান সিংহ। পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে শিখরের উচ্চতাকে সংশ্লিষ্ট সূত্র অনুসারে তিন ('ত্রিগুণ'), চার ('চতুর্গুণ'), পাঁচ ('পঞ্চগুণ') ও ছয় ('ষড়্গুণ') ভাগে ভাগ করার কথা বলা হয়েছে। 'সমরাঙ্গনসূত্রধার' ও 'বৃহৎশিল্পশাস্ত্র' 'ষড়গুণ সূত্র'-কে সমর্থন করেছে। একটি সম-চতুরস্র বা আয়ত ক্ষেত্রের উপর 'স্কন্ধ' থেকে 'অধিষ্ঠান' পর্যন্ত একটি শিখরের উচ্চতাকে তিন থেকে ছয় অংশে ভাগ করে জ্যামিতিক প্রবর্দ্ধন ('geometrical progression', 'গুণ সংকলিত') অনুসারে কতগুলি উল্লম্ব বা খাড়াখাড়ি রেখা আঁকা হলো, এরপর অধিষ্ঠানের সঙ্গে সমান্তরালভাবে কতগুলি অনুভূমিক বা আড়াআড়ি রেখা টানা হলো—বক্ররেখ শিখরের রেখা উঠবে উল্লম্ব ও অনুভূমিক রেখাগুলির ভেদ বিন্দুগুলিকে অনুসরণ করে। নিচের নকশা হতে বিষয়টি বোঝা যাবে :
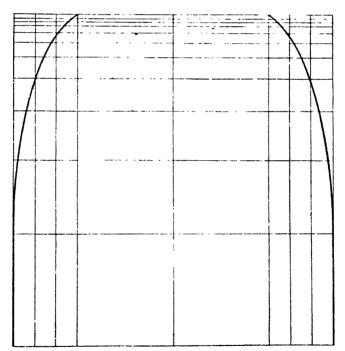
Curve of Sikhara drawn by means of 'triguṇa sūtra', the end of the rectangle being divided by three and the side by geometrical progression of three

বক্ররেখ শিখর ভারতের নিজস্ব স্থাপত্য

'কিউব', 'প্রিজম্' ও 'পিরামিড' শুধু যে ভারতীয় পবিত্র স্থাপত্যেই দেখা যায় এমন নয়, কিন্তু গাছ-পাতা-বাঁশের বৈদিক পটমণ্ডপ হতে 'ফর্ম' গ্রহণ করা অন্তর্মুখী গতিসম্পন্ন বক্ররেখ

শিখর-সম্পন্ন মন্দির ভারতীয় প্রতিভার একটি অসামান্য সৃষ্টি এবং তা অজস্র শৈল্পিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে একেবারে প্রথম থেকেই।

বক্ররেখ শিখরের বৈশিষ্ট্য

এখনও টিকে থাকা শিখরগুলি লক্ষ্য করলে তিনটি বৈশিষ্ট্য নজরে আসে : (১) ক্রুশাকার (cruciform) ভূমি-নকশা। এর কারণ প্রতিদিকের কেন্দ্রীয় বা প্রধান অংশ ('ভদ্র') বেশ বড় রকমে উদ্‌গত থাকে ও দুপাশে থাকে ছোট তথা অগভীরভাবে উদ্‌গত অংশ ('রথ')-গুলি। (২) গর্ভগৃহ চতুরস্র ও স্থির—শিখর গতিময়। (৩) ভূমি-নকশার ধাপ (step)-গুলি হতে 'প্রাসাদে'র পোস্তা (Buttresses, দেয়াল মজবুত করার জন্য গাঁথুনি বা ঠেস)-গুলি খাড়াখাড়ি উঠে যায় 'স্কন্ধ', এমনকি কখনো কখনো আমলক পর্যন্ত (যেমন মধ্যপ্রদেশের উদয়পুরের 'নীলকণ্ঠেশ্বর' বা 'উদয়েশ্বর মন্দিরে' মনে হয় যেন পোস্তাগুলি উড়ে যাচ্ছে—'Flying Buttresses')।

মূলমঞ্জরী ও উড়মঞ্জরী

আগেই দেখা গেছে যে শিখরের একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিশব্দ হলো 'মঞ্জরী'। মূল শিখর হল 'মূল-মঞ্জরী'। কখনো কখনো শিখরের গায়ে নিচ থেকে উপরে পরপর বসানো থাকতে পারে অঙ্গশিখরগুলি—নিচ থেকে দেখলে মনে হয় যেন অঙ্গশিখরগুলি উড়ে যাচ্ছে, তাই তাৎপর্যপূর্ণভাবে অঙ্গশিখরগুলির একটি নাম 'উড়মঞ্জরী'।

শিখরের প্রকার : 'শেখরী', 'ভূমিজ', 'লতিনা' ও 'সংমিশ্র'

গর্ভগৃহে 'পরমতত্ত্ব' 'অচলাসন' কিন্তু বহির্জগত 'চলাসন' তাই গতিময়—কিন্তু তাবৎ চলার বা গতির লক্ষ্য এক, পরমতত্ত্বের সাথে মিলন। কখনো কখনো 'মূলমঞ্জরী'-র গায়ে 'উড়মঞ্জরী'-গুলি নিচ থেকে উপরে এমনভাবে বসানো থাকে যে দেখে মনে হয় যেন সেগুলির মধ্যে ঊর্ধ্বে পরমতত্ত্বের কাছে পৌঁছানোর জন্য প্রবল প্রতিযোগিতা চলছে। এই-ই হলো 'শেখরী' রীতির শিখর—এর সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলো খাজুরাহোর 'কন্দরিয় মহাদেব' মন্দির। দ্বিতীয়ত, কখনো কখনো শিখর হতে পারে কিছুটা বর্তুলাকার বা তারা-র মতো (star-shaped) এবং এর অঙ্গশিখরগুলি হতে পারে সম মাপের তথা সমান্তরালভাবে সজ্জিত—এই-ই হলো 'ভূমিজ' শিখর এবং এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলো মধ্যপ্রদেশের উদয়পুরের পূর্বোক্ত 'নীলকণ্ঠেশ্বর' ('উদয়েশ্বর') মন্দির। তৃতীয়ত, কখনো কখনো সমগ্র শিখরটি পরপর ভূমি-আমলায় ঊর্ধ্বারোহণকে ব্যাহত না করেই বিভিন্ন তলে (storey) বিভক্ত হতে পারে, চার দেয়ালেরই দুই কোণের উদ্‌গত অংশে (উড়িষ্যায় 'কণিকা পগ') খাড়াখাড়িভাবে পরপর অঙ্গ শিখর থাকতে পারে ও চার দেয়ালেই জালিকা-সজ্জিত গবাক্ষ থাকতে পারে—এই-ই হলো 'লতিনা' শিখর এবং এর সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলো ভুবনেশ্বরের 'লিঙ্গরাজ' মন্দির। প্রকৃতপক্ষে লতিনা রীতির সর্বোত্তম বিকাশই ঘটেছিল উড়িষ্যায়। 'শেখরী', 'ভূমিজ' ও 'লতিনা'—এই তিনের দুটি বা তিনটিরই মিশ্রণে একাধিক 'সংমিশ্র' (composite) ধারাও আছে।

'মহা ভাস্কর্য'—'প্রাসাদ ক্ষিতিভূষণ'

উড়িষ্যার মন্দিরে ভাস্কর্যের গুরুত্ব মহাবিপুল, একারণে ওড়িশী বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে উড়িষ্যার

মন্দির হলো 'মহাভাস্কর্য।' উড়িষ্যায় মূল 'প্রাসাদ'টি হলো 'বড় দেউল' ও জগমোহনটি 'পিড়া দেউল।' 'বড় দেউল' ও 'জগমোহনে'র মাঝে থাকতে পারে এটি গভীর ভেদসূচক অংশ ('Incision') বা তার বদলে থাকতে পারে আরও একটি স্থাপত্য, 'অন্তরাল'। 'বড় দেউল' ও 'জগমোহন' উভয়েরই সামনে স্বস্থানে থাকে লম্ফমান সিংহ ('ঝম্পসিংহ') যা উভয় স্থাপত্যের মধ্যে ভাস্কর্যগত সংযোগ সৃষ্টি করে। রাজস্থানের 'রেখ' মন্দিরের সঙ্গে উড়িষ্যার 'বড় দেউলে'র যথেষ্ট মিল থাকলেও উড়িষ্যার 'পিড়া দেউল'রূপী জগমোহনের জায়গায় সেখানে আছে স্তম্ভ নির্ভর খোলা মণ্ডপ—এতে বায়ু চলাচলের সুবিধা হলেও উড়িষ্যার ঘেরা 'পিড়া দেউলে'র মহত্ত্ব ও শোভা নেই। একারণে বাস্তুশাস্ত্রে উড়িষ্যার মন্দিরকে বলা হয়েছে 'প্রাসাদ ক্ষিতিভূষণ'—এমন 'প্রাসাদ' যা পৃথিবীর অলংকার।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের নীতি একই

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের মধ্যে খুঁটিনাটি তফাৎ যাই-ই থাক, দক্ষিণভারতীয় 'জাতি বিমান' এবং উত্তর ভারতীয় 'প্রাসাদ'-এর নীতি একই। চতুরস্র গর্ভগৃহের উপব ঊর্ধ্বমুখী পিরামিড বা শিখর—ব্রহ্মাণ্ডের চারদিক হলো গর্ভগৃহের চার দেয়াল এবং দক্ষিণ ভারতীয় 'পিরামিড' এবং উত্তর-ভারতীয় 'বক্ররেখ শিখর' উভয়ই ধাবিত হয় ঐক্য-বিন্দুর দিকে।

'নাগর', 'দ্রাবিড়', 'বেসর' ইত্যাদি

প্রাচীনতর উৎসগুলিতে—অর্থাৎ 'বৃহৎসংহিতা' থেকে 'অগ্নিপুরাণে'র প্রথম দিকের অধ্যায়গুলিতে—কুড়ি প্রকার মন্দিরের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এই শ্রেণিকরণ নাগর, দ্রাবিড় ও বেসর রীতিতে নয় বা কোনো অঞ্চল-ভিত্তিতেও নয়। তবে, অগ্নিপুরাণের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ঐ কুড়ি প্রকারের মন্দির সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'এগুলি নাগর তথা লাট প্রাসাদ।' লাট হলো গুজরাটের প্রাচীন নাম—কিন্তু 'নাগর' শব্দটি প্রাচীন ভারতের ভূগোলে নেই। খ্রিষ্টীয় দশম শতকের একেবারে শেষে লেখা দুটি গ্রন্থ, 'ঈশানশিবগুরুদেবপদ্ধতি' এবং 'সমরাঙ্গনসূত্রধার'-এ 'নাগর' শব্দটি ঘন ঘন ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রন্থদুটির মধ্যে প্রথমটি দক্ষিণের এবং দ্রাবিড়-মন্দির বিষয়ে, দ্বিতীয়টি মালবে লিখিত ও এতে তৎকালে প্রচলিত সব রকমের মন্দিরের কথা আছে। লক্ষণীয়, গ্রন্থদুটিতে 'নাগর' ও 'দ্রাবিড়' উল্লেখিত হলেও 'বেসর' নেই, ত্রয়ীটি পূর্ণ করেছে 'বারাট' নামে একটি ধারা। অন্যদিকে কর্ণাটকের বেল্লারী জেলার হোলারের 'অমৃতেশ্বর' মন্দিরের মুখমণ্ডপে খোদিত একটি লিপিতে চার প্রকার স্থাপত্যের কথা বলা হয়েছে—'নাগর', 'কালিঙ্গ', 'দ্রাবিড়' এবং 'বেসর'। চালুক্য রাজবংশের পশ্চিম শাখা কর্তৃক নির্মিত মন্দিরটি সম্পর্কে পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের দক্ষিণ মণ্ডলের সহ অধ্যক্ষ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছেন যে এটি 'উত্তর ভারতে মুসলমান বিজয়ের বহু পূর্বে নির্মিত'। যাইহোক, দক্ষিণ ভারতের একটি 'আগম' গ্রন্থ 'কামিকাগম'-এ হিমালয় থেকে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত 'নাগর' (সত্ত্বগুণ), বিন্ধ্যপর্বত থেকে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত 'বেসর' (রজঃগুণ), এবং কৃষ্ণা নদী থেকে সুদূর দক্ষিণ-পর্যন্ত অঞ্চলকে 'দ্রাবিড়' (তমঃগুণ)-রীতির অঞ্চল বলা হয়েছে। তবে 'কামিকাগমে'ই সামান্য পরে নাগর-দ্রাবিড়-বেসর পরম্পরার কথা বলা হয়েছে—এটিই সঠিক কারণ, 'বেসর' হলো 'নাগর' এবং 'দ্রাবিড়' রীতির মিশ্ররূপ।

'নাগর'

'নাগর' শব্দটির গৃহীত অর্থ হলো : 'নগরভব', 'নগরস্থিত', 'পৌর', 'নগরসম্বন্ধী' প্রভৃতি। বাস্তুশাস্ত্রেও আছে : 'নগরের অলংকরণের জন্য পাথর ও পোড়ানো ইটের প্রাসাদ নির্মাণ করা উচিত' ('বৃহৎসহিতা'র টীকায় উৎপল কর্তৃক উদ্ধৃত কাশ্যপের মত)। ব্রহ্মা দেবতাদের দিব্য বা আকাশপথে বিচরণের জন্য 'বিমান' নির্মাণ করেছেন,। মর্ত্যের 'বিমান' হলো 'প্রাসাদ' অর্থাৎ মন্দির। যা নগরের অলংকার তা-ই 'নাগর'। 'শ্রী নগর' অর্থাৎ পাটলিপুত্রের অনুষঙ্গে 'নাগর' নামটি এসেছে এমনও বলা হয়েছে, কিন্তু 'বৃহৎসংহিতা'-র অনেক আগেই পাটলিপুত্র নগরীর প্রভাব ও প্রাধান্যের অবসান হয়। 'বিশ্বকর্মাপ্রকাশ' অনুসারে 'বাস্তুপুরুষ নাগাকার'—এ থেকেই 'বাস্তুনাগ'—একারণে কেউ কেউ ভাবেন 'নাগ' থেকেও 'নাগর' শব্দটির উদ্ভব হতে পারে। 'নাগর' শব্দের কাছাকাছি একটি শব্দ হলো 'পুর'—আকর্ষণীয় তথ্য হলো বালিদ্বীপে এখনও 'পুর' শব্দের একটি অর্থ হলো 'মন্দির'। 'বৃহৎসংহিতা'-র কুড়িটি 'মুখ্য' মন্দিরই খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকে দেখা দিল 'নাগর' রূপে; 'কুড়ি' সংখ্যাটি রইল, কিন্তু নামগুলি বদলে গিয়ে হলো 'নলিন', 'প্রলীন' প্রভৃতি; 'মেরু', 'মন্দর' ও 'কৈলাসে'র অনুষঙ্গও লোপ পেল—তবে এসবই হলো দক্ষিণের পূর্বোক্ত দুটি প্রখ্যাত বাস্তুশাস্ত্রে। এখনও টিকে থাকা মন্দিরের সাক্ষ্যে বোঝা যায় যে, খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত চতুরস্র গর্ভগৃহের উপর খাড়া শিখর-স্থাপনে নানা পবীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছিল। আইহোল, মহাকুটেশ্বর, বাদামি, পট্টডকল ও আরও বেশ কটি দৃষ্টান্ত হতে বিষযটি বেশ বোঝা যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করা যায় : খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে নির্মিত হাছিমল্লগুড়ি মন্দিরে ষষ্ঠ শতকে বক্ররেখ শিখর যোগ করা হয়; ষষ্ঠ শতকে নির্মিত আইহোলের দুর্গ মন্দিরের সমতল ছাদের উপরে একটি বক্ররেখ শিখর যোগ করা হয়; গুপ্তযুগে 'কুরজ বীর' মন্দিরে গর্ভগৃহের উপরে আরও একটি প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করে তার উপরে একটি বক্ররেখ শিখর বসানো হয়েছিল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার এমন ধারা অনুসরণ করে উপরের দৃষ্টান্তগুলির হাজার বছরেরও পরে, খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকে পশ্চিমবাংলার বিষ্ণুপুরে চালা-স্থাপত্যের উপরে একটি সম্পূর্ণ 'রেখ দেউল' 'রত্ন' হিসাবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বারাট

'রূপমণ্ডন' (সূত্রধার মণ্ডন কর্তৃক প্রণীত মূর্তিতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ)-এ কৃষ্ণা থেকে নর্মদা পর্যন্ত অঞ্চল বা বিদর্ভ-কে 'বারাট' বলা হয়েছে। 'কামিকাগম' এ বারাট মন্দিরের লক্ষ্মণ নির্দিষ্ট আছে—কিন্তু এই অঞ্চলে রক্ষিত মন্দিরগুলি সেই লক্ষ্মণের সঙ্গে মেলে না, মেলে চালুক্য স্থাপত্যের সঙ্গে।

বেসর

'বেসর' কোনো স্থাননাম নয়—শব্দটির অর্থ হলো 'অশ্বতর' বা 'খচ্চর'—এ থেকেই বোঝা যায় যে এটি সঙ্কর বা মিশ্র ধারা। 'কামিকাগম' অনুসারে এর 'বিন্যাস' 'দ্রাবিড়' কিন্তু 'ক্রিয়া' 'নাগর।' কর্ণাটকের জেলাগুলিতে ও মহীশুরে পরবর্তী চালুক্য এবং হোয়শল রাজবংশ নির্মিত বেশ কিছু মন্দির এর নিদর্শন। উত্তর ভারতীয় এবং 'দ্রাবিড়' এই দুই মহাশক্তিশালী ধারার মিলনস্থলে এমন ঘটা ছিল স্বাভাবিক।

দ্রাবিড়

দক্ষিণ ভারতের 'দ্রাবিড়' রীতিতে গর্ভগৃহের ঘন-চতুর্ভুজ খাড়া দেয়ালের উপরের সমতল ছাদ বা 'মেরু'-র উপর বসানো হয় একটি ছোট ও গম্বুজাকৃতি মন্দির ('ক্ষুদ্র অল্প বিমান')। 'ঈশানশিবগুরুদেবপদ্ধতি'-তে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, 'ক্ষুদ্র অল্প বিমান' হতেই দ্রাবিড়-রীতির সঙ্গে অন্যান্য রীতির ফারাক বোঝা যায়। বৃহত্তম 'দ্রাবিড়' মন্দির হলো 'জাতি বিমান' ('ছন্দ', 'বিকল্প', 'আভাস'—এইসব নামগুলিও 'জাতি বিমান'-ই বোঝায়)। 'জাতি বিমান'-এর চারপাশের আবেষ্টনে থাকে 'কুট', 'কোষ্ঠ', 'নীড়', 'পঞ্জর' প্রভৃতি নামের দেবায়তন-সমূহ যে গুলিতে থাকেন 'আবরণ দেবতা'-গণ।

কালিঙ্গ

'হোলাল'-লেখতে কথিত 'কালিঙ্গ' হলো 'নাগর'-রীতির মন্দিরের কলিঙ্গ-দেশীয় বা ওড়িশী সংস্করণ—ভুবনেশ্বরের 'লিঙ্গরাজ' মন্দির এর সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

সর্বদেশিক

'কামিকাগম'-এ সর্বদেশে প্রযোজ্য একটি 'সর্বদেশিক' বা 'সর্বদেশ্য' রীতিরও উল্লেখ আছে।

বিশ্বকর্মা ও ময়

'রামায়ণ' অনুসারে বিশ্বকর্মা দেবতাদের এবং ময় অসুরদের স্থপতি। বাস্তুশাস্ত্রীয় ঐতিহ্য অনুসারে বিশ্বকর্মা 'নাগর' রীতির এবং ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মাতা স্থপতিশ্রেষ্ঠ ময় 'দ্রাবিড়' রীতির স্থপতি।

রীতি ও তার বাস্তুশাস্ত্রীয় ভূগোল মেলে না

বিভিন্ন রীতির মন্দিরের নিদর্শনগুলি বাস্তুশাস্ত্র-নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে আবদ্ধ নেই—উদাহরণত ঔরঙ্গাবাদের নিকটস্থ ইলোরার 'কৈলাসনাথ' মন্দির দ্রাবিড়-রীতির এবং কুর্নুল, রাইচূড় ও কর্ণাটকের জেলাগুলির মন্দিরগুলির অনেকাংশ 'নাগর' রীতির। প্রকৃতপক্ষে সাধারণভাবে কৃষ্ণা নদীকে 'নাগর' রীতির দক্ষিণ-সীমা ধরা হলেও আরও দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত 'নাগর'-রীতির মন্দিরের দেখা মেলে।

শিল্প

মন্দির হলো 'তীর্থ' এবং এই 'তীর্থ'-টি শিল্প-কর্তৃক নির্মিত। বৈদিক যজ্ঞবেদী নির্মিত হলেই উদ্দেশ্য পূরণ হয়, মন্দির নির্মিত হলেই তার উদ্দেশ্য পূরণ হয় না, কারণ মন্দির 'দর্শন' করার জিনিস। শিল্প মন্দিরকে দর্শনীয় করে ছয়টি উপায়ে : (১) নিখুঁত আনুপাতিক পরিমাপ, (২) ছন্দ, (৩) অলংকার (৪) গতিধর্ম, (৫) আমলক এবং (৬) কলস। এগুলির সম্মিলিত তাৎপর্য অনুভব করলে উপলব্ধ হয় মন্দির-শিল্পের রসদৃষ্টি।

১. মান/মাপ

'প্রমাণে স্থাপিতা দেবা: পূজার্হাশ্চ ভবন্তি হি'

('প্রমাণে অর্থাৎ প্রকৃষ্ট মানে বা মাপে স্থাপিত হলে দেবতাগণ পূজার্হ হন'

—'সমরাঙ্গনসূত্রধার'।।)

'ময়মত' অনুসারে মন্দিরের 'মান' (পরিমাপ) সবদিক থেকে ঠিক হলে জগতের সম্পূর্ণতা লাভ হয়। 'সমরাঙ্গনসূত্রধার'-এ বলা হয়েছে প্রকৃষ্ট মাপে স্থাপিত হলে দেবতাদের পূজা করা যায়—এই গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে যে, একজন পাচক যেমন নানা স্বাদ পরীক্ষা করে রান্না করেন, একজন স্থপতিও তেমনভাবে নির্মাণের আগে সমস্ত কিছু পরীক্ষা করেন; এর মানে—উপাদান ও মশলার পরিমাণ এবং অনুপাত ঠিক না হলে যেমন রান্না খারাপ হয় তেমনই পরিমাপ নির্ণয় ও প্রয়োগ ভুল হলে মন্দির-শিল্প চরিতার্থ হয় না।

পরমতত্ত্ব (SUPREME PRINCIPLE) বহু হতে ইচ্ছা করলেন—তাঁর অংশরূপে এই বহুত্বগুলি সন্নিবেশিত আছে নিখুঁত মাপ, অনুপাত, সংস্থান, অনুক্রম, বিন্যাস এবং সন্বিধানে। ভুল মাপের অংশনিচয় কখনও একত্বে সংস্থিত হতে পারে না। এর কারণ, 'অথর্ববেদ-সংহিতা'য় আছে : 'তিনি পৃথিবী-সম্বন্ধীয় সত্যরূপে স্থিত হয়ে মহান দ্যাবাপৃথিবীকে অবিনশ্বররূপে স্বস্থানে স্থাপন করেছেন'' (৪।১।১।৪)। ব্রহ্মের 'সংস্থান' হল পরম 'প্রমাণ' অর্থাৎ 'প্রকৃষ্ট মান' বা 'মাপ'। একারণে ব্রহ্মের আছে 'মানদণ্ড'—'মান' শব্দটি এসেছে 'মা' থেকে আর তাই ব্রহ্মের অন্যতম পরিচয় হলো 'মাটি' ('বায়ুপুরাণ')। তিনি যা প্রকাশ করেন তা-ই দৃষ্ট হয়, যা দৃষ্ট হয় তা পরিমাপযোগ্য, যা পরিমাপযোগ্য তা 'উমা'—পরমতত্ত্ব হলেন পরিমাপকর্তা—('লিঙ্গপুরাণ')। ব্রহ্ম অনুৎপন্ন, তাই 'অমেয়', কিন্তু যা কিছু উৎপন্ন তা সবই 'মেয়' অর্থাৎ 'মাপযোগ্য' ('সমরাঙ্গনসূত্রধার'), সুতরাং, গাণিতিক সূত্র বা নিয়মাবলির দ্বারা গণনা ও পরিমাণযোগ্য বা 'গণ' ('গণিতসারসংগ্রহ')। আমাদের এই দেহ পরমতত্ত্বের বাস্তু—'ইদং শরীরং পুরুষস্য বাস্তুন:' ('নারদীয়বাস্তুপুরুষবিধান')—তাই ব্রহ্মাণ্ডের যে 'সন্বিধান' আমাদের দেহেরও সেই 'সন্বিধান'। আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়তত্ব ও সুধারা, আমাদের অঙ্গসৌষ্ঠব ও তার অনুপাত হলো 'প্রমাণ' ('প্রকৃষ্ট মান)। পরমতত্ত্ব যেমন করেন, মানুষও তেমন করে। মন্দির হলো ব্রহ্মাণ্ডের 'প্রতিম' (সদৃশ), তাই মন্দির ব্রহ্মাণ্ডের 'প্রতিমা'—এ কারণে মন্দিরের চাই ব্রহ্মাণ্ডের মতোই নিখুঁত মাপ এবং অনুপাত। স্মরণীয় যে, 'মন্দির' শব্দটির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশব্দ হলো 'বিমান'—'বি-মান' অর্থাৎ 'বিশিষ্ট মান' এবং অনুপাত। একারণে মন্দির-সংস্থানের ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম প্রতিটি অঙ্গকে হতে হয় নিখুঁত 'মান' বা মাপে। এরপরেও সব মিলিয়ে থাকা চাই নিখুঁত অনুপাত যা স্থাপত্যকে দান করবে অনন্য সমন্বয়, পূর্ণ সামগ্রিকতা ও স্বর্গীয় স্বরৈক্য (Harmony)। এই অনুপাত ও স্বরৈক্য শুধু 'প্রাসাদ' বা 'বিমানে' সীমাবদ্ধ নয়—মণ্ডপ,নাটমণ্ডপ, "পার্শ্বদেবতা' বা আবরণ দেবতাগণের মন্দিরসমূহ, প্রাকার, তোরণ—সব কিছুকেই নির্মিত হতে হবে মূল 'প্রাসাদ' বা মন্দিরের প্রতি গভীর ও সশ্রদ্ধ অনুপাত বজায় রেখে। একারণেই বাস্তুশাস্ত্র সমূহে মাপ/পরিমিতি প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা

আছে, আছে মন্দিরের প্রতি 'অঙ্গুলি' মাপের অজস্র খুঁটিনাটি ও বহুবিধ হিসাব, বলা বাহুল্য, নানা প্রয়োগবিধানের মধ্যে পার্থক্যও নানা—কিন্তু মূল তত্ত্বটি সর্বক্ষেত্রেই এক।

ছন্দ

ব্রহ্মাণ্ডের ছন্দ হলো অনুষ্টুপ ছন্দ, মন্দিরের ছন্দও তাই। অনুষ্টুপ হলো 'অষ্টাক্ষরপাদ ছন্দোবিশেষ।' চতুরস্র যজ্ঞবেদীর মতো ৪ × ৮ পদে বিন্যস্ত বলে ভাবা হয় যে অনুষ্টুপ ছন্দ সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ আর তাই, দিব্য মণ্ডলের প্রতীক। রামায়ণে অযোধ্যা নগরীকে আট ভাগে বিভক্ত ('অষ্টাপদ') একটি চতুরস্র বলে ভাবা হয়েছে। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' অনুষ্টুপ ছন্দেরই মতন ব্রহ্মাণ্ডের ৬৪টি পদ (৮ × ৮) কল্পিত হয়েছে। মন্দিরের গর্ভগৃহ চতুরস্র—এর দ্বিগুণ (৪ × ২) হলো আট। মন্দির-স্থাপত্যের ছন্দও তাই অনুষ্টুপ কারণ মন্দির ব্রহ্মাণ্ডের অনুকৃতি। এই অনুষ্টুপই মন্দিরের নিম্নভাগে 'তলছন্দ' ও সেখান থেকে উর্ধ্বগামী শিখরে 'উর্ধ্বছন্দ।' 'তলছন্দে' আছে 'সংসার'—বৃক্ষ, লতা, পশু, পাখি, মানুষ। 'উর্ধ্বছন্দে' আছে পর্বতশিখরের চিত্রকল্প ও প্রতিভাস—মেরু, মন্দর ও কৈলাসের মহামহিম রূপকল্প। এইভাবে, নাম ও আকারহীন এবং পরম এক পরমতত্ত্বের জন্য 'তলছন্দ'-স্থিত জগৎ ও সংসারের ব্যাকুল আকুতি 'রেখ' শিখরের 'উধ্বছন্দ'-এ গভীর 'একাগ্রতা' লাভ করে। এ কারণেই রেখ শিখর 'এক অগ্র'।

অলংকার

ছন্দের সঙ্গে থাকে অলংকার—মন্দিরের অলংকার হলো ভাস্কর্য। মুখ্য ভাস্কর্যগুলির প্রসঙ্গ এই রকম :

(ক) সংসার

সৃষ্টির সর্বনিম্নে আছে মরজগৎ। মন্দিরের নিম্নভাগে তাই থাকে মানুষ-পশু-পাখি-হাতি-ঘোড়া প্রভৃতির ভাস্কর্য। লক্ষণীয় যে সব মূর্তিগুলিই গতিময়—ঘোড়া ছুটছে, মানুষ যুদ্ধ করছে, প্রেমবভসে মত্ত হচ্ছে, ইত্যাদি—এই সংসারে যার যা কাজ সে তাতে ব্যস্ত আছে। এ হলো মর্ত্যলোক। অনেক সময়ে সারবদ্ধ মস্তকের প্রতীকে 'সংসার'-কে উপস্থাপিত করা হয়।

(খ) কীর্তিমুখ

কার 'কীতি'? পরমতত্ত্বের 'কীর্তি'। কার মুখ? রাহুর 'মুখ'। রাহুর মাতা সিংহিকা, তাই রাহু 'সৈংহিকেয়'। রাহু নবগ্রহের অন্যতমরূপে নৈঋত কোণের অধিপতি এবং 'তমঃ' গুণের আধার। যখন আলোকসৃষ্টি হয়নি তখন ছিল শুধুই 'তমঃ'—অন্ধকার—পরমতত্ত্বের ইচ্ছার আন্দোলনে এই অন্ধকারের গর্ভ হতে জন্ম নিল আলোক এবং ব্রহ্মাণ্ড। রাহু সূর্য ও চন্দ্র-কে 'গ্রাস' করেও পরমতত্ত্বের ইচ্ছানুসারে 'ত্যাগ' করেন। গর্ভগৃহের দ্বারের দুপাশের তরঙ্গায়িত ও উর্ধ্বারোহী লতাপাতা পরমতত্ত্বের ইচ্ছাজনিত আন্দোলনের প্রতীক। 'কীর্তিমুখ' তাই একই আকারের মধ্যে নানা রূপধর—সিংহ, মেষ, ড্রাগন, মাছ, পাখি এবং মানুষ—সব মিলে তার রূপ। মুখটি সিংহের বা সিংহসদৃশ, চোয়ালের নিচের অংশ নেই। ভয়াল ব্যাদিত মুখ যেন সব 'গ্রাস' করে। এই কালরূপ তামসের গর্ভ হতে জন্ম নেয় সৃষ্টি। মৃত্যুর গর্ভ হতে জন্ম নেয়

জীবন। 'কীর্তিমুখ' তাই ভারতীয় শিল্পীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী ভাষা। 'কীর্তিমুখ' সাধারণত থাকে 'গবাক্ষ' বা 'শুকনাসা'-র শীর্ষদেশে—তবে এর আরও নানা অবস্থান হতে পারে।

(গ) মিথুন ভাস্কর্য

"তদ্যথা প্রিয়যা স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিংচন
বেদ নান্তরমেবমেবায়াং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা
সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিংচন বেদ নান্তরং তদ্বা
অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্।।"

"যেমন প্রিয়া স্ত্রী আলিঙ্গন করলে কোনটা বাহির
বা কোনটা ভিতর লোকের সেই জ্ঞান থাকে না,
তেমনি পরমাত্মার সাথে মিলন হলে পুরুষ
ভিতর বাহির কিছুই জানতে পারে না। এই
যে রূপটি, এই-ই এর আপ্তকাম, আত্মকাম,
কামনারহিত ও শোকাতীত রূপ।।"

—'বৃহদারণ্যক উপনিষদ', ৪।৩।২১

নারী ও পুরুষের একাত্মিকা মিলন 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদের উপরে উদ্ধৃত মন্ত্রটিতে পরমাত্মার সঙ্গে সাধকের বা সাধিকার পূর্ণ-মিলনের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। পরমতত্ত্বের দ্বিলিঙ্গাত্মক ধ্রুবাভিসারিতার ('Bi-sexual polarity'-র), অর্থাৎ শিব ও শক্তি বা পুরুষ ও প্রকৃতি রূপের আপাত দ্বিমাত্রিক বিভাজনের ফলে সৃষ্ট হয়েছে জাগতিক দ্বিপত্রোৎপাদিতার ('dichotomy-র')। অথর্ববেদেও আছে : "যথা বৃক্ষং লিবুজা সমন্তং পরিষস্বজে এবা পরিষ্বজস্য মাং"—'লতা যেমন বৃক্ষকে বেষ্টন করে থাকে তেমনই আমাকে আলিঙ্গন করো' (৬।১।৪) সাধক যদি পরমপুরুষকে লতার মতো জড়িয়ে ধরে তবে তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়। এই সাধনার নাম তাই 'লতা সাধনা'—এই সাধনায় সাধক ও সাধিকা পুরুষ ও প্রকৃতি-রূপে মিলিত হন, এ হলো 'মিথুন' যা আসলে উচ্চমার্গের সাধক ও সাধিকার একটি বিশেষ প্রকার যোগসাধনা। অথর্ববেদের এই সূত্র হতেই সৃষ্ট হয়েছে নানা ধারার তন্ত্রসাধনা। মন্দিরের বহির্গাত্রে তাই থাকে বা থাকতে পারে মিথুন ভাস্কর্য। সর্বোপরি, মন্দির হলো শিবের 'মূর্তি' এবং এ হিসেবে শিব ও শক্তির একাত্মক প্রকাশ—'শক্তি' ছাড়া শিব হয় না।

(গ) ত্রিদেব

সমগ্র মন্দির-সংস্থানটিকে স্বর্গীয় সুষমা ও মহত্ত্ব দানের জন্য মন্দির-স্থাপত্যের সবচেয়ে দৃশ্যমান ও গুরুত্বপূর্ণ তিনটি স্থানে তিনজন শ্রেষ্ঠ দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্তি বসানো হয়।

(ঘ) অষ্টদিকপাল ও নবগ্রহ

মন্দির-ভাস্কর্যের দুটি অর্থপূর্ণ বিষয় হলো 'অষ্টদিকপাল' (ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ, মরুৎ, কুবের ও ঈশান—আট দিকের আট দেবতা) এবং 'নবগ্রহ' (সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু)—মূর্তি। নবগ্রহ-মূর্তি সাধারণত দ্বারশীর্ষে থাকে। এই দুই প্রতীক ব্যবহারের ফলে মন্দির একাধারে মহাকাল এবং মহাকাশের সঙ্গে যুক্ত হয়।

(ঙ) শার্দুল এবং সুরসুন্দরী

শার্দুল হলো 'হিংসক' – 'বাঘ' বা 'শরভ'—উড়িষ্যার পরিভাষায় এ হলো 'বিড়াল' বা 'ব্যাল'। 'ব্যাল' হলো শ্বাপদ হিংস্র জন্তু। অন্যদিকে, 'সুরসুন্দরী' হলো, 'সুরাঙ্গনা' বা 'অপ্সরা'। মন্দির-ভাস্কর্যে তাৎপর্যপূর্ণভাবে 'শার্দুল' 'সুরসুন্দরী' উভয়েই 'শক্তি'-র প্রতীক।

(চ) নাগ এবং গৌণদেবতাগণ

নাগ বসুন্ধরাকে ধারণ করে—নাগদেবতার ভাস্কর্য প্রতীকীভাবে মন্দিরকে স্থায়িত্ব দেয়। দেয়ালগাত্রস্থ পার্শ্বদেবতাদের মূর্তিগুলি একদিকে বাস্তুপুরুষমণ্ডলের আবরণ দেবতারূপে 'ব্রহ্মপুর' বা গর্ভগৃহকে ঘিরে রাখে এবং অন্যদিকে তাকে করে তোলে 'মেরু' বা 'সুরালয়' অর্থাৎ মন্দিরটি হলো পুরাণ-কথিত 'মেরু' পর্বত এবং মন্দির-গাত্র হলো 'মেরু'-গাত্রস্থ স্বর্গলোক।

(ছ) পদ্ম

'ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং'—'ব্রহ্মপুরে আছে ক্ষুদ্র পদ্ম' ('ছান্দোগ্য উপনিষদ,' ৮।১।১) —এই পদ্ম নাম ও আকারহীন পরমতত্ত্বের প্রতীক। মন্দির-ভাস্কর্যে পদ্ম তাই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

(জ) গর্ভগৃহের ঘনদ্বার-সংলগ্ন ভাস্কর্যগুলি :

(i) দ্বারপাল

ঘনদ্বারের দুদিকে থাকে দুই দ্বারপাল—স্বর্গদ্বারের দুই প্রতীকী প্রহরী—এঁদের হাতের 'অস্ত্র' দেখলে অনেক সময়ে বলে দেওয়া যায় মন্দিরটি শৈব না বৈষ্ণব ধারার।

(ii) প্রধান এবং পার্শ্বদেবতাগণ

'ঘনদ্বার'-শীর্ষের কেন্দ্রে থাকে প্রধান দেবতার ও তাঁর দুপাশে থাকে পার্শ্ব-দেবতাদের মূর্তি—গর্ভগৃহের ঘনদ্বার এইভাবে হয়ে ওঠে 'স্বর্গদ্বার।'

(iii) নদী-প্রতীক/নদী-দেবতা

'ঘনদ্বারে'র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হলো নদী-দেবতা (গঙ্গা, মন্দাকিনী, যমুনা—বিশেষত গঙ্গা)। এই দ্বারের মধ্য দিয়ে গর্ভগৃহে প্রবেশ করা হলো পবিত্র স্নান (গঙ্গাস্নান) করে পাপধৌত এবং নির্মল হয়ে বিগ্রহ-প্রতীকের মাধ্যমে নাম ও আকারহীন পরমতত্ত্বকে 'দর্শন' করা ও তাঁর দ্বারা 'দৃষ্ট' হওয়া। সাধারণত ঘনদ্বারের 'শাখা'-র (ফ্রেমের উপরভাগের-দুদিকে দুই প্রলম্বিত অংশ যা দুদিকের দেয়ালে প্রবিষ্ট হয়ে থাকে) দুদিকে থাকে নদী-দেবতা বা নদী-মাতার মূর্তি—কখনো কখনো তিনি তাঁর বাহন মকর প্রতীকেও থাকতে পারেন।

(iv) বিদ্যাধর/বিদ্যাধরী

ঘনদ্বারের 'শাখা'-র দুদিকে থাকেন বা থাকতে পারেন উড্ডীন বিদ্যাধর বা বিদ্যাধরী, এঁরা হলেন সঙ্গীত-বিদ্যাধর বা সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী দেবযোনিবিশেষ, স্বর্গ ও পৃথিবীর মাঝে এঁদের বাস।

(৪) গতিধর্ম

গর্ভগৃহের স্থির পূর্ণতা মন্দিরের বহির্গাত্রে রূপান্তরিত হয় প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড এবং তার বীজবস্তুর সাদৃশ্যে, কেননা মন্দির হলো 'ভগবানের শরীর।' একারণেই মন্দিরের 'আকৃতি' হলো 'প্রকৃতি'—এবং এই কারণেই, অর্থাৎ নাম ও আকারহীন পরমতত্ত্বের জাগতিক প্রকাশের প্রতিভূ বলেই, মন্দিরের বহির্গাত্র গতিময়।

ভাস্কর্যগুলির প্রত্যেকটিই নিজস্ব ক্ষেত্রে পৃথক, কিন্তু প্রত্যেকটিই আবার একই ঊর্ধ্বগতি-সম্পন্ন প্রাসাদগাত্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ভাস্কর্যরূপে পৃথক পৃথক হয়েও গতিধর্মের দিক থেকে এক ('Dynamically One') ।

প্রদক্ষিণ-কালে ভক্ত তাঁর জীবন্ত সত্তা এবং চোখ দিয়ে এই সত্য উপলব্ধি করেন। 'অভিগমন'-কালে মণ্ডপে প্রবেশ করে ভক্ত একের পরে এক ছন্দময় স্তম্ভ ('Pillared rhythms') অতিক্রম করে যান—একের পরে এক স্তম্ভ পিছনে চলে যেতে থাকে। ভক্ত চলতে চলতে কখনো কখনো একটু থামতে পারেন—একদৃষ্টে দেখতে পারেন একটি মূর্তি ভাস্কর্য, আবার তিনি চলতে থাকেন এক লক্ষ্যে—গর্ভগৃহের দিকে—মূর্তিগুলিও যেন ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

এমনকি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে এমন মূর্তিগুলিও সর্বদাই গতির মধ্যে রয়েছে। এই গতি তিন প্রকার :

(i) মূর্তিগুলি প্রাসাদগাত্রের গতিময়তার অংশ এবং তা যখন মূর্তিগুলি নিজ নিজ বেদীর উপরে দুই পা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ('সমপাদস্থানক') অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, তখনও। এই খাড়া (Erect) ভঙ্গিতে মূর্তির ওজন সমভাবে বণ্টিত হয় ডান-বাঁ দু দিকেই—এ হলো 'সমভঙ্গ,' যা যদি নামে মাত্র বা অতি সামান্য 'ভঙ্গ' হয় তবে 'অভঙ্গ,' যদি তিনদিকে বক্র বা 'ভঙ্গ' হয় তবে 'ত্রিভঙ্গ' এবং যদি অতিরিক্ত 'ভঙ্গ' বা বক্র হয় তবে 'অতিভঙ্গ'। এই বক্র ভঙ্গিমাতে সৃষ্ট হয় দোলা বা গতির অনুভব।

(ii) যখন কোনো মূর্তি আক্ষরিক অর্থেই গতিশূন্য কোনো ভঙ্গিতে আছে, তখনও মূর্তিটিকে দেয়ালে আপন ভারসাম্য রক্ষা করতে হচ্ছে এবং সে সম্পর্কিত টানাপোড়েন সহ্য করতে হচ্ছে।

(iii) বিভিন্ন মূর্তির হস্তসঞ্চালন-ভঙ্গি, মুখভঙ্গি ও ভাব—বরাভয় প্রদান করছেন, বর দিচ্ছেন, অসুর-নিধন করছেন (যেমন 'দুর্গা মহিষাসুর-মর্দিনী' বা 'শিব ত্রিপুরান্তক') বা অজ্ঞতা দূর করছেন প্রভৃতি 'স্থায়ী ভাব' বিশেষ গতিভঙ্গিমা সৃষ্টি করে। এ হল প্লুটার্ক-কথিত

'Schemate'। পাশ্চাত্য মূর্তি-তত্ত্বে অঙ্গসঞ্চালন, মুখভঙ্গিমা প্রভৃতির প্রকৃতিগত ভেদ বোঝাতে প্লুটার্ক দুটি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন—'Schemate' এবং 'Phorai'—হাতে আয়না, ফুল বা অস্ত্র ধারণ করা আছে এমন মূর্তি-ভঙ্গিমা হলো 'Phorai'—তবে, ভারতে দ্বিতীয় শ্রেণীটি প্রথম শ্রেণিটিরই অন্তর্ভুক্ত।

এইভাবে মূর্তিভাস্কর্যগুলি দেয়ালে একটি গতি নিয়ে অবস্থান করে। এই গতির কিছুটা মূর্তিগুলির নিজেদের আর কিছুটা প্রাসাদের খাড়া গতিছন্দ থেকে জাত। এমনকি মূর্তিগুলি যখন দেয়ালের দিকেই তাকিয়ে আছে, পিছনে ফিরে বা প্রায় পিছনে ফিরে—তখনও যা কিছুর উপর দিয়ে ঝুঁকে মূর্তিগুলি ঘুরে আছে, সেইসব কিছু হতে এই গতি সৃষ্টি হচ্ছে, যেমন, খাজুরাহোর 'বিশ্বনাথ' এবং 'পার্শ্বনাথ' মন্দিরগাত্রের দুটি অপ্সরা-মূর্তিতে লতার মতো বাঁকানো পিঠ, দীর্ঘ পেলব বাহুর আন্দোলন, পিঠ ও কাঁধের উপর হতে দৃশ্যমান মুখের একপাশ ও অপূর্ব পদভঙ্গিমা মধ্যযুগীয় গতিশক্তি এবং প্রাচীন ভারতীয় 'প্রকৃতিবাদে'র অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছে।

(৫) আমলক

মন্দিরশিল্পে ব্যবহৃত আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হলো 'আমলক' এবং 'কলস'—তবে 'আমলক শুধুমাত্র 'নাগর' রীতির মন্দিরেই ব্যবহৃত হয়, দক্ষিণ ভারতে এর স্থান নেয় ও অর্থ বহন করে 'বিমান' বা হর্ম্যের শীর্ষদেশের পেয়ালার মতো আকৃতির গম্বুজ (Cupola)। আমলক হলো নিরেট পাথরের এমন বলয় যার গোল বৃত্তটির সমগ্র প্রান্তদেশ খাঁজকাটা—আমলকী ফলের সঙ্গে আকৃতির সাদৃশ্যের জন্য এই নাম। নাগররীতির শিখরের চার দেয়াল ('বেণু') ভিতরমুখে বেঁকে কাছাকাছি হলে তাদের উপরে আমলকটি বসানো বা চাপানো হয়,—এখানে এটি দুভাবে কাজ করে : (১) এটি শিখরের চারটি দেয়ালের 'নিবৃত্তি' এবং 'বন্ধন,' (২) এটি 'কলস' ও 'স্তূপিকা'-র 'বেদী'—অর্থাৎ আমলকের উপরে 'কলস' ও 'স্তূপিকা' বসানো হয়। শুধু 'মূল শিখর' বা 'মূলমঞ্জরী'-রই নয়, 'অঙ্গশিখর' বা 'উড়মঞ্জরী' গুলিরও আমলক থাকে, উড়িষ্যায় আবার প্রত্যেক 'ভূমি'-রও আমলক থাকে— 'ভূমি-আমলক'। 'মূলমঞ্জরী'র গায়ে 'উড়মঞ্জরী'গুলির যে প্রতিযোগিতা চলে, আমলকে তার সমাপ্তি, কেননা আমলক হলো প্রতিযোগিতার 'সিদ্ধি।' 'আমলক মন্দিরের চার-দেয়ালকে ধরে রাখে, ঊর্ধ্ব হতে চারিদিকে মন্দিরের মহিমা প্রচার করে এবং 'স্তূপিকা'-র বেদীরূপে কাজ করে। সর্বোপরি 'আমলক' শিখর শীর্ষের 'বিন্দু' ও গর্ভগৃহের 'ব্রহ্মস্থান' বা 'ব্রহ্মপুরে'র মধ্যে যোগসাধন করে।

(৬) কলস ('অমৃতকলস'/'অমরকারক')

মন্দির-শীর্ষে আমলকের উপরে থাকে 'স্তূপিকা'—'স্তূপিকা'র অঙ্গ হলো 'কলস,' প্রতীকী অর্থে 'অমৃতকলস' ('অমর-কারক')। প্রত্যেক দেবতার 'কলা' বা অংশ নিয়ে বিশ্বকর্মা একে তৈরী করেছেন বলে এর নাম 'কলস' ('মহানির্বাণতন্ত্র')। 'ময়মত' অনুসারে কলসের শ্রেষ্ঠ উপাদান হলো সোনা—তবে রূপা, তামা, পাথর, ইট এবং পঙ্খ (চুনবালি) বিকল্পরূপে ব্যবহৃত

হতে পারে ও হয়। অনেক সময় শিখর-বিন্দু থেকে 'বেণুকোশে'র মধ্য দিয়ে সোজা নিচে বিগ্রহের অধিষ্ঠান-বেদীর তলায় প্রোথিত হয় 'নিধিকলস' বা নানা রত্ন ('নিধি')-সহ 'কলস' বা 'কুম্ভ'। আমলকের উপরের 'অমৃতকলস' ও বিগ্রহবেদিকার নিচের 'নিধিকলস' উভয়ে-উভয়েব সঙ্গে সম্পৃক্ত ও একযোগে মৃত্যুহীন জ্ঞানময়তার প্রতীক। আবার, এইভাবেই আমলক, 'অমৃতকলস' ও নিধিকলস মিলে পরমতত্ত্বের মহিমা প্রকাশ করে।

রসদৃষ্টি

'মন্দিরের আকৃতি হলো প্রকৃতি' ('অগ্নিপুবাণ')—এ হলো প্রকাশিত জগতের বীজভূত রূপ। খ্রিষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকের সিরপুর প্রস্তর-লেখতে বলা হয়েছে যে মন্দিরের শরীরে 'এই বিস্ময়কর সংসারের' উচ্চ-নিচ সমস্ত জীব ও আকৃতি বর্ণিত হয়। মন্দিরের ভাস্কর্যগুলি এই অর্থই বহন করে।

ভক্ত যখন বাক্, শরীব ও মন নিয়ে মন্দিবে 'অভিগমন' করেন তখন স্তম্ভ, মণ্ডপ ও মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্যগুলির সাথে তিনি আত্মিকভাবে একীভূত হন—এইভাবে ভক্ত নিজেও যেন স্থাপত্যের অংশ হয়ে যান। ভাস্কর্যগুলি শেষ হয় গর্ভগৃহেব ঘনদ্বারে—এভাবে ভাস্কর্যগুলি যেন ভক্তকে পথ দেখিয়ে ভগবানের কাছে নিয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই ভক্ত এবং ভাস্কর্যগুলির নৈকট্য সবচেয়ে বেশি কবে অনুভূত হয় অন্তর্বর্তী প্রদক্ষিণপথ সম্পন্নকালে অর্থাৎ 'সান্ধার' মন্দিরগুলিতে প্রদক্ষিণকালে।

বাইরের প্রখর বৌদ্রের বিপরীতে ভিতরের আবছা আলো-আঁধার ও শীতল পরিবেশ ভক্তের হৃদযকে স্নিগ্ধ করে। ভাস্কর্যগুলিও মণ্ডপের জ্বলন্ত প্রদীপের তেলের, পূজার ফুলের এবং ধূপের গন্ধেব সঙ্গে মিশে আধ্যাত্মিক পরিবেশ রচনা কবে। বাইরে থেকে দেখলে ভারতীয় আকাশ ও প্রকৃতিব সঙ্গে মন্দিরগুলিব দিব্য সাযুজ্য ভক্তের হৃদয়ে নাম ও আকারহীন পরমতত্ত্বের মহিমাস্পর্শ নিয়ে আসে।

ভাস্কর্যগুলির প্রধান প্রদর্শন হয় প্রাসাদের খাড়া দেয়ালে—যেমন খাজুবাহোব কন্দরিয় মহাদেব, দেবী জগদম্বা, উদয়পুরের নীলকণ্ঠেশ্বর, ওসিয়ার শচীয়া মাতা প্রভৃতি মন্দিরে দেখা যায়। মন্দিরের চার দেয়ালেই খিলানের উপরস্থ কার্ণিশ, থাম, পিল্লা, কুলুঙ্গি প্রভৃতি স্থান থাকে। উন্নত. আনত, 'দন্তুরিত' (দাঁত কাটা) ইত্যাকার অংশগুলিও 'প্রাসাদে'র চারদেয়ালকে নানা আকাব দান করে, এমনকি তাবার মতো আকারও সৃষ্ট হতে পারে। মন্দিরের দেয়ালগাত্রের এইসব জায়গায় বসানো মূর্তি-ভাস্কর্যগুলি তীব্র ও উজ্জ্বল ভারতীয় রৌদ্রে উদ্ভাসিত হয়। তীব্রোজ্জ্বল বৌদ্র একদিকে মূর্তিগুলির উঁচু অংশগুলিকে প্রবল আলোকিত করে ও অন্যদিকে তার পাশে পাশেই নিচু বা আনত স্থানগুলিতে গাঢ় ছায়া সৃষ্টি করে গভীর নাটকীয়তার জন্ম দেয়। বিন্যাস ও বুননে ভাস্কর্যগুলি দেয়ালগুলির সঙ্গে আর দেয়ালগুলি ভাস্কর্যগুলির সঙ্গে একাকার হয়ে থাকে।

ভাস্কর্যগুলি মন্দিরকে ঘিরে থাকে মেখলার মতো। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ :

১. অনিবার্য ক্ষেত্র ছাড়া, প্রতিটি ভাস্কর্যই পৃথক এবং সম্পূর্ণ 'কম্পোজিসন'—এমনকি যখন একই ফ্রেমে বিভিন্ন মূর্তি থাকে তখনও অন্য মূর্তিগুলির কাজ হলো প্রধান মূর্তিটিকে পরিস্ফুট করা।

২. মূর্তিগুলি কখনোই গথিক স্থাপত্যের 'স্তম্ভ মূর্তি' ('Pillar Figures') নয়। গথিক স্তম্ভ মূর্তিগুলি 'ভার' বা ওজন বহন করে, কিন্তু ভারতীয় মন্দিরের ভাস্কর্য-মূর্তিগুলি কখনোই ভার বা ওজন বহন করে না, প্রকৃতপক্ষে ভার বা ওজন বহনের সঙ্গে ভারতীয় মন্দিরের মূর্তি ভাস্কর্যগুলির কোনো সম্বন্ধই নেই।

বিভিন্ন ভারতীয় ধারার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে (যেমন উত্তর ভারতীয় এবং দক্ষিণ ভারতীয় রীতির মধ্যে অনুপাতের পার্থক্য আছে), কিন্তু পার্থক্যগুলি বাহ্যিক। সর্বত্রই আকর্ণ বিস্তৃত দীর্ঘ চক্ষু অনুপম স্বর্গীয় দ্যোতনা সৃষ্টি করে— আয়ত গভীর দৃষ্টি চিরবিস্ময় নিয়ে উন্মুক্ত রয়েছে কিন্তু কারও দিকে তাকাচ্ছে না, কোনও কিছু বলছে না—বাস্তুশাস্ত্রীগণ একে বলেছেন 'দিব্যদৃষ্টি।' বলা বাহুল্য, চিত্রকলায় এই সুযোগটি আরও বেশি—অজন্তা, বাদামি, বাঘ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাচীন চিত্রকলায় বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়। 'সমরাঙ্গনসূত্রধার'-এ 'রসদৃষ্টিলক্ষণম্' নামে একটি পরিচ্ছেদে এবিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা আছে।

ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে 'ভয়ানক' এবং 'বীভৎস'-ও 'রস' হিসেবে স্বীকৃত —অন্যগুলি হলো : 'শৃঙ্গার', 'হাস্য', 'করুণ', 'বীর', 'রৌদ্র', 'অদ্ভুত' এবং 'শান্ত' ('সমরাঙ্গনসূত্রধার'-এ আরও দুটি রসের কথা বলা হয়েছে)। বলা বাহুল্য, মূর্তিগুলির প্রত্যেকটিই উপরের কোনো না কোনো 'রস' সৃষ্টি করে। কিন্তু 'ভয়ানক' এবং 'বীভৎস রসের উপস্থাপনা উল্লেখযোগ্যভাবে কম, অবশ্যই কঙ্কালসার, করালবদনা, ভয়ংকরী চামুণ্ডা মূর্তি (যেমন খাজুরাহোর মিউজিয়ামে রক্ষিত 'চামুণ্ডি' মূর্তি) আছে, কিন্তু ভক্ত জানেন যে তিনি অসাধুজনের কাছেই ভয়ংকরী, সাধুজনের 'মাতৃকা।'

ভারতীয় মূর্তিকলায় মূর্তির মাপ ও অনুপাত হয় 'তাল' অনুসারে—এক 'তাল' হল 'বারো আঙুল।' উত্তর-ভারতে সাধারণত দেবমূর্তি হয় ন' 'তাল' এবং দেবীমূর্তি হয় আট 'তাল', তবে এক থেকে দশ 'তাল'-সম্পন্ন নানা মাপ ও অনুপাত স্বীকৃত ও চলিত ছিল।

সর্বোপরি, মূর্তিগুলি মানুষের আদলে নির্মিত হলেও তাদের উপর আরোপ করা ('Transubstantiate করা) হতো দেবতার গুণ ও লক্ষ্মণ—এই দৈব, স্বর্গীয় এবং না-মানুষী ('Non-human') ভাবই ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং নানা আঞ্চলিক পার্থক্যের মধ্যেও এই বিষয়টি সর্বত্রই লক্ষিত হয়।

দ্র: সামগ্রিকভাবে ভারতের এবং পৃথকভাবে ভারতের যে কোনো অঞ্চলের মন্দিরবিদ্যালোচনায় পরম শ্রদ্ধেয়া স্টেলা ক্র্যামরিশের 'The Hindu Temple' অতি-অবশ্যপাঠ্য, কিন্তু বাংলা ভাষার পাঠকদের মধ্যে এই মহাগ্রন্থটি সম্পর্কে চেতনা দুঃখজনকভাবে কম। আমরা মহাগ্রন্থটির মূল প্রতিপাদ্যটিকে পাখির চোখ করে সমগ্র ব্যাপারটিকে মর্ম অনুসারে তত্ত্ব, স্থাপত্য

এবং শিল্প—এই তিনভাগে ভাগ করে, সেগুলিকে আবার প্রসঙ্গ অনুসারে ছোট ছোট অনুচ্ছেদে ভাগ করে নিয়েছি। এতে প্রথম পাঠকগণ মহাগ্রন্থটির কিছু সুফল পেয়ে যাবেন বলে আমাদের মনে হয়েছে।

প্রতিপাদ্যটি আছে মাহগ্রন্থটির খণ্ড দুটির বৃহৎ মাপের (১১" × ৮১/২") ৩৬১টি পৃষ্ঠায় ও তার ২১৫টি পাদটীকায়। অনেক সময় তত্ত্বটি আছে মূলে ও তথ্যটি আছে পাদটীকায়। আমরা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পাদটীকার তথ্যগুলি নিবন্ধমধ্যে গ্রহণ করেছি। বলা বাহুল্য, বহু খুঁটিনাটি বাদ পড়েছে।

পরম শ্রদ্ধেয়া ক্র্যামরিশ-প্রদত্ত ইংরাজী অনুবাদ মাথায় রেখেও অথর্ববেদের ক্ষেত্রে পণ্ডিত বিজনবিহারী গোস্বামী এবং উপনিষদগুলির ক্ষেত্রে পণ্ডিত অতুলচন্দ্র সেন, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন মহোদয়গণের বাংলা অনুবাদ অনুসরণ করেছি, অন্য সমস্ত উদ্ধৃতির বঙ্গীকরণের দায় আমাদের। পারিভাষিক শব্দগুলির (যেমন, 'তীর্থ', 'বেশ্ম', 'যন্ত্র', 'প্রাসাদ', 'নাগর' প্রভৃতি) অর্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমবিহীনভাবে শ্রদ্ধেয় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অনুসরণ করেছি—আমাদের অভিজ্ঞতা হলো এই কোষগ্রন্থটিতে প্রদত্ত অর্থ ক্র্যামরিশ-উদ্দীষ্ট অর্থের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে।

১

'চান্দের সমান'

(বাংলার খড়ো চালের মাটির ঘর)

['কোর' দেওয়া বা বাঁকা চালের স্থাপত্য বাংলার মন্দিরকলার বিশিষ্ট রূপ। ফর্মটি এসেছে বাংলার কুটির হতে, প্রযুক্তিটি নয় কারণ বাঁশ-খড়ের প্রযুক্তি ইট বা পাথরের নির্মাণে অচল। কিন্তু নান্দনিক অনুভবে বাংলার কুটিরের রূপ এবং রসেব উপলব্ধি না থাকলে চালা স্থাপত্যের সৌন্দর্যের রহস্যটুকু অধরা থাকে, তাই এই নিবন্ধ।]

কন্ কন্ কন্
চালে দুই গাছ ছন্
লট্‌কি লট্‌কি বাতাস করে
উড়াই নিত মন।
—বাংলার ছড়া।[১]

পদাবলীর চণ্ডীদাসের অপরূপ কবিত্বের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "নিজের প্রাণের মধ্যে, পরেব প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব।"[২] বাংলার একজন অতি সুমহান কবি-প্রসঙ্গে উচ্চারিত এই অনন্য রবীন্দ্র-বাক্যের অনুসরণে বলা যায়, নিজের, পরের ও প্রকৃতির প্রাণের মিলনোৎপন্ন সার্থক ফল হল বাংলার খ'ড়ো ঘর। যথার্থ বাস্তুর দান হল ঘরেব লোকেদের মনের সুখ, পড়শী বাস্তুগুলির সঙ্গে মিলমিশের সুখ এবং মায়ের কোলের শিশুর মতো প্রকৃতির কোলে প্রকৃতি হয়ে থাকার সুখ। ঠিক এটুকুই হল বাংলার খ'ড়ো ঘরের 'কবিত্ব' বা শিল্প। চণ্ডীদাসের পদের মতন। সহজ, আটপৌরে, শান্ত, স্নিগ্ধ, প্রকৃতিময়। এর আদলেই গড়ে উঠেছিল বাংলার চালারীতির মন্দিরগুলি, সুলতানী যুগের প্রথম দিককার মসজিদগুলিতে এর ছাপ পড়েছিল, পড়েছিল সেকালের দরগা ও সমাধিতেও, মুঘল স্থাপত্যে 'বাঙ্গালী ছত্রী' নামে এই ফর্ম আদৃত হয়েছিল, এবং এর আদলেই কোম্পানীর আমলে তৈরি হয়েছিল বিখ্যাত "বাংলা"[৩] বাড়িগুলি। স্থাপত্য-শিল্পে এই ফর্মই 'গৌড়ীয় রীতি' নামে খ্যাত।

রামচন্দ্রের দূত হয়ে আদিকবি কৃত্তিবাসের[৪] হনুমান লম্ফ দিয়ে সাগর পেরিয়ে সীতা অন্বেষণ করছিলেন, এমত সময—

নিশাকর সুপ্রকাশ গগন মণ্ডলে।
ভালোমতে হনুমান লঙ্কাকে নেহালে।।
চালের উপরে.শোভে সুবর্ণের বারা।
চারিভিতে শোভা করে মুকুতার ঝারা।।[৫]

যতই সোনা বা মুক্তা-শোভিত হোক না কেন কৃত্তিবাসের লঙ্কার রাজপুরীর এই ঘরগুলি

বাংলা চালা ছাড়া কিছু নয়। শেষে হনুমান লেজের আগুনে যে ঘরগুলি পোড়ালেন, সেগুলিও তাই :

সব ঘর জ্বলে যেন রবির কিরণ।
হেন ঘরে অগ্নি বীর করে সমর্পণ।।
মেঘেতে বিদ্যুৎ যেন লেজে অগ্নি জ্বলে।
লাফ দিয়া পড়ে বীর বড় ঘরের চালে।।

. ...

ঘরে ঘরে লাফ দিয়া ভ্রমে হনুমান।।
এক ঘরে অগ্নি দিতে আর ঘর জ্বলে।
কে করে নির্ব্বাণ তার কেবা কারে বলে।।
অগ্নিতে পুড়ি পড়ে বড় ঘরের চাল।
কত স্ত্রীপুরুষের গায়ের গেল ছাল।।[৮]

যে ঘরগুলি 'সুবর্ণের বাবা' ও 'মুকুতার ঝাবা' নিয়ে 'রবির কিরণে' আগেই রশ্মি প্রতিফলিত করে ঝলমল করছিল এবং পরে হনুমান যেগুলিতে অগ্নিসংযোগ করলেন সেই সুমহার্ঘ চালা ঘরগুলির নমুনা পাওয়া যায় 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র 'জুইতের ঘর' বা 'বারবাংলার' ঘরে অথবা আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বর্ণিত ও বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রে ফরিদপুর জেলার মধুখালি গ্রামের প্রয়াত ছরওয়ার জান মিঞার বাড়িতে। পশ্চিমবঙ্গে এখনও টিকে থাকা এমন পূর্ণ নিদর্শন মাত্র একটি, হুগলির জাঙ্গীপাড়া থানার আঁটপুরের 'রাধাগোবিন্দ' মন্দিরের পার্শ্ববর্তী চণ্ডীমণ্ডপ, যার উপরের হাতির পিঠের মত বাঁকানো খড়ের দোচালা ছাদ ও কাঠের খুঁটি আড়া প্রভৃতির অসাধারণ কারুকাজ এখনও বিস্ময়কর। হুগলীরই বলাগড় থানার শ্রীপুর গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপটিও একই প্রকার এবং এর কাঠের কাজও মনোমুগ্ধকর, কিন্তু এর উপরকার পূর্বের খড়ের চালের বদলে একই আকৃতিতে টিনের শেড্ দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মন্দিরবাজারের অনতিদূরের মহেশপুর গ্রামের খড়ো চালের ও কাঠের খুঁটি সম্পন্ন মন্দিরটির বা নদীয়ার উলা বীরনগরের বিখ্যাত মুস্তৌফী পরিবারের চণ্ডীমণ্ডপের এখন অস্তিত্ব নেই, কিন্তু এগুলির এখনও রক্ষিত কাঠের খুঁটি, আড়া প্রভৃতির অপরূপ কারুকাজ হতে চোখ ফেরানো যায় না। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বীণপুর থানার রামগড় গ্রামস্থ কালাচাঁদের বিখ্যাত ত্রয়োদশ রত্ন মন্দিরের লাগোয়া আটচালা মণ্ডপটির চালে খড়ের জায়গার টিন লাগানো হলেও এর কাঠের খুঁটি শাঙ্গা. তীর, নাগদণ্ড প্রভৃতির অসামান্য কারুকাজ চেয়ে দেখার মতো। বীরভূমের সিউড়ি শহর থেকে ৮/৯ কিলোমিটার দূরবর্তী নগরী গ্রামের রায় পরিবারের বিশাল দুর্গাদালানের সামনের খড়ো চালের বিশাল আটচালা নাটমণ্ডপটি ঝড়ে বিনষ্ট হওয়ায় এখন লোহার খুঁটি ও টিনের চালের একই মাপের নাটমণ্ডপ নির্মিত হয়েছে। নেই নেই করে এখনও পশ্চিমবাংলার নানা গ্রামে চমৎকার কাঠের কাজসম্পন্ন খড়ো চালের গৃহস্থ-ঘর আছে যদিও তা সংখ্যায় নগণ্য—যেমন বর্ধমান জেলার ও যোগ্যাদা মন্দিরের জন্য সুবিখ্যাত

ক্ষীরগ্রামের গঙ্গাধর চৌধুরী মহাশয়ের খড়ো চালের চারচালা (এব বারান্দার একটি আড়ায় খোদিত লিপিটির পাঠ হল : 'শ্রী শ্রী যোগাদ্যা মাতার শ্রীচরণ ভরসা, সন ১৩৩৪ তারিখ ১৪ই জ্যৈষ্ঠ/শ্রী রজনীকান্ত মিস্ত্রি'—অর্থাৎ এটি ১৯২৭-২৮ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত) ঘরের বারান্দার বক্রচালের কাঠ ও দণ্ডগুলি খোদাই শিল্পে সমৃদ্ধ। মুর্শিদাবাদ জেলাব সাগরদীঘি থেকে টেরাকোটা সমৃদ্ধ সুলতানী যুগের মসজিদের জন্য খ্যাত খেরুর গ্রামে যাওয়াব পথে কড়াইয়া গ্রামের আলতাফুর রহমান সাহেবের মাটির দোতলা বাড়ি বা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার নবগ্রামের বাসরাস্তার পাশেই মাটির অতি বৃহৎ ও দ্বিতল চকমিলান বাড়িটিও উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। বীরনগব, আঁটপুর, শ্রীপুর, রামগড় এর দৃষ্টান্তগুলি ১৮/১৯ শতকীয় ও অন্য দৃষ্টান্তগুলি ১৯/২০ শতকীয়। এগুলিই প্রমাণ করে অতীব শিল্পমণ্ডিত 'বড় ঘরের চাল' কৃত্তিবাস বাংলার গ্রাম থেকেই তুলে নিয়ে স্বর্ণলঙ্কাব বসিয়েছিলেন। এ জাতীয় ঘবের চালে গাছ থেকে হনু লাফিয়ে পড়া, দুর্ঘটনাক্রমে এগুলিতে আগুন লেগে যাওযা বা হিংসাকালে সার সার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া—এসব বাংলার গ্রামে কোনো নতুন ঘটনা ছিল না। কিন্তু এসবের চেয়েও অনেক বড় কথা হল, কৃত্তিবাস লঙ্কাব বাজপুরীতে যে বাংলা-চালা ছাড়া অন্য কোন রকম ঘর কল্পনা করলেন না (বলা বাহুল্য কৃত্তিবাসের মত মহান কবি অনায়াসেই তা পারতেন) এতেই বোঝা যায় খ'ড়ো চালের ঘরের ঐতিহ্য কত প্রাচীন ও কত মহিমামণ্ডিত।

খ'ড়ো ঘবের খুঁটিনাটি ব্যাপাবগুলিব সামান্য কিছু আলোচনাব আগে আমাদেব বোঝা দরকার যে এটি হল অনন্য এক লোকস্থাপত্য এবং এর নান্দনিকতা হল লোক-নান্দনিকতা, এর ধারক বঙ্গপ্রকৃতি ও বাহক লোকপরম্পরা। এর প্রাণ একদিকে প্রকৃতি ও অন্যদিকে মানবসমাজের সঙ্গে সমন্বয়ে। এর চরিতার্থতা হল গ্রামের এক ঘবের সঙ্গে সকল ঘবের ও সকল ঘরের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি ঘবের পবিপূর্ণ সঙ্গতিতে। প্রাতিষ্ঠানিক, কেতাবী বা শিক্ষিত নগরবাসীর চর্চিত কৃত্রিম নান্দনিক দৃষ্টি এর সৌন্দর্য-বিচারে অক্ষম। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হয় যে বাংলার পরম ধন হল বাংলার উর্বর মাটি, বাঁশ-মাটির ঘব বিনষ্ট হলে তা আবার মাটির সঙ্গে মিশে যায়, জমি হয়ে যায়, মাটি ও জমি রক্ষা পায় এমনকি, কাদাব গাঁথনির ইটের বাড়ি ও সুরকির গাঁথনির বাড়িও বিনষ্ট হলে মাটিতে বসে বা মিশে গেলেও জমি ফেরত পাওয়া যায়। মালদহ জেলার গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় এবং মুর্শিদাবাদে যথাক্রমে সুলতানি ও নবাবী আমলের বহু বৃহৎ ঘব-বাড়ির জায়গায় এখন ভালোভাবেই চাষবাস হচ্ছে, যদিও লাঙ্গলেব টানে এখনও মাঝে মাঝে পুরাতন ইট উঠে আসে। কিন্তু বর্তমান সিমেন্ট-স্টোনচিপ্স-লোহার রড সংযোগে যে ইমাবতসমূহ বিপুল বিক্রমে লাখে লাখে মাথাচাড়া দিচ্ছে সেগুলি স্থায়ী দূষণ—খনিগুলি যখন নিঃশেষিত হয়ে আসবে ও বর্তমান ইমারতগুলি যখন বিনষ্ট হবে তখন এদের জঞ্জাল ফেলার জন্য বঙ্গোপসাগরও অপ্রতুল হবে এবং আমাদেব তৎকালীন উত্তরসূরীরা হয়ত চোখের জলে আমাদের অদূরদর্শিতাকে অভিশাপ দেবেন। মনে রাখা দরকার মানুষকে বাঁচতে হলে চাষজমি বাঁচাতেই হবে--কম্পিউটার-সিদ্ধ বা সেলফোনের ডালনা খেয়ে মানুষ বাঁচবে না। এখানেই রযেছে খ'ড়ো চালের বাঁশ-মাটির ঘরের প্রাকৃতিকতা ও যথার্থ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। লোকছড়া

এবং 'খনার বচন' নামে প্রচলিত সারগর্ভ সন্দর্ভগুলিতে এই বিজ্ঞানসম্মত তথা নান্দনিক দিকটির চমৎকার ইঙ্গিত আছে :

ঘর আর বর
মাঘ ফাল্গুনে কর্[৭]

ধান কাটা সারা হওয়ার পর যখন অর্থ ও অবকাশ দুই-ই হাতে আছে এবং আবহাওয়া ও পরিবেশ যখন মনোরম, বিয়ে করা ও ঘর তৈরি করার আদর্শ সময় তো তখনই। কিন্তু ঘরটি হবে কেমন জায়গায়?

পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ
উত্তরে কলা, দক্ষিণে মেলা।
দক্ষিণ ছেড়ে, উত্তরে বেড়ে,
করগে ঘর পোতা জুড়ে।[৮]

(শব্দার্থ : পোতা—"গৃহ-ভিত্তি, ভিত, বনিয়াদ/বনেদ....পৌতা (√পুঁত-< প্রোথ্) প্রোথিত করা"—কামিনীকুমার রায়, 'লৌকিক শব্দকোষ', ঘরবাড়ি)[৯]

পুবদিকে হাঁস ভেসে-বেড়ানো পুকুর কেননা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকেই আসে বৃষ্টিবাহী মৌসুমী বায়ু (স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথ : "পুব সাগরের পার হতে কোন্ এল পরবাসী"[১০]); পশ্চিমের তাপ ও ঝড় বা পশ্চিমা বায়ু ঠেকাতে বাঁশঝাড়; শীতের হিমেল উত্তরা-বায়ু ঠেকাতে উত্তরে থাকবে কলাবাগান, তারপর টানা দেওয়াল, বসন্ত ও গ্রীষ্মের প্রাণ-জোড়ানো বাতাসের জন্য দক্ষিণদিক থাকবে 'মেলা' বা খোলা—এমন জায়গাই ঘর বাঁধার জন্য আদর্শ। প্রকৃতি ও পরিবেশ-বিষয়ে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ নিঁখুত জ্ঞান এখানে আদর্শ বাস্তু ও প্রকৃতির মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছে। একই অভিজ্ঞতা আছে আরেকটি প্রচলিত লোকছড়ায় :

দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা
পূব দুয়ারী (তার প্রজা
পশ্চিমের দুয়ারী বেজায় তাপ)
উত্তর দুয়ারী বাপের বাপ।"[১১]

বাস্তুর শুভাশুভ নিয়ে 'খনার বচন' নামে অনেক সন্দর্ভ গ্রামবাংলায় চলিত আছে। সেগুলির একটি এবং গবেষক দীপকরঞ্জন দাস-কৃত তার টীকা উদ্ধার করা গেল :

কর্ণমূলে সুখি কাঠি, তবে মাপি ভিতর মাটি,
দীর্ঘে প্রস্থে যত পাই, এক মিশাইবে তাই।
বেদে হরি থাকে শশী, ভাঙা ঘরে উঠে বসি,
বেদে হরি থাকে দুই, আগে ভালো পরে কই।
বেদে হরি থাকে তিন, সে গৃহে লাগেনা ঋণ,
বেদে হরি থাকে শূন্য, কিসের পাপ কিসের পূণ্য।[১২]

—"এখানে বাস্তুভিটার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের যোগফলের সঙ্গে আবও এক যোগ করে তাকে চার দিয়ে ভাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভাগশেষ এক হলে সম্ভবত এরূপ বাস্তুতে ভাঙা ঘরে বাস করাও মঙ্গল। দুই ভাগশেষ থাকলে ফল প্রথমে ভালো হলেও পরে অমঙ্গল আশঙ্কা থাকে। ভাগশেষ তিন হলে গৃহী অ-ঋণী হবে। ভাগশেষ শূন্য হলে বাস্তু সর্বাংশে বাসোপযোগী।"[১৩]

এখন মনে রাখা দরকার যে চালা, বিশেষত দোচালা ফর্ম সবথেকে সহজ ও প্রাকৃতিক ফর্ম, কল্পনা করাই চলে যে মানুষ বনের গাছ-গাছালি লতা-পাতা দিয়ে দোচালা ঘরই স্বাভাবিক বুদ্ধিতে প্রথম তৈরি করেছিল। পণ্ডিত অদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে ইরানের প্রাগৈতিহাসিক রাজধানী সুষা-তে খ্রিষ্টজন্মের দু'হাজার বছর পূর্বের দোচালা সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে।[১৪] আমাদের দেশে প্রাচীনতম উদাহরণ 'প্রবরগিরি'-র 'লোমশ' 'ঋষির গুহা' নামে পরিচিত প্রস্তর স্থাপত্যটি যা সম্ভবত মৌর্য-যুগে নির্মিত। 'প্রবরগিরি হল বিহারের বুদ্ধগয়ার অনতিদূরবর্তী বরাবর পাহাড়। স্থাপত্যটি পাথরের হলেও এর আদল তথা অলঙ্করণ কাঠের নির্মাণ ও কাজের মত—বোঝা যায় এটির নির্মাতা-কারিগর-শিল্পীগণ আদতে কাঠের কাজই করতেন। স্থাপত্যটির ছাদের আকৃতি হাতির পিঠের বা নৌকার ছই-এর মত। গুহাটির বাইরের দ্বারের একটি স্তম্ভলেখ থেকে জানা যায় যে মৌখরীবংশীয় শার্দূল বর্মণের পুত্র অনন্তবর্মণ খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে গুহাস্থ কৃষ্ণমূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেন, গুহাটি এর অনেক আগে নির্মিত। বলাবাহুল্য বাঁশ-খড়ের দোচালা-চারচালা তারই বহু আগেই এসে গিয়েছিল এবং এই অভিজ্ঞতাই কারিগর ও শিল্পীগণ প্রবরগিরির উল্লেখিত স্থাপত্যটি নির্মাণে প্রয়োগ করেছিলেন। অন্যদিকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, নরওয়ে, সুইডেন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের গ্রামে গ্রামে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ চালারীতির বৃহৎ বাড়িতে বাস করা পছন্দ করতেন এবং এখনও এমন দৃষ্টান্ত ঐ সব দেশে বিরল নয়। ভারতের প্রায় সবকটি প্রদেশেই 'চালা' তৈরি হয়ে আসছে চিরকাল, শুধু বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে চালের ঢালের তাবতম্য ঘটেছে, বৃষ্টিপাতের বাৎসরিক গড় যে সমস্ত অঞ্চলে ২৫ ইঞ্চির কম, যেমন পশ্চিমোত্তর উত্তরপ্রদেশ থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ, সেখানে চাল সামান্য ঢালযুক্ত বা প্রায় সমতল, কিন্তু বৃষ্টিপাতের হার যেখানে বেশি, যেমন তামিলনাড়ু ও কেরলে, সেখানে ঢাল অনেক বেশি—তামিলনাড়ু ও কেরলের গ্রাম গুলের দোচালা ও চারচালাগুলি দেখলেই বিষয়টি বোঝা যায়! সুতরাং গৃহনির্মাণে চালার স্থাপত্য শুধুমাত্র বাংলার ব্যাপার নয়—তা'হলে এক্ষেত্রে বাংলার বৈশিষ্ট্য কি?

ছন, খড়, বাঁশ, বেত এইসব অতি সামান্য জিনিস দিয়ে তৈরি ঘর যার দুটি চাল, নৌকার উল্টো পিঠের মতো বা হাতির পিঠের মতো, এমন কৌণিকভাবে মিশেছে যে দেখে মনে হয় প্রকৃতির মাঝে একটি গ্রাম্য মেয়ে ঝুঁকে বসে কাজ করছে—বলা হয়েছে এটি বাস্তুশিল্পের শ্রেষ্ঠ ফর্ম—বাংলা চালারীতির অনন্যতা রয়েছে এখানেই। এই বক্রচাল (curvilinear roof) স্থাপত্যকে পশ্চিমবঙ্গে জেলা ও অঞ্চলভেদে 'কোর' বা 'রাগ' দেওয়া বলা হয় এবং বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে অত্যধিক বাঁক (কোর/রাগ)-কে বলা হয় 'জুইত' এবং এমন ঘর হল 'জুইতের ঘর'। মুঘল স্থাপত্যে 'বাঙ্গালী ছত্রী' নামে এই ফর্ম বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে,

দিল্লির দেওয়ান-ই খাসে এই ফর্ম ব্যবহৃত হয়েছে, রাজপুতানার প্রাসাদগুলিতেও এর যথেষ্ট নিদর্শন আছে।

উনিশ শতকের তিরিশের দশকেই জেমস্ প্রিন্সেপ এই ফর্মকে চিহ্নিত করেছিলেন "Bengal style" রূপে এবং এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : "The Bengalis taking advantage of the elasticity of the bamboo universally employ in their dwellings a curvilinear form of roof"*

ভার (বিশেষত বর্ষাকালে ভিজে খড়-শনের গুরুভার) বহনের জন্য মাটির দেওয়াল হয় যথেষ্ট পুরু (দুই/তিন হাত)। ইটের বাড়ির মত গভীর না হলেও মাটির ঘরেরও ভিত কাটতে হয়। ভিত খোঁড়া হলে তার তলমাটি কদিন ধরে ভেজানো হয়। কাছেই একজায়গায় দেওয়াল তৈরির উপাদান হবে যে মাটি তা'ও ভালমতন জল দিয়ে বেশ কদিন ভিজিয়ে রাখা হয়, তারপর মুগুর দিয়ে পিটিয়ে সেই মাটি 'তৈরি' করা হয়। এবার ঐ তৈরি মাটির তাল দিয়ে দেওয়াল গাঁথা শুরু হয়। দিনে হাত দুয়েক গেঁথে সেই মাটি 'টানা'র জন্য কদিন অপেক্ষা করা হয়। দিনে যতখানি গাঁথা হয় ততখানি হল 'কাঁথ'—নিচের 'কাঁথ' 'টানলে' তার ওপর আবার ক্রমিক 'কাঁথ' গেঁথে গেঁথে অপেক্ষা করা হয়। এইভাবে চারপাশের দেওয়াল গাঁথা হয়ে যায়। দেওয়াল গাঁথার সময়েই দরজা ও জানালার জন্য জায়গা রাখা হয় ও এগুলির উপরকার ফাঁকা জায়গায় লম্বালম্বি মজবুত তক্তা বা মাপমতন বাঁশের সার বসিয়ে তার ওপর আবার কাঁথ গাঁথা হয়—দরজা জানালার উপরকার এই আধুনিক লিন্টেলের মতো কাঠ বা বাঁশকে বলা হয় 'সরদল'। দেওয়াল গাঁথার সময়েই (সাধারণত) ঘরের ভিতরমুখে হাতখানেক বা তার কিছু কম বার করে রেখে দেওয়ালে গভীরভাবে বসিয়ে দেওয়া হয় অত্যন্ত মজবুত কাঠের হুড়কোর সার—একে বলা হয় 'তোড়া'—এই 'তোড়াগুলি থেকেই টানাকাঠগুলি ছাদের ভার বহনে 'পাড়' ও 'মুদনী'কে সাহায্য করে। 'পাড়' হল 'ঘরের খুঁটির এবং তীরের মাথায় অথবা কাঁথের উপর ন্যস্ত চালের ভারবহ কাঠ বা বাঁশ।'[১৭] এবং মুদনী বা মুদনি হল 'চালের মাথায় শক্ত মোটা কাঠ ও বাঁশ'[১৮]। আধুনিক পরিভাষায় মুদনীকে বলা যেতে পারে 'Ridge-pole'। ঘর যদি বড় হয় তবে অত্যন্ত ভারি ছাদের ভেবে যাওয়ার বা বসে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই নীচে 'সাঙ্গা' বা টানা বাঁশ/টানাকাঠ দিয়ে তার উপর দিয়ে ছোট ছোট ঠেকনা দিয়ে চালকে ঠিকঠাক ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়—এই ঠেকনাগুলিকে বলা হয় 'তীর'। বলা বাহুল্য মাটির দেওয়ালের জায়গায় 'বেড়া' বা 'ছিটেবেড়া'-ও ব্যবহৃত হতে পারে—'ছিটেবেড়া' হল বাঁশের কঞ্চি, বাঁখারি, পাটকাঠি, গাছের ডালপালা প্রভৃতি সার করে বসিয়ে তার দুদিকে কাদা মোটা করে ছিটিয়ে বা ধরিয়ে মসৃণ করে লেপে দেওয়া বেড়া। চালারীতির স্থাপত্যে প্রায়ই বারান্দার জন্য আলাদা চাল হয়না—মূল দেওয়ালের উচ্চতা বাড়িয়ে (তা না হলে বারান্দা এত নিচু হয়ে

* 'Pratna Samiksha', Directorate of Archaeology & Museums, Govt of W Bengal, vol. 2 & 3, 1993-94-এর পৃঃ 3 এ নিরঞ্জন গোস্বামী কর্তৃক তাঁর 'Archaeological Activities in Bengal till 1967' প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

পড়বে যে তার নীচে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাবে না) চালের সামনের অংশকে 'বারান্দা' হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত এর দুপাশ ও সামনেব দিকে খোলা থাকে, তবে দুপাশে কখনও কখনও দেওয়াল বা বেড়া রাখাও হয় (হুগলীর গুড়াপের নন্দদুলালের সুবৃহৎ আটচালা মন্দিরটি এই রীতির শ্রেষ্ঠ উদাহবণ)। পারিভাষিক শব্দপ্রয়োগ করলে, এক তলার ক্ষেত্রে এই অংশের নাম 'দুয়ার' এবং দোতলার ক্ষেত্রে 'বারান্দা', তবে বর্তমানে একতলার ক্ষেত্রেও বারান্দা শব্দটি জনপ্রিয় হচ্ছে। অনেক সময়েই বারান্দার জন্য আলাদা চালা ব্যবহৃত হয়— যেমন বর্ধমান জেলার বনকাটি (আউসগ্রাম থানা) গ্রামে আমরা আটচালার সামনে একচালা বারান্দা দেখেছি এবং এমনই দেখেছি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বসনছোড়া (চন্দ্রকোণা থানা) ও বিভিন্ন জেলার বহু গ্রামে, কোনও কোনও জায়গায়, আটচালাটির ছাদে টিন বসানো হলেও বারান্দার চাল খড়েরই আছে। বীরভূম (যেমন সিউড়ি থানা এলাকাব কবিলাসপুব, বোলপুব থানার ইটাণ্ডা, মহঃ বাজার থানাব চাঁদনি নামক সাঁওতালপল্লী বা নানুব থানাব হাটশেরাণ্ডী) ও বাঁকুড়া (যেমন তালডাংরা থানাব হাড়মাসড়া বা ইঁদপুব থানাব আটবাইচণ্ডী) জেলায় চারচালার সামনে একচালা দুয়াব/বারান্দা খুব দেখা যায। আবার হুগলীর জাঙ্গীপাড়া থানার কোতলপুরের পথে একটি ক্ষেত্রে আটচালার সামনে দোচালা বারান্দা চোখে পড়েছে।

এবাব দরকার চালারীতিব স্থাপত্যেব বিভিন্ন শ্রেণি সম্পর্কে ধারণা প্রস্তুত করা। দেওয়াল থেকে ঢালা একটি মাত্র চাল নামলে তা একচালা। মুদনী থেকে দুদিকে দুটি চাল নামলে তা দোচালা বা একবাংলা। পাশাপাশি দুটি দোচালা বা একবাংলার জোড়া থাকলে তা জোড়বাংলা (মন্দিরেব ক্ষেত্রে প্রথমটি জগমোহনরূপে ব্যবহৃত হয়)। দোচালাব সামনেব ও পিছনেব চালেব সঙ্গে দুপাশ থেকে আরও দুটি চালা নামলে হয (২ + ২ = চারচালা), নীচেব চারচালার উপর তুলনায় ছোট আর একটি চারচালা চাপালে হয (৪ + ৪ = আটচালা) এবং আটচালার দ্বিতীয় বা ক্ষুদ্রতর চারচালাটির উপর আরও ছোট একটি চাবচালা চাপালে হয় (৪ + ৪ + ৪ = বারোচালা), চালের সংখ্যা আরো হেরফের ঘটানো যায়, যেমন চারচালার পাশ থেকে একটি অতিরিক্ত চালা নামালে হয়ে যেতে পারে পাঁচচালা—কিন্তু পবিভাষায় তিনচালা, পাঁচচালা, ছয়চালা, নয়চালা বলে কিছু নেই। বৃহৎ, প্রা মাঠের মতন, উঠান সম্পন্ন বৃহৎ বা অতিবৃহৎ দোতলা (এমনকি তিনতলা) মাটির ঘর হল মাঠকোঠা। মাঝে উঠান রেখে চারপাশে ঘেঁষাঘেঁষি ঘব কবলে হয় চকমিলান বাড়ি—উড়িষ্যায় একে বলে 'খঞ্জা ঘর'। ভিতরের উঠান (প্রায়ই বৃহৎ) হল 'বাকুল'। বলা বাহুল্য, জেলা ও অঞ্চল ভেদে এদেব মধ্যে কিছু রূপবৈচিত্র্য চোখে পড়ে, ভিন্ন ভিন্ন নামও পাওয়া যায় যেমন বর্ধমান-বাঁকুড়ায় লাটাকুমড়ি বা মুঠকাঠামো, হুগলিতে লতাপেড়ে, মেদিনীপুরে আটপাঁচিলে। এইসব বৈচিত্র্য কিন্তু রকমফের মাত্র, মৌলিকভাবে কাঠামোটি সর্বত্র এক বা প্রায় এক। ভৌগোলিক দিক থেকে দেখলে, পূর্ববঙ্গে দোচালা অত্যন্ত জনপ্রিয় কিন্তু রাঢ়বঙ্গে 'চারচালা'।

ঘর তৈরির পর বাকি থাকে 'ফিনিসিং' ও অলংকবণের কাজ। এখানে বাঙালী ছাপরবনগণ এমন প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন, যার তুলনা মেলা ভার। ছাপরবন হলেন ঘরামি, ময়মনসিংহ গীতিকায

যাঁদের বলা হয়েছে কামলা—এঁদের মধ্যে ছিলেন নানা ধরণের শ্রমিক ও শিল্পী যাঁরা ঘর বাঁধা থেকে অলংকরণ, সব কাজই করতেন। লক্ষ্য করার বিষয় কথাটি ঘর বাঁধা বা অঞ্চলভেদে 'ঘরফাঁদা'—কিন্তু কখনও ঘর তৈরি বা নির্মাণ করা নয়। প্রচলিত লোকছড়ায় তাই দেখি :

বর আনতে কড়ি
ঘর ফাঁদতে দড়ি।[১৭]

পূর্ববঙ্গের (এখন বাংলাদেশ) ঢাকা-ময়মনসিংহের জুইতের ঘরের তলছাদে, ঝাঁপে ও ভেলকিতে অবিশ্বাস্য শিল্পদক্ষতা দেখিয়েছেন ছাপরবনগণ—ছন, খড়, বাঁশ, বেত প্রভৃতি সামান্য উপকরণে। এখন বুঝতে হবে জানালা-দরজার উপরের চৌকাঠ হল 'কাপালি', এবং ঝাঁপ হল কাপালি থেকে চালের নিচ পর্যন্ত অংশ। 'ভেলকি' হল (পূর্ববঙ্গীয়) 'দরজা জানালার উপরিস্থ অল্পায়তন আচ্ছাদন বা বেড়া। ইহার শিল্পকার্য এক সময়ে দর্শকদের ভেলকি লাগাইয়া দিত'।[১৮]

জুইতের ঘরের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নিঃসংশয়ে 'বারদুয়ারি ঘর' বা 'বারবাংলার ঘর'। শ্রদ্ধেয় কামিনীকুমার রায় এর চমৎকার পরিচিতি দিয়েছেন—

"তখনকার দিনে বিত্তশালী অনেকেই যেমন মঠমন্দির নির্মাণ করিয়া পরকালের পথ সুগম করিতেন, তেমনই ইহলোকে খ্যাতি প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্যও অনবদ্য কারুকার্যমণ্ডিত'বার বাংলার ঘর' নির্মাণে উদ্যোগী হইতেন। বাড়ির বাহিরের দিকে (বাহির মহলে) এই শ্রেণীর ঘর তৈয়ার করা হইত। দেশেব বিভিন্ন স্থান হইতে ঘরদরজার কাজে নামকরা শিল্পীদের উচ্চ পারিশ্রমিক দানের প্রতিশ্রুতিতে আহ্বান করা হইত। নির্বাচিত শিল্পীরা মাসের পর মাস, এমনকি বৎসরের পর বৎসর কাজ করিয়া এক একটি ঘরের শিল্পকাজ শেষ করিতেন। এই সকল শিল্পের উপকরণ ইটপাথর সিমেন্ট বালি নয়; বাঁশ বেত চটি পাটি উলুখড় ইত্যাদি সামান্য জিনিস লইয়াই শিল্পীরা কাজে নামিতেন। বেড়ায়, ঝাঁপে, সামান্য একটি বাখারির গায়ে, এক টুকরা শীতল পাটিতে, তাঁহারা এমন সব কারুকার্য করিতেন, পুরাণ ইতিহাসের কাহিনী রূপায়িত করিয়া তুলিতেন, যাহা দেখিবার জন্য দূর দূরান্ত হইতে দলে দলে লোক ছুটিয়া আসিত। সেইসব ঘরদুয়ার এখন আর চোখে পড়ে না; সেইসব শিল্পী গোষ্ঠীও আজ আর নাই, থাকিলেও কেহ তাহাদের ডাকে না।"[১৯]

'ময়মনসিংহ গীতিকা'র 'মহুয়া' পালায় জুইতের ঘব* ও চৌকারী বা চারচালা ঘরের উল্লেখ আছে :

(ক) নয়া বাড়ী লইয়া রে বাইদ্যা বানলো জুইতের ঘর।
লীলুয়া বয়ারে কইন্যার গায়ে উঠল জ্বর।।[২০]
(শব্দার্থ : লিলুয়া বয়ার—লীলাময় বা ক্রীড়াশীল বাতাস)
(খ) নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা বানলো চৌকারী।
চৌদিগে মালঞ্চের বেড়া আয়না সাড়ি সাড়ি।।[২১]

* 'জুইতেব ঘর'-এর অর্থ কেউ কেউ (যেমন সুখময় মুখোপাধ্যায়, তৎসম্পাদিত 'ময়মনসিংহ গীতিকা' ১৯৯৯ সংস্করণের পৃঃ ৬) অর্থ করেছেন খুব পছন্দসই বা জুতের ঘর—বলা বাহুল্য তা নয়, আমরা আগেই দেখেছি জুইত হল বাঁক যা না থাকলে খুব পছন্দসই হলেও জুইতের ঘব হবে না।

বোঝাই যাচ্ছে পুরাতন বাংলার লোককবি, কারিগর ও সাধারণ মানুষের কাছেও একবাংলা 'জুইতের ঘর' ও চারচালা (চৌকারি) স্থাপত্য ও তাদের ভিতরকার পার্থক্যটি স্বচ্ছ ছিল। এটিও লক্ষণীয় যে চারচালাটি সাজানো হয়েছে মালঞ্চের বেড়া আর আয়নার সার দিয়ে।

ময়মনসিংহ গীতিকায় আরও দেখি পুকুর প্রভৃতির মাঝে 'জলটুঙ্গির ঘর'—

জলটুঙ্গি ঘর আছে আমার বাপের বাড়ী।
খাট পালঙ্ক আছে কত চান্দুয়া মশারী।।

(কাজলরেখা)[২২]

হয়তো জলটুঙ্গী ঘর ছিল বিলাস করার অঙ্গ, ঠিক যেভাবে কামটুঙ্গী ঘর হয়তো ছিল কামকলার অঙ্গ।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর মহাগ্রন্থ 'বৃহৎ বঙ্গ'-এ জুইতের ঘরের এক অনন্য বর্ণনা রেখে গেছেন, এই বর্ণনা সমগ্র বাঙালী জাতির অমূল্য উত্তরাধিকার, তাই তা বিস্তৃতভাবে উদ্ধার করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা :

"যখন নদীর ভাঙনের ভয়ে পাকাবাড়ি তৈরি করা নিরাপদ্ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, তখন বঙ্গদেশের স্বাভাবিক শিল্পানুরাগ খড়োঘরেই যথাসাধ্য প্রযুক্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে ময়মনসিং, শ্রীহট্ট, ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে এই খড়ো ঘরগুলির জন্য লোকেরা মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিতেন। তাঁহাদের স্বাভাবিক শিল্পশক্তির এমন সকল নমুনা এই খড়ো ঘরে প্রদর্শিত হইত যে, এখনকাব দিনে তাহার একটা ধারণা করা শক্ত। পূর্ববঙ্গের গীতিকায় অনেক স্থলে সূক্ষ্ম শিল্পকলামণ্ডিত খড়ো ঘরের উল্লেখ পাওয়া যায়। মলুয়া গীতিকার নায়ক চাঁদ বিনোদ এ বিষয়ে একজন ওস্তাদ ছিলেন। তাঁহার খড়ো ঘর রচনার কথা সেই গীতে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হইয়াছে। মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলির কোন কোনটিতে সাহ বেণের স্ত্রী অমলার "উদয়তারা" নামক ঘরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়. তাহার কারুকার্য্য ও মণিমুক্তার ঝালর ও সোনার "টুনি" প্রভৃতির যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় যখন বাঙ্গালী বণিক্‌দের বিশ্ব-ব্যাপক বাণিজ্য ছিল, তখন ঐ সকল খড়ো ঘরের পাছে অজস্র অর্থ ব্যয় হইত। কবির বর্ণনা অতিরঞ্জিত হইলেও উহা সাময়িক শিল্পসম্ভারের কতকটা আভাস দিতেছে—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। পূর্ব্ববঙ্গে ফরিদপুর জেলার মধুখালি গ্রামে (উক্ত স্থানে থানা ও ই. বি. আর. এর স্টেশন আছে) স্বর্গীয় ছরওয়ার জান মিঞার বাড়ীতে ঐরূপ একখানি ঘর আছে। ময়মনসিংহ-অঞ্চলে কোন কোন স্থানে দুই একটি তদ্রূপ ঘর আছে বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। এ শিল্প দেশ হইতে চলিয়া গেল।... ... ...

ছারওয়ার জান মিঞার বাড়ীর কতকটা ধারণা নিম্নলিখিত বিবরণে পাওয়া যাইবে :

ঘরখানি চারি চালা বিশিষ্ট, সে দেশে ইহাকে 'চৌরী' ঘর বলে। পূর্ববঙ্গে একরূপ ছন জন্মে তাহাকে 'উলু ছন' বলে। এই উলুছনের উল্লেখ পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকায় অনেক স্থলে পাওয়া যায়। সাধারণ ছন হইতে এই উলুছন দীর্ঘ, সূক্ষ্ম ও অনেক কাল স্থায়ী। এই উলু ছনকে খুব কায়দা করিয়া 'কুলিছন' তৈরি করিতে হয়। মুঠির মধ্যে উলু ছন এক এক আটি ধরিয়া ধরিয়া তাহা

ছাঁটিতে হয়, কোন একটি খড় বড় বা ছোট না হয় এইভাবে বাছাই হয় এবং সমান করিয়া কাটিতে হয়। তৎপরে এই 'কুলি' ছনের এক একটি আঁটি বিস্তৃত করিয়া সাজানো হয়। চালের উপর ছন খুব পুরু করিয়া প্রত্যেকটি স্তর নির্ম্মিত হয়, প্রত্যেক ছয় ইঞ্চি ব্যাপক ছনের স্তরের পর আঁঠন (বাঁশের চটা উহা খুব সরু করিয়া গোলাকৃতি করে তাহারই নাম 'ছাওনি কাঠি') এইরূপ স্তরে স্তরে কুলিছন চালের সঙ্গে বাঁধিয়া ঢালা (উপরকার দিক্) পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। উপরের দিকটা ঐ ছনই মোড় দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া এমন করিয়া বাঁধে যে তাহা দেখিতে খুব সুন্দর হয়। এই চালের নীচের দিক্‌টাই অতি সরু—কারুকার্য্যময় পাটী থাকে। এই পাটীকে পূর্ব্ববঙ্গে শীতল পাটি বলে। ইহার দাম খুব বেশি। কখনও কখনও একখানির দাম ৫০০ টাকা পর্যন্ত হইত। শীতল পাটিতে আটকাইবার জন্য 'ছাটন' (সূক্ষ্মভাবে চাঁচা বাঁশের চটা) ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি প্রত্যেক চার আঙুল পরে পরে 'ছাটান' থাকে, ছাটানগুলির সঙ্গে ফুরসো (ছাটন হইতে বড় অর্দ্ধ গোলাকৃত চাঁচা বাঁশ) বক্র এবং আড়িভাবে আবদ্ধ থাকে। এই ফুরসোর সহিত দড়ি ('তাইতা') দিয়া চালের উপরকার আঁটন আবদ্ধ থাকে। এই সমস্ত বাঁধনে 'কুলি ছন' খুব শক্তভাবে আঁটা থাকে। ফুরসোর সঙ্গে ঘন ঘন পাকা বাঁশের নাতিস্থূল গোলাকৃতি 'রুয়ো' আড়াআড়িভাবে বাঁধা হয়, ইহাতে চাল এত শক্ত হয় যে কেহ চালের উপর তাণ্ডব নৃত্য করিলেও তাহা হেলে না। রুয়োকে আটকাইবার জন্য বাঁশের 'চটা' সর্ব্বনিম্নে আবদ্ধ হয়, এই প্রশস্ত চটাকে 'মুখজোত' বলে। চালের একেবারে সম্মুখের সাজানো দিক্‌টাকে 'মুখপাত' বলে। এখন ঘরের মধ্যে গিয়া উর্দ্ধে তাকাইলে যে দৃশ্য দেখা যায় তাহা বর্ণনাতীত, যে সকল বাঁশ ও আটনের কথা বলা হইয়াছে সেই সমস্তই নানা বর্ণে রঞ্জিত ও তাহার প্রত্যেকটিতে অসীম ধৈর্যের পরিচায়ক শিল্পকার্য্য আছে। বিচিত্র বর্ণের ফুল ও লতাতে উপরকার দৃশ্য অতি মনোরম হয়। নানা কারুকার্য্য-মণ্ডিত খুঁটির সঙ্গে কাঠের 'ডাফ্' দিয়া চাল আঁটা হয়। এই ডাফগুলির কোনটি নরাকৃতি, কোনটি হাতীর শুঁড়ের মত, কোনটিতে পরী বা অন্য কোন জীবজন্তু মূর্ত্তি গড়া থাকে। যেখানে যেখানে বেতের 'গোরা', সেইখানে সেইখানে বিচিত্রবর্ণ পশুপক্ষী ও ফুলপল্লবের কারিগরী। সুন্দী বেত অতি সূক্ষ্মভাবে চাঁচিয়া তাহাতে নানা কায়দা করিয়া লতাপাতা বা ফুলের আকারে গেঁড়োগুলি (গ্রন্থি) গড়া হয়। নিম্ন হইতে উর্দ্ধে তাকাইলে মাঝে মাঝে শীতলপাটী ও বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত গেঁড়ো এবং ঠেকাগুলি অদ্ভুত মূর্ত্তিতে এমন শোভাময় দেখায় যে চক্ষু সেই চারুদৃশ্যে ভুলিয়া যায়; এই শিল্পশোভা প্রতিপদে অজন্তার ছাতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

ছরওয়ার জান মিঞার খড়ো ঘর, পোঃ মুধুখালি, গ্রাম বনমালদিয়া, জেলা ফরিদপুর। এই ঘরখানি প্রথম ওস্তাদ রাজলোচন ঘরামী প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়া শেষে ভয় পাইয়া মিঞার নিকট অস্বীকার করে। কিন্তু তাহার এক আনাড়ী সাগরেৎ মহিম নমঃশুদ্র এই ঘর অতি প্রশংসা ও গৌরবের সহিত সমাধা করে। ইহা প্রস্তুত করিতে প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ১২০০০ টাকা পড়িয়াছিল। পূর্ব্বে এই ঘরে একটিমাত্র আলো জ্বালাইলে সমস্ত ঘরখানি 'মিনাপাত' এবং 'অভ্র' প্রতিবিম্বিত হইয়া আলোকিত হইত। কিন্তু বর্তমানে "মিনাপাত" একেবারেই নাই, অভ্রকিছু আছে। যে ঘরামি দিনে একটি মাত্র রুয়ো প্রস্তুত করিতে পারিত, সেই চাকুরী পাইয়াছে; এবং

মহিম নাকি প্রত্যেকটি জিনিষেরই পরীক্ষা করিবার জন্য জিনিসগুলির উপর দিয়া একগাছি রেশমী সুতার টানিয়া লইয়া যাইত, যদি সুতাটি ছিঁড়িয়া যাইত, তবে বুঝা যাইত যে জিনিস ভালভাবে মসৃণ হয় নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই চিত্র বিচিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিল্পীর তপস্যার ফলস্বরুপ ঘরখানি দেখিলেই অজন্তার কারিগরদিগের কথা মনে পড়িবে। ....

যিনি নিজে চোখে এই ঘরখানি না দেখিবেন, তিনি এই শোভার একটা ধারণা করিতে পারিবেন না। প্রতি অবকাশ-স্থল, প্রত্যেক রূয়া, ছাটন ও ফুর্‌শি এমন সামঞ্জস্য-সহকারে নিয়মিত এবং প্রত্যেক জিনিসের ব্যবধান এরূপ সুনিয়ন্ত্রিত যে মনে হয় যে কারিগর প্রতি সূক্ষ্ম কার্য্যের জন্য গজকাঠি হাতে করিয়া কাজ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের এই শিল্পশিক্ষা বংশানুক্রমে এরূপ বিশুদ্ধভাবে হইয়া আসিয়াছে, যে কোন গজকাঠি বা মানদণ্ডের সাহায্য ব্যাতিরেকে সমস্ত জিনিস কারিগরেব স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানে সম্পাদিত হইয়াছে। চালটা পূর্ব্বে দুই হস্ত পরিমিত পুরু ছিল, এখন আর উহা অত পুরু নাই। এই পুরু চালের নীচে দাঁড়াইয়া দারুন গ্রীষ্মকালেও সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া যায়। চালের মধ্যে মধ্যে সুদর্শন আবের চিত্রিত ছবির কারিগরী সর্ব্বত্র। অপরাপর বিবরণ;—৪ খানি চালা, চালা হইতে 'মুখপাত' পর্য্যন্ত এক একটি 'ধয়ো' ৪০ হাত। ঘরের দৈর্ঘ্য ৩৫ফিট—এক একটি 'আঠন'ও ৩৫ ফিট। ঘবখানি প্রস্থে ৩০ ফিট, খাড়াই ২৪ফিট। এক একটি চালে ৯০টি ''ধয়ো'', খাড়াই ২৪ ফিট। এক একটি চালে ৯০ টি 'ধয়ো', ৫৪ টি 'আঠন', ১৮৫ টি 'ফুরশী', ৪৫০ টি 'ছাটন', ১৭০ টি 'সলা', ১৪ টি 'পট', ৭ টি 'মুখপাত', ৫টি 'পাড়', ৪০ টি 'ডাফ', ১০ টি 'খুঁটি' বারান্দায় ৮টি (ভিতরে) ও ২০ টি 'তীর' উপরি ভাবে একটি 'ঢালা'। ....

চালের খুব পুরু ও শক্ত গাঁথনির দরুন ঘরের নিম্নে বহু বৎসরেও এক ফোঁটা জল প্রবেশ কবিতে পারিত না, এই জন্য চালের নিম্নভাগ নানারূপে সজ্জিত করা হইত। অনেক সময় ময়ূরের পাখা এবং সময়ে সময়ে মাছরাঙ্গা পাখীর পালক দিয়া তাহা সাজানো হইত। ('মাছুয়া পক্ষের পাখা দিয়া সাজুয়া বানায়!'—মলুয়া পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, ২য় ভাগ, প্রথম খণ্ড, ৬২ পৃষ্ঠা)। উৎকৃষ্ট ঘরগুলি যে সকল বাঁশ ও বেত দিয়া নির্ম্মাণ করা হইত, তাহা সাধারণ বেত ও বাঁশ অপেক্ষা অনেক ভালো, কারণ তাহা গৃহস্থেবা আলাদা রকমের চারা তৈয়ারী করিয়া যত্নের সহিত উৎপাদন করিত। সময়ে সময়ে একটি সুন্ধি বেত ২/৩ শত হাত লম্বা হইত। এখনও পূর্ববঙ্গের কোন না কোন পল্লীতে সেইরকম বেত জন্মানো হয়। খাঁটি বাঙালী ঘরের সকল কাজই বাঁশ বেত ও ছন দিয়া সম্পাদিত হইত, সুতো দিয়া যেরূপ কাঁথা বা শালে নানারূপ ফুল, লতা ও জীবজন্তু প্রস্তুত করা হয়, শুধু সুন্ধি বেত দিয়া সেইরূপ কারুকার্য হইত, সেই বেত চাঁচিয়া প্রায় সূতার মত সূক্ষ্ম করা হইত। বাঁশের দ্বারা নানারূপ জীবজন্তুর মুখ ও অবয়ব নির্ম্মিত হইত। সুতরাং খাঁটি বাঙালী গৃহস্থ খুব কমই কাঠ প্রভৃতি অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করিতেন। যত অল্প ব্যয়ে সম্ভব, তাহারই উপর তাঁহাদের অমূল্য কারুকার্য্য চলিত। পুরাণো কাপড়ের উপর, পুরাণো শাড়ীর সূতা বাহির করিয়া যেরূপ কাশ্মীরী শালের মতন কাঁথা তৈরী হইত, এই সামান্য সামান্য উপকরণে তদ্রুপ বাঙ্গলার পল্লীর সুদর্শন অপূর্ব্ব কারুখচিত খড়ো ঘর তৈয়ারী হইত। এককালে বঙ্গদেশে এইরূপ ঘর অনেকেই প্রস্তুত করিতেন। ....

বাঙ্গলা দেশে যে এই রূপ ঘর অনেক ছিল, তাহার প্রমাণ শুধু পল্লী-গীতিকায় নহে আইন-ই-আকবরিতেও আছে। আবুল ফজল লিখিয়াছেন, 'বাঙ্গালীদের ঘরগুলি প্রধানত বাঁশ দ্বারা নিৰ্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহাদের কতকগুলিতে ৫০০০ টাকা কিংবা ততোধিক অর্থ ব্যয়িত হয়—এই ঘরগুলি খুব দীর্ঘস্থায়ী হয়।' ['Their (of the Bengalees) houses are chiefly made of bamboos, some of which will cost five thousand rupees and upwards and are of very long duration. —Ain-i-Akbari, Pt. I, Soobha of Bengal, P. 303'] একখানি ঘর প্রস্তুত করিতে ৫০০০৲ এবং ততোধিক টাকা সেই সময়ে ব্যয় হইত, এখনকার দিনে ঐ টাকার মূল্য অনেক অধিক।"[২৩]

দীনেশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি বাড়ি উল্লেখ করেছেন—এই বাড়িগুলিও ছিল উপরে বর্ণিত বাড়িটির মতই সুন্দর—বাড়িগুলি ছিল বোলপুরের কাছে এক গ্রামে, খুলনা জেলার এক গ্রামে, বাঁকুড়ার পাত্রসায়েরে ও ত্রিপুরার আগরতলায়।[২৪] দীনেশচন্দ্র না বললেও ফরিদপুরের প্রাক্তন বাসিন্দা ও বর্তমানে বারাকপুর (উত্তর ২৪ পরগণা), তালপুকুর, নতুনপল্লীর স্থায়ী অধিবাসী, সুপ্রতিষ্ঠিত কাষ্ঠশিল্পী ও ভাস্কর, নিখিলচন্দ্র ধর জানিয়েছেন যে তিনি ফরিদপুরের টেপাখোলা গ্রামে মোহন মিঞার মালিকানাধীন এক বৃহৎ ও অত্যন্ত অলংকরণ (বাঁশ ও বেতের কাজ)-সমৃদ্ধ 'চৌচালা' ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি বহুবার বিস্মিত চোখে দেখেছেন—সন্নিহিত অঞ্চলে এখনও বসবাসকারী নিখিলবাবুর আত্মীয়গণ এদেশে বেড়াতে এসে জানিয়েছেন যে অলংকরণ সমৃদ্ধ চৌচালাটি এখনও ভাল অবস্থায় রক্ষিত আছে। তাঁরা আরও জানিয়েছেন যে চৌচালাটি অতীব পুরাতন এবং একসময় হয়তো গ্রামের অতিধনী পাল পরিবারের অধিকারে ছিল। তবে দীনেশচন্দ্র কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' থেকে এ-প্রসঙ্গে যে স্মৃতিকথা উদ্ধার করেছেন তা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। বর্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালি মহকুমার 'রাজার ঝি' নামক দীঘির পাড়ে কয়েকটি বাঁশের কুটিরের শিল্পকাজে লোকজন অভিভূত হতেন, নবীনচন্দ্র এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'এ অঞ্চলে কি কোন অঞ্চলে এমন কবিত্বপূর্ণ বাঁশের ঘর কেহ কখনও দেখে নাই। বাঁশের কুটির যে এমন সুন্দর হইতে পারে, এ ধারণাও কাহারও ছিল না। এ অঞ্চলে এই সকল ঘর লইয়া মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বহুদূর হইতে দলে দলে লোক এই সকল গৃহ দেখিতে আসিতে লাগিল।"[২৫]

ধনী-গৃহে বা চণ্ডীমণ্ডপে মেঝে থেকে উপরে তাকালে খড়ের চালের যে কর্কশতা চোখে পড়ে তা ঢাকার জন্য বিভিন্ন রঙের শরকাঠি (রূপসী কাঠি), বেতের চিলতে, ময়ূরপুচ্ছের সাদা ডাঁটি প্রভৃতির জ্যামিতিক ও ফুলকারি নক্সার অপরূপতা আলোচনা প্রসঙ্গে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উলা-বীরনগরের সৃজননাথ মুস্তৌফীর "উলার মুস্তৌফী বংশ' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন : 'এই গৃহের (উলার চণ্ডীমণ্ডপের) চালের ভিতরের দিকে সরু সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম বেতের কারুকার্য ছিল। তদ্ব্যতীত অভ্র ও ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রকের এবং রঙিন সরু বাঁশের শলা বা কাঠির দ্বারা নির্মিত চিকের আচ্ছাদন দ্বারা চালের ভিতরের দিকের খড় ঢাকা ছিল। ১২৭১ সালের আশ্বিন মাসের ঝড়ে চাল উড়িয়া যাওয়ায় ঐ সকল কারুকার্য নষ্ট হইয়াছে।"[২৬] ... অমিয় কুমার এপ্রসঙ্গে আরও জানিয়েছেন যে দুর্গাপূজার সময় লোকে দেবী দর্শন ভুলে

গিয়ে ছাদের কারুকাজের দিকেই তাকিয়ে থাকতো বলে নাকি পূজার সময় ঐ সব কারুকাজ চাঁদোয়া টাঙিয়ে ঢেকে দেওয়ার জন্য স্বপ্নাদেশ হয়।[২৭]

অতি ধনীদের ঘরই এ পর্যন্ত দেখা হল, দারিদ্র্যও কিন্তু ছিল অতিব্যাপক। সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি শ্লোকে দরিদ্রের কুঁড়েঘরের করুণ অবস্থার বর্ণনা আছে, শ্লোকটির শ্রদ্ধেয় নীহাররঞ্জন রায়-কৃত অনুবাদ হল : 'কাঠের খুঁটি নড়িতেছে, মাটির দেয়াল গলিযা পড়িতেছে, চালের খড় উড়িয়া যাইতেছে; কেঁচোর সন্ধানে নিরত ব্যাঙের দ্বারা আমার জীর্ণ গৃহ আকীর্ণ''[২৮]। বাংলার প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী লিখেছেন :

ঘরে নাই ধান চাল চালে নাই ছানি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি।।[২৯]

আদিপর্বের বাংলার, শ্রদ্ধেয় নীহাররঞ্জন লিখেছেন, "দরিদ্র নিম্নবিত্ত সমাজে সনাতন দুঃখ কষ্ট লাগিয়াই ছিল; 'হাঁড়িতে ভাত নাই, নিত্যই উপবাস, অথচ ব্যাঙের সংসার বাড়িয়াই চলিতেছে,' 'ক্ষুধায় শিশুদের চোখ ও পেট বসিয়া গিয়াছে, তাহাদের দেহ শবের মতো শীর্ণ', 'ভাঙা কলসীতে এককোঁটা মাত্র জল ধরে', 'পরিধানে জীর্ণ, ছিন্ন বস্ত্র, সেলাই করিবার মতো সূঁচও নাই ঘবে', 'ভাঙা কুঁড়েঘরের খুঁটি নড়িতেছে, চাল উড়িতেছে, মাটির দেয়াল গলিয়া পড়িতেছে'—এইসব ছবি সমসাময়িক সাহিত্যে দুর্লভ নয়।[৩০] বলা বাহুল্য গঙ্গা দিয়ে বহু জল বয়ে গেলেও বাংলার গরীব মানুষদের ছবি আদিকাল হতে অদ্যাবধি মৌলিক অর্থে তেমন বদলায়নি। বোঝাই যায় যে অমন শিল্পময় 'জুইতের ঘর' বানাতেন যাঁরা সেই সব শিল্পী—ছাপরবন-কামলা-ঘরামী—থাকতেন অতি হীন চালায় এবং কখনও কখনও খোলা আকাশের তলে। বাংলা প্রবাদে তাই দেখি 'ছাপরবনের টুই উদাম'।

বা, গৃহস্থের সুখ নেই
ঘরামীর ঘর নেই।[৩১]

অপিচ শিল্প ধনের অনুষঙ্গ নয় বা ধন শিল্পের অনিবার্য প্রাক্‌শর্ত নয়। ধন যেখানে শিল্পের শর্ত মানে বা শিল্পের অনুগত থাকে সেখানে বিরোধ বাধে না, কিন্তু ধন যেখানে আপন দম্ভে প্রকট হয় শিল্প সেখানে কুণ্ঠিত, লজ্জিত, শঙ্কিত ও শেষে লুপ্ত হয়। সাঁওতাল-পল্লীর সুস্নিগ্ধ ও সুনম্র শৈল্পিক অনুভবের সঙ্গে বহুকোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কিছু কিছু আধুনিক অট্ট-অট্টালিকার মহার্ঘ্য-কদর্যতার তুলনা করলেই বিষয়টি বেশ বোঝা যায়। যাই হোক, বাংলার পল্লীর 'সাধারণ' মাটির ঘরগুলি হতশ্রী বা শিল্প-বহিত ছিল না। মাটির দেয়ালের কাঁথ শুক্‌নো খটখটে হয়ে গেলে, দুদিকের অসমান অংশ ঝুরিয়ে নিয়ে, গৃহস্থের সামর্থ্য অনুসারে হত 'উলুটি', 'পাটুটি' বা 'তুলুটির' কাজ—এঁটেল পাঁকের সঙ্গে উলুখড়ের (যা সাধারণ খড়ের মত ফাঁপা নয়, নিরেট) কুচি মেশালে 'উলুটি', পাটের কুচি মেশালে 'পাটুটি' আর তুলোর কুচি মেশালে হয় 'তুলুটি'। দেওয়ালে এই মিশ্রণের প্রলেপ ভালভাবে লাগাবার পর কয়েকদিন অপেক্ষা করা হয়। ক্রমে প্রলেপটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে 'উসো' দিয়ে মেজে মসৃণ করা হয় দেয়াল। 'তুলুটি'তে তুলোর কুচির সঙ্গে সম্পন্ন গৃহস্থগণ একসময় রেড়ীর তেল মিশিয়ে

নিতেন—ফলে মাজার পর দেয়াল হত আরও মসৃণ, দক্ষ কারিগরের হাতে হলে নাকি পিঁপড়েও চলতে পারত না তার উপর দিয়ে। আবার কখনও কখনও কাঁথ গাঁথার সময়েই প্রধান কারিগর দেয়ালের দুদিক পাটা দিয়ে এমন সমান করে মেজে দিতেন যে আর প্রলেপ না দিলেও চলত। ছিটেবেড়ার দেয়াল হলে বেড়ার দুদিকে মাটির আস্তরণ লাগিয়ে তা শুকিয়ে গেলে তার উপর মসৃণ পাঁকের প্রলেপ দেওয়া হত। এরপর বাড়ির মেয়েরা গৃহ কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেই (মাটির/ ছিটেবেড়ার) দেয়ালে দেন দেয়াল-আলপনা বা আঁকেন দেয়ালচিত্র। দেয়াল ছেড়ে এই শিল্প ছড়িয়ে পড়ে নিকোনো উঠোনে, উঠোনের আলপনায়—এর মাধুর্য একদা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো মহান কবিকে বিমোহিত করেছিল :

আমি যত দূরেই যাই
আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে
নিকোনো উঠোনে
সারি সারি
লক্ষ্মীর পা
আমি যত দূরই যাই।।[২২]

যাই হোক বিভিন্ন ব্রত উপলক্ষ্যে মেয়েরা ঘরের মেঝে, বারান্দা, উঠোন, সরা, ঘট, হাঁড়ি, কলসী বা কুলাতে যে আলপনা আঁকেন, তার সঙ্গে দেয়াল-আলপনা বা দেয়ালচিত্রের পার্থক্য দুটি— ১. ব্রত অনুষ্ঠানিক, তাই ব্রত অনুষ্ঠানের পর এই আলপনা অর্থ হারায়, কিন্তু দেয়ালচিত্র যদিও বা পূজা-পরব উপলক্ষ্যে আঁকাও হয় তথাপি এর সৌন্দর্য বা অলঙ্করণের দিকটাই বড় এবং অনুষ্ঠান শেষেও তা তাৎপর্যমণ্ডিত থাকে; ২. দেয়ালচিত্র কিছুটা ভাস্কর্যলক্ষণযুক্ত এবং মৃৎফলকের সঙ্গে এর আত্মিক সম্পর্ক আছে। সামান্য উপকরণ থেকে নিজেরাই রং তৈরি করে (যেমন সিঁদুর বা ইটের গুঁড়ো থেকে লাল, কাঠকয়লা থেকে কালো, হলুদ থেকে হলদে বা শিউলি ফুলের বোঁটা থেকে কমলা রঙ), ছেঁড়া কাপড়ের ন্যাতা সেই রঙে চুবিয়ে, সেই ন্যাতার টানে মেয়েরা দেয়ালে আঁকেন নানা নক্‌শা। আবার কখনও বা দেয়ালে বেলেমাটি (সাদাটে রঙের জন্য বলা হয় দুধমাটি)-র প্রলেপ দিয়ে, সেই প্রলেপ ভিজে থাকতে থাকতে আঙুলের অবিশ্বাস্য দ্রুতগতির টানে আঁকা হয় নানা ছবি। দরজার উপরের দেয়ালে যেমন লেখা হয় "মা দুর্গার আগমন", "এসো মা লক্ষ্মী" "এলাহি ভরসা" প্রভৃতি হৃদয়মথিত বাক্য যার মৌল প্রেরণা হল বাড়ির সকলের জন্য মঙ্গলকামনা, যেমন দরজার মাথায় ও দু'পাশের দেয়ালে, পাঁচিলে, ধানের গোলায়, তুলসীমঞ্চে, গোয়ালঘরের দেয়ালে আঁকা হয় নানা ধর্মীয় প্রতীক, তেমনই আঁকা হয় লাতা-পাতা-ফুল-পাখি প্রভৃতির বিচিত্র শোভাযাত্রা যার সঙ্গে সম্পর্ক সৌন্দর্যবোধের, ধর্মের নয়। এক্ষেত্রে সাঁওতাল মেয়েদের কাজ বহুখ্যাত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঝাড়খণ্ড, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি মেয়েরাও দেয়ালচিত্র যথেষ্ট আঁকতেন একসময়, এখন কমে এসেছে, শুধু অসাঁওতালদের মধ্যে নয়, সাঁওতালদের মধ্যেও। আয়োজনে সামান্য হলেও বাংলার এইসব খড়ো (উচ্চফলনশীল

ধানের খড়ের প্রতিরোধ-ক্ষমতা কম হওয়ায় এখন টিন ক্রমশঃ একচেটিয়া হচ্ছে) চালের মাটির ঘরের শিল্পসুষমা যে কত অসামান্য তা আমাদের এই অক্ষম আলোচনা হতেও হয়ত কিছুটা অনুভব করা যাবে।

বাংলার খ'ড়ো ঘর এত প্রাকৃতিক বলেই এত সাধারণ, এত সাধারণ বলেই এত সহজ, এত সহজ বলেই এত সুন্দর। তাই আশ্চর্যের নয় যে প্রাচীনতম কাল হতে বাংলা কবিতায় খড়ো ঘরের চিত্রকল্প বারবার এসেছে। চর্যাপদের কবি হাজার বছর আগে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার সূক্ষ্ম অনুষঙ্গ ব্যাখ্যায় খড়ো ঘরের চালেব উপর বাঁকা চাঁদ ওঠার ও খড়ের চালে আগুন লাগার ছবি ব্যবহার করেন :

ডাহ ডোম্বী-ঘরে লাগেলি আগি।
সসহর লই বিঞ্চুহুঁ পানী।।
নউ খর জালা ধূম ণ দিশই।
মেরু-শিখর লই গঅণ পইসই।।[৬৩]

—পঙক্তিকটির পরমশ্রদ্ধাভাজন ড. সুকুমার সেন-কৃত আধুনিক বাংলা-রূপান্তর হল : 'ডোম্বী ঘবে দাহ, আগুন লাগিয়াছে। শশধর লইয়া জল সিঁচিতেছি। খরজ্বাল (অথবা খড়ের জ্বাল), ধূম—(কিছুই) দেখা যায় না। মেরুশিখর ধরিযা গগনে প্রবেশ করে'।[৬৪] আবার পঞ্চাশ সংখ্যাক চর্যায় আছে বাঁশেব চাঁচারী ব্যবহারের কথা :

চারি বাসে গড়িল রেঁ দিআঁ চঞ্চালী।[৬৪(ক)]

'ময়মনসিংহ গীতিকা'য় রয়েছে বাংলার গ্রাম ও খড়ো ঘরের অপরূপ উপস্থাপনা এবং সেই সঙ্গে বাংলাব কালরহিত গ্রামীণ জীবনেরও। 'কমলা' পালায় মানিক চাকলাদারের গ্রাম ও ঘর বাড়িব বর্ণনায় আছে :

হুলিয়া গেরাম ভাইরে দেখিতে সুন্দর।
বাগিজায় বেইড়া আছে যত সুন্দর ঘর।।
সেহিত গেরামে থাকে মানিক চাকলাদার।
ধনে জনে বাড়িয়াছে সম্পদ অপার।।
চৌচালা আটচালা তার ঘর যত খানি।
সুন্দি বেতে বান্দা আর উলুছনে ছানি।।
পাঁচ খণ্ড বাড়ী তার বিশ গোটা ঘর।
হাজারে বিজারে খাটে দাঙ্গর গাবর।।
খামারিয়া জমী তার আছে চল্লিশ কুড়া।
দশ গোটা হাতি আর তিরিশ গোটা ঘোড়া।।
বন্ধ ভইরা চড়ে তার যত দুধের গাই।
মইষ ছাগল মেড়া লেখাজুখা নাই।।
টাইল ভরা ধান আর গোয়াইল ভরা গরু।

বছরে বছরে বান্ধা এক পুরা সরু।।
হাজারে বিজারে লোক দিন রাইত খায়।
অতিথ আইলে কভু ফিরিয়া নাই সে যায়।।
ফকির-বৈষ্টম যদি হাক ছাড়ে দুয়ারে।
কাটায় মাপ্যা চাউল দেয় হরিষ অন্তরে।।[৩৫]

(শব্দার্থ: ১। দাঙ্গর গাবর—বলশালী ভৃত্য।। ২। টাইল—ধান, সরিষা প্রভৃতির জন্য বাঁশের পাত্র।। ৩।। সরু—তিল, সরিষা প্রভৃতি।। ৪। এক পুরা—এক গোলা।)

সুন্দি বেতে বাঁধা আর উলুছনে ছাওয়া চারচালা ও আটচালা ঘর। গোলা ভরা ধান, তিল, সর্ষে। দুধের জন্য প্রচুর গৃহপালিত পশু—বাঙালির চিবস্বপ্ন রূপ পেয়েছে এখানে।। আবার 'মলুয়া' পালার নবম পর্ব 'ভাগ্যচক্র পরিবর্তন'-এ দেওয়ান 'কুড়ি আড়া জমীন' লিখে দিলে বিনোদের দিন ফেরে কারণ বিনোদের আরও গুণ ছিল সে 'কামলার কাজ' ভাল জানত, ঝাপে বাঁশ বেতের সূক্ষ্ম শিল্পকাজে দক্ষ ছিল এবং মাছরাঙা পাখির পালক দিয়ে দারুণ ঘর সাজাতে পারত :

কামলার কাম বিনোদ তাও ভালা জানে।
ভালা কইরা বান্ধে বাড়ী সূত্যা নদীর কানে।।
আটচালা চৌচালা ঘর বান্ধিয়া সুন্দর।
ভালা কইরা বান্ধে বিনোদ বার দুয়াইরা ঘর।।
শীতল পাটি দিয়া বিনোদ ঘরের দিল বেড়া।
উলুছনে ছাইল চাল দেখতে মনহারা।।
ঝাপে ঝুপে করে বিনোদ কামলার কাম।
দেখিতে সুন্দর বাড়ী চান্দের সমান।।
মাছুয়াপক্ষীর পাখ দিয়া সাজুয়া বানায়।।
কামলা ডাকিয়া বিনোদ পুষ্কনি কাটায়।।[৩৬]

(শব্দার্থ· ১। কানে—ধারে/কাছে।। ২। সাজুয়া—সাজসজ্জা।।)

বিনোদ চাঁদের সমান সুন্দর ('দেখিতে সুন্দর বাড়ী চান্দের সমান') যে বারদুয়ারি বাড়ী বানালো, তা হ'ল সেই 'জুইতের ঘর' যা মহুয়া পালায় হুমরা বাইদ্যা খেলা দেখিয়ে রোজগার করে বানিয়েছিল উলুয়াকান্দা গ্রামে (পূর্বোদ্ধৃত 'নয়া বাড়ী লইয়া রে বাইদ্যা বানলো জুইতের ঘর')। আবার বিনোদের এই বারদুয়ারী ঘরই হল 'রূপবতী পালা'—র 'বার বাংলার ঘর' :

রাজ্য করে রাজচন্দ্র রামপুর সহরে।
বারবাংলার ঘর বান্‌ছে ফুলেশ্বরীর পারে।।[৩৭]

-বাউল গানে মানবদেহের রূপক হিসেবে বাংলার খ'ড়ো চালের মাটির ঘর বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণরূপে অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের প্রখ্যাত সংকলন হতে অনন্ত গোঁসাইয়ের একটি সুদীর্ঘ গানের কিছু অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে :

কে গড়েছে এমন ঘর, ধন্য কারিকর,
তার কারিকুরির বালিহারী,
সেই কারিকরের কোথায় ঘর,
ধন্য কারিকর।

ঘরের মূল তিনটি খুঁটি,
কি পরিপাটি,
দড়ি-দড়া, বাঁধাছাঁদা সাড়ে তিন কোটি।
ঘরের দরজা নয়খান,
সকলি প্রমাণ,
অসংখ্য জানালা আছে, কে করে সন্ধান,
সে ঘরের মাপ চৌদ্দপোয়া,
চৌদ্দ ভুবন তার ভিতর।
এক ঘরে কত কারখানা, ঘর বালাখানা
ঘরের ভিতর বৈঠকখানা, আর তোষাখানা,
আছে ফুলের বাগান, হাওয়াখানা,
মধ্যে দিব্য সরোবর।।

একথা মিথ্যা কভু নয়, ঘরের মাটি কথা কয়,
ঘরের ভিতর আগুন-জলে এক মিশালে বয়,
সেথা সাধু-চোরে, রাক্ষস-নরে, বিষামৃতে একত্তর।।
(ধন্য কারিকর)[৩৮]

বাউল অনন্ত গোঁসাই দেহতত্ত্বের রূপকার্থেই গেয়েছিলেন, কিন্তু আমরা জানি যে প্রত্যক্ষ অর্থেই "ঘরের মাটি কথা কয়"—অনন্ত গোসাঁইও তা আমাদের চেয়ে অনেক ভালভাবে জানতেন বলে অমনভাবে গেয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

মাটির বাড়ি ও মাটির ঘর বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আবেগ ও আগ্রহ প্রবাদ-প্রতিম। এর এক উৎস বঙ্গপ্রকৃতি, অন্য উৎস বাংলার খড়ো চালের মাটির ঘরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। বৈশিষ্ট্যটি হল এই যে, যতদিন মাটির ঘরটি থাকে ততদিন তা প্রকৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে থাকে এবং যখন থাকেনা তখন "ঘুমিয়ে পড়ার মতো" ঐ প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যায়। "শেষ সপ্তক"—এর চুয়াল্লিশ-সংখ্যক কবিতার প্রথম স্তবকেই রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলেছেন :

আমার শেষবেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে,
তার নাম দেব শ্যামলী।

ও যখন পড়বে ভেঙে
সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো
মাটির কোলে মিশবে মাটি;
ভাঙা থামে নালিশ উচু করে
বিরোধ করবে না ধরণীর সঙ্গে:
ফাটা দেয়ালের পাঁজর বের করে
তার মধ্যে বাঁধতে দেবে না মৃতদিনের প্রেতের বাসা।

কবির এই ইচ্ছার উৎসটি অসামান্যভাবে বিধৃত আছে এই কবিতাটিরই ষষ্ঠ স্তবকে :

চিরদিন মাটি আমাকে ডেকেছে
পদ্মার ভাঙনলাগা
খাড়া পাড়ির বনঝাউবনে,
গাঙশালিকের হাজার খোপের বাসায়;
সর্ষে-তিসির দুইরঙা খেতে
গ্রামের সরু বাঁকা পথের ধারে,
পুকুরের পাড়ির উপরে।
আমার দুচোখ ভরে
মাটি আমায় ডাক পাঠিয়েছে
শীতের ঘুঘুডাকা দুপুরবেলায়
রাঙা পথের ও পারে,
যেখানে শুকনো ঘাসের হলদে মাঠে
চরে বেড়ায় দুটি-চারটি গোরু
নিরুৎসুক আলস্যে.
লেজের ঘায়ে পিঠের মাছি তাড়িয়ে,
সেখানে সাথীবিহীন
তালগাছের মাথায়
সঙ্গ-উদাসীন নিভৃত চিলের বাসা।[১১]

রবীন্দ্রনাথের 'শেষ সপ্তক'—এর প্রথম কবিতাটি রচিত হয়েছিল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে এবং উপরোদ্ধৃত চুয়াল্লিশ সংখ্যক কবিতাটি রচিত হয় সম্ভবত ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু মাটির বাসা আগে হতেই রবীন্দ্রভাবনায় ছিল, যেমন, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'গীতালী' কাব্যের '২২' সংখ্যক রচনায় কবি অনুভব করেন বাংলার মাটির বাসায় কেউ যেন রাধিকার মত অপেক্ষায় বসে আছেন অনন্তকাল ধরে :

এই যে কলো মাটির বাসা
শ্যামল সুখের ধরা—
এইখানেতে আঁধাব আলোয়
স্বপনমাঝে চরা।
এরই গোপন হৃদয়-'পরে
ব্যথার স্বর্গ বিরাজ করে
দুঃখে আলো করা।

বিবহী তোব সেইখানে যে
একলা বসে থাকে—
হৃদয় তাহার ক্ষণে ক্ষণে
নামটি তোমার ডাকে।
দুঃখে যখন মিলন হবে
আনন্দলোক মিলবে তবে
সুধায় সুধায় ভবা।'[৪০]

আবার ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত একটি গানে রবীন্দ্রনাথ দেখেন মাটির ঘরের মাটির প্রদীপের আলো "প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো", আর তা "মায়েব প্রাণেব ভয়ের মতো দোলে" :

মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে,
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারি আলো দেখবে বলে।
সেই আলোটি নিমেষহত   প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মতো দোলে।
সেই আলোটি নেবে জ্বলে   শ্যামল ধরার হৃদয়তলে,
সেই আলোটি চপল হাওয়ায় ব্যথায় কাঁপে পলে পলে।
নামল সন্ধ্যাতারার বাণী   আকাশ হতে আশিস আনি,
অমরশিখা আকুল হল মর্ত্যশিখায় উঠতে জ্বলে।'[৪১]

মাটির ঘরেব মাটির প্রদীপের সুযমা এমনই হৃদয়াতুর যে 'অমরশিখা' 'মর্ত্যশিখায়' জ্বলে উঠতে ব্যাকুল হয়।

শুধু কাব্য-কবিতা নয়, রবীন্দ্র-অনুষঙ্গে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি মাটির ঘরের স্থাপত্য নিয়ে শান্তিনিকেতনে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা-মিরীক্ষা হয়েছে পরপর। এরই ফলে দেখা দেয় কালোবাড়ি, মৃন্ময়ী, গাছবাড়ি, শ্যামলী, তালধ্বজ, চৈতি প্রভৃতির মত মাটির স্থাপত্য। এই কাজে যুক্ত হয়েছিলেন নন্দলাল বসু ও রামকিংকর বেইজের মতো বহু গুণী মানুষ যেমন, তেমনই মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলমান কাবিগরগণ ও শান্তিনিকেতনের সীমাপবর্তী গ্রামসমূহের সাঁওতাল কারিগরগণ।

খড়ো চালের মাটির ঘরের প্রতি নাড়ির টান বাঙালীরা হয়ত এখনও বোধ করেন আর সে কারণেই বোধহয় একালের দিকপাল কবি অরুণ মিত্র আটচালার চুলোয় আঁচ দিতে বলেন, 'মাটি আঁকড়ে আছি' :

আমি গান ভরছি ধুলোয়
আমি আঁচ দিচ্ছি চুলোয়।
উড়তে উড়তে ধুলো
উঠেছে আটচালায়,
নিভতে নিভতে চুলো
ওই দ্যাখো ওই পালায়।

আমার দু'চোখ ছলোছলো
হায় কী করি কী করি
আচ্ছা তোমরা বলো
আমার গানও গেল ভাতও নিখোঁজ
মাথা কুটছি দুবেলা রোজ
ডক্ ডিকরি ডিকবি।

তবু ভাবছি আগামীকাল
পেট ভরাবে মিহিন চাল
পাতের পাশে ঘুরবে বিশটা মাছি,
গান জাগাবে মাঠের রাখাল
সুরের নাচানাচি
সেই আশাতে জাগর আমি
মাটি আঁকড়ে আছি।[৪২]

বাংলার খড়ো চালের মাটির ঘর দেখে অজ্ঞাত ছড়াকারের মনে হয়েছিল, 'চালে দুই গাছ ছন' আর 'লট্‌কি লট্‌কি বাতাস' মন উড়িয়ে নিত। ময়মনসিংহ গীতিকার লোককবির মনে হয়েছিল, 'দেখিতে সুন্দর বাড়ী চান্দের সমান।' এই সৌসাদৃশ্য শুধু 'কোর' বা 'রাগ' বা 'জুইত' দেওয়া বাঁকানো চালের সঙ্গে কাস্তের মত বাঁকা চাঁদের আকারের মিলে সীমাবদ্ধ নয়, খাল-বিল-পুকুর-জলা জঙ্গল-মাঠ-ক্ষেত-গাছপালা-ঘরবাড়ি সবকিছু নিয়ে তাবৎ বঙ্গপ্রকৃতির চন্দ্রশোভায় বিস্তৃত। বাউল তাই বিস্ময়ে গেয়ে ওঠেন :

গুরু কণ্ড শুনি সারাৎসার
কোন কামলায় বানাইছে ঘর এমন চমৎকার।।[৪৩]

এই বিস্ময়ই বেদনা-নিবিড় হয়ে ধরা দেয় আধুনিকোত্তম কবি জীবনানন্দ দাশের অনুপম রচনায় :

বলিল অশ্বত্থ সেই

বলিল অশ্বত্থ ধীরে : 'কোন্ দিকে যাবে বলো—
তোমরা কোথায় যেতে চাও?
এতদিন পাশাপাশি ছিলে, আহা, ছিলে কত কাছে :
ম্লান খোড়ো ঘরগুলো—আজও তো দাঁড়ায়ে তারা আছে;
এই সব গৃহ মাঠ ছেড়ে দিয়ে কোন্ দিকে কোন পথে ফের
তোমরা যেতেছ চলে পাইনাকো টের!
বোঁচকা বেঁধেছ ঢের,—ভোলো নাই ভাঙা বাটি ফুটা ঘটিটাও,
আবার কোথায় যেতে চাও?
'পঞ্চাশ বছরও হায় হয়নিকো—এই-তো সেদিন
তোমাদের পিতামহ, বাবা, খুড়ো, জেঠামশায়
—আজও, আহা, তাহাদের কথা মনে হয়!—
এখানে মাঠের পারে জমি কিনে খোড়ো ঘর তুলে
এই দেশে এই পথে এই সব ঘাস ধান নিম জামরুলে
জীবনের ক্লান্তি ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষার বেদনার শুধেছিল ঋণ;
দাঁড়ায়ে-দাঁড়ায়ে সব দেখেছি যে,—মনে হয় যেন সেই দিন!
'এখানে তোমরা তবু থাকিবে না? যাবে চলে তবে কোন্ পথে?
সেই পথে আরও শান্তি—আরও বুঝি সাধ?
আরও বুঝি জীবনের গভীর আস্বাদ?
তোমরা সেখানে গিয়ে তাই বুঝি বেঁধে রবে আকাঙ্ক্ষার ঘর!...
যেখানেই যাও চলে, হয়নাকো জীবনের কোনো রূপান্তর;
এক ক্ষুধা এক স্বপ্ন এক ব্যথা বিচ্ছেদের কাহিনী ধূসর
ম্লান চুলে দেখা দেবে যেখানেই বাঁধো গিয়ে আকাঙ্ক্ষার ঘর!'
—বলিল অশ্বত্থ সেই নড়ে-নড়ে অন্ধকারে মাথার উপর।[৪৪]

সূত্র-নির্দেশ :

১। ভবতারণ দত্ত-সংকলিত 'বাংলার ছড়া' (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৭) পৃ: ১৫০, ছড়াসংখ্যা ২৮৯।

২। 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি', পঃ বঃ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', দশম খণ্ড, পৃ: ৪০।

৩। Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary (1994). পৃ: 197-এ আছে : Bunglow : noun. 1. a cottage. 2. (in India) a one-storied thatched or tiled house. Usually surrounded by a veranda [<Hindi bangla lit., of Bengal] একইভাবে The New Oxford Encyclopedic Dictionary (1987). Vol. 1. পৃ: 206-এ আছে: Bunglow. One-storied house, bungaloid. adj,. of or resembling bunglow (s). [Hind. Bangla of Bengal.]

৪। 'রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত', হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য-রত্ন সম্পাদিত এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত, সাহিত্য সংসদ, ২০০২।।

৫। ঐ। সুন্দরাকাণ্ড। হনুমানের সীতা অন্বেষণ। পৃ : ২১১।

৬। ঐ। হনুমান কর্তৃক লঙ্কা দাহন। পৃ : ২২৬।

৭। প্রচলিত লোকছড়া, দেখুন, "প্রবাদ-প্রবচনে গ্রামীণ বাস্তু", দীপকরঞ্জন দাস, 'কৌশিকী' (তারাপদ সাঁতরা-সম্পাদিত), পুস্তক বিপণি, ২০০৪, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৩০৮ এবং 'বাংলার কুটির' (সেন্টার ফর আর্কিয়োলজিক্যাল স্টাডিজ অ্যাণ্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া, ২০০১) পৃ : ১৪৮।.

৮। প্রাগুক্ত 'কৌশিকী' পৃ : ৩০৭ ও 'বাংলার কুটির' পৃ : ১৪৫-১৪৬।

৯। প্রাগুক্ত 'বাংলার কুটির', পৃ : ১৭১।

১০। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', পঃ বঃ সরকার, চতুর্থ খণ্ড, 'গান', পৃ : ৪৭৬।

১১। প্রাগুণ্ড 'কৌশিকী' পৃ : ৩০৮ এবং 'বাংলার কুটির' পৃ : ১৪৮।

১২-১৩। প্রাগুক্ত 'কৌশিকী' পৃ : ৩০৮ এবং 'বাংলার কুটির' পৃ : ১৪৭।

১৪। 'চালা শৈলীর ঐতিহ্য', প্রাগুক্ত 'বাংলার কুটির', পৃ : ১৪২।

১৫। কামিনী কুমার রায়, 'লৌকিক শব্দকোষ', প্রাগুক্ত 'বাংলার কুটির', পৃ : ১৭০।

১৬। ঐ। পৃ : ১৭৬।

১৭। দীপকরঞ্জন দাস, প্রাগুক্ত 'কৌশিকী' পৃ : ৩০৮ এবং 'বাংলার কুটির' পৃ : ১৪৮।

১৮। কামিনী কুমার রায়, প্রাগুক্ত 'লৌকিক শব্দকোষ' প্রাগুক্ত 'বাংলার কুটির', পৃ : ১৭৫।

১৯। ঐ। পৃ : ১৭৪।

২০। সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ময়মনসিংহ-গীতিকা', ভারতী বুক স্টল, ১৯৯৯ সংস্করণ, পৃ : ৬।

২১। ঐ। পৃ : ঐ

২২। ঐ। পৃ : ১৪৭।

২৩। দীনেশচন্দ্র সেন, 'বৃহৎ বঙ্গ', প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯ পুনর্মুদ্রণ (প্রথম প্রকাশ, ১৯৩৫), পৃ : ৫৫৮-৫৬৪

২৪। ঐ, পৃ : ৫৬৩।

২৫। 'মাটির বাড়ি' প্রাগুক্ত 'বাংলার কুটির', পৃ : ১২৮।

২৭। ঐ

২৮। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', আদিপর্ব, দে'জ ১৪০২ পুনর্মুদ্রণ, পৃ : ৪৫৬। নীহাররঞ্জন কর্তৃক উদ্ধৃত শ্লোকটি হল:

চলৎ কাষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণ সঞ্চয়ম।

গণ্ডুপদার্থিমণ্ডুকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম।।

২৯। চন্দ্রাবতী হলেন অন্যতম 'মনসামঙ্গল' রচয়িতা বংশীদাস (চক্রবর্তী)-এর কন্যা। পণ্ডিত অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ('বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পর্ব, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ২০০২-২০০৩ পুনর্মদ্রণ. পৃ . ৪৪৯) লিখেছেন : ''আমবা বংশীদাসকে নানা প্রমাণের বলে সপ্তদশ শতাব্দীর কবি বলিয়া স্থিব কবিয়াছি। সুতরাং তাহার কন্যাও ঐ একই সময়ে বা কিছু পরে আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন।'' চন্দ্রাবতী-ই বাংলা সহিত্যের প্রথম মহিলা কবি। মেয়েলি ছড়ায় চন্দ্রাবতীর রামায়ণ ভালো কাজ—দুর্ভাগ্যবশতঃ তা খণ্ডিতভাবে পাওয়া গেছে।

৩০। প্রাগুক্ত 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', পৃ : ৪৬৮।

৩১। দীপকরঞ্জন দাস কর্তক সংকলিত। প্রাগুক্ত 'কৌশিকী' পৃ · ৩০৯ এবং 'বাংলার কুটির', পৃ : ১৪৯।

৩২। 'যত দূরেই যাই', 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা', দে'জ, ১৯৯৮, নবম সংস্করণ, পৃ . ৬৭-

৩৩। 'চর্যাগীতি পদাবলী', সুকুমার সেন, আনন্দ, ২০০২ মুদ্রণ, পৃ : ৭৬। পদ, ৪৭।

৩৪। ঐ। পৃ : ১৪৯।

৩৪। (ক) ঐ। পৃ · ৭৭।

৩৫। 'ময়মনসিংহ গীতিকা', প্রাগুক্ত, পৃ : ১৭১-১৭২।

৩৬। ঐ। পৃ : ৫২-৫৩।

৩৭। ঐ। পৃ : ২৬৪।

৩৮। 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৮, পৃ : ৮০১, গান- সংখ্যা ৩৬৯। অনন্ত গোঁসাই সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন: ''অনন্তের দীর্ঘ' কয়েকটি গান বাংলার বাউল-মহলে বিশেষ পরিচিত। অনন্ত কোথাকার লোক, তাহা জানিতে পারি নাই। তবে রচনা-রীতি ও দীর্ঘ সাঙ্গরূপক ব্যবহারদৃষ্টে মনে হয়, ইনি খুব সম্ভব রাঢ়ের বাউল।''

৩৯। পঃ বঃ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-বচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, পৃ : ২১৪-২১৬।

৪০। ঐ। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ : ৩৭৬।

৪১। ঐ। চতুর্থ খণ্ড। গান ১০৮০, বিচিত্র, পৃ : ৪৩৬।

৪২। 'অরুণ মিত্রের শেষ্ঠ কবিতা', দে'জ ২০০২ মুদ্রণ, পৃ : ১৬৮।

৪৩। 'বাংলার বাউল-ফকির', সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত। পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯, পৃ : ১১৮।

৪৪। জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র, ভারবি, পুনর্মুদ্রণ ২০০৪, পৃ. ২৩৩-৩৪।

২
প্রেক্ষিত

"বাংলাদেশের মন্দির রচনার ইতিহাস ধরিতে গেলে, দেড় সহস্র বৎসরেরও অধিক। এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অনেক উত্থান-পতন ঘটিয়াছে—ভাঙ্গিয়াছে গড়িয়াছে। জাতীয় জীবনের সামগ্রিক কর্মপ্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে মন্দিরগুলি নির্মিত হইয়াছিল, তাই বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসেব অনেক সাক্ষ্যই বাংলার মন্দিরগুলির অঙ্গে লিপ্ত হইয়া আছে। কিন্তু এই অমূল্য সাক্ষ্য-সম্পদ বাঙালীর ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই।"

—হিতেশরঞ্জন সান্যাল,*

গোড়ার কথা

একসময় আর্যভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলির কাছে বাংলা ছিল অবজ্ঞার স্থান। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ, মগধ ও চের দেশবাসিদের রূঢ় ব্যবহার এবং অতিরিক্ত বাচ্চা-কাচ্চা জন্ম দেওয়ার জন্য কাক, চড়াই (চটক) আর পায়রার সদৃশ বলা হয়েছে[১]। 'মনুসংহিতা'-য় আছে যে বাংলাদেশে ক্ষত্রিয়রা শূদ্রত্ব ('বৃষলত্ব') প্রাপ্ত হয়[২]। বৌধায়ন সূত্রে বলা হয়েছে যে বঙ্গ প্রভৃতি দেশে গেলে বিশেষ যজ্ঞ করে শুদ্ধ হতে হবে[৩]। অন্যদিকে অনতিদূরবর্তী অতীতেও প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে বাংলা ছিল 'অজ্ঞাত ভূমি' ('terra incognita'). কিন্তু স্বাধীনোত্তর কালের উৎখননে দেখা গেছে যে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের মতই পশ্চিমবঙ্গও প্রত্নসম্পদে সমৃদ্ধ এবং এখানেও আদি-ইতিহাস (proto-history, prehistory) কাল থেকে ইতিহাস-কালের দিকে মানুষের অগ্রগতির প্রমাণাদি রয়েছে[৪]। বস্তুত পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত তাম্রপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল বাংলায় আর্যভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলি আসার বহু আগেই, এবং এব সাথে মধ্য গঙ্গা উপত্যকা ও দাক্ষিণাত্যের তাম্রপ্রস্তব সংস্কৃতির মিলও অনেক[৫]। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা চলে যে পশ্চিমবাংলায় উৎখনিত মুখ্য কটি তাম্রপ্রস্তর-সংস্কৃতি কেন্দ্রের বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্ধারিত আদি সময়কাল এইরকম ঃ ভরতপুর (বর্ধমান) ১৪৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ, মহিষদল (বীরভূম) ১২৮৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ, পাণ্ডুরাজার ঢিবি (বর্ধমান) ১১৮০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ, বাহিরি ও হাত্তিগ্রা ১০০০-৯০০ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দ, বাণেশ্বরডাঙ্গা ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ[৬]। বলাবাহুল্য সময় কালগুলি দু/ একশো বছর আগে-পরে হতে পারে, তবে উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলিই সব নয়, প্রকৃতপক্ষে বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার আরও অন্তত ৭৬ টি জায়গায় তাম্রপ্রস্তর যুগীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে[৭]—এই স্থানগুলিব মধ্যে আছে মঙ্গলকোট, তমলুক, ডিহর, নানুর, হারাইপুর প্রভৃতি।

---

* 'বাংলার মন্দির' আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'সমকালীন নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন', ৪র্থ খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, ১৪১৩, পৃ : ১৩

মঙ্গলকোটে খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে লোহা ব্যবহার করে এই রকম কোনও জনগোষ্ঠী তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির অন্ত ঘটায় এবং তা, পান্ডুরাজার ঢিবি ও বাণেশ্বরডাঙ্গায় মাটির নিচে ঐ সময়কালের স্তরে লোহার তরবারি পাওয়া থেকে মনে হয়, জোর করে। কিন্তু উৎখননে প্রমাণিত হয় যে এর পরেও আদি মধ্যযুগ (যেমন, পাণ্ডুরাজার ঢিবি), এমনকি মধ্যযুগ (যেমন, মঙ্গলকোট) পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক সংস্কৃতি অব্যাহত ছিল।

অতি সুদূর তাম্রপ্রস্তর যুগ হতে যেসব ইঙ্গিত মেলে সেগুলিই, কিছুটা হলেও, বুঝতে সাহায্য করে বাংলার আদি 'নগর' বা নগর-সংস্কৃতি যা ভিন্ন উন্নত মন্দির-স্থাপত্যের (যেমন, খনা-মিহিরের ঢিপি) কথা ভাবা অসম্ভব। 'নগর' শব্দটির সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ ও তর্ক আছে, অপিচ, নগরের দুটি প্রাকশর্ত মনে হয় অপরিহার্য : (১) একাধিক সংস্কৃতির অবস্থান (যেমন, বর্তমান বাংলাদেশের মহাস্থান) এবং একটি সংস্কৃতির কেন্দ্র মাত্র নয় (যেমন, বাংলাদেশেরই পাহাড়পুর); (২) অন্যান্য নগরের, কখনও কখনও বিদেশেরও সঙ্গে, বাণিজ্য সম্পর্ক। এই মাপকাঠিতে খ্রিষ্টজন্মের ৬০০ বছর আগে (যে সময়ে আর্যাবর্তে 'ষোড়শ মহাজনপদ' দেখা দিয়েছিল) বা তারও আগে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল ও দক্ষিণের নিম্নভূমিতে আদি স্তরের হলেও কৃষি ও কৃষি-বাণিজ্য ভিত্তিক এক ধরণের 'নগর'-সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার চন্দ্রকেতুগড়ে ঐ সময়ে 'নগর' গড়ে ওঠা শুরু হয় এমন ভাবার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ এখন দেখা যাচ্ছে। একই সঙ্গে এমনটা ভাবার অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য যুক্তিও এখন যথেষ্ট যে চন্দ্রকেতুগড় এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলই হল প্রাচীন 'গঙ্গে।'[৯] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই 'গঙ্গে' হল মেগাস্থিনিস কথিত 'গঙ্গারিডি' ও খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জনৈক গ্রীক নাবিক রচিত The Periplus of the Erythraean Sea- কথিত 'গঙ্গে' বা 'গঙ্গারেজিয়া'[১০]। যাই হোক প্রচীন বাংলার আদি নগর-সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলির কালানুক্রমিক বিবরণ নির্মাণের সময় না হলেও এটুকু এখন বোঝা যাচ্ছে যে ঐতিহাসিক কালের নগরায়নের দুটি পর্যায় ছিল : (১) প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরায়ন (আনু. খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ থেকে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ এবং (২) আদি মধ্যযুগ (৬০০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ)[১১] উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল : বানগড়, মহাস্থান, কর্ণসুবর্ণ, কোটাসুর, পাখন্না (শুশনিয়া পাহাড়ের খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকের লিপিতে কথিত পুষ্করণা), মঙ্গলকোট, চন্দ্রকেতুগড় এবং তাম্রলিপ্তি[১২]।

সব মিলিয়ে একথা বলার মধ্যে তেমন ঝুঁকি এখন আর নেই যে, প্রাক-মৌর্য কালেই বাংলায় যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী তাম্রপ্রস্তরযুগীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, মৌর্যযুগে এই ধারাই উত্তর ভারতীয় তথা সর্বভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরও বলশালী হয়।

লিখিত সাহিত্যে যেসব তথ্য মেলে সেগুলি প্রমাণ বা অপ্রমাণ করে প্রত্নতত্ত্ব—আলোচনার শুরুতে ধ্রুপদী সাহিত্য হতে বাংলা ও বাঙালীর প্রতি অবজ্ঞাসূচক যে বিবৃতিগুলি উদ্ধার করা হয়েছে, প্রত্নতত্ত্ব সেগুলিকে সমর্থন করে না।

আমরা উপরের কথাগুলি স্মরণ করলাম দুটি কারণে : (১) একটি দীর্ঘকালীন ও সমৃদ্ধিশালী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ভিন্ন বৈগ্রাম, মহাস্থান, গোকুল, পাহাড়পুর (বাংলাদেশ), খনা-মিহিরের ঢিপি,

ভরতপুর, জগজীবনপুর প্রভৃতি অঞ্চলের উৎখননে যে স্থাপত্যের নিদর্শন মিলেছে তার, কিম্বা বরাকর, দেউলি, সাতদেউলিয়া, বহুলাড়া, হাড়মাসড়া, জটা প্রভৃতি স্থানে যেসব প্রাচীন মন্দির এখনো দাঁড়িয়ে আছে, তাদের, ব্যাখ্যা হয় না; (২) মৌর্য যুগ থেকেই যে বাংলার সংস্কৃতি, এবং সেই সুবাদে বাংলার মন্দিরও সর্বভারতীয় সংস্কৃতি ও মন্দির কলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল, তা স্মরণ করা।

জৈন সমস্যা

এখন এই তথ্যটি একেবারেই সাধারণ জ্ঞান যে বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ভাল সংখ্যায় জৈন মূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিতত্ত্ববিদ্যায় যাঁরা পারঙ্গম, সেইসব পণ্ডিত গণের ভাষ্য অনুসারে এগুলির সময় খ্রীষ্টজন্মের আগে হতে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক। অন্যদিকে বর্ধমান জেলার সাতদেউলিয়ার সুউচ্চ জৈন দেউল, বাঁকুড়া জেলার হাড়মাসড়া ও দেউলভিড়্যা (তালডাংরা) বা পুরুলিয়ার দেউলি (সুইসা)-র অষ্টম-নবম শতকীয় জৈন দেউলগুলি (দেউলির পঞ্চায়তনটি আরও আগেকার হতে পারে) ও পশ্চিম মেদিনীপুরের ডাইনটিকরির জৈন দেউলটি (দ্বাদশ শতক) আজও দাঁড়িয়ে আছে, বাঁকুড়ার বহুলাড়ার সুউচ্চ দেউলটি (নবম শতক), যেটি বর্তমানে সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দির, হয়ত আদিতে জৈন মন্দির ছিল, একই কথা বলা যায় বাঁকুড়ারই অম্বিকানগরের অম্বিকা মন্দিরের পিছনে থাকা (নবম-দশম শতকীয়) বর্তমানে শিবের ছোট দেউলটির সম্পর্কে ও পুরুলিয়ার পাকবিড়্ড়ার এখনও টিকে থাকা তিনিটি অতি প্রাচীন জৈন মন্দির সম্পর্কে। এ ছাড়াও বেশ কটি অতি প্রাচীন জৈন মন্দিরের একদা গৌরবময় অস্তিত্বের প্রমাণ মিলেছে। অন্যদিকে বাঁকুড়ার ধরাপাটের দেউলের পশ্চিম ও উত্তর দেয়ালে দুটি বড় মাপের জৈন মূর্তি আছে, এবং ঐ মন্দির ঘেঁষে চলা রাস্তার ওপারে, দেউলটির ঠিক বিপরীতে, একটি দালানে একটি নাগছত্রধারী পার্শ্বনাথ মূর্তি মনসা-জ্ঞানে পূজিত হচ্ছে— প্রায় চার ফুট দীর্ঘ এই জৈন মূর্তিটি হয়ত আদিতে ছিল দেউলটির পূর্বদিকের দেয়ালে যেখানে এখন একটি বাসুদেব মূর্তি আছে—এ হয়ত জৈন দেউলকে শ্যামচাঁদের মন্দিরে (উত্তর দেয়ালের দিগম্বর জৈন আদিনাথের মূর্তির কল্যানে গ্রামবাসীরা একে 'ন্যাংটা শ্যামচাঁদের দেউল' বলেন) রূপান্তরের ইঙ্গিতবাহী। তালডাংরা থানার দেউলভিড়্যার উল্লেখিত জৈন দেউলটিরও অদূরে একটি ভগ্ন-নাসিকা জৈন মূর্তি 'খাঁদুরাণি' নামে লৌকিক দেবীরূপে পূজিত হচ্ছে, বাঁকুড়ার কোতুলপুরের কাছে সনাদা গ্রামে (যেখানে পাওয়া জৈন মূর্তি বহু) ভুবনেশ্বর শিবের দেউলের পথে একটি বিশাল পুকুরের পাড়ে একটি দালানে দুটি বৃহৎ জৈন মূর্তি সাড়ম্বরে যথাক্রমে মাতৃকা ও বরাহ অবতার রূপে পূজিত হচ্ছে। বাঁকুড়ার আটবাইচণ্ডী ও বর্ধমানের কল্যানেশ্বরীর কঙ্কালসার ভয়ংকরী চামুণ্ডা মূর্তি দুটিও হয়ত আদিতে জৈন মূর্তি। প্রকৃতপক্ষে প্রায় সমগ্র রাঢ়বঙ্গের অনেক গ্রামেই প্রাচীন জৈন মূর্তি নানা লৌকিক বা ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী রূপে পূজিত হচ্ছে। আবার, পুরুলিয়ার পাক-বিড়্ড়ার উল্লেখিত মন্দিরক্ষেত্রে একটি দালানে ঐ অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাচীন জৈন মূর্তি ও ভাস্কর্যের বিস্ময়কর সংগ্রহ রক্ষিত আছে। অনতিদূরে টুইসামাতেও একটি ভগ্ন জৈন দেউল আছে। আচার্য বিনয় ঘোষ পুরুলিয়ার হড়া গ্রামে তাঁর দেখা জৈন মন্দির

ও বেশ কটি জৈন মূর্তির উল্লেখ করেছেন।[১৩] তাঁর অনেক আগে বেগলার বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় তাঁর দেখা অনেক জৈন মন্দির ও মূর্তির উল্লেখ করেছেন।[১৪]

অন্যদিকে মঙ্গলকোটের উৎখননে কুষাণ-স্তর হতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির নিগমেশ মূর্তি প্রমাণ করে যে খ্রীষ্টজন্মের আগেই জৈন ধর্ম ঐ অঞ্চলের গণ-স্তরকে স্পর্শ করে ছিল।[১৫] ফরাক্কার মতো বাণিজ্যপথের দিক হতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রাপ্ত মৌর্য-শুঙ্গ কালের (আনু ৩১৩-১৫১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) একটি পোড়া মাটির জৈন উৎসর্গ ফলকও গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দেয়।[১৬] আমরা দেখেছি যে ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের বা বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম উদ্ভবের আগে রাঢ়বঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী তাম্রপ্রস্তর যুগীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এবং এখানকার অধিবাসীদের তামার ব্যবহার জানা তো ছিলই, আদি বা প্রাথমিক ধরণের লোহার ব্যবহারও জানা ছিল, পরন্তু মঙ্গলকোটের উৎখননে প্রমাণিত হয়েছে কৃষিভিত্তিক এই 'আদি নগর'গুলি একটি আন্ত-আঞ্চলিক ও আন্তরাজ্য সম্পর্কও গড়ে তুলেছিল।[১৭] এ প্রসঙ্গে দুটি তথ্য স্মরণীয়: (১) লোহার ব্যবহার কিছু কাল আগেও যতটা মনে করা হত, তার চেয়ে প্রাচীন, এবং (২) সাঁওতালডাঙ্গা, মঙ্গলকোট, বাণেশ্বরডাঙ্গা মহিষদল, হারাইপুর, বাহিরি, হাত্তিগ্রা এবং পাণ্ডুরাজার ঢিবির তাম্রপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতি-কেন্দ্রগুলি পরস্পরের থেকে খুব দূরবর্তী নয়।

যাই হোক, মূল কেন্দ্র সমেত শিখর (হাজারীবাগের পরেশনাথ পাহাড়, ২৪ জন তীর্থংকরের ২০ জন এখানে সিদ্ধিলাভ করেন বলে জৈনদের বিশ্বাস) থেকে অরণ্য পেরিয়ে দ্বারকেশ্বর, কাঁসাই, শিলাবতীর নদী-রেখা ধরে রাঢ়ভূমি পর্যন্ত বাণিজ্য-পথ গড়ে উঠেছিল বলে অনেকের অনুমান। জৈনগ্রন্থ 'আচারঙ্গ সূত্র' (খ্রীষ্টিয় ১ম/২য় শতক) অনুসারে মহাবীর কয়েকজন শিষ্যের সঙ্গে 'লাঢ় (রাঢ়) দেশের সুবভভূমি (সুক্ষ্মভূমি) এবং বজ্জভূমির (বজ্রভূমির) জনপথহীন অঞ্চলে ভ্রমণ করেন' কিন্তু রাঢ়দেশের রূঢ় অধিবাসীগণ তাঁদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে, কুকুর লেলিয়ে দেয়; অর্থাৎ রাঢ়ের লোকেরা ছিল অসভ্য এবং বুনো (ইঙ্গিতটা হল, জৈন সাধুরা তাদের 'সভ্য' করেন)। যদি মহাবীর এসে থাকেন, তবে খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ তে রাঢ়ভূমির যে সব 'নগরে' ইতোমধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী তাম্রপ্রস্তরযুগীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল সেই সব অঞ্চলে তৎকালে প্রচলিত বাণিজ্য পথ ধরেই এসেছিলেন। সুতরাং 'আচারঙ্গ সূত্রে'র বয়ানটি যথার্থ নয় এবং এ কথাও যথার্থ নয় যে জৈনরাই আরণ্যক রাঢ়ভূমিতে প্রথম সভ্যতার আলো জ্বালেন[১৮]।

অপিচ, খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ১০০-র মধ্যে জৈন সাধুরা রাঢ়-ভূমিতে যে এসেছিলেন, তারপরে হয়ত যে ১২/১৩ শতক অবাধ স্থায়ীভাবে অবস্থান করেছিলেন, জৈন মঠ মন্দির-মূর্তি প্রভৃতি নির্মাণে প্রভূত অর্থ সম্পদেরও যে বিনিয়োগ হত— ঐ অঞ্চলে পাওয়া মূর্তিগুলি এবং এখনও দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন জৈন দেউলকটি তার যথেষ্ট প্রমাণ , কিন্তু সেগুলির প্রতিষ্ঠাতা ও নির্মাতাদের পরিচয়, তাদের অর্থনৈতিক-সাংগঠনিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা, স্থানীয় শাসক বা অধিপতিদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক, মন্দির বা মূর্তিগুলি সম্পর্কে স্থানীয় মানুষদের মনোভাব এবং সর্বোপরি তাঁদের লুপ্ত, অদৃশ্য ও সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়ার কারণ—এইসব বিষয়ে আমাদের জ্ঞান আজও শূন্য।

প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য অনুসারে প্রাচীন বাংলার উত্তর অংশে বৌদ্ধ প্রাধান্য ছিল, রাঢ়ে জৈন (স্মরণীয় যে সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে একটিও পাল লেখ পাওয়া যায়নি)। বাঙালিদের সংস্কৃতিতে জৈন উপাদানও যথেষ্ট—কিন্তু তার স্বরূপ জানতে আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে।

বৌদ্ধ সম্পর্ক

প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধদের সম্পর্কে প্রামাণ্য পুস্তক-প্রবন্ধ অনেক, এখানে তার পুনরাবৃত্তির মানে হয় না। আমরা অনুক্রম বজায় রাখতে শুধু বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে থাকা প্রাচীন বৌদ্ধ স্থাপত্যগুলির মধ্যে মাত্র চারটির উল্লেখমাত্র করব। বাংলার প্রাচীন জৈন দেউল, সংখ্যায় গুটি কয় হলেও, আজও মাটির উপরে দাঁড়িয়ে আছে; প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ স্থাপত্যের অবশেষ যা কিছু মিলেছে সবই মাটি খুঁড়ে, তা-ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শুধু ভিতটুকু, এ হতে কিছু অনুমান হয়ত করা যায়, জোর দিয়ে কিছুই বলা যায় না। (অবিভক্ত) উত্তরবঙ্গ বৌদ্ধ-প্রধান হলেও যেমন বাণগড়ে (কোটিবর্ষ, দেবীকোট) জৈন নিদর্শন মিলেছে, তেমনই বাঢ়ভূমি জৈন প্রধান হলেও বর্ধমান জেলার পানাগড়ের কাছে ভরতপুরের এবং ভাতার থানার বড়বেলুনের কাছে বাণেশ্বরডাঙ্গার উৎখননে অনুমানিক অষ্টম ও নবম শতকীয় বৌদ্ধস্তূপের সন্ধান মিলেছে। সুপ্রাচীন প্রত্নক্ষেত্র ভরতপুরের চতুর্থ বা সর্বশেষ স্তরে একটি পঞ্চরথ, ১২.৭৫ × ১২.৭৫ মিটার আয়তনের বর্গাকার বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে, এর বৃহৎ কুলুঙ্গিতে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় একটি বড় বুদ্ধমূর্তিও পাওয়া গেছে, সব মিলিয়ে এগারোটি বুদ্ধমূর্তি এখানে মিলেছে, স্তূপটিব নির্মাণকাল আনুমানিক অষ্টম-নবম শতক।[১৯] বাণেশ্বর ডাঙ্গার উৎখননে পরবর্তী গুপ্ত হতে পালযুগীয় স্তরে ভরতপুরের মতই একটি পঞ্চরথ বৌদ্ধস্তূপের অস্তিত্বের প্রমাণ (শুধুমাত্র ভিতটুকু) মিলেছে—এটি আনুমানিক নবম শতকীয়।[২০]

১৯৮৭-ব ১৩ই মার্চে মালদহ জেলার হবিবপুর থানার জগজীবনপুরের একটি ঢিপি হতে হঠাৎ পাওয়া একটি তাম্রপট্টোলির পাঠোদ্ধার[২১] হলে দেখা যায় দেবপালের পুত্র মহারাজাধিরাজ মহেন্দ্রপালদেব তাঁর রাজত্বের সপ্তম বৎসরে (আনু. ৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) সেনাপতি বজ্রদেবকে নন্দদীর্ঘিকা উদ্রঙ্গে একটি বৌদ্ধ মঠ ও বিহার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে চিরকালের জন্য জমি দান করছেন। পরে ঐ স্থানে পাওয়া একটি টেরাকোটা নামমুদ্রার দেবলা মিত্র কৃত পাঠে[২২] বিষয়টি সমর্থিত হয়। তাম্রপট্টোলিটির তাৎপর্য বিষয়ে গৌতম সেনগুপ্ত লিখেছেন: (পাল) "বংশের রাজবৃত্তে একটি নতুন নাম সংযোজিত হল—মহেন্দ্রপাল। বহুদিন যাবত পণ্ডিতেরা এই মহেন্দ্রপালকে গুর্জর-প্রতিহার বংশের সমনামা আর এক রাজার সঙ্গে অভিন্ন মনে করে পূর্বভারতে গুর্জর প্রতিহার শাসনের তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন। জগজীবনপুর তাম্রপট্টোলির পাঠোদ্ধারে সেই তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হল সম্পূর্ণভাবে। দ্বিতীয়ত মহেন্দ্রপালের রাজ্যবর্ষ অঙ্কিত অনেকগুলি মূর্তির কালক্রম যথাযথভাবে নির্ধারিত হওয়ায় পূর্বভারতীয় ভাস্কর্যের সন-তারিখ নিধারণেব কাজ আরও একটু পরিচ্ছন্নভাবে করা সম্ভব হল। সর্বোপরি, একটি বৌদ্ধবিহারের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বহুবিধ তথ্যের ভাণ্ডার এই জগজীবনপুর তাম্রপট্টোলি। প্রতিষ্ঠাতার পরিচয়, সমকালীন রাজশক্তির ভূমিকা, বিহার স্থাপনার উদ্দেশ্য, স্থান নির্ধারণ—এইসব প্রয়োজনীয়

তথ্য নিশ্চিতভাবে জানতে পারায়, সামগ্রিকভাবে আদি-মধ্যযুগের ধর্মীয় সংস্থান সম্বন্ধে আমাদের ধ্যানধারণা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে''।[২৩] বিগত কয়েক বৎসরের উৎখননে একটি সুবৃহৎ বৌদ্ধবিহারের চিত্র অংশত উন্মোচিত হয়েছে। দেবলা মিত্র অনুমান করেছিলেন যে এই বিহারের ভূমি নকশার সাথে নালন্দার ভূমি নকশার মিল আছে।[২৪] জগজীবনপুরে পাওয়া টেরাকোটা ভাস্কর্যও অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—মন্দির অলংকরণ শিল্প-বিষয়ে আলোচনাকালে আমরা সেদিকে কিছু দৃষ্টিপাত করব, এখানে শুধু এটুকু বলা যায় যে সেগুলি হতে নবম শতকীয় বাংলার, শুধু পারত্রিকই নয়, ঐহিক সংস্কৃতিরও পরিচয় মেলে, মৃৎভাস্কর্যের শিল্পমানই বলে দেয় যে সেই সংস্কৃতি ছিল যথেষ্ট সমৃদ্ধ।

মালদহ জেলারই হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ওয়ারি গ্রামের রত্নগড়ে দশম-একাদশ শতকের আরও একটি বৌদ্ধস্তূপের প্রমাণ মিলেছে।

বলা বাহুল্য, উপরেরগুলিই সব নয়। বাংলাদেশের মহাস্থানের ভাসুবিহার ও পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারের কথা এখন সকলেই জানেন; মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণের হিউ-এন-সাঙ কথিত রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের কথাও এখন সকলেই জ্ঞাত আছেন—কিন্তু কেউ জানেন না সন্ধ্যাকর নন্দী-কথিত জগদ্দল মহাবিহারের মত আরও কত বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান বাংলার মাটির তলায় কোথায় কোথায় চাপা পড়ে আছে—জগজীবনপুরের নন্দদীর্ঘিকা বৌদ্ধবিহারের কথাও ১৯৮৭-র ১৩ই মার্চের আগে কেউ জানতেন না। এই বিহারগুলির সঙ্গে তৎকালীন বাঙালি সমাজের সম্পর্ক কেমন ছিল? বাঙালি সমাজে এগুলির প্রভাব কতখানি গভীর ছিল?—এসব প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই। কিন্তু আমরা ভুলতে পারিনা যে বৌদ্ধ 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বা চর্যাগীতিকা-ই বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বই। স্মরণীয় যে, আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যার প্রবীনতম কবি বা সিদ্ধাচার্য লুইপাদের সময়কাল ধরেছেন দশম শতকের দ্বিতীয় ভাগ[২৫] যেটি আবার জগজীবনপুরের নন্দদীর্ঘিকা বৌদ্ধ বিহারেরও কাল, তবে এই দুই তথ্যের মধ্যে যোগের কথা ভাবা অসম্ভব। প্রতীকী অর্থে হলেও চর্যাগীতিকায় প্রতিফলিত সমাজজীবন মুখ্যত শবর, শবরী, ডোম, ডোম্বী, তাঁতি, শুঁড়ি, মাহুত, কাপালিক, নটী নদী প্রভৃতি অন্ত্যজদের এবং গুহ্য সাধনতত্ত্ব হলেও ভাষাটি আদি স্তরের বাংলা—এই দুটি তথ্য মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মণ-শাসিত উচ্চ বর্ণ-সমাজে এমনটি হওয়া অসম্ভব ছিল। স্মরণীয় যে দেশী বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ সুলতানী যুগে ব্রাহ্মণদের নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল হাওয়ার আগে ঘটেনি। শ্রদ্ধেয় গবেষকগণ দেখিয়েছেন যে বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে বৌদ্ধ উপাদান প্রচুর শুধু নয় গভীর। কিন্তু তার উৎস আমরা আন্দাজ করতে পারব তখন, যখন আমরা জানতে পারব বৌদ্ধ বিহারগুলির সঙ্গে সাধারণ বাঙালীদের এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু, শ্রমণ, সন্ন্যাসী ও সিদ্ধাচার্যদের সঙ্গেও সাধারণ বাঙালীদের সম্পর্ক ও লেনদেন কেমন ছিল।

প্রাকমুসলিম বাংলার ব্রাহ্মণ্য মন্দির

এখনও টিকে থাকা এবং দৃশ্যমান ও মুসলমানরা এদেশে আসার আগে নির্মিত ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে অতি সামান্য। পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁরা যে ব্রাহ্মণ্য

মন্দিরেরও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন, এমন লেখ্য প্রমাণ যথেষ্ট। আমরা মাত্র দুটি দৃষ্টান্ত[১১] উল্লেখ করছি : দেবপালের পুত্র শূরপাল (জগজীবনপুর-তাম্রপট্টোলিতে রাজা মহেন্দ্রপালকে রাম ও শূরপালকে সৌমিত্রি বা লক্ষ্মণ বলা হয়েছে, অতএব ইনি দেবপালপুত্র মহেন্দ্রপালের অনুজ ও তাঁর পরে সিংহাসনে বসেন) তাঁর মাতা মাহটা ভট্টারিকার নির্দেশে মাহটেশ্বর শিব ও তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার জন্য চারটি গ্রাম দান করেছেন— এমন উল্লেখ আছে একটি তাম্রলেখতে। (২) বীরভূমের বোলপুর মহকুমার সিয়ান গ্রামে পাওয়া একটি শিলালেখতে রাজা নয়পাল (১০২৭-৪২খ্রী:) একাধিক শিব এবং মাতৃকা-মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন, এই সব লেখতে যেসব মন্দিরের কথা আছে, সেগুলির এখন কোনও অস্তিত্ব নেই। এখনও টিকে থাকা প্রাক-মুসলিম ব্রাহ্মণ্য মন্দিরগুলি হল : (১) ক্রোশজুড়ি, শিব, পুরুলিয়া, খ্রী: সপ্তম শতক; (২) ববাকর, বর্ধমান, সিদ্ধেশ্বর শিব, খ্রী: সপ্তম/অষ্টম শতক (ম্যাকাচিয়ন হয়ত ভেবেছিলেন যে এটি আদিতে ছিল জৈন বা বৌদ্ধ মন্দির, একারণে তিনি একে বলেছেন 'The so-called Siddhesvari[১২]—কিন্তু দ্বারশীর্ষের লকুলিশ মূর্তিতে এর শৈব চরিত্র ধরা আছে); (৩) তেলকুপির গুরুডি এবং লালপুর গ্রামে পাঞ্চেৎ বাঁধের জলাধার ঘেষে একটি এবং পাড় থেকে সামান্য দূরে জলের মধ্যে একটি, মোট দুটি মন্দির, শিব, দশম শতক (বেগলার বর্তমানে জলাধারের জলে ডুবে আছে বা আগেই লুপ্ত হয়েছে এমন আরও আটটি মন্দির এবং বেশ কটি ছোট উৎসর্গ মন্দিরের উল্লেখ করেছেন, পরে উপযুক্ত স্থানে বিবরণীটি উদ্ধৃত হয়েছে), (৪) দশভূজা (বর্তমানে উদয়চণ্ডী) ও (৫) গজলক্ষ্মী পাড়া, পুরুলিয়া, দশম-একাদশ শতক, (৬) বড়াম দেউলঘাটা, পুরুলিয়া, শিব, এখনও দাঁড়িয়ে থাকা দুটি মন্দিরের প্রাচীনতরটি, দশম-একাদশ শতক (৭) জটা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, একাদশ শতক, (৮/৯), আটবাইচণ্ডী, বাঁকুড়া, বর্তমানে বাশুলি বলে পরিচিত দুটি দেউল, একাদশ শতক, (১০) সোনাতপল, বাঁকুড়া, সূর্য, একাদশ শতক, (১১) হাকন্দ, ময়নাপুর, বাঁকুড়া, দ্বাদশ শতক, ঐতিহ্যগতভাবে এই মন্দিরের সঙ্গে যোগ হল ধর্ম মন্দিরের। এছাড়া তেলকুপীর মন্দিরগুলির সঙ্গে গঠনগত গভীর সাদৃশ্য হতে মনে হয় পুরুলিয়ার বান্দা গ্রামের দেউলটি (১২) তেলকুপির মন্দিরগুচ্ছের সমসাময়িক ও সমধর্মী, এমন হলে এটিও দশম-একাদশ শতকীয় ব্রাহ্মণ্য মন্দিরগুলির একটি। পুরুলিয়ার বুধপুরের (১৩) বুদ্ধেশ্বর শিবের বৃহৎ দেউলের শীর্ষদেশটি পুনর্নির্মিত কিন্তু পঞ্চায়তন রীতির এই মন্দিরের চারকোণের চারটি ছোট দেউলের যেটি আংশিকভাবে টিকে আছে সেটি তেলকুপীর মন্দিরের মতন—তাই এটি দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকীয় মনে করা হলেও, একাদশ শতকীয়ও হতে পারে। এমনই হতে পারে পুরুলিয়ারই (১৪) বিরিঞ্চিনাথ (পাচেট পাহাড়ের দক্ষিণে), যদিও তা ধ্বংসপ্রাপ্ত তবু মন্দির ক্ষেত্রের স্তম্ভগুলি (আধুনিক মণ্ডপে পুনর্ব্যবহৃত) ও আরও নানা প্রস্তরসাক্ষ্য হতে প্রাচীনতার আঁচ পেতে অসুবিধা হয় না। বাঁকুড়ার বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর শিবের সুউচ্চ দেউলটিকে আমরা এই তালিকায় ধরিনি কারণ ওটি আদিতে জৈন দেউল ছিল এমন ভাবার পক্ষে ভাল যুক্তি আছে। আবার, পুরুলিয়ার ছড়রা গ্রামে এখনও টিকে থাকা দেউলটি গড়নে তেলকূপী-রীতির হলে ও ঐ গ্রামে অনেক জৈন মূর্তি মেলায় মনে হয় ওটি জৈন দেউলই ছিল।

বলা বাহুল্য, উপরের তালিকাভূক্ত মন্দিরগুলি ছাড়াও প্রাকমুসলিম যুগীয় মন্দির থাকতে পারে, যেমন বর্ধমানের জৌগ্রামের জলেশ্বরনাথ শিবমন্দিরকে কেউ কেউ প্রাক্-মুসলিমযুগীয় ভেবেছেন—কিন্তু মন্দিরটিকে দেখে অত পুরাতন মনে হয় না, তবে মন্দিরটির নিচে আছে একটি অনতিউচ্চ ঢিপি যা হতে মনে হয় যে এটি আছে একটি প্রাচীনতর মন্দিরের ধ্বংসস্তুপের উপরে। অপিচ, এখনও টিকে থাকা প্রাকমুসলিম ব্রাহ্মণ্য দেউলের সংখ্যা ১২/১৪টির বেশি সম্ভবত নয়, ২০টির বেশি কিছুতেই নয়। প্রাচীনকালে রাঢ়বঙ্গে জৈন ও উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধ প্রাধান্যের কথা তত্ত্বগতভাবে মেনেও বলা যায় যে এই সংখ্যা যা থাকা উচিত ছিল তার তুলনায় অত্যন্ত কম। ম্যাকাচিয়ন অত্যন্ত যথার্থভাবে লিখেছেন যে, উনিশ শতকে নির্মিত অনেক মন্দিরকে যে এখনই আমরা ক্ষয়ের শেষ পর্যায়ে দেখতে পাই তা হতেই সহজে অনুমান করা চলে মুসলমান শাসনের গোড়ার দিকে নির্মিত অতি অধিকাংশ মন্দিরই অদৃশ্য হয়ে গেছে[১৮]। বৃষ্টি ও বৃক্ষবহুল বাংলার মাটিতে ইটের মন্দিরের স্থায়িত্ব কম, এটিই সম্ভবত প্রধান কারণ। মূর্তিদ্বেষী মুসলমান বিজেতাদেব দ্বারাও যে কিছু মন্দির বিনষ্ট হয়েছে, তাতেও সন্দেহ নেই, উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে পাল রাজবংশের দীর্ঘকালীন রাজধানী হওয়া সত্ত্বেও গৌড়ে একটিও বৌদ্ধ, জৈন বা ব্রাহ্মণ্য স্থাপত্য টিকে নেই—অন্যদিকে গৌড়ের ও বিশেষত পাণ্ডুয়ার সুলতানী যুগের মসজিদ ও স্থাপত্যের দেয়ালে অনেক দেবদেবীর মূর্তি উল্টো করে গাঁথা অছে—মূর্তিগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য তো বটেই, বোদ্ধও জৈন দেবদেবীও আছে। হুগলীর ত্রিবেনীর জাফর খাঁ গাজীর আস্তানাতেও অনুরূপ দৃশ্য দেখা যায়।[১৯] কোনও কোনও আধুনিক ঐতিহাসিক বলেন মসজিদগাত্রে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি গাঁথা থাকলেই সেগুলি যে মন্দির ভেঙে আনা হয়েছিল এমন বোঝায় না—প্রস্তরহীন অঞ্চলে ইতোমধ্যেই ভগ্ন মন্দিব-ক্ষেত্র হতে সেগুলি সংগৃহীত হয়েছিল, এমন সম্ভাবনা যথেষ্ট। তবে বেশ কিছু মন্দির ও বৌদ্ধ বিহার যে বিজেতা মুসলমান সৈন্যরা ভেঙ্গেছিল তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তবুও, বাংলার প্রকৃতি, আবহাওয়া এবং মানুষের অবহেলাই এক্ষেত্রে বিনষ্টির প্রধান কারণ বলে দেশ ঘুরে আমাদের মনে হয়েছে—গৌড়, পাণ্ডুয়া বা ত্রিবেণীর মত তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে উত্তেজনা-প্রবণ ক্ষেত্রগুলিব কথা আলাদা।

যাই হোক, যে ১৪টি প্রাকমুসলিম ব্রাহ্মণ্য দেউল টিকে আছে তাদের মধ্যে মাত্র ৩টি ইটের নির্মাণ (পাড়া-র দশভূজা, সোনাতপল এবং জটা—বহুলাড়াকে এদের সঙ্গে ধরলে ইটে-নির্মিত দেউল হবে ৪টি)—অন্য সব কটিই পাথরের। জেলা হিসেবে দেখলে এখনও দাঁড়িয়ে থাকা প্রাক-মুসলিম ব্রাহ্মণ্য দেউল দক্ষিণ ২৪ পরগণায় একটি (জটা), বর্ধমানে একটি (বরাকরের সিদ্ধেশ্বর), বাঁকুড়ায় চারটি (সোনাতপল-১, ময়নাপুর-১ ও আটবাইচণ্ডী-২)—বাকি সব কটি পুরুলিয়ায়। দেখা যাচ্ছে যে রাঢ় বঙ্গের বাইরে প্রাকমুসলিম ব্রাহ্মণ্য দেউল মাত্র একটি—জটার দেউল। কারণ, ইটের তুলনায় পাথরের স্থায়িত্ব বেশি এবং বাংলায় বাঁকুড়ার পশ্চিম অংশে ও পুরুলিয়া জেলায় পাথর সহজলভ্য। এর সাথে প্রান্তিক ও অরণ্যাবৃত বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার আঞ্চলিক হিন্দু অধিপতিদের আপেক্ষিক স্বাধীনত্যও একটি কারণ হতে পারে, কিন্তু এঁরা জৈন এবং বৌদ্ধ স্থাপত্যগুলি সম্পর্কে সহানুভূতিশীল ছিলেন বলে মনে হয় না।

সংক্রামণকাল

দ্বাদশ শতকের শুরুর দিকে ইসলামের আগমন থেকে পঞ্চদশ শতকের শেষ দিক, অর্থাৎ চৈতন্যযুগারম্ভ পর্যন্ত সময়কালকে বাংলার ইতিহাসের সংক্রামণকাল বা একযুগ হতে অন্যযুগে প্রবেশের কাল বলে ভাবা যায়। এই সময়কালে জৈনরা লুপ্ত হন, এই সময়কাল-মধ্যেই চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া সমগ্র বাংলা হতে বৌদ্ধরাও লুপ্ত হতে থাকেন ও দ্রুত হারে লুপ্ত হতে হতে ষোড়শ শতকের শেষদিকে একসময় লুপ্ত হয়ে যান, এবং সবচেয়ে বড় কথা পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক থেকে বাঙালিদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে বাড়তে উনিশ শতকের সত্তরের দশকে হিন্দুদের সংখ্যাকে অতিক্রম করে যায়, গোলাম মুরশিদ তাঁর 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি' গ্রন্থে উলরিখ ক্রেমারের গবেষণালব্ধ তথ্য অনুসারে কৃত যে 'গ্রাফ'টি[৩০] দিয়েছেন তা হতে বিষয়টি বোঝা যায়।

বাঙালীদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা এভাবে বাড়ার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা নানা প্রকার, কিন্তু ব্যাপারটি এই বইয়ের বিষয় নয়—এখানে শুধু এইটুকু স্মরণ করা যায় যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল', বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' এবং জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'—ষোড়শ শতকের এই তিনটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থেই এ বিষয়ে যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে—তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিতটি আছে রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণ'[৩১]-এ। ইঙ্গিতটি হল ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ সংঘাতের—দক্ষিণা দাবী করে বেদ উচ্চারক ব্রাহ্মণরা সদ্ধর্মী অর্থাৎ বৌদ্ধদের ঘরে ঘরে হামলা চালাতেন, আগুনও লাগিয়ে দিতেন। ক্রমে বৌদ্ধদের উপর ব্রাহ্মণদের এই অত্যাচার চরমে উঠলে তার প্রতিকারের জন্য ধর্মঠাকুর যবন বা মুসলমানরূপি হলেন, অন্য দেবতারাও পাজামা পড়লেন, ব্রহ্মা হলেন মহম্মদ, বিষ্ণু হলেন পয়গম্বর , শিব হলেন আদম, গণেশ হলেন গাজী, কার্তিক হলেন কাজী, মুনিগণ হলেন ফকির, পুরন্দর হলেন মওলানা, চণ্ডী হলেন হাওয়া বিবি, মনসা হলেন বিবি নূর ইত্যাদি এবং এইভাবে দেবতারা বৌদ্ধনিগ্রহক ব্রাহ্মণদের শাস্তি দিলেন। 'শূন্যপুরাণ' হতে মনীষী কাজী আবদুল ওদুদ কর্তৃক উদ্ধৃত ও শব্দার্থ সংযোজিত প্রাসঙ্গিক অংশটুকু হল :

জাজপুর পুরবাদি (১) সোলসঅ ঘর বেদি (২)
বেদি লয় কেবোল দুর্জন।
দখিন্যা(৩) মাগিতে যাঅ জার ঘরে নাহি পাঅ
সাঁপ দিয়া পুড়ায় ভুবন (৪)।।
মালদহে লাগে কর না চিনে আপন পর
জালের(৫) নাঞিক দিসপাস।
বলিষ্ঠ হইল বড় দস বিষ হয়্যা জড়
সদ্ধর্ম্মিরে(৬) করএ বিনাস।।
বেদ করে উচ্চারণ বের্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিআ সভাই কম্পমান।

মনেতে পাইয়া মর্ম্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্তান।।
এইরূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহারন
ই বড় হোইল অবিচার।
বৈকণ্ঠে ডাকিআ ধর্ম্ম মনেতে পাইয়া মর্ম্ম
মায়াতে হোইল অন্ধকার (৭)।।
ধর্ম্ম হৈল্যা জবন রূপি মাথাএ ত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিকচ কামান (৮)।
চাপিয়া উত্তর হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম।।
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত (৯) অবতার
মুখেতে বলেত দম্বাদার (১০)।
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার (১১)।।
ব্রহ্মা হৈল মহাঁমদ (১২) বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর (১৩)
আদম্ফ (১৪) হৈল সুলপানি।
গণেশ হৈল গাজী (১৫) কার্ত্তিক হৈল কাজি (১৬)
ফকির (১৭) হইল্যা যত মুনি।।
তেজিয়া আপন ভেক (১৮) নারদ হইলা সেক (১৯)
পুরন্দর হইল মলনা (২০)।
চন্দ্র সূর্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে
সভে মিলে বাজায় বাজনা।।
আপুনি চণ্ডিকা দেবি তিহুঁ হৈল্যা হায়া বিবি (২১)
পদ্মাবতী হল্য বিবি নূর। (২২)
জতেক দেবতাগণ হয়্যা সভে এক মন
প্রবেশ করিল জাজপুর।।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় (২৩) বোলে বোল।
ধরিআ ধর্ম্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল।।

১. পুরবাদি—পূর্ব প্রভৃতি দিক ২. বেদি—বৈদিক ৩. দখিন্যা—দক্ষিণা ৪. ভুবন—ভবন। ৫. জালের—আরবী জাল—ভুলভ্রান্তি, অপরাধ। ৬. সদ্ধর্ম্মি—বৌদ্ধ; ৭. অন্ধকার—পাঠান্তরে খনকার—খার্সী খুনকার—রাজা, প্রভু; ৮. ত্রিকচ কামান—ফার্সী তীরকশ=ধনু, কামান=ধনু (ফার্সী)। ৯. ভেস্ত—বেহেশত্=স্বর্গ; ১০. দম্বাদার—দম্ম্দার, কথিত আছে১৪৩৩ সালে প্রায় ৪০০ বৎসর বয়সে মাদার পীরের মৃত্যু হয়। ১১. ইজার—পাজামা। ১২. মহাঁমদ—মোহম্মদ; ১৩. পেকাম্বর—পয়গম্বর=ঈশ্বরের বার্ত্তাবহ; ১৪ আদম্ফ— আদম=আদি মানব; ১৫. গাজী=যোদ্ধা; ১৬. কাজি=বিচারক। ১৭. ফকিব=সন্ন্যাসী; ১৮.ভেক=বেশ; ১৯. কে— শেখ=সম্মানিত ব্যক্তি (এখানে ধর্ম্মগুরু); ২০. মলনা—মৌলানা; ২১. হায়া বিবি=হাওয়া বিবি Eve; ২২. নূর=বিবিফাতেমা—হজরত মোহম্মদের কন্যা; ২৩. পাখড় পাখড়=পাকড়াও।—বসুমতী সংস্করণ।[১১] গোলাম মুরশিদ লিখেছেন জাজপুরের মন্দির ও দেবমূর্তি ভাঙার ঘটনাটি হল ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলেইমান কাররানির সেনাপতি কালাপাহাড় কর্তৃক জাজপুরের মন্দির লুণ্ঠন ও ভাঙ্গার ঘটনা[১২]। নিম্নবর্গের হিন্দুরা বিষয়টি কোন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন 'শূন্যপুরাণের' বিবরণ হতে তা বোঝা যায়, এটাও হয়ত বোঝা যায় মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে তুর্কীরা এলেও নবদ্বীপবাসীদের কেউ কেন লক্ষ্মণ সেনের পক্ষে লাঠি-ঠেঙ্গা নিয়ে বেরিয়ে আসেননি। যাই হোক, গোলাম মুর্শিদ ঠিকই লিখেছেন যে দেবতারা রাতারাতি ইজার পরে মুসলমান হয়ে গেলেন—এই ব্যাপারটি অতিরঞ্জিত, মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েছিল তুলনায় অনেক ধীর গতিতে[১৩]।

তৎকালীন গ্রামীণ হিন্দু সমাজ সাধারণভাবে শাসক বা রাজা বদলের ব্যাপারে আদৌ আগ্রহ পোষণ করত না। কিন্তু গ্রামসমাজেও মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে সেই অচলায়তন প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়ে গেল। উচ্চবর্ণীয়গণ নানা স্মৃতিশাস্ত্রের বিধি-বিধান কঠোর থেকে কঠোরতর করে কচ্ছপ যে ভাবে বিপদ বুঝলে নিজের খোলার মধ্যে ঢুকে আত্মরক্ষা করতে চায় ('কূর্মবৃত্তি') সেভাবে অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করতে থাকলেন। কিন্তু এরই ফলে নিম্নবর্গীয়দের উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ আগের চেয়ে অনেকটাই শিথিল হল। ফল হল সুদূর প্রসারী :

১. লৌকিক দেবদেবীর উত্থান: ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের কঠোরতায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্গীয় ও নিম্নবর্ণীয়দের দেবদেবীগণ—বাশুলি, চণ্ডী, মনসা, ধর্ম প্রভৃতি— গ্রহণযোগ্যতা লাভ করছিলেন না, এখন উপরের চাপ শিথিল হওয়ায় তাঁরা প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও প্রসারের জায়গা পেয়ে গেলেন। নিম্নবর্গীয় তথা নিম্নবর্ণীয়রাও ইসলামের প্রবল চাপের মুখে ঐসব লৌকিক দেবদেবীগণের আশ্রয়ে টিকে থাকার মত মানসিক বল কিছুটা হলেও পেলেন। শেষে মুসলমানদের সংখ্যা যখন আরও বাড়ল তখন উচ্চবর্ণীয় সমাজপতিগণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই সব দেবদেবীদের যত সম্ভব ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন ('মনসামঙ্গলে'র চাঁদ সওদাগর যেমন পিছন-ফিরে বাঁ হাতে মনসাকে ফুল ছুঁড়ে দেন)। এবার মনসা হলেন শিবের মেয়ে, চণ্ডী হলেন শিবের স্ত্রী, এমনকি যাঁর লেশমাত্র পৌরাণিক ঐতিহ্য নেই, সেই ধর্মঠাকুরও দেখা দিলেন কোথাও শিব বা কোথাও নারায়ণরূপে। বাংলার গ্রাম ঐসব দেবদেবীর 'মঙ্গল' গানে মুখর হতে শুরু করল।

চৈতন্যযুগের আগেই যে ব্যাপাবটি ঘটা শুরু হয়ে গিয়েছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ আছে বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এর দুটি ক্ষেত্রে, যথাক্রমে আদি ও শেষ খণ্ডে :

(ক) ধর্মকর্ম লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধন।।[১]

(খ) ধর্মকর্ম লোক সব এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীব গীতে করে জাগরণে।।
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি।
তাও সে পূজেন কেহো মহাদম্ভ করি।।
ধন বংশ বাঢ়ুক করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য-মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে।।
যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত।
ইহাই শুনিতে সর্বলোক আনন্দিত।।
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
গোবিন্দ-পুণ্ডরীকাক্ষ-নাম উচ্চারয়।।[২]

বিষয়টি গুরুতর না হলে বৃন্দাবনদাস তাঁর রচিত চৈতন্য-জীবনীকাব্যের শুরুতে ও শেষে একই কথা লিখতেন না। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে বৃন্দাবনদাস নিজেও তাঁর কাব্যের নাম রেখেছিলেন 'চৈতন্যমঙ্গল' পরে তা 'চৈতন্যভাগবত' হয়, প্রায় সমসাময়িক জয়ানন্দের কাব্যের নামও 'চৈতন্যমঙ্গল'। এই কথাটিও ভোলা অসম্ভব যে, ষোড়শ শতক থেকে সপ্তদশক সময়কালে, যখন চৈতন্য-যুগ সবচেয়ে প্রবল ছিল, তখন সমভাবেই মঙ্গলকাব্য, শিবায়ন কাব্য প্রভৃতিও প্রবল ছিল।

২. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ : প্রায় সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী সাহিত্য ছিল ধর্মীয় সাহিত্য, মানুষের কথা যেসব ক্ষেত্রে আছে সেসব ক্ষেত্রেও তা আছে ধর্মীয় আদলে। অন্যদিকে, একেবারে আদি ব্রাহ্মণ্যকালে সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনও ভাষায় শাস্ত্র ও রামকথা পাঠ ও আলোচনা পুরোপুরি নিষিদ্ধ ছিল, এমন বিধানও ছিল যে সংস্কৃত ছাড়া অন্যভাষায় লিখলে রৌরব নরকবাস অনিবার্য। ফলত প্রাচীন বঙ্গেও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও সাহিত্য হত সংস্কৃত ভাষায়-- একাদশ শতকের শেষে জয়দেব বা উমাপতিধরও তাই-ই করেছেন। আদিম বাংলার চর্চা হয়ত কিছু থেকে থাকবে নাথসাহিত্য, ডাক, খনার বচন প্রভৃতি আকারে, কিন্তু সেগুলি আমাদের কাছে আদৌ প্রাচীন রূপে পৌঁছায়নি। ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি যে একেবারে আদিস্তরের বাংলা ভাষায় যথেষ্ট উৎকৃষ্ট ও গম্ভীর কবিতা লিখেছিলেন চর্যাগীতিকার বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য কবিগণ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য বৃত্তের বাইরে। এরপরের অসামান্য একটি মাইলফলক হল চৈতন্যপূর্বকালে

বড়ুচণ্ডীদাস রচিত 'কৃষ্ণকীর্তন'-নামে পরিচিত কাব্যটি, যতটা তার ভাষার জন্য, যা আধুনিক বাংলার অনতিদূরবর্তী, ততটাই তার বিষয়বস্তুর জন্য। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ-রাধার নামে চালালেও এর চেয়েও বেশি ঐহিক এবং এর চেয়েও বেশি 'সেকুলার' কবিতার বই বাংলায় এতাবৎ কমই লেখা হয়েছে। কৃষ্ণ এখানে দেবত্বহীন, একটি চাষাড়ে, কামুক ও উদ্দাম গ্রাম্য যুবক। অন্যদিকে, 'কৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রাধা সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশী যা লিখেছেন তা স্মরণ করাই যথেষ্ট :

> "..... কিন্তু এ-কাব্যে রাধা একেবারে বালিকা। কবি তাহাকে অত্যন্ত কৌশলে বাল্যের জ্ঞাতপ্রায় জীবন হইতে ধীরে ধীরে একটির পর একটি অভিজ্ঞতার আঘাতে— ভাস্কর যেমন পাথর হইতে মূর্তি ফুটাইয়া তোলে—কৈশোরের মধ্য দিয়া যৌবনময়ীরূপে গড়িয়া তুলিয়া প্রেমের বিস্ময়-নিকেতনের সম্মুখে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। এ-পদাবলির তিল-তুলসী-যথার্পিত-দেহ রাধা নহে—ভক্তিরস যাহার উপজীব্য। এ-রাধা দুরন্ত বালিকা, অনভিজ্ঞা কিশোরী, গর্বিতা যুবতি। কৃষ্ণের দেবত্বে ইহার বিশ্বাস নাই, পরকীয়া প্রেমের মহত্ত্বে এ সন্দিগ্ধা। এ হাসিয়া রাগিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া, মারিয়া ধরিয়া, ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া, কথার মুখেমুখে তীব্র শ্লেষ নিক্ষেপ করিয়া সমস্তক্ষণ পাঠকের মর্মকে টানিয়া রাখে; এবং কাব্যের শেষে বিরহব্যথার নিভৃত খিলান- পথে কখন অজ্ঞাতসারে একেবারে মনের মধ্যে আসিয়া আসন গ্রহণ করে। এ-মূর্তি এতই সজীব প্রাণ-প্রচুর যে, মনে হয় তাহার পায়ে কাঁটাটি বিঁধিলে এখনই রক্ত বাহির হইবে। এই রক্তের অধিকারই সাহিত্যের অধিকার; সে-স্বাভাবিক অধিকারে রাধা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর নায়িকা এবং রাধার অধিকারে কাব্যখানি নানা দোষ সত্ত্বেও অমূল্য।"[৩৭]

প্রশ্ন হল এমন একটি ব্রাহ্মণ্য মত ও সংস্কার-বিরোধী কাব্য সেই ধর্ম-শাসিত যুগে বড়ুচণ্ডীদাস লিখলেন কি করে? উত্তরটা হল দ্রুত বর্ধমান মুসলমান জনসংখ্যা ও মুসলমান শাসকের যুগপৎ চাপে ব্রাহ্মণ্য নিয়ন্ত্রণ শিথিল হওয়ায় বড়ু চণ্ডীদাসের পক্ষে বাংলার গ্রামাঞ্চলে নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে চলিত থাকা সজীব ঐতিহ্যটিকে কাব্যে ধরা সম্ভব হয়েছিল।

প্রাথমিক উত্তেজনা কেটে যাওয়ার পরে সুলতানী শাসকদের কেউ কেউ প্রশাসনিক প্রয়োজনেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রতি কিছুটা নমনীয় নীতি গ্রহণ করেন। কবি মালাধর বসু ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অনুসরণে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য,' রচনা করার জন্য সুলতান রুকনুদ্দিন বরবক শাহ্ কর্তৃক 'গুণরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত হন। চট্টগ্রামের শাসক ('লস্কর') পরাগল খান এবং ছুটি খানও মহাভারতের আংশিক অনুবাদ করান। এই বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তগুলি মুসলমান শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু ইতোমধ্যে, পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধের কোনও এক সময়ে প্রকাশিত হয় কৃত্তিবাসের 'রাম পাঁচালি' বা রামায়ণ—পঞ্চদশ শতকের মধ্যেই এই পুঁথির নকল বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, এতিহ্যটিও জনপ্রিয় হয়, পুঁথির মাধ্যমে যতটা, কথকতা ও গ্রাম্য যাত্রায় তার চেয়ে ঢের বেশি। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক অনন্য মৈথিলী পদগুলি এসময়েই বাংলায় পৌঁছে যায়, এসময়ের মনে হয় শেষ দিকে জনপ্রিয়

হয় নিতান্ত আটপৌরে প্রায় মুখচলতি বাংলায় রচিত পদাবলীর চণ্ডীদাসের হৃদয়স্পর্শী ও অতীব গভীরগামী রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক অসাধারণ পদগুলি। বৈষ্ণব ধর্ম বঙ্গভূমিতে আগেও অজ্ঞাত ছিল না—পাহাড়পুরের অষ্টম-শতকীয় বিহারে রাধাকৃষ্ণের টেরাকোটা ফলক মিলেছে, এই প্রত্ন-তথ্যের সঙ্গে আমরা যোগ করতে পারি প্রাক-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব গ্রন্থকার ও গ্রন্থের পণ্ডিত অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রদত্ত তালিকাটি[৩৮] (ক) জয়দেবের গীতগোবিন্দ, (খ) বিল্বমঙ্গলের (লীলাশুক) কৃষ্ণকর্ণামৃত, (গ) ব্রহ্মসংহিতা, (ঘ) বোপদেবের মুক্তাফল, (ঙ) বিষ্ণুপুরীর বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী, (চ) লক্ষ্মীধরের ভগবন্নামকৌমুদী, (ছ) শ্রীধরস্বামীর ভাগবতের টীকা, (জ) ঈশ্বরপুরীর কৃষ্ণলীলামৃত। সুতরাং চৈতন্যের আগেও বাংলায় কৃষ্ণভক্তি অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু তা সাধক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মহলে—বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে তা পৌঁছে যাওয়া শুরু হল কৃত্তিবাসের 'রাম পাঁচালি' ও পদাবলীর চণ্ডীদাসের পদগুলি গ্রামে গ্রামে গীত হওয়ার পর থেকে এবং তা সোজাসুজি বাংলা ভাষায়। ঠিক এজন্যই ঘটতে পারল চৈতন্যদেব-পরিচালিত বিপ্লব।

চৈতন্যদেব (আবির্ভাব ১৪৮৬ খ্রি:) বাংলার হিন্দু সমাজে এক নতুন জীবন নিয়ে এলেন ঠিক সেই সময়ে যখন থেকে বাঙালিদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা দ্রুত বাড়া শুরু হয়েছিল। এর আগেই হিন্দু প্রজাদের প্রতি মুসলমান শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গির কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। চৈতন্যের সময়কার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) ছিলেন আরও উদারপন্থী। চৈতন্যদের এই অনুকূল পরিস্থিতিতে বাংলা ভাষার প্রবল শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করলেন। নিজে উচ্চতম মানের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও তিনি প্রচারের বাহন করলেন বাংলা ভাষাকে, সংস্কৃত মন্ত্রের জায়গায় স্থাপন করলেন বাংলা ভাষায় নামগানকে, এবং সবচেয়ে বড় কথা জাতিভেদের অনড় দুর্গে জব্বর আঘাত হানলেন এই সত্য প্রতিষ্ঠা করে যে নামগানকারী যবনও (হরিদাস যেমন) ব্রাহ্মণের তুলনায় অধিক সম্মানযোগ্য। এতেই বিপ্লব ঘটে গেল—চৈতন্যের আগের একশো বছরের বাংলার সাথে চৈতন্যের পরের একশো বছরের বাংলার পার্থক্য এত বিপুল যে একটিকে দিয়ে অপরটিকে চেনা যায় না। বাঙালি হিন্দু সমাজ আক্ষরিক অর্থেই প্রেম ও ভক্তির বন্যায় প্লাবিত হয়ে যেন নতুন যৌবন লাভ করল। সমাজের প্রত্যেকটি দিক এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এর বিপুল প্রভাব পড়ল। সৃষ্টি হল বিপুল বৈষ্ণব সাহিত্য যার প্রভাব বাংলা সংস্কৃতিতে অতি বিপুল।

বৈষ্ণবের ক্ষয়, শাক্ত পদাবলীর আশ্রয়

চৈতন্যদেব অকালে অপ্রকট হওয়ার পর অল্পকালের মধ্যেই বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ অত্যন্ত অভিজাত সংস্কৃত ভাষায় একের পরে এক অতীব পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ (যেমন সনাতন গোস্বামীর 'বৃহদ্‌ভাগবতামৃত' ও 'বৈষ্ণবতোষণী', রূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' এবং শ্রীজীব গোস্বামীর 'শ্রীগোপালচম্পু') রচনা করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের দুরতিক্রম্য দুর্গ গড়ে তুললেন—সাধারণ মানুষের কাছে এই বাধা ছিল অভেদ্য, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাংলায় তাঁর মহাগ্রন্থ 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করলেও বৈষ্ণব দর্শনে অভিজ্ঞ ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির

কাছেও তা দুরূহ। এবং ব্রাহ্মণ্য বর্ণভেদ প্রথাও এখানে ফিরে এল—অভিজাত গৌড়ীয় বৈষ্ণব হলেন উচ্চবর্ণভুক্ত এবং সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, সংখ্যার দিক হতে যাঁরা ছিলেন মুষ্টিমেয়। অন্য প্রান্তে রইলেন নিম্নবর্গীয়, শুধুমাত্র নামগানকারী এবং নিজেদের মত করে বোঝা প্রেম-ভক্তিবাদী নিরক্ষর বা প্রায় নিরক্ষর লক্ষ লক্ষ 'বোস্টম'—'বৈষ্ণব' ও 'বোস্টমের' পার্থক্যটি শুধুমাত্র 'তৎসম' আর 'তদ্ভব' শব্দের নয়, গভীরভাবে সমাজতাত্ত্বিক। বাংলায় আগে হতেই নানা ধরনের কায়াসাধক, সহজ-সাধক ও রহস্যাচারীরা ছিলেন—এবার তাঁদের বড় একটা অংশ 'বোস্টম'দের মিশে গেলেন, বাউল প্রভৃতিদের সংখ্যা ও প্রভাব দুই-ই বেড়ে গেল (নিত্যানন্দ পুত্র বীরচন্দ্র সহজিয়াদের বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে গ্রহণ করায় এই প্রক্রিয়া আরও বল পায়)। এসবের ফলে আবার নানা বিকৃতিও (যেমন গৌর নাগর) দেখা দিল। চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব আন্দোলন অভিমুখভ্রষ্ট হল। এই ভাবে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ-নাগাদ বৈষ্ণব ধারাটি অনেক পরিমাণেই প্রাণশক্তি হারাল। এই অবস্থায় ১৭৪০ থেকে ১৭৭০, মাত্র তিরিশ বছরের মধ্যে পরপর কতগুলি ঘটনায় বাঙালি সমাজ প্রবলভাবে আন্দোলিত ও সঙ্কটগ্রস্ত হল—বর্গী হামলা, পলাশীর যুদ্ধ, ইংরেজদের দেওয়ানি লাভ ও দ্বৈত শাসন এবং '৭৬-এর মন্বন্তর নামে পরিচিত ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ। বলা বাহুল্য এই সঙ্কট বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান উভয় অংশকেই সমভাবে আক্রান্ত করেছিল, কিন্তু হিন্দু সমাজে সমগ্র ব্যাপারটি অন্য অভিঘাত নিয়ে এল। এই সঙ্কটকালে অন্নদাত্রী, অভয়দাত্রী, শক্তিরূপিণী মাতৃকল্পনার আবেদন স্বাভাবিক ভাবেই অপ্রতিবোধ্য হয়ে উঠল এবং স্বাভাবিকভাবেই আবার তা বাংলা ভাষায়—রামপ্রসাদ সেনের সহজ, মুখচলতি ও দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ ভাষায়। একমাত্র গুহ্য সাধনতাত্ত্বিক পদগুলি ছাড়া সব সময়েই রামপ্রসাদ গান বেঁধেছেন এমন নিখাদ বাঙালিয়ানায় যে সেগুলি আজও যেন বাঙালি হিন্দুর প্রাণের বার্তা বহন করছে। সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ শাক্ত পদাবলীর আগমনী ও বিজয়া বিষয়ক গানগুলি যেগুলি একসময় বাঙালি হিন্দু ঘরে ঘরে সমাদৃত ছিল। এখন দুর্গা হলেন ঘরের মেয়ে, যে নিতান্ত বালিকা বয়সেই বয়স্ক ও ভবঘুরে স্বামীর ঘর করতে গেছে, সারা বছর তার মা মেয়ের চিন্তায় কাঁদেন, ঘুম হয় না, শুধু বছরে একবার তিনদিনের জন্য বাপের ঘরে আসেন। একেবারে ঘরের কথা। রামপ্রসাদের মতই অন্যান্য শাক্তপদকর্তরাও কম বেশি একই ভাব ও ভাবনা উপস্থাপিত করেছেন। বৈষ্ণব-পদাবলী কখনও এমন 'ঘরের কথা' হয়ে ওঠেনি, বরং প্রাথমিক প্রাণময়তা কেটে যাওয়ার পরে তা অনেকটাই শাস্ত্রশাসিত, অলংকার কন্টকিত এবং কৃত্রিম। বড়ুচণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তনে'র মধ্যে বাঙালি জীবনের প্রতিনিধিমূলক কাব্যধারার উৎসমুখ হওয়ার মতন মশলা ছিল কিন্তু গোস্বামীরা ওটিকে প্রত্যাখ্যান করেন। অতএব অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকেই দেখা গেল বাংলার প্রধান উৎসব হল দুর্গোৎসব এবং প্রধান দেবি হলেন কালী। এমনকি বাংলার বিখ্যাত বৈষ্ণব-কেন্দ্রগুলিতেও (যেমন, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, গোস্বামী-মালিপাড়া, কুলীনপাড়া, দেনুড় প্রভৃতি) বৈষ্ণবরা অত্যন্ত সংখ্যালঘু। ব্যাপারটি যে সবসময় খুব মসৃণভাবে ঘটেছে এমন নয়—বৈষ্ণব-শাক্ত বিরোধ মাঝে মাঝে উৎকট আকার নিত। বৈষ্ণবদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব রাসযাত্রাকালে নবদ্বীপ জুড়ে বৃহৎ বৃহৎ শাক্ত দেবীমূর্তি মহাধূমধাম সহকারে পূজিত হয় এবং ঐ দেবীগণের মেলা ও শোভাযাত্রার

ভীড়ে রাস-উৎসব চাপা পড়ে যায়—এ ব্যাপার এখনও প্রবলভাবে চলছে। কিন্তু এটা বাইরেব ও আনুষ্ঠানিক ব্যাপার, ভিতরের বা অন্তরের নয়। সম্প্রদায়-গণ্ডীব বাইরে ব্যাপক বাঙালি হিন্দুর মধ্যে এই ফারাক ছিল না। ঠিক এই ব্যাপারটিকে ধরে রামপ্রসাদ সেন ও অন্যান্য শাক্ত কবিরা শ্যাম-শ্যামার অপরূপ সমন্বয়ের চিত্র উপস্থিত করলেন: "কালী হলি মা রাসবিহারী/ নটবর-বেশে বৃন্দাবনে" (রামপ্রসাদ[৩৯]), "জান না রে মন, পবম কাবণ, কালী কেবল মেয়ে নয়, / মেঘের ববণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়।।" (কমলাকান্ত[৪০]) বা "অভেদে ভাবরে মন কালা আর কালী" (রামলাল দাস দত্ত[৪১])। অন্যদিকে তাবাপীঠেব বামাচবণ বা বামাক্ষ্যাপার সাধনা বিশেষত রাঢ বঙ্গের নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে শক্তিশালী মীথের আকার নেয়। প্রথাগত শিক্ষাহীন ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ বামাক্ষ্যাপা তাঁর মাতৃসাধনা ও আচরণে এতাবৎ প্রচলিত সামাজিক ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও রীতি-নীতিকে অগ্রাহ্য করে মহা আলোড়ন সৃষ্টি করেন। বামাক্ষ্যাপার বেপরোয়া মুক্তমনস্কতাই বাঙালি চেতনাকে বড় রকমের ঝাঁকুনি দেয়। প্রায় সমসাময়িক রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে বসে যে পবমতসহিষ্ণুতার আদর্শের কথা বললেন তার আবেদন হল গভীর। তখন একদিকে খ্রীস্টানদেব মূর্তিপূজা-বিরোধী প্রচার, অন্যদিকে ব্রাহ্মদের নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা ও আরও একদিকে নানা সম্প্রদায়ের নানা মতের বিরোধে বাঙালি প্রবল চেতনা-সঙ্কটে পতিত হয়েছিল। বামকৃষ্ণ সমস্ত বিষয়টিকে সামলালেন অতি সহজে, প্রথমে মূর্তিপূজা-বিষয়ে : "যাঁর জগৎ, তিনি বুঝাবেন।. . .. যদি ওই মাটির প্রতিমা পূজা করাতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না—তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ওই পূজাতেই সন্তুষ্ট হন। তোমার ওর জন্য মাথা ব্যথা কেন? তুমি নিজেব যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর"।[৪২] এবং সর্বমত ও সর্বপথেব প্রতি অপূর্ব সহিষ্ণুতার কথা বলে . "মা মাছের নানারকম ব্যঞ্জন করেছেন—যার যা পেটে সয়।"[৪৩] এরপবে আরও এগিয়ে . "এক পুকুরে তিন-চার ঘাট; এক ঘাটে হিন্দুবা জল খায়, তাবা বলে 'জল'। একঘাটে মুসলমানেরা জল খায়, তারা বলে 'পানি'। আর এক ঘাটে ইংরাজেরা জল খায়, তারা বলে 'ওয়াটার'; তিন-ই এক, কেবল নামে তফাত। তাঁকে কেউ বলছে 'আল্লা', কেউ 'গড'; কেউ বলছে 'ব্রহ্ম'; কেউ 'কালী'; কেউ রাম, হরি, যীশু, দুর্গা।"[৪৪] -এর থেকে সবাব কিছু হয় না, এর থেকে গভীরও কিছু হয় না।—রামপ্রসাদ ও শাক্ত কবিরা যে শাক্ত-বৈষ্ণব সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন, রামকৃষ্ণ তাকেই সর্বব্যাপী করলেন। কিন্তু শিকড় আবো গভীরে- ভক্তি আন্দোলনে, বাংলায় বহুকাল হতে চলা তন্ত্র আন্দোলনে যাতে নিম্নবর্ণীযরা ও মেয়েবা অপাঙক্তেয় ছিল না যে কারণে বামাক্ষ্যাপা ব্রাহ্মণ্য সংস্কাববাদীদেব স্রেফ গাম্য গালাগাল দিয়ে উড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন, এবং কর্তাভজা, সাহেবধনী, সহজিয়া প্রভৃতি নানা শাখার আন্দোলনে, যেগুলিতে সম্ভবত ব্রাহ্মাণ্য সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রূপেই নানা ধরণের বিকারও ছিল। গোলটা বাঁধল যখন বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে বিপ্লবী জাতীযতাবাদীরা ঠিক তা-ই করলেন যা প্রখর বাস্তববোধে রামকৃষ্ণ কখনও করেননি—ভারতমাতার জায়গায় তাঁরা দুর্গা বা কালীকে বসিয়ে দিলেন। মুসলমানের কাছে ভুল সংকেত গেল।

আমরা জানি সমগ্র মধ্যযুগ ধরেই সুফী, গাজী, পীর, ফকির প্রভৃতিগণের প্রচার ও আন্দোলন বাঙালি সংস্কৃতির খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিভিন্ন লোক-ধর্মও তাই। আমরা একথাও ভুলিনি যে উনিশ শতকে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম আন্দোলন, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন-ধর্ম-কৃষ্ণতত্ত্ব-আনন্দমঠ এবং সারস্বত সমাজে বেদান্ত চর্চার গুরুত্ব বৃদ্ধি উচ্চবর্ণীয় ও নব্য ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের নাড়া দিয়েছিল। খ্রীস্টান মিশনারীদের অতি উৎসাহ ও প্রচারের চাপ আর একটি বিষয়। বিষয় আরও বহুবিধ। অতএব সমগ্র ব্যাপারটি অতীব জটিল ও বহুমুখী। তবুও একথা বোধ হয় অতিরঞ্জিত নয় যে নিম্নবর্গীয় (শুধুমাত্র নিম্নবর্ণীয় নয়) বাঙালি হিন্দু সমাজ উনিশ শতকের শেষ দিকে বাঁধা পড়ে দুটি মূল ঘাটে—চৈতন্য এবং রামপ্রসাদ-বামাক্ষ্যাপা-রামকৃষ্ণ। লৌকিক দেবদেবীরা নিজেদের স্বতন্ত্র মহিমা অনেকাংশে বজায় রেখেও এই দুটি ঘাটে সুবিধামত তরী ভেড়ালেন বা ঘাটের আশপাশে তরী বাইতে থাকলেন, যেমন বাশুলি-বিশালাক্ষ্মী-চণ্ডী-কল্যাণেশ্বরী-ভৈরবী-যোগাদ্যা প্রভৃতি দুর্গা ও কালীতে আর ধর্ম ঠাকুর কখনো নারায়ণে কখনো শিবে সমাগত হলেন। অরণ্যে বা লোকচক্ষুর আড়ালে পূজিতা কালী সপ্তদশ শতকের আগে গৃহে খুব কমই পূজিতা হতেন এবং তিনি 'ঘরের মেয়ে' হয়ে ওঠেন ১৭৬০/৬৫ থেকে, একারণে অন্যতম প্রধান দেবী হলেও বাংলার কালীমন্দিরগুলির প্রায় সবকটিই ১৭৬০-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত, ফলতঃ সংখ্যাও কম—কিন্তু অন্যরূপে শক্তিদেবীর মন্দির বাংলায় চিরকালই আছে।

১-৩ : সতীশচন্দ্র মিত্র, 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' (দে'জ ২০০১ পুনর্মূদ্রণ, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৩১৫ এবং ৩২৪ তথ্যসূত্র যথাক্রমে ১, ৩ এবং ৫) দেখুন।

৪. S.C. Mukherji, 'Excavation at Banesvar Danga, Barddhaman,' 'PRATNA SAMIKSHA 2 & 3, Directorate of Archaeology & Museums, Govt. of West Bengal, 1993-94, P.80

৫. ঐ, P. 85

৬. ঐ, P. 84

৭. ঐ, P. 83

৮. B.D. Chattopadhyaya, 'Urban Centres in Early Bengal,' PRATNA SAMIKSHA,' প্রাগুক্ত, P. 170

৯. ঐ, P. 177

১০. প্রাগুক্ত 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' পৃ: ৩২৭-২৮ এবং ৩৩০ (তথ্যসূত্র ৫ এবং ৬)

১১. প্রাগুক্ত 'PRATNA SAMIKSHA' ও প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃ: 17.

১২. স্থানগুলির প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণের জন্য দেখুন PRATNA SAMIKSHA প্রাগুক্ত সংখ্যা ও নিবন্ধ, PP 169-192

১৩. বিনয় ঘোষ: 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', প্রকাশ ভবন, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৯৯৫, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৪৩৭-৩৮।

১৪. J.D. Beglar, 'Report of a tour through the Bengal Provinces,' 1872-73, 1966 Reprint, Indological Book House, Varanasi, PP. 162-207.

১৫. Chitrarekha Gupta,' Jainism in Bengal : Beginning of the Study, Problems and Perspective,' প্রাগুক্ত PRATNA SAMIKSHA P. 219

১৬. ঐ

১৭. ঐ

১৮. ঐ

১৯. বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন: যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী: 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি,' পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫ দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১০৯-১০।

২০. প্রাগুক্ত 'PRATNA SAMIKSHA,' S.C. Mukherji, 'Excavation at Banesvar Danga,' PP 87-88

২১. তাম্রপট্টোলিটির বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিক অংশের বিবরণের জন্য দেখুন প্রাগুক্ত PRATNA SAMIKSHA-য় 'Excavation at Jagjivanpur–A preliminary report'-এ সুধীন দে কর্তৃক উদ্ধৃত গৌরীশ্বর ভট্টাচার্যের আলোচনার অংশ, P.P. 229-231.

২২. গৌতম সেনগুপ্ত, 'সম্প্রতি আবিষ্কৃত একটি বৌদ্ধবিহার ও তার মৃৎভাস্কর্য,' 'চারুকলা,' রাজ্য চারুকলা পর্ষদ, ২য় সংখ্যা, ১৪০৭, পৃ: ৫৮।

২৩. ঐ, পৃ: ৫৬

২৪. ঐ, পৃ: ৫৭

২৫. Suniti Kumar Chatterji, 'The Origin and Development of the Bengali Language, Rupa, 1985, P. 120.

২৬. নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস,' আদি পর্ব, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০২, পৃ: ৫৬৪-৬৫।

২৭. David J. McCutchion, 'Late Mediaeval Temples of Bengal, The Asiatic Society, 1993 Reprint, P. 3

২৮. ঐ

২৯. দেখুন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মুসলমান মসজিদে হিন্দুকীর্ত্তির অবশেষ,' বিনয় ঘোষের প্রাগুক্ত 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি,' তৃতীয় খণ্ড, পরিশিষ্ট ৬-এ সংযোজিত, পৃ: ৩৪২-৫২।

৩০. গোলাম মুরশিদ, 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি,' 'অবসর,' সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০, জুন ২০০৬ পুর্নমুদ্রণ, পৃ: ৭১।

৩১. 'শূন্যপুরাণ' নিয়ে ও রামাই পণ্ডিতের ঐতিহাসিকতা নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা সংশয় আছে। তিনখানি পুঁথি অবলম্বনে নগেন্দ্রনাথ বসু ১৩১৩ বঙ্গাব্দে 'শূন্যপুরাণ' প্রকাশ করেন, নামটি তাঁরই দেওয়া, পুঁথিতে আছে 'আগমপুরাণ।' সমগ্র ধর্ম-সাহিত্য ও ধর্ম-পূজকমণ্ডলীতে রামাই পণ্ডিত অত্যন্ত প্রাচীন ও শ্রদ্ধেয় নাম। ড: শহীদুল্লাহের মতে আদিতে একজন রামাই পণ্ডিত হয়ত ছিলেন, পরে তাঁর গ্রন্থে আরো অনেকে হস্তক্ষেপ করেন। পণ্ডিত অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাই লিখেছেন, "শূন্যপুরাণ কোন একজন কবির রচনা নহে।" ষোড়শ শতকের একেবারে শেষদিক হতে সপ্তদশ শতকে এটি গ্রন্থিত হয়ে থাকতে পারে। এর

আগে দীর্ঘকাল ধরে আদি ঐতিহ্যটি ধর্মপূজা ও গাজনের ছড়ার আকারে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়।

৩২. কাজী আবদুল ওদুদ, 'বাংলার মুসলমানের কথা,' মৃত্তিকা, ১৪০৯, পৃ: ২৫-২৬।

৩৩. প্রাগুক্ত 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি,' পৃ: ৬৩।

৩৪. ঐ

৩৫. বৃন্দাবনদাস-বিরচিত 'শ্রী শ্রী চৈতন্য ভাগবত,' বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, দে'জ ১৯৯৫ সংস্করণ, আদিখণ্ড, পৃ. ১১।

৩৬. ঐ, শেষখণ্ড, পৃ: ৩৩১।

৩৭. প্রমথনাথ বিশী, 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী,' প্রথম পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি মুদ্রণ, ২০০১, পৃ: ১।

৩৮. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,' মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা: লি:, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮২, প্রথম খণ্ড, পৃ: ২৭৭।

৩৯. শাক্ত পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, স. অমরেন্দ্রনাথ রায়, ১৯৮৯, পৃ: ১০০।

৪০. ঐ, ১০১

৪১. ঐ, ১০২

৪২. 'রামকৃষ্ণকথামৃত,' উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪০০ পুনর্মূদ্রণ, প্রথম খণ্ড, পৃ: ১৮-১৯।

৪৩. ঐ, পৃ: ১৯

৪৪. ঐ, পৃ: ৮৫

৩
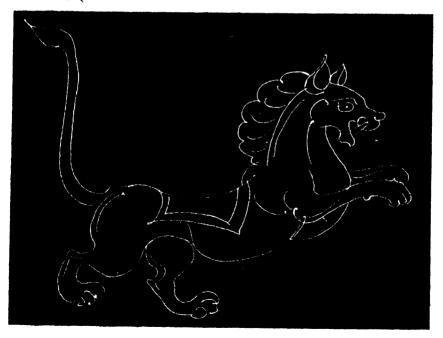
মন্দির-সাক্ষ্যে বাঙালি হিন্দুর ধর্মসংস্কৃতি

এই বইয়ের পরিধি মুসলিম-পূর্ব যুগ থেকে উনিশ শতকের সমাপ্তি পর্যন্ত। একালে ধর্ম ও সংস্কৃতি ভিন্ন ছিল না। প্রাচীন ও মধ্যযুগে দেবীদেবতাই ছিলেন প্রধান, মানুষ নয়। উনিশশতকের দ্বিতীয় দশকে 'ইয়ংবেঙ্গল' যুক্তির সোরগোল তোলেন, কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁদের কেউ খ্রীষ্টে, কেউ ব্রহ্মে, কেউ বা ব্রাহ্মণ্যবাদে লীন হন। অক্ষয় কুমার দত্ত ও পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁদের অসামান্য কাজের কোথাও ধর্মকে মাথায় চড়তে দেননি, কিন্তু তাঁরা দুজনেই একক পথযাত্রী। রামমোহন থেকে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ সকল প্রধান মণীষার প্রধান আলোচ্য ছিল ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব এবং শুধু তা-ই নয়, তাঁদের ভাবনায় মানুষেব মঙ্গলের উপায়ও হল ঈশ্বরতত্ত্ব। একারণেই অনন্য মণীষাদীপ্ত উনিশ শতকেও ধর্ম ছাড়া সংস্কৃতি ছিল না (আমাদের অভিজ্ঞতা হল এখনও নেই)। ঐতিহাসিক কালের সপ্তম-অষ্টম শতক থেকে উনিশ শতকের শেষ দিক পর্যন্ত বাঙালি হিন্দুর ধর্ম-সাংস্কৃতিক জীবনেব একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য হল পুরাতন মন্দিরগুলি—নিচের সারণিগুলি হতে সম্ভবত বিষয়টি আন্দাজ পাওয়া যাবে। উল্লেখ থাকুক : (ক) সারনিগুলি আজও টিকে থাকা মন্দিরের, তাও প্রাথমিক ও খসড়া গোছের, (খ) এই বইয়েরই দ্বিতীয় পর্বে প্রদত্ত পঞ্জিগুলির প্রাথমিক খসড়া ঘেঁটে সারণিগুলি নির্মিত, (গ) গুচ্ছ মন্দিরগুলি (জোড়া মন্দির থেকে ১০৮ মন্দির) এগুলিতে ধরা হয়নি) এবং (ঘ) এগুলি ছাপা হয়ে যাওয়ার পরেও দ্বিতীয় পর্বের পঞ্জিগুলি বহুল পরিবর্ধিত হয়েছে—তথাপি এই সারণিগুলি থেকে যথেষ্টই ইঙ্গিত মেলে·

সারণি-১ : দেউল (রেখ, আটকোণা, উল্টোপদ্ম)

কাল	শিব	বৈষ্ণব	অন্যান্য
৭-১৩ শতক	৮		জৈন-৩, গজলক্ষ্মী, দশভূজা, সূর্য, বাশুলি, হাকন্দ, রঙ্কিণী = ৯
১৪ শতক	২		
১৫ শতক	৪	১	
১৬ শতক	৮	৭	সর্বমঙ্গলা, লৌকিক, বর্গভীমা = ৩
১৭ শতক	১৬	১২	সর্বমঙ্গলা, ধর্ম, চণ্ডী = ৩
১৮ শতক	১৪	১৩	বোড়োবলরাম, লৌকিক, দুর্গা, চণ্ডী, পিঙ্গলাক্ষী, শীতলা, কল্যাণেশ্বরী = ৭
১৯ শতক	৬৬	১৮	গন্ধেশ্বরী, সিংহবাহিনী, শীতলা, বিশালাক্ষী = ৪

সারণি-২ : দোচালা

কাল	ইসলামী	শিব	বৈষ্ণব	অন্যান্য
১৫ শতক	ছোটি দরগাহ (পাণ্ডুয়া)			দ্র : ছোটি দরগাহের ভিতরে দ্বার-শীর্ষ-রূপে ব্যবহৃত। কদম রসুলের পাশে একটি সমাধির উপরেও ক্ষুদ্র দোচালা স্থাপত্য আছে।
১৬ শতক	সালামী দরওয়াজা (পাণ্ডুয়া)			
১৭ শতক	ফতে খানের সমাধি (গৌর)	১		
১৮ শতক	খাজা আনোয়াবের বেড় (বর্ধমান)	৬	১	মৌলীক্ষা, ধর্ম, কালিকা, দুর্গামণ্ডপ (অমরারগড়) = ৪
১৯ শতক	জিন্দাপীরের সমাধি (কলিগ্রাম, মালদহ)			ক্ষীরগ্রাম (বর্ধমান) যোগাদ্যা মন্দিরের পশ্চিম দ্বার, মাণিক পীরের দরগা (ঝিখিরা হাওড়া), হিন্দু পরিবার প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত—হিন্দু ও মুসলিম উভয়েরই স্মারক। = ২

সারণি-৩ : জোড়বাংলা

কাল	শিব	বৈষ্ণব	অন্যান্য
১৬ শতক		১	
১৭ শতক		৫	
১৮ শতক	১	৫	সিদ্ধেশ্বরী, কালী-৩, চণ্ডী, বাশুলি, অন্নপূর্ণা, ধর্ম = ৮
১৯ শতক	১ (শিব-দুর্গা)		দুর্গামণ্ডপ (পাইকপারি), বিশালাক্ষী, বোড়াই চণ্ডী, ক্ষীরগ্রামেব যোগাদ্যা মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বার = ৪

সারণি-৪ : চারচালা

কাল	শিব	বৈষ্ণব	অন্যান্য
১৫ শতক		১	সিংহবাহিনী = ১
১৬ শতক		২	
১৭ শতক	৬	২	কালী, সনকা = ২
১৮ শতক	১৩	২	সর্বমঙ্গলা,জঙ্গলবিলাস পীরের দরগা (বাণীবন) = ২
১৯ শতক	২৪	২	কালী, বিশালাক্ষী, জয়দুর্গা, মনসা, শিবকালী = ৫

সারণি-৫ : আটচালা

কাল	শিব	বৈষ্ণব	অন্যান্য
১৬ শতক	১	১ এবং ৩ (?)	
১৭ শতক	৬০	৫৫	মেলাইচণ্ডী, ভুবনেশ্বরী, ধর্ম-২, পাটেশ্বরী, পতিদুর্গা = ৬
১৮ শতক	১১১	৩৭	দক্ষিণা কালী, গজলক্ষ্মী, বিশালাক্ষী, জয়চণ্ডী-৩, অষ্টনায়িকা দুর্গা, ভৈরবী, সিংহবাহিনী-২, ধর্ম-৩, দ্বারিকাচণ্ডী, শীতলা, দুর্গা, দশভূজা, মহাকাল-ভৈরব, ভীমেশ্বরী = ১৯
১৯ শতক	৪৫	১৫৪	ধর্ম-৬, দক্ষিণা কালী-২, তারা, জয়চণ্ডী-২, শিবদুর্গা, জযদুর্গা, রাজরাজেশ্বরী, বিশালাক্ষী-২, কালী-৪, শীতল-মনসা = ২১

সারণি-৬ : বারোচালা

কাল	শিব	বৈষ্ণব
১৮ শতক		
১৯ শতক	১	
	৪	২

সারণি-৭ : একরত্ন

কাল	শিব	বৈষ্ণব	অন্যান্য
১৭ শতক		১০	
১৮ শতক	৫	২০	জয়দুর্গা, শীতলা, চণ্ডী = ৮
১৯ শতক	৬	৫	গেঁড়িবুড়ি = ১

সারণি-৮ : পঞ্চরত্ন

কাল	শিব	বৈষ্ণব	অন্যান্য
১৭ শতক	২	৮	শীতলা = ১
১৮ শতক	৯	৪৩	কণকদুর্গা, সিংহবাহিনী-২, জয়দুর্গা, মহাবিদ্যা, ভুবনেশ্বরী, শীতলা, চণ্ডী = ৮
১৯ শতক	১৯	৬৪	শীতলা-৬, সিংহবাহিনী, বাশুলি, ধর্ম, চণ্ডী = ১০

সারণি-৯ : নবরত্ন

কাল	শিব	বৈষ্ণব	অন্যান্য
১৬ শতক		২	শীতলা = ১
১৭ শতক	১	৩	
১৮ শতক	৬	৫১	সর্বমঙ্গলা, জগদ্ধাত্রী, গড়চণ্ডী, কঙ্কালেশ্বরী, সত্যনারায়ণ = ৫
১৯ শতক	৬	২৪	বিশালাক্ষ্মী, ব্রহ্মময়ী কালী-৩, নিস্তারিণী কালী-৩, কৃপাময়ী কালী, অন্নপূর্ণা-২, ভুবনেশ্বরী কালী, ভবতারিণী কালী, সর্বমঙ্গলা, হরসুন্দরী কালী = ২৪

সারণি-১০ : **ত্রয়োদশ রত্ন** (১৯ শতক). (ক) বক্রচাল, বৈষ্ণব,২ এবং দুবরাজপুর রীতি-শিব, ৫

সারণি-১১ : **সপ্তদশ রত্ন** (১৯শতক) শিব-২

সারণি-১২ : **পঞ্চবিংশতি রত্ন**, (ক) বৈষ্ণব-৪ (১৮ শতক) এবং আনন্দভৈরবী কালী-১ (১৯ শতক)

সারণি-১৩ : গিরিগোবর্ধন (১৯ শতক), বৈষ্ণব-৫

সারণি-১৪ : মিশ্র (১৯ শতক), শিব-১ বৈষ্ণব-৬, শিব-অন্নপূর্ণা-১, সিংহবাহিনী-২

সারণি-১৫ : মুসলিম-প্রভাবিত গম্বুজ :

ষোড়শ শতক শিব-১, ভৈরবী-১

সপ্তদশ শতক . কামতেশ্বরী-১

অষ্টাদশ শতক . হরিহর-১

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতক : শিব-১

উনবিংশ শতক-শিব-২, সিদ্ধেশ্বরী-১=৮

সারণি-১৬, দালান

কাল	শিব	বৈষ্ণব	অন্যান্য
১৮ শতক	৪	১৮	চাঁদ রায়, ধর্ম, সিদ্ধেশ্বরী কালী, সত্যনারায়ণ, শীতলা, নৃত্যকালী = ৬
১৯ শতক	৫	৩৭	চাঁদ রায়-২, বিশালাক্ষ্মী, ধর্ম-৩, সিদ্ধেশ্বরী কালী-২, শীতলা-৪, সত্যনারায়ণ, নৃত্যকালী, কালী, নিস্তারিণী কালী, ভদ্রকালী,মহাকালী, দক্ষিণা কালী, ষষ্ঠী, শীতলা-মনসা, ধনেশ্বরী, বিন্ধ্যবাসিনী, জগদ্ধাত্রী = ২৪

(দুর্গাদালান, ঠাকুরদালান, রাজবাড়ি-সদৃশ দালান প্রভৃতি এই তালিকায় ধরা হয়নি)

উপরের সারণিগুলি সম্পূর্ণ নয়, যা আগেই বলা হয়েছে। পরন্তু জোড়া মন্দির থেকে ১০৮ মন্দির পর্যন্ত গুচ্ছ মন্দির গুলিকে উপরের সারণিগুলিতে ধরা হয়নি---ধরলে শিব-মন্দিরের সংখ্যা অনেক বেশি হত, কারণ ঐ মন্দিরগুলিতে শিব প্রায় একছত্র। অপিচ, মূল প্রবণতাগুলি ঐ সারণিগুলিতে ঠিকঠাকই ধরা পড়েছে :

১. প্রাক-মুসলিম কাল থেকেই বাংলায় শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও লৌকিক ধারা গুলি নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে---মন্দিরগুলিই প্রমাণ, এই সব কৃষ্টির মধ্যেই স্থায়ী আসন দখল করে আছে জৈন ও বৌদ্ধ অবশেষ। প্রাক-মুসলিম বিষ্ণু মন্দির একটিও টিকে নেই, তবে অন্য প্রমাণ আছে। আমরা দেখেছি যে, মৌর্যযুগে আর্যভাষাগোষ্ঠীর আগমনের আগেই এই বঙ্গে যথেষ্ট উন্নত কৃষ্টি গড়ে উঠেছিল---সেইসব কৃষ্টির উপাদান কতটা রয়ে গেছে বাংলার ধর্মসাংস্কৃতিক জীবনে, বিশেষত লৌকিক দেবদেবী ও ধর্মের আকারে, তা আমরা জানিনা। কিন্তু বাঁকুড়ার হাকন্দ মন্দিরটি জানাচ্ছে যে প্রাক-মুসলিম কালেই ধর্ম-ঠাকুর কত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন---প্রকৃত পক্ষে আমরা যতটা অনুমান করতে পারি ধর্ম-ঠাকুর হয়ত সেকালেই তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন, নইলে তাঁর উদ্দেশ্যে অত বড় দেউল দেওয়া কেন? লোকক্ষেত্রে একই সাক্ষ্য দেয় বাগুলি ও রঙ্কিণীর প্রাক-মুসলিম দেউল দুটি। আবার যথাক্রমে দশভূজা ও গজলক্ষ্মীর

প্রাক-মুসলিম দেউল দুটি শাক্ত ধারার সাক্ষ্য। আমাদের দেশে সবকিছুতেই তর্ক— এসব ক্ষেত্রেও তর্ক তোলা যায় এই বলে যে আদতে এগুলি অন্য (এমনকি জৈন) মন্দির ছিল, বলা যায় কিন্তু প্রমাণ করা যায় না। তবে সাত/আটশো বছর ধরে অঞ্চলের মানুষজন মন্দিরগুলিকে ঐসব নামেই জেনে আসছেন, পরম্পরাটি খুব সহজে উড়িয়ে দেওয়ার নয়।—আমরা এখানে শুধুমাত্র প্রথম সারণিটির উল্লেখ করলাম, কিন্তু অন্য সারণিগুলি পরীক্ষা করলেও দেখা যাবে যে সমগ্র ঐতিহাসিক কাল জুড়ে বাঙালি হিন্দুর সংস্কৃতিতে শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব ও লৌকিক— সব ক'টি ধারাই অর্থপূর্ণ ভাবে সজীব থেকেছে, কোনও বিশেষকালে কোনও বিশেষ ধারা অপেক্ষাকৃত প্রবল হয়েছে, এইমাত্র।

২. সাধারণ বিশ্বাসের বিপরীতে তুর্কী-বিজয়োত্তর কালেও মন্দির-নির্মাণ একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়নি। উপরের সারণিতে চতুর্দশ শতকের মাত্র দুটি দেউল (ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর, ডিহর, বাঁকুড়া) উল্লেখিত হয়েছে কিন্তু অন্য প্রমাণ আরও আছে। যাই হোক, খ্রীষ্টীয় ৭ম/৮ম শতক থেকে উনিশ শতকের শেষকাল পর্যন্ত কোনো শতকেই বাংলায় মন্দির-নির্মাণ বন্ধ থাকেনি।

৩. প্রখর চৈতন্য-প্রভাবিত কালেও, অর্থাৎ ষোড়শ সপ্তদশ শতকেও, শৈব-শাক্ত ও লৌকিক দেবদেবীর মন্দির-প্রতিষ্টা উল্লেখযোগ্যভাবেই চলিত ছিল—ঠিক যেমন রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত-বামাক্ষ্যাপা-রামকৃষ্ণ প্রভাবিত কালেও বৈষ্ণব মন্দির-প্রতিষ্ঠায় তেমন ভাঁটা পড়েনি। অন্যদিকে, চৈতন্যের প্রভাব যেকালে প্রবল ছিল, সেই কালই আবার মঙ্গলকাব্যগুলির সর্ব্বোচ্চ প্রকাশের যুগ। শুধু তাই নয়—মঙ্গলকাব্যগুলিতে চৈতন্যপন্থার অনেক কিছুই সাদরে গৃহীত হল যদিও কাব্যগুলির উদ্দেশ্য হল চণ্ডী, মনসা, ধর্ম প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ লোকদেবতা বা লোকদেবীর মহিমা বর্ণনা করা। অন্যদিকে লৌকিক সহজিয়া বাউলরা বৈষ্ণব শাখাগুলিতে আশ্রয় পেয়ে গেলেন এবং স্বয়ং চৈতন্য পুরী-যাত্রার আগে ছত্রভোগের কাছে অম্বুলিঙ্গ শিব দর্শন করে আনন্দিত হন। মন্দির-টেরাকোটায় ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট—যেমন আঁটপুরের রাধাগোবিন্দ মন্দির গাত্রে কালী ও দুর্গার দর্শনীয় প্যানেল তো আছেই, অঘোরপন্থী শৈব মহান্তের নগ্ন নৃত্যের প্যানেলও আছে—অন্যদিকে বড়-নগরের চারবাংলা শিব মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের অসামান্য প্যানেল যেমন আছে তেমনই কমলে কামিনীর প্যানেলও আঁছে—এমন দৃষ্টান্ত দুই শতাধিক মন্দিরে আছে। গোড়াপন্থী অসহিষ্ণুতার (যেমন চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাসের উচ্চারণ—"ছিণ্ডোঁ ছিণ্ডোঁ পাষণ্ডীর মাথা,"* ছকের অন্তরালে আরো বলশালী সামাজিক সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়ের ছক না থাকলে মন্দির-ক্ষেত্রে অমন দৃষ্টান্ত রচনা অসম্ভব ছিল।

৪. উপরে বাঙালি হিন্দু সমাজে সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়-প্রচেষ্টার ইঙ্গিতের যে আভাস আছে, তারচেয়েও বড় ও গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয়ের প্রমাণ আছে মন্দির-স্থাপত্যে, তা হল হিন্দু ও ইসলামী স্থাপত্যরীতির সমণ্বয়। দোচালা স্থাপত্যের বঙ্গীয় নিদর্শনগুলির মধ্যে প্রাচীনতম যেগুলি, সেগুলির সব কটিই সুলতানী যুগের ইসলামী স্থাপত্য। এর পূর্ব্ববর্তী চালা স্থাপত্যের নিদর্শন বা তার

* প্রাগুক্ত সংস্কররণ, মধ্যখণ্ড, পৃ. ১২১।

লিপি-প্রমান বঙ্গদেশে পাওয়া যায়নি, বাংলার বাইরে যে দুটি ক্ষেত্রে (ববাবর পাহাড় ও মামল্লপুরম) আছে, সেগুলির দ্বারা সুলতানী স্থপতিদের প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ ছিল না, তাঁরা হয়ত প্রভাবিত হয়েছিলেন বাংলার বক্রচাল কুটিরের সৌন্দর্য-দ্বারা। মন্দির-স্থাপত্যে চালা স্থাপত্য শুধু গৃহীতই হল না—দোচালা, চারচালা-আটচালা-বারোচালা স্থাপত্যের বৈচিত্র-সম্পদে বিপুলভাবে উদ্ভাসিত হল। বক্রচাল দালানও তাই (স্মরণীয় পাণ্ডুয়ার 'ছোট সোনা মসজিদ')। ছাদের চারপাশের কোণে ও মাঝে মিনার বসিয়ে স্থাপত্যকে সাজানো ইসলামী রীতি (স্মরণীয় গৌড়ের 'কদম রসুল')—এই কায়দাটি মন্দিব-স্থাপত্যে গৃহীত হল, কিন্তু মিনারের জায়গায় বসানো হল উত্তর ভারতীয় নাগর দেউলের অনুকৃতি. এমনকি পূর্ণ নাগর দেউল। গর্ভগৃহের ছাদ-নির্মাণেও ব্যবহৃত হল মুসলিম গম্বুজ নির্মাণের প্রযুক্তি, কোনও কোনও জায়গায় মুসলিম গম্বুজই ছাদ হিসেবে ব্যবহৃত হল।

৫. রত্নরীতির মন্দির বৈষ্ণব-সমাজে অধিকতর আদৃত হয়েছে, দালান রীতিও তাই—অন্য সব রীতিতেই শিব মন্দিরের সংখ্যা বেশি (জোড়া মন্দির ও গুচ্ছ মন্দিরগুলি ধরলে আরও বেশি হবে)। লৌকিক দেবতা ও দেবীগণও প্রায় সব রীতিব মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। তবে রত্নরীতির প্রতি বৈষ্ণবদের এবং দেউল ও আটচালা মন্দিরের প্রতি শৈবদের বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়—বিষয়টি আকর্ষক হলেও ব্যাখ্যা করা শক্ত। একজন গ্রামবৃদ্ধা বর্তমান লেখককে বলেছিলেন কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের সঙ্গে রত্নরীতি বেশ মানানসই, শিবের স্বয়ম্ভু রূপের সঙ্গে দেউল এবং ভোলানাথ রূপের সঙ্গে আটচালা বেশ খাপ খায়—অভিমতটি অপ্রামাণ্য, কিন্তু চিত্তাকর্ষক।

উপরের মন্তব্যগুলি আসলে এক প্রকার সাধারণীকরণ—এগুলিকে মজবুত ভিতের উপরে দাঁড় করাতে হলে চাই বিশেষ অঞ্চল এবং বিশেষ মন্দির বিষয়ে বাস্তব দৃষ্টান্ত-ভিত্তিক আলোচনা—এই বইয়ের দ্বিতীয় পর্বে পঞ্জিকরণ-কালে 'প্রাসঙ্গিকী' নামের বিশেষ অনুচ্ছেদগুলিতে আমরা সাধ্যমতন সেই চেষ্টা করব।

৪

ব্রতছড়ায় প্রকৃতি ও মন

যে কোনো কলার মতই মন্দিরকলারও জন্ম প্রকৃতি ও মনোভূমি থেকে। এক্ষেত্রে প্রকৃতিটি হল বঙ্গপ্রকৃতি এবং মনোভূমিটি হল বাংলার মনোভূমি। বাংলার মেয়েদের ব্রতছড়ায় এই দুটি দিকের সহজ, স্বাভাবিক ও আন্তরিক প্রকাশ আছে—এত সহজ যে বোঝাই যায় না এর অন্তহীন গভীরতা; এত স্বাভাবিক যে বীজ থেকে অঙ্কুর, ডাল থেকে পাতা গজানোর মত তা টেরই পাওয়া যায় না; এত আন্তরিক যে শ্বাস-প্রশ্বাসের মত তা স্তব্ধ হলে প্রাণটিই থাকে না।

(ক) এসো পৃথিবী, বসো পদ্মপাতে।
শঙ্খচক্র ধরি হাতে।।
খাওয়াবো ক্ষীর মাখাবো ননী।
আমি হই যেন রাজার রানী।।

[পৃথিবী ব্রত[১]]

(খ) এ নদী সে নদী এক খানে মুখ,
ভাদুলি ঠাকুরানী ঘুচাবেন দুখ।
এ নদী সে নদী একখানে মুখ,
দিবেন ভাদুলি তিনকুলে সুখ।।
* * * * * *
নদী নদী কোথা যাও
বাপ ভায়ের বার্তা দাও,
নদী নদী কোথা যাও
শ্বশুর-স্বামীর খবর দাও।

[ভাদুলি ব্রত[২]]

(গ) বট্ আছেন, পাকুড় আছেন, তুলসী আছেন পাটে,
বসুধারা ব্রত করলাম তিন বৃক্ষের মাঝে।
মায়ের কুলে ফুল, শ্বশুরের কুলে তারা,
তিন কুলে পড়বে জল গঙ্গার ধারা।

[বসুধারা ব্রত[৩]]

(ঘ) পুণ্যি পুকুর পুষ্পমালা
কে পূজেরে দুপুরবেলা?
আমি সতী লীলাবতী,
সাত ভায়ের বোন ভাগ্যবতী।

[পুণ্যিপুকুর ব্রত[৪]]

(ঙ) সন্ধ্যামণি কনকতারা
সন্ধ্যামণি জলের ধারা।
এই ব্রত যে নারী করে।
সাত ভায়ের বোন বলি তারে।

[সন্ধ্যামণি ব্রত[৫]]

(চ) শিল শিলাটন শিলে বাটন শিল অঝঝর ধরে।
স্বর্গ হতে মহাদেব বলেন গৌরী কি বস্তু করে।।
আশ নড়ে পাশ নড়ে সিংহাসন।
হরগৌরী কোলে করে গৌরী আরাধন।।

[শিব ব্রত[৬]]

(ছ) হরি হরি বৈশাখ মাস,
কোন্ শাস্ত্রে পড়লো মাস?
চন্দনে ডুবু ডুবু হরির পা,
হরি বলেন মা গো মা
আজ কেন আমার শীতল পা?

[হরির চরণ ব্রত[৭]]*

বাস্তুশাস্ত্রসমূহে একবাক্যে বলা হয়েছে যে মন্দির হল ব্রহ্মাণ্ডের অনুকৃতি— মন্দিরের ইষ্টকন্যাস হল পৃথিবীর গর্ভাধান। ব্রতছড়াতে পৃথিবীকে শঙ্খচক্র হাতে ধরে পদ্মপাতায় বসতে বলে বাংলার মেয়েরা শাস্ত্রগ্রন্থ ছাড়াই সেই সত্য প্রকাশ করলেন অন্তরের সহজ অনুভবে। আচার্য বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় তেমন, অন্যান্য বাস্তুশাস্ত্রেও তেমন বলা হয়েছে যে যেখানে নদী নেই, পুকুর নেই, বৃক্ষ নেই বা পুষ্পকানন নেই সেখানে দেবতারা থাকেন না। প্রকৃতিই মানুষ ও দেবতার মেলবন্ধন ঘটায়—এই সত্যানুভব প্রকাশ করতে বাংলার মেয়েদের কোনো শাস্ত্র বা কোনো গুরুভার তত্ত্বদর্শন দরকার হয়নি একেবারেই। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে মন্দির 'শিব ও শক্তির একাত্মক প্রকাশ'—কিন্তু বাংলার যে মেয়েরা "হরগৌরী কোলে করে গৌরী আরাধন" করেন তাঁদের কষ্ট করে শাস্ত্র পড়ে ঐ কথা জানতে হয়নি। হর-হরি এখানে নিতান্তই 'ফ্যামিলি মেম্‌বার।' হরি তো কোলের নাড়ুগোপাল—পায়ে চন্দন মাখাতেই বেচারীর সর্দি লেগে যাচ্ছে।

দেবতাকে এইভাবে ঘরের লোক মনে করা, নিজের ঘরকে দেবতার আর দেবতার ঘরকে নিজের মনে করাই বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের সার কথা।

*১ ৭ : 'বাংলার ব্রতপার্বন', ড. শীলা বসাক, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৭। পৃ. যথাক্রমে ১৩০-৩১, ৪৩-৪৪, ১৩৪, ১৩১, ৪৩, ৪২, ৪১-৪২।

৫

ব্রতছড়ায় বাংলার মন্দির

মন্দির যে বাঙালির সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল, তার প্রমাণ আছে বাংলার ব্রতছাড়ায়—অন্যভাবে বলা যায় যে বাঙালির সংস্কৃতির একে-বারে অন্দরমহলে প্রবেশ না করলে বাংলার মেয়েদের ব্রত বা ব্রতছাড়ায় মন্দিরের উল্লেখ থাকত না। ড: শীলা বসাকের গ্রন্থ* থেকে তিনটি উদাহরণ উদ্ধার করা যায়:

(ক) নাট মন্দির জোড় বাঙ্গালা
দোরে হাতি বাইরে ঘোড়া।
দাস-দাসী, গো মহিষী
গির্দ্দে আসে পাশে
রূপ-যৌবন সবাই সুখী স্বামী ভালবাসে।

[সেঁজুতি ব্রত]

(খ) আগদেউল পাছদেউল
মধ্যে হইল চম্পা দেউল
চম্পা দেউলে হবে বাজা
মুই তার প্রিয় ভার্যা।

[দেউলপূজা ব্রত]

(গ) আসকৌটি বাসকৌটি
নিত্য পূজোং ঘব দেউটি
ঘর দেউটিক নমস্কার,
নিত্য আসুক ধানের ভার

[বাটেশ্বরা পূজা ব্রত]

নাটমন্দির (যেখানে কীর্তন, গানবাজনা, অভিনয় ইত্যাদি হত) ও জোড়বাংলা স্থাপত্য অধিকারীর আর্থিক স্বচ্ছলতা বোঝাত, দরজায় হাতি-ঘোড়া শুধু ধনী মানুষেরই থাকত, গোয়ালভরা গরু-মহিষও তাই। সংসারে প্রচুর দাসদাসী থাকলে গিন্নীর কিছু করার থাকেনা—তিনি আশপাশে রাখা তাকিয়া (গির্দা)-গুলিতে হেলান দিয়ে আরাম করেন ও হুকুম দেন। এমন ঘর পাওয়া ছিল গ্রামবাংলার মেয়েদের গভীর গভীরতর স্বপ্ন। নাটমন্দির ও জোড়বাংলা যে এমন প্রাণের স্বপ্নেও জায়গা করে নিল তাতেই বোঝা যায় বাঙালি মনে এগুলির স্থান ছিল কত নিবিড়।

* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪, ২২৭ ও ২২৮।

দেউল (নাগর দেউল) উত্তর ভাবতীয় মন্দিরকলার অতি সম্মানিত রূপ। সুদূর-দক্ষিণ ছাড়া ভারতের সর্বত্রই বক্ররেখ শিখর দেউল ভক্ত ও কলারসিক উভয়কেই মুগ্ধ করে। পরন্তু বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে শি ও শক্তির একাত্মক প্রকাশ হিসেবে দেউল নিজেই ধ্যেয় ও পূজ্য— 'দেউলপূজা ব্রত' যেন অত্যাশ্চর্যভাবে সেই স্মৃতি বহন করছে—বিষয়টি আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এই ব্রতের 'দেউল'-নির্মাণ পদ্ধতিটি লক্ষ্য করলে। ডঃ শীলা বসাক লিখেছেন: " এই ব্রতে প্রথমে দেউল তৈরি করে তাকে পুজো করতে হয়। প্রথমে চারটি মাটির ঢেলা চতুর্ভুজ আকারে এবং তার উপরে আরও চারটি ও তার উপর দুটি মাটির ঢেলা দিয়ে মন্দিরের মতো দেউল তৈরি করতে হয়।"* দেউলের চতুর্ভুজ গর্ভগৃহ বৈদিক যজ্ঞবেদীর স্মারক, বক্র রেখ আকার বাঁশ-খড়ের বৈদিক পটমণ্ডপের--- প্রথম চারটি মাচির ঢেলা হল 'বাড' ও তার উপরের মাটির দুটি ছোট ঢেলা হল 'গণ্ডী' এবং এইভাবে একটি বক্ররেখ শিখর দেউলের আদল পাওয়া গেল। বহুযুগ-লালিত একটি স্মৃতি এইভাবে গ্রামবাংলার (এক্ষেত্রে কোচ-বিহার জেলার) ব্রতিনীদের মাধ্যমে মূর্ত হল।

সংসারের যে ঘরে দেবীদেবতার নিত্য পুজো হয়, সে ঘরতো ভগবানেই ঘর, সে ঘরের দীপ (দেউটি) হল ভগবানের ঘরেরই দীপ, তাই "ঘর দেউটিক নমস্কার"—ঘর ও মন্দির একাকার হয়ে আছে বাঙালির চেতনায়।

* প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

৬

মহৎ কবির কবিতায় মন্দির

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

নদী-তীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিব-মন্দির

এ মন্দির-বৃন্দ হেথা কে নির্মিল কবে?
কোন্ জন? কোন্ কালে? জিজ্ঞাসিব কারে?
কহ মোরে কহ তুমি কল কল রবে,
ভুলে যদি, কল্লোলিনি, না থাক লো তারে।
এ দেউল-বর্গ গাঁথি উৎসর্গিল যবে
সে জন, ভাবিল কি সে, মাতি অহঙ্কারে,
থাকিবে এ কীর্তি তার চিরদিন ভাবি,
দীপরূপে আলো করি বিস্মৃতি-আঁধারে?
বৃথা ভাব, প্রবাহিনি, দেখ ভাবি মনে।
কি আছে লো চিরস্থায়ী এ ভবমণ্ডলে?
গুঁড়া হয়ে উড়ি যায় কালের পীড়নে
পাথর; হুতাশে তার কি ধাতু না গলে?—
কোথা সে? কোথা বা নাম? ধন? লো ললনে?
হায়, গত, যথা বিম্ব তব চল জলে!

—'চতুর্দশপদী কবিতাবলী', ৪২
[১৮৬৬-তে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভগ্ন মন্দির

ভাঙা দেউলের দেবতা,
তব বন্দনা রচিতে ছিন্না বীণার তন্ত্রী বিরতা—
সন্ধ্যাগগনে ঘোষে না শঙ্খ তোমার আরতিবারতা।
তব মন্দির স্থিরগম্ভীর ভাঙা দেউলের দেবতা!

তব জনহীন ভবনে
থেকে থেকে আসে ব্যাকুল গন্ধ নববসন্তপবনে।
যে ফুলে রচেনি পূজার অর্ঘ্য, রাখেনি ও রাঙা চরণে,
সে ফুল ফোটার আসে সমাচার জনহীন ভাঙা ভবনে।।

পূজাহীন তব পূজারি
কোথা সারাদিন ফিরে উদাসীন কার প্রসাদের ভিখারি
গোধূলিবেলায় বনের ছায়ায় চির-উপবাস-ভুখারি!
ভাঙা মন্দিরে আসে ফিরে ফিরে পূজাহীন তব পূজারি।।

ভাঙা দেউলের দেবতা,
কত উৎসব হইল নীরব, কত পূজানিশা বিগতা।
কত বিজয়ায় নবীন প্রতিমা কত যায় কত কব তা,
শুধু চিরদিন থাকে সেবাহীন ভাঙা দেউলের দেবতা।।

—'কল্পনা' (১৩০৭ বঙ্গাব্দ)

ভাঙা মন্দির

২

প্রতিমা না-হয় হয়েছে চূর্ণ,
বেদীতে না-হয় শূন্যতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়,
না-হয় ধুলায় হল লুণ্ঠিত
আছিল যে চূড়া উন্নতা,
সজ্জা না থাকে কিসের লজ্জা ভয়।
বাহিরে তোমার ওই দেখো ছবি,
ভগ্নভিত্তিলগ্ন মাধবী,
নীলাম্বরের প্রাঙ্গণে রবি
হেরিয়া হাসিছে স্নেহে।
বাতাসে পুলকি আলোকে আকুলি
আন্দোলি উঠে মঞ্জরীগুলি,
নবীন প্রাণের হিল্লোল তুলি
প্রাচীন তোমার গেহে।
সুন্দর এসে ওই হেসে হেসে
ভরি দিল তব শূন্যতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
ভিত্তিরন্ধ্রে বাজে আনন্দে
ঢাকি দিয়া তব ক্ষুণ্নতা
রূপের শঙ্খে অসংখ্য জয় জয়।

[মাঘ ১৩৩০; পূরবী]

বিষ্ণু দে

গোটা মাটিই মন্দির

মন্দিরের দেশ ছিল, গোটা মাটিই মন্দির।
এখন লোপাট সব, ভাঙা-চোরা রক্তিম মাটির
চতুর্দিকে ভগ্নস্তূপ, শতছিন্নভিন্ন মূর্তি।
নেই সেই গোপাল ছেলেরা, রাখালের খেলা নেই
প্রাণেব অস্থির কৈশোরের স্ফূর্তি নেই।
যৌবনেব সম্মিলিত মেলা নেই, রাস ভাঙা, মেলা নেই,
ধুঁয়ার ছলনা কাঁদা পরিপাটি কৌতুকের খেলা নেই।

খুজে-খুজে বৃথা ঘোরা, মন চোখ পায় না চেনাকে
যা ছিল সুন্দর স্বপ্ন, শুধু দেখা ঘায়ে-ঘায়ে—মারে-মারে
সব চূর্ণ ধূলিসাৎ মতিচ্ছন্ন শৃগাল দাপটে, শুধু আছে তেপান্তর
ব্যাপ্ত জনপদে শুধুই ধ্বংসের শূন্য রূপ,
নৃশংস লোভেব শতক্ষতে অন্ধ দগ্ধ।
কোনো মূর্তি ওঠে না দু-চোখে, নেই
এমনকি কালীয়দমনও।।

—'ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে' (১৯৬৬-৬৯)

৭

বাঙালি হিন্দু সমাজ-সাক্ষ্য (১৯ শতক)

[মন্দির সামাজিক কর্মপ্রচেষ্টার ফল। মন্দির বুঝতে হলে আগে সমাজকে বোঝা চাই। কিন্তু ১৯ শতকের পূর্ববর্তীকালের বাঙালি সমাজের প্রত্যক্ষ বিবরণী মেলে না। পুরাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য, প্রশাসনিক দলিলপত্র প্রভৃতিতে পরোক্ষ সূত্র আছে কিন্তু সেগুলির ব্যাখ্যায় নানা মুনির নানা মত। ১৯ শতকের প্রথম দশকগুলি খুব তাৎপর্যপূর্ণ—একদিকে প্রাক-১৯ শতকীয় সমাজ বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় পুরো মাত্রায় রয়ে গেছে ও অন্যদিকে ইংরাজ শাসন ও শিক্ষাপ্রভাবে পরিবর্তনের ধাক্কা আসতে শুরু করেছে। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'য় সংকলিত খবরগুলিতে এর প্রত্যক্ষ বিবরণ আছে এবং ডিরোজিও, ইয়ং বেঙ্গল, রামমোহন, ব্রাহ্ম-আন্দোলন, তত্ত্ববোধিনী, খ্রীষ্টানীকরণ, মাইকেল মধুসূদন, বাবুগিরি. বিধবা-বিবাহ, সংবাদ-প্রভাকর,—ইত্যাকার ব্যাপারসমূহ সকলের জানা, উল্লেখও বাহুল্য। ১৮৭০-৭২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিপরীত ক্রিয়া শুরু হয়েছে। একদিকে পাশ্চাত্য নীতি-শাস্ত্রের প্রভাবে শ্লীলতা-অশ্লীলতা বাতিক দেখা দিয়েছে—ভারতচন্দ্র থেকে মন্দিরগাত্রের মিথুন ভাস্কর্য অশ্লীল ঠেকছে, অন্যদিকে খ্রীষ্টান হওয়া তো বন্ধ হয়েইছে এমনকি ব্রহ্মবাদীরাও নব্য-হিন্দুয়ানিতে আশ্রয় নিচ্ছেন এবং হিন্দু আচার ও সংস্কারেব 'বিজ্ঞান-সম্মত' ব্যাখ্যা হাজির হচ্ছে। পাঠকজনের সুবিধা হবে ভেবে নীচে সেকালের সংবাদ, নক্সা এবং সঙের গানের একটি ক্ষুদ্র সংকলন পেশ করা হল—এগুলি নিজেরাই সব বলে; ব্যাখ্যা অবান্তর।]

(ক)

সংবাদ-দর্পণে বাঙালি হিন্দু সমাজ (১৮১৮-৩০)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত **সংবাদপত্রে সেকালের কথা**, প্রথম খণ্ড, ১৮১৮-১৮৩০, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তৃতীয় সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৭৭ :

(১) ২০ মার্চ ১৮১৯। ৮ চৈত্র ১২২৫। **শ্রীরামপুরের টোল।** —শ্রীরামপুরস্থ সাহেবরা মোং শ্রীরামপুরে এক কালেজ অর্থাৎ বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে ক্রমে ২ বিদ্যার্থিগণ নিযুক্ত হইতেছে ....। (পৃ ১৮)

(২) ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১৭ ফাল্গুন ১২৩০। **সংস্কৃত কালেজের প্রস্তর স্থাপন।** —২৫ ফেব্রুয়ারি বুধবারু বৈকালে সংস্কৃত কালেজ নামক বিদ্যালয়ের নিমিত্ত যে স্থান পটলডাঙ্গায় প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে বাস্তু প্রস্তর সংস্থাপন হইয়াছে। .... (পৃ ২৫)

(৩) ১৩ মে ১৮২৬। ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩। **হিন্দুকালেজ।** —আমরা পূর্বে প্রকাশ করিয়াছি যে পটলডাঙ্গার পাঠশালা ঘর প্রস্তুত হইলে হিন্দুকালেজ ঐ ঘরে আসিবেক এক্ষণে আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ২০ বৈশাখ সোমবার সংস্কৃত পাঠশালা ও হিন্দুকালেজ বিদ্যালয় ঐ বাটিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ... (পৃ. ২৮)

(৪) ৭ মার্চ ১৮২৯। ২৫ ফাল্গুন ১২৩৫। **ভবানীপুরের স্কুল।** . গত পাঁচ ছয় বৎসরের

মধ্যে এ দেশে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষাকরণার্থে যে উদ্যোগ হইতেছে তাহা অত্যাশ্চর্য্য। ইহার পূর্ব্বে আমরা শুনিতাম যে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার ছাত্রেরা যৎকিঞ্চিৎ পড়াশুনা করিয়া কেরাণিরদের পদপ্রাপণার্থে সেই ভাষা শিক্ষা করিত কিন্তু আমরা এখন অত্যাশ্চর্য্য দেখিতেছি যে এতদ্দেশীয় বালকেরা ইংগ্লণ্ডীয় অতিশয় কঠিন পুস্তক ও গূঢ় বিদ্যা আক্রমণ করিতে সাহসিক হইয়াছে এবং ভাষার মধ্যে যাহা অতিশয় দুঃশিক্ষণীয় তাহা আপনারদেব অধিকারে আনিযাছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দু কালেজের বিদ্যার্থিবা ও শ্রীযুত রামমোহন রায় ও শ্রীযুত জগমোহন বসুর পাঠশালার ছত্রেরা ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেদের নিকটে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার উত্তর পরীক্ষা দিয়াছে। (পৃ. ৩৭)

(৫) ১৬ মার্চ ১৮২২। ৪ চৈত্র ১২২৮। **চতুষ্পাটি।** — মোকাম কলিকাতার হাতিবাগানে শ্রীযুত হরচন্দ্র তর্কভূষণ চতুষ্পাটি করিয়া ২৮ ফাল্গুন রবিবারে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনারম্ভ করিয়াছেন।.... (পৃ. ৩৮)

(৬) ১৩ মার্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬। হরিনাভিবাসি শ্রীযুত **রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য** খ্যাত অধ্যাপক এই মহানগব কলিকাতার আড়পুলিতে চতুষ্পাঠী করিয়া বহু দিবসাবধি অধ্যাপনা করিতেছেন .. । (পৃ. ৩৯)

(৭) ২১ নবেম্বব ১৮১৮। ৭ অগ্রাহায়ণ ১২২৫। ....—অনন্যসাধারণ পণ্ডিতাশ্রয় মহামহোপাধ্যায় মহারাজ গুরু শ্রীযুত **রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য** এতাবৎ কাল বিষয়সুখানুভব করিয়া সম্প্রতি স্বানুরূপ পুত্রে স্বকীয় ধন সম্পত্তি শিষ্যাদি সমর্পণ করিয়া কাশীবাসাভিলাষী হইয়া প্রস্থান কবিযাছেন। (পৃ. ৩৯)

(৮) ১২ ডিসেম্বর ১৮১৮। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২২৫। —সুপ্রীমকোর্টের পণ্ডিত শ্রীযুত **মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য** শ্রীযুত বিচাবক সাহেবেরদের নিকটে চারি মাসের বিদায় লইয়া কাশী তীর্থ দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছেন। (পৃ ৪০)।

(৯) **সম্পাদকীয়** : ১৮১৫ সনে রামমোহন ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' প্রকাশ করেন। কিন্তু কেবলমাত্র বাংলা অনুবাদসহ বেদান্তসূত্র প্রকাশ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, সমগ্র শাঙ্কব ভায্য পৃথক মুদ্রিত করিয়াছিলেন। —এ সংবাদ রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্তৃক পুনঃ প্রকাশিত 'রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি'-র ৮১২ পৃষ্ঠায় আছে। (পৃ. ৩৯২)।

(১০) ২৪ আগষ্ট ১৮২২। ৯ ভাদ্র ১২২৯। ইস্তাহার। —বাঙ্গালায় ইংরেজী বিদ্যার্থি সকলের প্রয়োজনার্হ প্রসিদ্ধ **জান্সন্স ডিক্সানেরি।** শ্রীযুত জন মেন্দিস সাহেব কর্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গলায সংগৃহীত হইল এবং কএক দিবস ছাপা সমাপ্ত হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় বিক্রয় হইতেছে। মূল্য ৮ টাকা। (পৃ. ৬৬)।

(১১) ১১ জুন ১৮২৫। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২। **বাঙ্গলা ডেক্‌সিয়ানরি।** —আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে শহর শ্রীরামপুরনিবাসি **শ্রীযুত ডাক্তর কেরি সাহেব** পোনর বৎসর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া বাঙ্গালা ও ইংরাজী ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা শহর শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ছাপা হইয়া গত সপ্তাহে সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং গ্রাহকেরদের নিকট

প্রেরিতও হইতেছে। ..... ইহার মূল্য চামড়া বাইণ্ডসমেত ১১০ এক শত দশ টাকা নিরূপিত হইয়াছে। ....। (পৃ. ৬৯)।

[উল্লেখ্য 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'-য় ১৮১৮-১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত যে সমস্ত গ্রন্থের সংবাদ আছে, কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, তার সবই বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্র-গ্রন্থ বিষয়ক— বইগুলি ছাপা হয়েছিল শ্রীরামপুরের ছাপাখানা ছাড়াও কলকাতার কলুটোলার চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়, বহু বাজারের লেবেণ্ডর সাহেবের ছাপাখানা, মীরজাপুরের সম্বাদ-তিমিরনাশক এবং মুন্সী হেদাতুল্লার ছাপাখানায়।]

(১২) ৯ জুলাই ১৮২৫। ২৭ আষাঢ় ১২৩২। **কলিকাতার নক্সা।** —অল্প দিবস হইল কলিকাতায় মেজর সক সাহেব কর্তৃক কলিকাতা নগরের এক নক্সা প্রস্তুত হইয়াছে ভারতবর্ষের মধ্যে এ অতিপ্রধান কর্ম্ম হইয়াছে। ঐ নক্সাতে প্রত্যেক রাস্তা ও গলি এবং সে সকলের পরিমাণ পর্যন্ত স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। ....

অল্পকালেতে যে কোন নগর এমত বৃর্দ্ধিযুও হইয়াছে ইহা আমরা প্রায় কখন শুনি নাই। চিতপুরের যে ব্যাঘ্র ভীতি তাহা অদ্যাপি লোকেবা কহে এবং যাহারা চৌরঙ্গির বন দর্শন করিয়াছে এমত লোকও অদ্যাপি আছে। (পৃ. ৭১)।

(১৩) ১০ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ২৭ ভাদ্র ১২৩২। —**শ্রীযুতপ্রিনসেপ সাহেব** কাশীধামে গমনপূর্ব্বক ঐ স্থানের প্রত্যেক রাস্তা ও গলি ও অট্টালিকা এবং কাশীতলবাহিনী গঙ্গা প্রভৃতির নক্শা করিয়া ইংগ্লণ্ডে প্রেবণ করিযাছিলেন . .. ঐ নক্শা ছাপা হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। .... (পৃ ৭১)

(১৪) ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৫। ২৫ মাঘ ১২৩১। **সকের কবিতার বৃত্তান্ত।**—পটলডাঙ্গানিবাসি শ্রীযুত বাবু রূপনারায়ণ ঘোষাল মহাশয়ের বাটীতে শ্রীশ্রীবাগ্দেবী পূজোপলক্ষ্যে কলিকাতা মহানগরীর অনেক বর্দ্ধিষ্ণু সন্তানেরা ঐ স্থানে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক সকের কবিতা পরস্পর গাহনা করিয়াছেন ....। (পৃ. ১২৬)।

(১৫) ২০ নবেম্বর ১৮১৯। ৬ অগ্রহায়ণ ১২২৩। এই সপ্তাহের **বাজার ভাও।** —জালুন তুলা আটার টাকা মোন; কাছোড়া তুলা সতর টাকা মোন। পাটনাই তণ্ডুল তিন টাকা বার আনা মোন। পাছড়ি তণ্ডুল উত্তম তিন টাকা দুই আনা মোন। মধ্যম তণ্ডুল দুই টাকা দশ আনা মোন। মুগী তণ্ডুল উত্তম একটাকা এগাব আনা মোন। বালাম তণ্ডুল এক টাকা তের আনা মোন। নীল উত্তম এক শত ষাটি টাকা মোন। (পৃ. ১৪৩)।

(১৬) ৮ আগষ্ট ১৮২৯। ২৫ শ্রাবণ ১২৩৬। **কলিকাতার গঙ্গাতীরস্থ কল।** ---যে কল কএক মাসাবধি কলিকাতার গঙ্গাতীরের রাস্তাব উপর প্রস্তুত হইতেছিল তাহা সংপ্রতি সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং কলিকাতাস্থ লোকদিগকে সুজি যোগাইয়া দিতে আরম্ভ করা গিয়াছে। এই কলের দ্বারা গোম পেষা যাইবে ও ধান ভানা-যাইবে ও মর্দ্দনের দ্বারা তৈলাদি প্রস্তুত হইবে এবং এই সকল কার্য্য ত্রিশ অশ্বেব বল ধারি বাষ্পের দুইটা যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইবে। . .(পৃ. ১৬৫)

(১৭) ১০ জুলাই ১৮২৫। ২ শ্রাবণ ১২৩২। সামান্য সমাচার। —....শ্রীমতী **মহিষাদলের**

রানী ও বাবু গুরুপ্রসাদ বসু শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া প্রত্যেকে পাঁচ ২ শত কবিযা এক সহস্র দীন দরিদ্রেরদিগের কারণ কর দিয়া তাহারদিগকে দর্শন করাইয়াছেন। খেদের বিষয় এই যে ঝড় বৃষ্টি গ্রীষ্ম ও লোকাধিক্যপ্রযুক্ত এ বৎসর অনেক লোক হত হইয়াছে। (পৃ. ২২৮)।

(১৮) ১৬ জুন ১৮২১। ৪ আষাঢ ১২২৮। **স্নানযাত্রা।** —১৫ জুন ৩ আষাঢ় মাহেশের স্নানযাত্রাতে লোক অধিক হইয়াছিল অনুমান হয় তিন লক্ষ লোকের কম নহে। ....। (পৃ. ২২৮)

(১৯) ৯ মার্চ ১৮২২। ২৭ ফাল্গুন ১২২৮। **দোলযাত্রা।** —মোকাম শ্রীরামপুরের গোস্বামিদিগের স্থাপিত শ্রীশ্রীযুত রাধামাধব ঠাকুর আছেন পরে এই মত দোল যাত্রাতে বাবু রাঘবরাম গোস্বামির পালা হইয়া দোল যাত্রাতে রোসনাই ও মজলিস ও গান বাদ্য ও ব্রাহ্মণ ভোজন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের পুরস্কার আশ্চর্য রূপ করিয়াছেন ইহাতে অতিশয় সুখ্যাতি হইযাছে। (পৃ. ২২৮)।

(২০) ২১ এপ্রিল ১৮২৭। ৯ বৈশাখ ১২৩৪। **চরকপূজা।** —চরকপূজার সময় সন্ন্যাসিবদের মধ্যে কেহ ২ মত্ত হইয়া পথেতে এমত কদর্য্যরূপে নৃত্যাদি করে যে তাহা দর্শন করিতে ভদ্রলোকেরদের অতিশয় লজ্জা হয় অতএব তাহার নিবারণ করিতে কলিকাতায় মাজিস্ট্রিট সাহেব লোকেরা নিশ্চয় করিয়াছেন...। (পৃ. ২২৯)।

(২১) ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ৬ ফাল্গুন ১২২৮। **বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা।** —মোকাম কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক ২৯ মাঘ রবিবার সংক্রান্তি দিবসে আপন বাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুরানী সহিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেব ঠাকুরেব মূর্তি প্রকাশ করিয়াছেন। (পৃ. ২৩৪)।

(২২) ২৭ এপ্রিল ১৮২২। ১৬ বৈশাখ ১২২৯। **শ্রীশ্রীশিব প্রতিষ্ঠা।** —আলাপসীংহ পরগনার জিলা ময়মুনসিংহেব মোতালকেব এক তালুকদার শ্রীমতী বিমলাদেবী ফাল্গুন মাসে বারানসীক্ষেত্রে আসিয়া দ্বাদশ শিব স্থাপন করিয়াছেন এবং এক রূপ্য দানসাগর ও দশ পিত্তল দানসাগর করিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন....। (পৃ. ২৩৪)।

(২৩) ৮ ফেব্রুয়ারী ১৮২৩। ২৭ মাঘ ১২২৯। **নূতন ঘাট।** —মোকাম বহলভপুরে রাধাবহলভ ঠাকুরের পুরাতন মন্দিরের নিকট পুরাতন এক ঘাট বাঁধা ছিল সে ঘাট ভগ্ন হইয়াছে তাহাতে কলিকাতার গৌর সেটের বিধবা শ্রীমতী টুনুমণী সেই ভগ্ন ঘাটের নিকট দক্ষিণে অতিউত্তম এক ঘাট বান্ধিয়াছেন সে ঘাট দীর্ঘে ও প্রস্থে বড় এবং শক্ত ও সুদৃশ্য হইয়াছে এবং সেই ঘাটে উপযুক্তমত দ্বাদশ মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে। (পৃ ২৮১)

(২৪) ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ৬ ফাল্গুন ১২২৮। **পূজা।** —গত ৫ ফেব্রুয়ারি বাঙ্গলা ২৪ মাঘ মঙ্গলবার চতুর্দ্দশী তিথি পুষ্যা নক্ষত্রে কলিকাতার শ্রীযুত মহারাজা গোপীমোহন বাবু মোং **কালীঘাটে শ্রীশ্রীকালীঠাকুরাণীর** অতি চমৎকার পূজা দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অভরণ স্বর্ণের প্রমাণ চারিহস্ত ও জড়াও পৈঁছা ৪ ছড়া ও জড়াও বিজটা দুই খান ও জড়াও বাজু দুই খান ও জড়াও বাউটি চারি গাছ ও এক স্বর্ণ-মুণ্ড ও এক রূপ্য খড়্গ ও নানাবিধ জরি ও পট্ট বস্ত্রাদি ও নৈবেদ্যাদি পূজোপকরণেতে নাটমন্দির পূর্ণ তদুপযুক্ত দক্ষিণা ও শাল ও প্রণামী ও তত্রস্ত অধিকারীবর্গ ও স্বস্ত্যয়নকারক ব্রাহ্মণ ও তাবৎ কাঙ্গালিরদিগকে বহুমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক

সন্তুষ্ট করিয়াছেন। এ বিষয়েতে কলিকাতার ও জেলা হওয়ালী শহরেব পুলীসের দারোগা প্রভৃতি নিযুক্ত থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে স্বর্গীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর যে স্বর্ণের মুণ্ডমালা দিয়া পূজা দিয়াছিলেন তাহা এইক্ষণে স্বর্ণ হস্তাদি সমভিব্যাহারে যেরূপ শোভা পাইতেছে সে অত্যাশ্চর্য যাহার দর্শনে বাসনা থাকে দর্শন করিলেই জানিতে পাইবেন। (পৃ ২৩৪)

(২৫) ২৯ অক্টোবর ১৮২৫। কার্ত্তিক ১২৩২। **কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।** —পরম্পরা শুনা গেল যে সংপ্রতি মোকাম চুঁচড়া শহরের মধ্যে শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের বাটীতে দুর্গোৎসব অতিবাহুল্যরূপে হইয়াছিল তাহার শৃংখলা এবং ব্যয় দেখিয়া সকলেরই চমৎকার বোধ হইয়াছে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত থাল গাড়ু ঘটি বাটি ইত্যাদি সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছিল এবং গীত বাদ্য রোশনাই ও বাটীর সজ্জা যেখানে যাহা সাজে সেই স্থানে তাহা অনায়াসে দিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বত্র এই দৃষ্টান্ত স্থলের ন্যায় হইয়াছে। (পৃ ২৩১)

(২৬) ১৩ মার্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬। —বিজ্ঞাপন। **বহুমূল্যের তালুক নীলামে বিক্রয় হইবেক।।** —সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জিলা হুগলি এবং ২৪ পরগনাব মধ্যে শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদারের দরুন তালুক আগামি ১৮৩০ সালের ১৮ মার্চ বৃহস্পতিহার শ্রীযুত মিসোর্স টালা এন্ড কোম্পানি সাহেবরা তাঁহারদিগের নীলাম ঘরে নীলামে বিক্রয় করিবেন ইহার বিশেষ নীলামঘরে অথবা ইঙ্গরেজী সম্বাদে পাইতে পারিবেন। (পৃ. ২২২)।

(২৭) ১১ ডিসেম্বর ১৮১৯। ২৭ অগ্রহায়ণ। ১২২৬। **চুরি।** —মোং কলিকাতা বাগবাজারে রাস্তায় এক সিদ্ধেশ্বরীর প্রতিমা আছেন. ..গত সপ্তাহে জ্যোৎস্না রাত্রিতে অনুমান ছয় দণ্ড রাত্রির সময়ে এক চোর তাঁহার ঘরের জানালা ভাঙ্গিয়া অনুমান পাঁচ সাত হাজার টাকার তাঁহার স্বর্ণালঙ্কার চুরি করিয়াছে। পরে থানায় খবর হইলে ববকন্দাজেরা অনুসন্ধান করিতে ২ এক বেশ্যার ঘরে সেই অলঙ্কারের কতক পাইল....। (পৃ. ২৩৩)।

(২৮) ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ৮ ফাল্গুন ১২২৬। **চুরি।** —মোং বাঁশবাড়িয়াতে নৃসিংহদেব রায় হংসেশ্বরী প্রতিমা সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহার অলঙ্কার দুই তিন হাজার টাকার স্বর্ণরূপ্যাদি ঘটিত দিয়াছিলেন....গত অমাবস্যা রাত্রিতে পূজাবসান কালে তাহার সমুদয় অলঙ্কার ও অন্য ২ ব্যবহাবিক দ্রব্য চুরি গিয়াছে তাহার তদারক অনেক হইতেছে। (পৃ. ২৭৫)।

(২৯) ৮ মে ১৮১৯। ২৭ বৈশাখ ১২২৬। পূজা। —২৮ বৈশাখ ৯ মে রবিবারে বৈশাখী পূর্ণিমাতে মোং উলাগ্রামে উলাই চণ্ডীতলানামে এক স্থানে বার্ষিক **চণ্ডীপূজা** হইবেক। এবং ঐ দিনে গ্রামের তিন পাড়ায় বারএয়ারি তিন পূজা হইবেক। দক্ষিণ পাড়ায় মহিষমর্দ্দিনী পূজা ও মধ্য পাড়ায় বিন্ধ্যবাসিনী পূজা ও উত্তর পাড়ায় গণেশজননী পূজা।.... (পৃ. ২৩২)।

(৩০) ১৪ আগষ্ট ১৮১৯। ৩১ শ্রাবণ ১২২৬। **ব্রাহ্মণী পূজা।** —চান্দ সওদাগরের ইতিহাস অনেকে জ্ঞাত আছেন। সেই চান্দ সওদাগরের স্থাপিত ব্রাহ্মণীর পূজা প্রতিবৎসর নবদ্বীপের পশ্চিম মোং জান নগর গ্রামে হইয়া থাকে....সংপ্রতি সে পূজা আগামি রবিবারে হইবেক। (পৃ. ২৩২)।

(৩১) ১৪ এপ্রিল ১৮২১। ৩ বৈশাখ ১২২৮। **চুঁচুড়ার সং।** —গত সপ্তাহে মোকাম চুঁচুড়াতে

অনেক ২ আশ্চর্য্য সং করিয়াছিল। তাহার মধ্যে শ্রীশ্রীরামজীকে রাজা করিয়াছিল ; শ্রীমতী রাধাকে রাজা করিয়াছিল এবং সুন্দর নৌকাতে নৌকাখণ্ড যাত্রা হইয়াছিল এবং শরৎকালীন দশভুজা মূর্ত্তি এবং শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ এই ২ রূপ অনেক প্রকার সং হইয়াছিল। ইহার অধ্যক্ষ চুঁচুড়া শহরবাসী সকল ও কলিকাতা অনেক কিন্তু দুই ভাগে দুই কর্ম্মকর্ত্তা এক জনের নাম খোঁড়া নবু দ্বিতীয় চোরা নবু। এবৎসর এসংগে খোঁড়া নবুর জয় হইয়াছে। (পৃ. ১২২)।

(৩২) ১৬ অক্টোবর ১৮১৯। ১ কার্ত্তিক ১২২৬। **নর্ত্তকী**। —শহর কলিকাতায় নিকী নামে এক প্রধান নর্ত্তকী ছিল কোন ভাগ্যবান লোক তাহার গান শুনিয়া ও নৃত্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এক হাজার টাকা মাসে বেতন দিয়া তাহাকে চাকব রাখিয়াছেন। (পৃ. ১২১)।

(৩৩) ২২ নবেম্বর ১৮২৩। ৮ অগ্রহায়ণ ১২৩০। **নাচ**।। —গত সোমবার ৩ অগ্রহায়ণ শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিকের বাটীতে রাস লীলা সময়ে নাচ হইয়াছিল....নিমন্ত্রিত সাহেবেরা তদ্দিনে নয় ঘণ্টাব কালে আসিতে আরম্ভ করিয়া এগার ঘণ্টা পর্যন্ত সকলের আগমনেতে নাচঘর পরিপূর্ণ হইল এবং নাচঘরের সৌন্দর্য্য যে করিয়াছিলেন সে অনির্ব্বচনীয়। অনন্তর কএক তায়ফা নর্ত্তকীরা সেই সভাতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল....। (পৃ. ১২১)।

(৩৪) ২১ অক্টোবব ১৮২০। ৬ কার্ত্তিক ১২২৭। **দুর্গোৎসব**। —এইবার মোং কলিকাতাতে দুর্গোৎসবে নাচ প্রায় কাহারো বাটিতে হয় নাই তাহাব কারণ এই মুসলমান লোকেরদের মহরম প্রযুক্ত মুসলমান বাই লোক প্রায় নাচ প্রভৃতি করে নাই। . .. (পৃ. ২৩০)

(৩৫) ২১ ফেব্রুয়াবি ১৮২৪। ১০ ফাল্গুন ১২৩০। **চূড়াকরণ**। —নবদ্বীপাধিপতি শ্রীলশ্রীযুত গিরীশচন্দ্র রায় বহাদরের পোষ্য পুত্র শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র রায়ের শুভ চূড়াকরণ ২৪ মাঘ ৫ ফেব্রুযাবি বৃহস্পতিবার হইয়াছে.... ইহাতে চল্লিশ হাজাব টাকা ব্যয় হইয়াছে। (পৃ. ২৪৫)।

(৩৬) ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ১ ফাল্গুন ১২২৬। **বিবাহ**। —গত শুক্রবার ৩০ মাঘ ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মল্লিক আপন পুত্রের বিবাহ যেরূপ দিয়াছেন....ইহাতে অনুমান হয় যে সাত আট লক্ষ টাকার ব্যয় ব্যতিরেকে এমত মহাঘটা হইতে পারে না।.... (পৃ. ২৩৯)

(৩৭) ২৫ অক্টোবর ১৮১৮। ৯ কার্ত্তিক ১২২৫। গোপীমোহন বাবুর **শ্রাদ্ধ**। —সন ১২২৫ শালে ১১ আশ্বিন শনিবার এই শ্রাদ্ধে তাহার পুত্রেরা অনেক দান করিয়াছেন ছয় স্বর্ণ ষোড়শ ও ছেয়ানব্বই রূপার ষোড়শ ও এক আটচালা পরিপূর্ণ পিত্তলের বাসন উৎসর্গ করিয়াছেন আর এক পাকা বাড়ি মায়সরঞ্জাম ও এক গৃহস্থের সম্বৎসরের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য শুদ্ধা দান করিয়াছেন এবং মহাদানে এক হাতি ও ঘোড়া ও পালকী ও নৌকা প্রভৃতি অনেক দিয়াছেন।....এই শ্রাদ্ধে অনুমান সর্ব্ব শুদ্ধা তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। (পৃ. ২৬০-৬১)।

(৩৭) ২৭ মার্চ ১৮১৯। ১৫ চৈত্র ১২২৫। **সহমরণ**। — ....অধিক সহমরণ বাঙ্গালা দেশে হয় পশ্চিম দেশে তাহার চতুর্থাংশ হয় না এবং বাঙ্গালার মধ্যে ও কলিকাতার কোট আপীলের অধীন জিলাতে অধিক হয় আরো হিন্দুস্থানে যত সহমরণ হয় তাহার সাত অংশের একাংশ কেবল জিলা হুগলিতে হয়। (পৃ. ২৪৯)।

(৩৮) ২৩ মার্চ ১৮২২। ১১ চৈত্র ১২২৮। **সহমরণ।** —কলিকাতার অন্তঃপাতি কোর্টের সাহেবেরা সহমরণ বিষয়ক এই রিপোর্ট শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া ছিলেন।

	সন ১৮১৫ সাল	১৮১৬ সাল	১৮১৭ সাল
কলিকাতার অন্তঃপাতী	২৫৩	২৮৯	৪৪১
ঢাকা	৩১	২৪	৫২
মুরশেদাবাদ	১১	২২	৪২
পাটনা	২০	২৯	৩৯
বানারস	৪৮	৬৫	১০৩
বরেলী	১৭	১৩	১৯
	৩৮০	৪৪২	৬৯৬

(পৃ. ২৫২)

(৩৯) ১৫ নবেম্বর ১৮২৩। ১ অগ্রহায়ণ ১২৩০। **সহমরণ।।** —মোং কোননগর গ্রামের কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি কুলীন ব্রাহ্মণ সর্ব্ব সুদ্ধা বত্রিশ বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তাহার জীবদবস্থাতে দশ স্ত্রী লোকান্তরগতা হইয়াছিল বাইশ স্ত্রী বর্ত্তমানা ছিল। তাহারদের কেবল দুই স্ত্রী তাহার নিজ বাটিতে ছিল আর সকলে স্ব ২ পিত্রালয়ে ছিল। ২১ কার্ত্তিক বুধবার ঐ চট্টোপাধ্যায় পরলোক প্রাপ্ত হইলে তাহার সকল শ্বশুর বাটীতে অতি ত্বরায় তাহার মৃত্যু সম্বাদ পাঠান গেল তাহাতে কলিকাতার এক স্ত্রী ও বাঁসবাড়ীয়ার এক স্ত্রী নিকটস্থ দুই স্ত্রী এই চারিজন...২৩ কার্ত্তিক শুক্রবার তৃতীয় দিবসের মধ্যাহ্নকালে....সহমরণ করিয়াছে। এই স্ত্রীরদের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর অবধি পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত হইবেক। (পৃ. ২৫৩-৫৪)।

(৪০) ২৬ ডিসেম্বর ১৮১৮। ১৩ই পৌষ ১২২৫।। **সহমরণ।** —কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না। (পৃ. ৫৯)।

(৪১) ১৮ জুন ১৮২৫। ৬ আষাঢ় ১২৩২। **কন্যা বিক্রয়।** —কএক দিবস হইল মোং বর্দ্ধমান হইতে এক বৈষ্ণবী আপন দ্বাদশ বর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা সমভিব্যাহারে মোং কলিকাতায়...আসিয়া....শ্রীযুত রাজা কিষণচাঁদ রায় বহাদরের নিকট যাইয়া ঐ কন্যাকে ১৫০ দেড়শত টাকায় আপন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিক্রয় করিয়া দেশে প্রস্থান করিয়াছে। (পৃ. ১১৬)।

(৪২) ১২ অক্টোবর ১৮২৮। ২৭ আশ্বিন ১২৩৫। **ভার্য্যা বিক্রয়।** —....জিলা বর্দ্ধমানের মধ্যে এক ব্যক্তি....তণ্ডুলের মূল্য বৃদ্ধি দেখিয়া....আপন স্ত্রীকে বিক্রয় করিবাব কারণ তত্রস্থ কোন স্থানে লইয়া গেল তাহাতে তত্রস্থ এক যুবা ব্যক্তি আসিয়া কএক টাকাতে তাহাকে ক্রয় কবিল ঐ স্ত্রী দর্শনে বড় কুরূপা নহে এবং তাহার বয়ঃক্রম অনুমান বিংশতি বৎসব হইবেক.. । (পৃ. ১৬৪)।

(৪৩) ৮ জুলাই ১৮২৫। ২৭ আষাঢ় ১২৩২। **বলাৎকার।** — মীরজাপুর-নিবাসি কোন কায়স্থের পরম সুন্দরী যুবতী স্ত্রী সমীপবর্ত্তিনী পুষ্করিণী মধ্যে গাত্রধৌতার্থ গমন করিয়াছিল ইতিমধ্যে ঐ কামিনীকে একাকিনী পাইয়া তত্রস্থ বর্দ্ধিষ্ণু সীতারাম ঘোষের পুত্র বাবু পীতাম্বর ঘোষ কএক জন লোক সমভিব্যাহারে আসিয়া বলে অবলার অম্বর ধরিয়া অন্তঃপুরে লইয়া স্বাভিলাষ পূর্ণ করিয়া পরিত্যাগ করাতে কামিনী রাগিণী হইয়া অতিদ্রুত গমনে পটলডাঙ্গার থানায় গমন করিয়া সমুদায় বিবরণ নিবেদন করাতে পরদিবস প্রাতে জমাদার সকলের জবানবন্দি লিখিয়া এক্ষণে পুলিশে প্রেরণ করিয়াছে. ।(পৃ ১১৬)।

(৪৪) ১৫ নবেম্বর ১৮২৩। ১ অগ্রহায়ণ ১২৩০। **দাঙ্গা।** —মোং চাকদহ গ্রামে রাণাঘাটনিবাসি শ্রীযুত উমেশ পাল চৌধরী ..ছয় আনি জমিদার এবং উলানিবাসি শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র মুসতফি দশ আনি জমিদার উভয়ে আপন ২ অভিমত স্থানে হাট বসাইবার কারণ.......হাটের লোকেরদিগকে ধরিয়া আপন ২ স্থানে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল ইহাতে মহাগোলমাল হইল। অনন্তরে দুই জমিদারের লোকেরদের মধ্যে প্রথম পরস্পর গালাগালি পরে চুলাচুলি তৎপরে হাতাহাতি অনন্তর কাটাকাটি হইয়া এক পক্ষের তিনজন ও এক পক্ষের চারিজন লোকের হস্ত চ্ছেদন হইয়াছে। (পৃ ১৭২)

(৪৫) ১১ অক্টোবর ১৮২৮। ২৭ আশ্বিন ১২৩৫। —মহেশতলার জমীদার শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তত্রস্থ শ্রীযুত বাবু অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত **দাঙ্গাকরণ** অপরাধে কারাগারে কএদ হইয়াছে.. ।(পৃ ১৮০ ৮১)।

(৪৬) ২৮ অক্টোবর ১৮২০। ১৩ কার্ত্তিক ১২২৭। **হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ।** —গত দুর্গোৎসবে হিন্দুরা সপ্তমী পূজা দিবসে প্রাতঃকালে নবপত্রিকা স্নান করাইতে গঙ্গাতীরে আনিয়াছিল পরে স্নান করাইয়া বাদ্যাদি সমেত বাটী যাইতেছিল যখন তাহারা চক চাঁদনীতে পঁহুছিল তখন অনেক মুসলমান সে স্থানে একত্র হইয়া তাহারদিগের সহিত কলহ করিল....। (পৃ. ১৬৯)।

বাঙালি হিন্দু সমাজ-সাক্ষ্য (১৯ শতক)

(খ)

হুতোমপ্যাঁচার নক্সা (সংকলিত অংশ)

'হুতোমপ্যাঁচার নক্সা' কালীপ্রসন্ন সিংহ, ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে মুদ্রিত সংস্করণ থেকে পুনর্মুদ্রিত, 'বসুমতী কর্পোরেশন', দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৮৮-৯৫ :

দুর্গোৎসব

.....ক্রমে দুর্গোৎসবের দিন সংক্ষেপ হয়ে পড়্‌লো। কৃষ্ণনগরের কারিগরেরা কুমারটুলী ও সিদ্ধেশ্বরীতলা জুড়ে বসে গেল। জায়গায় জায়গায় রং-করা পাটের চুল, তবলকীর মালা, টীন ও পেতলের অসুরের ঢাল-তলওয়ার, নানাবঙ্গের ছোবান প্রতিমার কাপড় ঝুলতে লাগলো; দর্জ্জিরা ছেলেদের টুপি, চাপকান ও পেটা নিয়ে দরোজায় দরোজায় বেড়াচ্ছে; 'মধু চাই!' 'শাঁকা নেবে গো!' বলে ফিরিওয়ালারা ডেকে ডেকে ঘুরছে। ঢাকাই ও শান্তিপুরে কাপুড়ে

মহাজন, আতরওয়ালারা ও যাত্রার দালালেরা আহার-নিদ্রে পরিত্যাগ করেছে। কোনখানে কাঁসারীর দোকানে রাশীকৃত মধুপক্কের বাটী চুমকী ঘটি ও পেতলের থালা ওজন হচ্ছে। ধূপ-ধূনো, বেণে মসলা ও মাথাঘষার এক্‌স্ট্রা দোকান বসে গেছে। কাপড়ের মহাজনেরা দোকানে ডবল পর্দ্দা ফেলেচে; দোকানঘর, অন্ধকারপ্রায়, তারি ভিতরে বসে যথার্থ 'পাই-লাভে' বউনি হচ্ছে। সিন্দুরচুপড়ী, মোমবাতি, পিঁড়ে ও কুশাসনেরা অবসর বুঝে দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে 'অ্যাকুডক্টের' উপর বার দিয়ে বসেচে। বাঙ্গাল ও পাড়াগেঁয়ে চাকরেরা আর্‌সি, ঘুন্‌সি, গিল্টির গহনা ও বিলাতী মুক্তো একচেটেয় কিনচেন; রবরের জুতো, কন্‌ফরটার, ষ্টিক ও ন্যাজওয়ালা পাগড়ী অগুন্তি উঠচে; ঐ সঙ্গে বেলোয়ারি চুড়ী, আঙ্গিয়া, বিলাতী সোনার শীল আংটী ও চুলের গার্ডচেনেরও অসঙ্গত খদ্দের। এতদিন জুতোর দোকান ধুলো ও মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু পূজোর মোর্‌সমে বিয়ের কনের মত ফেঁপে উঠছে, দোকানের কপাটে কাই দিয়ে নানা রকম রঙ্গিণ কাগজ মারা হয়েছে, ভিতরে চেয়ার পাতা, তার নীচে একটুক্‌রা ছেঁড়া কারপেট। সহরে সকল দোকানেরই, শীতকালের কাগের মত চেহারা ফিরছে। যত দিন ঘুনিয়ে আসচে, ততই বাজারের কেনা বেচা বাড়চে; কলকেতা তত গরম হয়ে উঠছে। পল্লীগ্রামের টুলো অধ্যাপকেরা বৃত্তি ও বার্ষিক সাধতে বেরিয়েচেন; রাস্তায় রকম রকম তরবেতর চেহারার ভিড় লেগে গেচে।

কোনখানে খুন, কোনখানে দাঙ্গা, কোথায় সিঁধচুরি, কোনখানে ভট্টাচার্য মহাশয়ের দু ভরি রূপো গাঁটকাটায় কেটে নিয়েচে; কোথাও কোন মাগীর নাক থেকে নথটা ছিঁড়ে নিয়েচে; পাহারা-ওয়ালার শশব্যস্ত, পুলিস বদমাইস্‌ পোরা চোরেরা পূজোর মোর্‌সমে দেদার কারবার ফালাও কচ্চে। "লাগে তাক্‌ না লাগে তুক্কো" "কিনি তো হাতী লুটি তো ভাণ্ডার" তাদের জপমন্ত্র হয়েচে; অনেকে পার্ব্বণের পূর্ব্বে শ্রীঘরে ও বাঙ্কুলে বসতি কচ্চে; কারো পূজোয় পাথরে পাঁচ কিল, কারো সর্ব্বনাশ। ক্রমে চতুর্থী এসে পড়লো।

এবার অমুক বাবুর নতুন বাড়ীতে পুজোর ভারী ধূম।...বাবু দেড়ফিট উচ্চ গদীর উপর তসর কাপড় পরে বার দিয়ে বসেচেন, দক্ষিণে দেওয়ান টাকা ও সিকি আধুলির তোড়া নিয়ে খাতা খুলে বসেচেন, বামে হবীশ্বর ন্যায়ালঙ্কার সভাপণ্ডিত অনবরত নস্য নিচ্চেন ও নাসা নিঃসৃত রঙ্গিন কফজল জাজিমে পুঁচ্চেন। এদ্দিকে জহুরী জড়ওয়া গহনার পুঁটুলী ও ঢাকাই মহাজন ঢাকাই শাড়ীর গাঁট নিয়ে বসেচে। মুন্সি মোশাই, জামাই ও ভাগনেবাবুরা ফর্দ্দ কচ্চেন, সামনে কতকগুলি প্রিতিমেফেলা দুর্গাদায়গ্রস্ত* ব্রাহ্মণ, বাইয়ের দালাল, যাত্রার অধিকারী ও গাইয়ে ভিক্ষুক 'যে আজ্ঞা' 'ধর্ম্ম অবতার' প্রভৃতি প্রিয় বাক্যের উপহার দিচ্চেন; বাবু মধ্যে কারেও এক আধটা আগমনী গাইবার ফরমাস কচ্চেন।....সভাপণ্ডিত মহাশয় সরপটে পিরিলীর বাড়ীর বিদেয় নেওয়া বিধবা-বিবাহের দলের এবং বিপক্ষপক্ষের ব্রাহ্মণদের নাম কাটচেন... নামকাটাদের পরিবর্ত্তে সভাপণ্ডিত আপনার জামাই, ভাগনে, নাত-জামাই, দোত্তুর ও খুড়তুতো ভেয়েদের নাম হাসিল কচ্চেন....।

ক্রমে চতুর্থীর অবসান হলো, পঞ্চমী প্রভাত হলেন—ময়রারা দর্গোমণ্ডা বা আগাতোলা সন্দেশের ওজন দিতে আরম্ভকল্লে। পাঁঠারা রেজিমেন্টকে রেজিমেন্ট বাজারে প্যারেড কত্তে লাগলো, গন্ধবেনেরা মসলা ও মাথাঘষা বেঁধে বেঁধে ক্লান্ত হয়ে পড়লো।....

এদিকে সহরের বাজারের মোড়ে ও চৌরাস্তায় ঢুলী ও বাজান্দারের ভিড়ে সেঁধানো ভার। রাজপথ লোকারণ্য; মালীরা পথের ধারে পদ্ম, চাঁদমালা, বিল্লিপত্র ও কুচো ফুলের দোকান সাজিয়ে বসেচে। দইয়ের ভার, মণ্ডার খুলী ও লুচি কচুরীর ওড়ায় রাস্তা জুড়ে গেছে; ....

ষষ্ঠী সন্ধ্যায় সহরের প্রতিমায় অধিবাস হয়ে গেল... সপ্তমী কোরমাকান নতুন কাপড় পরিধান করে হাসতে হাসতে উপস্থিত হলেন। ... পাঠকবর্গ! এ সহরে আজকাল দু-চার এজুকেটেড ইয়ংবেঙ্গলও পৌত্তলিকতার দাস হয়ে, পূজো-আচ্ছা করে থাকেন; ব্রাহ্মণভোজনের বদলে কতকগুলি দিলদোস্ত মদে ভাত প্রসাদ পান; আলাপি ফিমেল ফ্রেণ্ডেরাও নিমন্ত্রিত হয়ে থাকেন; পুজোরো কিছু রিফাইণ্ড কেতা।

....ক্রমে তাবৎ কলাবউয়েরা স্নান করে ঘরে ঢুকলেন। ..ক্রমে পুজো শেষ হলো ...বলিদানের উদযোগ হচ্ছে; বাবু মায়ষ্টাফ আদুড় গায়ে উঠানে দাঁড়িয়েচেন, কামার কোমর বেঁধে প্রতিমার কাছে থেকে পূজো ও প্রতিষ্ঠা করা খাঁড়া নিয়ে, কানে আশীর্ব্বাদী ফুল গুঁজে, হাড়কাঠের কাছে উপস্থিত হলো, পাশ থেকে একজন মোসাহেব 'খুঁটি ছাড়!' 'খুঁটি ছাড়!' বোলে চেঁচিয়ে উঠলেন; গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে পাঁঠাকে হাড়কাঠে পূরে দিয়ে, খিল এঁটে দেওয়া হলো; একজন পাঁঠার মুড়ি ও আর একজন ধড়টা টেনে ধল্লে, অমনি কামার "জয় মা! মাগো!" বলে কোপ তুল্লে; বাবুরাও সেই সঙ্গে "জয় মা! মাগো!" বলে প্রতিমের দিকে ফিরে চেঁচাতে লাগলেন, দুপ্ করে কোপ পড়ে গেল—গীজা গীজা গীজা গীজা, নাক টুপ টুপ টুপ গীজা গীজা গীজা গীজা নাক টুপ টুপ টুপ শব্দে ঢোল কাড়ানাগরা ও ট্যামটেমী বেজে উঠলো; ... দেখতে দেখতে সপ্তমী পূজো ফুরালো! ...বৈকালে চণ্ডীর গানওয়ালারা খানিকক্ষণ আসর জাগিয়ে বিদায় হলো—জগা স্যাকরা চণ্ডী গানের প্রকৃত ওস্তাদ ছিল।....

ক্রমে ছটা বাজলো, দালানের গ্যাসের ঝাড় জ্বেলে দিয়ে প্রতিমার আরতি করে দেওয়া হলো....

মনে করুন, আমাদের বাবু বনেদী বড়মানুষ; চাল স্বতন্তর, আরতির পর বেনারসী জোড় পরে সভাসদ সঙ্গে নিয়ে দালানে বার দিলেন; অমনি তক্‌মাপরা বাঁকা দরওয়ানেরা তলওয়ার খুলে পাহরা দিতে লাগলো; হরকরা, হুঁকোবরদার, বিবির বাড়ীর বেহারা মোসাহেবরা যোড়হস্ত হয়ে দাঁড়ালো, কখন কি ফরমাস হয়। বাবুর সামলে একটা সোনার আলবোলা, ডাইনে একটা পান্না বসান ফুরসি, বাঁয়ে একটা হীরে বসান টোপদার গুড়গুড়ি ও পেছনে একটা মুক্তো বসান পঁচুয়া পড়লো; বাবু আস্তাকুড়ের কুকুরের মত....দেখচেন—লোক কোনটার কারিগরীর প্রশংসা কচ্চে; যে রকমে হোক লোককে দেখান চাই যে, বাবুর রূপো, সোনার জিনিষ অঢেল....। ক্রমে অনেক অনেক অনাহূত ও নিমন্ত্রিত জড় হতে লাগলেন, বাজে লোকে চণ্ডীমণ্ডপ পুরে গেল, জুতোচোরে সেই লাঙ্গা তলোয়ারের পাহারার ভিতর থেকেও দুঝুড়ী জুতো সরিয়ে ফেল্লে।...

এদিকে দেখতে দেখতে গুড়ুম করে নটার তোপ পড়ে গেল, ছেলেরা 'বোমকালী' 'কলকেত্তাওয়ালী' বোলে চেঁচিয়ে উঠলো। বাবুর বাড়ীর নাচ,....উঠানের সমস্ত গ্যাস জ্বেলে দিয়ে মজলিসের উদ্‌যোগ হতে লাগলো, ...দুই-এক নাচের মজলিসি নেমন্তন্নে আসতে লাগলেন। মজলিশে তরফা নাবিয়ে দেওয়া হলো। বাবু জরি ও কালাবৎ নানাবিধ জড়ওয়া গহনায় ভূষিত হয়ে, ঠিক একটি 'ইজিপশন মমী সেজে' মজলিশে বার দিলেন—বাই, সারঙ্গের সঙ্গে গান করে, সভাস্থ সমস্তকে মোহিত কত্তে লাগলেন।

নেমন্তন্নেরা নাচ দেখতে থাকুন, বাবু ফর্‌রা দিন ও লালচোখে রাজা উজীর মারুন—পাঠকবর্গ একবার সহরটার শোভা দেখুন, প্রায় সকল বাড়ীতেই নানা প্রকার রং-তামাসা আরম্ভ হয়েছে; লোকেরা খাতায় খাতায় বাড়ী বাড়ী পূজো দেখে বেড়াচ্ছে। রাস্তায় বেজায় ভিড়। মারওয়াড়ী খোট্টার পাল, মাগীর খাতা ও ইয়ারের দলে রাস্তা পুরে গেচে। নেমন্তন্নের হাতলণ্ঠনওয়ালা, বড় বড় গাড়ীর সহিসেরা প্রলয় শব্দে পইস পইস কচ্চে, অথচ গাড়ী চালাবার বড় বেগতিক। কোথায় সখের কবি হচ্চে; ঢোলের চাঁটী ও গাওনার চীৎকারে নিদ্রাদেবী সে পাড়া থেকে ছুটে পালিয়েছেন; গানের তানে ঘুমন্তো ছেলেরা মার কোলে ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠচে। কোথাও পাঁচালি আরম্ভ হয়েচে, বওয়াটে পিল্‌ইয়ার ছোকরারা ভরপুর নেশায় ভোঁ হয়ে ছড়া কাটচেন ও আপনা আপনি বাহোবা দিচ্চেন; রাত্রিশেষে শ্রাদ্ধ গড়াবে, অবশেষে পুলিসে দাক্ষিণা দেবে। কোথাও যাত্রা হচ্ছে, মণিগোঁসাই সং এসেচে ছেলেরা মণিগোঁসাইয়ের রসিকতায় আলহাদে আটখানা হচ্ছে; আশে পাশে চিকের ভিতর মেয়েরা উঁকি যাচ্চে, মজলিসে রামমসাল জ্বলচে; বাজে দর্শকদের বায়ুক্রিয়ায় ও মসালের দুর্গন্ধে পূজাবাড়ী তিষ্ঠান দায়। ধূপ-ধুনার গন্ধও হার মেনেচে। কোনখানে পূজোবাড়ীর বাবুরাই খোদ মজলিস রেখেচেন—বৈঠকখানায় পাঁচো ইয়ার জুটে নেউল নাচানো, ব্যাং নাপানো, খ্যামটা ও বিদ্যাসুন্দব আরম্ভ করেচেন; এক একবারের হাসির গর্‌রায়, শিযাল ডাকে ও মদন আগুনের তানে—দালানে ভগবতী ভয়ে কাঁপচেন, সিঙ্গি চোরাকে কামড়ান পরিত্যাগ করে, ন্যাজ গুটিয়ে পলাবার পথ দেখচে, লক্ষ্মী সরস্বতী শশব্যস্ত। এদিকে সহরের সকল রাস্তাতেই লোকের ভিড়, সকল বাড়ীই আলোময়।

এই প্রকার সপ্তমী,অষ্টমী ও সন্ধিপুজো কেটে গেল; আজ নবমী, আজ পুজোর শেষ দিন।....

আজ কোথাও যোড়া মোষ, কোথাও নব্বইটা পাঁটা, সুপারি আখ, কুমড়ো, মাগুরমাছ ও মরীচ বলিদান হয়েচে; কর্ম্মকর্ত্তা পাত্র টেনে পাঁচোইয়ারে জুটে নবমী গাচ্চেন ও কাদামাটি কচ্চেন; ঢুলীর ঢোলে সঙ্গত হচ্ছে, উঠানে লোকাবণ্য, উপর থেকে বাড়ীর মেয়েরা উকি মেরে নবমী দেখচেন। কোথাও হোমের ধূমে বাড়ী অন্ধকার হয়ে গেছে....ক্রমে দেখতে দেখতে দিনমণি অস্ত গ্যালেন, পূজোর আমোদ প্রায় সম্বৎসরের মত ফুবালো। ভোরাও ওক্তে ভঁয়রো রাগিণীতে অনেক বাড়ীতে বিজয়া গাওনা হলো....শেষে বিসর্জ্জনের সমারোহ শুরু হলো....

বামুনবাড়ীর প্রতিমারা সকলেই জলসই, বড় মানুষ ও বাজে জাতির প্রতিমা পুলিসের পাশ মত বাজনা বাদ্দির সঙ্গে বিসর্জ্জন হবেন....

ক্রমে সহরের বড় রাস্তা চৌমাথা লোকারণ্য হয়ে উঠলো, বেশ্যালয়ের বারাণ্ডা আলাপীতে পুরে গেল; ইংরাজী বাজনা, নিশেন, তুরুকসোয়ার ও সাজ্জন সঙ্গে প্রতিমারা রাস্তায় বাহার দিয়ে বেড়াতে লাগলেন....কর্ম্মকর্ত্তারা কেউ কেউ প্রতিমে নিয়ে বাচখেলিয়ে বেড়াতে লাগলেন—আমুদে মিনষেরা ও ছোঁড়ারা নৌকার ওপর ঢোলের সঙ্গতে নাচতে লাগলো, সৌখীন বাবুবা খ্যামটা ও বাই সঙ্গে করে বোট, পিনেস ও বজরার ছাতে বার দিয়ে বসলেন—মোসাহেব ও ওস্তাদ চাকরেরা কবির সুরে দু-একটা বংদার গান গাইতে লাগলো।..

* প্রিতিমেফেলা দুর্গাদায় · সেকালে কাউকে জব্দ করার একটি উপায় ছিল পুজোব আগের রাতে চুপিসারে তার দরজায় প্রতিমা ফেলে যাওয়া--গৃহস্থ-মহাশয় সকালে প্রতিমা পেয়ে পূজার দায় নিতে বাধ্য হতেন, নইলে 'স্বেচ্ছায়' তাঁব কাছে আসা ঠাকুবের অপমান। ফেলে যাওয়া প্রতিমা-টি যদি হতেন দুর্গা তবে খরচের বহরে ব্যাপাবটি কন্যাদায়ের সমান হত, তাই 'দুর্গাদায়।'

বাঙালি হিন্দু সমাজ-সাক্ষ্য (১৯ শতক)

(গ)

সঙের ছড়া ও গান (১৮৭০-৭২)

'বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে', বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনীষা, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৯৬. পৃ. যথাক্রমে ১৭১-৭৩ এবং ২৬৫-২৭০। উভয় দৃষ্টান্তই আংশিকভাবে উদ্ধৃত .

কাঁসারীপাড়ার সঙের ছড়া

শহবে এক নতুন হুজুগ উঠেছে রে ভাই,
অশ্লীলতা শব্দ মোরা আগে শুনি নাই,
এর বিদ্যাসাগব জন্মদাতা,
বঙ্গদর্শন এর নেতা।
এদের কথার মাত্রা অশ্লীলতা
সদা দেখ্‌তে পাই;
কারে বলে অশ্লীলতা
লেজ্ তুলে দেখা নাই।
যথা কাব্য লিখ্‌তে হালিকালি
ফোড়ন দিতে তেজপাতা।।
সস্তা দরে মস্ত নাম কিন্‌তে যত লোক,
এই সুযোগে তাদের সবার ফুটে গেল চোখ,
এরা লঙ্কাকাণ্ড কচ্চে বসে,
কীর্ত্তি রাখবার কি প্রথা।
সেদিন বাঙ্গালা ভাষাব প্রধান প্রধান
কাব্য সকল লয়ে,
অশ্লীল বলে সে সব দিলে,
পাঠিয়ে যমালয়ে,
দেখ ভাবতচন্দ্র পার পেল না,

অন্য কবির কি কথা।
কবিত্বের গন্ধ আর মায়া যদি থাকতো দেশের প্রতি,
তবে দেশের গৌরব ভারতচন্দ্রের কর্ত্তেন না এ গতি;

. . . .

এরা ইংরেজিতে পণ্ডিত ভারী, কাব্যদেবীর হন সতা।।

. . . .

. . . .

[উদ্ধৃত অংশের শেষ পঙক্তিটিতে সঙের ছড়াকার মূল জায়গায় আঘাত করেছেন। নগ্ন নারী-পুরুষ দেহ বা নরনারী-মিলনের কাব্যোচিত বর্ণনায় বা ভাস্কর্যকর্মে এদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কবি-শিল্পীদের কোনো ছুঁচিবাই-রোগ ছিল না। বরং বিষয়টি তাঁদের কাছে নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল—এই সত্যটিই ১৯ শতকীয় ইংল্যান্ডের পিউরিটান তথা ভিক্টোরীয় যুগের নীতিবোধে বাতিকগ্রস্তদের কাছে অতিঘোর আপত্তিকর মনে হল। বিভাজনটি লক্ষণীয় : ভারতচন্দ্র পাশ্চাত্যপন্থীদের চোখে অশ্লীল কিন্তু ছড়াকারের চোখে 'দেশের গৌরব।' ছড়াকারের মতে পাশ্চাত্য পন্থীরা ইংরাজী জানেন, 'কাব্য' জানেন না। একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত হল খাজুরাহোরে মন্দিরগুলির অন্যতম আবিষ্কারক তথা জন প্রিন্সেপের ভ্রাম্যমান ইঞ্জিনিয়ারদের অন্যতম ক্যাপ্টেন টি. এস. বার্টের অভিজ্ঞতা—খাজুরাহোর মন্দিরগুলির অসাধারণ নির্মিতি বার্টকে মোহিত করে কিন্তু সেগুলির গাত্রের মিথুনমূর্তিগুলি তাঁর ভীষণই আপত্তিকর মনে হয়েছিল—ধর্মস্থলে এমন মিথুন-মূর্তি দেখে বার্ট সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন যে প্রাচীন হিন্দুদের ধর্মটাই খুব পরিমার্জিত ছিল না। বার্ট আরও লক্ষ্য করেন যে তাঁর পাল্কিবাহকদের কাছে ব্যাপারটি খুবই গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে, তাঁরা সোৎসাহে তা বোঝাতেও চাইছেন। বার্ট ১৮৩৮-এ খাজুরাহো প্রথম দেখে লেখেন :

> "I found....seven Hindoo temples, most beautifully and exquistely carved as to workmanship but the sculptor had at times allowed his subject to grow a little warmer than there was any absolute necessity for his doing ; indeed some of the sculptures here were extremely indecent and offensive, which I was surprised to find in temples that are professed to be erected for good purposes, and on account of religion But the religion of the ancient Hindoos can not have been very chaste if it induced people under the cloak of religion, to design the most disgraceful representations to desecrate their ecclesiastical erections. The Palki bearers, however, appeared to take great delight at those, to them very agreeable novelties, which they took great care to point out to all present."[F]

[F] Captain T S Burt, one of Princep's roving engineers, quoted by John Keay in 'India Discovered', Windward, 1981, p 128

এমত তৎকালীন পাশ্চাত্য রুচি-প্রভাবে ইংরাজী শিক্ষিতরা ১৯ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে এদেশে অশ্লীলতার হুজুগ তোলেন।]

জেলেপাড়ার সঙের ছড়া

খৃষ্টান হওয়া উঠে গেছে, বেহ্মগিরি কোরে।
হিঁদুয়ানী দেশে ফিরেছে, আবার পুরোদমে।।
এখন গোরাব পোশাক পরেন, বাবু,
ব্রীজ খেলেন ছেড়ে গ্রাবু,
মুর্গি-মটন আবো কিছু যায় বটে গর্ত্তে।
কিন্তু ঠাকুরতলায় টুপি খোলেন,
হাই তুলতে হরি বলেন,
হলিডে করেন হিঁদুব পুজো-পর্বে।।
* * * * * * * *
যোগ অভ্যাস Gymnastic,
গায়ত্রীটি hypocritic-এব Mystic একটা মর্ম্ম।।
দশ অবতার Evolution,
চণ্ডীপাঠ Elocution.
হোমে হয় Sanitation ম্যালেরিয়া নাশ।
রাখলে টিকি North Pole-এ,
Magnetic-এ বুদ্ধি খোলে,
Oxygen-এ শরীর [illegible]লে,
করলে একাদশীর উপবাস।।
পৈতেটা অন্য কি আর,
Electric conductor,
তুলসী মালা এক এক factor,
Health-এর given number-এ!
* * * * * * * *
রিসার্চ স্কলার ছিলেন শিব,

রেডিয়াম ফ্রেম কালীর জিভ,

তন্ত্রগুলো কেমিষ্ট্রি আর অল্‌কটের occult।

* * * * * * * *

একটু যদি ইংলিশ পড়ে জাহাজ চড়ে,

একলা কি জোড়ে যেতেন তাঁরা বিলেতে।

ঢুকে Cambridge কি Oxford-এ

কিম্বা Education বোর্ডে,

Learning-এর hardটা বানিয়ে নিতেন

কোমথ, মেলথাস, মিলেতে।।

তা হলো না হয়ে নেকেড নিগার,

বনের বেগার,

হতেন Huxley কি সোপেন হেগার,

ব্যাস, বাল্মীকি, পাতঞ্জল, কপিল।

৮.

লৌকিক দেবীদেবতার মন্দির

লৌকিক দেবীদেবতাগণই প্রাচীনতম কাল হতে বহমান বঙ্গসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ধারক ও সাক্ষ্য। পরবর্তী কালের ব্রাহ্মণ্যায়ন ও আর্যীকরণ সত্ত্বেও এই ধারা অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে এবং সমান্তরালভাবে বাংলার গ্রামসমাজে অব্যাহত থেকেছে। অন্তত ষোড়শ শতক থেকে নানা কারণে লৌকিক দেবীদেবতাগণের মধ্যে অধিকতর প্রভাবশালী ছিলেন যাঁরা, তাঁরা ব্রাহ্মণ্য উচ্চবর্ণ সমাজেও গৃহীত হতে থাকেন। আমরা ভুলতে পারি না যে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকীয় 'চৈতন্যযুগ'-ই আবার মঙ্গলকাব্য, শিবায়ন প্রভৃতিরও বোলবোলাওয়ের যুগ। দেখা যাচ্ছে যে সপ্তদশ শতকে শুরু হয়ে সমগ্র অষ্টাদশ ও উনিশ শতক জুড়ে সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় মুখ্য ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের মতনই লৌকিক দেবতাদের জন্যেও প্রথাগত এবং ঐতিহ্যপূর্ণ সমস্ত রীতিতে, অর্থাৎ দেউল-দালান-চালা-রত্ন সমস্ত রীতিতেই, মন্দিরও নিবেদিত হচ্ছে। এবং বাংলার গ্রামসমূহে লৌকিক দেবীদেবতাদের অসংখ্য থানের পাশাপাশি ঐ মন্দিরগুলিও সগৌরবে বিরাজ করছে। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এই ব্যাপারটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের বিবরণী

বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, শিবায়ন প্রভৃতির দিগ্‌দেবতাবন্দনা, কবির আত্মজীবনী প্রভৃতিতে নানা সূত্র আছে, সবই গবেষণার যোগ্য—কিন্তু আমরা ব্যবহার করছি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গলে'র 'দিগ্‌দেবতাবন্দনা'[১] কারণ বিশেষজ্ঞমহলে এর প্রামাণিকতার প্রভূত মান্যতা আছে। বোঝা যায় মুকুন্দরাম-কথিত ক্ষেত্রগুলির অধিকাংশই তখন ছিল আসলে 'থান', কিন্তু মন্দিরও কটি অবশ্যই ছিল, যেমন তমলুকের বর্গভীমা, তলকুঁয়াইয়ের কামেশ্বর বা ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা।

'দামুন্যাপ্রশস্তি'-তে তিনি চক্রাদিত্যের উদ্দেশে ধূস দত্তের দেওয়া যে দেউলটির[২] কথা বলেছেন সেটির এখন অস্তিত্ব নেই যদিও কিছু প্রত্নসাক্ষ্য হতে অনিশ্চিত অনুমান আছে। লক্ষণীয় যে "অযোধ্যা-মথুরা মায়া কাঞ্চী বারাণসী/অবন্তী দ্বারকা" প্রমুখ সারা ভারতে মান্য মহাক্ষেত্রগুলির উল্লেখ করলেও বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বাংলার যে সব দেবীদেবতার বন্দনা করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই গ্রাম্য লৌকিক দেবীদেবতা। মুকুন্দরাম কথিত গ্রামগুলির মধ্যে অনেককটির বর্তমান অবস্থান আমরা জানি না, আরও কটি শুধু আন্দাজ করতে পারি কিন্তু কয়েকটি আজও সমভাবে বিখ্যাত এবং সেইসব স্থানের দেবীদেবতাগণও আজও বহুমান্য—নীচে মুকুন্দরাম-বন্দিত দেবীদেবতাগণের পূর্বাপর উল্লেখ করা হল—কয়েকটি স্থানে বন্ধনীমধ্যে যে সব বর্তমান অবস্থান বলা হয়েছে সেগুলিকে আনুমানিক জ্ঞান করতে হবে :

১। পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ভারবি ১৯৯২ সংস্করণ, পৃ. ৪-৬।

২। ঐ। পৃ. ৬।

১। বলরাম। বোড়ো। (রায়না থানা। বর্ধমান)। ২। শুভিখাঁ ফকির। পাণ্ডুয়া। (হুগলীর পাণ্ডুয়া থানা)। ৩। কামেশ্বর। কোঙাঞি। (থানা, কেশপুর। গ্রাম, তলকুঁয়াই, নেড়াদেউল, পশ্চিম মেদিনীপুর)। ৪। মালেশ্বর। চন্দ্রকোণা। (থানা, চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর।) ৫। বাণেশ্বর। কাইতি। (থানা রায়না, বর্ধমান)। ৬। রঙ্কিনী। মৌলা। (মৌলা-পরমানন্দপুর? চন্দ্রকোণা। পশ্চিম মেদিনীপুর)। ৭। আদ্য গাজন শিব। নিগন (বর্ধমান, থানা মঙ্গলকোট। ক্ষীর গ্রামের যোগাদ্যার পূজায় এই শিবের প্রসাদ লাগে)। ৮। দক্ষিণ ঈশ্বর। রায়ান। ৯। টেটেশ্বর গোতেশ্বর। গোতান। (রায়না থানা, বর্ধমান)। ১০। অগ্নিমুখা হর। পলাসন। ১১। সর্বমঙ্গলা। বর্ধমান। (বর্ধমান)। ১২। মনসা। নারিকলেডাঙ্গা। (কালনা। বর্ধমান। —মনসা এখানে 'জগৎগৌরী')। ১৩। সঙ্কেতমাধব। সাগবসঙ্গম। (কৃষ্ণচন্দ্রপুর, থানা মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।) ১৪। রাড়ি ঠাকুরানী। বালিডাঙ্গা। (গুড়বাড়ি পঞ্চায়েৎভুক্ত, থানা ধনিয়াখালি, হুগলী)। ১৫। বিরজা। জাজপুর। ১৬। বিশালাক্ষী (?)। বিক্রমপুর। ১৭। মাতা (রাজবল্লভী)। (রাজবলহাট, জাঙ্গীপাড়া থানা, হুগলী)। ১৮। বেতাইচণ্ডী। বেতারগড়। (বেতাই—নারিট, থানা আমতা, হাওড়া)। ১৯। যোগাদ্যা। ক্ষীরগ্রাম। (থানা মঙ্গলকোট, বর্ধমান)। ২০। ষষ্ঠী। তালপুর। ২১। ভগবতী। জোড়ুর। (জেরুর? গুড়বাড়ি পঞ্চায়েৎ। থানা ধনিয়াখালি। হুগলী)। ২২। উত্তরবাহিনী। শিয়াখালা। (থানা চণ্ডীতলা, হুগলী)। ২৩। রঙ্কিণী। ইলিপুর। ২৪। গোমতী। গোমুঞ। ২৫। সর্বমঙ্গলা। নাড়িচা। (থানা পাত্রসাযেব, বাঁকুড়া। ২৬। বিশালাক্ষী। পাচড়া। (পাঁচড়া? জামালপুর থানা, বর্ধমান)। ২৭। মুণ্ডেশ্বরী। মুণ্ডথোপ। ২৮। জযচণ্ডী। হাসিনানগরী। ২৯। চক্রাদিত্য। দামিন্যা। (দামুন্যা, থানা রায়না, বর্ধমান। ৩০। জিষ্ণুহরি। তমলিপ্ত। (তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর)। ৩১। বর্গভীমা। তমলিপ্ত (তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর)। ৩২। রঙ্কিণী। ঘাটশীলা। (ঝাড়খণ্ড)। ৩৩। কামিখ্যা। কাঙুর (কামরূপ, আসাম)। ৩৪। নীলা। নীলপুর। ৩৫। ষড়াসিনী। গরাইপুর। ৩৬। কালিকা। কালীঘাট। (কলকাতা)। ৩৭। শিবেশ্বরী। গোপীনাথপুর। ৩৮। খেপ্তাই। পাড়াঞি। (ক্ষিপ্তেশ্বরী?—ক্ষেপুত। থানা দাসপুর। পশ্চিম মেদিনীপুর)। ৩৯। মেলাই। আমতা। (থানা আমতা, হাওড়া)। ৪০। চণ্ডী। হিড়িমা। ৪১। মহামাই। জামদা। ৪২। ঘাঁটু। পুরাস। ৪৩। ক্ষেত্রপাল। চৌখা। ৪৪। মহাকাল, ঘুবাল। ৪৫। বারাহীচণ্ডিকা। চণ্ডীপুর। ৪৬। অম্বিকা। দেউলপুর। ৪৭। অভযা পার্বতী। মাতত্রৈ। ৪৮। বিশালাক্ষী। নাইকুলি। (থানা, জগৎবল্লভপুর। হাওড়া)। ৫০। পঞ্চানন। গোনপুর। (থানা, সাঁতুড়ি। পুরুলিয়া)। ৫১। দফর খাঁ গাজী। ত্রিবেণী। (হুগলী)। ৫২। সিংহবাহিনী। গোতান। (থানা রায়না। বর্ধমান)। ৫৩। শিবানী। বিষ্ণুপুর। (মৃন্ময়ী? বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া)। ৫৪। জয়দুর্গা। শ্রীরামপুর। (হুগলী)। ৫৫। বন্দিনাথ। আড়ুর। ৫৬। বিশালাক্ষী। শাখবাল। (শাঁকরাইল। হাওড়া)। ৫৭। পির বাহাবরম। (বর্ধমান)। ৫৮। পীর ইসমাইল। মান্দারণ। (কামারপুকুরের কাছে, হুগলী)।

উপরেরগুলি ছাড়াও মুকুন্দরাম আরও যে সমস্ত দেবী-দেবতার বন্দনা করেছেন তাঁরা হলেন : বারাহী যমুনা, ভদ্রকালী, চৌষট্টি যোগিনী, বাসুলী, ভবানী, কাত্যায়নী, পার্বতী, ময়ূরবাহন, নাগ বাসুকি, অষ্টনায়িকা, কালু রায়, দক্ষিণ রায়, শার্দুলবাহন ও রঘুনাথ। মুকুন্দরাম আরও যেসব গ্রামের (দেবতাদের নাম না করে) বন্দনা করেছেন সেগুলি হল : কেজাপুর, হাসনহাটি, মণ্ডল গ্রাম, মঙ্গলকোট ও কামতা।

আমরা মুকুন্দরাম প্রদত্ত তালিকাটি ঈষৎ বিস্তৃতভাবেই উল্লেখ করলাম কারণ ১৬ শতকের শেষ ও ১৭ শতকের শুরু কালের বাংলার লোকচিত্রের এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ দলিল। এ থেকে সে সময়ে গ্রামবাংলায় লৌকিক দেবী-দেবতাদের যে অপ্রতিবোধ্য প্রভাব ছিল তার প্রত্যক্ষ আঁচ পাওয়া যায়। আবার ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, বর্ধমান ও নাবিচার সর্বমঙ্গলা, নারকেলডাঙার মনসা (জগৎগৌরী) বা তমলুকের বর্গভীমার প্রভাব এখন মুকুন্দরামের যুগের চেয়ে বেশি, কোচবিহার জেলার কামতার কামতেশ্বরী বা ঘাটশীলার রঙ্কিণীর মত দেবী দেবতাদের প্রত্যেকেরই ভক্তসংখ্যা আজও স্ফীততর হয়ে চলেছে।

অতএব ভাবা চলে যে অন্ততপক্ষে ১৮ শতকের গোড়া থেকে পশ্চিমবাংলার উচ্চবর্ণ ও উচ্চকোটি সমাজেও বেশ কিছু লৌকিক দেবীদেবতা মান্য হয়ে ওঠেন—ফলে ঐতিহ্যগত ও সম্মানিত স্থাপত্যেই লৌকিক দেব-দেবীদের মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হতে থাকল। আমবা সংক্ষেপে একটি প্রাথমিক জেলাওয়ারি বিবরণ নির্মাণ করতে পারি .

হাওড়া জেলার লৌকিক দেব-দেবীব মন্দিরগুলি হল : অমরাগড়ি (গজলক্ষ্মী, **আটচালা**, ১৭২৯), আমতা (মেলাই চণ্ডী, **আটচালা**, ১৬৪৯, উত্তব ঝাঁপদহ (চামুণ্ডা, **দালান**, ১৯ শতক), খালনা (জয়চণ্ডী, **আটচালা** ও ধর্ম (**দালান**, ঐ), গোণ্ডলপাড়া (চণ্ডী, ১৭৬৮, **জোড়বাংলা**, ১৭৬৮ এবং ধর্ম, ১৮৫২), ঝিখিরা (গড়চণ্ডী **নবরত্ন**, ১৭৯৫ ও জয়চণ্ডী (**আটচালা**, ১৭৫০), মাকরদহ (মাকড়চণ্ডী, **আটচালা** ১৮২১), রসপুর (গড়চণ্ডী, **দালান**, ১৯ শতক), শাঁকরাইল (বিশালাক্ষী, **আটচালা**, ১৮ শতক)। বড়গাছিয়া (ধর্ম, **আটচালা**, ১৯ শতক), মানসিংপুব (ধর্ম, **আটচালা**, ১৮১২), মনসুকা (ধর্ম, **আটচালা**, ১৯ শতক), ইসলামপুর (ধর্ম, আটচালা, ১৯ শতক), ইসলামপুর (ধর্ম, **আটচালা**, ১৯ শতক)। চিংড়াজোল, (ধর্ম, **দালান**, ১৯ শতক), কলিকাতা (ধর্ম, **আটচালা**, ১৭৯৮), [illegible]পুর (ধর্ম, আটচালা—প্রায় সম্পূর্ণ বিনষ্ট, ১৬৮৪), গৌরাঙ্গচক (ধর্ম, **আটচালা**, [illegible]৭৬২), আসণ্ডা (বুড়ো শিব, **আটচালা**, ১৮ শতক), গড়বেলিয়া (বুড়ো শিব, **আটচালা**, ১৭৮৭), যদুপুর (ধর্ম, **আটচালা**, ১৮ শতক), নিমাবালিয়া (বুড়ো শিব, **আটচালা**, ১৯ শতক), রামপুর (বুড়ো শিব, **আটচালা**, শীতলামনসা, **আটচালা**, ১৮৫৩), জোকা (শীতলামনসা-ষষ্ঠী, ১৭৯৭), নাইকুলি (বিশালাক্ষী, **দালান**, ১৮০৩), বিনোদবাটি (বিশালাক্ষী, **আটচালা**, ১৮৭৯), ভাণ্ডারগাছা (গজলক্ষ্মী, **আটচালা**, ১৭৮৫), রাউতাড়া (মানিকপীরের দরগা, **দোচালা**, ১৭৯৮) ও বানীবন (জঙ্গলবিলাস পীরের দরগা, **চারচালা**, ১৭ শতক)।

মেদিনীপুর (পূর্ব ও পশ্চিম) জেলাস্থ লৌকিক দেবীদেবতাদের মন্দিরগুলি এইরকম : **দোচালা**—বামপুর (কালু রায়, ধর্ম, ১৯ শতক, **চারচালা**—আমোদপুব (ধর্ম, ১৯ শতক), বরদা (টিনের চাল, বিশালাক্ষী), বাড় মহিষদা (পাথরে নির্মিত, ১৭৬৩, বিশালাক্ষী), মেদিনীপুর শহব (ধর্ম ১৯ শতক); **আটচালা**—খড়কুসুমা (ধর্ম, ১৯ শতক), জয়কৃষ্ণপুর (ধর্ম, ১৮১৭), বীরসিংহ (ধর্ম, ১৯ শতক), কেরুর (জয়দুর্গা, ১৯ শতক), নাড়াজোল (জয়দুর্গা, ১৯ শতক), সিমুলিয়া (ভীমেশ্বরী, ১৮ শতক); **একরত্ন**—বলিহারপুর, দাসপুর (গেঁড়িবুড়ী, ১৭৫৭); **পঞ্চরত্ন**—চন্দ্রকোণা (ধর্ম এবং কলকলি দেবী, ১৮৯০), দলপতিপুর (ধর্ম, ১৮ শতক), পাথরা ধর্ম, ১৯ শতক),

জোতমুরী (শীতলা, ১৯ শতক), ঝিকুড়িয়া (শীতলা, ১৮৭৫), ত্রিলোচনপুর (শীতলা, ১৭ শতক), পাঁচেটগড় (শীতলা, ১৯ শতক), ফকির বাজার (শীতলা, ১৮৪৮), রানীর বাজার (শীতলা, ১৮ শতক) ও সুরতপুর (শীতলা, ১৮৪৬); **নবরত্ন**—সরবেড়িয়া (সত্যনারায়ণ, ১৮৩৭) ও গোলগ্রাম (সর্বমঙ্গলা, ১৮ শতক); **দালান**—খুকুরদহ খুকুরচণ্ডী, ১৯ শতকের শেষে), বাসুদেবপুর (ধর্ম, ১৮৫৯), লালগড় (সর্বমঙ্গলা, ১৯ শতক), জাড়া (কালু রায় ও শীতলা ১৯ শতক) ও রাজনগর (শীতলা, ১৮০০); **শিখর দেউল**—চণ্ডীবুড়ী (চণ্ডীবুড়ী ও কুমারীনাথ মহাদেব, ১৯ শতক), গড়বেতা (সর্বমঙ্গলা, ১৬ শতক), তমলুক (বর্গভীমা, ১৭ শতক), আজুড়িয়া (শীতলা, ১৯ শতক), পাথরা (শীতলা, ১৯ শতক), মেদিনীপুর শহর (শীতলা, ১৯ শতক) ও সৌলান (শীতলা, ১৯ শতক) এবং **আটকোণা শিখর দেউল** আছে পিংলায় (পিঙ্গলাক্ষী, ১৯ শতক)।

বীরভূমের লোকদেবীদেবতার মন্দিরগুলি হল . **চারচালা**—নলহাটি (ললাটেশ্বরী, ১৮২৪), মৌড়পুর (শিব-পুকুরের মধ্যে, ১৯ শতক), মুলুক (রামেশ্বর, অপরাজিতা ও শিব—চারটি চারচালা) ও চিনপাই (ধর্ম, চারচালার দুদিকে দুই দালান, ১৯ শতক); **আটচালা**—তারাপুর (তারা, তারাপীঠ, ১৮১৯) ও চারকলগ্রাম (ধর্ম, ১৯ শতক); **সমতল চালের নবরত্ন** (মৌড়পুর (মৌড়েশ্বর, ১৯ শতক); **শিখর দেউল**—ভাণ্ডীরবন (ভাণ্ডীশ্বর শিব, ১৭৫৪), মহুলা (মৌলেশ্বর শিব, ১৬ শতক), কবিলাসপুর (ধর্ম, ১৬৪৩) ও পাঁচড়া (ভৈরব, ১৭১৮); **দালান**—চণ্ডীদাস নানুর (বাশুলী, ১৮ শতক?), উচকরণ (চাঁদ রায়, ধর্ম ১৭৬৮) ও করিধ্যা (মনসা, ১৯ শতক); উপরের মন্দিরগুলি ছাড়াও বীরভূমের সাঁইথিয়ার নন্দিকেশ্বর, বেলেগ্রামের ধর্ম, কুনুড়ির ধর্ম, আদিত্যপুরের কাঞ্চিশ্বর ও চাঁদরায়, কঙ্কালীতলার কঙ্কালী ও লাভপুরের ফুল্লরা প্রভৃতি মন্দিরগুলির স্থাপত্য উল্লেখযোগ্য না হলেও প্রতিটি স্থানই যথেষ্ট প্রাচীন লোক-ঐতিহ্য ধারণ করে আছে।

বাঁকুড়ায় ময়নাপুরের প্রাক-মুসলিমযুগীয় **দেউল** ছাড়াও ধর্মঠাকুরের দালান আছে ইন্দাস (১৮-১৯ শতক) ও বেলিয়াতোড়ে (২০ শতকে গোড়ায়), **আটচালা** আছে বৈতল (১৮ শতক) এবং কোতুলপুরে (১৯ শতক)। হদলনারায়ণপুরের ব্রহ্মাণী (**দালান**, ১৯ শতক) ও সোনামুখীর সুবর্ণমুখী (দালান, ঐ) অতি মান্য দেবী। গভীর মান্য হলেন অম্বিকা (অম্বিকানগর, **দালান**, এবং সাহারজোড়া **চারচালা**)। বৈতলের ঝগড়াই চণ্ডীর **রেখ দেউল** (১৬৫৯), আট বাইচণ্ডীর বাশুলির **দেউল** (প্রাকমুসলিম), ছাতনার বাশুলির পঞ্চরত্ন (১৮৭৩), জয়কৃষ্ণপুর ও রাউতখণ্ডের মনসা (**রেখ এবং আটচালা**, ১৯ শতক), বেলিয়াতোড়ের মহাদানা ও লাউগ্রামের দণ্ডেশ্বরীর আঞ্চলিক প্রভাব বিপুল। **নদীয়া** জেলার জুড়নপুরের 'বড়ো মা কালী', নবদ্বীপের 'পোড়া মা কালী', **চারচালা** (১৮২৫), 'বুড়োশিব' (**সমতল ছাদের নবরত্ন**), দোগাছিয়ার সাহেবধনী লোকধারার প্রবর্তকের **চারচালা** সমাধি-মন্দির, কল্যাণী ঘোষপাড়ার 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়ের 'সতীমা'-র মন্দির, পাগলাচণ্ডীর **দালান** মন্দির, বিরহীর ভাইফোঁটার মেলার জন্য বিখ্যাত মদনগোপালের **দালানমন্দির**, মুড়াগাছার 'সর্বমঙ্গলা' ও শান্তিপুরের পটেশ্বরী, 'মহিষখাগী', 'ঘাটচাঁদুনী', 'শ্যামাচাঁদুনী' প্রভৃতি লোকদেবীর **দালানমন্দিরগুলি** উল্লেখযোগ্য। **বর্ধমান** জেলায় ধর্মঠাকুরের মন্দির আছে গলসী, কুড়মুন, জাড়গ্রাম, দামড়া,

পাঁচড়া, মসাগ্রাম, দক্ষিণখণ্ড, রায়রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামে, বেশির ভাগই ১৯ শতকীয় **দালান** মন্দির; বুড়ো শিবের মন্দির-সহ গ্রাম হলঃ কামারপাড়া (ষোড়শ শতকীয় **দেউল**), মানকর (**দালান**, ১৯ শতক) সিঙ্গি (**নবরত্ন**, ১৮২৪); এছাড়াও অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ হল অমরারগড়ের শিবাখ্যা (**দালান**), বোড় গ্রামের বোড়ো বলরামের সুউচ্চ **খাঁজকাটা দেউল** (১৮ শতক?), ক্ষীরগ্রামের যোগদ্যার **গম্বুজ-শীর্ষ দেউল** এবং মাইথনের কল্যাণেশ্বরীর **পিড়া দেউল** (উভয়ই যথেষ্ট প্রাচীন) ও বর্ধমান শহরের সর্বমঙ্গলা (**সমতল ছাদের নবরত্ন**, ১৮ শতক)। বর্ধমান জেলার আরো কিছু লৌকিক দেবী-দেবতার মন্দিরের মধ্যে আছে জয়দুর্গা (উড়ো, **দালান** ও কলিগ্রাম, **চারচালা**), অষ্টনায়িকা দুর্গা (হাটগোবিন্দপুর, **আটচালা**), বেহুলা ও অট্টহাস (কেতুগ্রাম, **দালান**), জগৎগৌরী (নারিকেল ডাঙ্গা) প্রভৃতি। **দক্ষিণ ২৪ পরগণা** জেলার ধপধপির দক্ষিণেশ্বর দক্ষিণ রায় (**সমতল ছাদের মন্দির**, বর্তমান মন্দির,১৯০৯), জয়নগরের চণ্ডীতলায় জয়চণ্ডী (**দালান**, বৃহৎ নাটমণ্ডপ, ২০ শতক— আদিতে খড়ের চালের মন্দির ছিল) ও রক্তাখাঁ (বড়খাঁ গাজীর স্মারক?) পাড়ায় পঞ্চানন (সাধারণ মন্দির), মজিলপুরের ধন্বন্তরী কালী (**দালান**, ১৯ শতক? পাশে ছোট আটচালায় শিব), ময়দার ধর্মঠাকুর ও ময়দাকালী, পাটদহের পাটেশ্বরী (**আটচালা**, ১৭ শতক?), সরবেড়িয়ার মুলীকালী (বর্তমান মন্দির আধুনিক), বজবজের খুকীকালী (**আটচালা**), বড়ুপরের বিপত্তারিণী, শিবকালীনগরের বিশালাক্ষী (**বৃহৎ আটচালা**, ১৮৮২), বহড়ুর বাবাঠাকুর ধর্মরাজ (সাধারণ চালা), কাশীনগরের মাইবিবির থান (এখন মন্দির), ত্রিপুরাসুন্দরী-মন্দির রয়েছে কৃষ্ণচন্দ্রপুর (সাধারণ দালান) এবং বোড়ালে (বৃহৎ **গম্বুজ-শীর্ষ পঞ্চরত্নের আদলে**), বুড়ো শিবের মন্দির আছে পাইকান এবং দক্ষিণ বিষ্ণুপুরে, এবং অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য হল খাড়ির বড়খাঁ গাজীর মাজার ও নারায়ণী মন্দির (উভয়ই দালান)। **উত্তর ২৪ পরগণার** আমডাঙ্গা, নৈহাটি, গরিফা ও বারাকপুর-মণিরামপুরের বুড়ো শিব, মাদরালের জয়চণ্ডী, মাশুণ্ডার মশানচণ্ডী ও টিটাগড়ের বিশালাক্ষী মন্দিরের সবকটিই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। **কলকাতার** বেলগাছিয়ার ওলাই চণ্ডীর মন্দির (**বারোচালা**), চৌবাগার শীতলা (**পঞ্চরত্ন**) ও বেহালার মায়া দাসী রোডের বুড়ো শিবের মন্দিরের (**দালান**,—সবকটিই ১৯ শতকের) সামাজিক প্রভাব যথেষ্ট।

আমরা স্থানাভাবের জন্য উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির উল্লেখ করিনি, তবে লৌকিক দেবী-দেবতার স্থায়ী মন্দির সেখানেও যথেষ্ট। আবার, বীরভূমের রামপুরহাটের নিকটবর্তী, ঝাড়খণ্ডের মলুটির মৌলীক্ষা ঐ অঞ্চলের সর্বপ্রধান দেবী এবং তাঁর মন্দির (**দোচালা**, ১৮ শতক?) ঐ অঞ্চলের পবিত্রতম ক্ষেত্র।

আমরা শুরুতেই দেখেছি যে, লৌকিক দেবী-দেবতার মন্দিরগুলি বাঙালির সংস্কৃতির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকের ধারক। কলকাতার মতন মহানগরীতে, টিটাগড়ের মতন অতি জনবহুল ও অবাঙালি অধ্যুষিত ঘিঞ্জি শিল্প-শহরে বা বারাকপুর-গরিফা-নৈহাটির মত শিল্প-শহরে লৌকিক দেবী-দেবতার মন্দিরের আজও প্রভাবশালী থাকা হতে বোঝা যায় শিকড়টি কত গভীরে। তবে একথাও আমরা ভুলতে পারিনা যে, অসংখ্য লৌকিক দেবী-দেবতাগণের অতি ক্ষুদ্র অংশই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক থেকে স্থায়ী মন্দিরে উঠেছেন—তাঁদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নদীয়ার বীরনগরের উলাইচণ্ডীর মতন আজও 'থান'-ই পছন্দ করেন।

৯

সর্বভারতীয় ধারার প্রেক্ষিত ও বাংলার মন্দিরের স্থাপত্য

"Temples in Hindu India are not structures meant for usefulness. In designing a temple, the artist is almost entirely free to go by the form alone and leave utility and expenses to take care of themselves....in the best examples of classical architecture, a happy mean was struck between the rival claims of the horizontal and the vertical and adequate expression given to the spirit of the mountain home of the gods."

—Nirmal Kumar Bose

('The Spirit of Indian Temples)*

ভারতের মন্দিরের দার্শনিক ভিত্তি, মন্দির-স্থাপত্যের উপাদান, স্থাপত্যরীতির উদ্ভব ও বিকাশ, শিখররীতির বিবর্তন, মন্দিরের অলঙ্করণ-শিল্প বা ভাস্কর্যের নান্দনিক দিক সমূহ—সবই এই বইয়ের প্রাকপঠনরূপে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহৃত স্টেলা ক্র্যামরিশের সন্দর্ভটির অনন্য মেধা ও মননদীপ্ত বিশ্লেষণে আছে। এই বইয়ের দ্বিতীয় পর্বের সূচনায় প্রদত্ত 'মন্দির-দর্শন সহায়িকা'তে মন্দির স্থাপত্যের বিভিন্ন দিকের উপরে টিপ্পনী আছে। এছাড়া, সমগ্র দ্বিতীয় পর্ব জুড়ে পশ্চিমবাংলার মন্দির সমূহের কালানুক্রমিক পঞ্জিকরণে নানা মন্দিরের স্থাপত্য বিষয়ে, আমাদের বিবেচনায়, যথেষ্ট টীকাও যুক্ত হয়েছে। বর্তমান পরিচ্ছেদে সেই সবের পুনরাবৃত্তি অর্থহীন, পরন্তু বাহুল্য সব সময়েই ক্লান্তিকর। অপিচ, পুনরাবৃত্তি যতদূর সম্ভব এড়িয়ে, এখানে অতি সংক্ষিপ্ত একটি রূপরেখা নির্মাণের চেষ্টা করা হল।

এই বইয়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আমরা দেখেছি যে, বাংলার মন্দির উত্তর ভারতীয় ধারার সাথে যুক্ত হয় মৌর্যযুগে (খ্রিষ্টপূর্ব আনু. ৩২৬—খ্রিষ্টপূর্ব আনু. ১৮৪)। এই উত্তর ভারতীয় ধারাটি হল 'নাগর' রীতির ধারা, এর ভৌগোলিক সীমাটি মোটামুটি এইরকম : উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী (প্রকৃতপক্ষে আরও দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত), ও পশ্চিমে গুজরাট থেকে পূর্বে মগধ। আমাদের প্রতিবেশী উড়িষ্যা এই ধারারই আবিচ্ছেদ্য অংশ, তবুও এই বইয়ের প্রয়োজনে আমরা সেদিকে কিঞ্চিৎ অধিক দৃষ্টি দেব।

দুটি প্রশ্ন: (১) প্রাকমৌর্য তথা মৌর্যকালে উত্তর ভারতীয় মন্দির কেমন ছিল এবং তৎকালে বর্তমান পশ্চিম বাংলার মন্দিরই বা কেমন ছিল? (২) মৌর্যোত্তর কালে উত্তর ভারতীয় মন্দির কিভাবে বিবর্তিত হল এবং বাংলায় তা কতখানি ও কিভাবে গৃহীত হল?

প্রথম প্রশ্ন প্রথমে। মৌর্য-স্থাপত্যের স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হল খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে রাজস্থানে জয়পুর জেলার বৈরাটে প্রতিষ্ঠিত যুগপৎ ইট ও কাঠের একটি বৃত্তাকার বৌদ্ধ স্থাপত্য, আদিতে এর মধ্যে একটি স্তূপ ছিল—কিন্তু এখন তার শুধু ভিতের চিহ্নটুকুই আছে।

* 'Selected Writings', Centre for Archaeological Studies & Training, Eastern India, 2006, p 87.

সাঁচি (মধ্যপ্রদেশ, বিদিশা) স্তূপ এলাকায় উৎখনিত ৪০ সংখ্যক মন্দিরটি মৌর্য যুগে নির্মিত ও বৈরাটের মন্দিরটির সঙ্গে গভীর সাদৃশ্যপূর্ণ। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে প্রতিষ্ঠিত সাঁচির ১৮ সংখ্যক মন্দিরটি ছিল অর্ধবৃত্তাকার কিন্তু পরে, খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক থেকে এতে কারুকার্য-মণ্ডিত স্তম্ভ, কুড্যস্তম্ভ প্রভৃতি যুক্ত হয়। বিশেষজ্ঞগণ এগুলি ছাড়াও খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় দশকে রাজস্থানের উদয়পুর জেলার নগরীর সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব মন্দির এবং মধ্যপ্রদেশের বিদিশার হেলিওডোরাসের স্তম্ভের নিকটের ভাগবত (বৈষ্ণব) মন্দিরের কথা বলেন, কিন্তু আমাদের কিছু বোঝার উপায় নেই। নাগার্জুনকোণ্ডাতেও ঐ সময়কালের ইক্ষাকু বংশ প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মন্দির উৎখনিত হয়েছে। মৌর্যযুগের আর এক স্থাপত্য হল বোধগয়ার কাছে বরাবর পাহাড় বা 'প্রবরগিরি'র 'লোমশ-ঋষির গুহা' নামে পরিচিত পাহাড় কাটা (rock-cut) মন্দিরটি—পাহাড়ের পাথর কেটে খাঁটি দোচালা স্থাপত্য—হস্তিপৃষ্ঠ ছাদ, সরদল, শাঙ্গা, তীর, মুদনী, পাড়, চালকাঠ, কোনাচ প্রভৃতি-সহ যেন একটি খড়ো চালের কুটির। বোঝাই যাচ্ছে এইসব ক্ষেত্রে মৌর্য-যুগীয় স্থপতিগণ পূর্বতর কাঠের কাজের প্রভাবমুক্ত হতে পারেননি—এমনও হতে পারে যে কাষ্ঠশিল্পীদেরই পাথরের স্থাপত্যের কাজে লাগানো হয়েছিল। আমাদের দেখার কোনও সুযোগ না থাকলেও অত্যন্ত বিশিষ্ট ঐতিহাসিক এ. এল. বাসাম তক্ষশীলার জান্দিয়ালে উৎখনিত ও মৌর্য-যুগীয় একটি খাঁটি গ্রীক স্থাপত্যের কথা বলেছেন কিন্তু এইসঙ্গে তিনি একথাও জানিয়েছেন যে, এটির কোনও উত্তরসূরী নেই এবং একমাত্র কাশ্মীরের (যেমন মার্তণ্ড মন্দির) বাইরে এর কোনো প্রভাবও পড়েনি।[৮]

এখন, সমসাময়িক বাংলার কথা। প্রাকমৌর্য বা মৌর্যযুগের সমসাময়িক কালের মন্দির-স্থাপত্যর উভয় বাংলা ধরে একটি—উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাত মহকুমার বেড়াচাঁপার দেবালয় গ্রামের 'খনা-মিহিরের ঢিপি' নামে পরিচিত উৎখনিত স্থাপত্যটি (বারাসাত-বসিরহাট বাসপথের বেঁড়াচাপা স্টপেজের প্রায় লাগোয়া)। এ-সম্পর্কে ক্ষেত্রে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ প্রদত্ত বিজ্ঞাপনে যা জানানো হয়েছে সেটুকুই সারকথা। "খনা-মিহিরের ঢিপি যা বরাহমিহিরের ঢিপি নামেও পরিচিত, সুরক্ষিত ও বিশাল দুর্গশহর চন্দ্রকেতুগড়ের একটি অংশ। ১৯৫৬-৫৭ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালা এখানে উৎখনন করে খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের প্রাগমৌর্য যুগ থেকে দ্বাদশ শতকের পালযুগ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক পর্বের নিদর্শন উন্মোচিত করেছে। উৎখননে সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ আবিষ্কার হল একটি বহুকোণ বিশিষ্ট ইঁটের উত্তরমুখী মন্দির। সম্মুখের বর্গাকার অন্তরালসহ মন্দিরের তিনদিকে রয়েছে কিছুটা উদগত অংশ। প্রাথমিকভাবে মন্দিরটিকে গুপ্তযুগের বলে অনুমান করা হলেও বাস্তবিকপক্ষে নকশা, স্থাপত্যবিন্যাস ও অলঙ্করণের নিরিখে এটি পালযুগের দেবালয় বলেই মনে হয়। এই ঢিপিতে উৎখনন করে আদি ঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের বুদ্ধমূর্তি, ঔদ্দেশিক স্তূপ, জাতকের গল্প ও বুদ্ধের মূর্তি, উৎবৃত পোড়ামাটির ফলক, শীলমোহর, মুদ্রা, নানা ধরনের পুঁতি

[৮] A.L. Basham, 'The Wonder that was India', Third Revised Edition, Rupa & Co., Thirty-seventh impression, 2001, p. 355

ইত্যাদি পাওয়া গেছে।" এর সঙ্গে যোগ করা চলে : (ক) মন্দিরটির আসন ত্রিরথ। (খ) চতুষ্কোণ সংস্থানের উত্তর ছাড়া (সম্ভবত এদিকেই প্রবেশ পথ থাকার জন্য) বাকি তিন দিকের খনিত দেওয়ালের রেখার মাঝে একটি করে উদ্গত অংশ। (গ) উত্তরদিকে সংযোজন ও প্রসারণ স্পষ্ট। (ঘ) আসনের মাঝে একটি বর্গাকার ও ক্রমহ্রস্বায়মান কূপ যার উদ্দেশ্যে অনির্ণীত। (ঙ) সংস্থানটি দৈর্ঘ্যে (উত্তর-দক্ষিণ) ৩০০ এবং প্রস্থে (পূর্ব-পশ্চিম) ১০০ ফুটের মত। (চ) উত্তরদিকে সম্ভবত প্রথমে 'অন্তরাল' ও পরে 'মণ্ডপের' অস্তিত্ব ছিল। (ছ) এর দুপাশের পাটাতনের মত অংশদুটি হয়ত প্রবেশ পথ রূপে ব্যবহৃত হত। (জ) এইসব-কিছুর উত্তর-পশ্চিমে অন্য একটি মন্দিরের নিম্নাংশ উৎখনিত হয়েছে। —সব মিলিয়ে অতি উন্নত ও উৎকৃষ্ট মানের অনির্বচনীয় স্থাপত্য।

শুধু ভিৎ বা দেওয়ালের নিম্নাংশের অংশবিশেষ বা ভূমি-নক্সা দেখে মন্দিরের উপরিসৌধ অনুমান হয়ত করা যায়, কিন্তু জোর করে কিছু বলা যায় না—দেবালয়ের বহুকোণিক ভূমি-নক্সা দেখে অনুমান করা চলে এর উপরি-সৌধটি হয়ত বা ভদ্র (বা পিড়া) রীতির মত কিছু একটা ছিল এবং জোর করে বলা যায়, বৃত্তাকার বা অণ্ডাকার বা চালারীতির ছিল না কিন্তু এগুলিই ছিল মৌর্য-স্থাপত্যের মন্দিরগুলির ফর্ম। অতএব দেবালয়ের মন্দির দুটি প্রাক্ মৌর্যকালের—এমত ভাবনা অসঙ্গত নয় বলে মনে হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, অর্থাৎ উত্তর ভারতীয় মন্দিররীতির বিকাশ ও বিবর্তন এবং বাংলায় তার গ্রহণ-বর্জন বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে আমরা প্রথমে শিখর রীতির বিকাশ ও বিবর্তনকে পাখির চোখ করব।

গুপ্তযুগের (খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকের ৭০/৮০-র দশক থেকে ষষ্ঠ শতকের ৩০-এর দশক) মন্দিরগুলির মধ্যে যেগুলি এখনও টিকে আছে, সেগুলির প্রাথমিক স্থাপত্যগুলির সব কটিই ছোট ও সমতল ছাদবিশিষ্ট, মসলাহীন আর সম্ভবত সেই কারণেই আকৃতির অনুপাতে অনেক বেশি গুরুভার—এগুলি পঞ্চম শতকীয় এবং এদের মধ্যে রয়েছে সাঁচি (জেলা বিদিশা, মধ্যপ্রদেশ)-র মন্দির নম্বর ১৭, এবং তিগাওয়া (জেলা জব্বলপুর, মধ্যপ্রদেশ) ও এরানের (জেলা সাগর, মধ্যপ্রদেশ) মন্দিরগুলি। দৃশ্যত এরা পাহাড়-কাটা মন্দিরের ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে আসতে পরেনি, প্রকৃতপক্ষে বিদিশার সমীপবর্তী উদয়গিরির ১ নং গুহামন্দিরটিকে এগুলির 'মডেল' বলা যায়। তবু কতগুলি বৈশিষ্ট্য ইতোমধ্যেই দেখা দিয়েছে—স্তম্ভগাত্রে ও শীর্ষে অলংকরণ (সাঁচি ও তিগাওয়ার দৃষ্টান্ত দুটিতে স্তম্ভশীর্ষে উপবিষ্ট সিংহের মোটিফ ব্যবহৃত হয়েছে, যা আদি গুপ্তযুগীয় লক্ষ্মণ), দরজার ফ্রেমে অলংকরণ (বিশেষত তিগাওয়ায়) এবং এগুলি ছাড়া উল্লেখযোগ্য মন্দির ভাস্কর্যে 'গণ' (রাক্ষস/পিশাচ), বিদ্যাধর ও মিথুনমূর্তির ব্যবহার, কিন্তু শিখর এখনও দেখা দেয়নি। সম্ভবত পঞ্চম শতকেরই শেষ দিকে নাচনা (জেলা পান্না, মধ্যপ্রদেশ)-র পার্বতী মন্দিরে ঢাকা (বর্তমানে ছাদ লুপ্ত) প্রদক্ষিণ এবং গর্ভগৃহের উপরে একটি চতুষ্কোণ কক্ষ ব্যবহৃত হয়েছিল, একে প্রাথমিক শিখর ভাবা যায়। ষষ্ঠ শতকের দুটি মন্দিরে শিখরের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা গেল : (১) ঝাঁসির কাছে দেওগড়ের

(জেলা ললিতপুর, মধ্যপ্রদেশ) দশাবতার মন্দিরে প্রথম পাথর ধরে রাখার জন্য লোহার আংটা ব্যবহার করা হল, গর্ভগৃহের উপরে একটি ছোট শিখর যুক্ত হল এবং মনে হয় এই প্রথম বিষ্ণু, গণেশ প্রভৃতি দেবতার পাশপাশি রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ভাস্কর্যও মন্দির গাত্রে দেখা দিল; (১) দুর্গা-মন্দির বলে পরিচিত ভিতরগাঁও (জেলা কানপুর, উত্তরপ্রদেশ)-এর ইট নির্মিত অতি বিশাল (উচ্চতা প্রায় ৮০ ফুট) মন্দিরটি। এর চারদেওয়ালের মাঝে রয়েছে খাড়াখাড়ি বৃহৎ উদ্গত অংশ, ফলে মন্দিরটি হয়েছে ত্রিরথ। প্রকাণ্ড ও গুরুভার শিখরটি এখনও প্রাথমিক স্তরের, ধাপ কাটা পিরামিডাকৃতি এবং বক্ররেখ রূপ এখনও দেখা দেয়নি। ইটের তৈরী বলেই এর অলংকরণেও ব্যবহৃত হয়েছে টেরাকোটা-সজ্জা —গণেশ, মহিষাসুরমর্দিনী ও বিভিন্ন-মূর্তি। আদিতে ইটেরই তৈরী বোধগয়ার (জেলা গয়া, বিহার) মহাবোধি মন্দিরটি ভিতরগাঁওয়েব সমসাময়িক ও সমগোত্রীয়—অতি বহুল সংস্কৃত হলেও এর আদি ফর্মের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে মন্দিরটির আসন পঞ্চরথ, তীক্ষ্ণশীর্ষ তথা অত্যুচ্চ (প্রায় ২০০ ফুট) মূল শিখরটি পিরামিডাকৃতি। খাঁটি বক্ররেখ শিখরের আদল পাওয়া গেল গুপ্তোত্তর কালে, সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে মধ্যপ্রদেশের রাইপুর জেলার সিরপুরে নির্মিত লক্ষ্মণ মন্দিরে, এর গভীর মিল রয়েছে ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর মন্দিরের সাথে এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে স্থপতিগণ কাঠের মন্দির ও পাহাড়কাটা মন্দিরের ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন, কিন্তু এটা কি করে হল তা বুঝতে আমাদের দক্ষিণ দিকেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

আদিম 'Dolmen' দিয়েছিল গর্ভগৃহ এবং বাঁশ-খড়ের বৈদিক পটমঞ্জরী (Tabernacle) দিয়েছিল বক্ররেখ শিখরের রূপকল্পনা, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠার পরে মন্দিরের প্রসারণ ঘটে চারদিকে কিন্তু অভিমুখ মাত্র একটি— নাম ও আকারহীন পরমসত্তা, শিখর তাই একমুখী ও একাগ্র[১]। দুভাবে এটি হতে পারে—(১) বক্ররেখ শিখর যা উত্তর-ভারতীয় রীতির একান্ত বৈশিষ্ট্য ও (২) শীর্ষরূপে একটি পূর্ণ বা একক মন্দির (বিমান/প্রাসাদ)-কেই ব্যবহার করা যেতে পারে, এ হল দক্ষিণ ভারতীয় 'ক্ষুদ্র অল্প বিমান' যা অনারোহণযোগ্য ও অনেক সময়ে ঠাসা (solid) স্থাপত্য। বিষয়টি খুব ভালভাবে বোঝা যায় কর্নাটকের বিজাপুর জেলার আইহোল, বাদামি, মহাকুটেশ্বর ও পাট্টাডাকলে খ্রিষ্টীয় ৫ম থেকে ৮ম শতকের শেষদিক পর্যন্ত সময়কালে ঘটা পরীক্ষা-নিরীক্ষায়—উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় শৈলীর মিলনস্থলে এমনটি ঘটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে বিষয়টি ছড়িয়ে ছিল আরও কিছু ক্ষেত্রে। সেগুলির দু একটি আগে উল্লেখ করা যাক। প্রথমত, খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে পল্লব রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় চেন্নাই শহর থেকে ৬১ কিমি দূরবর্তী মামল্লপুরমে গ্রানাইট পাথরের এক একটি শিলা কেটে ও খোদাই করে নির্মিত 'রথ'গুলি (মোট নয়টি)। এদের মধ্যে বাসস্ট্যাণ্ডের লাগোয়া একই ক্ষেত্রে পাঁচটি রথের মধ্যে 'ধর্মরাজ' (উচ্চতম), 'অর্জুন' ও 'সহদেব' নামে রথ তিনটি পিরামিডাকৃতি, কিন্তু আকারে বৃহত্তম (দৈর্ঘ্য ৪৮, প্রস্থ ২৫ ও উচ্চতা ২৬ ফুট) ও দ্বিতল 'ভীমরথটি'র ছাদ বাংলার দোচালা স্থাপত্যের মত, তবে এটিকে ওড়িশী 'খাখড়া' রীতির দ্রাবিড় রূপ বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞগণ।[২]

১. Stella Kramrisch, প্রাগুক্ত, p. 179 এবং p. 156

২. ঐ, p. 183, Foot Note 4

এছাড়া একই ক্ষেত্রের 'দ্রৌপদী' রথটি প্রায় অবিকল একটি 'চারচালা', আবার মামল্লপুরমেরই 'লাইটহাউস' ও গুহামণ্ডপগুলিব ক্ষেত্রের 'গণেশ' রথটিরও শীর্ষদেশ 'খাখড়া' (দ্রাবিড়) রীতির। স্পষ্টতই পল্লব স্থপতি ও শিল্পীগণ কাঠের ও পাহাড়-কাটা মন্দিরের স্মৃতিমুক্ত নন। 'শোর-টেম্পল্' নামে পরিচিত মামল্লপুরমেব সমুদ্রতীরের খাঁটি দ্রাবিড় রীতির মন্দির দুটিও অনিবর্চনীয়। কিন্তু এই কথা আরও বেশি করে বলা চলে পল্লব পৃষ্ঠপোষকতায় অষ্টম শতকের গোড়ায় কাঞ্চিপুবমে প্রতিষ্ঠিত 'কৈলাসনাথ' মন্দির সম্পর্কে— অনন্যসাধারণ এই মন্দিরটির শিখরে দু তরফ পিপা-সদৃশ অংশের উপরে রয়েছে বেলনাকার শীর্ষ-সমন্বিত একটি গম্বুজ যা বৌদ্ধস্তূপকে স্মবণ করিয়ে দেয়---মন্দিরটির সামনে তুলনায় ছোট মণ্ডপ, আরও উল্লেখ্য ভাস্কর্য-সমন্বিত ছোট ছোট মন্দিরাকৃতি 'কূট' বা প্রকোষ্ঠগুলি যেগুলি বেষ্টনীর কাজ করছে। মণ্ডপগাত্র ও প্রকোষ্ঠসমূহে লক্ষণীয়ভাবে রয়েছে বিভিন্ন 'গণ' ও অর্ধকাল্পনিক হিংসক পশুর মূর্তি ভাস্কর্য। রাষ্ট্রকূট রাজ প্রথম কৃষ্ণেব (756-773 খ্রিঃ) নির্দেশে মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদের কাছে বিশ্বখ্যাত ইলোরায় উপর থেকে পাহাড় কাটতে কাটতে নেমে অন্ততপক্ষে ৩৭টি গুহা খনিত হলেও মূল অর্থাৎ 'কৈলাসনাথ শিবের' মন্দিরটি খনিত হয়েছে সম্পূর্ণরূপে শিল্পী ও কারিগরগণ কৃর্তক নির্মিত মন্দিরের আদলে এবং একেবারেই গুহা-মন্দিররূপে নয়---প্রকৃতপক্ষেই গর্ভগৃহ, মণ্ডপ, মন্দির-দ্বার, পার্শ্বদেবতা বা আববণ দেবতাদের মন্দির প্রভৃতি নিয়ে ইলোরার কৈলাসনাথ দক্ষিণ ভারতীয় রীতির একটি সম্পূর্ণ মন্দির—গুহা-মন্দির বা কাঠের মন্দিরের প্রভাব ও স্মৃতি হতে এটি সম্পূর্ণ মুক্ত। ইলোরার কৈলাসনাথ একই সঙ্গে কাঠের মন্দিরের অনুকৃতির যুগ ও পাহাড়কাটা মন্দিরের যুগেব অবসান ও বৃহৎ মন্দির স্থাপত্যের যুগের সূচনা ঘোষণা করে—তাঞ্জভুবে বাজ বাজ চোল (৮৮৫-১০১৪ খ্রিঃ) কর্তৃক নির্মিত বৃহদীশ্বর শিব মন্দিরটি এই স্থাপত্য-বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ ফল—প্রায় ২০০ ফুট উঁচু পিরামিডাকৃতি শিখর ও তারশীর্ষে দক্ষিণ ভারতীয় রীতিব গম্বুজ; লক্ষ্যণীয়ভাবে এই মন্দিবের গোপুবমটি মন্দিব শিখরের তুলনায় অনেকটাই ছোট (কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথেও তাই), মণ্ডপটিও তাই—কিন্তু বৃহদীশ্বব মন্দিরেব উচ্চতার সীমাস্পর্শের পর থেকে গোপুরমেব উচ্চতা বিপুলভাবে বাড়তে থাকে, একইসঙ্গে বাড়ে মণ্ডপের বিস্তৃতি।

এখন, উত্তর ভারতে আদি গুপ্তযুগীয় ছোট ছোট সমতল ছাদের মন্দির হতে ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ বা খাজুরাহোব কন্দরিয় শিব-মন্দিবের উচ্চ শিখরে বা দক্ষিণ ভারতে মামল্লপুরমের বাঁশ-খড়ের অনুকৃতি বা গুহামন্দিব হতে ইলোবা বা তাঞ্জভুরের মহানুভবতায় পৌঁছানোর পথে অনেক পবীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার হয়েছিল, সাধারণ বুদ্ধিতেই বলে এমন পবীক্ষা চলেছিল দেশজুড়ে— কিন্তু ইতোপূর্বেই যেমন উল্লেখিত হয়েছে, চাক্ষুষ প্রমাণ আছে কর্নাটকের বিজাপুর জেলার আইহোল, বাদামি, মহাকুটেশ্বব এবং পাট্টাডাকালে পঞ্চম থেকে অষ্টম শতকেব মধ্যে নির্মিত মন্দিরগুলিতে। এলাকাটি ভৌগোলিকভাবে উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের দুটি প্রচণ্ড শক্তিশালী স্থাপত্য আন্দোলনেব সঙ্গমস্থল হওয়ায় ব্যাপারটি ঘটা স্বাভাবিক ছিল। এখানে উত্তব-ভাবতীয় 'নাগব' শিখব ক্রমে ক্রমে পূর্ণতা পায়, আবাব এখানেই দক্ষিণ-ভারতীয় রীতির সেই অতি অলঙ্কৃত ধারা জন্ম নেয় যাব পরম বিকাশ পরে ঘটে দক্ষিণ কর্নাটকের হ্যালেবিদ্ ও বেলুরে।

আইহোলে মন্দির অনেকগুলি। এদের মধ্যে চারটি মন্দির উত্তর ভারতীয় শিখরের আদি রূপ ও তার বিবর্তনের ধারাটি বোঝার কাজে খব জরুরী—এই চারটি মন্দিরই খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে চালুক্য রাজবংশের আদি শাখা কর্তৃক নির্মিত। মন্দির চারটি হল (১) দুর্গা[১] মন্দির—বন্ধনী-সম্পন্ন উচ্চ অধিষ্ঠানের উপরে অর্ধবৃত্তাকার মণ্ডপ, স্তম্ভ পরিবেষ্টিত পার্শ্বশালা, এবং গর্ভগৃহের উপরে চৌকো ও ঈষৎ ক্রমহ্রস্বায়মান শিখর (এটি মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছু পরে সংযুক্ত হয়েছিল বলে ভাবা হয)। (২) হুচ্চিমালিগুটি (মন্দির নং ৯) বর্গাকার সান্ধার মন্দির এবং চতুরস্র গর্ভগৃহের উপরে আদি ও পরীক্ষামূলক ধরনের বক্ররেখ শিখর। (৩) হুচ্চাপ্পায়াগুটি, নিরন্ধার কিন্তু গর্ভগৃহের উপরে আমলক ও কলস-সহ বক্ররেখ শিখরটি যেন আদি আড়ষ্টতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। (৪) মন্দির-সংখ্যক ১৪—এটি আগের মন্দিরটির সমধর্মী, মনে হয় কিছুটা উন্নত সংস্করণ। বাদামির কাছে মহাকুটেশ্বর মন্দিরগোষ্ঠীর 'সঙ্গমেশ্বর' মন্দিরটির গুরুভার বক্ররেখ শিখর আইহোলের আদি রূপটি স্মরণ করায। বাদামি থেকে ২৯ কিমি দূরবর্তী পাট্টাডাকলের কাদাসিদ্ধেশ্বর ও জম্বুলিঙ্গ মন্দিরদুটি অতি গুরুভার শিখর-সম্পন্ন, কিন্তু কাশীবিশ্বনাথ মন্দিরটির স্থাপত্যে বিবর্তন স্পষ্ট—শিখরটি এখানে পঞ্চরথ। গলগনাথ মন্দিরের বক্র শিখরটি আরও উন্নত ও পাপনাথ মন্দিরের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বক্ররেখ শিখরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেকটাই সফল হয়েছে, কিন্তু এখানেও আদিম-ভাবটি একেবারে দূর হয়নি,—হল পরবর্তী চালুক্যদের (সপ্তম-অষ্টম শতক) পৃষ্ঠপোষকতায় অন্ধ্রপ্রদেশের মেহবুবনগর জেলার আলমপুরে প্রতিষ্ঠিত 'নবব্রহ্ম মন্দির' গুচ্ছে। এবার উত্তর ভারতীয় 'নাগর' রীতির শিখরের পূর্ণ পরিণত রূপ পাওয়া গেল গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যায়।

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে গুজরাটের গোপ (জেলা জামনগর, সৌরাষ্ট্র)-এ প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে লম্বা শিখর দেখা দেয়, সৌরাষ্ট্রে বহু ক্ষেত্রেই এই দৃষ্টান্ত অনুসৃত হয়, কিন্তু বক্ররেখ শিখরের যথার্থ রূপ মেলে অষ্টম শতকে, রোঢ়া (জেলা সবরকণ্টা)-র মন্দির গুচ্ছে এবং সুরেন্দ্রনগর জেলার ওয়াধার রণকদেবী মন্দির প্রভৃতি আরও কিছু দৃষ্টান্তে। তবে গুজরাটের মন্দির স্থাপত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বিন্দু মনে হয় ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দে শোলাংকি রাজ প্রথম ভীম কর্তৃক মেহসানা জেলার মোঢেরায় প্রতিষ্ঠিত 'সূর্য মন্দির'—নাগর দেউলের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিরই সবকটিই এখানে দৃষ্ট হয়।
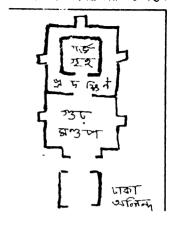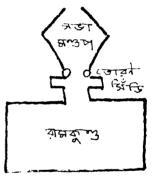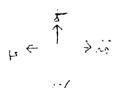
[১] 'দুর্গা' নয়—যদিও বহু ক্ষেত্রেই ভুলটি দেখা যায়।

পূর্ব প্রান্তে অসাধারণ রামকুণ্ড সরোবর, এটিও ছোট ছোট শিখর মন্দির ও অসামান্য জ্যামিতিক ফর্মে সজ্জিত। উদীয়মান সূর্যের রশ্মি সরোবরের জলকে স্পর্শ করে উঠতে উঠতে একসময় তোরণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে গর্ভগৃহে সূর্যদেবতার বিগ্রহকে আলোকিত করে—স্থাপত্য পরিকল্পনা এভাবেই কৃত। সমগ্র সংস্থানটিই উচ্চ অধিষ্ঠানের উপরে স্থাপিত। তোরণের পরে 'সভা-মণ্ডপ'টিকে বলা যায় কূর্মপৃষ্ঠ ছাদ সম্পন্ন নৃত্যমঞ্চ, হয়ত নাচের জন্য ব্যবহৃত হত। মূল প্রাসাদের দুটি অংশ—গূঢ় মণ্ডপ ও সান্ধার গর্ভগৃহ। পার্থক্য এই যে, অন্যত্র ভাস্কর্য শুধু মন্দিরের বহির্গাত্রে, কিন্তু মোধেরায় ভিতর-বাহির দুই গাত্রই ভাস্কর্যে স্বপ্ন-শোভাময়। ভিতরে স্তম্ভগুলিরও প্রতিটি ইঞ্চি অসামান্য সৌন্দর্যে খোদিত। তবে গর্ভগৃহের উপরস্থ পঞ্চরথ রেখ শিখরটি লুপ্ত। গুজরাটে উল্লেখযোগ্য মন্দির আরও বেশকটি। সৌরাষ্ট্রের শত্রুঞ্জয় ও সিরনারের জৈন মন্দিরগুলিও অসামান্য।

রাজস্থানে খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষদিক থেকে পঞ্চদশ শতকের শেষকাল পর্যন্ত মন্দির-নির্মাণ অব্যাহত ছিল। সবটাই উত্তর ভারতীয় 'নাগর' শৈলীতে এবং বলা বাহুল্য, কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যসহ। তবে আমরা মাত্র কয়েকটির উল্লেখই শুধু করতে পারি। 'নাগর' শৈলীর বিবর্তনে রাজস্থানের যোধপুর জেলার ওসিয়াঁর মন্দির-গোষ্ঠীর (খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষের দিক হতে একাদশ শতক) ভূমিকা আছে। পঞ্চরথ আসন, উঁচু অধিষ্ঠান, অলঙ্করণে দেব-দেবীর মূর্তি সমন্বিত কুলুঙ্গি ছাড়াও ফুল-লতা-পাতা ও কৃষ্ণলীলার ব্যবহার, চমৎকার বক্ররেখ কিন্তু কিছুটা চাপা ধরনের শিখর—দৃষ্টান্ত ভেদে কম-বেশি হলেও মোটামুটি এই হল ওসিয়াঁর মদিরগোষ্ঠীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য, প্রদক্ষিণও অনেক ক্ষেত্রে নেই। পরবর্তী মন্দিরগুলির মধ্যে চিতোরগড়ের 'কালিকামাতা' ও 'কুম্ভশ্যামা', উদয়পুর জেলার বদোলির 'ঘটেশ্বর' এবং জগতের 'অম্বিকা মাতা' প্রমুখ মন্দিরগুলির সবকটিই উন্নত পঞ্চরথ আসন ও অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য-মণ্ডিত। মনে করিয়ে দেওয়া ভাল যে এগুলি নমুনা মাত্র।

মধ্যভারতে প্রতিহার, কালাচুরি ও কচ্ছপঘাট রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন মন্দির এখনও বেশ কিছু টিকে আছে—এগুলি ছাড়া খাজুরাহোতে চান্দেল্য বংশ প্রতিষ্ঠিত অনন্যসাধারণ মন্দির স্থাপত্যগুলির নান্দনিক অনুভব সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে পরিসর নামমাত্র—তাই আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখমাত্র করব।

গোয়ালিয়র দুর্গের প্রান্তবর্তী এলাকায় দৃশ্যমান 'তেলি কা মন্দির' নামে পরিচিত অসামান্য মন্দিরটি আনু. ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে কনৌজ রাজ যশোবর্মন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় বলে কথিত। এই মন্দিরটি আমরা বেছে নিয়েছি শুধু অসামান্য বলে নয়, পূর্ণ ব্যতিক্রমী বলেও। আনু. ১০০ ফুট উঁচু বিশাল মন্দিরটি বক্ররেখ শিখরের 'নাগর' দেউলের সমুদ্রের মধ্যে বেলনাকার শিখর নিয়ে বিরাজমান—স্টেলা ক্র্যামরিশ একে 'খাখড়া' রীতির একটি উপধরন বলেছেন।* দৃশ্যত, এর শিখরের সাথে নাগর রীতির চেয়ে দ্রাবিড় রীতির মিল বেশি। মন্দিরগাত্রের মাঝের উদ্গত অংশটি প্রবেশদ্বার ও তার উপরস্থ গবাক্ষকে নিয়ে বিপুল চৈত্যাকৃতি ডিজাইন, যেন মন্দিরের মাঝে আর একটি মন্দির। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে গোয়ালিয়র দুর্গগামী পথের ধারেই রয়েছে পাহাড়-কাটা 'চতুর্ভুজ' মন্দির—প্রতিহার রাজ রামদেব প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির পাহাড় কেটে নির্মিত হলেও এর আকৃতি নাগর দেউলের মত, গুহার মত নয়।

---

* "The Vaital Deul represents a subvariety of the Khakhra type, also the Teli Ka Mandir"—Ibid. p. 182, Foot note 4.

কালাচুরি রাজবংশের শেষ ও মনে হয় শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল ভেরাঘাট (জেলা জব্বলপুর, মধ্যপ্রদেশ)-এর চৌষট্টি যোগিনী মন্দির (নবম-দশম শতক)। নর্মদা এবং বানসাগরের সঙ্গমের কাছে একটি ছোট পাহাড়ের উপরে ভিতরে ভিতরে আনু. ১২০/২৫ ফুট ব্যাসার্ধের গোলাকৃতি মন্দিরের ৮১টি 'কুট' বা প্রকোষ্ঠে উমা মহেশ্বর ও যোগিনী মূর্তি রয়েছে। খাজুরাহোর চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরটি (নবম শতক) বর্গাকার, তবে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের লাগোয়া হীরাপুর এবং বোলাঙ্গির জেলার রানিপুর ঝড়িয়ালের চৌষট্টি যোগিনী মন্দির দুটি ভেরাঘাটের মতই গোলাকার, কিন্তু ছোট— দুটি দৃষ্টান্তই একাদশ শতকীয়।

নর্মদা নদীর উৎসস্থল অমরকণ্টকে (জেলা শাহদোল, মধ্য প্রদেশ) চেদি-রাজ কর্ণ (খ্রি. ১০৪১-১০৭২) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও 'কর্ণ মন্দির' নামেই পবিচিত সপ্তরথ মন্দিরটির তিনটি গর্ভগৃহ যেন একই বৃন্তে তিনটি পাতা—বেলপাতা যেমন হয়—বোঝা যায় যে একটি মণ্ডপ দ্বারা এগুলি যুক্ত থাকা উচিত ছিল, কিন্তু সেই মণ্ডপ আদৌ নির্মিত হয়েছিল কিনা বলা যায় না, তবে শিখরটি খাজুরাহোর মতই সর্বোন্নত ধারার। অমরকণ্টকের অন্য মন্দির কটি পঞ্চরথ শিখর দেউল।

মধ্যপ্রদেশের আর একটি অসামান্য মন্দির হল উদয়পুর (জেলা বিদিশা)-এ পারমার রাজ উদয়াদিত্য (আনু. ১০৫৯-১০৮৭ খ্রি.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'নীলকণ্ঠেশ্বর' মন্দির। 'উদয়েশ্বর' নামেও পরিচিত এই মন্দিরটি 'ভূমিজ' রীতিব শিখরের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহবণ—এই রীতিতে দেওয়ালের কেন্দ্রীয় অংশটি বেশ প্রশস্ত ও উদগত থাকে এবং দুপাশ দিয়ে উপর থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া পুঁতি-গাঁথা সুতোর মত পরপর লম্বিত থাকে অন্য অংশগুলি, ফলে বক্ররেখ শিখরটি হয় বর্তুলাকার। মন্দিরটির ভাস্কর্যসজ্জাও অসাধারণ।

গোয়ালিয়র দুর্গ এলাকার মধ্যস্থিত 'শাস-বহু' মন্দির নামে পরিচিত যুগল মন্দিরও মন্দির স্থাপত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। লিপি অনুসারে কচ্ছপঘাট বংশীয় রাজা মহীপাল ১০৯৩ খ্রিষ্টাব্দে 'হরিসদনম্' নামে মন্দিরদ্বয় প্রতিষ্ঠা করেন। বৈষ্ণব ধারার মন্দির দুটির একটি বৃহৎ (শাস্) অন্যটি তুলনায় ক্ষুদ্র (বহু)। দুটি মন্দিরেরই শিখর লুপ্ত। বৃহত্তর মন্দিরটির পরিকল্পনা মহাবিপুল সমৃদ্ধ এবং রাজসিক— গর্ভগৃহ, অর্ধমণ্ডপ, মহামণ্ডপ ও তিনটি প্রবেশ অলিন্দ। দ্বিতল উচ্চতায় প্রবেশ কক্ষ ও ত্রিতল-উচ্চতায় মণ্ডপ, ৪টি বিপুল স্তম্ভ ও ১২টি বৃথাস্তম্ভ (pilaster) নির্ভর মণ্ডপের বর্তুল ছাদের উচ্চতা ৮০ ফুট বা তার বেশি। সমস্ত গাত্রের ভিতর বাহির উভয় দিকই বিপুল ও অসামান্য ভাস্কর্য মণ্ডিত— তুলনায় ছোট অন্য মন্দিরটি এরই ছোট সংস্করণ। সুতরাং সুউচ্চ শিখরদ্বয় লুপ্ত হলেও গোয়ালিয়রের 'শাস-বহু' মন্দির অনেক দিক হতেই ব্যতিক্রমী এবং অভিনব।

সকলেই জানেন যে, মধ্যভারতীয় মন্দির-স্থাপত্য-আন্দোলন উৎকর্ষের তুঙ্গতম শিখরে আরোহণ করে চান্দেল্য রাজবংশের অবারিত পৃষ্ঠপোষকতায়, তাঁদের ধর্মীয় রাজধানী খাজুরাহোতে (জেলা ছাতারপুর, মধ্যপ্রদেশ)। কিছুকাল আগেও মনে করা হত যে খাজুরাহোর মন্দিরগুলি আনু. ৯৫০-১০৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তৈবী—কিন্তু এখন বিশেষজ্ঞদের ধারনা হল আনু. ৮৫০ খ্রি. থেকে অন্তত ১১০০ খ্রি. পর্যন্ত এই নির্মাণ পর্ব চলেছিল। প্রথম যুগে ব্যবহৃত হত গ্রানাইট পাথর (যেমন চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরে), পরে অংশত গ্রানাইট ও অংশত বেলেপাথর এবং উন্নত পর্যায়ে শুধু বেলে পাথর। এই বিবর্তনে সময় লাগার কথা। আধুনিক বিশেষজ্ঞদের কেউ

কেউ খাজুরাহোর মন্দির গুলিকে অগ্রগতি, পরিণতি ও অবনতি এই তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেন—প্রথম পর্যায়ে আছে, (১) চৌষট্টি যোগিনী, (২) লালগুয়াঁ মহাদেব, (৩) ব্রহ্মা, (৪) মাতঙ্গেশ্বর এবং (৫) বরাহ মন্দির—সাধারণভাবে এগুলি নিরলংকার কিন্তু খাজুরাহোর মন্দিরগোষ্ঠীর কিছু সাধারণ লক্ষ্মণ, যেমন দুটি আমলকের প্রয়োগ, ঊর্ধ্বগতিময় শিখর ইতোমধ্যেই দেখা দিয়েছে, অর্থাৎ এই মন্দিরগুলি বিখ্যাত খাজুরাহো রীতির সার্থকতার দিকে যাত্রা সূচিত করছে; দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে : (১) লক্ষ্মণ (আনু. ৯৫০-৭০ খ্রিঃ), (২) পার্শ্বনাথ (আনু. ৯৫০-৭০ খ্রি.), (৩) বিশ্বনাথ (১০০২ খ্রি.), এবং (৪) কন্দরিয় মহাদেব মন্দির (আনু. ১০২৫-৫০ খ্রি.)—এই পর্যায়টি হল খাজুরাহোর মন্দির-গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ ও সার্থকোত্তম পরিনতির পর্যায়, এবং এদের মধ্যে আবার কন্দরিয় মহাদেব মন্দির সংশয়াতীত রূপে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই চারটি মন্দিরের মধ্যে লক্ষ্মণ ও বিশ্বনাথ মন্দির দুটি পঞ্চায়তন, কন্দরিয় মহাদেব মন্দিরটিও হয়ত আদিতে পঞ্চায়তন ছিল কিন্তু এর অধিষ্ঠানের চারকোণের চারটি তুলনায় ছোট শিখর মন্দির লুপ্ত। এর পরে শুরু হয় অবনতির পর্যায় বা তৃতীয় পর্যায়, এর মধ্যে আছে : (১) বামন, (২) আদিনাথ, (৩) জাবরি, (৪) চতুর্ভুজ ও (৫) দুলাদেও মন্দির—শেষেরটি সম্ভবত দ্বাদশ শতকীয়।
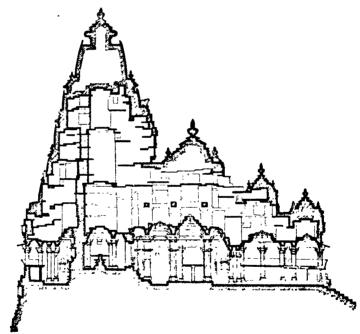
Fig ' KANDARIYA TEMPLE, KHAJURAHO
From B L. Dhama, 'A Guide to Khajuraho', Pl IV

পরম শ্রদ্ধেয়া স্টেলা ক্রামবিশ-প্রদত্ত এবং উপরে নিবদ্ধ 'কন্দরিয় মহাদেব' মন্দিরের অনুপম রেখাঙ্কনটি[১] তন্নিষ্ঠভাবে অনুসরণ করলে আমরা নাগর দেউলের সর্বোত্তম রূপটির

১। প্রাগুক্ত, Vol I, P 212.

মহা-মহানুভবতা উপলব্ধি করতে পারি। এ হল পর্বতের অনুকল্পে ভগবানের বাড়ি। প্রকৃতপক্ষে, এক্ষেত্রে মন্দিরটির নামকরণের মধ্যেই সূত্রটি আছে—'কন্দরিয়' শব্দটির অর্থ হল 'কন্দর' বা পর্বতের গুহায় স্থিত ('of the cave')'। সমগ্র সংস্থানটি এখানে পর্বতশ্রেণি, গর্ভগৃহটি তার কন্দর বা গুহা এবং পর্বতের তুলনায় গুহার মতই গর্ভগৃহও সমগ্র মন্দির-সংস্থানের তুলনায় অতিক্ষুদ্র—সমগ্র মন্দির-সংস্থানের দৈর্ঘ্য যেখানে ১০২ ফুট তিন ইঞ্চি সেখানে গর্ভগৃহের দৈর্ঘ্য মাত্র ১২ ফুট[২]। এটিও লক্ষ্যণীয় যে গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ-প্রতীকের একেবারে সোজাসুজি উপরে শিখরশীর্ষে রয়েছে 'বিন্দু' এবং অমৃতকলস/অমরকারক[৩]। এবং পর্বতশ্রেণি যেমন ক্রমশ হ্রস্বতর শৃঙ্গ হতে উচ্চতর শৃঙ্গে উন্নত হতে হতে শেষে তুঙ্গতম শিখরে পৌঁছায়, তেমনই প্রথমে 'অর্ধ মণ্ডপ' ('অর্ধ' কারণ তার সামনের দিকটি খোলা), উচ্চতায় সবচেয়ে কম কিন্তু এখান থেকেই শুরু হয় তুঙ্গতম শিখরের দিকে যাত্রা, এরপর কিছুটা উঁচু 'মণ্ডপ', এরপরে আরও উঁচু 'মহামণ্ডপ' যার ঊর্ধ্বগতি শিখরের 'শুকনাসা'র ঠিক নিচুতে থেমে যাচ্ছে, এরপরে মূল প্রসাদের মহোচ্চ শিখর। আবার পর্বতগাত্রে যেমন প্রতি চড়াইয়ের পরে উৎরাই, তেমনই অর্ধমণ্ডপের চড়াইয়ের পরে মণ্ডপের আরও উঁচু চড়াই, তার পরে মহামণ্ডপের আরও বেশি উঁচু চড়াই এবং মহামণ্ডপের উৎরাই মিলিয়ে যাচ্ছে মূল প্রাসাদের খাড়া দেওয়ালে—পর্বতমালায় যেমন হয়।—মন্দিরটির অন্য বৈশিষ্ট্যগুলির কিছু এই রকম : (১) উচ্চ অধিষ্ঠান, (২) এর উপর সংস্থানের ভূমিতলটি স্তম্ভ-নির্ভর হল ঘরের মতন; (৩) প্রদক্ষিণটি মহামণ্ডপের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ মন্দিরটি সান্ধার। (৪) বর্গাকার ছকের চারকোণে প্রোথিত চারটি খুঁটির মত স্তম্ভের সাহায্যে 'অন্তরাল'টি নির্দিষ্ট। (৫) বাহিরে মূল প্রাসাদ বা শিখরের গাত্রে নিবদ্ধ অঙ্গ শিখরগুলি নিজ নিজ আমলক ও কলসসহ যেন প্রবল গতিতে ঊর্ধ্বে উড্ডীন ('উড়মঞ্জরী'), এই-ই হল 'শেখরী' রীতির রূপ (৬) মণ্ডপ গুলির গাত্রস্থিত অনুকৃতিগুলিও নিজ নিজ আমলক ও কলস-বিশিষ্ট এবং (৭) সমগ্র সংস্থানটি ৮০০ টি অনুপম ভাস্কর্য-ফলকে সজ্জিত।

স্থানাভাবের কারণে আমরা খাজুরাহোর একটি মাত্র মন্দিরের সামান্য বিবরণী দিতে পারলাম, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যটি হল উত্তর ভারতীয় নাগর দেউলের রূপটি বোঝা, সে উদ্দেশ্য এতেই অনেকটা পূরণ হয়েছে বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলার ভারমোরে লক্ষণা দেবীর প্রতি উৎসর্গিত একটি সপ্তম শতকীয় কাঠের তৈরী মন্দির এখনও টিকে আছে এবং চাম্বা শহরেও একটি নবম শতকীয় রেখ দেউল এখনও ভাল অবস্থায় টিকে আছে।

রাজস্থানে 'ভূমিজ' রীতির শিখর বেশ কিছু আছে, খাজুরাহোতে 'শেখরী' রীতি অদ্বিতীয়, একই ভাবে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর-পুরী-কোণারকে 'লতিনা' রীতি অত্যুজ্জ্বল ভাবে বিদ্যমান। শিখরের দুই কোণের উদগত অংশ (বাহা পগ) প্রভৃতিকে যখন লতাজালের মত আচ্ছাদন করে রাখে 'ভূমি,' গবাক্ষ' প্রভৃতি, তখন শিখরটি 'লতিনা' রীতির—এই স্টাইল ভুবনেশ্বর ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। এই অঞ্চলের পূর্ণ পরিণত মন্দিরের অন্যান্য প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নীচের রেখচিত্র হতে বোঝা যাবে :

২। ঐ, Vol. II, P. 365, Foot Note

৩। ঐ Vol. I, P. 162, Foot note 83
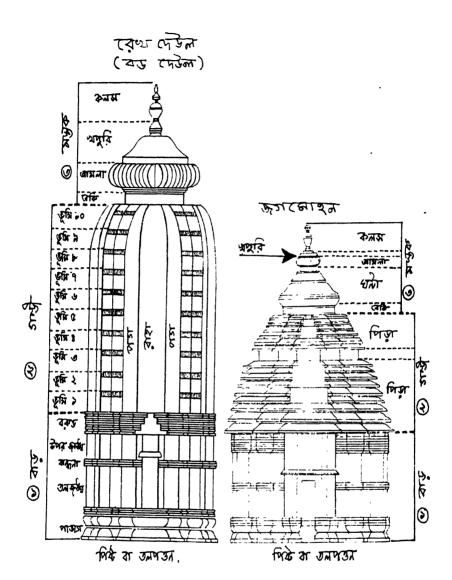
বললে, ওড়িশী দেউলের (রেখ এবং পিড়া) অধিষ্ঠান ('পা-ভাগ')-এর উপরে তিনটি মূল অংশ বাড়, গণ্ডি ও মস্তক। 'বাড়' হল দেওয়াল যেটি অধিষ্ঠান থেকে শুরু হয়ে গর্ভগৃহের ('গর্ভমুড়ের) শীর্ষ পর্যন্ত। (২) 'গণ্ডি' বাড়ের উপর থেকে 'বেকি-র তলা পর্যন্ত থাকা বক্ররেখ শিখরের অংশ বা শিখর। এটি কতগুলি তালা (storey) বা 'ভূমি'-বিশিষ্ট। শিখরের ভার বহনের জন্যই সমতল চালের ('রত্নমুড়') 'ভূমি'-গুলি ব্যবহৃত হয়।

(৩) 'মস্তক'—এর অংশ চারটি, (ক) 'বেকি' (গলা/গ্রীবা), শিখরের কণ্ঠদেশ, (খ) আমলক, (গ) 'খপুরি' (মাথার খুলি)—পূজারী যেমন পূজার্থে মাথার খুলির উপরে দেবতার ঘট বহন করেন শিখরের 'খপুরি' তেমনই 'কলস' বহন করে। (ঘ) কলস। এর উপরেও থাকে 'দণ্ড' এবং 'পতাকা'। ওড়িশী রীতি অনুসারে পূর্ণ পরিণত রেখ দেউলের ('বড় দেউলের') 'জগমোহন' ('মুখ-মণ্ডপ'/ 'মুখশালা'—'ছোট দেউল') হয় 'পিড়া' রীতির। এরও তিন অংশ বাড়, গণ্ডি, মস্তক— পার্থক্য হল (i) বাড়ের উপরস্থ গণ্ডিটি এক্ষেত্রে পিঁড়ির মত কয়েকগুচ্ছ ('পোটল') পিড়ার সাহায্যে ক্রমহ্রস্বায়মান পিরামিডাকারে নির্মিত হয় এবং (ii) 'বেকি' ও 'আমলকের মাঝে থাকে 'ঘন্টা' বা ঘন্টাকৃতি' স্থাপত্য। আমলক, খপুরি ও কলস রেখ মন্দিরেরই মত। এইসঙ্গে বৃহৎ মন্দিরের ক্ষেত্রে জগমোহনের সামনে থাকতে পারে আরও দুটি স্থাপত্য. যথাক্রমে 'নাটমন্দির' ('নৃত্যশালা') এবং 'ভোগ- মণ্ডপ', যেমন ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত 'লিঙ্গরাজ' মন্দিরে বিষয়টি এইরকম :
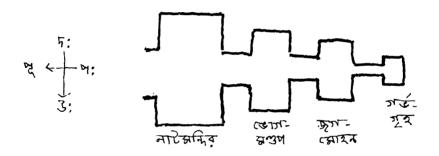
তবে আমাদের মনে রাখতে হয় যে, উপরের দিকগুলি শুধুমাত্র পূর্ণ বিকশিত ও পরিণত পর্যায়ের ব্যাপার, ভুবনেশ্বরেরই আদি পর্যায়ের নয়।

ভুবনেশ্বর-বৃত্তের মন্দিরগুলিকে তিনটি পর্যয়ে ভাগ করা চলে (১) আদি পর্যায়, ৭ম-১০ম শতক, এই পর্যায়ের মুখ্য স্থাপত্য হল পরশুরামেশ্বর ও বৈতল দেউল। মুক্তেশ্বর মন্দির একই সঙ্গে এই পর্যায়ের সমাপ্তি ও পরবর্তী পর্যায়ের সূচনা ঘোষণা করছে। (২) ১০ম থেকে দ্বাদশ শতক— এই পর্যায়ের মুখ্য স্থাপত্য হলঃ ব্রহ্মেশ্বর, লিঙ্গরাজ এবং পুরীর জগন্নাথ মন্দির। (৩) ১২শ-১৩শ শতক— এই পর্যায়ের মুখ্য দৃষ্টান্ত হল রাজা-রানী, অনন্ত বাসুদেব ও কোণারকের সূর্য মন্দির।

ভুবনেশ্বরের প্রাচীনতম মন্দির হল ষষ্ঠসপ্তম শতকীয় শত্রুঘ্নেশ্বর গুচ্ছ (লক্ষ্মণেশ্বর, ভরতেশ্বর এবং শত্রুঘ্নেশ্বর)—এগুলির দুটির কঙ্কাল-মাত্র আছে তবে যেটি ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ

কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয়েছে, সেটিতে নিবদ্ধ আদি ভাস্কর্যগুলি রীতি ও বিষয় উভয় দিক হতেই পরশুরামেশ্বরের সাথে মেলে—মন্দিরকটি মুখশালা বা মুখপগুপহীন। সপ্তম শতকীয় পরশুরামেশ্বর মন্দিরটি অধিষ্ঠান-রহিত ও ত্রিরথ। আকৃতি ছোট হলেও গুরুভার। সামনের বর্গাকার ও দ্বিস্তর-চাল-বিশিষ্ট [illegible] 'টি হয়ত ঈষৎ পরে যুক্ত। মূর্তিগুলি বৌদ্ধ চৈত্যের ধাঁচে 'ফ্রেমে' নিবদ্ধ। গর্ভগৃহের দরজার উপরের 'অষ্টগ্রহ' এর প্রাচীনতার ইঙ্গিত দেয়, পরবর্তী মন্দিরগুলিতে আছে নবগ্রহ। মন্দিরের পিছনের দেওয়ালের বৃহৎ কুলুঙ্গিতে স্থিত দ্বিভুজ কার্তিকেয় মূর্তিটি অসামান্য, তেমনই উল্লেখযোগ্য হল মুখশালার উত্তর দেওয়ালের সপ্তমাতৃকা মূর্তি। অন্য মূর্তিগুলিও আছে মুখশালার দেওয়ালে, এদের মধ্যে রয়েছে শিব, পার্বতী, গণেশ, যম, ইন্দ্র প্রভৃতি ছাড়াও একটি বিষ্ণুমূর্তি। প্রতিটি মূর্তি-ই অসাধারণ।—ভুবনেশ্বর পরিবৃত্তের স্থাপত্যের বিভিন্ন পর্যায় মিলিয়ে অন্যান্য মন্দিরগুলির মধ্যে বৈতল দেউল খাখড়া-মুণ্ডি সম্পন্ন; মুক্তেশ্বর মন্দিরে প্রথম অধিষ্ঠান ব্যবহৃত হয়, দেউলটি পঞ্চরথ, মুখশালাটি এখনও 'পিড়া' রীতির না হলেও সেদিকে প্রবণতা-সম্পন্ন এবং দেখতে পরশুরামেশ্বরের মতন গুরুভার নয়—এইসব কারণেই এটিকে আদি রীতির অবসানের ও নবরীতির সূচক স্বরূপ বলা হয়। এই মন্দিরেব তোরণটিও দর্শণীয়। এছাড়া, ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরটি পঞ্চায়তন। অন্য মন্দিরগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আগেই বলা হয়েছে।

কিন্তু উড়িষ্যা বলতে শুধু ভুবনেশ্বর পরিবৃত্তকেই বোঝায় না, আরও অনেক কিছুর মধ্যে পশ্চিম উড়িষ্যা, বিশেষত রাণিপুর-ঝড়িয়াল ও খিচিংকেও, বোঝায়। বোলাঙ্গির জেলার রাণিপুব-ঝড়িয়ালের চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরের কথা ইতোমধ্যে উল্লেখিত হযেছে, এছাড়া সোমেশ্বর শিবের দেউলের কাছে বেশ উল্লেখযোগ্য ধরণেব খাখড়া-রীতির একটি দেউল আছে এবং সোমসাগর নামে বৃহৎ পুকুবেব পাড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে মুখশালাহীন ও ছোট ছোট অন্তত: ২৩টি রেখ দেউল—আকৃতিতে ছোট হলেও এগুলির সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের দেউলগুলির সাদৃশ্য বেশি। একই কথা বলা যায় বাণিপুর-ঝড়িয়ালেব অতি উল্লেখযোগ্য 'ইন্দ্রলথ' মন্দির সম্পর্কে—এটি উড়িষ্যার সর্বোচ্চ ইটের তৈরী দেউল, ইট-কাটা অলঙ্করণ ও টেরাকোটা-সজ্জিত, বৃহৎ ও অত্যুচ্চ হলেও এটিরও কোনও জগমোহন বা মুখশালা নেই, তার বদলে মন্দিরদ্বারকে কেন্দ্র করে শিখর দেউলের অনুকৃতি আছে। প্রসঙ্গত, মধ্যপ্রদেশের সমীপবর্তী রাণিপুর-ঝড়িয়াল অত্যন্ত প্রাচীন স্থান, এখানে পুরাতন ও নব্য প্রস্তর-যুগের সাক্ষ্য মিলেছে এবং 'সোমতীর্থ' নামে পরিচিত এই ক্ষেত্রটি রামায়ণের কাল থেকেই দক্ষিণ কোশল রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল, ফলে এখানকার স্থাপত্য রীতিতে উত্তর-ভাবতীয় প্রভাবই মুখ্য, 'কালিঙ্গ' নয়। বারিপদা জেলার খিচিংয়েও মনে হয় কিছুটা তাই। খিচিংয়ের ভাস্কর্য শোভিত ও বিখ্যাত 'কীচকেশ্বরী' মন্দির নামে পরিচিত উচ্চ রেখ দেউলটি জগমোহন বা মুখশালাহীন. এছাড়া দেউলটিতে ভুবনেশ্বর-পরিবৃত্তের বা 'কালিঙ্গ' মন্দিরগুলির মতন সুডৌল ও নমনীয় ভাব নেই। খিচিংয়ের অন্যান্য মন্দিরগুলি সম্পর্কেও একই কথা। প্রসঙ্গত শোনপুর (জেলা ও শহর) মন্দির-শহর নামে

পরিচিত হলেও এখানকার মন্দিরগুলি প্রাচীন নয় তথাপি দুটি মন্দির আকর্ষণীয়—বাসস্ট্যাণ্ডের লাগোয়া পাঁচটি শিখর-সম্পন্ন 'পঞ্চরথ' মন্দির ও প্রধান রাস্তার পাশে থাকা 'জ্ঞানদেবী মালুনি' মন্দির, 'মালুনি' নামেই পরিচিত এই মন্দিরটি অতি বিরল গুহ্য তান্ত্রিক দেউল এবং চারদিকেই নিরেট দেওয়ালের দ্বারা বদ্ধ ও কোনো প্রবেশ পথই নেই—এদুটি ছাড়াও শোনপুরের রামেশ্বর ও সুবর্ণমেরু নামের সুউচ্চ দেউল দুটিও বিখ্যাত। প্রকৃত পক্ষে উড়িষ্যার প্রত্যেক জেলাতেই বহু উল্লেখযোগ্য রেখ দেউল আছে যেমন সম্বলপুর জেলার 'নৃসিংহনাথ', ঢেনকানল জেলার 'কপিলাস' (পিড়া-জগমোহন সহ) বা কালাহান্দি জেলার ভবানীপাটনার রাজবাড়ির মধ্যে থাকা চোখা খাড়া 'মানিকেশ্বরী দেবী' মন্দির। আরও আছে বারিপদা জেলার হরিপুরগড়ের টেরাকোটা-সহ গৌড়ীয় রীতির আটচালা মন্দির যেটি এই বইয়ে আলোচিত হয়েছে।

আমরা উপরে দক্ষিণ ও বিশেষ করে উত্তর ভারতের মন্দির-স্থাপত্যের অতি সংক্ষিপ্ত ও দ্রুতায়িত পর্যবেক্ষণটি উপস্থিত করেছি এই কারণে যে এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের মন্দির স্থাপত্য বোঝার উপায় নেই। এটুকু চেতনায় না রাখলে মনে হতেই পারে যে বরাকর, সাতদেউলিয়া বা জটার প্রাচীন দেউলগুলি যেন হঠাৎ শূন্য থেকে পড়েছে। এভাবে আমাদের কাছে সেই সমস্যাই ঘুরে আসে উত্তর-ভারতের শিখর-দেউল নিয়ে যে সমস্যায় পড়েছিলেন আদি গবেষকগণ, যেমন, ফার্গুসন ভেবেছিলেন যে শিখর হল 'ইন্দো-আর্য' ('Indo-Aryan') স্থাপত্য—ভেবেছিলেন, কিন্তু সমস্যাটির কোনো সমাধান তিনি করতে তো পাবেনইনি বরং তিনি বিভ্রান্ত হয়েছিলেন এই দেখে যে, শিখরেব আকৃতি কখনও প্রায় পিরামিডের মত, কখনও বিশপের টোপরের (Mitre) মত, কখনও গথিক শৃঙ্গের মত (খাজুরাহো), আবার কখনও পূর্ণ আকারপ্রাপ্ত আনারসের মত (ভুবনেশ্বর)।[১] বাংলার দেউলগুলির শ্রেণিকরণকালে এ জাতীয় সমস্যায়পড়েন পণ্ডিত ম্যাকাচিয়ন :

"Although there are striking differences between individual examples (some stunted, others tall, some flat-topped, others pointed, some fussy with decoration, others almost plain), it is difficult to divide the larger temples into convincing groups without creating an unwieldy number of sub-divisions."[2]

প্রকৃতপক্ষে উৎপত্তিকাল থেকেই শিখর ও শিখর-রীতির মধ্যে প্রায় অন্তহীন বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল,ফলত কাল-ভেদে ও অঞ্চল-ভেদে শিখর, ক্র্যামরিশ বর্ণিত মূল স্বরূপটি অক্ষুন্ন রেখেই, নানা বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে। পশ্চিম বাংলাতেও করেছে।

অতএব আলোচনার শুরুতে তোলা দ্বিতীয় প্রশ্নটির অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে সর্বভারতীয় মন্দির-স্থাপত্য ধারার গ্রহণ-বর্জন ও বিকাশ-সম্পর্কিত প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে হবে সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে এবং কোনও ধরা-বাঁধা ছকে নয়। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে উড়িষ্যার প্রভাবের কথা। পশ্চিমবঙ্গে

১। 'India Discovered' (প্রাগুক্ত), p 156।

২। প্রাগুক্ত, 'Late Mediaeval .. ', p. 19।

খাঁটি ওড়িশী দেউল সর্বমোট ১৮টি (দ্বিতীয় পর্বের পঞ্জি ১৭, দেখুন), এর বাইরেও দু/একটি দৃষ্টান্ত থাকতে পারে, কিন্তু বাকি প্রায় ২০০টি দৃষ্টান্তে ওড়িশী প্রভাব হয় নেই, নয়ত অতি সীমিত। সুতরাং শুধুমাত্র ওড়িশী ছকে পশ্চিমবাংলার দেউলগুলিকে বিচার করা চলে না। আসলে, 'ওড়িশী' বলতে আমরা শুধু ভুবনেশ্বর পরিবৃত্ত বা 'কালিঙ্গ' রীতি-ই বুঝি— দৃষ্টিকে আরও একটু প্রসারিত করে আমরা যদি পশ্চিম উড়িষ্যাকেও (বিশেষত খিচিং ও রানিপুর-ঝড়িয়াল) বিবেচনায় রাখি, তাহলে অসুবিধা অনেক কমে।

যাইহোক, সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটির উত্তর ছড়িয়ে আছে এই বইয়ের সমগ্র দ্বিতীয় পর্বে, এখানে শুধু কয়েকটি সূত্রের উল্লেখমাত্র করা যায়। আমরা দেখব যে, বরাকরের অষ্টম-শতকীয় সিদ্ধেশ্বর শিবের দেউলের সাথে ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর মন্দিরের চেয়ে সাদৃশ্য বেশি মধ্যপ্রদেশ ও সৌরাষ্ট্রের দু/একটি অতি প্রাচীন মন্দিরের সাথে। একথাও স্মরণ করা যায় যে, দশম-একাদশ শতকীয় দুটি বঙ্গীয় দেউল, সাতদেউলিয়া ও বহুলাড়ার দেউল দুটি, ভূভারতে অনুপম—তবে উত্তর-প্রদেশের ভিতরগাঁওয়েব চতুর্থ শতকীয় ইটি-নির্মিত সুবৃহৎ দেউলটি এদের পূর্বগ ও উড়িষ্যার রাণিপুর-ঝড়িয়ালের ইটেরই নির্মিত সুউচ্চ ইন্দ্রলথ মন্দিরটি এদের অনুগ হতে পারে। দেউলভিড়্যার দেউলটি (নবম শতক) 'কালিঙ্গ' রীতির সাথে বেশ মেলে, কিন্তু হাড়মাসড়ার দেউলটি (দশম শতক) মেলে না। সুইসার পঞ্চাযতনটি (অষ্টম-নবম শতক) ভুবনেশ্বরের ব্রহ্মেশ্বরের আগে নির্মিত, কিন্তু দেওগড়ের দশাবতারেব পঞ্চায়তনটি নির্মিত হয় খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে।

অন্যদিকে বেগলার সেই ১৮৭২-৭৩ এই লক্ষ্য করেন যে বীরভূমের বক্রেশ্বরের বিখ্যাত দেউলটি বিহারের বৈজনাথের মন্দিরগুলির মত[১]। আমরা একই কথা বলতে পারি বীরভূমের মহুলা, কবিলাসপুর, পাঁচড়া, রসা ও মহম্মদ বাজারের দেউলগুলি সম্পর্কে, ভাণ্ডীরবনের সোজা-খাড়া এবং বাড়-গণ্ডি ভেদহীন দেউলটিও তাই। বর্ধমানের কুমারডিহির সুউচ্চ, খাড়া এবং কিছুটা অন্তব অন্তর সমান্তরাল পটি-সহ দেউলটি কিছুটা মেলে উড়িষ্যার কালাহান্দি জেলার ভবানীপাটনার মানিকেশ্বরী মন্দিরের স্থাপত্যের সাথে, কিন্তু 'কালিঙ্গ'-রীতির সঙ্গে একেবারেই নয়। ম্যাকাচিয়ন যথার্থভাবে ছোট ও টেরাকোটা-সমৃদ্ধ 'বীরভূম-বর্ধমান' বীতির কথা বলেছেন[২]। মূলত বীরভূমের বোলপুর ও ইলামবাজার এবং বর্ধমানের আউসগ্রাম ও ভাতাড় থানা এলাকার এই রীতি আসলে 'নাগর' রীতিরই বঙ্গীয় সংস্করণ— কিন্তু আকর্ষণীয় ব্যাপার হল ঐ অঞ্চলেরই বৃহত্তর দৃষ্টান্তগুলিতে, যেমন দিগ্‌নগর ও সরগ্রামের বৃহত্তর ও উচ্চতর দেউলগুলিতে, ঐ মডেল অনুসৃত হয়নি।

পুরুলিয়ার প্রাচীনতর দৃষ্টগুলি, যেমন সুইসা-ছড়রা-পাক-বিড়বা প্রমুখ ক্ষেত্রের দেউলগুলি, অনেক পরিমানেই উত্তর ভারতীয় নাগর শৈলীর স্থাপত্য। হয়ত হাজারিবাগ থেকে কাঁসাই ও দ্বারকেশ্বর নদী-খাত ধবে এসেছিলেন যে জৈন প্রচাবকগণ, তাঁরা মগধের মাধ্যমে প্রভূত

১। প্রাগুক্ত 'Report', p 146।

২। প্রাগুক্ত 'Late Mediaeval.. ', p 23-24।

পরিচিত নাগর-শৈলীটিও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। পুরুলিয়ারই পরবর্তী দৃষ্টান্তগুলিতে, যেমন তেলকুপি-বান্দা-দেউলঘাট প্রমুখ স্থানের দেউলগুলিতে, উত্তর ভারতীয় শৈলীর সাথে সাথে কিছু কিছু 'কালিঙ্গ' প্রভাবও আছে, কিন্তু কখনোই তা সার্বভৌম হয়ে ওঠেনি।

এখানে স্মরণ করা দরকার সেই ঐতিহাসিক সত্যটি যার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন পণ্ডিত হিতেশ্বরঞ্জন সান্যাল :

> "গুপ্তযুগের অতুলনীয় উৎকর্ষের মধ্যে যে আঞ্চলিক আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহারই সুযোগে বাঙ্গালী তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করিল। আয়োজন চলিয়াছিল সুদীর্ঘকাল ধরিয়া। শিল্পে ও সংস্কৃতিতে যাহা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিতেছিল রাজনৈতিক জীবনে তাহাই রূপ লাভ করিল শশাঙ্কের কীর্তিকলাপের মধ্য দিয়া। উত্তরভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া শশাঙ্ক যে গৌড়তন্ত্রের সূচনা করিলেন তাহার মূল বাঙ্গালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার আয়োজনের মধ্যে। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে যে শক্তি জন্মলাভ করিয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছিল শশাঙ্কের মধ্যে যেন তাহারই একটি প্রকাশ ঘটিয়া গেল। শশাঙ্কের পরবর্তী প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া যে প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতা জীবনকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছিল তাহার মধ্যেও কিন্তু বাঙ্গালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনায় বাধা পড়ে নাই। মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে এই আত্মপ্রতিষ্ঠার নিদর্শন রহিয়া গেল পাহাড়পুরের সুবিশাল মন্দির গাত্রে।"[১]

বাংলার মন্দিরগুলি অধ্যাপক সান্যাল-কথিত "**বাঙ্গালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনা**"-র শ্রেষ্ঠ স্মারক—এ কারণেই বাঙালি স্থাপত্যক্ষেত্রেও কোনো ধারাকেই অন্ধভাবে অনুকরণ করেনি, নিজের আত্মা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে গ্রহণ, বর্জন ও স্বীকরণ কারেছে। প্রকৃতপক্ষে পালযুগে, ধর্মপাল ও দেবপালের সময়ে (৭৭০-৮৫০ খ্রি.) বাঙালি প্রায় সমগ্র আর্যাবর্তের রাজনীতিতে অত্যন্ত সক্রিয় ও অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালন করে—এরই ফলে উত্তর-ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালির পরিচয়ও নিবিড়তর হয়। কিন্তু আত্ম-প্রতিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্ববান বাঙালি সেসব গ্রহণ করে সম্পূর্ণ নিজের মত করে।

মনে হয়, এই-ই হল কারণ যার জন্য বর্তমান বাংলাদেশে উৎখনিত বাংলার প্রাচীনতম মন্দির-স্থাপত্যগুলির ভূমি-নক্সা ভারতের কোনো অঞ্চলেরই মন্দির-স্থাপত্যের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না বা বলা উচিত, বিশেষজ্ঞগণ ঐসব ক্ষেত্রের সঙ্গে ভারতের অন্য কোনো সমসাময়িক মন্দির স্থাপত্যের পূর্ণ আকার সাদৃশ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হননি। দিনাজপুর জেলার বৈগ্রাম, বগুড়া জেলার মহাস্থান (প্রাচীন পুণ্ড্রনগর) ও গোকুল বা রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর—সব ক্ষেত্র সম্পর্কেই এ কথা খাটে। পাহাড়পুরের অতি-বিশাল মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে, প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথি-চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ও ব্রহ্মদেশের পাগানের কয়েকটি

১। 'প্রাচীন মন্দির পরিচয়', প্রাগুক্ত 'সমকালীন', পৃ ২৪-২৫।

মন্দিরের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে কোনো কোনো পণ্ডিত ওটি সর্বতোভদ্ররীতির ছিল বলে অনুমান করেছেন। সর্বতোভদ্র বলে কথিত একটি স্থাপত্য আমরা দেখেছি—ইলোরার ৩২ সংখ্যক গুহার সমীপস্থ একটি পাহাড়-কাটা মন্দির, কিন্তু পাহাড়পুরের ভগ্নস্তূপ বা বৌদ্ধ পুঁথিচিত্র বা পাগানের মন্দির—এ তিনের একটিও আমরা দেখিনি।

এবারে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য রীতির মন্দির সম্পর্কে কিছু কথা বলা যায়।

আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে সমতল ছাদের ঘর (বা দালান)-ই ভারতের মন্দিরের আদি ফর্ম—এর উপরকার দ্বিতল কক্ষই ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে শিখরের রূপ নিয়েছিল। কিন্তু এর পরেও সারা ভারতেই শিখররীতির পাশাপাশি দালান-রীতিও থেকে যায়। পশ্চিমবঙ্গেও তাই। তবে পশ্চিমবঙ্গে কোর দেওয়া খড়ো ঘরের আদলে অনেক সময়ে দালানও হতো বক্রচাল—ফর্মটি সুলতানী আমলের কোনো কোনো মসজিদে (যেমন, ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত পাণ্ডুয়ার কুতুবশাহী মসজিদ বা সোনা মসজিদ), এবং এই বইয়ের দ্বিতীয় পর্বের পঞ্জি ১১-য় দেখা যাবে, কিছু মন্দিরেও গৃহীত হয়। প্রথম দিকে প্রথাগত ভারতীয় স্তম্ভ ব্যবহৃত হত, কিন্তু ১৯ শতকে বিভিন্ন ধরনের পাশ্চাত্য স্তম্ভ জনপ্রিয় হয় ও সমগ্র দালানেই পাশ্চাত্য প্রভাব দেখা দেয়। দ্বিতল/ত্রিতল দালান যেমন দেখা দেয়, তেমনই ১৮ শতকের শেষদিক থেকে পাশ্চাত্য প্রভাবিত রাজবাড়ির মত দালান-মন্দির ও নানা মাপের দুর্গাদালান, ঠাকুর দালান প্রভৃতিও দেখা দেয়। অন্যান্য রীতির মন্দিরের মত দালানের ক্ষেত্রেও ত্রিখিলান ফর্মটি বেশি জনপ্রিয় ছিল এবং অন্যান্য রীতির মন্দিরেরই মত দালানেও টেরাকোটা-অলঙ্করণ ব্যবহৃত হত, কিন্তু ১৯ শতক থেকে পঙ্খের অলঙ্করণই বেশি বেশি করে ব্যবহৃত হয়।

সারা ভারতেই একসময় কুটির, পর্ণকুটির, বাঁশ-খড়ের পটমঞ্জরী, চালাঘার প্রভতি মন্দিররূপে ব্যবহৃত হত। আমরা ইতোমধ্যে বোধগয়ার কাছে বরাবর পাহাড়ে বাঁশ-খড়ের দোচালা কুটিরের আদলে মৌর্যযুগীয় গুহা-মন্দির ও পল্লবযুগীয় মামল্লপুরমের দোচালা কুটিরের আদলে ভীমরথ ও চারচালা কুটিরের আদলে দ্রৌপদী রথের উল্লেখ করেছি—এগুলি নিঃসন্দেহেই বাঁশ-খড়ের মন্দিরের স্মৃতি বহন করছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্দিরের প্রকরণ, আদর্শ ও ঐতিহ্য প্রস্তুত হওয়ার পরে এই রীতি পরিত্যক্ত হয়। দক্ষিণ ভারতে মন্দিরগুলি হয়ে ওঠে অত্যুচ্চ সব গোপুরম নিয়ে একের পর এক বিশাল প্রাকার বেষ্টিত শহর এবং শহরের মধ্যে শহর, মণ্ডপের পরে মণ্ডপ ও মণ্ডপের মধ্যে মণ্ডপ—দেবতার উপস্থিতি সেখানে মহামহিম সম্রাটের মতন, সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। অন্যদিকে উত্তর-ভারতীয় বা নাগর শৈলীর শিখর-মন্দিরগুলি মানুষের বাসযোগ্য ভবনই নয়—ক্ষুদ্র, নিরেট, অন্ধকার গর্ভগৃহ যেমন মনুষ্য বাসোপযুক্ত নয় তেমনই অর্ধ-মণ্ডপ, মণ্ডপ প্রভৃতিও বাসোপযোগী গৃহ নয়। 'নাগর' দেউল একান্তভাবেই ভগবানের বাড়ি, মানুষের নয়। ঠিক এই বিন্দুতেই বাংলা ও বাঙালি সবার থেকে আলাদা—ভগবান ও রাজার রাজা ভগবান; বাঙালির প্রিয়জন, একেবারে ঘরের লোক ও পরিবারের অন্যতম, আপনজন। অধ্যাপক হিতেশ্বরঞ্জন সান্যাল এই বিষয়ে একটি হৃদয়স্পর্শী বিবরণী দিয়েছেন :

"হালিশহেরর নন্দগোপাল জিউর সেবায়েৎ ছিলেন এক সহায়সম্বলহীন বিধবা রমণী। কষ্টিপাথরের ঐ মূর্তি ও তাহার মন্দির ইহাই লইয়া ছিল তাঁহার সংসার। একরকম ভিক্ষা করিয়াই তাঁহার সেবা চলিত। একদিন দুপুরে মন্দিরে গিয়া দেখি, বৃদ্ধা তাঁহার বিগ্রহকে স্নান করাইয়া আহারে বসাইয়াছেন। বৃদ্ধা স্নানের বা ভোগের মন্ত্র জানিতেন না কিন্তু তাহাতে তাঁহার সেবার কোন ব্যাঘাত হয় নাই। আহারের পর গোপালকে শয়ন করাইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। আমরা মন্দিরের ছবি তুলিতে আসিয়াছি শুনিয়া তাঁহার গোপালের একটি ছবি তুলিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ছবি তুলিবাব জন্য গোপালকে বাহিরে আনিতে হইবে কিন্তু সে তো ইতিমধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা মন্দিরের ভিতের গিয়া অতি যত্নে আদরের সুরে তাহার ঘুম ভাঙ্গাইতে লাগিল। ঘুম ভাঙ্গিলে মূর্তিকে যখন বাহিরে আনিয়া বসানো হইল তখন তাহার গায়ে রৌদ্র পড়িতেছে। ফোকাস করিতে অসুবিধা হইতেছিল তাই কিছুটা দেরী হইয়া গেল, কিন্তু এই রৌদ্রে তো গোপালের কষ্ট হইবে—বৃদ্ধা তাই তাঁহার অঞ্চল প্রসারিত করিয়া ছায়া করিয়া দাঁড়াইলেন। যথাসময়ে ছবি উঠিল। বৃদ্ধা তখন তাঁহার গোপালকে কোলে তুলিয়া নিয়া বস্ত্রাঞ্চলে রৌদ্রতপ্ত মুখখানি সযত্নে মুছাইয়া দিয়া তাহার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিতে লাগিলেন—"গোপালের আমার কপাল দেখ। গোপাল আমার ভিক্ষে করে খায়! আমি গেলে কপালে আরও কত কি আছে?" এখানে আমি ঘটনাটি শুধু বর্ণনা করিলাম মাত্র। কিন্তু যে অকৃত্রিম আবেগ ও স্নেহে বৃদ্ধা তাঁহার এই চিরশিশু গোপালকে আহার করাইলেন, শয়ন করাইলেন, উঠাইয়া আনিলেন এবং অবশেষে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ মুছাইয়া দিয়া আদর করিতে লাগিলেন তাহার উষ্ণতাটুকু ধরিয়া দেওয়া সম্ভব হইল না। এই নিঃসন্তান বিধবা রমণী তাঁহার নিঃসহায় জীবনের সবটুকু বেদনা ও অবরুদ্ধ মাতৃহৃদয়ের সবটুকু স্নেহ এই পাথরের বিগ্রহের উপর আরোপ করিয়া যেভাবে তাহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা শুধু হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়া লইবার; নিঃসন্তান নিঃসম্বল বলিয়া হয়ত বৃদ্ধার আবেগ আত্যন্তিক হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু যে আন্তরিকতা হইতে ইহার জন্ম তাহার শত শত দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে দেখিয়াছি।"[১]

অধ্যাপক সান্যাল প্রতিবেদনটি লিখেছেন ১৯৬৭-৬৮-তে, আর আমরা ১৯৮০ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত আমাদের নিরন্তর পশ্চিম বাংলার গ্রাম পরিক্রমণে বারবার একই রকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি ও মনে মনে অধ্যাপক সান্যালকে প্রণাম জানিয়েছি। ভগবান বাঙালির কাছে একেবারে ঘরের লোক বলেই বাঙালির সবচেয়ে আদরের মন্দির-স্থাপত্যটিও একেবারে নিজের ঘরের আদলে,

১। 'বাংলার মন্দির', প্রাগুক্ত 'সমকালীন', পৃ. ১৬-১৭।

এই বইয়ের প্রথম পর্বের প্রথম পরিচ্ছেদ, 'চান্দের সমান' (বাংলার খড়ো চালের মাটির ঘর)'-এ বাংলার চালা বা কুটির নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা আছে। দ্বিতীয় পর্বের সূচনায় 'মন্দির-দর্শন সহায়িকা'-তেও চালারীতির বিভিন্ন দিক (দোচালা-জোড়বাংলা-চারচালা-আটচালা-বারোচালা) সম্পর্কে— টিপ্পনী আছে, সেসবের পুনরাবৃত্তিতে পুস্তকের ভারবৃদ্ধি ছাড়া কিছু হবে না। তবু এখানে কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করা যাক : (১) দোচালা বাংলাদেশ রাষ্ট্রে জনপ্রিয় হলেও পশ্চিমবঙ্গে বিরল এবং এখানে এখনও টিকে থাকা দোচালা ও একবাংলা স্থাপত্যগুলির প্রাচীনতম দৃষ্টান্তকটি হল সুলতানী যুগীয় মুসলিম স্থাপত্য পর্ব, পঞ্জি-২ দেখুন)। (২) জোড়বাংলা হল যুগল একবাংলা যার প্রথমটি মুখশালা বা জগমোহন রূপে ও দ্বিতীয়টি গর্ভগৃহ রূপে ব্যবহৃত হয়। এই রীতির মন্দিরেরও সংখ্যা কম। সারনাথের সংগ্রহালয়ে রক্ষিত শুঙ্গ আমলের পাথরের রেলিংয়ের অংশে একটি জোড়বাংলা স্থাপত্যের চিত্র খোদিত আছে।[২] (২) চারচালা নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় অধিকতর জনপ্রিয় হলেও বর্ধমান এবং বীরভূমেও যথেষ্ট। অন্যান্য জেলাতেও কিছু কিছু আছে। (৩) শিবনিবাস, ডাবুক, কিরীটেশ্বরী ও মলুটির কয়েকটি দৃষ্টান্তে চারটি দেওয়ালকে অতি বিপুল উচ্চতা দিয়ে শীর্ষে চারচালা ছাদ দেওয়া হয়েছে— এগুলির উচ্চতা রেখ দেউলের মত কিন্তু আচ্ছাদন চালারাতির—আমরা এগুলিকে শ্রদ্ধেয় সরসীকুমার সরস্বতীকে[২] অনুসরণ করে 'চালাদেউল' বলেছি। (৪) আসামের শিবসাগরের শিবদোল রেখ মন্দিরের সামনে একটি নিখুঁত ও খাঁটি চারচালা মুখশালা আছে—স্থাপত্যটি ১৮ শতকের। (৫) পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে জনপ্রিয় মন্দির স্থাপত্য হল আটচালা। হাওড়া, হুগলী, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায় আটচালা-মন্দির বিপুল সংখ্যায় দেখা যায়. নদীয়া ও বীরভূমেও যথেষ্ট কিন্তু বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় সংখ্যায় খুবই কম। (৫) ক্র্যামরিশ জানিয়েছেন যে পাঞ্জাবের প্রাচীন মুদ্রায় (Audumbara coins) যে মন্দিরচিত্র আছে তা বাংলার মন্দিরের সমগোত্রীয়[৩]—এগুলি আটচালা বা আটচালা সদৃশ মন্দির কিনা তিনি বলেননি, হতেও পারে তাই কেননা বাংলার মন্দির বললে আটচালার কথাই প্রথমে মনে আসে। (৬) আসামের শিবসাগরের জয়সাগরে 'ঘনশ্যামের ঘর' নামে ১৮ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত একটি বৃহৎ ও খাঁটি আটচালা মন্দির আছে—বক্রচাল ও ত্রিখিলান মন্দিরটির সাথে যথাক্রমে হুগলীর বল্লভপুরের রাধাবল্লভেব পুরাতন মন্দির ও উড়িষ্যার হরিপুরগড়ের প্রাচীন আটচালার রূপ ও আকৃতিগত সাদৃশ্য চোখে পড়ার মত। (৭) ত্রিপুরার রাধাকিশোরপুবের ভুবনেশ্বরী

২। Indian Museum Bulletin, January 1970, Article 'Gaudiya Temples and Their Diffusion', Adris Banerjee, p. 117-118

২। বিনয় ঘোষ, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'--৩, প্রকাশ ভবন (২০০১ মুদ্রণ), পরিশিষ্ট-৫, নিবন্ধ 'পশ্চিমবঙ্গের স্থাপত্যকলা'— সরসীকুমার সরস্বতী, পৃ. ৩৩৯

৩। Ibid, p. 140, Foot Note 35

মন্দিরে (১৭/১৮ শতক) বক্রচাল চারচালার উপবে একটি গম্বুজ বসানো হয়েছে, ফলে আটচালার আদল এসেছে—মন্দিরটির 'মুখশালা' বা জগমোহন রূপেও ব্যবহৃত হয়েছে একই রীতির অপেক্ষাকৃত ছোট একটি স্থাপত্য। স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকে এই মন্দিরের প্রেক্ষাপট আছে। (৮) পশ্চিমবঙ্গে আটচালার মূল চরিত্রটি সব সময়ে এক—একটি বৃহত্তর চারচালার উপরে একটি ক্ষুদ্রতর চারচালা। কিন্তু উপবের চারচালা ও নিচের চারচালার আয়তনের অনুপাতে দৃষ্টান্তভেদে নানা পার্থক্য আছে যেমন, তেমনই উচ্চতার অনুপাতেও আছে। আবার সামগ্রিকভাবে আটচালা অতি বৃহৎ থেকে অতি ক্ষুদ্র অজস্র মাপের আছে-- পাঁচখিলান, ত্রিখিলান, এক খিলান সব প্রকারেরই আটচালা আছে। আটচালার আটকোণা অনুকৃতিও হয়েছে, আবার সমতল চালের আটচালাও আছে। রূপভেদ আরও বহুপ্রকার। ফলে 'ডিজাইন' অনুসারে এগুলির শ্রেণিকরণ করতে গেলে বহুশ্রেণি ও উপশ্রেণির জটিল-কুটিল জালে জড়িয়ে পড়তে হয়। তবু এর মধ্যে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর বৃত্তাঞ্চলের ও পুরুলিয়ার গোণপুরের আচটালাগুলির উপরের চারচালাগুলির ছোট ও চাপা রূপ, বীরভূমেব তাবাপীঠ বীবচন্দ্রপুর-লাভপুর আর হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর থানা এলাকার কিছু দৃষ্টান্তে উপরের চারচালাটির অতি শীর্ণ, অতি ক্ষীণ ও অতি ক্ষুদ্র উপস্থিতি বা হুগলী-বর্ধমান-হাওড়া-পশ্চিম মেদিনীপুরে যেগুলি বেশি মেলে, আটচালার সুসম, সামঞ্জস্যপূণ, স্নিগ্ধ, শান্ত রূপটি আলাদা করে চোখে পড়ে। (৯) আটচালার উপরে ছোট আর একটি চারচালা চাপালে হয় বারোচালা— এমন দৃষ্টান্ত পশ্চিমবাংলার কয়েকটি মাত্র আছে। (১০) রত্নরীতির আঙ্গিকগত দিক নিয়ে যেটুকু বলার, সংক্ষেপে হলেও, দ্বিতীয়পর্বের সূচনায় 'মন্দির দর্শন সহাযিকা'তে বলা হয়েছে। এখানে আরও একবার স্মরণ করা দরকার যে 'রত্ন' একই সাথে দুটি মহান উদ্দেশ্য পূরণ করে : (ক) বাংলা চালার (কিছু ক্ষেত্রে সমতল ছাদ-সম্পন্ন দালানের) উপরে উত্তর ভারতীয় নাগর-শৈলীর রেখ দেউলকে রত্ন-রূপে বসিয়ে বাংলার চালা-মন্দিরকে সর্বভারতীয় মন্দির-স্থাপত্যান্দোলনেব সঙ্গে যুক্ত করা হল এবং বাংলার মন্দিরও রেখ-দেউলের অতি প্রগাঢ় ও অতি সুগভীর অর্থ এবং তাৎপর্য লাভ করল। প্রাচীন কাল থেকেই ভারতে ত্রৈকুটক, পঞ্চায়তন প্রভৃতি রীতির মন্দির প্রচলিত ছিল, 'পঞ্চরত্ন' 'নবরত্ন' প্রভৃতি যেন তাদের বঙ্গীয় সংস্করণ। (খ) ছাদের কোণে কোণে, চারপাশে বা স্থাপত্যের বিভিন্ন স্তরে 'ছত্রী' বা 'গম্বুজ' বা 'মিনার' বসানো নিঃসন্দেহে মুসলিম রীতি—চার-চালার ছাদের মাঝে একটি 'রত্ন' বসিয়ে 'একরত্ন' ও এরপরে চারকোণে আরও চারটি তুলনায় ছোট রত্ন বসিয়ে 'পঞ্চরত্ন' বা একটি আটচালার নীচের চারচালার চারকোণে চারটি রত্ন বসিয়ে উপরের চারচালাটিরও চারকোণে চারটি ও মাঝে একটি বৃহত্তর 'রত্ন' বসিয়ে 'নবরত্ন' প্রভৃতি নির্মাণের ধারণাটি নিঃসন্দেহে ইসলামি স্থাপত্য থেকে এসেছে তা না হলে ইসলাম-পূর্ব ভারতের পঞ্চায়তন প্রভৃতির মাঝে নিঃসন্দেহে

রত্নরীতির মন্দিরও দেখা যেত। রত্নরীতি হিন্দু মুসলিম সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ ধারকগুলির অন্যতম। হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় ও একই সাথে সর্বভারতীয় ধারার সাথে যোগসাধন ঘটানো রত্নরীতি বাঙালি মণীষার অনুপম কীর্তি। ক্রমে একই কৌশলে রত্নসংখ্যা বাড়িয়ে একাদশ, ত্রয়োদশ, সপ্তদশ ও পঞ্চবিংশতি রত্নের মন্দিরও দেখা দিল, কিন্তু মূল তাৎপর্য ও অর্থ বদলালো না। সমতল চালের রত্নমন্দিরগুলি একতালা দোতালা প্রভৃতি দালানের রত্নযুক্ত সংস্করণ। (১১) এছাড়া, গিরিগোবর্ধন, ('সহায়িকা' দেখুন), মুসলিম গম্বুজ, ব্যতিক্রমী, মিশ্র প্রভৃতি সমস্ত ধারার মন্দিরই দ্বিতীয় পর্বে পঞ্জিকৃত হয়েছে। (১২) উত্তর-বঙ্গের মন্দিরগুলি পৃথক বিবেচনার দাবি রাখে বলে দ্বিতীয় পর্বে এ-বিষয়ে পৃথক পরিচ্ছেদ যুক্ত হয়েছে। (১৩) দুই থেকে একশত নয় পর্যন্ত গুচ্ছ-মন্দিরগুলি মুক্তাঙ্গন-রীতির সুপ্রাচীন ও সর্বভারতীয় ধারার সাথে যুক্ত, অথচ এদিকে তেমন দৃষ্টি পড়ে না—দ্বিতীয় পর্বে এই অভাব-মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। (১৪) জগমোহন, রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ (এই তিনের পরিচয় 'সহায়িকা'য় দেখুন) ইত্যাদি সকল প্রকার আনুষঙ্গিক স্থাপত্যও সমুচিত মর্যাদা সহকারে দ্বিতীয় পর্বে পঞ্জিকৃত হয়েছে, তাতেই তাদের পরিচয় মিলবে।

১০
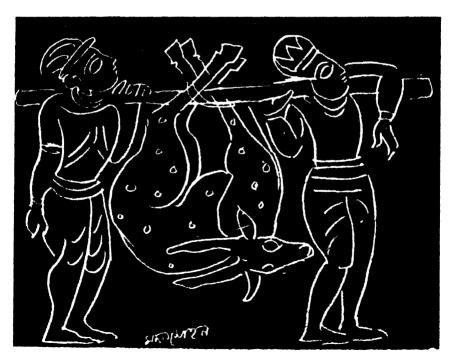
পশ্চিমবঙ্গের মন্দির অলঙ্করণ শিল্প
(একটি সূত্রাত্মক আলোচনা)

> ''মুখখানির দিকে চাহিয়া আমরা অন্তরে উদ্বেলিত হইয়া উঠি; যদি কখনও নির্ভয়ে কথা বলিবার সুযোগ লাভ করি তাহা হইলে, ডাগর সাহসে বলিব বেদান্ত এই সৌন্দর্য্যকে বিদ্রুপ করিতে পারে না। কেননা দীর্ঘ আয়ত চক্ষুদ্বয়, কেননা অধরে স্মিত হাস্যরেখা এবং পদ্মপত্রস্থিত জলকণার লাবণ্য এখানে বেপথুমান। এ মুখ স্মরণে অসংখ্য গীতিকাব্য সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে বিষয় ত্যাগ সন্ন্যাস লইয়াছে। বহুর হৃদয়ে এ মুখখানি গভীরতার অন্য নাম।''
>
> —কমলকুমার মজুমদার।*

'অলঙ্করণ শিল্প' এই বইয়ের বিষয়-পরিধির অন্তর্ভুক্ত নয়, অপিচ তা মন্দিরানুষঙ্গ, অতএব সূত্রাকারে কিছু বলার চেষ্টা করা গেল।

দুটি কথা প্রথমে . (ক) বাংলা মন্দির অলঙ্করণ শিল্প সর্বভারতীয় মন্দির অলঙ্করণকলার অংশ—এর নন্দনতত্ত্ব সর্বভারতীয় মেধা, মনন, দর্শন ও শিল্পধাবার সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত। এই বইয়ের প্রাকপঠনরূপে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উপস্থাপিত সন্দর্ভটিতে ভারতের মন্দির অলঙ্করণ কলার বিভিন্ন দিক বিষয়ে মহান শিল্পবেত্তা স্টেলা ক্র্যামরিশের যে পর্যবেক্ষণ আছে, তার অতিরিক্ত কিছু আমাদের বলার নেই—এখানে আমাদের যা কিছু কথা তা ঐ সন্দর্ভটির সাপেক্ষে, আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল ক্র্যামরিশ কথিত বিষয়গুলি মাথায় রেখে দর্শন করলে রসবোধ হয়। (খ) বাংলা মন্দির অলঙ্করণ শিল্প সম্পূর্ণ ও ব্যাপক গবেষণা দাবী করে—সংগ্রহালয় নির্ভর, আর্কাইভে রক্ষিত আলোকচিত্র নির্ভর বা গ্রন্থালয় নির্ভর গবেষণা এক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ তো বটেই, ভ্রান্তিমূলক হতেও বাধ্য, প্রতিটি মন্দিরগাত্র সরেজমিনে তন্নিষ্ঠভাবে দেখার পরে সেগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে ফলকগুলির ডিজাইন ও বিষয়ক্রমের বিবর্তনের ধারাগুলিকে লক্ষ্য করার প্রভূত শ্রমসাধ্য কাজটি করা, এরপরে পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গতি, কৃষ্টি ও শিল্পরুচি তথা শিল্পীদের ঐতিহ্য, শিল্প-শিক্ষা, সঙ্গতি, উত্তরাধিকার প্রভৃতি একদিকে ও অন্যদিকে শুধু রামায়ণ-মহাভারত-পৌরাণিক গল্পকাহিনী-পাঁচালি-মঙ্গলকাব্য-শিবায়ন-বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলীই নয়, আঞ্চলিক ইতিহাস এবং আঞ্চলিক সংস্কৃতির ধারাটিকেও লক্ষ্য করা—মোটামুটিভাবে এই হল যেটুকু না করলেই নয়, সেইটুকু। বলা বাহুল্য, এখানে এই অত্যল্প পরিসরে তেমন কোনও চেষ্টা করার কথা ভাবাও বাতুলতা।

এখানে আরও চারটি ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হয়। প্রথমত, এমন একদল আছেন যাঁরা টেরাকোটা বা অন্য ধরনের অলঙ্করণ-শিল্প সম্পর্কে ব্যাকুল আবেগে বিহ্বল হন কিন্তু মন্দির সম্পর্কে নিস্পৃহ। টম পেইনকে অনুকরণ করে বলা যায়—এঁরা পাখির পালকের সৌন্দর্যের

* 'বঙ্গীয় শিল্পধারা ও অন্যান্য প্রবন্ধ', দীপায়ন, ১৪০৫, অধ্যায় 'বাঙলার টেরাকোটা', পৃ. ৫৫।

জন্য বিলাপ করেন কিন্তু মুমূর্ষু পাখিটিকে ভুলে যান। একথাও আমাদের বুঝতে হয় যে মন্দিরের জন্য টেরাকোটা হয়, টেরাকোটার জন্য মন্দির হয় না। অন্য অলঙ্করণের ক্ষেত্রেও একই কথা। দ্বিতীয়ত, যতই যা হোক দেওয়ালে থাকলে তবেই অলঙ্করণ ফলকগুলির মহত্ত্ব, গুরুত্ব ও নান্দনিক সৌন্দর্য্য বজায় থাকে। দেওয়াল থেকে খসে পড়া বা ছাড়িয়ে আনা বা উৎখনন করে আনা ও সংগ্রহালয়ে রক্ষিত ফলকগুলি বরফ দেওয়া মাছের মত; মাছ, তবে মৃত। জীবন্ত মাছের সৌন্দর্য্য যেমন জলে, টেরাকোটা বা অন্য ফলকের সৌন্দর্য তেমনই মন্দিরগাত্রে। তৃতীয়ত, অনেকে বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নিয়ে মন্দিরগাত্রের ফলক দেখেন, যেমন সমাজচেতনামূলক ফলক, এবং যখন তারা এগুলি পান না, কিম্বা প্রত্যাশার তুলনায় অনেক কম পান, তখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন যে ব্যাপারটি একেবারেই মধ্যযুগীয় এবং 'ধর্ম-নিরপেক্ষ' আধুনিক মানুষের ওসব নিয়ে ভাবাই অর্থহীন। রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত উক্তির অনুকরণে বলা যায়, এ হল ধানের খেতে বেগুন খোঁজা ও না পেয়ে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য না করা। মন্দিরগাত্রে যা আছে, তা দিয়েই বিষয়টি দেখতে হবে এবং বলা বাহুল্য, সংখ্যায় অন্যান্য ফলকের তুলনায় অত্যন্ত কম হলেও, 'সামাজিক' ফলকও আছে, কিন্তু ভোলা চলে না যে, ওগুলি আছে মর্ত্যলোক বা 'সংসার'-এর উপস্থাপনরূপে, আধুনিক সমাজতেনামূলক দৃষ্টিতে নয়। চতুর্থত, যা সারা ভারতের মন্দির-ভাস্কর্য সম্পর্কেই সত্য, প্রকৃতি ও প্রখর সূর্যালোকের সাহচর্যেই মন্দির-ভাস্কর্য সবচেয়ে বেশি খোলে। একদিকে অনুপম বঙ্গপ্রকৃতি ও অন্যদিকে ভাস্কর্যগুলির উঁচু জায়গাগুলিতে বিচ্ছুরিত অত্যুজ্জ্বল রৌদ্র ও নিচু জায়গাগুলির গভীর কালোছায়ার গহন নাটকীয়তা যে মহত্ত্বের জন্ম দেয় তা অন্য কোথায়ও পাবার নয়।

আমরা পশ্চিম বাঙলার মন্দিরগাত্রে এখনও বর্তমান আছে এমন কিছু দৃষ্টান্ত নিতান্ত নমুনারূপে উল্লেখ করব। কিন্তু দৃষ্টান্তগুলি আদৌ তেমন পুরাতন নয়—মধ্যযুগের শেষ দিক থেকে আধুনিক যুগের শুরুর দিক হল সেগুলির সময়কাল। কিন্তু যে ঐতিহ্যটি ঐ দৃষ্টান্তগুলি বহন করছে, তা অত্যন্ত প্রাচীন। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে স্টেলা ক্র্যামরিশ রীতি-প্রকরণ বিচারে টেরাকোটা মূর্তি শিল্পকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছিলেন—'সময়-বিমুক্ত' ('ageless') এবং 'সময়-নিবদ্ধ' ('timed variation')। সময়-বিমুক্ত মূর্তি-ভাস্কর্য হল আদি ও সরলতম রূপ যা যে কোনো কালের শিল্পীদের হাতেই হতে পারে, ভারতে খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০-এর মেহেরগড় থেকেই এর যথেষ্ট দৃষ্টান্ত মেলে। 'সময়-নিবদ্ধ' মূর্তিকলা হল শিল্পীর সচেতন মন ও শিক্ষিত হাতের প্রয়োগে সমুন্নত ও পরিমার্জিত কলা এবং তাতে অনিবার্যভাবে শিল্পীর সময়কালের ছাপ পড়ে, কালভেদে প্রকাশভঙ্গির বদল হলে মূর্তিকলার ধারারও বদল ঘটে—এই ধারাগুলিকে চিহ্নিত করেই মূর্তিগুলিকে মৌর্য-যুগীয়, শুঙ্গ-যুগীয়, গুপ্ত-যুগীয়, পালযুগীয় ইত্যাদি বলে চেনা যায়। সাধারণভাবে বললে, মৌর্য-যুগ থেকেই সমুন্নত টেরাকোটা দেখা দেয়, পশ্চিম বাঙলার চন্দ্রকেতুগড়ে (বেড়াচাঁপা, উত্তর ২৪ পরগনা) এই সময়কাল বা তারও কিছু পূর্ববর্তীকালের নিদর্শন মিলেছে। এর পরে শুঙ্গ ও গুপ্তযুগে ধারাটি আরও উন্নত হয়। স্বাভাবিকভাবেই ইট-নির্মিত মন্দিরের অলঙ্করণে টেরাকোটা ভাস্কর্য শিল্প ব্যবহৃত হল—এর

নজীর মেলে খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শ্রাবস্তীতে এবং এই বইয়ে পূর্বোল্লেখিত ভিতরগাঁওয়ের মন্দিরগাত্রে। ভিতরগাঁওয়ের টেরাকোটায় তিন প্রকার মূর্তি শিল্প রয়েছে : গণেশ, আদি বরাহ, মহিষাসুর-মর্দিনী, নদী-মাতৃকা প্রমুখ দেবদেবী মূর্তি; সীতাহরণ, নর-নারায়ণ প্রমুখ আখ্যানমূলক মূর্তি এবং মানুষ-পশু-ফুললতাপাতা প্রভৃতি পার্থিব চিত্র বা 'সংসার।' সপ্তম-অষ্টম শতকীয় মধ্যভারতে এ-জাতীয় আরও কয়েকটি দৃষ্টান্তের কথা শোনা যায়। উড়িষ্যাব বানিপুর-ঝড়িয়ালের ইট-নির্মিত তথা টেরাকোটা-সজ্জিত সুউচ্চ দেউলটির কথা এই বইয়ে পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

দুই বাঙলার মধ্যে মন্দিরের যেটি প্রাচীনতম নিদর্শন. সেই বেড়াচাঁপার দেবালয়ের মন্দিরটিতে টেরাকোটা অলঙ্করণ ছিল কিনা বা থাকলে কিরকম ছিল জানা নেই। তবে বিশেষজ্ঞদের বিবরণী হতে জানা যায় যে বাংলাদেশের মহাস্থানের নিকটবর্তী সরলপুর পলাশবাড়ি হতে খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের লিপিযুক্ত টেরাকোটায় রামায়ণেব লৌকিক মেজাজযুক্ত প্যানেল পাওয়া গেছে।[২]। বাংলাদেশেরই পাহাড়পুরের অষ্টম-শতকীয় মহাবিহারের কথা সকলেই জানেন— তবুও নিম্নোদ্ধৃত বিবরণীটি স্মরণে রাখা মনে হয় সুবিধাজনক :

> ''পাহাড়পুরের মহাবিহারের পাদমূলে চারিদিকে প্রস্তর গাত্রে উৎকীর্ণ যে ৬৩টি মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সত্যই অপূর্ব্ব; পূর্ব্বভারতে ইহাব তুলনা মিলে না; .....(প্রদক্ষিণ) পথের চারিধারে নক্সা করা টালিতে (plaques) মানুষ, নানারকম জীবজন্তুর ছবি এবং 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশে' বর্ণিত গল্প চিত্রিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে 'বানর-কীলক-কথা' ও 'সিংহ-শশক কথা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।...... পাহাড়পুর মন্দিরের ভিত্তি খুঁড়িবার সময় বহু পাথরের হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি বাহির হইয়াছে; তন্মধ্যে 'গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ', শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক 'ধেনুকাসুর' ও 'চানুর মুষ্টিক বধ' প্রভৃতি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক মূর্তি সত্যই চিত্তাকর্ষক। তদ্ভিন্ন রামায়ণে বর্ণিত 'বালীবধ', বালী-সুগ্রীব সংগ্রাম, মহাভারতে বর্ণিত 'সুভদ্রা হরণ' ও 'মহাদেবের হলাহল পান', বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির চিত্র মন্দিরের প্রাচীর ও পাদমূলে শোভা পাইতেছে। এই স্থানে বিহারাগাত্রে রাধাকৃষ্ণের যে অনুপম মূর্তিটি পাওয়া গিয়াছে উহাই প্রাচীনতম যুগলমূর্তি বলিয়া বিবেচিত হয।..... এখানকার মন্দির-গাত্রে দগ্ধ মৃত্তিকা নির্ম্মিত (terracotta) যে সমুদয় জীবজন্তুর মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায় যেমন— মৎস্য, শুশুক, কুম্ভীর, বিবিধ সরীসৃপ, শঙ্খ, ঝিনুক প্রভৃতি তাহাদের প্রায় সমস্তই বাংলা দেশের এবং বাঙালির চির পরিচিত।''[৩]

২। গৌতম সেনগুপ্ত, 'সম্প্রতি আবিষ্কৃত একটি বৌদ্ধবিহার ও তার মৃৎভাস্কর্য'। চারুকলা-২, ১৪০৭, পৃ ৫৯।

৩। 'বাংলায় ভ্রমণ', প্রথম খণ্ড, 'পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত, ১৯৪০, পৃ. ১৩৩-৩৬।

উপরে উদ্ধৃত বিবরণীতে মন্দির অলঙ্করণ-শিল্পের যে বিষয়সূচি আছে শতাব্দীর পর শতাব্দী মন্দিরের পর মন্দিরে সারা বাঙলায় তা অক্ষুণ্ণ থেকেছে—অর্থাৎ রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলাই সেখানে প্রধান উপজীব্য, কখনও কখনও শিব-কাহিনী, অন্যান্য দেব-দেবী ও মহাভারতের কাহিনীও এসেছে এবং নশ্বর সংসারের প্রতীকরূপে এসেছে মানুষ, পশুপাখি, ফুল লতাপাতা প্রভৃতি।

নবম-দশম শতকীয় 'নন্দদীর্ঘি বিহারে' (জগজীবনপুর, মালদহ) প্রাপ্ত টেরাকোটা-ফলকগুলি সম্পর্কে অন্যতম বিশেষজ্ঞ গৌতম সেনগুপ্তের বিবরণীর প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ এই প্রকার :

> "পশু আর পাখি, পুরুষ এবং নারী, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী, ধর্মীয় প্রতীক, আলঙ্কারিক মোটিফ—সব মিলিয়ে এক সমৃদ্ধ শিল্প প্রদর্শনী। জগজীবনপুর ফলকে দেখা যাবে নানা ভঙ্গিমায় সিংহ, হাতি, শৃঙ্গযুক্ত এবং শৃঙ্গহীন হরিণ, গরু, নীলগাই, মহিষ, হংস, ময়ূর. বানর এইসব পশু-পাখিদের। এদের মধ্যে আবার সিংহ এবং বানরের নিশ্চিত প্রাধান্য। দেবদেবীরা সংখ্যায় অল্প শিব, সূর্য, বোধিসত্ত্ব, মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর—এই কটি দৈবীরূপ চিত্রিত হয়েছে কয়েকটি ফলকে। দেবলোকের নিম্নস্তরের বাসিন্দা কিন্নর, সুপর্ণ, বিদ্যাধরদেরও খুঁজে পাওয়া যাবে। আছে প্রতিকৃতি ধর্মী মনুষ্যমূর্তি এবং এক বিশিষ্ট ধর্মীয় প্রতীক গ্রন্থপূজার অনবদ্য রূপায়ণ।
>
> জগজীবনপুরে পাওয়া ফলকগুলি যথার্থই ভাস্কর্যধর্মী, নরম মাটিতে গড়া হয়েছে সংবেদনশীল রূপ। এরা অমিত প্রাণশক্তির অধিকারী, প্রায় প্রতিটি ফলকের বিষয়বস্তুর মৌন লক্ষ্মণ গতিময়তা।..... জগজীবনপুরের শিল্পীদের অন্যতম প্রিয় বিষয় যোদ্ধা। যোদ্ধার হাতে কখনও কৃপাণ, কখনও ধনু, কখনও দণ্ড, কখনও ঢাল। এদের গড়ন বলদৃপ্ত—শরীরের অনাবৃত উর্ধাঙ্গ, নিম্নাঙ্গের স্বল্প আবরণ, পরনে দু-একটি ভারী অলংকার—সবই শক্তিমান রূপকে আরও অভিব্যক্তিময় করে তুলেছে। যোদ্ধাদের দেখানো হয়েছে ঈষৎ তির্যক রেখার বিন্যাসে। যেন ফলকের এক কোণ থেকে অন্য কোণের দিকে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন।"[৪]

অত্যন্ত সহজবোধ্য কারণেই পাহাড়পুর ও জগজীবনপুরের বিবরণীর জন্য বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভর না করে আমাদের উপায় নেই, কিন্তু একথা বুঝতেও মনে হয় অসুবিধা নেই যে, এই দুই ক্ষেত্র মিলেই রচিত হয়ে গিয়েছিল বাঙলার মন্দির-অলঙ্করণ শিল্পের যথার্থ প্রকরণ। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে পাহাড়পুরেই একরকম স্থির হয়ে গিয়েছিল মন্দির-টেরাকোটার বিষয়সূচি, পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সপরিবারে দুর্গা-মহিষাসুরমর্দিনী, কমলেকামিনী প্রভৃতি কিছু দেবীমূর্তি, ইউরোপীয় পুরুষ ও মহিলা ও ১৮/১৯ শতকীয় কিছু সামাজ চিত্র—এর মধ্যে আবার মহিষাসুরমর্দিনী অতি প্রাচীন ও সর্বভারতীয়। অন্যদিকে জগজীবনপুরের ফলকগুলির

৪। প্রাগুক্ত 'চারুকলা' ও প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃ.৫৯-৬১

প্রাণবন্ত গতিধর্ম ১৮ শতক পর্যন্ত বাঙলার মন্দির টেরাকোটার একান্ত বৈশিষ্ট্য ছিল—১৯ শতকে যখন তা প্রাণময় গতিধর্ম হারিয়ে যান্ত্রিক ও নিষ্প্রাণ পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হল তখনই এই অপরূপ কলারও অবসান সূচিত হল।

বাংলার মন্দির-টেরাকোটা বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি তা মুখ্যত অন্ত্য-মধ্যযুগের ব্যাপার, কিন্তু নবম-দশম শতক থেকে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের মাঝে বেশ কয়েক শতাব্দী রয়ে গেছে, এ সময়ে মন্দিরকলা একেবারে যে রুদ্ধ ছিল না তা আমরা দেখেছি, সুতরাং অলংকরণ কলার ঐতিহ্যটিও কখনোই মরে যায়নি। কিন্তু এই সময়কালের সবচেয়ে কঠিন সময়ে অর্থাৎ সুলতানি শাসনের প্রথম তিনটি শতকে (১৩-১৬ শতক) নির্মিত মসজিদগুলিতে টেরাকোটা অলঙ্করণের চমৎকার প্রয়োগ শিল্পটির পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হয। পশ্চিম বাঙলার কয়েকটি জেলায় এমন ১০/১২টি মসজিদ এখনো মোটামুটি টিকে আছে, আমরা স্থানাভাবে সেগুলির মধ্যে মাত্র তিনটির উল্লেখ মাত্র করব। মালদহের পাণ্ডুয়ার অতি বিশাল আদিনা মসজিদের (১৪ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ) বিশেষত পশ্চিমদিকের টিম্পানাম (ভবন-শীর্ষের ত্রিকোণাকার অংশ)-গুলির টেরাকোটা নকাশী অলঙ্করণ আজও বিস্ময় উদ্রেক করে, এছাড়া আছে শিকলে ঝুলন্ত প্রদীপ, পদ্ম, পদ্মকোরক, লতাগুচ্ছ, নানা জ্যামিতিক নক্সা প্রভৃতি টেরাকোটা সজ্জা। মুর্শিদাবাদ জেলাব সাগরদীঘি থানাব খেরুর গ্রামের মসজিদটি (১৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দ) প্রার্থনাকক্ষের উত্তর ও দক্ষিণের দেওয়ালগুলিতে, ভগ্ন মিনারে ও মসজিদের দেওয়ালের বহির্গাত্রে টেবাকোটা ফুল-লতাপাতায় অসাধারণ অলঙ্করণ সমৃদ্ধ। বীরভূমেব রাজনগরের জীর্ণ ও পরিত্যক্ত 'মতিচূড়া' মসজিদেব (ষোড়শ শতক) ভিতবের দেওয়াল গাত্রের অপরূপ টেরাকোটা অলঙ্করণ হতে চোখ ফেরানো যায় না। আগেই বলা হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত আরও আছে এবং তা ১৭ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত। —পশ্চিম দিনাজপুরের বিন্দোল গ্রামের ষোড়শ শতকীয় ভৈরবী মন্দিরের ফুল-লতা-পাতা ও নকাশি টেরাকোটা উপবে বলা মসজিদ টেরাকোটার সাথে পুরোপুরি মেলে, কিন্তু প্রভাব আছে ১৯ শতকের শেষকাল পর্যন্ত পশ্চিম বাঙলার প্রায সর্বত্র।

অতএব খ্রিষ্টপূর্ব কালের চন্দ্রকেতুগড় থেকে ১৯ শতকেব শেষকাল পর্যন্ত টেরাকোটা-অলঙ্করণ শিল্প একটি নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরা। ১৯ শতক জুড়ে এই পবম্পরা প্রাণশক্তি হারায়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় মুর্শিদাবাদ জেলাব গোকর্ণে ষোড়শ শতকের শেষে প্রতিষ্ঠিত নরসিংহ মন্দিরে. জজানের সপ্তদশ শতকীয় দেউলে বা উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ-শাখার গোবরডাঙার সমীপবর্তী ইছাপুরের সপ্তদশ শতকীয় ভগ্ন মন্দিরের দেওয়ালগাত্রের (অতি-সম্প্রতি মাটি সরিয়ে উন্মুক্ত) টেরাকোটা অলঙ্করণে শিল্পীদের প্রখর ব্যক্তিত্ব ও কল্পনার ছাপ আছে—সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধের গোড়ায় নির্মিত মুর্শিদাবাদের ভট্টবাটির পঞ্চরত্নে তা অক্ষুণ্ণ আছে, এর সামান্য পরবর্তী ও ঐ জেলারই, বড়নগরের চারবাংলা মন্দিব সম্পর্কেও একথা খাটে। ১৯ শতকের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি সম্পর্কেও কিন্তু একথা বলা যাবে না, যেমন বাঁকুড়ার সোনামুখীর পঁচিশরত্ন (১৮৬৫) বা গিরিগোবর্ধন (১৮৩৫)-এ আয়োজন বিপুল কিন্তু প্রয়োগ কল্পনাশক্তি-রহিত, আনুষ্ঠানিক ও পুনরাবৃত্তিমূলক। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের শ্রেষ্ঠ মন্দিরগুলি ১৬৪৩ থেকে ১৭৫৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত, অর্থাৎ টেবাকোটার অবক্ষয় শুরু হওয়ার আগেই সেখানে

মন্দির নির্মাণের প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে—১৬৪৩-এ শ্যামরায়ের মন্দিরে টেরাকোটার মহানুভব সূক্ষ্ম শিল্পের প্রক্রিয়া শুরু হল, ১৬৫৫-য় জোড়বাংলার মন্দিরে তা পূর্ণতার কাছাকাছি পৌঁছল, শেষে ১৬৯৪-এ মদনমোহন মন্দিরগাত্রে তা মহৎ শিল্পের রসোল্লাসে পরিণত হল; শ্যাম রায় ও জোড় বাংলা মন্দির-টেরাকোটা যদি হয় বিদ্যাপতির পদের বিদগ্ধ মণ্ডনকলা, তবে মদনমোহন মন্দির-টেরাকোটা পদাবলীর চণ্ডীদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ পদগুলির 'অতল জলের আহ্বান'—এমন শিল্প-সুষমা দেখেই আমরা অনুভব করতে পারি মহান শিল্পবেত্তা কমলকুমার মজুমদারের উচ্চারণের মানে :

> "এ ঘোর যামিনী মেঘের ঘটা কেমনে আইলে বাটে' এই পদ আবৃত্তি করিতে করিতে কতবারই না আমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছি। অলৌকিক মায়া আমাদের আচ্ছন্ন করিয়াছে। ছায়ানীল এবং সৌরলোক পড়শী হইয়াছে। আর যে নিশ্বাস সুদীর্ঘ রেখায় রূপান্তরিত। অথবা 'যেন কান্দিয়া আঁধার গগন চাঁদের স্মরণ লইল আসি' পদটির মধ্যে যে বর্ণ উচ্ছসিত, যে মাধুর্য বিপুল সেই অনুভব লাভ করি। আমরা যেমন বা প্রতীক হইয়া যাই।"[৫]

কমলকুমার উপরে উদ্ধৃত কথাগুলি লিখেছেন বিষ্ণুপুর, গুপ্তিপাড়া, সোনাতোড়পাড়া (সিউড়ি), কালনা প্রভৃতি অঞ্চলের মন্দিব-টেরাকোটায় রাধিকা-মূর্তি দেখে এবং এতেই বোঝা যায় সশ্লিষ্ট শিল্পীদের প্রতিভা ও অনুভব শক্তি। লক্ষণীয়, কমলকুমার-উল্লেখিত সবকটি মন্দিরই অষ্টাদশ শতক বা তার আগে তৈরী—এই সময়কালের মধ্যে প্রস্তুত মন্দির-টেরাকোটার অন্যান্য প্যানেলগুলিও অধিকারী রসিকজনচিত্তে অনুরূপ মাধুর্যের অনুরণন তোলে, এমনকি রাম-রাবণের যুদ্ধের আপাত হিংসক দৃশ্যগুলির অত্যাশ্চর্য মাধুর্য তাঁকে শান্তি দেয়। এই মাধুর্য ও শান্তি বাংলার, শুধু টেরাকোটা নয়, তাবৎ মন্দির-অলংকরণ কলার পরম ধন এবং এই বৈশিষ্ট্যটিই ভারতের মন্দির-ভাস্কর্য্যের কল্পনাতীত ঐশ্বর্যের মধ্যেও বাংলার ভাস্কর্যকলাকে অমেয় গৌরব দান করেছে।

বাংলাব (বা যে-কোনো অঞ্চলের) মন্দির অলংকরণ কলার গভীরগামী আলোচনার আগে দরকার মাধ্যম ও বিষয় অনুসারে ফলকগুলির কালানুক্রমিক পঞ্জিকরণ ও তারপরে লক্ষ্য করা দরকার প্রকরণ ও স্টাইলের বিবর্তনের ধারাটি—এই কাজ দুঃসাধ্য তবে মনে হয় অসাধ্য নয়। কিন্তু আমরা শুরুতেই যেমন বলেছি, অলঙ্করণ শিল্প এই বইয়ের বিষয় পরিকল্পনাতেই নেই এবং এখানে তার অবকাশও নেই। এখানে আমরা কেবল বিষয় অনুসারে কটি দৃষ্টান্ত উল্লেখমাত্র করব যদিও জানি যে এই পদ্ধতিতে বিষয়টির প্রতি মর্যাদাদান আদৌ সম্ভব নয় :

(ক) টেরাকোটা : (i) রামায়ণ : মন্দির ভাস্কর্যে রামকথার প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত মেলে মধ্যপ্রদেশের দেওগড়ের ষষ্ঠ শতকীয় দশাবতার মন্দিরে। বাংলাদেশের পলাশ-বাড়িতে প্রায় সমসাময়িক কালের রামায়ণ-ফলক মিলেছে, কিন্তু লৌকিক মেজাজে—এটিই বাঙালি মেজাজ। একারণেই এখানে পরে আকর হয়েছেন কৃত্তিবাস, বাল্মীকি নন। যাইহোক জর্জ মিচেল যথার্থভাবে উল্লেখ করেছেন যে, রামায়নের গোড়ার দিকের কাহিনীগুলির রূপায়ণ আছে ১৮ শতকীয়

৫। প্রাগুক্ত 'বঙ্গীয় শিল্পধারা' পৃ. ৫৫

মন্দিরগুলিতে[৬]। দশরথের পুত্রার্থে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির যজ্ঞ (বড়নগর 'চারবাংলা' উত্তর, বাঁশবেড়িয়া 'বাসুদেব', গুপ্তিপাড়া 'রামচন্দ্র'); দশরথের রানিদের পুত্রলাভ (বড়নগর 'জোড়বাংলা' দশঘড়া 'গোপীনাথ', ভট্টমাটি 'রত্নেশ্বর শিব'); তাড়কা রাক্ষসী বধ (বড়নগর 'জোড়বাংলা'); অহল্যার শাপমোচন (বড়নগর 'জোড়বাংলা'); হরধনুভঙ্গ (গুপ্তিপাড়া 'রামচন্দ্র' রামগড় 'কালাচাঁদ' মন্দির); সীতা-বিবাহ (গুপ্তিপাড়া 'রামচন্দ্র'); নবোঢ়া সীতাসহ রামচন্দ্রের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনকালে পরশুরাম কর্তৃক প্রতিস্পর্ধা-জ্ঞাপন (বড়নগর 'জোড়বাংলা'); বনে বাস/ভ্রমণরত রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ (বিষ্ণুপুর 'মদনমোহন', বড়নগর 'চারবাংলা' উত্তর, পশ্চিম মেদিনীপুরের রাজনগর, শিব—প্রভৃতি); শূর্পনখার নাসিকা ছেদন (গুপ্তিপাড়া 'রামচন্দ্র', বড়নগর 'জোড়বাংলা, আলঙ্গিরি 'রঘুনাথ', গৌরা 'লক্ষ্মী জনার্দন'—প্রভৃতি); মারীচ বধ (বড়নগর 'চারবাংলা' পশ্চিম, মেল্লক 'মদনগোপাল', রাধাকান্তপুর 'গোপীনাথ—প্রভৃতি), রাবণের সাধুবেশে আগমন ও সীতাহরণ (পারুল 'বিশালাক্ষী', কঁয়তা 'রঘুনাথ'—প্রভৃতি); জটায়ু কর্তৃক রাবণকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা—যেন ঠোঁট মেলে রাবণ-সহ রথটি গিলে ফেলাব চেষ্টা করছেন (বড়নগর 'চারবাংলা' উত্তর, আলঙ্গিরি 'রঘুনাথ', কেন্দুলি 'রাধাবিনোদ', দাসপুর 'লক্ষ্মী-জনার্দন'—প্রভৃতি); লঙ্কায় বন্দিনী সীতা (সুরুল 'পঞ্চরত্ন', অমরাগড়ি 'দামোদব', ঝিখিবা 'দামোদর'—প্রভৃতি); হনুমান ও বানর বাহিনীর বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ টেরাকোটা শিল্পীদের অত্যন্ত প্রিয় বিষয় ও শত শত মন্দিরগাত্রে তা বিপুল বৈচিত্র নিয়ে ছাড়িয়ে আছে, তবু অশোকবনে চেরি-পবিবৃতা সীতার সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাৎ (যেমন দশঘরা 'গোপীনাথ'), সেতুবন্ধন (যেমন হালিশহর 'নন্দকিশোর') প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য; আর একটি জনপ্রিয় হল কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ (বালিদেওয়ানগঞ্জ 'চণ্ডী'—প্রভৃতি) নিদ্রাভঙ্গের পরে কুম্ভকর্ণ-কর্তৃক বানর ভক্ষণ (বহু দৃষ্টান্ত, যেমন ঝিখিরা শ্যামসুন্দর); কিন্তু সবচেয়ে জনপ্রিয় প্যানেল হল রাম-রাবণের যুদ্ধ যা অজস্র মন্দিরের প্রধান প্রবেশ খিলানের উপরে শোভা পাচ্ছে; সীতার অগ্নিপরীক্ষার একটি মর্মস্পর্শী ফলক আছে ঝিখিরার 'সীতারাম' মন্দিরে; সিংহাসনে আসীন রাজা রাম ও সীতার অনবদ্য প্যানেল আছে সুরুলের পঞ্চরত্নে ও কালনার প্রতাপেশ্বরের দেউলের খিলান শীর্ষে। অনেক সময়ে রাবণকে প্রচ্ছন্ন ভক্ত ভাবা হয়—রাবণ-কর্তৃক করজোড়ে রামচন্দ্রকে উপাসনা করার বৃহৎ টেরাকোটা প্যানেল আছে বড়নগরের 'চারবাংলা' মন্দিরের উত্তরেরটির খিলান শীর্ষে। দুর্গার অকালবোধনে একটি পদ্ম কম পড়ায় রামচন্দ্র-কর্তৃক নিজেরই নয়ন পদ্ম উৎপাটনে উদ্যত হওয়ার দৃশ্যটির আকর্ষণীয় ফলক আছে মালঞ্চের দক্ষিণা কালী মন্দিরের গাত্রে।—বাংলার মন্দির টেরাকোটায় রামায়ণী ফলক এত প্রচুর ও এত বৈচিত্রময় যে উপরের বিবরণীটি বিন্দু দিয়ে সিন্ধু দেখার মতন।

(ii) কৃষ্ণলীলা : বংশীবাদক কৃষ্ণের বড় মাপের অনুপম প্যানেল আছে ভুবনেশ্বরের সপ্তম শতকীয় পরশুরামেশ্বর মন্দিরের মুখশালায়, বাংলাদেশের পাহাড়পুরে উৎখনিত অষ্টম শতকীয় মহাবিহারে রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি পাওয়া গেছে। সুতরাং পরম্পরাটি অতি প্রাচীন, তবে বাংলার মন্দিরগাত্রের কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক প্যানেলগুলির প্রায় সবই ভাগবত ও লোকপ্রচলিত

৬। 'Brick Temples of Bengal', Princeton University Press, 1983, P 130

কৃষ্ণকাহিনী নির্ভর। এছাড়া, বাংলার মন্দির ভাস্কর্যে কৃষ্ণের জন্ম থেকে মথুরাগমন পর্যন্ত লীলা-ই চিত্রিত হয়েছে—মহাভারতের কৃষ্ণ প্রায় অনুপস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের মন্দির-ভাস্কর্যে দ্রষ্টব্য কৃষ্ণলীলা বিষয়ক অজস্র ফলকের মধ্যে আমরা সামান্য কয়েকটির উল্লেখমাত্র করছি : বংশীধারী কৃষ্ণ (বিষ্ণুপুর মন্দিরগুচ্ছ, চেলিয়ামা 'রাধাবিনোদ', কালনা 'গোপালবাড়ি'— প্রভৃতি); রাধা ও কৃষ্ণের একত্র বাঁশি বাজানোর অসাধারণ একটি ফলক আছে বড়নগরের জোড়বাংলায়; কংসের কারাগারে কৃষ্ণের জন্ম ও পিতা বসুদেব কর্তৃক যমুনা পেরিয়ে গোকুলে গোপরাজ নন্দের ভবনে শিশু কৃষ্ণকে অচেতন যশোদার পাশে রেখে তাঁর কন্যারূপে সদ্য জন্ম নেওয়া যোগমায়াকে নিয়ে ফেরার কাহিনীর বিভিন্ন অংশের ফলক আছে নানা মন্দিরে (যেমন, কালনা 'কৃষ্ণচন্দ্র', পারুল 'বিশালাক্ষি প্রভৃতি), শিশু কৃষ্ণকে নিয়ে গোকুলের মেয়েদের আনন্দ, বাদ্য ও নৃত্যের অসাধারণ ফলক আছে বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দিরে, এর উদাহরণ আরও অছে; আকুইয়ের একটি ফলকে গোকুলের মেয়েরা শিশু কৃষ্ণকে সোনা দিয়ে ওজন করছেন; পুতনা বধ (যেমন হদলনারায়ণপুর 'দামোদর'); তৃণাবর্ত (কংস-প্রেরিত ঝড়-রূপী দৈত্য) বধ (যেমন, ঝিখিরা 'দামোদর'); বকাসুর বধ (যেমন বড়নগর 'চারবাংলা' উত্তর), কালিয়দমন (অসংখ্য মন্দিরগাত্রে, যেমন ইলামবাজার লক্ষ্মী-জনার্দন); বস্ত্রহরণ (বহু দৃষ্টান্ত, যেমন ক্ষীরপাই 'রাধাদামোদর'); রাসলীলা (যেমন, বিষ্ণুপুর 'শ্যামরায়', গুপ্তিপাড়া 'রামচন্দ্র', কাদাসোল পঞ্চরত্ন, মৌখিরা পঞ্চরত্ন প্রভৃতি—কিন্তু রাসলীলার সর্ববৃহৎ ও পূর্ণ ব্যতিক্রমী তথা অনন্যসাধারণ ফলকটি রয়েছে ভট্টমাটির রত্নেশ্বর শিব মন্দিরের পিছনের দেওয়ালের উপরের অংশ জুড়ে); কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণ (যেমন বড়নগর 'জোড়বাংলা'); গোষ্ঠবিহার (যেমন, বিষ্ণুপুর মন্দিরগুচ্ছ); নৌকাবিলাস (অসংখ্য দৃষ্টান্ত, যেমন বাঁশবেড়িয়া 'বাসুদেব'); কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য কংস-নিযুক্ত বৃষদানব অরিষ্ট (বিষ্ণুপুর), অশ্বদানব কেশী (কালনা 'কৃষ্ণচন্দ্র') ও হস্তী-দানব 'মহাকুবলয়' (গুড়াপ, নন্দদুলাল) বধ; কংস বধ (সোনামুখী 'শ্রীধর')—বলা বাহুল্য এই সমস্ত ও কৃষ্ণলীলার আরও নানা বিষয়ে আরও অসংখ্য ফলক আছে। আর একটি জনপ্রিয় ও বহুদৃষ্ট বৈষ্ণব ফলক হল 'ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ' তবে এ বিষয়ে সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ফলকটি আছে ভট্টমাটির রত্নেশ্বর শিবমন্দিরের পশ্চিম গাত্রের খিলান-শীর্ষে। দুপাশে আনন্দিত গোপবাসি ও মাঝে নৃত্য করতে করতে রাধা ও কৃষ্ণ উভয়েই বাঁশি বাজাচ্ছেন—অনেকটা পুঁথিচিত্রের ঢঙে নির্মিত এই সুবৃহৎ ফলকটি আছে বিষ্ণুপুরে শ্রীধরের নবরত্ন মন্দিরে। একটি বিরল কিন্তু আকর্ষণীয় ফলক হল 'নরনারীকুঞ্জর' (ঘুরিষা 'শিব')। গোপ-নারীরা সকলে মিলে হাতির আকার করছেন, বংশীবাদক কৃষ্ণ তার উপরে বসছেন।

(iii) মহাভারত : বাংলার মন্দির-ভাস্কর্যে মহাভারতের ফলক-আশ্চর্যজনকভাবে বিরল। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের একটি অসাধারণ ফলক আছে হদলনারায়ণপুরে ছোট তরফের নবরত্নের প্রধান খিলান শীর্ষে, একই বিষয়ে চমৎকার একটি ফলক আছে মাঙলইয়ের পঞ্চরত্নের গাত্রে। আঁটপুরের রাধাগোবিন্দ মন্দিরগাত্রে যুধিষ্ঠির ও শকুনির পাশা খেলার আকর্ষণীয় ফলক আছে। বিষ্ণুপুরের মদনমোহন মন্দিরগাত্রে অর্জুনের সারথী-রূপে কৃষ্ণের একটি ফলক আছে। বিষ্ণুপুরেরই

জোড়বাংলা মন্দিরে ভীষ্মের শরসজ্জার অসাধারণ ফলক আছে, একই বিষয়ে একটি ফলক আছে শান্তিপুরের অদ্বৈত মন্দিরে।

(iv) অন্যান্য দেবদেবী : অনন্ত-শয়নে বিষ্ণুমূর্তির প্রাচীন নিদর্শনগুলির মধ্যে আছে বিদিশার লাগোয়া উদয়পুর বা ভিলসার অন্যতম গুহায় খ্রিষ্টীয় চতুর্থ-শতকীয় বিশাল একটি মূর্তি, দেওগড়ের ষষ্ঠ-শতকীয় দশাবতার মন্দিরগাত্রে এবং মামল্লপুরমের লাইটহাউস ক্ষেত্রের একটি গুহাতেও সপ্তম-শতকীয় একটি অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্তি আছে। পশ্চিম বাংলার মন্দিরগাত্রে বহুদৃষ্ট (যেমন হদলনারায়ণপুর-মেজ তরফের পঞ্চরত্ন, ইলামবাজার হাটতলার আটকোণা মন্দির—প্রভৃতি) অনুরূপ ফলকগুলি ঐ প্রাচীন ঐতিহ্যের বাহক। বিষ্ণুর দশাবতারের মূর্তিও সুপ্রাচীন ও সর্বভারতীয় একটি ঐতিহ্য (যেমন মামল্লপুরমের সপ্তম-শতকীয় বরাহ গুহা)—এর দৃষ্টান্ত আছে পশ্চিমবাংলার অসংখ্য মন্দির গাত্রে (যেমন ইলামবাজারের পঞ্চরত্ন, সুরুলের জোড়া-শিব—প্রভৃতি)। বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম ত্রিপাদ (এক পা মর্ত্যে, এক পা শূন্যে বা স্বর্গে এবং নাভি থেকে উদ্ভূত তৃতীয় পা দানব বলির মাথায়) রূপের বৃহৎ (প্রায় চার ফুট) ফলক (ভগ্ন) আছে ভট্টমাটির মন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালের নিম্নভাগে, সাধারণ ফলক আছে বহু মন্দিরে। সর্বভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যে শিবও অত্যন্ত প্রাচীন—ভুবনেশ্বরের সপ্তম/অষ্টম শতকীয় পরশুরামেশ্বর মন্দিরের মুখশালায় শিব-কাহিনীর অসাধারণ প্যানেল আছে, অষ্টম শতকীয় ইলোরা বা নবম-দশম শতকীয় এলিফ্যান্টার শৈবমূর্তিগুলি পৃথিবী বিখ্যাত। পশ্চিমবঙ্গের বরাকরের অষ্টম-শতকীয় সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দিরের দ্বারশীর্ষস্থ ষষ্ঠশতকীয় শৈব-সাধক লকুলিশের মূর্তিটি অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ। তথাপি, বাংলার মন্দির-টেরাকোটার শিব উচ্চমার্গীয় শাস্ত্রসাহিত্যের শিব-ব্রহ্ম নন—বাংলার লৌকিক শিব। বাংলার মন্দিরগাত্রের শিব-পার্বতী—মঙ্গলকাব্যের একজন বিশেষজ্ঞের ভাষায়—গ্রামবাংলার গরীব বামুন জনৈক শিবপদ ভট্টাচার্য ও তস্য পত্নী পার্বতী দেবী। এই শিব-পার্বতী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাহন নন্দী বা বৃষের উপরে (যেমন হালিশহর 'নন্দকিশোর'), বিরল-ক্ষেত্রে সিংহাসনেও (যেমন গাজীপুর, চন্দ্রকোণা) উপবিষ্ট; নদীয়ার দিগ্‌নগরের 'রাঘবেশ্বর শিব' মন্দিরের দক্ষিণগাত্রে নন্দী-সহ শিবের নৃত্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ফলক আছে; বিবাহোদ্দেশে বরযাত্রীসহ শিবের শোভাযাত্রা (যেমন, বাঁকাদহ 'দামোদর'), শিব পার্বতীর বিবাহ (যেমন, ঘুরিষা নবরত্ন, সোনামুখী ২৫ রত্ন—প্রভৃতি)। শিব-নৃত্যের একটি আকর্ষণীয় ফলক আছে বিষ্ণুপুরে শ্রীধরের নবরত্নে। এগুলি ছাড়াও আকর্ষীণীয় শিব-ফলক আছে গুপ্তিপাড়া, বাঁশবেড়িয়া, ঘুরিষা, কালনা প্রভৃতি বহু স্থানের মন্দিরে। 'মহিসাসুরমর্দিনী' দুর্গা সর্বভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যের সবচেয়ে প্রাচীন ও সবচেয়ে ঐতিহ্যপূর্ণ বিষয়গুলির অন্যতম—মামল্লপুরমের লাইট-হাউস এলাকার সপ্তম শতকীয় 'মহিষমর্দিনী গুহা' গাত্রের খোদিত অনুপম দুর্গামূর্তি আজও সারা পৃথিবীর পর্যটকদের মন হরণ করে, ভুবনেশ্বরের নবম-শতকীয় শিশিরেশ্বর দেউলগাত্রের বা খিচিংয়ের নবম-দশম শতকীয় কীচকেশ্বরী মন্দিরের পিছনের দেওয়ালের সুবৃহৎ মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি দুটিও অনুপম। প্রকৃতপক্ষে এই তিনেরই আগে খ্রিস্টীয় চতুর্থ

শতকের ভিলসা বা উদয়পুরে একটি গুহার বহির্গাত্রে একটি দুর্গা-মূর্তি খোদিত দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ এবং আমাদের বিনীত অনুভবে সবচেয়ে সুন্দর টেরাকোটা ফলক রয়েছে ভট্টমাটির প্রাগুক্ত রত্নেশ্বর শিব মন্দিরের পশ্চিম-দেওয়ালে—বঙ্গীয় রীতি অনুসারে দুর্গা আছেন সপরিবারে। বর্ধমানের সর গ্রামের একটি ছোট ও পরিত্যক্ত আটচালার দ্বারশীর্ষে দুর্গার একটি অসাধারণ ফলক আছে—এমন দৃষ্টান্ত আছে সারা পশ্চিমবঙ্গে। মাঙলইয়ের পঞ্চরত্নে ১৮টি হাত বিশিষ্ট দুর্গার অনন্য ফলক আছে। ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর মন্দিরের মুখশালার গাত্রে ছটি মাতৃকামূর্তি আছে—পুরুলিয়ার চেলিয়ামার রাধাগোবিন্দ মন্দিরের খিলান-শীর্ষে মাতৃকাগণ শুম্ভ ও নিশুম্ভের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। গণেশ-জননী রূপে দুর্গার অনির্বচনীয় দুটি ফলক হল বড়নগরের 'চারবাংলা' মন্দিরগুচ্ছের উত্তরেরটিতে ও হুগলীর বালিদেওয়ানগঞ্জের দুর্গা মন্দিরে। বড়নগরের জোড়বাংলা মন্দিরের একটি ফলকে দেখা যাচ্ছে দুর্গা শিশু কার্তিককে কোলে নিয়ে ও শিশু গণেশের হাত ধরে হেঁটে বাপের বাড়িতে আসছেন—আগমনী গান যেন এতে মুখর হয়েছে। বড়নগরের জোড়বাংলা মন্দিরেরই বক্র কার্নিশের নিচের দেওয়ালের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরপর কালী-মূর্তির ফলক বসানো আছে, আঁটপুরেও রাধাগোবিন্দ মন্দিরের প্রধান প্রবেশ পথের উপরে কালীর বড়মাপের ফলক আছে। হংস-বাহন চতুর্মুখ ব্রহ্মা (যেমন ঝিখিরা 'সীতারাম'), ঢেকি বাহনে নারদ (যেমন কাঁকড়াকুলি 'লক্ষ্মী-জনার্দন), গণেশ (যেমন বাঁকুড়ার অযোধ্যার একটি দেউলের দ্বারশীর্ষে), গঙ্গা বা তার মকর-বাহন (সুহারি 'শিব' মন্দিরে যেমন—তবে বহু ক্ষেত্রেই দৃষ্ট হয়), ইলামবাজার হাটতলার আটকোণা দেউলে আছে গঙ্গা-অবতরণের বড় মাপের ফলক (স্মরণীয়, এ বিষয়ে বিশ্বখ্যাত হল মামল্লপুরমের সপ্তম-শতকীয় পাহাড় খোদাই করা রিলিফ), গজলক্ষ্মী (বড়নগর, 'চারবাংলা' পশ্চিম), সরস্বতী (বিষ্ণুপুর 'শ্রীধর' যেমন) ছাড়াও বিরলক্ষেত্রে কার্তিকের ফলকও আছে। লৌকিক দেবীদের মধ্যে মনসার একটি অসাধারণ ফলক আছে বীরভূমের ইটান্ডার জোড়বাংলা মন্দিরে, তবে 'কমলেকামিনী'-র ফলক আছে অনেক ক্ষেত্রে (গোবরডাঙার ইছাপুরে ১৭ শতকের প্রথম অর্ধে প্রতিষ্ঠিত ও বিনষ্ট বৃহৎ মন্দিরটির প্রধান প্রবেশ দ্বারের পাশে থাকা ফলকটি মনে হয় প্রাচীনতম—পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠিত নানা মন্দিরে দৃষ্টান্ত আছে যেমন বড়নগরের 'চারবাংলা' পশ্চিম, আলঙ্গিরি 'রঘুনাথ', আজুড়িয়া নবরত্ন. বনপাস 'দেউল' প্রভৃতি)।

(v) ফুল-লাতাপাতা/জ্যামিতিক নক্সা : ফুল-লতাপাতা ও জ্যামিতিক নক্সার টেরাকোটা ফলক দেখা যায় প্রায় সর্বত্র। অন্যান্য ফলকের ফ্রেম হিসাবেও এর প্রয়োগ যথেষ্ট বিপুল। সুতরাং পৃথকভাবে কোনো মন্দিরের উল্লেখ করা হচ্ছে না, তবে হুগলী জেলাতেই যেন এর প্রয়োগ বেশি। সাধারণত প্রধান দ্বারের উপরে হলেও আঁটপুরের রাধাগোবিন্দ মন্দিরের সামনের অঙ্গনের একটি আটচালা মন্দিরের পূর্ণ সম্মুখ-গাত্রই টেরাকোটা পুষ্প-শোভিত। পদ্ম, বলা বহুল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক—এবং প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হয়।

(vi) মানুষ ও পশুপাখি : মন্দির-ভাস্কর্যে মানুষ ও পশুপাখি হল মর্ত্যলোক বা 'সংসার'-

এর প্রতীক-ফলক, ফলত এগুলি থাকে দেওয়ালের নিম্নভাগে। জীবনচক্রের রূপায়ণ বলে এখানে সবাই কাজ করছে বা জীবনকে সম্ভোগ করছে। হাতি-ঘোড়া সহ শোভাযাত্রা (বড়নগর 'চারবাংলা' পশ্চিমের ফলকটি অনন্য কিন্তু দৃষ্টান্ত অসংখ্য), হরিণ-পেঁচা-সর্পকুণ্ডলী (গুড়াপের নন্দদুলাল মন্দিরগাত্রে এরা পৃথক ফ্রেমে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে', টিয়া (মন্দির ভাস্কর্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় পাখি—অনেক সময়ে মূল প্রবেশ খিলানের দুদিকের অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও বিন্যস্ত, যেমন গোহগ্রামের চারটি ছোট আটচালার গুচ্ছে), শকুন (বাহিরগড় 'দামোদর'—যুদ্ধক্ষেত্রে শব-ভক্ষণরত), উট (যেমন কাঁকড়াকুলি 'লক্ষ্মী-জনার্দন') হরিণ (গুড়াপ নন্দদুলাল' ও সারা বাংলায় অসংখ্য শিকারদৃশ্যে), গাভীদল (বর্ধমান জেলার কামারপাড়ার দেউল গাত্রে অনুপম—এটিকে কৃষ্ণলীলার গোষ্ঠবিহারের অংশও ভাবা যায়, বৃষদল (বা শিবের নন্দীবৃন্দ দিগনগর 'রাঘবেশ্বর'), হংসদল (বিষ্ণুপুর 'মদনমোহনে' অনুপম, এছাড়াও দিগনগরসহ বেশ কিছু দৃষ্টান্তে)—প্রভৃতি পশুপাখির মেলা আছে বাংলার মন্দির টেরাকোটায়। বড়নগর জোড়বাংলায় দুদিকে দুই অশ্বমুখ দিয়ে তিনটি প্রবেশ খিলানই সাজিয়ে ঘোড়াকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, এবং আপন মর্যাদায় আছে সিংহ, কখনো প্রবেশস্তম্ভ বা দ্বারের উপরে, কখনও দেওয়ালগাত্রে।

অন্যদিকে রয়েছে সৈন্যদল—বিরল মুঘল-বাহিনী (মাটিয়ারি, শিব, নদীয়া), নবাবের বাহিনী (ভট্টমাটি ও চারবাংলা, মুর্শিদাবাদ), ব্রিটিশ ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাহিনী (ইটাণ্ডা, কালী, বীরভূম); অসংখ্য শিকারদৃশ্য ও শিকার হওয়া পশু বহনের দৃশ্য (বড়নগর 'চারবাংলা' ও হাওড়া-হুগলি-বর্ধমানে বহু মন্দিরে), ও দেশী কায়দায় নল দিয়ে পাখি ধরার অসাধারণ একটি ফলক রয়েছে কামারপাড়ার পূর্বোক্ত দেউলে। আরও আছে পাল্কি, পাল্কিবাহক এবং পাল্কিতে আসীন সামন্ত প্রভু (যেমন, জগন্নাথবাড়ি, কালনা), বাঈ-নাচ (আঁটপুর 'রাধাগোবিন্দ'), গোশকট (আঁটপুর 'রাধাগোবিন্দ'), দুধ দোয়ানো (ইলামবাজার 'লক্ষ্মী জনার্দন'—স্মরণীয় গরুর দুধ-দোয়ানোর একটি বৃহৎ ভাস্কর্য আছে মামল্লপুরমের লাইট হাউস ক্ষেত্রে, পিচ রাস্তার পাশের সপ্তম শতকীয় গুহায়), রসকাটার জন্য তালগাছে চড়া (রাধাকান্তপুর 'গোপীনাথ'), কামারশালা-কোদাল চালানো-ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া-ক্ষৌরকর্ম (হাওড়ার কল্যানপুরের বিনষ্ট নবরত্ন), চরকায় সুতো-কাটা (কৃষ্ণপুর, 'শিব', হুগলী), সাপুড়ের সাপ খেলানো (চাউলি 'শ্রীধর' পশ্চিম মেদিনীপুর), বাঁক কাঁধে বা মাথায় মোট বওয়া শ্রমজীবি (আঁটপুর 'রাধাগোবিন্দ' ও আজুড়িয়া 'লক্ষ্মী-জানার্দন), মাছ ধরা (হদলনারায়ণপুর, দামোদর), মাছ-কাটা (পারুল 'বিশালাক্ষি') সকালে গোবরজল ছিটানো বা 'বাসিপাট' করা (কেন্দুলি, 'রাধাবিনোদ')—প্রভৃতি নানা সামাজিক দৃশ্য।

মেয়েদের জীবনের সামান্য কিছু ঝলকও আছে পশ্চিমবঙ্গের মন্দির-টেরাকোটায়। স্নানের পর পিছনে পিঠ বেঁকিয়ে গামছা দিয়ে লম্বা চুল ঝাড়া (কাটান, শ্রীধরের দ্বিতল মন্দির; ক্ষীরপাই রাধাদামোদর), স্নানান্তে শিবপূজা (ক্ষীরকুণ্ডীর নবরত্ন), উপবিষ্ট যুবতীর পিছনে বসে পরিচারিকা বা অন্য কোনো মহিলা-কর্তৃক যুবতীটির চুল আঁচড়ে দেওয়া (আঁটপুর 'রাধাগোবিন্দ',

সুরুলের পঞ্চরত্ন—প্রভৃতি), একজন সধবা নারী কৃর্তক আর একজন সধবাকে সিঁদুর পরানো (চেঁচুয়া গোবিন্দনগর 'রাধাগোবিন্দ'), রান্না (বড়নগর জোড়বাংলা), মেয়েদের পড়াশুনা (শ্রীবাটি 'শঙ্করশিব')—এগুলি সাধারণ মহিলা জীবনেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই সঙ্গে আছে অতি ধনী পরিবারের বিপুল গয়নাগাটি পরিহিতা 'অলসকন্যা' ও বাতায়নবর্তিনী (আঁটপুর, ইলামবাজার, সিউড়ি; দ্বারহাট্টা, চুরুলিয়া, ঝিখিরা প্রভৃতি বহু গ্রামের মন্দিরে)।

অন্ত্যমধ্যযুগীয় বাংলার পোষাক, গহনা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রদর্শনী আছে মন্দির টেরাকোটায়। বাঁশবাজির মত লোকক্রীড়ার টেরাকোটা ফলক আছে আটপুরের রাধগোবিন্দ ও ক্ষীরকুণ্ডীর নবরত্নে। গাজনের চরকের একটি আকর্ষণীয় ফলক আছে রাধাকান্তপুরের গোপীনাথ মন্দিরে।

শৈব-তান্ত্রিক ও মোহান্তদের বিচিত্র কার্যকলাপের টেরাকোটা ফলক আছে হুগলীর তারকেশ্বরের নিকটবর্তী আকনাপুর ও জয়নগর ছাড়াও আসণ্ডা গ্রামের মন্দিরে। নদীয়ার দিগ্‌নগরের 'রাঘবেশ্বর' মন্দিরের একটি ফলকে একজন উলঙ্গ মোহান্ত জপমালা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন এক নগ্ন যুবতীর পাশে; আঁটপুরের রাধাগোবিন্দ মন্দিরের একটি ফলকে একজন উলঙ্গ মোহান্ত নৃত্য করছে পাখা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা একজন অভিজাত রমনীর সামনে। হাওড়ার চিংড়াজোলে শিবলিঙ্গের সামনে নৃত্যরতা উদ্দাম যুবতীর ফলক আছে দামোদরের আটচালায়। গুহ্য যোগাচারী গোষ্ঠীর বিকৃত আচারের একটি ফলক আছে কাটানের পূর্বোক্ত শ্রীধর মন্দিরগাত্রে, এমনি একটি ফলক আছে বর্ধমান জেলার সাদিপুরের পঞ্চরত্নের গায়ে। অজাচারের একটি ফলক আছে পশ্চিম মেদিনীপুরের লাওদার বাঁকারায় মন্দিরে। হাওড়া, হুগলী এবং দুই মেদিনীপুর জেলার কিছু মন্দিরে স্থূল গোছের কিছু মিথুন মূর্তি ফলকও আছে।

কখনও কখনও মানবলোকের রূপকসৃষ্টি করা হয়েছে শুধুমাত্র পরপর মনুষ্য-মুণ্ডের ফলক সাজিয়ে (যেমন সুপুরের আটকোণা দেউলের নিম্নভাগে, বা মলুটির একটি দুর্গাদালানে ছাদের কার্নিশের নিচ বরাবর), আবার কখনও বড় মাপের দ্বারপাল-মূর্তির মাধ্যমে (যেমন বর্ধমান জেলার পাঁচড়ার পঞ্চরত্ন মন্দিরে বা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পাথরার তিনটি পঞ্চরত্নের গুচ্ছে)।

চৈতন্যযুগ থেকেই সারা বাংলায় খোল-কর্তাল-নৃত্য সহযোগে কীর্তন সমাজ আন্দোলনে বড় ভূমিকা নেয়—স্বাভাবিক ভাবেই মন্দির-টেরাকোটায় এর বহু উদাহরণ আছে। এর একটি অনুপম দৃষ্টান্ত হল হদলনারায়ণপুরে মেজ তরফের পঞ্চরত্নের খিলান-শীর্ষের বড় মাপের ফলকটি যাতে দেখা যাচ্ছে কীর্তন করতে করতে একজন ভাবে মূর্ছা গেছেন, একজন তাঁর সেবা করছেন ও অন্যরা দুহাত তুলে নৃত্য ও নামগান করতে করতেই তাঁর মূর্ছাভঙ্গের চেষ্টা করছেন। কীর্তন ও নামগানের উৎকৃষ্ট ফলকের আরও তিনটি দৃষ্টান্ত হল রয়েছে যথাক্রমে সুপুরের আটকোণা দেউল ও তার পাশের রেখ দেউলে এবং দশঘররার গোপীনাথ মন্দিরের নিম্নভাগে। বলা বাহুল্য, এমন দৃষ্টান্ত আরো আছে।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ও উনিশ শতকের প্রথম দিকের মন্দির-টেরাকোটায় প্রায়ই বন্দুক ও কুকুরসহ, ঘোড়ার পিঠে, পাল্কিতে বা পাশাপাশি দাঁড়ানো সাহেব-মেম ছিল অন্যতম অবিচ্ছেদ্য ব্যাপার, (বিশেষত হাওড়া ও হুগলীর) মন্দিরের পর মন্দিরে এর দৃষ্টান্ত আছে। এই সঙ্গে মন্দিরের নিম্নভাগে যুক্ত হয়েছে পাশ্চাত্য জাহাজ এবং রণতরীর ফলক—বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি (হালিশহর 'নন্দকিশোর') হয়ত মগ দস্যুদের—শীর্ণ পোত ও খোলে বন্দীর করুণ প্রমুখ দেখে তা-ই মনে হয়, এবং দ্বারাহাট্টার রাজ রাজেশ্বর মন্দিরের বৃহৎ (সম্ভবত) বাণিজ্যপোতটি মনে হয় ব্রিটিশ ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্মারক। তবে পশ্চিমবাংলার মন্দির টেরাকোটায় পাশ্চাত্য প্রভাবের সবচেয়ে উচ্চকিত দৃষ্টান্ত মনে হয় রয়েছে সুপুর ইলামবাজার-মৌখিরা-ঘুরিষা-হেতমপুর অঞ্চলে—এই বইয়ের দ্বিতীয় পর্বে সংশ্লিষ্ট মন্দিরগুলির প্রসঙ্গ কথায় বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

(খ) পাথর : এই বইয়ের দ্বিতীয় পর্বে খ্রিষ্টীয় সপ্তম থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর দেউলগুলি—অর্থাৎ ক্রোশজুড়ি, বরাকর, পাক-বিড়্‌রা-তেলকুপী-বান্দা-দেউলঘাট ডিহর প্রভৃতি—সম্পর্কিত আলোচনায় ঐসব অঞ্চলের প্রস্তর-ভাস্কর্য সম্ভবমত আলোচিত হয়েছে আটবাই চণ্ডীর চামুণ্ডা মূর্তিও তাই। এগুলির পরে নির্মিত বাঁকুড়ার ধরাপাটের দেউল গাত্রের প্রমাণ সাইজের মূর্তিগুলিও কিছুটা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। বাঁকুড়ারই গোকুলনগরের গোকুলচাঁদের পাথরের পঞ্চরত্ন ও ঘুটগেড়িয়ার প্রস্তর দেউলের প্রস্তর ভাস্কর্যও উল্লেখিত হয়েছে। ইটের দালান মন্দিরে পাথরের মূর্তি বসানোর দৃষ্টান্ত রয়েছে বাঁকুড়ার কোতুলপুরে হালদার পরিবারের ১৯ শতকীয় বিষ্ণু (শালগ্রাম) মন্দিরে। বিভিন্ন ইট-নির্মিত মন্দিরের দরজায় বিশেষভাবে আনানো পাথরের অলঙ্কৃত ফ্রেম বসানোর দৃষ্টান্ত আছে সারা পশ্চিম বাংলায়।

(গ) ফুলপাথর : সিউড়ির সোনাতোড়পাড়া থেকে জাতীয় সড়ক ধরে শেষে একদিকে ঝাড়খণ্ডের মলুটি ও অন্যদিকে রামপুরহাট-সংলগ্ন তারাপীঠ—বীরভূম ও ঝাড়খণ্ডের সীমান্ত অঞ্চল—এই ভোগোলিক পরিসীমামধ্যে একধরণের অত্যন্ত নরম 'পাথর' মেলে যা পুরোপুরি পাথর নয়, মাটিও নয়; অত্যন্ত নরম হওয়ায় সহজেই এতে ইচ্ছেমত নক্সা-কাটা বা মূর্তি খোদাই করা যায়, আবার টেরাকোটা নির্দিষ্ট তাপে মাটি পুড়িয়ে করতে হয়, এতে তেমন কিছু লাগে না অর্থাৎ একে পোড়াতে হয় না। বিদগ্ধ শিল্পবেত্তা কমলকুমার মজুমদার ফুলপাথরকে টেরাকোটা-ই ধরেছিলেন, এমনকি ফুল-পাথরের অনুপম কাজ দেখে তাঁর একে 'ইট-পাথর' বলে 'ভ্রম'-ও হয়েছিল[৭]। যাইহোক, যা পোড়ানো হয় না, তা পোড়ামাটি নয়; যা পোড়ানো

৭। "এখানে তারাপীঠে, অন্যান্য টেরাকোটা ইটের বিষয়বস্তু অভিনব, এবং যে মৃত্তিকা দ্বারা এই সকল ইট নির্ম্মিত তাহা ভিন্ন প্রকৃতির। প্রত্যেকটি ইটের রঙ কালচে লাল, অনেক জায়গায় ইট পাথর বলিয়া ভ্রম হয়।"—প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

ইট তা পাথর নয়; এবং যা পাথর তা ইট নয়। ফুলপাথর হল পাথুরে মাটি, তার পাথরের ধর্মই প্রধান। তবে বিষয়বস্তু ও ডিজাইনে ফুলপাথরের অলঙ্করণ ও টেরাকোটা অলঙ্করণের মধ্যে পার্থক্য নেই—শুধু ফুলপাথরের কাজ অনেক বেশি পাতলা, চোখা ও ধারালো। ফুলপাথরের কাজের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ সিউড়ি-সোনতোড়পাড়ার ১৭/১৮ শতকীয় 'রাধা-দামোদর' মন্দির—ত্রিখিলানের ডানেরটিতে কালিয়দমন, বাঁয়েরটিতে অনন্ত শয়ানে বিষ্ণু, মাঝে রাসচক্র ও বস্ত্রহরণ—সব কটিই সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরের কাজ। এছাড়া সেতুবন্ধনের জন্য পাথর বইতে থাকা বানর সৈন্যের দল ও সরস্বতী মূর্তিটিও অসামান্য। গণপুরের পাঁচ-মন্দিরগুচ্ছের (১৮ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ) মাঝেরটির খিলানশীর্ষে—রয়েছে কৃষ্ণের জন্মকাহিনীর অনুপম ফলক। এই মন্দিরগুচ্ছের কতকগুলি আশ্চর্য ফলক হল শ্রমজীবী মানুষের চিত্র—কাঠ-চেড়া, ঢেকিতে পাড় দেওয়া, মাথায় মোট বওয়া প্রভৃতি। এছাড়া 'নরনারীকুঞ্জরে'র একটি অতি বিরল ও অনন্য ফলক, অন্যান্য দেবদেবী, ফুল-লতাপাতা ও নানা প্রকার ব্যায়াম ও শারীরিক কসরতের চিত্তাকর্ষক ফলক। এর অদূরে কালীতলার চৌদ্দ-মন্দিরগুচ্ছের পরম ধন হল শেষ প্রান্তের কোণে উচ্চ মঞ্চের উপরে থাকা ফুলপাথরের কাজে অপরূপ-সজ্জিত চারচালা দোলমঞ্চটি। এখানকার চৌদ্দটি মন্দিরেব খিলান-শীর্ষেই রয়েছে চমৎকার ফুলপাথরের কাজ, এর মধ্যে দোলমঞ্চের দিকের একটিতে রয়েছে গঙ্গা অবতরেণর একটি চোখ-টানা ফলক। তারাপীঠের তারামন্দির-গাত্রের (বর্তমান মন্দির ১৮১৮) ফুলপাথরের ভীষ্মের শরশয্যার ফলকটির তুলনা শুধু বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরের অনুরূপ ফলকটি। রামপুরহাটেব অনতিদূরবর্তী ঝাড়খণ্ডের মলুটিতে মন্দিরের সংখ্যা কমবেশি ৭০টি, সবকটিই ১৮/১৯ শতকের মধ্যে নির্মিত ও প্রায় সবকটিই কমবেশি ফুল-পাথরের কাজে সজ্জিত—এরমধ্যে 'রাজবাড়ি' বলে কথিত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের একটি মন্দিরের দুর্গা ফলকটি অসামান্য, তেমনই সিকি তরফের মন্দিরগুচ্ছের একটি মন্দিরগাত্রের প্রচণ্ড গতিতে ধাবমান দুই অশ্বারোহীর ফলকটি একেবারেই ব্যতিক্রমী, তেমনই ব্যতিক্রমী হল ছোট তরফের মন্দিরগুচ্ছের প্রধান মন্দিরটির নিম্নভাগে থাকা জমিতে লাঙ্গল দেওয়ার ফলকটি। সিউড়ি রামপুরহাট বাসপথের কুলিয়া ও ডেউচার মন্দিরগুলির ফুলপাথরের ফলকগুলি প্রায় লুপ্ত।

(ঘ) পঙ্খের কাজ : পঙ্খের কাজ হল পলস্তরা (plaster) দিয়ে বা কাঁচা থাকতে থাকতে পলস্তরা কেটে ডিজাইন বা নক্সার কাজ। ঐতিহ্যটি সর্বভারতীয় ও প্রাচীন (স্মরণীয় ইলোরার বিশ্বখ্যাত অষ্টম-শতকীয় প্রস্তর-ভাস্কর্যগুলির পলস্তরার গয়নাগাটি)। ১৯ শতবে পশ্চিমবঙ্গের বহু মন্দির ও ভবনগাত্রে (যেমন বর্ধমানের বড়শূলে দে পরিবারের প্রভূত পঙ্খ-অলংকৃত বসতবাটি) এর প্রয়োগ হয়। চুন-বালির পলস্তরার বড় মাপের ফুল (যেমন তালপুকুরে অন্নপূর্ণার নবরত্নে), পরী (যেমন দশঘরার রায় পরিবারের দোলমঞ্চে), মূর্তি (যেমন চিরুলিয়ার বারোচালা ও আলঙ্গিরির নবরত্নের বাতায়নবর্তিনী বা সোনামুখীর পঞ্চরত্ন গিরিগোবর্ধন

মন্দিরের পাহাড় পশু পাখি), ফুললতাপাতার বিপুল কারুকাজ (যেমন নাড়াজোলের পরিত্যক্ত দুর্গাদালানের খিলান-শীর্ষে), জ্যামিতিক নক্সা (যেমন বৈদ্যপুরের বৃন্দাবনচন্দ্রের নবরত্ন মন্দিরে) , তুলসী মঞ্চ (যেমন তিলন্তপাড়ার জানকীবল্লভের পঞ্চরত্নের অঙ্গনে, হাতির আকাবে)— প্রভৃতির মত দৃষ্টান্ত ১৯ শতকীয় পশ্চিমবঙ্গে আক্ষরিক অর্থেই গণনাতীত। এ সময়ে মন্দির-অলঙ্করণে একই স্থাপত্যে টেরাকোটা ও পঙ্খ উভয়েরই যুগপৎ সহাবস্থান নজরে পড়ে (যেমন সৈদাবাদে কৃষ্ণেন্দু হোতা প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ চারচালায় বা বাঁকুড়ার হাটকৃষ্ণনগর ও পাত্রসায়েরের কটি মন্দিরে, আবার তিলন্তপাড়াব প্রাগুক্ত জানকীবল্লভের পঞ্চরত্নেব তিনপাশ অনবদ্য টেরাকোটা-মণ্ডিত হলেও পিছনের দেওয়ালটি পরিপূর্ণরূপে পঙ্খ-অলঙ্কৃত),—চারদেওয়ালই পরিপূর্ণভাবে পঙ্খের অলঙ্করণ-সম্ভারে বিপুল সমৃদ্ধ এমন মন্দির পাওয়া যাচ্ছে বিশ শতকের গোড়ায়, মোল্লারহাটে গিরিবালা দাসীর রাধাগোবিন্দকুঞ্জের পঞ্চরত্ন মন্দির।

যাইহোক, শিল্পকলার দিক হতে পশ্চিমবঙ্গে পঙ্খের কাজের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত চারটিই অষ্টাদশ শতকীয়। প্রথমত, মুর্শিদাবাদ জেলার বড়নগরের 'চারবাংলা' (১৭৫৫-৬০) মন্দিরগুচ্ছের পূবের বা পশ্চিমমুখী মন্দিরটির চুনবালির কাজের শোভা সারা ভারতে অনুপম, বস্তুত শিল্পসভার কোনো আসরেই এর কুণ্ঠিত হওয়ার কারণ নেই। চুনবালির পলস্তরা কাটতে শিল্পীগণ এখানে 'অস্ত্র' চালিয়েছেন ক্যানভাসে তুলি চালানোর মতন করে। ত্রিখিলান শীর্ষের পূর্ণ দেওয়াল জুড়ে থাকা রামকথার বিপুল সম্ভার, দক্ষিণের স্তম্ভগাত্রে রাধা ও এক গোপিনী-সহ কৃষ্ণ, তৃষ্ণার্তকে সুন্দরীর জলদান; উত্তরের স্তম্ভগাত্রে মা ও শিশু, উড়ন্ত পক্ষিদলের মধ্যে সীতা-সহ রাবণের রথ প্রভৃতি বৎসরেব পর বৎসর দেখেও আশ মেটে না। দ্বিতীয়ত, আগেরটির অদূরে ভাবানীশ্বর শিবের প্রায় সমসাময়িক সুউচ্চ উল্টোপদ্ম-শিখরের আটকোণা দেউল—এর গাত্রস্থ পঙ্খের সুবৃহৎ মাপের কালীয়দমন, পুতনাবধ ইত্যাকার দৃশ্যাবলীও চেয়ে দেখার জিনিস। প্রসঙ্গত, নিকটস্থ ও প্রায় বিনষ্ট কয়েকটি মন্দিরের ভগ্ন দেওয়ালে পঙ্খের সূক্ষ্ম কাজের লুপ্তাবশেষ আছে। তৃতীয়ত, খানাকুল কৃষ্ণনগরের অষ্টাদশ শতকীয় রাধাবল্লভ মন্দির—এর বহির্গাত্রে ঈষৎ বড়মাপের কার্পেটধর্মী ও পরপর সাজানো বর্গাকার ফলকে অত্যুচ্চ মানের নকাশী কারুকর্ম আছে—এই মন্দিরেরই মুখশালার পরে গর্ভগৃহের বহির্গাত্রে রয়েছে বাইরের দেওয়াল গাত্রের মত একই রীতির কিন্তু রঙীন পঙ্খের অনুপম কাজ, মশলার মধ্যেই স্থায়ী ভেষজ রঙ মিশিয়ে নিয়ে তৈরী এমন রঙীন পঙ্খের কাজের দৃষ্টান্ত পশ্চিমবঙ্গে আরও আছে (যেমন বৈদ্যপুরের 'বন্দাবনচন্দ্র')। চতুর্থত, বীরভূমের চণ্ডীদাস-নানুরের বাশুলী মন্দিরের ডানে ছটি ছোট চারচালা প্রতিটির দ্বারের উপরে ও দুপাশে থাকা পঙ্খের ঈষৎ বড় মাপের ফুল-পাখির কাজের মত সরল, সহজ ও সুন্দর দৃষ্টান্ত এই বঙ্গে পাওয়া ভার।

(ঙ) কাঠের কাজ : হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলার ভারমোরে অষ্টম শতকীয় কাঠ-নির্মিত একটি মন্দির অঙ্গে প্রতিহার-যুগীয় শিল্পকলার ছাপ নিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু কাঠের

ঐতিহ্য ইট-পাথরের চেয়ে প্রাচীন যদিও সহজবোধ্য কারণে সবই বিনষ্ট। পশ্চিমবঙ্গে এখনও টিকে থাকা দুটি দৃষ্টান্তই অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে নির্মিত—হুগলীর আঁটপুর ও শ্রীপুরের চণ্ডীমণ্ডপ দুটি। উভয় ক্ষেত্রেই কাঠের খুঁটি, আড়া প্রভৃতির অনুপম ভাস্কর্য বিষয়, আঙ্গিক ও ভঙ্গি সব ব্যাপারেই সমকালীন টেরাকোটাকেই স্মরণ করায়। আঁটপুরের চণ্ডীমণ্ডপের কার্নিসে একটি প্রথাগত শিকার দৃশ্যও আছে। এছাড়া আঁটপুরের চণ্ডীমণ্ডপের ফুললতাপাতার কাজ, জগদ্ধাত্রী ও রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তি এবং শ্রীপুরের ধ্যানী শিব ও মহিষাসুরমর্দিনী প্রমুখ ভাস্কর্য তারিফ করার মত। বীরভূমের উচকরণের 'চাঁদ রায়' (ধর্ম) মন্দিরের (১৮৬৮) দরজার কাঠের ফ্রেমের ভাস্কর্যের সূক্ষ্ম কলার কোনো তুলনা হয় না। পশ্চিম মেদিনীপুরের রামগড়ের আটচালা মণ্ডপের কাঠের স্তম্ভ ও ফ্রেমে চমৎকার খোদাই কাজ আছে—এটি ১৯ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে নির্মিত। দক্ষিণ ২৪ পরগনার লুপ্ত একটি চণ্ডীমণ্ডপের অসাধারণ ভাস্কর্য-মণ্ডিত কাঠের স্তম্ভ বসানো আছে মহেশপুরে। এছাড়া বাঁকুড়া হাওড়া ও হুগলীর কিছু এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মন্দিরের পরে মন্দিরে দরজায় দশাবতার, কৃষ্ণলীলা ও নানা দেবীদেবতার মূর্তি খোদাই আছে—এগুলির নির্মাণকাল অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ থেকে উনিশ শতকের শেষকালের মধ্যে।

(চ) অঙ্কন-শিল্প : মন্দিরগাত্রে অঙ্কন-শিল্পের অসামান্য নজীর আছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বহড়ুর শ্যামসুন্দর মন্দিরের (১৮২১) পাশাপাশি তিনটি গর্ভগৃহের সামনের দেওয়ালে—ফ্রেসকোগুলির শিল্পী দুর্গারাম ভাস্কর—অনুপম চিত্রগুলির বিষয় রামায়ণ, কৃষ্ণলীলা, শিব—পার্বতী ও নন্দী-ভৃঙ্গীসহ ও চৈতন্যলীলা। অনেকে এই শৈলীকে কালীঘাটের পটের পূর্বগ ভাবেন। এছাড়া গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্র ও বাঁকুড়ার রাউতখণ্ডের পঞ্চরত্ন মন্দিরের গর্ভগৃহের অভ্যন্তরস্থ দেওয়ালও উল্লেখযোগ্যভাবে চিত্রিত।

দ্বিতীয় পর্ব

স্থাপত্যরীতি-অনুসারী, কালানুক্রমিক

এবং

গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির সাংস্কৃতিক-

ঐতিহাসিক টীকা তথা প্রতিটি স্থাপত্যের পথনির্দেশসহ

সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দির
বহুলাড়া, বাঁকুড়া
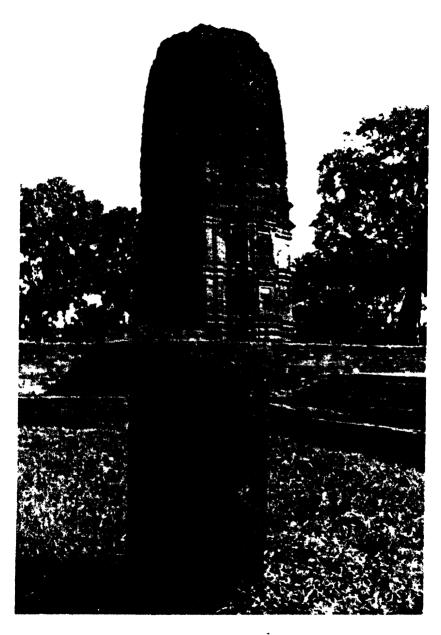
কথা

চক্ষুর্বৈ সত্যং চক্ষুর্হি বৈ সত্যং তস্মাদ্যদিদানীং
দ্বৌ বিবদমানাবেয়াতামহমদর্শমহমশ্রৌষমিতি
য এবং ব্রুয়াদহমদর্শমিতি তস্মা এব শ্রদ্দধ্যাম...

"চক্ষু সত্য, চক্ষু নিশ্চয়ই সত্য। তাই দুই জন লোক যদি বিবাদ করতে করতে আসেন এবং তাঁদের একজন যদি বলেন 'আমি শুনেছি' ও অপর জন্য যদি বলেন 'আমি দেখেছি'—তবে যিনি বলছেন 'আমি দেখেছি' তাঁর কথাই শ্রদ্ধার যোগ্য।"

—বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৫ম অধ্যায়, চতুর্দশ ব্রাহ্মণ, মন্ত্র ৪।

"The congruence between formal structure and ideas gives further validity to a way of seeing, if not 'proof'. But no extraneous evidence is essential, and certainly not textual evidence, though it may be useful. Those who rush to documents before using their eyes should heed the words of the Upanishad...."*

—Adam Hardy

মন্দির বোঝার উপায় মন্দির দেখা। ভাবনা ও নির্মিতির মধ্যেকার ব্যাপারগুলি বোঝার উপায় হিসাবে দেখাব গুরুত্ব আরও বেশি, কোনো বাইরের সাক্ষ্য বা পুস্তকের সাক্ষ্য জরুরী নয়, যদিও তা কাজে লাগতে পারে—পণ্ডিত এ্যাডাম হার্ডির এই উক্তি পরম সত্য। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় বলে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে 'দেখা'-কে যোগের উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। ঋষিও মন্ত্র 'দেখেন।' তদুপরি মন্দির হল 'শিল্প'। শিল্প দেখার বস্তু। 'দর্শন' শব্দটিরও অর্থ হল সত্যকে দেখা, সত্যকে সাক্ষাৎ করা বা সত্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধি। কিন্তু পুস্তক-পাঠ যেমন অন্যের কথা শোনা, আলোকচিত্র তেমন অন্যের চোখে দেখা।

মন্দিরগুলি জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলির অন্যতম এবং পণ্ডিত হিতেশরঞ্জন সান্যাল যেমন বলেছেন 'জাতীয় জীবনের সামগ্রিক কর্মপ্রচেষ্টার অঙ্গ।'

অতএব দেখাই উপায়। যাঁরা দেখতে চান তাঁদের কাজে লাগবে ভেবে পঞ্জিগুলি নির্মিত হল। পণ্ডিত ম্যাকাচিয়ন অনন্যসাধারণভাবে কাজটি করেছিলেন, তাঁর অকালমৃত্যু যে কাজটির আরও অগ্রগতি হঠাৎই থামিয়ে দিয়েছিল, তা আমাদের চরম দুর্ভাগ্য—আমরা অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছি, তবে নিজেদের মতন করে এবং নিতান্ত ব্যক্তিগত সাধ্যের অতি সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে।

আমাদের যাচনা, পাঠক যতটুকু পারেন মন্দিরগুলি দেখুন, কারণ উপনিষদের ঋষি যেমন বলেছেন : 'চক্ষু সত্য, চক্ষু নিশ্চয়ই সত্য।'

---

* ('Indian Temple Architecture . Form and Transformation', Indira Gandhi National Centre for the Arts, Abhinav Publications, 1995, p 6)

মন্দির-দর্শন সহায়িকা

মন্দির পবিত্র স্থাপত্য। পবিত্রতাটুকু না থাকলে মন্দির অর্থহীন। স্থাপত্য না থাকলে মন্দিরও থাকে না। দুই-এর সমন্বয়ে হয় মন্দির। তবে স্থাপত্যগত ও আঞ্চলিক পার্থক্য যা বা যতই থাক, গভীরেরও গভীরে ভারতীয় মন্দিরের বাণী এক। এই বইয়ের প্রাকপঠনে প্রদত্ত স্টেলা ক্র্যামরিশের সন্দর্ভে বাণীটির মহান বিশ্লেষণ আছে। এটিই হল মন্দিরের 'ভাষা।' নাগর, বেসর, দ্রাবিড়, কালিঙ্গ, সংমিশ্র, চালা, রত্ন, দালান প্রভৃতি ঐ 'ভাষা'-রই অজস্র রূপভেদ। 'ভাষা'-টিই আসল—রূপভেদগুলি নয়। ক্র্যামরিশের সন্দর্ভটি আমরা সশ্রদ্ধভাবে উপস্থিত করেছি মন্দিরের ভাষার অন্যতম মহান অভিধানরূপে, ওখানেই প্রায় সবকিছুই আছে এবং ওটি অবশ্য পাঠ্য। তবু যাঁরা মন্দির দেখতে চান তাঁদের সামান্য হলেও সুবিধা হতে পারে ভেবে আমরা অল্পকিছু পারিভাষিক শব্দের অর্থ দেওয়ার চেষ্টা করছি :

প্রতীক

অলসকন্যা—নানা ভঙ্গিতে 'কন্যা' বা 'নায়িকা'-মূর্তিফলক। প্রসাধনরতা, স্নানান্তে কেশসজ্জারতা, শালভঞ্জিকা, বাতায়নবর্তিনী প্রভৃতি রূপে বাংলার মন্দিরগাত্রে বর্তমান। শক্তির প্রতীক।

অঙ্গশিখর—মূল শিখরগাত্রস্থ শিখরের অনুকৃতিসমূহ। 'শেখরী' (যেমন খাজুরাহোর 'কন্দরিয় মহাদেব') রীতিতে মনে হয় যেন ঊর্ধ্বে আরোহণের জন্য অঙ্গ শিখরগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা চলেছে—বাস্তু-পুরুষমণ্ডলের ছকে 'ব্রহ্মপুর'-এর চারিদিকে থাকে 'পার্শ্বদেবতা' বা 'আবরণ-দেবতা'-দের মন্দির, অঙ্গশিখরগুলি তার প্রতীক।

অপ্সরা—সমুদ্র মন্থনকালে অপ্ বা জল হতে জাত স্বর্গ-বারাঙ্গনা। শক্তির প্রতীক।

অষ্টদিকপাল ও নবগ্রহ : ইন্দ্র, বহ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, মরুৎ, কুবের এবং ঈশান হল অষ্টদিকপাল এবং সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু হল নবগ্রহ। দ্বার-শীর্ষস্থ এই দিকপাল ও নবগ্রহ মূর্তি ভাস্কর্যগুলি মন্দিরকে মহাকাল ও মহাকাশের সঙ্গে প্রতীকী অর্থে যুক্ত করে তাকে মহাজাগতিক তাৎপর্য দান করে।

আমলক : আমলকী ফলের মত চারিদিকে শলাকার মতন খাঁজকাটা পাথরের বলয়। শীর্ষদেশের এই অঙ্গটি প্রতীকীভাবে মন্দিরশীর্ষের 'বিন্দু' ('বিন্দু শিবাত্মক') ও গর্ভগৃহের বিগ্রহ প্রতীকের মহিমা ও বিভা চারিদিকের জগৎ-চরাচরে ছড়িয়ে দেয়।

ইট : বৈদিক যজ্ঞবেদী ইট দিয়ে তৈরী হত বলে ইট হল 'যজ্ঞতনু'। মন্দির-স্থাপত্যে ইটের মর্যাদা তাই সবচেয়ে বেশি। পাথরকেও ইট-জ্ঞানে প্রয়োগ করা হত। পাথর বা কাঠের জন্য পৃথক বৈদিক মন্ত্র নেই—ইটের মন্ত্রই উচ্চারণ করা হত।

কপাল : পাত্ররূপে ব্যবহৃত নরকরোটির খুলি। শৈব ও তান্ত্রিক চিহ্ন।

কলস : অমৃতকলস, অমরকারক। 'কলা' হতে সৃষ্ট—তাই কলস।

কল্পলতা : উপর থেকে নিচে লতার মত মন্দিরের কোণাচ। হাতি, সিংহ, লতা-পাতা

অরণ্যের প্রতীক। এইভাবে মন্দির হল অভীষ্টফলপ্রদ 'কল্পতরু'। একে 'কল্পবল্লি'-ও বলা হয়, আবার সমস্ত মায়ার মৃত্যু ঘটায় বলে 'মৃত্যুলতা'-ও বলা হয়।

ক্ষেত্র : যেখানে একটি বিশেষ উপস্থিতি অনুভূত হয়।

গর্ভগৃহ : প্রাসাদের গর্ভ। এখানে প্রবেশের অর্থ মাতৃগর্ভে পুনঃ প্রবেশ, এখান থেকে নির্গত হওয়ার অর্থ পুর্নজন্মলাভ। মাতৃগর্ভের মতই অন্ধকার। বৈদিক যজ্ঞবেদীর স্মৃতিতে চতুরস্র।

চৈত্য : 'চিতি' (বৈদিক যজ্ঞবেদী) থেকে 'চৈত্য'। দেউল। মন্দিরগাত্রের দেউলাকৃতি কুলুঙ্গি। বৌদ্ধ পুণ্যগৃহ বা মন্দির।

তীর্থ : নদীর এক পাড় থেকে অপর পাডে যাওয়ার ঘাট (ঋগ্বেদ)। মন্দিরও মর্ত্যালোক হতে অমর্ত্যলোকে যাওয়ার ক্ষেত্র, তাই 'তীর্থ'।

নদী-প্রতীক : গর্ভগৃহের ঘনদ্বারের দুধারে গঙ্গা-যমুনা মূর্তি, বা তাঁদের মকরবাহন বা তরঙ্গ -চিত্র—এর অর্থ ভক্ত গর্ভগৃহে প্রবেশকালে পবিত্র নদীজলে মানসস্নান করেন। জল জ্ঞানের প্রতীক।

নরনারীকুঞ্জর : গোপনারীগণ পরস্পর-পরস্পরকে এমনভাবে ধারণ করলেন যে তাতে একটি হাতির (কুঞ্জরের) আকৃতি হল; বংশীধারী কৃষ্ণ হাতির পিঠে চড়ার মত তার উপরে আসীন হলেন। বৈষ্ণব ভাস্কর্য। বীরভূম ও পশ্চিম মেদিনীপুরের কিছু মন্দিরগাত্রে এর দৃষ্টান্ত আছে।

পদ্ম : 'ব্রহ্মপুরে আছে একটি ক্ষুদ্র পদ্ম' (ছান্দোগ্য উপনিষদ' ৮।১।১)। নাম ও আকারহীন পরমতত্ত্বের প্রতীক।

ফুল-লতা-পাতা (দ্রাবিড় : 'বল্লিমণ্ডল') : মন্দিরগাত্রে ফুল-লতা-পাতার অলংকরণ। পুষ্পিত কুঞ্জকাননের প্রতীক—'যেখানে কুঞ্জকানন নেই সেখানে দেবতারা থাকেন না' ('বৃহৎসংহিতা')।

বিদ্যাধর/বিদ্যাধরী : স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী (তাই উড্ডীন) সঙ্গীত-বিশারদ দেবযোনি বিশেষ। মন্দির-গাত্রে এঁদের মূর্তি থাকার অর্থ মন্দির হল 'মেরু' বা পৌরাণিক পর্বত যার গাত্র হল স্বর্গ।

ব্যাল/বিড়াল : শ্বাপদ হিংস্র জন্তু। শক্তির প্রতীক।

মন্দির (প্রাসাদ/বিমান/দেউল) : নাম ও আকারহীন পরমতত্ত্বের জাগতিক প্রকাশের প্রতীক। ভগবানের বাড়ি। যতই ভগ্ন হোক, কোনো চেনা লোকের বাড়ি দেখলে লোকটিব কথা মনে পড়ে, ভিতরে তিনি থাকুন বা না থাকুন—যতই ভগ্ন বা পরিত্যক্ত হোক মন্দির দেখলে ভগবানের কথা মনে পড়ে। ভিতরে বিগ্রহ থাক বা না থাক। মন্দির তাই নিজেই পূজ্য। মন্দির দেবতাদের প্রসন্ন করে, তাই 'প্রাসাদ'। ব্রহ্মাণ্ডের মতন মন্দিরের 'মান' বিশিষ্ট, তাই 'বিমান', এবং মন্দিরেই দেবকুলের অধিষ্ঠান, তাই 'দেউল'।

মন্দিরের অনুকৃতি : মন্দিরের খিলান-শীর্ষে বা সম্মুখগাত্রে মন্দিরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুকৃতি-রূপ ভাস্কর্য। অঙ্গশিখরের মতই এগুলিও হল বাস্তুপুরুষমণ্ডলে কথিত পার্শ্বদেবতাদের মন্দিরের প্রতীক—দক্ষিণভারতের দেওয়াল-মন্দির ('Wall-Temples', স্মরণীয় হ্যালেবিদ ও বেলুর) যেমন।

রত্ন : চালারীতির মন্দিরের উপর রেখ বা শিখর দেউলের অনুকৃতিতে চূড়া। এইভাবে চালা-মন্দিরও প্রতীকী অর্থে শিখর-দেউলের শাস্ত্রীয় অর্থ ও তাৎপর্য-প্রাপ্ত হল, এবং বাংলার চালা যুক্ত হল প্রায় সর্বভারতীয় মহান নাগর-শৈলীর সাথে। আবার ছাদের উপর চূড়া বসানোর ধারণাটি এসেছে ইসলামী স্থাপত্য (স্মরণীয় গৌড়ের কদম-রসুল') থেকে। এটি হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়েরও শ্রেষ্ঠ ফসল।—স্মরণীয় যে মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজার ও পাচথুপির দুটি মন্দিরক্ষেত্রে শিবলিঙ্গকেই 'রত্ন' বলা হয়েছে, এটি আঞ্চলিক প্রয়োগ।

লম্ফমান সিংহ (ঝম্পসিংহ) : শক্তির প্রতীক।

লিঙ্গ-প্রতীক : 'লিঙ্গ' শব্দটির প্রথম অর্থ 'জ্ঞানসাধন' ('বঙ্গীয় শব্দকোষ')। ঐ প্রতীকটির মাধ্যমে ভক্তের আত্মার সাথে নাম ও আকারহীন পরমাত্মার যোগসাধন ঘটে, এতেই ঘটে 'জ্ঞানসাধন।' 'আকাশলিঙ্গম্।' 'চিদম্বরম্।'

শক্তি : নাম ও আকারহীন ব্রহ্মের ইচ্ছা। দুর্গা। মন্দির শিব ও শক্তির একাত্মক প্রকাশ।

শার্দুল : বাঘ, শরভ, ব্যাল, বিড়াল। শক্তির প্রতীক। লক্ষণীয়, নায়িকা, কন্যা ও অপ্সরারাও হিংসক প্রাণীর মতনই শক্তির প্রতীক।

শিখর : বৈদিক যজ্ঞের অগ্নিশিখার স্মৃতিবাহী। জাতবেদ অগ্নি যেমন যজ্ঞের হবি পরমাত্মার কাছে বহন করেন, তেমনভাবে 'শিখর' ভক্তের আকুতিকে তাঁর দিকে ধাবিত করে। অন্যদিকে 'শিখর' মেরু, মন্দর ও কৈলাশ—এই তিন পবিত্র শৃঙ্গের প্রতীকায়ন। এর সমস্ত রূপই (ভূমিজ, লতিনা, শেখরী, সংমিশ্র প্রভৃতি) এই অর্থ বহন করে। দ্রাবিড় মন্দিরে শিখর হয় না—সেখানে এই অর্থ বহন করে পিরামিডাকৃতি 'ক্ষুদ্র অল্প বিমান।' 'শিখর' গর্ভগৃহের ছাদ নয়, ভবনও নয়—ভগবানের যশস্তম্ভ। ইউরোপীয় স্থাপত্যে এর কোনো নিদর্শন নেই। 'শিখর' একান্তভাবে ভারতীয় মনীষার সৃষ্টি।

সংসার : মন্দিরগাত্রের একেবারে নিচের স্তরে নানাবিধ পশু, পাখি, নর ও নারীর ভাস্কর্য। সকলেই কর্মরত: সৈন্যরা যুদ্ধযাত্রা করছে, পাল্কিবাহকেরা পাল্কি বহন করছে, নর-নারী প্রেম করছে—আরও বহুবিধ কাজ—এ হল 'সংসার' যেখানে সবাই জাগতিক কাজে ব্যস্ত। প্রতীকীভাবে, চারিদিকের গ্রাম ও জনজীবনও মন্দির-লালিত 'সংসার'।

হংস : পৌরাণিক পক্ষিবিশেষ। ঋগ্বেদ অনুসারে হংস মিশ্রিত সোমজল থেকে শুধু সোমরসটুকুই পান করে ('বঙ্গীয় শব্দকোষ')। অসার বা দোষ পরিহার করে শুধু সার বা গুণটুকু গ্রহণের প্রতীকরূপে মন্দিরগাত্রে থাকে বা থাকতে পারে হংস বা হংসমালা। 'যে সরোবরে হাঁস ভেসে বেড়ায় দেবতারা সেখানে থাকেন'—'বৃহৎসংহিতা।'

স্থাপত্য

অধিষ্ঠান : প্রাকার-মূল।

অন্তরাল : শিখর ও জগমোহনের মধ্যেকার স্থাপত্য।

আমলক (প্রতীক দেখুন) : একাধারে বক্র হয়ে একজায়গায় আসা চার দেওয়ালের বন্ধনী এবং কলস-পতাকা সহ স্তূপিকার বেদী।

কণিকা পগ : মন্দিরের কোণের অংশ। পগ = Segment।

কুট : গম্বুজশীর্ষ মণ্ডপ/কক্ষ (দ্রাবিড়)।

খপুরি : মাথার খুলি, দেউল-শীর্ষে আমলকের উপরের চাপা ঘন্টাকৃতি অংশ।

খাখড়া : অর্ধ-বেলনাকার শীর্ষ-সম্পন্ন দেউল (যেমন : ভুবনেশ্বরের বৈতল দেউল)।

গলা/গ্রীবা/বেকি : গণ্ডীর উপরে এবং আমলকের নিচে মানুষের গলার মত অংশ।

গণ্ডী : বাড়ের উপর থেকে মস্তকের নিচ পর্যন্ত বক্ররেখ শিখর।

জগমোহন : গর্ভগৃহের (যদি থাকে, অন্তরালেরও) সম্মুখের সেই কক্ষ যেখানে দাঁড়ালে যিনি জগৎকে মোহিত করেন তাঁকে দেখা যায়। উড়িষ্যায় সাধারণত পিড়া দেউল। **মুখমণ্ডপ। মুখশালা। চন্দ্রশালা।**

জাল (জালিকা) : মাকড়সার জাল বা মাছধরার জালের মত অংশ—'grille pattern'।

জাঙ্ঘ : বাড়ের খাড়া (Vertical) অংশ—'পাভাগ' এবং 'বন্ধনা'র মাঝে 'তল জাঙ্ঘ' আর 'বন্ধনা' ও 'বরণ্ডে'র মাঝে 'উপর জাঙ্ঘ।'

তল : ভূমি, তালা (Storey)।

দেউল : সাধারণ অর্থে সম্পূর্ণ মন্দির, বিশেষ অর্থে গর্ভগৃহ।

নাগর : উত্তর-ভারতীয় মন্দির-রীতি (প্রকৃতপক্ষে সুদূর অংশ ছাড়া দক্ষিণ ভারতেও দৃষ্ট হয়)।

নিরন্ধার : প্রদক্ষিণপথহীন মন্দিব।

পঞ্চায়তন : একই চতুরস্র অধিষ্ঠানের চারকোণে চারটি ছোট শিখর দেউল আর মাঝখানে একটি বৃহৎ শিখর দেউল—এইভাবে পাঁচটি 'আয়তন' বা মন্দির-বিশিষ্ট সংস্থান। খাজুরাহের লক্ষ্মণ এবং বিশ্বনাথ মন্দির দুটি ও ভুবনেশ্বরের ব্রহ্মেশ্বর মন্দির এই ধারার প্রাচীন ও সম্মানিত দৃষ্টান্ত। পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়ার সুইসার নিকটবর্তী দেউলির প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অষ্টম-নবম শতকীয় দৃষ্টান্তটি প্রাচীনতম। [উল্লেখ্য যে বর্ধমান জেলার বৈকুণ্ঠপুরে আটচালা মন্দিরের একটি পঞ্চায়তনও আছে।]

পাভাগ : মন্দিরের নিম্নতম অংশ।

পিড়া : কাঠের পিঁড়ির মত ধাপ-সহযোগে পিরামিডাকৃতি ছাদ-সম্পন্ন দেউল—উড়িষ্যায় সাধারণত জগমোহন।

পোটল (পটল) : পিড়ার গুচ্ছ।

বন্ধনা : দুই জাঙ্ঘের মাঝে বন্ধন (moulding), একক বা একাধিক।

বরণ্ড : বাড়ের সর্বোচ্চ অংশের বন্ধন (moulding), একক বা একাধিক।

বড় ও ছোট দেউল : 'বড় দেউল' মূল মন্দির ও 'ছোট দেউল' হল জগমোহন।

বাড় : দেওয়াল। অধিষ্ঠান (পিষ্ট) থেকে গণ্ডীর (বক্ররেখ শিখরের) নিচ অবধি।

বি-সম : 'বেকি'-র নিচে গণ্ডীর সর্বোচ্চ অংশ।

ভদ্র : কল্যাণকর/প্রিয়দর্শন। স্থাপত্যে 'পিড়া'; 'ভদ্র দেউল' হল 'পিড়া দেউল'।

ভূমিজ : নাগররীতির শিখর বিশেষ। শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—মধ্যপ্রদেশের বিদিশা জেলার উদয়পুরের উদয়েশ্বর শিব-মন্দির।

মণ্ডপ : মন্দিরমুখের ছাদযুক্ত চত্বর। তিন প্রকার—অর্ধমণ্ডপ ('অর্ধ' কারণ প্রবেশপথের জন্য সামনের দিক খোলা), মণ্ডপ ও মহামণ্ডপ (যেমন, খাজুরাহো)। গুজরাটে সভামণ্ডপ ও গুঢ় মণ্ডপ।

মস্তক : নাগর দেউলের শীর্ষভাগ। 'বেকি'-র উপরস্থ আমলক, খপুরি (খুলি), কলস ও পতাকা এই চার অংশ নিয়ে 'মস্তক'।

রথ : মন্দিরের বর্হিগাত্রের উদ্গত অংশ (Segment)। দেওয়ালের বাইরের দিকে মাঝ-বরাবর একটিমাত্র উদ্গত অংশ থাকলে দুকোণের দুটি উদ্গত অংশ ('কণিকা পগ') নিয়ে হল 'ত্রিরথ'—এইভাবে উদ্গত অংশ বাড়িয়ে মন্দিরটি 'পঞ্চরথ', 'সপ্তরথ' বা 'নবরথ' হতে পারে।

রাহাপগ : প্রধান বা মধ্যবর্তী মূল 'পগ' (segment) বা উদ্গত অংশ।

লতিনা : নাগররীতির শিখর বিশেষ। শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের 'লিঙ্গরাজ' মন্দির।

শিখর (প্রতীক দেখুন) : অধিষ্ঠান, পা-ভাগ, বাড় ও গণ্ডী—এই চার অংশে গঠিত বক্ররেখ শিখর 'নাগর' দেউলের সম্মানিত রূপ। (রেখচিত্র দেখুন)।

শেখরী : নাগররীতির শিখর বিশেষ। শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহোর 'কন্দরিয় মহাদেব' মন্দির।

শুকনাস : শুক (টিয়া) পাখির নাসিকার (ঠোঁটের) মত আকারে গণ্ডীর সামনের দিকের উদ্গত অংশ।

সান্ধার : প্রদক্ষিণপথ সহ মন্দির।

স্তূপ/স্তূপিকা : খপুরি, কলস ও পতাকা নিয়ে হয় 'স্তূপ' বা 'স্তূপিকা'।

বাংলার মন্দিরের কিছু দিক :

গিরিগোবর্ধন : উত্তোলিত বাহুতে গোবর্ধন পাহাড়কে ধারণ করে ব্রজবাসিদের প্রলয়বর্ষণ থেকে রক্ষা করেন শ্রীকৃষ্ণ—এরই স্মৃতিতে পঙ্খের পাথর, জঙ্গল, পশু-পাখি সহ গোবর্ধন পাহাড়ের আদলে মন্দির। বাঁকুড়া জেলায় কয়েকটি দৃষ্টান্ত আছে।

চাঁদনি (চাঁদিনি) : চাঁদনি (বা চাঁদোয়া)-আঁটা প্রশস্ত চক বা বাজার—"দেখেন চক চাঁদিনী সুন্দর", ভারতচন্দ্র ('বঙ্গীয় শব্দকোষ')। শামিয়ানা বা চাঁদোয়া খাটানো মণ্ডপ যেমন চারিদিক খোলা হয়, তেমনভাবে চারিদিকে মুক্ত খিলান-সহ দালান, সাধারণত স্নানঘাট, যেমন আছে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দির-প্রাঙ্গণের পশ্চিমে গঙ্গাতীরে দ্বাদশ শিবমন্দিরের মাঝে। মন্দিরের ক্ষেত্রে ছোট (সাধারণত ত্রিখিলান প্রবেশপথ-বিশিষ্ট) দালান। এই বইয়ে শুধুমাত্র 'ঘাট' অর্থেই 'চাঁদনি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

চালা : বাংলার খ'ড়ো চালের মাটির ঘরের আদলে মন্দির। সামনে-পিছনে দুটি ঢালু চাল নামলে দোচালা বা এক বাংলা; দুটি একবাংলা আড়াআড়ি জোড়া থাকলে জোড়বাংলা; একটি

দোচালার দু-পাশ থেকে আরও দুটি চাল নামলে চারচালা; একটি চারচালার উপরে আর একটি ছোট চারচালা চাপালে হয় একটি আটচালা ও একটি আটচালার উপরে একটি আরও ছোটো চারচালা চাপালে হয় বারোচালা।

রত্নরীতি : (প্রতীক 'রত্ন' দেখুন) : একটি চারচালার ছাদের উপরের মধ্যবর্তী স্থানে একটি 'রত্ন' বা চূড়া বসালে হয় 'একরত্ন', এবার চারকোণে চারটি তুলনায় ছোট 'রত্ন' বসালে হয় 'পঞ্চরত্ন', একটি আটচালার নিচের চারচালার চারকোণে চারটি এবং উপরের চারচালার চারকোণে চারটি 'রত্ন' বসিয়ে তার মাঝখানে একটি বৃহৎ রত্ন চাপালে হয় 'নবরত্ন'। এমনভাবে 'রত্ন'-সংখ্যা বাড়িয়ে ১৩, ১৭, ২১ (পশ্চিমবঙ্গে নেই তবে বাংলাদেশে আছে) ও ২৫ অবধি বাড়ানো যায়। মুর্শিদাবাদ-রীতির 'রত্ন'-মন্দিরগুলিতে কেন্দ্রীয় চূড়াটি হয় অতি-বৃহৎ কিন্তু কোণের রত্নগুলি হয় অতি ক্ষুদ্র।

দেউল (বঙ্গীয়) : পশ্চিমবঙ্গে খাঁটি ওড়িশী দেউল (শিখর/রেখ) গুটি কয়েক আছে। '[illegible]যমত'-এর মতন বাস্তুশাস্ত্রের চোখে সেগুলিকে দেখা চলে। কিন্তু তার বাইরে শত শত দেউলের ক্ষেত্রে, অষ্টম শতকীয় সিদ্ধেশ্বর (বরাকর) শিবের দেউলের সময় থেকেই, বাংলার দেউলগুলি নানা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ ভারতের বৃহৎ অংশ এবং সমগ্র উত্তর-ভারত জুড়ে ছড়িয়ে থাকা নাগর-দেউলগুলি স্থানে স্থানে কিছু কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে—বাংলাতেও তাই। বলা যেতে পারে নাগর দেউলের বঙ্গীয় রূপ—এই অর্থেই 'দেউল' শব্দটি নিচের পঞ্জিতে প্রযুক্ত হয়েছে এবং ওড়িশী উল্লেখ না থাকলে শব্দটিকে এই অর্থেই গ্রহণ করতে হবে।

আটকোণা দেউল : ভারতে অত্যন্ত প্রাচীন। পশ্চিমবঙ্গে আটচালা মন্দিরেও এর বিরল অনুকৃতি আছে।

উল্টোপদ্ম শিখর-দেউল : শীর্ষে উল্টোপদ্মের আকারের গম্বুজ। শুধু মুর্শিদাবাদ জেলায় দেখা যায়। ইসলামী গম্বুজ ও হিন্দু পদ্ম প্রতীকের মিশ্রণ। আজীমগঞ্জের কাছে বড়নগরের ভবানীশ্বর মন্দিরে সমগ্র গণ্ডীটিকেই এই আকার দেওয়া হয়েছে।

মুক্তাঙ্গন মন্দির : দুই থেকে একশত আট— নানা সংখ্যক মন্দিরের গুচ্ছ। ঐতিহ্যটি প্রাচীন এবং সর্বভারতীয় (যেমন ত্রৈকুটক, পঞ্চায়তন, চৌষট্টি যোগিনী প্রভৃতি।)।

মিশ্র ধারা : অনেক সময় দেখা যায় একরীতির মন্দিরের উপরে অন্য রীতির মন্দির চাপানো হয়েছে—দালানের উপর পঞ্চরত্ন, জোড়বাংলার উপর নবরত্ন প্রভৃতি, কিন্তু দুইয়ে মিশে কিছু হয়নি।—আমরা এই বইয়ে এগুলিকে দালানের উপর পঞ্চরত্ন বা জোড়বাংলার উপর নবরত্ন ইত্যাদি-ই বলেছি।

দোলমঞ্চ : সাধারণত চারকোণা—তবে মন্দিরের মতই নানা রীতি। দোলউৎসবের সময়ে বিগ্রহকে এনে মঞ্চে স্থাপন করলে যাতে সবদিক থেকে দেখা যায় তারজন্য সব দিকই খিলান-সহযোগে খোলা থাকে (ব্যতিক্রম আছে)।

রাসমঞ্চ : সাধারণত আটকোণা। নানা রীতি। রাস উৎসবের সময়ে বিগ্রহ-স্থাপনের পরে দর্শনের জন্য মঞ্চের সবদিক খোলা। উনিশ শতকে 'বরোক' পাত্র বা ফুলদানির আকারের চূড়া

রাসমঞ্চে জনপ্রিয় হয়। 'বরোক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন ম্যাকাচিয়ন : "baroque' vase pinnac les" (p. 77)—'baroque' শব্দটির অর্থ : অনিয়মিতভাবে কাটা হিরে/মুক্তা; সপ্তদশ শতকীয় ইটালিতে এই নামে একটি শিল্প/ স্থাপত্যধারা দেখা দেয়। রাস-মঞ্চে এর ব্যবহার প্রতিষ্ঠাতাদের পাশ্চাত্য-প্রীতির পরিচায়ক।

তুলসী মঞ্চ : সর্চরাচর দৃশ্যমান পদ্ধতিতে সবসময়েই ছিল, তবে মন্দিরের আকৃতি (রেখ/রত্ন)-তেও আছে। স্বাভাবিক কারণেই এরও চারদিক খোলা; মেঝে হয় না, ওখানে গাছ বসাবার জন্য মাটিই থাকে। এসব ছাড়াও আছে ঝুলন-মঞ্চ (বিরল), ভোগঘর প্রভৃতি।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য-রীতিতে বৃহৎ দুর্গাদালান, ঠাকুরদালান, কালীদালান, গঙ্গাবাস প্রভৃতিও যথেষ্ট সংখ্যায় দেখা দেয়।

উল্লেখ্য : ম্যাকাচিয়ন চূড়া বা রত্নের আকার ও ডিজাইন এবং মন্দিরের আয়তন অনুসারে শ্রেণিকরণ করে মন্দিরগুলিকে তার উদাহরণ অনুসারে পঞ্জিকৃত করেছেন। তাঁর দৃষ্টান্তও নির্বাচিত আর তাই কম। আমরা দেখেছি সার্বিক ক্ষেত্রে এমন শ্রেণিকরণ অসম্ভব কারণ প্রত্যেক শ্রেণিরই বহু উপশ্রেণি হবে এবং তার পরেও অনেক ব্যতিক্রম থেকে যাবে। বহু মন্দিরকে কোনো শ্রেণিতেই রাখা যাবে না। অন্যদিকে, একটি স্থাপত্য একশো বছর বা তার বেশি সময় ধরে জাতীয় সংস্কৃতির সাক্ষ্য দিচ্ছে, এই ব্যাপারটিই জরুরী। নিজেদের অভিরুচি বা সংজ্ঞানুসারে তাই বৈশিষ্টপূর্ণ বা হীন কিংবা গুরুত্বপূর্ণ বা হীন বলাও আমাদের বিজ্ঞানসম্মত মনে হয়নি। পরন্তু আমরা কালানুক্রম রক্ষা করতে চেয়েছি।

মন্দির-মসজিদ সহ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ঐতিহ্যের পঞ্জিকরণ জাতির আত্মপরিচয় এবং ইতিহাস ও সংস্কৃতির স্বার্থে জরুরী এই সহজ কারণে যে, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের এই অমূল্য উত্তরাধিকারগুলির অনেককটিই থাকবে না।

মন্দিরগুলি জাতীয় সংস্কৃতির উৎপাদন, তাই যত বেশি সম্ভব ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির টীকাকরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মন্দির·
সটীক কালানুক্রমিক পঞ্জি

সংকেত · (ক) = স্থান : ক্রম—গ্রাম/শহর, থানা, জেলা। (খ) = দেবদেবী। (গ) প্রতিষ্ঠাতা/কারিগর। (ঘ) = উপাদান—অন্য রকম উল্লেখ না থাকলে, ইট। স্থাপত্যশৈলী। অলংকরণ। (ঙ) = কাল। (চ) = পথনির্দেশ।

[কোনো স্থাননামের পরে জেলা বা থানার নাম না থাকলে স্থাননামই সেই জেলা বা থানার নাম]

পঞ্জি—১

দেউল (রেখ/শিখর/আটকোণা/উল্টোপদ্ম ইত্যাদি)

১। (ক) ক্রোশজুড়ি, কাশীপুর, পুরুলিয়া। (খ) শিব। (ঘ) সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গে এখনো দাঁড়িয়ে থাকা দেউলগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। কিছু কাল আগে উপরের অংশ সিমেন্ট-সহযোগে পুনর্নির্মিত। নিচে আদি প্রস্তর-দেওয়াল বর্তমান। খোদাই শিল্পে সমৃদ্ধ প্রস্তর-নির্মিত দেউল।— অধিষ্ঠানের দিকের প্রস্তর-বন্ধে (mouldings) রেখ দেউলের অনুকৃতি। গর্ভগৃহে বৃহৎ শিবলিঙ্গ। দরজার পাশের প্রস্তরগাত্রে গঙ্গা-যমুনা; জপমালা, কপাল ও ত্রিশূল—এই তিন শৈব-চিহ্ন-সহ দুটি চতুর্ভুজ দ্বারপাল-মূর্তি, দুহাত মাথার উপরে তুলে রাখা দুটি স্ফীতোদর বামন-মূর্তি এবং গুপ্তযুগীয় শৈলীর বিশেষ লক্ষ্মণ—ঢেউয়ের মত 'কল্পলতা' ('কল্পবল্লি', 'পত্রলতা') -শোভিত দরজার পাথরের ফ্রেম (ভগ্ন, একটি টুকরো কলকাতার রাজ্য-পুরাতত্ত্ব বিভাগের সংগ্রহালয়ে রক্ষিত)। (ঙ) সপ্তম শতক। (চ) আদ্রা থেকে বা বাসে কাশীপুরে গিয়ে নিজ-ব্যবস্থায়—পুরুলিয়া থেকেও সম্ভব।

প্রাসঙ্গিকী

বঙ্গীয় মন্দিরের কাল-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই স্থাপত্যশৈলী ও অলংকরণের রীতি-প্রকরণের উপর নির্ভর করতে হয়, কিন্তু 'শৈলী' (Style) অত্যন্ত অস্পষ্ট শব্দ, রীতিপ্রকরণও তাই—এগুলির কোনো সংজ্ঞাও হয় না। বেগলার সেই ১৮৭২-৭৩-এই লিখেছেন, "...Style is such a vague expression, that it is a vicious system, which presumes from a consideration of that which itself is undefined to deduce the age of any structure.*" অর্থাৎ যে অস্পষ্ট ব্যাপাবটির নিজেরই সংজ্ঞা হয় না সেই শৈলী বা রীতি-প্রকরণ দিয়ে কোনো বিশেষ স্থাপত্যের কাল-নির্ধারণ একটি দোষান্বিত ব্যবস্থা। এমন সমস্ত সিদ্ধান্তই তাই স্রেফ অনুমান—ক্রোশজুড়ির দেউলের ক্ষেত্রে যেমন, এই বইয়ের সমস্ত পঞ্জিগুলির অনুরূপ (যেখানে যেখানে শুধু শতক বা শতকের প্রথমার্ধ/দ্বিতীয়ার্ধ এমন বলা হয়েছে, সেইসব) ক্ষেত্রেও তেমন।

মধ্যপ্রদেশের সাতনা জেলার ভূমারের গুপ্তযুগীয় শিব মন্দিরে ক্রোশজুড়ির দেউলের মতন 'কল্পলতা' এবং স্ফীতোদর বামন মূর্তি আছে। কেউ কেউ উড়িষ্যার বারিপদা জেলার খিচিংয়ে ময়ূরভঞ্জের রাজাদের তৈরী কীচকেশ্বরী মন্দিরকে স্মরণ করে ক্রোশজুড়ির দেউলটিকে দ্বাদশ শতকে স্থাপন করতে চান, কিন্তু, (i) খিচিংয়ের ঐ মন্দিরটিও আদিতে সপ্তম-অষ্টম শতকেই নির্মিত এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে পরীক্ষামূলকভাবে প্রাচীন কৌশলে ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের উপাদানেই ওটি পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয়—দুর্ভাগ্যবশত পণ্ডিতগণ মনে করেন যে পুনর্নির্মিত মন্দিরটি পুরোপুরি আদি মন্দিরের মতন হয়নি। খিচিংয়ের অন্যান্য

* J D.Beglar 'Report of a Tour through the Bengal Provinces in 1872-73' Varanasi, Indological BOOK HOUSE, Reprint 1966, p 154—এরপর থেকে শুধু 'Report'।

(যেমন একাদশ/দ্বাদশ শতকীয় চামুণ্ডা) মন্দিরের সঙ্গে ক্রোশজুড়ির দেউলের পার্থক্যই বেশি। (ii) ক্রোশজুড়ির দেউলে আদিতে ছোট হলেও একটি মুখশালা বা মণ্ডপ ছিল, খিচিং-এ তা নেই। (iii) খিচিং-এর কীচকেশ্বরী মন্দিরের দরজার উপরে (পূর্ব দিক) রয়েছে চামুণ্ডা মূর্তি, তার উপরের দুটি কুলুঙ্গি শূন্য। পশ্চিমের দেওয়ালে নিচ হতে উপরে পরপর কুলুঙ্গিতে আছে (প্রথমটি শূন্য) দ্বিভূজ কার্তিক ও শিব-মূর্তি। উত্তরে : নিচে বৃহৎ গণেশ, তার উপরে ছোট গণেশ, তারও উপরে শিব। দক্ষিণে প্রথম মহিষমর্দিনী বৃহৎ, তার উপরে মহিষমর্দিনী ছোট ও তারও উপরে শিব-মূর্তি। ক্রোশজুড়ির দেউলের কাছে একটি ঘরে ক'টি বৃহৎ ও প্রাচীন মূর্তি— নন্দীর উপরে দশভূজ শিব, চতুর্ভুজ কালী—পূজিত হচ্ছে। ক্ষেত্রে ইতস্তত: আরও কিছু ভগ্ন মূর্তি আছে। এই সব মূর্তিই হয়ত দেউলটির গায়ে ছিল (অন্য কোনো লুপ্ত মন্দিরেরও হতে পারে)। কিন্তু স্মরণযোগ্য যে ভুবনেশ্বরের সপ্তম শতকীয় পরশুরামেশ্বর মন্দিরের পূর্ব বা পিছনের দেওয়ালের বৃহৎ কুলুঙ্গিতে দ্বিভূজ কার্তিকেয়র সুবৃহৎ মূর্তি আছে।—মন্দিরগুলি সরেজমিনে দেখে ক্রোশজুড়ির দেউলকে সপ্তম শতকীয় ভাবা ঠিক বলে আমাদের মনে হয়েছে।

আন্দাজ দুই কি. মি. দূরে 'শিব টাঁড়ে' একটি প্রাচীন মন্দিরের অবশেষ সহ একটি ঢিবি আছে। 'শিব-টাঁড়' অর্থাৎ 'শিবের ঢিবি' কথাটি লক্ষণীয়।

২। (ক) বরাকর (বেগুনিয়া), কুলটি, বর্ধমান। (খ) সিদ্ধেশ্বর শিব—মন্দির সংখ্যা চার। (ঘ) বেলেপাথরে নির্মিত উত্তর ভারতীয় বা নাগর শৈলীর দেউল, আদি ধরণ। ত্রিরথ হতে পঞ্চরথে উত্তরণের আদি দৃষ্টান্ত। গাত্রে অসাধারণ খোদাই শিল্প। (ঙ) অষ্টম শতক। (চ) আসানসোল চিত্তরঞ্জন-শাখার বরাকর স্টেশন থেকে সহজে হেঁটে— বা আসানসোল থেকে সহজে বাসে বরাকরের বেগুনিয়া বাজার।

প্রাসঙ্গিকী

বরাকরের মন্দির-ক্ষেত্রে বর্তমানে মন্দির আছে চারটি। সবকটিই শিখর-দেউল। ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেই পাশাপাশি দুটি (নম্বর ১ এবং ২), এদের কিছু পিছনে তৃতীয়টি (নম্বর ৩), এরও কিছু তফাতে আমাদের আলোচ্য চতুর্থটি (নম্বর ৪)। কিন্তু ১৮৭২-৭৩-এ তাঁর বিখ্যাত প্রতিবেদনে বেগলার পাঁচটি মন্দিরের কথা বলেছেন* —এখনকার চার নম্বর মন্দিরটি বেগলারের 'Temple No. 5' এবং এর আগে ভগ্ন অবস্থায় ছিল তাঁর 'Temple No. 4' যেটি তাঁর মতে ছিল বিষ্ণু মন্দির—এটির এখন চিহ্নমাত্রও নেই। বেগলার ক্ষেত্রের অন্য মন্দির তিনটি হতে সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দিরের (এখনকার চার ও বেগলারের পাঁচ নম্বর) পার্থক্যে আলোকপাত করেছেন অনবদ্যভাবে : "Externally, the tower differs considerabaly from those of the other temples here, and though in bad order, surpasses them in beauty and richness' though the sculptured details are not so profuse, or minute. The basement mouldings, too, are bold, elegant and simple, and stand in strong contrast to the richer, more labored, but ineffective, profusion of lines in the other temples . ... this temple cannot be classed with the others."**—অন্য

* প্রাগুক্ত 'Report', pp. 150-54

** ঐ। pp. 153-54

তিনটির তুলনায় সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের ভাস্কর্য প্রচুরও নয়, সূক্ষ্মও নয়, তবুও সেটি সৌন্দর্য এবং সমৃদ্ধিতে অন্যগুলিকে অতিক্রম করে যায়; অধিষ্ঠানের গড়ন দৃশ্যমান, সুচারু, ললিত এবং সরল—এই ব্যাপারটিই অন্যগুলির অধিকতর কষ্টকৃত কিন্তু অকার্যকর রেখার প্রাচুর্যের বিপরীত। তবে আসল কথাটি বলেছেন অধ্যাপক হিতেশরঞ্জন সান্যাল :

"বরাকরের সিদ্ধেশ্বরের মন্দির শিখর মন্দির নির্মাণের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি। ত্রিরথ হইতে পঞ্চরথ রূপে যাত্রাপথের পরিচয় ইহাতে রহিয়াছে; আসন পঞ্চরথ হইলেও মন্দিরদেহের সর্বত্র সে বিভাগ কার্যকর হইয়া উঠিতে পারে নাই—একটা সঙ্কোচ থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু মন্দিরটির তুঙ্গ শিখরের সজীব বলিষ্ঠতা ও দ্বিধাহীন উর্ধ্বগমনের পশ্চাতে যে সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ। অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বারকরের এই মন্দিবটিতে কিন্তু আদিমতা একেবারে লোপ পায় নাই। আসনে ও মন্দির দেহে রথ পগ সমূহের কোণগুলি তীক্ষ্ণ, মার্জনা করিয়া কমনীয় করিয়া তোলা হয় নাই। অপরিস্ফুট পঞ্চরথ আসন, রথ-পগ সমূহের তীক্ষ্ণতা, অমার্জিত বহিরেখার বন্ধনে বিধৃত হইয়াও শিখরের স্বচ্ছন্দ উর্ধ্বগত সমস্তই শক্তি ও সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ।"*

আদি ত্রিরথ বিন্যাস হতে উন্নততর পঞ্চরথ বিন্যাসে মন্দির স্থাপত্যের উত্তরণের পর্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন বরাকরের সিদ্ধেশ্বর শিব।

১৮৬৫-তে ভ্যালেন্টাইন বল বরাকরে তাঁর দেখা 'তিনটি' শৈব মন্দিরের উড়িষ্যার রীতির 'অতি সদৃশ' ('Very Similar') স্থাপত্যের কথা বলেন।** এরপর ১৯৩৩-এ সরসীকুমার সরস্বতী ভুবনেশ্বরের সপ্তম শতকীয় পরশুরামেশ্বর মন্দিরের সাদৃশ্যে সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের সময় নির্ধারণ করেন।*** অতঃপর অধ্যাপক হিতেশরঞ্জন সান্যাল পরশুরামেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুইয়ের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন :

'অষ্টম শতকীয় এই খর্বাকৃতি (পরশুরামেশ্বর) গুরুভার শিখর মন্দিরটির আসনের বিন্যাস, অপ্রধান রথকদ্বয়ের পরিণতি ও গণ্ডীর উপরে কর্ণিক পগের বিভাগ ঠিক বরাকবের সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের একান্ত অনুরূপ। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঘটিয়াছে গণ্ডী রচনায়। গর্ভের তুলনায় শিখরের উচ্চতা পরশুরামেশ্বরে যেটুকু অর্জন করা সম্ভব হইয়াছে বরাকরের সিদ্ধেশ্বর মন্দিরে সে উচ্চতা অনেক বেশী। ইহা ছাড়া সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের দ্বিধাবিভক্ত রাহা পগ ও concave আমলক তাহা স্বকীয়তার পরিচায়ক। কিন্তু এ দুটির একটিও মূল সমস্যার সহিত জড়িত নয়। মূল সমস্যার প্রশ্নে গণ্ডী রচনার ক্ষেত্রে যে তারতম্য ঘটিয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হয় যে অভিজ্ঞতায় পরশুরামেশ্বর মন্দিরের নির্মিত হইয়াছিল বারকরের সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের ক্ষেত্রে তাহা অনেক বেশী বিস্তার ও গভীরতা অর্জন করিয়াছে।"***

---

* 'সমকালীন নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন' (স. আনন্দগোপাল সেন গুপ্ত), ৪র্থ খণ্ড, করুণা প্রকাশনী ১৪১৩, পৃ: ৩০। পরে শুধু 'সমকালীন'।

** 'Archaeology of Eastern India New Perspectives', Ed. Gautam Sengupta & Sheena Panja, Centre for Archaeological Studies & Training, Eastern India, Kolkata, 2002, Ch.IV by Gautam Sengupta & Sambhu Chakraborty, p. 395 —এরপর শুধু 'New Perspectives

*** ঐ। পৃ: 398-99

**** সমকালীন', পৃ: ৩০

সাধারণত আমলক হয় convex, কিন্তু বরাকরের সিদ্ধেশ্বরে তা concave —অধ্যাপক সরস্বতী ও সান্যাল উভয়েই এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এছাড়াও পরশুরামেশ্বরে মূল ভাস্কর্যগুলি চন্দ্রশালা বা মুখমণ্ডপে, বরাকরের সিদ্ধেশ্বরে সেগুলি মন্দিরেরই শিখর গাত্রে।

স্মরণীয় যে বরাকরের সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে প্রতিহার বংশের প্রথম যুগে (অষ্টম শতক) নির্মিত মধ্যপ্রদেশের শিবপুরী জেলার মহুয়ার ভগ্ন শিব-মন্দিরের মিল আরও মৌলিক। ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের প্রাক্তন প্রধান কৃষ্ণ দেব বিষয়টির উল্লেখ করেছেন: "A broad recess (at Mahua Shiva Temple) separates the wall from the spire which repeats the *bhumi-amalakas* on the flanks of the central offset, as seen on the roughly contemporary temple at Pashtar in Saurashtra and Temple No. IV at Barakar, District Burdwan, West Bengal".* লক্ষণীয়, কৃষ্ণ দেব উড়িষ্যার পরশুরামেশ্বরের উল্লেখ করেননি। যাই হোক দেওয়াল ও গণ্ডীর মাঝে ঐ 'Recess' বা গভীর নিম্নায়ত রেখাটিই চাবিকাঠি। উত্তর ভারতীয় বা নাগর শৈলীর প্রাচীনতম মন্দিরগুলির কিছু ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যটি আছে—এবং এটিই বরাকরের সিদ্ধেশ্বরকে যুক্ত করেছে শুধু উড়িষ্যার সঙ্গে নয়, প্রাচীন মধ্যপ্রদেশের সাথে, এমনকি সুদূর সৌরাষ্ট্রেরও সাথে।

ম্যাকাচিয়ন বরাকরের সিদ্ধেশ্বরকে বলেছেন, 'the so-called Siddhesvari temple at Barakar,** বিষয়টি দুর্বোধ্য, কারণ মন্দিরটি সিদ্ধেশ্বর শিবের, সিদ্ধেশ্বরী বা কালীর নয় এবং শৈবক্ষেত্র রূপেও ওটি 'তথাকথিত' বা 'so-called' নয়। প্রকৃতপক্ষে বরাকরের সিদ্ধেশ্বরের ঘনদ্বারের উপরস্থ চৈত্য-কুলুঙ্গিতে স্থিত যষ্ঠ-সপ্তম শতকের প্রখ্যাত শৈবগুরু লকুলীশের মূর্তি কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখে না। সমগ্র ক্ষেত্রটির শৈব চরিত্র প্রশ্নাতীত। ম্যাকাচিয়ন এটি আদিতে জৈন মন্দির ছিল এমন ভেবেছিলেন কিনা বোঝা যায় না, কিন্তু এখানে তা হওয়ার নয়।

বরাকরের সিদ্ধেশ্বর মন্দিরক্ষেত্রে প্রাপ্ত মূর্তিগুলির উল্লেখ ছাড়া ক্ষেত্রটির বিবরণ সম্পূর্ণ হতে পারেনা—আমরা এক্ষেত্রে গৌতম সেনগুপ্ত ও শম্ভু চক্রবর্তী-প্রদত্ত সাম্প্রতিক বয়ানটি*** অনুসরণ করছি : মূর্তি-গুলি আছে তিন জায়গায়, (i) সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের চৌহদ্দিতে এলোমেলো ভাবে পড়ে থাকা মূর্তিগুলি ক্ষয়িত, শুধু একটি সূর্য ও একটি গনেশ মূর্তিকে চেনা যায়—এগুলি নবম-দশম শতকের। (ii) প্রাচীন পাথর তোলার খাদ, বর্তমানে ব্রহ্মাণী পুকুর-পাড়ে এক সারিতে রাখা বারোটি মূর্তির মধ্যে গণেশ এবং শিব-বীরভদ্র(?) মূর্তির সঙ্গে রয়েছে একগুচ্ছ মাতৃকা মূর্তি যেগুলি হয়ত একটি মাতৃকা-মন্দিরে বসানোর জন্য নির্মিত হয়েছিল। একটি বীরস্তম্ভও আছে---অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় থাকা এই মূর্তিগুলি নবম-দশম শতকের। (iii) গৌরাঙ্গ-মন্দির বা সীতারামদাস বাবার আশ্রমে রক্ষিত আছে সূর্য, উমা-মহেশ্বর, গরুড়ের উপরে বিষ্ণু, ইন্দ্র-যম-অগ্নি-বায়ু-বরুণ প্রমুখ দিকপাল এবং চন্দ্রের মূর্তি। দিকপাল-মূর্তিগুলি কোনো মন্দিরের জন্যই নির্মিত হয়ে থাকতে পারে। মূর্তিগুলিতে পাল-সেন যুগের সূক্ষ্মতা নেই। এগুলি হয়ত ১২/১৩ শতকের। —এসবে প্রমাণ হয় যে ১২/১৩ শতক পর্যন্ত এখানে মূর্তি নির্মাণের ঐতিহ্য অব্যাহত ছিল।

* Temples of North India', Krishna Deva, Natioanl Book Trust, Reprint 2000, p.21.

** 'Late Mediaeval Temples of Bengal', David J MacCutchion, The Asiatic Society, Reprint 1993, p 3—এরপর শুধু ম্যাকাচিয়ন।

*** প্রাগুক্ত 'New Perspectives', pp 398-99

৩। (ক) **দেউলভিড়্যা, তালডাংরা, বাঁকুড়া।** (খ) পরিত্যক্ত জৈন দেউল। (ঘ) নাগর (ওড়িশী) শৈলী। কালো পাথরে নির্মিত। ত্রিরথ। গণ্ডীতে ঝম্পসিংহ। উচ্চতা অনু. ৪০ ফুট। (ঙ) নবম শতক। (চ) বিষ্ণুপুর-তালডাংরা বাসে পোড়ামাটির ঘোড়াব জন্য বিখ্যাত পাঁচমুড়া—সেখান থেকে কুমোরপাড়া অতিক্রম করে রাস্তার সঙ্গে না ঘুরে, সোজা গেলে ডানে, গাছপালার মধ্যে। **প্রাসঙ্গিকী** : গ্রামের লৌকিক 'থানে' একটি নাক-ভাঙা জৈন মূর্তি 'খাঁদুরাণী' নামে পূজিত হয়ে আসছে—এটি আদিতে হয়ত দেউলটির কুলুঙ্গিতে স্থাপিত ছিল।

৪। (ক) **হাড়মাসড়া, তালডাংরা, বাঁকুড়া,** (খ) পরিত্যক্ত জৈন দেউল, (ঘ) মাকড়া পাথরে নির্মিত। পঞ্চরথ। উচ্চতা আনু, ২০/২২ ফুট। আমলক আংশিক ভগ্ন। (ঙ) দশম-একাদশ শতক। (চ) বাঁকুড়ার গোবিন্দ নগর বাসস্ট্যাণ্ড থেকে বিবড়দা হয়ে খাতরা যাচ্ছে এমন বাসে সরাসরি। বাসরাস্তার পাশেই। **প্রাসঙ্গিকী** : (i) পণ্ডিত কাশীনাথ দীক্ষিত এই গ্রামে একটি বৃহৎ তীর্থঙ্কর-মূর্তি আবিষ্কার করেন। (ii) দেউলে এখন হাড়ি সম্প্রদায়ের একজন পুরোহিত পূজা করেন—হয়ত এটি প্রাচীন দেউলের লৌকিক 'থানে' পরিণয়নের দৃষ্টান্ত।

৫। (ক) **সাতদেউলিয়া, জামালপুর, বর্ধমান।** (খ) পরিত্যক্ত জৈন দেউল। (ঘ) বিপুল উচ্চতা (আনু. ৭০ ফুট) সম্পন্ন 'নাগর' দেউল। টেরাকোটা ও ইট খোদাই (cut-brick)-শিল্পে সজ্জিত অপরূপ স্থাপত্য। চৈত্য-গবাক্ষ বিন্যস্ত। (ঙ) দশম-একাদশ শতক। (চ) হাওড়া-বর্ধমান কর্ডলাইনের মসাগ্রাম স্টেশন থেকে রিক্সায়, সরাসরি। **প্রাসঙ্গিকী** : (i) সাতদেউলিয়ার চেয়ে প্রাচীন ইট-নির্মিত মন্দির হল উত্তর প্রদেশের কানপুর জেলার ভিতরগাঁওয়ের ষষ্ঠ শতকীয় ৭৫/৮০ ফুট উচ্চ বিশাল মন্দির—এখানে শিখরটি 'নাগর' রীতির বক্ররেখ রূপ পায়নি। যদিও আকৃতিতে সেই চেষ্টাটি আছে, কিন্তু মন্দিরটি গণেশ, আদি-বরাহ, মহিষমর্দিনী প্রভৃতি টেরাকোটা মূর্তি ছাড়াও নানা অলংকরণে সজ্জিত। প্রায় সমসাময়িক ইটের মন্দির বোধগয়ার মহাবোধি মন্দির, কিন্তু তা বহুল সংস্কৃত। উড়িষ্যার বলাঙ্গীর জেলার রানীপুর-ঝাড়িয়ালের চৌযট্টি যোগিনী মন্দিরের অদূরে ইট-নির্মিত সুউচ্চ (৫০ ফুট, আনু.) ইন্দ্রলথ মন্দিরও অসাধারণ ইট-কাটা (cut brick) শিল্পে অনন্য সজ্জিত—কিন্তু এটি অত্যন্ত পরিপক্ক ওড়িশী নাগরদেউল। (ii) একদা সাতদেউলিয়ার মন্দিরে গ্রথিত ও বর্তমানে কোনো সংগ্রহালয়ে রক্ষিত ১৪১ জন জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি খোদিত একটি প্রস্তর ফলকের আলোকচিত্র মুদ্রিত আছে যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর বর্ধমান ইতিহাস ও সংস্কৃতির-র প্রথম খণ্ডে (পুস্তক বিপণি, ১৯৯৪), চিত্র-সংখ্যা: ১৩।

৬। (ক) **বহুলাড়া, ওঁদা, বাঁকুড়া,** (খ) সিদ্ধেশ্বর শিব (বর্তমানে)। (ঘ) উচ্চতা আনু. ৬০/৬৫ ফুট। নাগর দেউল। গাত্রে রেখ দেউলের ইট-কাটা অনুকৃতি। টেরাকোটা চৈত্য, অলিন্দ, ফুল, লতা-পাতা, মালা, জ্যামিতিক নক্সা, পূবের একটি কুলুঙ্গিতে সিংহের সঙ্গে এবং উত্তরের এক কুলুঙ্গিতে হাতির সঙ্গে যুদ্ধরত মল্ল। অনেক উপরের একটি কুলুঙ্গিতে একটি রহস্যময়ী মূর্তি (কোনো দেবী?) (ঙ) দশম / একাদশ শতক। (চ) বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া বাসপথের ওঁদা থেকে রিক্সায়—বাঁকুড়া-ওঁদা ট্রেকারও আছে।

প্রাসঙ্গিকী

(i) দ্বারকেশ্বর নদের অদূরবর্তী বহুলাড়া (বোল্যাড়া / বোলাড়া) গ্রামটি দেউলটির চেয়ে প্রাচীন। প্রাচীন জৈন গ্রন্থসমূহে (যেমন আচারঙ্গ সূত্রে) 'রাঢ়' বোঝাতে 'লাঢ়' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আচার্য বিনয় ঘোষ এপ্রসঙ্গে দুটি তথ্য উল্লেখ করেছেন—প্রথমত, রাজেন্দ্রচোলের লিপিতে 'উত্তীরলাঢ়ম' (উত্তর রাঢ়) এবং তক্কণলাঢ়ম' (দক্ষিণ রাঢ়) শব্দদুটি ব্যবহৃত হয়েছে; দ্বিতীয়ত গ্রামনামের সঙ্গে 'লাড়া' শব্দ যোগ করার দৃষ্টান্ত বাঁকুড়ায় আরও আছে, যেমন 'বেলাড়া', 'কুলাড়া' প্রভৃতি।*

(ii) বহুলাড়ার রহস্য বহুগুণে বাড়িয়েছে প্রাঙ্গণের ছোট স্তূপগুলি। স্বাধীনতার আগেই প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উৎখননে ১৯টি স্তূপ বেরিয়েছিল, এখন বেড়ে পঁচিশটির মত হয়েছে। এগুলির অধিকাংশই বর্তুলাকার—একটি রবীন্দ্রনাথ সামন্তের ভাষায় 'বড় সাইজের খড়মের মতো।'** আচার্য বিনয় ঘোষ এগুলিকে বৌদ্ধদের 'শারীরিক চেতিয়' ভেবে লিখেছেন : "বৌদ্ধ শ্রমণদের মৃত্যুর পর তাঁদের দেহভস্মাবশেষ 'অস্থিকুম্ভে'র মধ্যে রেখে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করা হত এবং তার উপরে একটি বৃত্তাকার (সাধারণত) মাটির বা ইটের 'স্তূপ' (পালিতে 'থুপ', সিংহলী 'দাগোবা') নির্মাণ করা হত। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের পার্শ্বস্থ স্তূপগুলি দেখে প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনুমান করেন যে এখানে আগে বৌদ্ধদের একটি কেন্দ্রও ছিল।"***

(iii) সিদ্ধেশ্বর শিবের গর্ভগৃহে গণেশ ও মহিষমর্দিনী ছাড়াও একটি জৈন পার্শ্বনাথ মূর্তি আছে—বেগলার ('Report' p. 202) এবং অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও ('পুরাকীর্তি' পৃ: ৭২) জৈন মূর্তিটির কথা বলেছেন। পরন্তু বাঁকুড়ার দেউলভিড্যা (তালডাংরা), হাড়মাসড়া, পরেশনাথ (মুকুটমণিপুর) ও অম্বিকানগরের জৈন কেন্দ্রগুলি বহুলাড়া থেকে আদৌ দূরে নয়। জৈনদের মধ্যেও মৃত সন্তদের অস্থি সমাধিস্থ করার রীতি অপ্রচলিত ছিল না। বহুলাড়ার আশপাশে কোনো বৌদ্ধকেন্দ্রও এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। এখানে জৈন কেন্দ্র থাকাই হয়ত বেশি সম্ভব।

(iv) বেগলারের সময়ে (১৮৭২-৭৩) স্তূপগুলি উৎখনিত হয়নি, কিন্তু তিনি সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের তিনপাশে ও চারকোণে সাতটি গৌণ বা আবরণ দেবতার মন্দিরের কথা বলেছেন, একটি তাঁর মতে ছিল নন্দী বা বৃষবাহনের****—এগুলির এখন অস্তিত্ব নেই।

(v) বেগলার ঐ প্রতিবেদনের শুরুতেই বহুলাড়ার দেউলটি সম্পর্কে লিখেছেন "The finest brick temple in the district, and the finest though not the largest brick temple that I have seen in Bengal". —অন্যদিকে, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার-

---

* বিনয় ঘোষ, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' (প্রকাশ ভবন, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৫), প্রথম খণ্ড, পৃ: ৩৬০।—এরপর শুধু 'প: বঙ্গের সংস্কৃতি।'

** রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, 'বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা' (পুস্তক বিপণি, ১৯৮১), পৃ: ১৩১।

*** প. বঙ্গের সংস্কৃতি —১, পৃ: ৩৬৩।

**** প্রাগুক্ত 'Report', pp. 202-03

সম্পাদিত ও ভারতীয় বিদ্যাভবন কর্তৃক প্রকাশিত The Struggle for Empire' গ্রন্থে স্থাপত্য বিষয়ক অধ্যায়ে পণ্ডিত সবসী কুমাব সরস্বতী বহুলাড়ার মন্দিরটিকে সর্বভারতীয় মর্যাদার দাবিদার বলেছেন—এই সর্বভারতীয় ধারাটি হল আসলে উত্তর-ভারতীয় 'নাগর' শৈলী। এটিই খাঁটি কথা—বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দির শুধু উড়িষ্যার নয়, সমগ্র উত্তর ভারতের মহান 'নাগর' শৈলীর প্রতিনিধিত্বের অধিকারী।

৭। (ক) ছরড়া, পুরুলিয়া মফস্বল, পুরুলিয়া। (খ) পরিত্যক্ত জৈন দেউল, (ঘ) ত্রিরথ। চৈত্য ও ভুমি-আমলক খোদিত। গ্রীবার উপর আমলক এখনো বর্তমান। (ঙ) দশম-একাদশ শতক। (চ) পুরুলিয়া শহর থেকে অটোরিক্সায়। **প্রাসঙ্গিকী** : ১৮৬৪-১৮৬৫-তে ড্যাল্টন এখানে দুটি দেউল (অন্যটি নিরলংকার পঞ্চরথ, বর্তমানে লুপ্ত) দেখেছিলেন, তিনি লিখেছেন "there were originally seven of these Deols. Five have fallen...."* সাতটি দেউলের ছয়টিই এখন পড়ে গেছে। সেগুলির গর্ভগৃহ ও গাত্রের মূর্তিগুলির (প্রায় সবই জৈন ধারার) কিছু অংশ গ্রামে এখানো দেখা যায়। (ii) স্থানীয় ঐতিহ্য অনুসারে গ্রামের কাছাকাছি বৃহৎ পুকুরগুলি সরাকদের (প্রাচীন জৈনদের 'মনুষ্যাবশেষ', 'Human relics') কীর্তি।

৮। (ক) জটা, মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। (খ) শিব, (গ) রাজা জয়ন্তচন্দ্র (?)। (ঘ) রেখ দেউল, সংস্কৃত। (ঙ) দশম-একাদশ শতক। (চ) শিয়ালদহ (দক্ষিণ) থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর বা কাকদ্বীপ লোকালে মথুরাপুরে গিয়ে, সেখান থেকে বাসে বা অটোয় রায়দীঘি গিয়ে নদী পার হয়ে ভ্যান-রিক্সায়, সরাসরি।

প্রাসঙ্গিকী

(i) ১৮৯৬-এ প্রকাশিত 'List of Ancient Monuments in the Presidency Division'-এ বলা হয়েছে : "The Deputy collector of Diamond Harbour reported in 1875 that a copper plate discovered in a place little to the north of Jatar Deul fixes the date of the erection of this temple by Raja Jayantachandra in the year 897 of the Bengali Sak era corresponding to A.D. 975. The copper plate was discovered at the clearing of the jungle by the grantee Durga Prased Chowdhury. The inscription is in Sanskrit and the date as usual was given in enigma with the name of the founder."** দেখা যাচ্ছে যে, ১৮৭৫-এর সরকারী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী নামে একজন সত্ত্বাধিকারী জঙ্গল হাসিল করার সময়ে জটার দেউলের সামান্য উত্তরে একটি তাম্রশাসন পান এবং তাতে বলা হয়েছে যে রাজা জয়ন্তচন্দ্র ৮৯৭ শকাব্দে, অর্থাৎ ৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে দেউলটি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তাম্রশাসনটি হারিয়ে গেছে, রাজা জয়ন্তচন্দ্র সম্পর্কেও কিছু জানা যায়নি।

(ii) শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র মিত্র জানিয়েছেন "জটার দেউল ১১৬নং লাটের অন্তর্গত। ম্যাপে

* প. বঙ্গের সংস্কৃতি— ১, পৃ: ৪৩৮

** 'পশ্চিমবঙ্গ', ফেব্রুয়ারী-মার্চ ২০০০-এর পৃ: ৩১-এ সাগর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত

ইহাকে প্যাগোডা (pagoda) বা (বৌদ্ধ) মন্দির বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটির কার্যবিবরণী হইতে জানিতে পারি—Mr. Swinhoe has published a figure of the ruins lately discovered in Lot 116. The temple is of theBuddhist type of architecture ! Rev. J. Long বোধ হয় এই দেউল দেখিয়াই 'a fine Hindu temple two centuries old', বলিয়া গিয়াছেন। মেজর স্মিথ (Smyth) বলেন যে, এই স্থানে একটি মন্দিরে ৮ বৎসর বালকের আকার বিশিষ্ট একটি প্রস্তরমূর্তি ছিল—Hunter, Statistical Accounts, Vol. I, P, 88: 24 parganas Gazetteer, p. 29"*

(iii) জটার দেউলের কাছাকাছি দেউলবাড়ি (স্থানীয় উচ্চারণে দেলবাড়ি) গ্রামে একটি প্রাচীন দেউলের নিচের অংশ টিকে আছে। পাথর প্রতিমার কাছে বনশ্যামনগরে কিছুকাল আগেও একটি প্রাচীন দেউলের আস্তিত্ব ছিল। অনতিদূরের গোবিন্দপুরেও একটি প্রাচীন দেউলের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। সন্নিহিত সুন্দরবন অঞ্চলে কিছু জায়গায় ধ্বংসাবশেষ ও ইটের রাশি আছে। জটার অনতিদূরের নানা গ্রাম—যেমন ঘাটেশ্বর, রাক্ষসখালি, খাড়ি, কাশীনগর, বাইশহাটা, রায়দীঘি, কঙ্কণদীঘি, ছাটুয়া, করঞ্জলী, কাঁটাবেনিয়া, পাতপুকুর, নলগোঁড়া, দমদমা, দক্ষিণ বারাশত, বৈদ্যের চক, মাজেরাট, পুরন্দরপুর—থেকে প্রাচীন বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মূর্তিগুলি অধিকাংশই পাথরের, কয়েকটি বেশ বড় মাপের (চার ফুট পর্যন্ত)। রাক্ষসখালিতে পাওয়া গেছে অষ্টধাতুর বুদ্ধমূর্তি। বিভিন্ন অঞ্চলে পোড়ামাটির মূর্তিও মিলেছে। মূর্তিবিশারদগণ এগুলিকে প্রাকমুসলিম-যুগের বলে মনে করেন। আচার্য বিনয় ঘোষ যেমন বলেছেন, মূর্তিগুলি জোয়ারের জলে ভেসে আসেনি, তীর্থযাত্রী-পর্যটকগণের পক্ষেও এত ভারী মূর্তিগুলি নিয়ে চলাফেরা করা ছিল ঘোর অসুবিধাজনক— "তাহলে এই কথাই ভাবতে হয় যে জৈন-বৌদ্ধ-হিন্দুধর্মের অনুগামী ও অনুরাগীদের বাস একদা সুন্দরবন অঞ্চলে ছিল, এবং বিশাল সুন্দরবনের স্থানে-স্থানে জৈন ও বৌদ্ধ সভ্যতার কেন্দ্রও গড়ে উঠেছিল"**

(iii) শ্রদ্ধেয় নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন: "সুন্দরবনের জটার-দেউল।........মন্দিরটির এমন সংস্কার-সংরক্ষণ করা হইয়াছে যে, ইহার মূল আকৃতি-প্রকৃতিই গিয়াছে বদলাইয়া।........যুক্তিহীন, জ্ঞানহীন সংস্কার ও সংযোজনার ফলে মন্দিরটির মৌলিক রূপ আজ আর কিছু বুঝিবার উপায় নাই। তবে পুরাতন এবং সংস্কারপূর্ব একটি আলোকচিত্র হইতে মনে হয়, এই দেউলটিও অনেকটা (বহুলাড়ার) সিদ্ধেশ্বর-মন্দিরের মতনই ছিল......।"*** আমরা ১৯২২-এ প্রথম প্রকাশিত সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর-খুলনার ইতিহাসে'র দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদত্ত জটার দেউলের সংস্কার-পূর্ব কালের আলোকচিত্রটি দেখলে বুঝতে পারি নীহাররঞ্জনের মন্তব্যের সারবত্তা।

৯ (ক) পাড়া, পুরুলিয়া। (খ) গজলক্ষ্মী। বর্তমানে অপহৃত মূর্তিটি দেখে ১৮৭২-৭৩-এ বেগলার লিখেছেন : "The temple enshrines a statue of fine black stone ; it

* 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ ২০০১ মুদ্রণ, প্রথম প্রকাশ ১৯২২, পৃ: ৬৪৯, 'তথ্যসূত্র' ২০।

** প্রাগুক্ত 'প: বঙ্গের সংস্কৃতি—৩, পৃ: ২৭৩।

*** বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব', দে'জ ১৯৯৩ সংস্করণ, পৃ: ৬৮০।

is of Lakshmi, and is two armed ; two elephants are sculptured as holding garlands over her head; she lost her nose, but is otherwise in excellent preservation, and rivals the fine sculptures of Lakhisarai"* (ঘ) নিচের অংশ অতি নরম বেলেপাথর, উপরের অংশ শক্ত পাথরের। নিচের অংশে প্রচুর খোদাই কাজ ও ভাস্কর্য-মণ্ডিত চৈত্য শোভিত, কিন্তু নরম পাথরের হওয়ায় সবই ক্ষয়িত। আনু. ২০/২৫ ফুট উচ্চ। (ঙ) দশম একাদশ শতক। (চ) পুরুলিয়া থেকে বাসে পাড়া থানা স্টপেজ—এখান থেকে ৭/৮ মিনিট হাঁটা।

১০। (ক) ঐ। (খ) দশভুজা—বেগলারের দেখায় "a ten-armed female statue" (ঐ Report p. 165)। বড় মাপের ইট ও কাদার গাঁথনি। চৈত্য-গবাক্ষ-সহ সূক্ষ্ম ইট খোদাই শিল্প। (ঙ) দশম-একাদশ শতক— বেগলারের মতে 'perhaps older than the stone one' (Report, p. 164) (চ) ঐ। পাশে।

১১। (ক) দেউলঘাট (বোড়াম), আড়ষা, পুরুলিয়া। (খ) বিগ্রহ লুপ্ত। বেগলার, কাঁসাই নদীর দিক থেকে দক্ষিণতম একটি মন্দিরে (তাঁর মতে) পার্বতী-মূর্তি দেখেছিলেন : "the figure within is a four-armed female seated on a lion, which, therefore, I assume to represent Parvati"** (ঘ) আমলক ও কলসসহ শীর্ষদেশ লুপ্ত হলেও আনু. ৫০/ ৬০ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট। 'corbelling' বা কদলিকাকরণ পদ্ধতিতে নির্মিত। ত্রিরথ। লহরা-সাজিয়ে ত্রিকোণ দ্বার। দেউলের সামনে ও পাশগুলিতে চৈত্য ও দেউলের অনুকৃতি—ইট-খোদাই করে রচিত। বেগলারের মতে নিপুণ ও মসৃণ এই ইট-খোদাই বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দিরের কথা মনে করায় ও বুদ্ধগয়ার মতই এগুলির উপরে পলেস্তরা করা হয়নি।*** পঙ্খের মূর্তির মধ্যে আছে হংসশ্রেণি, বামন, আসনপীড়ি হয়ে বসা মূর্তি প্রভৃতি। জল-নিকাশী মকর-নালী।—অলংকরণ বহুলাড়া ও সাতদেউলিয়ার দেউল দুটি স্মরণ করায়। (ঙ) দশম-একাদশ শতক। (চ) দুভাবে যাওয়া চলে—(i) পুরুলিয়া থেকে বেগুনকোদরগামী বাসে ঘাটবন—এখান থেকে চার কি.মি. হাঁটা (আগের স্টপেজ জীবনড়িতে নামলে রিক্সা মিলতেও পারে)। (ii) পুরুলিয়া থেকে বাসে জয়পুরে গিয়ে ৬ কি. মি. রিক্সায় এসে কাঁসাই পার হয়ে।

১২। (ক) ঐ। সামান্য উত্তরে। (খ) (?)। (ঘ) অপেক্ষাকৃত ছোট। একই পদ্ধতিতে নির্মিত ও অলংকৃত। (ঙ) দশম-একাদশ শতক।

প্রাসঙ্গিকী

(i) দেউলঘাটের তৃতীয় মন্দিরটি ২০০২-এর মার্চে আমাদের দর্শন কালে মেরামতের চেষ্টায় সম্পূর্ণ পতিত দেখেছি—গ্রামের লোকেরা পুনর্নির্মাণ দাবী করছিলেন।

(ii) দেউলঘাটে আরও ১০/১২টি পাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বা চিহ্ন আছে—তবে উন্নত নির্মাণ ও পালযুগীয় বড় বড় টালির মত ইট হতে বোঝা যায় যে ইটের মন্দিরগুলিই প্রাচীনতর।****

---

* প্রাগুক্ত 'Report', p 164.

** প্রাগুক্ত 'Report', p. 184

*** ঐ।

**** W.B. District Gazetteer, Puruliya, p. 435.

(iii) দেউলঘাটে প্রাপ্ত লিপিটি বেগলারের মতে নবম-দশম শতকীয় ('Report' p. 184) ও রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে একাদশ-চতুর্দশ শতকীয় (পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, 'পুরাকীর্তি', পৃ: ৬৯)

(iv) ড্যালটন ও তাঁর অনুসরণে আচার্য বিনয় ঘোষ দেউলঘাটের মন্দিরগুলিকে জৈন সরাকদের সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকীয় কীর্তি ভেবেছেন।* দেউলঘাটে একটিও জৈন (এমনকি বৈষ্ণব) মূর্তি মেলেনি—সবই শৈব, যেমন, দুটি দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী (যথাক্রমে দশম এবং একাদশ শতক) এবং দুটি চণ্ডী (যথাক্রমে দশম এবং দ্বাদশ-শতক)।

১২। তেলকুপি, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া।—তেলকুপি বা প্রাচীন তৈলকম্পের মন্দিরগুচ্ছ বঙ্গীয় মন্দিরকলার বিবর্তনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু মাত্র দুটি ছাড়া বাকি সব মন্দিরই পাঞ্চেৎ বাঁধের জলরাশিতে নিমজ্জিত। স্থানীয় মানুষেরা জানিয়েছেন যে বৈশাখ মাসে জল কমলে তেলকুপির ভৈরবথানের মন্দিরকটি দেখা যায়। কিন্তু আমরা সে সময়ে দ্বিতীয় যাত্রা করে উঠতে পারিনি। আমরা তাই আমাদের দেখা মন্দির দুটির উল্লেখ করছি এবং ক্ষেত্রটি জলমগ্ন হওয়ার আগে গিয়েছেন এমন দুজন শ্রদ্ধেয় প্রত্যক্ষদর্শী পণ্ডিত— বেগলার ও নির্মলকুমার বসুর বিবরণ ও বিশ্লেষণ ছাড়াও একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত স্মরণ করছি :

(i) (ক) **গুরুডি**। (খ) (?) (ঘ) অতিজীর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত প্রস্তর দেউল, শিখর বা গণ্ডী-র সামনের অংশ ভগ্ন। দুপাশ ও পিছন দিকের দেওয়ালে (বড়) বৃহৎ কুলুঙ্গি, এর উপর দিয়ে একটি বেশ চওড়া উদ্গত অংশ ('রাহা পগ') বাড়ের শীর্ষ অবধি উঠে নিম্নায়ত হয়ে মিলিয়ে গিয়ে, গণ্ডী বা শিখরের শুরুতে আবার দৃশ্যমান হয়ে, গ্রীবা পর্যন্ত যাত্রা করেছে। ফলত মন্দিরটি হয়েছে 'ত্রি-অঙ্গ'—গ্রামে এক জায়গায় বেশ কটি প্রস্তর-মূর্তি রক্ষিত আছে, এগুলির কয়েকটি ঐ মন্দিরগাত্রের হতে পারে। মন্দিরটির উচ্চতা আনু. ২৫ ফুট। (ঙ) দশম-একাদশ শতক। (চ) পুরুলিয়া শহর থেকে বাসে রঘুনাথপুর—মূল বাসস্ট্যাণ্ড থেকে ট্রেকার মিললেও নিজব্যবস্থায় যাওয়াই ঠিক হবে। গ্রামের শেষে, পাঞ্চেৎ জলাধার-ঘেষে।

(ii) (ক) **লালপুর**। (খ) (?) (ঘ) অতি জীর্ণ প্রস্তর দেউল, অধিষ্ঠান জলমগ্ন। 'গণ্ডী' বা শিখরের পাথর জায়গায়-জায়গায় খসে গেছে, তবু আমলকটি এখনও বর্তমান। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য গুরুডির মতন। (ঙ) দশম-একাদশ শতক। (চ) গুরুডির পরেই লালপুর একই রাস্তায়। গ্রামের চা-দোকানের পাশ দিয়ে নামা কাঁচা পথে--চায-মাঠ ও জলের ধারের বৃহৎ ঘাসের জঙ্গল ভেদ করে--জল কম থাকলে জলভেঙে, না হলে নৌকা লাগবে! লালপুর গ্রাম থেকে একজন পথপ্রদর্শক নেওয়া ঠিক হবে। দেড়/দুই কি মি হাঁটাপথ।

তেলকুপি

১৮৭২-৭৩-এ কৃত জে. ডি. বেগলারের প্রতিবেদন**

(সংক্ষিপ্তসার)

তেলকুপিতে মন্দিরগুলির তিনটি গুচ্ছ। প্রথমত: গ্রামের সামান্য পূবে, দামোদরের কোল

* প্রাগুক্ত 'প: বঙ্গের সংস্কৃতি— ১' পৃ: ৪৪০-৪১।

** প্রাগুক্ত 'Report', pp. 169-178.

ঘেষে, রয়েছে বৃহত্তম গুচ্ছটি। দ্বিতীয়ত: গ্রামের কাছে, কিছুটা পশ্চিমে রয়েছে দ্বিতীয় গুচ্ছটি। তৃতীয়ত গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে রয়েছে তৃতীয় গুচ্ছটি। গুচ্ছ-ক্রম অনুসারে মন্দিরগুলি (অন্য উল্লেখ না থাকলে তেলকুপি-ধরণের রেখ, প্রস্তর-দেউল) হল : (i) শিব। কাটাপাথর (Cut stone)-এ নির্মিত। নিরলংকার। (ii) শিব। দ্বারশীর্ষে লক্ষ্মীর প্রতীক। (iii) ধ্বংসপ্রাপ্ত। (iv) চতুর্ভুজ বিষ্ণু। দ্বারশীর্ষে পদ্ম। (v) গণেশ। শিখর-শীর্ষ লুপ্ত। (vi) মহামণ্ডপ, অর্ধমণ্ডপ, বারান্দা-সহ বৃহৎ মন্দির। মণ্ডপটি বৃহৎ পিড়া ধরণের। শিখর-গাত্রের পাথরে সূক্ষ্ম খোদাই কাজ ও ভাস্কর্য। পরে হয়তো পাড়া-র দশভূজা মন্দিরের মত পলেস্তারা প্রযুক্ত হয়। (vii) ক্ষুদ্র দেউল। (viii) বৃহৎ মহামণ্ডপসহ বৃহৎ মন্দির, শুধু শিখরগাত্রই অলংকৃত। (ix) ছোটো কিন্তু দেবীস্থানের কল্যাণেশ্বরীর ধাঁচে পিড়া দেউল। (x) বারান্দা, প্রবেশ-কক্ষ, মণ্ডপ ইত্যাদি সহ খাড়া ও চোখা শিখর-সম্পন্ন বৃহৎ মন্দির। (xi) দ্বারশীর্ষে গণেশ, কিন্তু গর্ভগৃহে আদিত্য মূর্তি-স্পষ্টতই পরে বসানো। ১নং মন্দিরের মত তবে ভগ্ন-শিখর। (xii) এবং (xiii) xi নম্বরের মতন।

এছাড়া আছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানসিক (Votive) মন্দির—ক্ষেত্রটি ব্রাহ্মণ্য না হলে এগুলি বৌদ্ধ মনে হত।

নদীর ধারে রয়েছে একটি অর্ধেক ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির যেটি হয়ত পরের বৃষ্টিতেই লোপ পাবে।

অন্যান্য গুচ্ছের মধ্যে নিকটতমটি দ্বারশীর্ষে গজলক্ষ্মী এবং শিখর-শীর্ষে বরাকব-ধরণের আমলক ও স্তূপিকা সহ পূর্ণ ও চমৎকারভাবে বর্তমান।

এর হাজার ফুট দক্ষিণে দ্বারশীর্ষে গজলক্ষ্মী সহ চতুর্ভুজ বিষ্ণু ও পৌনে এক মাইল দূরে রয়েছে নরসিংহ মন্দির। আরও দক্ষিণে বিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে তেলকুপির একমাত্র বৌদ্ধ-মন্দির, সামনে ইটের অতিবিশাল ঢিবির আকারে রয়েছে তার মঠটি—তবে এটি জৈনও হতে পারে কারণ দ্বারশীর্ষের প্রতীক-চিহ্নটি এত ক্ষয়ে গেছে যে চেনা যায় না।

নিকটে রয়েছে একটি সম্ভবত বৈষ্ণব-মন্দির—এর দ্বারটি ছোট ছোট ভাস্কর্যে সমৃদ্ধ—চারটি সারিতে রয়েছে মূর্তিগুলি, প্রথম সারিতে রয়েছে বিষ্ণুর দশাবতার-মূর্তি, পরে রয়েছে শ্মশ্রুধারী ঋষিদের একটি সারি এবং আরেক সারিতে আছে কতগুলি অশ্লীল মূর্তি।

তেলকুপিতে স্থানবিশেষে নানা মূর্তি এবং পাথর ও ইটের স্তূপ--মনে হয় ইট-নির্মিত সবক'টি মন্দিরই পড়ে গেছে।

মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছে পাথরের লহড়ার উপরে লহড়া সাজিয়ে ('কদলিকা-করণ', Corbelling)--একটি মাত্র পাথরের দেওয়ালে একটি 'true arch' বা মৌল খিলান আছে, ওটি মুসলমান বিজয়োত্তর কালের হতেও পারে।

ঐতিহ্য অনুসারে, মন্দিরগুলি নির্মাণ করেছিলেন বণিক মহাজনগণ এবং কোনো রাজা নন। এমনটিই সম্ভব, কারণ স্থানটির অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য-পথে।

নির্মলকুমার বসু : 'মানভূম জেলার মন্দির' (অংশ)

"মানভূমের সহিত কোনও সময়ে বোধ হয় দক্ষিণ মগধ ও উড়িষ্যার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

মানভূমে রাঢ়দেশের মতো গৌড়ীয় গঠনের মন্দির থাকিলেও উড়িষ্যা অথবা গয়া জেলার মতো অনেকগুলি মন্দির আছে। দামোদরের কূলে তেলকূপি বলিয়া যে স্থানটির উল্লেখ করা হইয়াছে সেখানে দশ-বারোটি বেশ পুরাতন মন্দির আছে। এগুলি উড়িষ্যার রেখ-জাতীয় দেউল। ইহাদের বাড় তিন অঙ্গে রচিত, অর্থাৎ তাহাতে কেবল পাভাগ, জাংঘ ও বরণ্ড আছে। সে হিসাবে ইহারা উড়িষ্যার পুরাতন রেখদেউলের সহিত একগোত্রে পড়ে, কিন্তু ইহাদের গঠন এত হাল্কা ধরনের ও গর্ভের সহিত অনুপাতে ইহাদের উচ্চতা এত বেশি যে, উড়িষ্যার বদলে গয়া জেলার কোঞ্চ, দেও প্রভৃতি স্থানের মন্দিরের সহিত এগুলিকে এক গোত্রে ফেলিতে হয়। কিন্তু পরবর্তী মন্দিরগুলির সহিত ইহার একটি প্রধান তফাৎ হইল আঁলার আকৃতিতে। তেলকূপির মন্দিরগুলির আঁলা গয়া জেলার আঁলা অপেক্ষা অনেক চেপ্টা ও অনেক বড়। তাহাতে তেলকূপির রেখদেউলগুলিকে একটি বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

তেলকূপির বাড় ও আঁলার সহিত যুক্ত ধ্বজা পুঁতিবার একটি পাথরের খাপেও আমরা উড়িষ্যার সহিত তাহার সম্বন্ধেব খানিকটা অভাব দেখি। উড়িষ্যার ত্রি-অঙ্গ-বাড়যুক্ত রেখদেউলে জাংঘে সচরাচর একটি শিখর বসানো থাকে, কিন্তু তৎপরিবর্তে তেলকূপির জাংঘে কতকগুলি থামের আকৃতি খোদাই করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ময়ূরভঞ্জের খিচিঙেও এই লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যায়। আঁলায় ধ্বজা পুঁতিবার জন্য খোপ তৈয়ারি করা রাজপুতানা, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশে খুব চলতি আছে। মানভূম একসময়ে জৈনধর্মের প্রভাব কিছু দেখিতে পাই।

যাহাই হউক, উড়িষ্যার প্রভাব যে তেলকূপিতে একেবারে পড়ে নাই তাহা বলা চলে না। তেলকূপিতে একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক রেখদেউল আছে। তাহার সহিত একটি ভদ্রদেউলও সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই ভদ্রদেউলের গঠনে শিল্পীরা এমন দু-একটি ভুল করিয়াছেন যাহাতে মনে হয় যে তাঁহারা ভদ্রদেউল গঠনে আনাড়ি ছিলেন। প্রথমত ভদ্রের পিঢ়াগুলি অসম্ভব-রকম বড় করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, তাহাদের গণ্ডীর উপরে ঘণ্টা না বসাইয়া সোজাসুজি একটি রেখমস্তক বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়ত, রেখদেউলটির তলজাংঘে বিরাল ও উপর-জাংঘে বন্ধকাম না দিয়া শিল্পীরা তল-জাংঘেই দুইটিকে গুঁজিয়া দিয়াছেন। সেখানেও আবার বিরাল উপরে ও বন্ধকাম নীচে রাখা হইয়াছে। এগুলি শিল্পাচারবিরুদ্ধ, অতএব উড়িষ্যার শিল্পে অনভিজ্ঞ লোকের তৈয়ারি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অথচ উড়িষ্যার সহিত তেলকূপির যে সম্বন্ধ ছিল তাহা বিরাল প্রভৃতি মূর্তির অস্তিত্বেই প্রমাণ কবিয়া দিতেছে।

উড়িষ্যাব সহিত তেলকূপির আরও একটি যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে তেলকূপিতে দামোদরের চড়ার উপর 'ছাতা-পরব' নামে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তখন বালির চড়ায় দুইটি বাঁশের বড় ছাতা পুঁতিয়া ফুলচন্দন দিয়া তাহাদের পূজা করা হয়। একটি স্থানীয় পঞ্চকোটের রাজার নামে ও অপরটি, আশ্চর্যের বিষয়, পুরীর 'গজপতি সিং'-এর নামে স্থাপন করা হয়। কত কাল পূর্বে এই দেশটি হয়তো পুরী-রাজের অধীন ছিল, আজ তাঁহার রাজত্ব পর্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অথচ তাঁহার নাম আজও একটি সুদূর পল্লিতে পূজিত হইয়া আসিতেছে।''*

* নির্মলকুমার বসু, 'নির্বাচিত রচনা : প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্য ও শিল্পকলা' সেন্টার ফর আর্কিয়োলজিক্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া, ২০০৬, পৃ: ৮৯-৯০।

মানভূমি-বর্ধমানের দেউলগুলি যে একাদশ শতকে উড়িষ্যার বা মূল কেন্দ্রের প্রভাব কাটিয়ে স্বকীয় আঞ্চলিক রূপ পরিগ্রহ করছিল Percy Brownও সেকথা বলেছেন : "Still more to the north the shrines in the Burdwan and Manbhum districts show more individuality in their design, the increased distance from the centre of the movement causing them to be less under the influence of the prêsent style. There are several examples of the phase at Barakar in Burdwan, and another at Telkupi in Manbhum presumed to date from the end of the Pal dynasty in Bengal in the 11th century. These buildings are more closely allied with the regioned style as it developed in Bengal."* —পার্সি ব্রাউন একাদশ শতকের কথা বলেছেন, কিন্তু আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে সপ্তম শতকীয় ক্রোশজুড়ি ও অষ্টম শতকীয় বরাকরের সিদ্ধেশ্বর শিবের দেউলের স্বকীয় ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট। পরে সাতদেউলিয়া ও জটার দেউলেও তাই-ই দেখা যায়।

১৩। (ক) **সোনাতপল, ওঁদা, বাঁকুড়া।** (খ) সূর্য (?)। (ঘ) সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত। বেগলারের সময়েই (১৮৭২-৭৩) মন্দিরটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ছিল—তিনি লিখেছেন যে corbelling (কদলিকাকরণ, রম্ভা তরু) পদ্ধতিতে নির্মিত এই মন্দিরের ইটগুলি অপরূপ ভাবে খোদাই করা হয়েছিল এবং তা পরে সংযোজিত নয় (প্রাগুক্ত 'Report', p. 201) কিন্তু তা এখন বোঝাব উপায় নেই। উচ্চতা আনু. ৬০ ফুট। (ঙ) একাদশ শতক। (চ) বাঁকুড়ার গোবিন্দনগর বাসস্ট্যাণ্ডের বাইরে থেকে ওঁদা-গামী ট্রেকারে ফটক—এখান থেকে রেললাইন-পেরিয়ে ২১/২ কি.মি. সোজা হাঁটা। পরের স্টপ ভেদুয়াশোল থেকে রিক্সা মেলে।

১৪। (ক) **অম্বিকানগর, রানীবাঁধ, বাঁকুড়া।** (খ) বর্তমানে শিব। আদিতে সম্ভবত জৈন। গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ ছাড়াও জৈন ঋষভনাথ মূর্তি। (ঘ) অতি জীর্ণ ও ক্ষুদ্র (আনু. ১৪/১৫ ফুট উচ্চতা) প্রস্তর-দেউল। (ঙ) একাদশ-শতক। (চ) খাতরা বা মুকুটমণিপুর থেকে ট্রেকারে (বাস ও আছে) সহজেই অম্বিকানগর—আম্বিকার বিখ্যাত মন্দিরের পিছনে। স্থানটি প্রখ্যাত জৈনকেন্দ্র পরেশনাথের লাগোয়া, অম্বিকাও হয়ত আদিতে জৈন দেবী।

১৫। (ক) **আটবাইচণ্ডী (চোংরাবাঁধ পাড়া), ইন্দপুর, বাঁকুড়া।** (খ) বাসুলী ও শিব। (ঘ) একই ক্ষেত্রে দুটি ২০/২২ ফুট উঁচু নিরলংকার প্রস্তর দেউল। (ঙ) একাদশ শতক। (চ) বাঁকুড়া-ইন্দপুর-খাতরা বাসে বাংলা—এখান থেকে রিক্সায় ধরমপুর, বাউরীশোল, আলখাড়া প্রভৃতি গ্রাম অতিক্রম করে ৮/৯ কি.মি.। **প্রাসঙ্গিকী** : পাশের আটবাইচণ্ডী পাড়া পেরিয়ে চাষমাঠের ধারে গাছপালার নিচে তিন ফুট পাথরে খোদিত অস্থিসার, কোটরগত উদর, বুকের হাড়গুলি উঠে আসা দেহ, কঙ্কাল-বদন ও কোটরগত চক্ষু বিশিষ্ট, দশভূজা, খড়গ ও ত্রিশূলধারিণী, কণ্ঠে মুণ্ডমালা, হাতে নরমুণ্ড এবং পদতলে ভৈরব বিশিষ্ট আটবাইচণ্ডী মূর্তি শিহরণ জাগায়। বর্তমানে

* Percy Brown, 'Indian Architecture, Buddhist and Hindu Period, Bombay, 1959, pp 109—পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক 'পুরুলিয়া জেলার পুরাকীর্তি', অণিমা প্রকাশনী ২০০৬-এর পৃ: ৬৮-তে উদ্ধৃত।

লোকদেবী রূপে বিপুল মান্য হলেও এটি দেখে আমাদের ভুবনেশ্বরের বৈতল দেউলের অতি ভয়ংকরী চামুণ্ডা-মূর্তি মনে পড়েছিল। বর্ধমানের কঙ্কালেশ্বরীর এমন ভয়াবহতা নেই।

১৬। (ক) **পাকবিড়রা, পুঞ্চা, পুরুলিয়া**। (খ) জৈন, (ঘ) বর্তমানে তিনটি রেখ দেউল বর্তমান। তিনটিই পাথরের। দুটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। দুটি দেউলেরই বেশ কয়েক ফুট (চৈত্য কুলুঙ্গির তলদেশ পর্যন্ত) মাটিতে বসে গেছে। তথাপি বোঝা যায় দুটি দেউলই ত্রিরথ। আমলক লুপ্ত, কিন্তু পদ্মকুঁড়ি বেড়িয়ে আসা পাথরের কলসটি বর্তমান। ক্ষেত্রে এমন কয়েকটি কলস ও আমলক রক্ষিত আছে। নাগর-দেউল। প্রবেশপথ ত্রিকোণ। ছোট বা তৃতীয় দেউলটি একই রীতির। (ঙ) একাদশ শতক (ডঃ শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পঠিত লিপির ভাষা হতে অনুমান—পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত. পৃঃ ৭৭-৭৮)। (চ) পুরুলিয়া থেকে বাসে। পুঞ্চা থানা/ডাঙ্গা স্টপেজে নেমে হেঁটে।

প্রাসঙ্গিকী

পাকবিড়্যার এখন মাত্র তিনটি দেউল থাকলেও আদিতে ছিল অনেক বেশি। বেগলারের ১৮৭২-৭৩-এর বিবরণীটি তাই স্থানটির গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য অপরিহার্য :

পাকবিড়রা—বেগলারের প্রতিবেদনের সারাংশ*

(i) অনেক (মুখ্যত জৈন) মন্দির ও মূর্তি, মূর্তিগুলির মধ্যে প্রধান হল একটি অতি বিশাল নগ্ন মূর্তি ৭½ ফুট, যার বেদীতে পদ্ম চিহ্ন আছে। মূর্তিটি যে মন্দিরে পূজিত হত তার শুধু ভিৎটুকু আছে—পশ্চিমমুখী মন্দিরটি অবশ্যই অতি বিশাল ছিল।

(ii) একটি মাত্র ইটের মন্দির দাঁড়িয়ে আছে, এটি উল্লেখযোগ্যভাবে সাদা-সিধে।

(iii) এর উত্তরে এক সারিতে চারটি পাথরের মন্দির, একটি ভগ্ন, বাকি তিনটি দাঁড়িয়ে আছে।

(iv) এর উত্তরে পাঁচটি মন্দির এর দুটি পাথরের ও তিনটি ইটের—ইটের মন্দির তিনটি ধ্বংসপ্রাপ্ত, পাথরের মন্দিরদুটির একটি দাঁড়িয়ে আছে।

(v) এব উত্তরে তিনটি পাথরের ও একটি ইটের মন্দির—সব কটিই ধ্বংসপ্রাপ্ত।

(vi) দণ্ডায়মান ইটের মন্দিরের পূর্ব দিকে দুটি ঢিবি—দুটি ইটের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

(vii) এর দক্ষিণে তিনটি পাথরের মন্দির—সব কটি ধ্বংস প্রাপ্ত।

পাথরের মন্দিরগুলির অলংকরণ নিম্নাংশের বন্ধন (mouldings)-এ সীমাবদ্ধ। এগুলি এক কক্ষ মন্দির, সামনে কোনো মুখমণ্ডপ ছিল না।

সুতরাং বেগলার ১৮৭২-৭৩-এ পাকবিড়রায় ২০টি মন্দির দেখে ছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে তখন মাত্র পাঁচটি দাঁড়িয়ে ছিল।

পাকবিড়রার মন্দিরক্ষেত্রে প্রবেশের মুখেই একটি বেদীতে বেগলার-কথিত ৭½ ফুট উচ্চতার দণ্ডায়মান তীর্থংকর (ষষ্ঠ তীর্থংকর পদ্মপ্রভা)-মূর্তিটি স্থাপিত আছে। স্থানীয় মানুষেরা এঁকে

* প্রাগুক্ত 'Report', pp. 193-95

লৌকিক দেবতা ভীরম-রূপে পূজা করেন। মন্দির নির্মাণের চেষ্টা চলছে। ক্ষেত্রের একটি পাকা ঘরে অনেকগুলি পাথরের মূর্তি রক্ষিত আছে—এগুলি হয়ত ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরগুলিতে ছিল। একই সঙ্গে আছে কয়েকটি পাথরের ক্ষুদ্র উৎসর্গ (votive) মন্দির। —এছাড়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে প্রথম দেউলটির পাশে রক্ষিত আছে জৈন তীর্থংকরগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তি-খোদিত একটি আয়তাকার বড় প্রস্তর ফলক। দ্বিতীয় মন্দিরের দেওয়ালে আছে একটি জৈন তীর্থংকর মূর্তি।

১৭। (ক) **ময়নাপুর (বাজার), জয়পুর, বাঁকুড়া।** (খ) হাকন্দ (এখন শিব), (ঘ) পাথরের দেউল। অতি জীর্ণ। (ঙ) দ্বাদশ শতক। (চ) বিষ্ণুপুর বা জয়রামবাটি থেকে বাসে সরাসরি। **প্রাসঙ্গিকী** লোক-ঐতিহ্য অনুসারে ময়নাপুর 'শূণ্যপুরাণ'-রচয়িতা রামাই পণ্ডিতের জন্মস্থান। মন্দিরের পাশের হাকন্দ দীঘির ধারেই নাকি রঞ্জাবতী-পুত্র লাউসেন নিজের দেহকে নয় খণ্ড করে কেটে ধর্মঠাকুরের পূজা করেছিলেন—''দিবস দ্বাদশ দণ্ডে/হাকন্দতে নব খণ্ডে/হবে যবে রঞ্জার তনয়'' ('ধর্মমঙ্গল', ঘনরাম চক্রবর্তী)।

১৮। (ক) **ডাইনটিকরি, বীণপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) পরিত্যক্ত মন্দির—রঙ্কিনী (?)। (ঘ) পঞ্চরথ 'পিড়া' দেউল। (ঙ) দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক। (চ) মেদিনীপুর শহর থেকে বাসে লালগড়ে গিয়ে ভ্যান রিক্সায়।

১৯। (ক) **জৌগ্রাম, জামালপুর, বর্ধমান।** (খ) জলেশ্বরনাথ শিব। (ঘ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চ। নাটমন্দির গত শতকে যুক্ত। মন্দিরের পিছনে ন্যাংটা বাবা নামে একজন তান্ত্রিক সাধুর চার-চালা সমাজ আছে। (ঙ) প্রাক-মুসলিম—বহুল সংস্কৃত। (চ) হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের জৌগ্রাম স্টেশন থেকে সহজে হেঁটে।

২০। (ক) **বলরামপুর, পুরুলিয়া।** (খ) বিগ্রহ নেই। (ঘ) বৃহৎ রেখ দেউল। রথগুলি উঁচু ও স্পষ্ট। গাত্র মসৃণ ও নিরলংকার, তবে কেন্দ্রীয় ও কোণের রথগুলির নিম্নাংশে রেখ শিখরের অনুকৃতি। (ঙ) ১৩/১৪ শতক। (চ) পুরুলিয়া থেকে বাসে/ট্রেনে। ৩২ কি.মি.।

২১। (ক) **বান্দা (দেউলঘেরা), রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া।** (খ) বিগ্রহ নেই। (ঘ) পাথরের দেউল। ত্রিরথ। **বেগলারের বিশ্লেষণ** : বরাকরেব মন্দিরগুচ্ছের মতই মন্দিরটি বাহুল্যবর্জিত, বরাকরের মতই মন্দিরটির সামনে মহামণ্ডপ ছিল. প্রকৃতপক্ষে স্তম্ভধৃত দীর্ঘ মণ্ডপের চিহ্ন এখনো আছে—কিন্তু পার্থক্যও আছে অনেক দিক থেকে : মন্দিরটির সম্মুখভাবে রয়েছে বন্ধনার ত্রিস্তর রন্ধ্র; প্রথম বা সবচেয়ে নিচেরটি চতুরস্র গর্ভগৃহের পথের উপরের সমতল ছাদ, এর উপরে অপেক্ষাকৃত ছোট রন্ধ্র ও একটি ছোট কক্ষ যার মেঝে হল গর্ভগৃহের ছাদ, এর উপরে রয়েছে আর একটি ছোট কক্ষ। ছাদের উপরে ছাদ। যেহেতু এগুলি আদি পরিকল্পনারই অংশ, পরবর্তী সংযোজন (যেমন মেরামতির ফলে বুদ্ধগয়াতে) নয়, সেহেতু এগুলি গবাক্ষ নয় বা কোনোকালে তা ছিলও না। মগধ শ্রেণির মন্দিরগুলির সঙ্গে বান্দার দেউলটির স্থাপত্যের এই পার্থক্য গভীর।* —কেন্দ্রীয় উদ্গত রেখা-বরাবর খোদিত জাফরি মুসলিম প্রভাবের ইঙ্গিত দেয়। আমলক বর্তমান। (ঙ) ১৪ শতক। (চ) পুরুলিয়া থেকে বাসে চেলিয়ামা—

প্রাগুক্ত 'Report', p. 168

গ্রামে ঢোকা প্রথম রাস্তা ধরে প্রবেশ করে বাজার পেরিয়ে ক্রমাগত ডানে একটা মাঠ, মোরাম রাস্তা, একটা বাঁধ পেরিয়ে চলা-পথে, গাছপালার মধ্যে ফাঁকা জায়গায়। প্রসঙ্গত, পাড়া চেলিয়ামার আগে—একই বাসপথে।

২২ (ক) **ডিহর, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া**। (খ) ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর শিব। (গ) বিষ্ণুপুররাজ পৃথ্বী মল্ল। (ঘ) দুটি মন্দিরেরই 'গণ্ডী' বা শিখর অবলুপ্ত—'বাড়' বা দেওয়াল ষাঁড়েশ্বরের আন্দাজ ১৯ ফুট এবং শেলেশ্বরের আন্দাজ ১৫/১৬ ফুট উচ্চ। পুরাতত্ত্ব বিভাগ এর উপরে সমতল ছাদ যুক্ত করেছেন। 'গণ্ডী' না থাকলেও বাড়ের নিম্নাংশে 'রেখ' দেউলের অনুকৃতি হতে বোঝা যায় যে মন্দিরদুটি আদিতে 'রেখ' দেউলই ছিল। (ঙ) ১৩৪৬। (চ) বিষ্ণুপুর-সোনামুখী বাসে ৯কি.মি. দূরের ধানগড়া বা ১০ কি.মি. দূরের বেলিয়াড়া থেকে সহজে হেঁটে—বেলিয়াড়া থেকে সামান্যই হাঁটা।

প্রাসঙ্গিকী ডিহর বাঁকুড়ার পবিত্রতম শৈবতীর্থগুলির একটি। 'দ্বি-হর' (অর্থাৎ দুই হর বা শিব) থেকে 'ডিহর' নামটি হয়েছে, কেউ কেউ এমন ভাবেন। দ্বারকেশ্বরের শুষ্ক খাত কানা নদীর ধারে ঢিবির উপরে অবস্থিত ডিহরে উৎখননের ফলে তাম্রাশ্মীয় যুগ থেকে লৌহ যুগের সূচনাকাল পর্যন্ত সভ্যতার ধারাবাহিক নিদর্শন মিলেছে।* "ডিহর থেকে কুষাণ যুগের টেরাকোটা মূর্তি, ধূসর রঙের গোলাকার মৃৎপাত্র, অসংখ্য মাল্যদানা, অসংখ্য তাম্রমুদ্রা, কয়েকটি গোলাকার রূপার মুদ্রা সহ বহু কৌলাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখার অধীন যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি পুরাকীর্তি ভবনে রক্ষিত আছে।"**

২৩। (ক) **গাড়ুই, আসানসোল, বর্ধমান**। (খ) বিষ্ণু (শালগ্রাম)। (ঘ) এই মন্দির প্রাঙ্গণে একটি বোর্ডে লিখিত আছে : "আনুমানিক চতুর্দশ শতকে নির্মিত এই ভগ্নপ্রায় প্রস্তর দেউলটি প্রবেশদ্বারের প্রলম্বিত ভারবাহী খিলানের জন্য বৈচিত্র মণ্ডিত।—ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ, কলকাতা মণ্ডল"। কিন্তু দেখে আমাদের মনে হয়েছে ঐ সর্বেক্ষণের সংস্কারে মন্দিরটির আকৃতি বদল হয়ে প্রকৃতপক্ষে এটি এখন চারচালায় পরিণত হয়েছে। (ঙ) ১৪ শতক। (চ) আসানসোল-চিত্তরঞ্জন বাইপাসের বাসে গাড়ুই স্টপেজ হতে অপর দিকের গলিরাস্তায় সামান্য গিয়ে।

২৪। (ক) **আড়া, দুর্গাপুর, বর্ধমান**। (খ) রাঢ়েশ্বব শিব। (ঘ) পাথরে নির্মিত, পিড়া ধরণের, উচ্চতা আনু. ৪০ ফুট। (ঙ) ১৫ শতকেব শুরুতে (?)। (চ) দুর্গাপুর থেকে সরাসরি বাসে।

২৫। (ক) **বরাকর (বেগুনিয়া), কুলটি, বর্ধমান**। (খ) মন্দির সংখ্যক ৩। (১ এবং ২নং মন্দির জোড়া দেউল শীর্ষকে পঞ্জিকৃত)। (ঘ) উচ্চতা আনু. ৪০/৪৫ ফুট। পাথর-খোদাই শিল্পে সজ্জিত। (ঙ) ১৫ শতক। (চ) ক্রম ২ দেখুন।

২৬। (ক) **খুদিকা, সালানপুর, বর্ধমান**। (খ) পরিত্যক্ত দেউল—এখন শিব। (ঘ) আনু.

* 'Indian Archaeology : A review : 1983-84' হতে 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা' ১৪০৯-এর পৃ: ৩১-এ গৌরপদ সেন কর্তৃক উদ্ধৃত।

** 'পশ্চিমবঙ্গ'-ঐ। গৌরপদ সেন, 'বাঁকুড়ার জনজীবনের কয়েকটি দিক', পৃ: ৩২।

২৫ ফুট উচ্চতার পাথরের দেউল। অতি কৃশ, চোখা, খাড়া। (ঙ) ১৫ শতক। (চ) আসানসোল-চিত্তরঞ্জন বাসপথের সালানপুর মোড় থেকে ঢুকে সালানপুর রেলস্টেশানকে বাঁয়ে রেখে রেললাইন পেরুনো রাস্তায় কিছু গিয়ে ডানে।

২৭। (ক) **কুঁয়াই (নেড়াদেউল/তলকুঁয়াই), কেশপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর।** (খ) কামেশ্বর শিব। (ঘ) পাথরে নির্মিত। সপ্তরথ। পিড়া রীতির জগমোহন ও অন্তরাল। উচ্চতা আনু. ৪০ ফুট। ওড়িশী রীতি। (ঙ) ১৫/১৬ শতক। (চ) মেদিনীপুর-চন্দ্রকোণা টাউন বাসে নেড়াদেউল স্টপেজ।

প্রাসঙ্গিকী

"কামেশ্বর লিঙ্গ বন্দোঁ কোঙাই নগরে।
চন্দ্রকোণায় গড়পতি বন্দোঁ মালেশ্বরে।।"

—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।*

মুকুন্দরাম কর্তৃক 'চণ্ডীমঙ্গল' রচনা সমাপ্ত হয়েছিল মানসিংহের কালে (১৫৯৪-১৬০৬), তখনই কুঁয়াই 'নগর' এবং 'কামেশ্বর' বিখ্যাত। ধরে নেওয়া চলে যে এর পূর্ববর্তী একশত বৎসরের মধ্যে কোনো এক সময় দেউলটি নির্মিত হয়েছিল। স্মরণীয়, যে গড় আড়ড়ায় মুকুন্দরাম আশ্রয় পেয়েছিলেন, তা কুঁয়াই থেকে বেশি দূরে নয়।

মন্দিরের সামনের চত্বরে পাথরের বৃষ ও হাতি ছাড়াও একটি বৃহৎ আমলক পড়ে থাকতে দেখা যায়। আমলকটি পড়ে গিয়েই নাকি মন্দিরটি নেড়া হয়ে যায়—তাই এটি 'নেড়াদেউল'।

২৮। (ক) **সহস্রলিঙ্গ (সন্তনি), নয়াগ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) সহস্রলিঙ্গ শিব—বৃহৎ লিঙ্গগাত্রে গোল করে প্রতি থাকে ১০০টি করে দশ থাকে ১০০০টি শিবলিঙ্গ খোদিত। (ঘ) পাথরে নির্মিত আনু. ৫০ ফুট উচ্চতার ওড়িশী-রীতির দেউল। 'পিড়া' জগমোহন। (ঙ) ১৬ শতক। (চ) ঝাড়গ্রাম থেকে ধামসাইগামী বাসে খুরিকা-মাথানী, এখান থেকে ভ্যান-রিক্সায়। অরণ্য-ঘেষে অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে পথ ও মন্দির। পরের স্টপ বালিগেরিয়াতে ভ্যান-রিক্সা মিলতেও পারে, এরপরের স্টপ পলাশিয়া থেকে দূরত্ব কম (৩/৩১/২ কি.মি.) কিন্তু হাঁটতেই হবে। এখান থেকে উড়িষ্যা খুবই কাছে।

২৯। (ক) **কেদার, ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) কেদারেশ্বর বা চপলেশ্বর শিব। (ঘ) পাথরে নির্মিত। পঞ্চরথ। পিড়া জগমোহন, চালা নাটমণ্ডপ। ওড়িশী-প্রভাবিত। উচ্চতা আনু. ৩০ ফুট। (ঙ) ১৬ শতক। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বালিচক থেকে বাসে/ ট্রেকারে।

৩০। (ক) **এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর।** (খ) হটনাগর শিব। (ঘ) সপ্তরথ। উচ্চতা আনু. ৫০ ফুট। পিড়া জগমোহন। খোলা বারদুয়ারী। চত্বরে প্রবেশদ্বার একরত্ন। (ঙ) ১৬ শতক। (চ) হাওড়া, খড়গপুর, মেছেদা বা কাঁথি থেকে বাসে এগরা, এরপর সহজে হেঁটে।

৩১। (ক) **দাঁতন (মন্দিরবাজার), মেদিনীপুর।** (খ) শ্যামলেশ্বর শিব। (ঘ) মাকড়া পাথরে

* 'চণ্ডীমঙ্গল' ('দিগ্‌দেবতাবন্দনা'), স. পঞ্চানন মণ্ডল, 'ভারবি', ১৯৯২ পৃ: ৪।)

নির্মিত। পঞ্চরথ, পিড়া। উচ্চতা আনু. ১৫/১৬ ফুট। জগমোহনগাত্রে বিষ্ণুর অনন্ত শয়ান-মূর্তি খোদিত। (ঙ) ১৬ শতক। (চ) খড়্গপুর থেকে বাসে দাঁতন। সহজে হেঁটে।

৩২। (ক) **সাঁকোয়া (হাটপাড়া), খড়্গপুর লোকাল, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) চন্দনেশ্বর শিব। (ঘ) পাথরে নির্মিত। চারস্তর পিড়া দেউল ও পিড়া জগমোহন। উচ্চতা, আনু. ৩০ ফুট। (ঙ) ১৬ শতক। (চ) খড়্গপুর থেকে বেলদামুখী বাসে বেনাপুর—এখান থেকে রিক্সায় টানা ৫ কি. মি.।

৩৩। (ক) **এক্তেশ্বর, বাঁকুড়া।** (খ) এক্তেশ্বর শিব—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে শাস্ত্রীয় 'একপাদেশ্বর' থেকে 'এক্তেশ্বর'*। (ঘ) পাথরে নির্মিত (উচ্চতা আনু. ৪৫ ফুট)। দৃশ্যত পিড়া মনে হলেও 'বাড়'-এ রেখ মন্দিরের অনুকৃতি দেখে মনে হয় আদিতে বৃহৎ রেখ দেউল ছিল। বৃহৎ মন্দির-ক্ষেত্রে গৌণ মন্দির ও কটি প্রস্তর-মূর্তি। (ঙ) ১৬ শতক। (চ) বাঁকুড়ার গোবিন্দনগর স্ট্যাণ্ড থেকে ট্রেকারে (বাসও আছে)। এক্তেশ্বর বাঁকুড়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শৈবতীর্থ।

প্রাসঙ্গিকী

এক্তেশ্বর-সম্পর্কে আচার্য বিনয় ঘোষের অসামান্য আলোচনার (প্রথম প্রকাশ: ১৯৫৭) শেষাংশ উদ্ধৃত হল : ''কিংবদন্তী হল, সামন্তভূমের রাজার সঙ্গে মল্লভূম-বিষ্ণুপুরের রাজার একবার প্রচণ্ড বিরোধ হয়, রাজ্যের সীমানা নিয়ে। বিরোধের মীমাংসা করেন স্বয়ং শিব এবং তখন উভয়ের নির্দিষ্ট সীমানার উপর এক্তেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত হন। 'এক্তেশ্বর' কি তাহলে মল্লভূম ও সামন্তভূমের রাজাদের পরস্পরের রাজ্যের এক্তিয়ারের অভিবাবক ও ঈশ্বর, তাই এক্তেশ্বর? ...

এক্তেশ্বর বেশ প্রাচীন শৈবতীর্থ। এক্তেশ্বর শিবের গাজন ও মেলাও বহুকালের প্রাচীন। ও'মালি সাহেব যখন বাঁকুড়া জেলার গেজেটিয়ার সঙ্কলন করেন, বছর সত্তর আগে, তখন তদানীন্তন বাঁকুড়ার কলেক্টর কুমার রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেব তাঁকে এক্তেশ্বর গাজনের একটি বিবরণ লিখে পাঠান। বিবরণটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। সত্তর বছর আগেও এক্তেশ্বরে মহাসমারোহে শিবের গাজন ও মেলা হত। চড়ক-উৎসবে বিভিন্ন রকমের বাণফোঁড়া হত, তার মধ্যে পিঠবাণও ছিল। ভক্ত্যারা পিঠে লোহার বড়শী বিঁধে শালের চড়কগাছে পাক খেতেন, আর নিচে থেকে শিবশঙ্কর ধ্বনি দিতেন অন্যান্য ভক্ত্যারা। আজকাল বেআইনি বলে পিঠে বাণ ফুঁড়ে উৎসব করা বন্ধ হয়েছে। আর-একটি বিচিত্র উৎসবের কথা রমেন্দ্রকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন। গাজনের দিন রাতে জ্বলন্ত চিতার মতো আগুন জ্বালিয়ে ভক্ত্যারা উৎসব করত এক্তেশ্বরে। উৎসবের নাম 'সতীদাহ' উৎসব। সতীদাহের প্রচলন যে একসময় কি ব্যাপকভাবে হয়েছিল এ অঞ্চলে, তা গাজনের উৎসবের সঙ্গে 'সতীদাহ' উৎসবের এই অনুকরণ-অভিনয় দেখেই বোঝা যায়। বিচিত্র সংস্কৃতি-সংমিশ্রণের নিদর্শন।

এক্তেশ্বরের মন্দিরটি সবচেয়ে বিস্ময়কর। বাংলা দেশে ঠিক এই ধরনের মন্দির আর দ্বিতীয়টি আছে কি না, আমার জানা নেই। মনে হয় নেই। ১৮৭২-৭৩ সালের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের রিপোর্টে বেগলার সাহের এক্তেশ্বর মন্দির সম্পর্কে লেখেন :

---

* 'প. বঙ্গের সংস্কৃতি'—১, পৃ: ৩৬৬

The temple is remarkable in its way; the mouldings of the basement are the boldest and finest of any I have seen, though quite plain. The temple was built of laterite. (Report of a Tour through the Bengal Provinces : Beglar : A. S. I. Report, 1872-73).

প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগে বেগলার যখন বাংলাদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সন্ধানের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন এক্তেশ্বর মন্দির দেখেছিলেন। মন্দিরটি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল যে অন্তত পূর্বে তিনবার মন্দিরটি সংস্কার করা হয়েছে। মন্দিরের শিখরের উর্ধ্বাংশ ভেঙে পড়ে গিয়েছে বলে তাঁর মনে হয়। আজও তাই মনে হয়। এরকম বিশাল স্তম্ভের মতো মন্দির বাংলায় দেখা যায় না। মন্দিরগাত্রের উদ্‌গত অংশগুলি দেখে মনে হয়, যখন সম্পূর্ণ শিখরটি ছিল, তখন মন্দিরটির উচ্চতাও ছিল যথেষ্ট। এক্তেশ্বর মন্দির 'বাংলা মন্দির' নয়। রেখদেউলের প্রতিটি অংশের বর্ধিত রূপ তার মধ্যে স্পষ্ট, কেবল শিখরশূন্য বলে রূপটি যেন অর্ধসমাপ্ত। মন্দিরের গায়ে কোনো কারুকাজ নেই, কিন্তু ছোট ছোট দেউলের মণ্ডিত রূপের নক্‌শা আছে। সংস্কারের সময় মন্দিরের আসল রূপটির দিকে যে বিশেষ নজর দেওয়া হয়নি, তারও প্রমাণ আছে। কিন্তু তাহলেও এক্তেশ্বরের মন্দিরটি বিস্ময়কর, কারণ মন্দিরের এরকম ভারি নিরেট গড়ন আর কোথাও দেখা যায় না। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন পাহাড়ের গা থেকে খোদাই করা শিলামন্দিরের মতো এক্তেশ্বরের মন্দিরটি বাঁকুড়ার দ্বারকেশ্বর নদের তীরে ঠেলে উঠেছে।"*

৩৪। (ক) **গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) কঙরেশ্বর শিব। (ঘ) পাথরে নির্মিত, পিড়া (উচ্চতা আনু. ১৭ ফুট)। (ঙ) ১৬ শতক। (চ) মেদিনীপুর শহর বা বিষ্ণুপুর থেকে বাসে— এখানকার সর্বপরিচিত সর্বমঙ্গলা-ক্ষেত্রে।

৩৫। (ক) ঐ। (খ) সর্বমঙ্গলা। (গ) কিংবদন্তি অনুসারে : বগড়ী-রাজ গজপতি সিংহ। (ঘ) পাথরে নির্মিত ওড়িশী ধারার রেখ দেউল, পিড়া জগমোহন। চারচালা নাটমণ্ডপ পরে সংযোজিত। উচ্চতা আনু. ৪৬/৪৭ ফুট। সামান্য নকাশী অলংকরণ। (ঙ) ১৬ শতক। (চ) ঐ।

প্রাসঙ্গিকী

(i) গড়বেতা বগড়ীর রাজাদের রাজধানী ছিল, কিন্তু 'আইন-ই-আকবরী'তে একে উড়িষ্যার জলেশ্বরের অন্তর্ভুক্ত দেখানো হয়েছে। মনে হয় ষোড়শ শতকের কোনো এক সময়ে উড়িষ্যার রাজারা এখানে আধিপত্য বিস্তার করেন। পরে বিষ্ণুপুররাজ দুর্জন সিংহ গড়বেতা অধিকার করেন।

(ii) বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য গড়বেতায় উড়িষ্যা, বিষ্ণুপুর ও মানভূম—তিন জায়গারই সাংস্কৃতিক প্রভাব পড়েছে।

(iii) সর্বমঙ্গলার ভয়ংকরী মূর্তি দেখে কেউ ভাবেন যে ওটি বৌদ্ধ-তান্ত্রিক মূর্তি, আবার কেউ ভাবেন যে আদিতে সর্বমঙ্গলা রঙ্কিনী বা চম্‌কিনীর মত ভয়ংকরী বনদেবী ছিলেন।

৩৬। (ক) **দেউলবাড়, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর।** (খ) জগন্নাথ। (ঘ) আনু. ৪০ ফুট

---

* ঐ পৃ: ৩৬৭-৬৮

উচ্চতার ওড়িশী 'রেখ', পিড়া জগমোহন, সামান্য টেরাকোটা। (ঙ) ১৬ শতক। (চ) খড়গপুর শাখার মেছেদা থেকে কাঁথির বাসে মরিশদা—এখান থেকে ভ্যানরিক্সা (৫ কি.মি.)।

৩৭। (ক) **দেউলবাড়, নয়াগ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) রামেশ্বরনাথ। (গ) জনশ্রুতি অনুসারে চন্দ্ররেখাগড়ের রাজা চন্দ্রকেতু। (ঘ) পাথরে নির্মিত ওড়িশী সপ্তরথ রেখ, পিড়া জগমোহন ও নাটমন্দির। (ঙ) ১৬ শতক—১৫৮৪? (চ) ঝাড়গ্রাম-নয়াগ্রাম বাসে ধনকামরা, এখান থেকে নিজ-ব্যবস্থায় (১২ কি.মি.)।

৩৮। (ক) **দেউলী, নারায়ণগড়, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) যোগী দেউল—পরিত্যক্ত। (ঘ) ত্রিরথ পিড়া (উচ্চতা আনু. ১৫ ফুট), প্রস্তর-দেউল। (ঙ) ১৬ শতক। (চ) খড়গপুর থেকে বাসে বেলদা, এরপর রিক্সায়।

৩৯। (ক) **বৈদ্যপুর, কালনা, বর্ধমান।** (খ) কৃষ্ণ (?) (ঘ) রেখ দেউল (উচ্চতা আনু. ২০/২২ ফুট) ও রেখ জগমোহন (উচ্চতা আনু. ১২/১৬ ফুট)। উৎকৃষ্ট টেরাকোটা। (ঙ) ১৬ শতক। (চ) হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনের বৈঁচি স্টেশন থেকে কালনার বাসে বৈদ্যপুর—এখানে বৃন্দাবনচন্দ্রের বিখ্যাত মন্দির ও রাসমঞ্চকে বাঁয়ে রেখে ডানে ঘুরলে..।

৪০। (ক) **গৌরাঙ্গপুর, কাঁকসা, বর্ধমান।** (খ) ইছাই ঘোষের দেউল। (ঘ) আনু. ৭০ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। কিছু ইঁট খোদাই কাজ। কুলুঙ্গিতে টেরাকোটা ভাস্কর্য। (ঙ) ১৬ শতক (?)। (চ) বোলপুর, ইলামবাজার বা পানাগড় থেকে বাসে '১১ মাইল' স্টপেজ—এখান থেকে রিক্সায় বনকাটি-অযোধ্যা পেরিয়ে বেশ কয়েক কি.মি.। শীত-গ্রীষ্মে জয়দেব-কেঁন্দুলি থেকে অজয় নদ পেরিয়ে সহজে যাওয়া চলে।

প্রাসঙ্গিকী

(i) ইছাই ঘোষের সময়ের কম করে সাতশো বছর পরে কেউ দেউলটি নির্মাণ করান। স্থানটি ইছাই ঘোষের গড় রূপে খ্যাত 'ত্রিষষ্ঠীর গড়ে'র খুব নিকটে বলেই হয়ত কালে কালে দেউলটি ইছাই ঘোষের নামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে গেছে। প্রকৃত পক্ষে অজয়ের অন্য পাড়ে 'লাউসেন তলা'ও আছে।

(ii) ইছাই ঘোষ 'ধর্মমঙ্গলের' অন্যতম প্রধান চরিত্র। কাহিনীর রূপরেখা এই রকম : ধর্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বর হয়ে সোম ঘোষকে তাঁর সামন্ত কর্ণসেনকে সাহায্য করার জন্য পাঠান। কিন্তু সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ দুর্দান্ত হয়ে উঠে কর্ণসেনের ছয় পুত্রকে হত্যা করে 'ত্রিষষ্ঠীর গড়' অধিকার করেন। কর্ণসেন ভগ্ন-হৃদয়ে গৌড়ে ফিরে আসেন। ব্যথিত গৌড়েশ্বর কৌশলে শ্যালক মহামদকে আসামে পাঠিয়ে শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিয়ে দেন। মহামদ ফিরে এসে বৃদ্ধ কর্ণসেনের সঙ্গে ভগ্নীর বিয়েতে ঘোর অসন্তুষ্ট হয়ে নানা বিপত্তি ঘটাতে থাকেন। শেষে তিনি একদিন প্রকাশ্য রাজসভায় কর্ণসেনকে আঁটকুড়ে ও রঞ্জাবতীকে বন্ধ্যা বলেন। তখন রামাই পণ্ডিতের উপদেশে রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করলে রঞ্জাবতী লাউসেন নামে প্রচণ্ড শক্তিধর পুত্রলাভ করেন। লাউসেন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে গৌড়েশ্বরের আদেশে রাজসৈন্য সহকারে যুদ্ধযাত্রা করে ইছাই ঘোষকে পরাজিত ও নিহত করেন। এই যুদ্ধে দুর্গা ইছাই ঘোষের ও ধর্মঠাকুর লাউসেনের পক্ষে ছিলেন।

(iii) **ইতিহাসের ইঙ্গিত : অধ্যাপক হিতেশরঞ্জন সান্যালের বিশ্লেষণ** :*

দুর্গার বর ছিল এই যে, ইছাই ঘোষের মাথা কাটলে আবার জোড়া লেগে যাবে। লাউসেন কয়েকবার ইছাই ঘোষের মাথা কাটলেও তাই কিছু হল না। তখন অন্য দেবতারা নানা কৌশল করতে থাকলেন—একবার হনুমান ইছাই ঘোষের কাটা মাথা নিয়ে পাতালেও পালিয়ে গেলেন। শেষে দুর্গা লাউসেনকে বধ করার জন্য নিজেই যুদ্ধে নামলেন, তখন দেবতারা জাদুবলে একটি নকল লাউসেন তৈরী করে দুর্গার সামনে উপস্থিত করলেন, দুর্গা তাকেই বধ করে ফিরে গেলেন, এই সুযোগে লাউসেন আবার ইছাই ঘোষের মাথা কাটলেন ও হনুমান সাথে সাথে মাথাটি ধর্মঠাকুরের পায়ে রাখলে তা আর উঠতে পারল না—এই অলৌকিক কাহিনীর আড়ালে ইতিহাসটি হল : আদিবাসী এবং ডোম, হাড়ি প্রভৃতি অন্ত্যজদের দেবতা ধর্মঠাকুর ধীরে ধীরে উচ্চবর্ণীয় সমাজেও মান্য হচ্ছেন। লাউসেন উচ্চবর্ণভুক্ত কিন্তু ধর্মঠাকুরের ভক্ত, তাঁর সেনাপতি কালু ডোম, তাঁর সৈন্যরাও ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত, আবার একই সঙ্গে লাউসেন পাল রাজাদের সামরিক ও রাজনৈতিক সমর্থনও পেয়েছিলেন—এইভাবে লাউসেনের নেতৃত্বে উচ্চবর্ণ, অন্ত্যজ শ্রেণী ও রাজশক্তির একটি জোট তৈরী হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে ইছাই ঘোষ ছিলেন গোয়ালা—জাতের মই-এ মাঝামাঝি একটি গোষ্ঠী। স্পষ্টতই তিনি পৌরাণিক দেবী শ্যামারূপার পূজা করতেন জাতের মই-এ আরও উপরে ওঠার চেষ্টায়—লাউসেনের জোটের বিরুদ্ধে তিনি নিজের জাতের লোক ছাড়া কারও সাহায্য পাননি, ফলে তাঁর পরাজয় ছিল অবধারিত।

৪১। (ক) **তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর**। (খ) বর্গভীমা। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতার সপ্তরথ রেখ দেউল। চারচালা জগমোহন। অতি বহুল সংস্কৃত। সমতল থেকে বেশ কয়েক ফুট উচ্চ ঢিবির উপরে অধিষ্ঠান। (ঙ) ১৬ শতক। (চ) হাওড়া থেকে ট্রেনে/বাসে সরাসরি বা পাঁশকুড়া থেকে বাসে তমলুক, এরপর রিক্সায় সর্বপরিচিত মন্দির।

প্রাসঙ্গিকী

(i) 'তমলিপ্তের জিয়ুগহবি বন্দিনু বর্গভীমা।
সপ্তজননী জলনিধি সপ্তদ্বীপ সীমা।।'**

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম উদ্ধৃত পঙক্তি-দুটি লিখেছিলেন ষোড়শ শতকের শেষে বা সপ্তদশ শতকের একেবারে গোড়ায়। মন্দিরটি তার পূর্ববর্তী।

(ii) প্রাচীনকালে তমলুক অনেক নামে পরিচিত ছিল—তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্তী, বেলাকুল, তামলিপ্ত, তমোলিপ্ত, তেমোলিতি (চীনা পর্যটকগণের ভাষায়) প্রভৃতি।

(iii) তমলুক ও তার আশপাশের অঞ্চল থেকে এত বেশি পরিমাণে প্রস্তর ও তাম্রযুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে যে, প্রত্নবিশারদগণ মনে করেন যে তিন হাজার বছর আগেই এখানে ধারাবাহিক একটি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

---

* Hitesranjan Sangal : 'Literary Sources of Medieval History : A study of a few Mangal Kavya Texts,' 'Selected Writings,' Archaeological Studies and Training, Eastern India, 2004, PP. 200-203.

** প্রাগুক্ত 'চণ্ডীমঙ্গল,' 'দিগ্‌দেবতাবন্দনা', পৃঃ ৫।

(iv) অসুর নিধনকালে এখানেই নাকি বিষ্ণুর শরীর থেকে ঘাম ঝরে পড়ে তাই স্থানটির নাম বিষ্ণুগৃহ। আবার মহাভারতের অশ্বমেধপর্বের যুদ্ধকালে কৃষ্ণ ও অর্জুন এখানেই নাকি রাজা তাম্রধ্বজের বীরত্বে মুগ্ধ হন আর তাম্রধ্বজ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণার্জুন মূর্তিই নাকি আজও তমলুকে জিষ্ণুহরি নামে পূজিত হচ্ছেন।

(v) ঐতিহাসিক কালে: মৌর্য সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র সিংহলরাজ তিষ্যের আমন্ত্রণে খ্রিস্টপূর্ব ২৪৩-এ তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকেই বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের নিয়ে সিংহল-যাত্রা করেন বলে কথিত হয়। জৈন 'কল্পসূত্র' অনুসারে ত্রয়োবিংশ তীর্থংকর পার্শ্বনাথ তমলুকে ধর্মপ্রচার করেন। চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন ৩৯৯ থেকে ৪১৪ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত ভারত ভ্রমণ করেন—তিনি দু'বছর তাম্রলিপ্তে ছিলেন। তিনি তাম্রলিপ্তে বহু ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী-সহ ২২-টি বৌদ্ধ সংঘারাম দেখেন। এরপর হিউয়েন সাঙ (৬৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দ) ও ই-ৎসিঙ (৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ) তাম্রলিপ্তে আসেন ও এর বিবরণও লিখে যান। এছাড়া য়ুয়ান চোয়াঙ নামক আরও একজন চৈনিক পর্যটকের বিবরণী হতে জানা যায় যে তাম্রলিপ্ত নগরের একপ্রান্তে একটি সুউচ্চ অশোকস্তম্ভ ছিল। য়ুয়ান চোয়াঙ ৫০-টির মত মন্দিরেরও উল্লেখ করেছেন।

(vi) বর্গভীমা দেবী বহুমান্যা এবং ভক্ত-সমাকীর্ণা বলেই মন্দিরটির এত বেশিবার সংস্কৃত হয়েছে যে এখন আদি রূপ বোঝা যায় না। তবে ১৯০২-এ শ্রদ্ধেয় ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত লিখেছেন: ''ইহার বাহিরের গঠন প্রণালী উড়িষ্যাঞ্চলের মন্দিরের ন্যায় হইলেও ভিতরের গঠন বৌদ্ধ বিহারের সদৃশ এবং অবিকল বুদ্ধগয়ার মন্দিরের অনুরূপ। প্রবেশদ্বারের সম্মুখে প্রধান বা মূল বিহারের অনুকরণে একটি ক্ষুদ্র বিহার রহিয়াছে। তদ্‌দৃষ্টে অনুমান হয়, ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহার অন্যান্য দিকেও ছিল ....।''*

একই ভাবে, ১৯৪০-এ প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ'-এ লেখা হয়েছে : ''তমলুকের বর্গভীমাদেবীর মন্দির একটি প্রাচীন কীর্ত্তি। ....অনেকে অনুমান করেন, সম্রাট অশোক তাম্রলিপ্তে যে স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন উত্তরকালে তাহার উপরই এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরটির বহির্ভাগের গঠনপ্রণালী বাংলার স্থাপত্যরীতি হইতে পৃথক। ভিতরের গঠনপ্রণালী বৌদ্ধ বিহারের সদৃশ ও বুদ্ধগয়ার মন্দিরের অনুরূপ। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব লুপ্ত হইলে কোন পরিত্যক্ত বৌদ্ধ বিহার-ই হিন্দু মন্দিরে পরিণত হয়।।**

(vii) বিশেষজ্ঞদের মতে বর্গভীমার মূর্তি অনেকটা বৌদ্ধ-তান্ত্রিক দেবী উগ্রতারার মতন।

৪২। (ক) **কুলীনগ্রাম, জামালপুর, বর্ধমান**। (খ) গোপাল (মদন-গোপাল)। (ঘ) আনু. ৪০/৪৫ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। নাটদালানের আগে ক্ষুদ্র অন্তরাল। নাটদালান অনেক পরে সংযোজিত। (ঙ) ১৬ শতক। (চ) হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের জৌগ্রাম স্টেশন থেকে রিক্সায় (৫ কি.মি.)।

* বিনয় ঘোষ কর্তৃক উদ্ধৃত। প: বঙ্গের সংস্কৃতি-২, পৃ: ৩৮-৩৯।

** 'বাংলায় ভ্রমণ', স. অমিয় বসু, 'পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত', ১৯৪০, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ১৩৫।

প্রাসঙ্গিকী

কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিঞা। প্রত্যব্দ আসিবে পট্টডোরী লৈঞা।।
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়। তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়।।
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। এ বাক্যে বিকাইলাঙ আমি তোমার বংশের হাথ।।
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর। সেহো মোর প্রিয় আর লোক বহু দূর।।

—'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', মধ্যখণ্ড, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।।*

কুলীনগ্রাম 'কৃষ্ণবিজয়' (ভাগবতের অংশবিশেষ) কাব্যের রচয়িতা কবি মালাধর বসুর গ্রাম। এই কাব্য রচনার জন্য গৌড়ের সুলতান (সম্ভবত রুকনুদ্দিন বরবকশাহ্‌) তাঁকে গুণরাজ খান উপাধিতে ভূষিত করেন। এই কাব্যের 'নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' পঙক্তিটি চৈতন্যদেবের বিশেষ প্রিয় ছিল। মালাধর বসুর পুত্র সত্যরাজ বৈষ্ণব সমাজের একজন প্রধান পুরুষ এবং পৌত্র রামানন্দ (অনেকের মতে সত্যরাজ ও রামানন্দ একই ব্যক্তি) ছিলেন চৈতন্য-পরিকর। এছাড়া যবন হরিদাসও এক সময়ে কুলীনগ্রামে ছিলেন—এমন কথিত হয়। একারণেই শ্রীচৈতন্য কুলীনগ্রামের বসু (খান) পরিবারকে প্রতি বৎসর পুরীর জগন্নাথের রথযাত্রা উৎসবে পট্টডোরী দানের সম্মানিত অধিকারে ভূষিত করেন।

মালাধর বসুর 'কৃষ্ণবিজয়' কাব্যে চৈতন্যের পূর্বেই খাঁটি রাগানুগা ভক্তির আভাস মেলে :

অল্পধন লোভ লোকে এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে।।**

যাই হোক, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের' মত মহাগ্রন্থে কুলীনগ্রামের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে অন্তত: ১০ বার—আদিখণ্ডে ১, মধ্যখণ্ডে ৫ এবং অন্ত্যখণ্ডে ৪ বার***—এই তথ্যটুকু বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কুলীনগ্রামের গুরুত্ব বোঝাতে যথেষ্ট।

৪৩। (ক) **পাড়া, পুরুলিয়া।** (খ) রাধারমণ। (গ) পুরুষোত্তমদাস নামে বৃন্দাবনাগত এক সাধু। (ঘ) নিচের অংশ পাথরের, কিন্তু শিখর ইটের। ত্রিমুখে খিলানসহ পিরামিডাকৃতি জগমোহন। খিলানগাত্রে কিছু পাথর-খোদাইয়ের কাজ। কিন্তু শিখর এত লতাপাতায় ঢাকা যে আকৃতি কিছু বোঝা যায়না। (ঙ) ১৬ শতকের শেষে (?)। (চ) ক্রম ৯ দেখুন— আরও এক কি.মি. এগিয়ে।

৪৪। (ক) **ছোট বলরামপুর, পুরুলিয়া মফস্বল, পুরুলিয়া।** (ঘ) ইটের তৈরী বৃহৎ দেউল, নিরলংকার। (ঙ) ১৬-১৭ শতক। (চ) পুরুলিয়া শহর থেকে অটোরিক্সায়/রিক্সায় (৬ কি.মি.)। **প্রাসঙ্গিকী** : ১৮৬৪-৬৫-তে ডালটন এখানে কয়েকটি তীর্থঙ্কর-মূর্তি দেখেছিলেন। এখানে নদীর ধারে অতি জীর্ণ একটি পাথরের দেউল আছে—এটি প্রাকমুসলিম যুগের জৈন দেউল হতেও পারে।

---

* অক্ষয়কুমার কয়াল-সম্পাদিত 'ভারবি' (১৯৯৮) সংস্করণ, পৃ: ২৩৬।

** অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-কর্তৃক 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,'প্রথম খণ্ড (মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৮২ চতুর্থ সংস্করণ) পৃ: ৬৫২-তে উদ্ধৃত।

*** প্রাগুক্ত সংস্করণ, পৃ: যথাক্রমে : ৬২, ১০৯, ২০২, ২১৬, ২৩১, ২৩৬, ৪২১, ৪২২, ৪২৫ এবং ৪৩১

৪৫। (ক) সিহর, কোতুলপুর, বাঁকুড়া। (খ) শান্তিনাথ শিব। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতার মাকড়া-পাথর-নির্মিত ত্রিরথ শিখর-দেউল ও একস্তর পিড়া-র জগমোহন। চারচালা ভোগমণ্ডপ। শিখর ও জগমোহনের কুলুঙ্গিতে কটি মূর্তি। (ঙ) ১৭ শতক। প্রথম দিক। (চ) জয়রামবাটির মায়ের দিঘির পাশ দিয়ে ঢোকা রাস্তায় বাসে/রিক্সায়/হেঁটে।

৪৬। (ক) গড় পঞ্চকোট (ধারা পঞ্চায়েৎ ক্ষেত্র), নিতুড়িয়া, পুরুলিয়া। পথনির্দেশ : আসানসোল বা বরাকর থেকে বাসে সহজে দিসেরগড়, এখান থেকে নদী-সেতু পেরিয়ে পারবেলিয়া—এখান থেকে বাসে গোবাগ। এবার হেঁটে।। বরাকরের পরের স্টেশন কুমারধুবি থেকে ট্রেকারেও যাওয়া যায়। 'গড় পঞ্চকোট' অনেকগুলি মন্দিরের ভগ্নস্তূপের সমষ্টি, একটি পাঁচেট পাহাড়ের উপর, অন্যগুলি পাহাড়টির পাদদেশে। এগুলির একত্র বর্ণনাই সুবিধাজনক :

গড় পঞ্চকোটের মন্দির

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতে কবি **মাইকেল মধুসূদন দত্ত** পুরুলিয়া জেলার গড় পঞ্চকোটে যান, কিন্তু মাত্র কয়েকমাস পঞ্চকোট এস্টেটের ম্যানেজারী করে, সম্ভবত অসুস্থতার কারণে কলকাতায় ফিরে আসেন। এর অনতিকাল পরে তাঁর মৃত্যু হয়। পঞ্চকোট বা পাঁচেট পাহাড়ের গড়টি তখনই জীর্ণ ও প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। একদিকে পঞ্চকোট পাহাড়ের বিপুল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অন্যদিকে গড়ের অতি জীর্ণদশা মধু কবির মনে কত গভীর রেখাপাত করেছিল তার প্রমাণ এ বিষয়ে ঐ ক্ষুদ্র সময়কালে লেখা তাঁর তিনটি কবিতায় আছে। কবিতা তিনটি হল, 'পঞ্চকোট গিরি,' 'পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী' এবং 'পঞ্চকোট-গিরি বিদায়-সঙ্গীত'*

প্রথম কবিতাটিতে মধুসূদন লিখছেন যে মহেন্দ্রের "বজ্র প্রহরণে" পর্বতকুল পাখা হারালেও পঞ্চকোট "হীনগতি" নয় কারণ লঙ্কায় কুম্ভকর্ণের মত "শূন্যপ্রাণ, শূন্যবল" হলেও সে "ভীমাকৃতি"। কিন্তু কবির প্রশ্ন, "কোথায় সে রাজলক্ষ্মী, যাঁর স্বর্ণ-জ্যোতি/উজ্জ্বলিত মুখ তব? যথা অস্তাচলে/দিনান্তে ভানুর কান্তি।" দ্বিতীয় কবিতায় মধুকবি "নিশার স্বপনে" দেখছেন যে বাগ্‌দেবী যেন তাঁকে বলছেন· "বিবিধ আছিল পূণ্য তোর জন্মান্তরে,/তেঁই দেখা দিলা তোরে আজি হৈমবতী/যেরূপে করেন বাস চির রাজঘরে/পঞ্চকোট,-পঞ্চকোট-ওই গিরিপতি।" তৃতীয় কবিতাটিতে মধুসূদন প্রকাশ করেছেন তাঁর ব্যর্থ বাসনা:

"ভেবেছিনু, গিরিবর! রমার প্রসাদে,
তাঁর দয়াবলে,
ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি
জলশূন্য পরিখায়; ধনুর্বাণ ধরি দ্বারিগণ
আবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতূহলে।"

মধুসূদন যখন পঞ্চকোটে যান তার একবৎসর সময়কালের মধ্যে ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষনের হয়ে **জে ডি বেগলার** গড় পঞ্চকোট ভ্রমণ ও সেখানকার ভগ্ন পুরাবস্তুসমূহ পরীক্ষা করে তার প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ প্রস্তুত করেন—প্রতিবেদনটির সংক্ষিপ্ত রূপ হল :

লোক-কথা অনুসারে পরপর পাঁচজন রাজা রাজত্ব করেন ব'লে পঞ্চকোট নাম হয়েছে এমন

* 'মধুসূদন রচনাবলী,' সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৯ মুদ্রণ, পৃ: ১৯৫-৯৬।

ভাবা হলেও নামটি হয়েছে পাঁচটি দুর্গপ্রাকার বা 'কোট' থেকে। উত্তরে সুউচ্চ পঞ্চকোট পাহাড়ের প্রাকৃতিক দেওয়াল, এবং পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরে চারস্তরের মাটির দেওয়াল, মাঝে ছিল পরিখা—এইভাবে খুব কম খরচ ও চেষ্টায় সবচেয়ে বেশী নিরাপত্তা লাভ সম্ভব হয়েছিল। দেওয়ালগুলির মাঝে মাঝে ছিল বেশ কটি দ্বার, সবগুলিই মুসলমান শাসকদের যুগের খিলান (arch)-এ নির্মিত। পাহাড় থেকে নেমে আসা জলধারায় সারা বছরই পরিখাগুলিতে জল থাকত, তবে বেশীরভাগই মজে ভরে গেছে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে অনেকগুলি ইটের বক্রচাল স্থাপত্য আছে, এগুলির বেশিরভাগই ছিল টেরাকোটা সম্পন্ন। দ্বারগুলির বেশীরভাগই লুপ্ত হলেও পাথরের চারটি দ্বার এখনও আছে—আঁখ দুয়ার, বাজার মহল দুয়ার বা দেশবাঁধ দুয়ার, খরিবাড়ি দুয়ার এবং দুয়ার বাঁধ—এদের মধ্যে শেষেরটিই সবচেয়ে ভাল অবস্থায় আছে। মন্দিরগুলির মধ্যে পাহাড়ের উপরের রঘুনাথ মন্দিরের [illegible] ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের একটি লেখ পাওয়া গেছে, সুতরাং অনুমান করা যায় যে অন্য মন্দিরগুলি পরবর্তী কালের।*

দেখা যাচ্ছে যে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কবি মধুসূদন দত্ত এবং ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বেগলার দেখেছেন যে পঞ্চকোটের গড়টি ভগ্ন, জঙ্গলাকীর্ণ এবং পরিখাগুলি জলশূণ্য। আসলে এর আগেই গড়টি পরিত্যক্ত হয়েছে এবং পঞ্চকোট রাজবংশের উত্তরাধিকাবিগণ রাজত্ব হারিয়ে কাশীপুরের (আদ্রার অদূরে) জমিদারে পরিণত হয়েছেন এবং পঞ্চকোটের মন্দিরগুলির বিগ্রহাদি কাশীপুরের বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। পঞ্চকোট রাজবংশের এই জমিদারে পরিণত হওয়ার ইতিহাসটুকু বাংলার ইতিহাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়।

পঞ্চকোট-রাজাদের অধীনে ১২টি ছোট বড় জমিদারী বা সামন্ত রাজ্য ছিল—বাগমুন্ডি, বেগুনকোদর, জয়পুর, মুকুন্দপুর, হাসলা, তোড়াং, কাত্রাস, নওগড়, ঝরিয়া, টুন্ডি, পান্ডা এবং ঝালদা। দুর্গম ও প্রত্যন্ত এই অঞ্চলে পঞ্চকোটের রাজারা প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইংরেজ সরকার নানা অছিলায় জঙ্গল মহলের অধিকার নিতে থাকে এবং খাজনা বাকীর অজুহাতে পঞ্চকোট রাজ্যের একের পর এক অংশ নিলাম হ'তে থাকে এবং কলকাতার কিছু উঠতি ম্যুৎসুদ্দি বেনিয়ান সেগুলি কিনে নিতে থাকেন। পঞ্চকোট-রাজের অধীন বা অধীন নয় এমন ভূস্বামীরাও আশঙ্কা করেন যে পঞ্চকোট-রাজ না থাকলে তাঁরাও থাকবেন না। শেষ পর্যন্ত শুরু হয় বীরত্বপূর্ণ ভূমিজ বিদ্রোহ। ইংরেজ সরকারের বিবরণীতে একে বলা হয়েছে "গঙ্গানারায়ণীহাঙ্গামা"। অষ্টাদশ শতকের শেষপাদ থেকে ১৮৪০/৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলা এই বীরত্বপূর্ণ ব্রিটিশ-বিরোধী ভূমিজ সংগ্রাম যেন সাঁওতাল-বিদ্রোহের পটভূমির মত। এরই অবসান হয় ব্রিটিশ ও তার দালালদের জঙ্গলমহলে অপ্রতিহত আধিপত্যে ও পঞ্চকোট রাজবংশের কাশীপুরের জমিদারে পরিণত হওয়ায়।

দেড় হাজার ফুটের সামান্য বেশি উঁচু ও প্রায় সাড়ে পাঁচ কি.মি. এলাকা নিয়ে থাকা বর্তমান পাঁচেট পাহাড় তার জঙ্গল ও ধ্বংসস্তূপ নিয়ে ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে আছে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্ত যা লিখেছেন বা বেগলার-কৃত ১৮৭২-৭৩-এর প্রতিবেদনে যা আছে ১৩৬ বছর পরে এখন তার অনেক কিছুই নেই। পরিখাগুলির চিহ্ন বলতে কিছু নিচু

* প্রাগুক্ত 'Report', PP. 178-82.

জমি আর ডোবা, বেগলার কথিত চার-স্তর মাটির দেওয়াল অদৃশ্য, স্মৃতি বলতে কিছু ঢিবি বেগলার যে চারটি পাথরের দ্বারের উল্লেখ ক'রেছেন তার একটি (দুয়ার বাঁধ?) এখনও কোনওমতে করুণ এবং অতি করুণভাবে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন গড়ের (স্থানীয়দের কথায় রাজবাড়ির) ধ্বংসস্তুপের একপাশে।

পাঁচেট পাহাড়ের নীচে 'গড়' এলাকায় ঢোকা-মাত্র একটি জোড়-বাংলা মন্দিরের ধ্বংস-স্তুপ, জঙ্গলাকীর্ণ। ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'লেও জোড়বাংলা আকৃতি স্পষ্ট। এরপর সামান্য গেলেই সুবৃহৎ পঞ্চরত্ন মন্দির। গড় পঞ্চকোটের পরিত্যক্ত মন্দিররাজির এটিই প্রায় পূর্ণ মহিমায় বিরাজমান— আনুমানিক ২৫ ফুট উচ্চতার বিষ্ণুপুর-রীতির পঞ্চরত্ন (মাঝ বা মূল শিখরটি অতি স্থূল ও অতি বিপুল, তুলনায় চারকোণের চারটি শিখর বা 'রত্ন' অনেক শীর্ণ ও ছোট), গাত্রে এখনো টেরাকোটার দু-একটি পদ্ম ছাড়াও সামান্যাবশিষ্ট কাজ, গর্ভগৃহের দরজার উপরে একসার ক'রে পঙ্খের (চুনবালির) কাজ, মূল দরজার দুপাশে দুটি প্রথাগত নকল দরজাই পঙ্খের কাজে সুসমৃদ্ধ। এই মন্দিরটির পুবে রয়েছে বৃহত্তর একটি জোড়বাংলা মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ, জঙ্গলাকীর্ণ, তারও পুবে পাহাড় ঘেঁষে রয়েছে আর একটি দর্শনীয় মন্দির বিশেষ—সামনে ও দুপাশে একখিলান দ্বারসহ পিড়া-রীতির জগমোহনটি হতে এখনও চোখ ফেরানো যায়না; প্রবেশ করে উপরে তাকালে ঘণ্টার তলদেশের মত গম্বুজের তলদেশ নজরে আসে, কিন্তু মূল মন্দিরটি ভেঙে পড়েছে এবং ধ্বংসস্তুপটি জঙ্গলাবৃত। উপরি কথিত পঞ্চরত্নটির ঠিক পশ্চিমপাশে গড়বাড়ির (স্থানীয়দের ভাষায় 'রাজবাড়ি'-র) বিস্তীর্ণ ধ্বংসস্তুপে একটি ছাদহীন ত্রিখিলান দ্বিতল (দ্বিতল মন্দির?) দেওয়াল, ইট-পাথরের উঁচু-নীচু স্তূপ ও উত্তর পাশে বেগলার উল্লেখিত দ্বারগুলির একমাত্র অবশিষ্টটি—দেখতে দেখতে মনে হয় যেন শ্বাস ছাড়ছে ইতিহাস। এবার আরও উত্তরে এগিয়ে গেলে বাঁয়ে একটি খন্দ-ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে একটি মাঝারি আকৃতির রেখ দেউল, এটিও আছে মোটামুটি ভাল অবস্থায়। এরপর উত্তরে সামান্য গিয়ে শীর্ণ পথে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পাহাড়ে চড়া, কষ্ট কিছু আছে, কিন্তু দূরত্ব বেশী নয় তাই চড়াই ভাঙা যায় সহজেই—শেষে পরম বিস্ময়, শ্যাম-রঘুবীর মন্দির-ক্ষেত্র; বেগলার যাকে বলেছেন রঘুনাথ মন্দির :
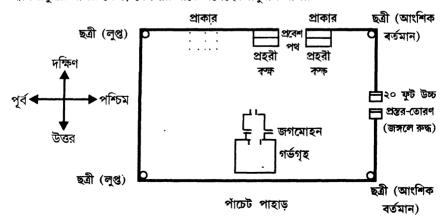
উপরের দুর্বল রেখাচিত্র থেকেই পাঠক অনুভব করবেন আদিতে কত মহনীয় ছিল পাহাড়ের উপরের এই মন্দির-ক্ষেত্র। পিড়া জগমোহনটি সুউচ্চ (আনু ১৭/১৮ ফুট) যাতে মনে হয় মূল মন্দির বা বড় দেউলটি ছিল ৩০ থেকে ৩৫ ফুট উঁচু, ভিৎ ও ধ্বংসাবশিষ্ট দেওয়াল দেখেও তা-ই মনে হয়।

আকর্ষণীয় ব্যাপার হল পিড়া রীতির জগমোহন-সহ রেখ দেউল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় বেশ ক'টি থাকলেও (যেমন, চন্দ্রকোণার 'রঘুনাথ', পঁচেটের 'কিশোর রায়', কাষ্টখামারের 'বটেশ্বর শিব' বা কেশিয়াড়ির অদূরে কুমারহাটির 'জগন্নাথ'), সমগ্র রাঢ় বঙ্গে পিড়া-জগমোহনের সঙ্গে রেখ দেউলের উদাহরণ মাত্র দুটি— বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার সিহরের 'শান্তিনাথ শিব' এবং ওঁদা থানার বিক্রমপুরের রাধাকৃষ্ণের দেউল। সুতরাং পুরুলিয়ার পঞ্চকোট পাহাড়ের উপরে ও নিচে দু-দুটি এ জাতীয় স্থাপত্যের অস্তিত্ব বিস্ময়কর। গড় পঞ্চকোট রাজ্যের উৎপত্তি নিয়ে যে সব কিংবদন্তি আছে, তার একটিতে বলা হয় যে, এই রাজ্যের আদি প্রতিষ্ঠাতা যখন সদ্যোজাত শিশু তখন তাঁর পিতা ও মাতা তাঁকে নিয়ে হাতির পিঠে ক'রে তীর্থদর্শনে পুরী যাচ্ছিলেন। পঞ্চকোটের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনাক্রমে শিশুটি হাতির পিঠ থেকে পড়ে অসাড় হয়ে গেলে তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে মৃত ভেবে চলে যান, কিন্তু তিনি মারা যাননি। জঙ্গলের একটি গাভী (কপিলা গাই) তাঁকে দুধ দিয়ে বড় করে, ও তিনিই পঞ্চকোট রাজ-বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। কল্পকাহিনীর খোলস ছাড়ালে এই কিংবদন্তি হয়ত পঞ্চকোট রাজ-বংশের সঙ্গে পুরী তথা উড়িষ্যাব সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়, ওড়িশী শৈলীতে পিড়া-রীতির জগমোহনসহ রেখ দেউলের উপস্থিতি এখানে হয়ত সেই সাংস্কৃতিক প্রভাবের ফল।

শ্যামরঘুবীরের মন্দির ক্ষেত্র আয়তাকার, পিছনে পাঁচেট পাহাড়ের প্রাকৃতিক দেওয়াল, বাকি তিন অর্থাৎ পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে প্রস্তর-প্রাকার, যার চার কোণে চারটি রাজপুত ছত্রীর মত চবুতরা ছিল (দক্ষিণ-পশ্চিম কোণেরটি এখনও বর্তমান)। এ হতেই হয়ত বেগলার একে মুসলমান শাসকদের সময়ে নির্মিত ভেবেছেন। আর দর্শনীয় হল পশ্চিমের আনু. ২০ ফুট উচ্চতার অত্যন্ত সুদৃশ্য ও রাজসিক প্রস্তর-নির্মিত তোরণ, প্রাকার-বেষ্টিত ক্ষেত্রে এমন প্রস্তর-তোরণ পশ্চিম মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের মহামায়া তথা দণ্ডেশ্বর শিব-ক্ষেত্র ও কোচবিহার জেলার গোঁসানিমারীর কামতেশ্বরী মন্দির ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গে নেই। বাইরের ঘন জঙ্গলের জন্য তোরণটি অব্যবহার্য হওয়ায় দক্ষিণের খিড়কি পথই এখন প্রবেশ-দ্বার। এর উপরের ও দুপাশের পাথরের বাইরের গাত্রে চুনরঙ করা থাকায় নিচে বহুদূর থেকে এটি দেখা যায়। ভিতরে খিড়কি-পথের দুপাশে পাথরের ছোট ঘর, বোধ হয় প্রহরীদের জন্য। মন্দিরের সামনে প্রাকার ঘেঁষে পাথরের স্থাপত্য, মনে হয় প্রথমটি নাটমন্ডপ ও পরেরটি ভোগ-ঘর, উচ্চতা কম দুটিরই। জগমোহনটির সামনে (দক্ষিণে) ও দুপাশে (পূর্ব ও পশ্চিমে) বৃহৎ এক খিলান করে প্রবেশ-পথ; প্রবেশ করে উপরে তাকালে প্রকান্ড ঘণ্টার তলদেশের মত 'পিড়া' গম্বুজের তলদেশ এবং সামনে পাথর-খোদাই অলংকরণে সমৃদ্ধ গর্ভগৃহের প্রবেশ দ্বারের সুবৃহৎ ও রাজসিক প্রস্তর খিলান। কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে ধ্বসে পড়া মূল মন্দির বা 'বড় দেউল' গভীর বেদনার সঞ্চার করে। পূবের দেওয়ালের অবশিষ্টাংশ-ঘেঁষে ভেঙে পড়া শীর্ষদেশের পাথরের স্তূপ ডাঁই

হয়ে আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নিচে পঞ্চরত্নের দক্ষিণ-পূর্বে ঢিবির উপরে আরও একটি মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে আছে।

উপরে শ্যাম-রঘুবীরের অঙ্গনের জঙ্গল কাটা থাকলে (মাঝে মাঝে কাটা হয়, আবার হয়) অঙ্গনে পুরাতন ধরনের পাথরের কারুকর্ম বা তার টুক্‌রো ইতস্ততঃ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

শেষে স্মরণযোগ্য যে কাশীপুরের জমিদারদের, অর্থাৎ পঞ্চকোট রাজবংশের কুলদেবী হলেন 'রাজেশ্বরী' কালী, কাশীপুরের শেষ উল্লেখযোগ্য জমিদার সেখানে যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন সেটি 'ভুবনেশ্বরী' কালীর—অথচ গড় পঞ্চকোটের পরিত্যক্ত মন্দিরগুলির সমস্ত বিগ্রহই (যেগুলি কাশিপুরের জমিদাররা স্বগৃহে নিয়ে গেছেন) ছিল বৈষ্ণব-ধারায় : শ্যাম-রঘুবীর (রঘুনাথ), শ্যামচাঁদ, রাধারমন, রাধাশ্যাম, মদনমোহন, মদনগোপাল প্রভৃতি। অনুমান করা চলে জঙ্গলমহলের স্বভাবে হিংস্র তথা রূদ্র ও বীররসের আদিবাসী ও ভূমিজ প্রজাদের রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধুর ও কোমল রসে ভিজিয়ে ঠান্ডা রাখার চেষ্টাতেই এই ব্যবস্থা হয়েছিল।

৪৭। (ক) **এল্যাটি (বেলাটুকরি), ওন্দা, বাঁকুড়া।** (খ) পরিত্যক্ত মন্দির (শ্যামসুন্দর)। (গ) মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ (?)। (ঘ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চতার চোখা-খাড়া দেউল। (ঙ) ১৭ শতক। প্রথম দিক। (চ) ক্রমিক-৯, সোনাতপল দেখুন—ঐ রাস্তায় গিয়ে (শীত-গ্রীষ্মে) দ্বারকেশ্বর পেরিয়ে, অথবা, বাঁকুড়া থেকে বাসে বেলাটুকরির জোড়ামন্দিরতলা স্টপেজ।

৪৮। (ক) **বীরভানপুর, দুর্গাপুর, বর্ধমান।** (খ) শিব। (ঘ) পাথরে নির্মিত দেউল। (ঙ) ১৭ শতক। প্রথম দিক। (চ) দুর্গাপুর থেকে রিক্সায়। **প্রাসঙ্গিকী** : ১৯৫৪ ও ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের পূর্বাঞ্চলীয় অধীক্ষক বি.ডি. লাল-পরিচালিত উৎখননে এখানে ৬০০০ বছর আগেকার মানুষের ব্যবহৃত পাথরের ক্ষুদ্র অস্ত্র মিলেছে, তাদের বসবাসের চিহ্নও মিলেছে।*

৪৯। (ক) **ইন্দা, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) খড়্গেশ্বর শিব। (গ) ধারেন্দার রাজা খড়্গাসিংহ বা বিষ্ণুপুরের রাজা খড়্গামল্ল। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতা, ঝামাপাথরে নির্মিত সপ্তরথ। সংস্কারে আদল পরিবর্তিত। (ঙ) ১৭ শতক। প্রথম দিক। (চ) খড়্গপুর স্টেশন থেকে রিক্সায়। **প্রাসঙ্গিকী** : কিংবদন্তি অনুসারে এখানে হিড়ম্বডাঙার বিশাল মাঠে ভীমসেন হিড়িম্ব রাক্ষসকে বধ করে তার বোন হিড়িম্বাকে বিয়ে করেন।

৫০। (ক) **কেশিয়াড়ি (ভবানীপুর, মঙ্গলামাড়ো), পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) সর্বমঙ্গলা। (গ) মন্দির ও জগমোহন—প্রতিষ্ঠাতা, চক্রধর ভূএগা; কারিগর—বাসুরাম। বারদুয়ারি—প্রতিষ্ঠাতা, সুন্দর দাস, কারিগর, বনমালী দাস। (ঘ) ল্যাটেরাইট পাথরে নির্মিত—মন্দির, জগমোহন ও বারদুয়ারী তিনই ওড়িশী পিড়া রীতিতে। (ঙ) মন্দির ও জগমোহন ১৬০৪ এবং বারদুয়ারী ১৬১০। (চ) খড়্গপুর থেকে বাসে কেশিয়াড়িতে গিয়ে রিক্সায়।

প্রাসঙ্গিকী

(i) সর্বমঙ্গলার পাশে স্থাপিত বিজয়মঙ্গলার পাদপীঠে খোদিত লিপি অনুসারে মন্দির ও

---

* দেখুন : যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি', প্রথম খণ্ড, ১৯৯৫, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ: ৮৮-৯০।

জগমোহনের প্রতিষ্ঠাতা চক্রধর ভূঞা ছিলেন মানসিংহের অধীনস্থ জমিদার রঘুনাথ ভূঞার পুত্র এবং বারদুয়ারির প্রতিষ্ঠাতা সুন্দর দাস ছিলেন মানসিংহের অমাত্য শাহ সুলতানের কর্মচারী (বারদুয়ারির লিপি অনুসারে)।

(ii) কেশিয়াড়িতে দীর্ঘকাল উড়িষ্যার রাজাদের আধিপত্য ছিল। উড়িষ্যারাজ কপিলেশ্বরদেব পাঁচ কি.মি.-র মত দূরে ঝামাপাথরের একটি সেনানিবাসও নির্মাণ করিয়েছিলেন। এতে কপিলেশ্বর শিবের একটি রেখ দেউলও ছিল। পরে সেনানিবাসটি মোগলদের হস্তগত হয়, একটি মসজিদও হয়।

(iii) কয়েকটি আচার থেকে মনে হয় সর্বমঙ্গলা হয়ত বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী ছিলেন।

৫১। (ক) ঐ। (খ) কাশীশ্বর শিব। (ঘ) ঝামাপাথরে নির্মিত। পিড়া দেউল ও জগমোহন। (ঙ) সতের শতক। (চ) ঐ। সর্বমঙ্গলা মন্দিরের মুখোমুখি পথে।

৫২। (ক) ঐ। (খ) জগন্নাথ—ভেঙে পড়ার পরে পুরাতন মন্দিরের উপাদানেই উড়িষ্যা থেকে আনা কারিগরগণ কর্তৃক পুনর্নির্মিত সুউচ্চ দেউল।—আগে বলা পথে।

৫৩। (ক) **কুমারহাটি, কেশিয়াড়ি, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) পরিত্যক্ত মন্দির, জগন্নাথ। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতার ঝামাপাথরে তৈরী সপ্তরথ দেউল-পিড়া জগমোহন। (ঙ) ১৭ শতক। প্রথম দিক। (চ) কেশিয়াড়ির লাগোয়া।

৫৪। (ক) **বিষ্ণুপুর (ভট্টাচার্য পাড়া), বাঁকুড়া।** (খ) মল্লেশ্বর শিব। (গ) মল্লরাজ বীর সিংহ। (ঘ) ল্যাটেরাইট পাথরে নির্মিত। বহুল সংস্কারে আদিরূপ লোপ পেলেও রথ-পগ বিন্যাস হতে বোঝা যায় যে আদিতে রেখ দেউলই ছিল। ডি.বি. স্পুনার ১৯১০-১১-য় ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের বার্ষিক বিবরণীতে জানিয়েছেন যে ১৮ শতকেব শেষদিকে শিখরটি ভেঙে পড়লে বর্তমান আটকোণা চূড়াটি স্থাপিত হয়।* প্রবেশ পথের উপর ক্লোরাইট পাথরের হাতি। (ঙ) ১৬২২। (চ) বিষ্ণুপুর বাসস্ট্যাণ্ড (রসিকগঞ্জ) থেকে রিক্সায় (২ কি.মি.)।

৫৫। (ক) **হাওড়িহাট (জগদীশপুর), মন্দিরবাজার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।** (খ) যোগেশ্বর শিব। (গ) হাওড়ি নামে এক মহিলা (অন্যমতে হাটখোলার দত্ত পরিবার) আহিরীটোলার ভট্টাচার্যদের দান করেন। বর্তমানে স্থানীয় নস্কর পরিবারের অধীনে। (ঘ) রেখ কিন্তু বক্রচাল, চোখা কৌণিক ও খাঁজকাটা (ridged) শিখর—ব্যতিক্রমী স্থাপত্য। ১৯৬৭-তে জোড়া দেউলের একটি (ভুবনেশ্বর শিব) ভেঙে পড়ার পরে পুনর্নির্মিত হয়েছে। (ঙ) ১৬৫৩। (চ) লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনের জয়নগরের বিষ্ণুপুর মোড় হতে মথুরাপুরগামী বাসপথের কাঠপোল স্টপেজে নেমেই দেখা যাবে।

৫৬। (ক) **কবিলাসপুর, রাজনগর, বীরভূম।** (খ) ধর্ম?। (গ) করণ রূপ-দাস। (ঘ) ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের বোর্ডে লেখা হয়েছে "নিরলঙ্কার প্রস্তরনির্মিত এই মন্দিরটির কোণগুলি তীক্ষ্ণ এবং শিখরটি ক্রমহ্রাসমান আকৃতির"—এটিই যথার্থ। (ঙ) ১৬৪৩। (চ) সিউড়ি থেকে বাসে ভবানীপুরে গিয়ে আন্দাজ ১....কি.মি. হাঁটা। সিউড়ি থেকে বক্রেশ্বর বা রাজনগরগামী বাসে চন্দ্রপুর মোড়ে গিয়েও ভবানীপুরের বাস মেলে। অন্যথা সিউড়ি-রাজনগর বাসে লাউজোড়ে গিয়ে ৪... কি.মি. হাঁটাপথ।

---

* অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি; পূর্ত বিভাগ, প.ব. সরকার, ১৯৭১, পৃ: ৮১।

প্রাসঙ্গিকী

গবেষক দেবকুমার চক্রবর্তী মন্দিরটির দুটি লিপি হতে প্রাপ্ত তথ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন :

(i) সাধারণ ভাবে 'ধর্ম' মন্দির বলা হলেও লিপিতে একে হরি বা বিষ্ণুমন্দির' বলা হয়েছে।

(ii) প্রতিষ্ঠাতার নাম "করণ রূপদাস কৃতী"। করণ অর্থাৎ কায়স্থ, হয়ত ইনিই রাজনগরের মুসলমান রাজাদের সনদ অনুসারে নিষ্কর জমি-পাওয়া রূপদাস।

(iii) লিপিতে একজন 'ধর্মাত্মা যবন' শাসকের ("ধর্মাত্মা যবনো ভবেদানু যুগং ভূপৌ") কথা আছে—ইনি নিশ্চয়ই রাজনগরের মুসলমান শাসকদের একজন, এঁরা উদারতা ও সহিষ্ণুতার জন্য আজও শ্রদ্ধার পাত্র। (iv) দ্বিতীয় তথা দীর্ঘতর লিপির শেষে আছে "মেহতরি শ্রীহরিদাস"। 'মেহতরি' (ফারসী 'মেহতর্') শব্দটির অর্থ 'মেতর' বা 'মেথর'। অনুমান করা যায় হরিদাস নামে একজন নিম্নবর্ণীয় ব্যক্তি নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [কেউ কেউ মহারাষ্ট্রীয় 'মেহতরৈ' (মোড়ল) অর্থে 'মেহতরি' শব্দটিকে বুঝতে চান কিন্তু মুসলমান শাসকের অধীন অঞ্চলে ফারসী প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক]*।

৫৭। (ক) **জজান, ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ**। (খ) সোমেশ্বর শিব। (গ) কিংবদন্তি অনুসারে স্থানীয় ঘোষ পরিবারের আদি পুরুষ সোমেশ্বর ঘোষ। (ঘ) আটকোণা দেওয়ালের উপর রেখ শিখর—উচ্চতা আনু.৪৫ ফুট। পুরাতন-রীতির টেরাকোটা অলংকরণ। দ্বারশীর্ষের পঙ্খের কাজ সম্ভবত ১৯১৪-য় সংস্কারকালীন।—অঙ্গনমধ্যস্থ সর্বমঙ্গলা মন্দিরটি ১৯৪৩-এ প্রতিষ্ঠিত তবে বিগ্রহটি নাকি প্রাচীন। (ঙ) ১৭ শতকের মধ্যভাগ (চ) শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের বহরমপুর থেকে সবাসরি বাসে বা বাসে কান্দী—এখান থেকে রিক্সায় (সাত/আট কি.মি.)। **প্রাসঙ্গিকী** : মুর্শিদাবাদ জেলায় এটি-ই এ-জাতীয় একমাত্র দেউল। মুশিদাবাদ জেলায় হলেও জজান বীরভূমের নিকটবর্তী ও বাঢ়বঙ্গেব সাংস্কৃতিক বৃত্তের মধ্যে। নিকটস্থ মহাদেববাটি (বালুট) গ্রামের বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ, পায়ে হাঁটা দূরত্বের 'পাঁচথুপি' (পাঁচটি স্তূপ বা 'থুপ' থেকে নাকি এই নাম) ও জজানের পুরাতন নাম 'জয়যান' থেকে বৌদ্ধ-সম্পর্কের ইঙ্গিত মেলে। মন্দির-ক্ষেত্রের এক জায়গায় কিছু ভগ্ন প্রাচীন মূর্তির অংশ রক্ষিত আছে—সেগুলি দেখে আমরা বিশেষ-কিছু বুঝতে পারিনি।

৫৮। (ক) **কর্ণগড়, শালবনী, পশ্চিম মেদিনীপুর**। (খ) দণ্ডেশ্বর শিব। (গ) কর্ণগড় রাজপরিবার। (ঘ) মাকড়া পাথরের প্রায় ৫০ ফিট উচ্চ একাদশ-রথ রেখ দেউল ও প্রায় ২৭ ফুট উচ্চ সপ্তরথ পিড়া জগমোহন। (ঙ) ১৭ শতকের মধ্যভাগ। (চ) মেদিনীপুর শহর থেকে বাসে সহজে ভাদুতলা—এখান থেকে হেঁটে বা ভ্যানরিক্সায়, চার কি.মি.।

৫৯। (ক) **ঐ**। (খ) মহামায়া। (গ) ঐ। (ঘ) মাকড়া পাথরের সপ্তরথ রেখ দেউল (উচ্চতা আনু. ৩২/৩৩ ফুট) ও সপ্তরথ পিড়া জগমোহন। (ঙ) ঐ। (চ)ঐ।—দণ্ডেশ্বর ও মহামায়া মন্দিরদ্বয় একই ঘেরা ক্ষেত্রে। পশ্চিমের প্রবেশ দ্বারের উপরে 'যোগী খোপ' বা 'যোগী মণ্ডপ' যাকে পাথরের ত্রিতল মন্দিবও বলা যায়।

* 'বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি', প.ব. সরকার, পৃঃ ২২-২৬

প্রাসঙ্গিকী

(i) 'শিবায়ন' ('শিব-সংকীর্তন') কাব্যের কবি রামেশ্বর চক্রবর্তী ভট্টাচার্য ঘাটালের নিকটবর্তী যদুপুর থেকে শোভা সিংহের ভাই হিম্মৎ সিংহ-কর্তৃক উৎখাত হয়ে কণগড়ের রাজা রাম সিংহের (১৬৯৩-১৭১১) কাছে আশ্রয় পান ও পরে রামসিংহের পুত্র রাজা যশোবন্ত সিংহ (১৭১১-৪৯) আদেশ দিলে 'শিব-সংকীর্তন' কাব্য রচনা করেন ("পূর্ববাস যদুপুরে/হেমৎসিংহ ভাঙ্গে ঘরে/রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত,/স্থাপিয়া কৌশিকী তটে/বরিয়া পুবাণ পাঠে। রচাইল মধুর সঙ্গীত"। এবং "রাজা রামসিংহ মহাবীর/তস্য সূত যশোবন্ত/সিংহ সর্বগুণযুত/.....তস্য পোষ্য রামেশ্বর/ তদাশ্রয়ে কর‍্যা ঘর/বিরচিল 'শিব সংকীর্তন"*)। কথিত আছে যে মহামায়ার মন্দিরে যে পঞ্চমুণ্ডীর আসন আছে, সেখানে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য যোগসাধনা করতেন।

(ii) **চুয়াড় বিদ্রোহ ও রানী শিরোমণি** : ১৭৬৩-তে মেদিনীপুর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারে আসে—এরপর থেকেই স্থানীয় জায়গীরগুলি হতে স্থানীয় সর্দার ও অধিকারীদের উৎখাত করে কোম্পানি নিজ অধিকার বাড়াতে থাকে। এর বিরুদ্ধে স্থানীয় কৃষকরা তাঁদের সর্দারদের নেতৃত্বে প্রথমে ১৭৬৭ ও পরে ১৭৯৮-এ ইংরাজদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে নামে—সশস্ত্র এই বীরত্বপূর্ণ লড়াই-ই ইতিহাসে চুয়াড় বিদ্রোহ নামে পরিচিত। বিভিন্ন সরকারী প্রতিবেদনে স্বাভাবিক ভাবেই চুয়াড়দের দস্যু, দুর্বৃত্ত, হিংস্র লুঠেরা প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়—কিন্তু সর্বত্রই একথাও স্বীকার করা হয় যে হারানো জায়গীর ফিরে পাওয়ার জন্যই কৃষকরা বিদ্রোহ করেন। ইতোমধ্যে ১৭৪৯-এ কর্ণগড়ের শেষ রাজা অজিত সিংহ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে তাঁর দুই স্ত্রী, বানী শিরোমণি ও রানী ভবানী রাজত্বের অধিকারিনী হন। রানী শিরোমণি প্রথম দিকে বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। এর জন্য ইংরাজরা রানী শিরোমণিকে বন্দিনী করেন। পরে চুয়াড় বিদ্রোহীদের অন্যতম নেতা গোবর্ধন দিকপতি কর্ণগড় রাজবাড়ি দখল করলে রানী শিরোমণি ও রানী ভবানী নাড়াজোলের রাজা ত্রিলোচন খানের আশ্রয় নেন—১৮১৩-য় রানী শিরোমণির মৃত্যুর পরে কর্ণগড় নাড়াজোল রাজপরিবারের সম্পত্তি হয়।

৬০। (ক) **রেয়াপাড়া, নন্দীগ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর।** (খ) মহারুদ্র সিদ্ধিনাথ শিব। (ঘ) আনু. ৫০ ফুট উচ্চতার সপ্তরথ দেউল। 'বরণ্ড'-অংশে পাল-সেন যুগের একটি বিষ্ণুমূর্তি বসানো হয়েছে। (ঙ) ১৭ শতকের মধ্যভাগ। (চ) মেছেদা থেকে বাসে তেরপেখিয়ায় গিয়ে হলদি নদী পার হয়ে ভ্যান-রিক্সায় (৫/৬ কি.মি.)।

৬১। (ক) **কাঁকড়াকুলি (দক্ষিণ-পাড়া), ধনিয়াখালি, হুগলী।** (খ) পরিত্যক্ত দেউল, শিব। (ঘ) আনু. ৩৫/৪০ ফুট উচ্চতার অতি জীর্ণ, সম্মুখগাত্র আংশিক ভগ্ন আটকোণা দেউল। (ঙ) ১৭ শতকের মধ্যভাগ। (চ) তারকেশ্বর থেকে বাসে ধনিয়াখালি সিনেমাতলা—এখানে থেকে ভ্যানরিক্সা। গ্রামের শেষে, চাষমাঠের মধ্যে।

---

* আশুতোষ ভট্টাচার্য কর্তৃক উদ্ধৃত। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', অষ্টম সংস্করণ, দশম পুনর্মুদ্রণ, ২০০২, পৃ: ২২৪।

৬২। (ক) **মহুলা (স্থানীয় উচ্চারণে 'মোলা') সিউড়ি, বীরভূম।** (খ) মৌলেশ্বর শিব। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতার প্রস্তর-দেউল। ব্যতিক্রমী স্থাপত্য—অতি নিচু মন্দির-দ্বার, মাটিতে বসে ঢুকতে হয়। 'গণ্ডী' কাঁধে গিয়ে হঠাৎ শেষ হয়েছে, মাঝ থেকে 'গলা' বেশ খানিকটা উপরে উঠেছে এর উপরে আমলক, কলস ও দণ্ড। (ঙ) ১৭৪৯। (চ) কিছুটা দুর্গম। সিউড়ি থেকে বক্রেশ্বর/রাজনগর প্রভৃতি বাসে 'নগরী' স্টপেজ, যান মেলে না, সুতরাং ডানে বেরুনো রাস্তায় ২ কি.মি হেঁটে নগরী গ্রাম, এবার স্কুল অতিক্রম করে ডানের পথে সংরক্ষিত বনের পাশ দিয়ে ২১/২ কি.মি. হাঁটলে নবডি গ্রাম, এবার আরও ১১/২ কি.মি. হেঁটে, ডানের পথে।

৬৩। (ক) **পাঁচড়া (ভৈরবথান), খয়রাশোল, বীরভূম।** (খ) আদিনাথ শিব। (ঘ) আনু ৪০ ফুট উচ্চতার পাথর-নির্মিত দেউল, শীর্ষদেশ ভগ্ন। একবাংলা বা দোচালা জগমোহন—এটি অভিনব। (ঙ) ১৭ শতকের মধ্যভাগ। (চ) সিউড়ি বা দুবারাজপুর থেকে বাবাইজোড় বা লোকপুর-গামী বাসে পাঁচড়ায় গিয়ে রিক্সায়।

৬৪। (ক) **বিক্রমপুর, ওন্দা, বাঁকুড়া।** (খ) পরিত্যক্ত মন্দির (রাধাকৃষ্ণ)। (গ) বিষ্ণুপুর-রাজ প্রথম রঘুনাথ সিংহ। (ঘ) পাথরে নির্মিত সপ্তরথ। পিড়া রীতির জগমোনটি অংশত ভগ্ন। (ঙ) ১৬৫৩-৫৪। (চ) বাঁকুড়া শহরের গোবিন্দনগর স্ট্যাণ্ড থেকে ওন্দা-পথে বাসে বা ট্রেকারে কালিসেন—এখান থেকে রিক্সায়/হেঁটে।

৬৫। (ক) **রসা, খয়রাশোল, বীরভূম।** (খ) আদিনাথ শিব। (গ) অর্জুন রায়চৌধুরী, জমিদার, সরপী, বর্ধমান। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতার রেখ। মন্দিরের সামনে একটি ও তার পাশে এক সারিতে তিনটি মন্দির বটের গ্রাসে, সামনেরটিতে বটের কোটরের মধ্যেই পূজাপাঠ হয়। মনে হয় এই চারটি মন্দিরের অন্তত দুটি রেখ দেউলই ছিল। (ঙ) ১৬৫৪। (চ) সিউড়ি বা দুবরাজপুর থেকে বাবাইজোড় গামী বাসে সরাসরি, বাসপথের ধারেই, শিশুউদ্যানের পরে বটের আড়ালে।

৬৬। (ক) **বৈতল (উত্তরবাড়, হাটতলা), জয়পুর, বাঁকুড়া।** (খ) ঝগড়াই চণ্ডী (লৌকিক)। (গ) বিষ্ণুপুর-রাজ রঘুনাথ সিংহ। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতার প্রস্তর দেউল। সপ্তরথ। কুলুঙ্গিতে কার্তিক ও গণেশের মূর্তি। সামনে অদূরে শিবের চারচালা। (ঙ) ১৬৫৯। (চ) জয়রামবাটি থেকে ছোট বাসে বা তারকেশ্বর-খাতরা বাসে সরাসরি বা বিষ্ণুপুর থেকে বাসে বাঁকাদহের বৈতল মোড়, এখান থেকে বাস পাল্টিয়ে—বৈতলের পাতরপুকুর মোড়ে নেমে হেঁটে/ভ্যান-রিক্সায়।

৬৭। (ক) **কুমারডিহি, অণ্ডাল, বর্ধমান।** (খ) শিব। (গ) জমিদার রাজবল্লভ চৌধুরী। (ঘ) ল্যাটেরাইট পাথরে নির্মিত, উচ্চতা ৫০ ফুট উচ্চতার রেখ—গোড়া থেকে আমলকের তলা পর্যন্ত কয়েক হাত অন্তর অন্তর দুটি করে সমান্তরাল খাঁজ। বক্ররেখ শিখর-শীর্ষে আমলক, কলস ও দণ্ড। শীর্ণ প্রবেশদ্বারের দুপাশে দুটি নকল স্তম্ভ এবং তার দুদিক থেকে পাথরেরই জ্যামিতিক রেখায় আমলক-কলস-সহ রেখ দেউলের চিত্র। (ঙ) ১৬৬১। (চ) অণ্ডাল স্টেশন থেকে বাসে সরাসরি।

৬৮। (ক) **জগন্নাথপুর, বড়জোড়া, বাঁকুড়া।** (খ) রত্নেশ্বর শিব। (ঘ) বীরভূমের মহুলার দেউলের মতন, তবে প্রবেশদ্বার স্বাভাবিক। (ঙ) ১৭ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ। (চ) দুর্গাপুর থেকে বাঁকুড়ার বাসে বড়জোড়ার দুটি স্টপ পরের বাঁধকানা থেকে রিক্সায়।

৬৯। (ক) **চাতরা (চৌধুরীপাড়া, দোলতলা), শ্রীরামপুর, হুগলী।** (খ) গৌরচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র। (গ) চৈতন্য-পার্ষদ কাশীশ্বর পণ্ডিত-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ—মন্দির পরে প্রতিষ্ঠিত ও গৌরাঙ্গ-মন্দির নামে পরিচিত। (ঘ) ত্রিমন্দির (বাস্তুশাস্ত্রের 'ত্রৈকূটক' রীতিতে নির্মিত)—পাশাপাশি তিনটি শিখর, মাঝেরটি বৃহত্তম (আনু.৫০ ফুট)। তিনটি শিখরই ঘন খাঁজকাটা। (ঙ) ১৬৮০ (?)। (চ) হাওড়া ব্যাণ্ডেল লাইনের শেওড়াফুলি স্টেশন থেকে রিক্সায়।—**কিংবদন্তি:** (i) পুরী যাত্রার সময়ে মহাপ্রভু এখানে এসে কৃষ্ণের পাশে নিজের মূর্তি দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে নিজমূর্তিটি গঙ্গায় ফেলে দেন। চৈতন্য অপ্রকট হওয়ার পরে কাশীশ্বরের যোগ্য বংশজগণ আবার মন্দিরে কৃষ্ণের পাশে গৌরাঙ্গ মূর্তি স্থাপন করেন। (ii) এখানকার কৃষ্ণ-বিগ্রহ জাগ্রত জেনে বিষ্ণুপুর-রাজ বীর হাম্বির নাকি জোর করে মূর্তিটি বিষ্ণুপুরে নিয়ে যান।

৭০। (ক) **গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) কানু গোসাঁইয়ের সমাধি মন্দির। (ঘ) মাকড়া পাথরের পিড়া দেউল (উ:১৫ ফুট)। (ঙ) ১৭ শতকের শেষ দিক। (চ) ক্রম ৩৪ দেখুন।

৭১। (ক) **কেদার, দাঁতন, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) কেদার পাবকেশ্বর। (ঘ) মাকড়া পাথরের রেখ দেউল। দ্বারশীর্ষে নবগ্রহ মূর্তি। (ঙ) ১৭ শতকের শেষদিক। (চ) খড়গপুর-এগরা বাসপথের খাকুরদা থেকে চার কি.মি.।

৭২। (ক) **ঘুটগেড়িয়া, বড়জোড়া, বাঁকুড়া।** (খ) পরিত্যক্ত মন্দির—রাধাদামোদর। (ঘ) আনু. ৪০/৪২ ফুট উচ্চতার পঞ্চরথ প্রস্তর-দেউল। গণ্ডীর চারদিকে ঝম্পসিংহ। স্তূপিকায় আমলক, কলস ও দণ্ড বর্তমান। দ্বারের উপরে ও দুপাশে কিছু ভাস্কর্য। (ঙ) ১৭ শতকের শেষদিক। (চ) দুর্গাপুর থেকে মালিয়াড়া-গামী বাসপথের ঘুটগেড়িয়া হাইস্কুলের সামনে নেমে অল্প হেঁটে। বাঁকুড়া থেকে বড়জোড়া হয়ে একই পথ।

৭৩। (ক) **কামারপাড়া (বনপাস, বুড়োশিবতলা), ভাতাড়, বর্ধমান।** (খ) বুড়ো-শিব। (ঘ) ৩০ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। সামান্য টেরাকোটা অবশিষ্ট—সামনে টিনের চালের বৃহৎ মণ্ডপ ও দুপাশ ঘেঁষে ঘরবাড়ি থাকায় মন্দিরটির পূর্ণ আকার দেখা অসুবিধাজনক। (ঙ) ১৭ শতক। (চ) বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যাণ্ড থেকে কামারপাড়ার বাসে—কামারপাড়া বুড়োশিবতলা স্টপেজ।

৭৪। (ক) **সত্যপুর (মাড়োতলা), ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ)সত্যেশ্বর শিব। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতার নবরথ প্রস্তর-দেউল, গণ্ডীতে বিষ্ণুমূর্তি। নিচু পাঁচিল-ঘেরা ক্ষেত্রে শিবের আটচালা। (চ) পাঁশকুড়া থেকে টেবাগেড়্যাগামী বাসে সরাসরি।

৭৫। (ক) **ধরাপাট, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।** (খ) শ্যামচাঁদ। (ঘ) আনু. ৫০ ফুট উচ্চতার ল্যাটেরাইট পাথরের দেউল। দুই দেওয়ালে জৈন ও এক দেওয়ালে বাসুদেবের বৃহৎ মূর্তি। (ঙ) ১৭ শতক (?)। (চ) বিষ্ণুপুর থেকে অতি সহজে বাসে জয়কৃষ্ণপুর। এখান থেকে রিক্সায়, জয়কৃষ্ণপুর ও পাইকপাড়া অতিক্রম করে।

প্রাসঙ্গিকী: লিপি ও মূর্তি রহস্য

(i) ধরাপাটের দ্বারশীর্ষে একটি বিচিত্র লিপি আছে। আমাদের চারবার ধরাপাট ভ্রমণকালে,

আমরা লিপিটির যে পাঠ গ্রহণ করতে পেরেছি তা দুই দশকেরও আগে নেওয়া ড: রবীন্দ্রনাথ সামন্ত-কৃত পাঠের সঙ্গে হুবহু এক। ড: সামন্ত-কৃত পাঠটি হল :

বি	ক্র	ম	ব	দে	......
স	ক	১	৩	২	৩
ম	ল্ল	ম	হী	পা	ল
স	কা	ব্দা	১	৩	২
....					

শ্রী রাম	শ্রী	মতি	পুষ্প	দেবী	শ্রী রাম
দে কামিনা	বৈষ্ণব	শ্রী	পরমানন্দ	শর্ম্মণ	বিসাস*

সমস্যা হল আচার্য বিনয় ঘোষ দ্বিতীয় পঙক্তির ১৩২৩ শকাব্দকে পড়েছেন ১৫২৫ শকাব্দ (১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দ), এবং তৃতীয় পঙক্তির "মল্ল মহীপাল"-এর জায়গায় পড়েছেন "মল্ল মহীপাল শ্রীহম্বীর সিংহ"—মল্লরাজ বীর হাম্বীরের রাজত্বকাল মল্লাব্দ ৮৯৩ থেকে ৯২৬ (খ্রিষ্টাব্দ ১৫৮৭-১৬২০), এইভাবে দেউললিপিতে ১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দ থাকলে তা বীর হাম্বীরের রাজত্বকালের সাথে মেলে।** অন্যদিকে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম দুটি গ্রন্থে ('বাঁকুড়ার মন্দির', ১৯৬৫ এবং তৎসম্পাদিত 'বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিযার', ১৯৬৮) শকাব্দটি পড়েছেন ১৬১৬ অথবা ১৬২৬ অর্থাৎ খ্রিষ্টাব্দ ১৬৯৪ অথবা ১৭০৪—ম্যাকাচিয়ন এই তারিখ দুটিই ব্যবহার করেছেন*** এবং জর্জ মিচেল হিসেব করেছেন ১৬৯৩ বা ১৭০৩।**** এরপরে অমিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রাগুক্ত 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, ১৯৭১-এ শকাব্দটি পড়েন ১৫২৫—অর্থাৎ আচার্য বিনয় ঘোষের পাঠই মেনে নেন।—আমরা '১৫২৫' শকাব্দ বা 'শ্রীহম্বীর সিংহ' কথাগুলি লিপিতে পাচ্ছি না।

লিপিটিও বিচিত্র। এর উর্ধ্বাংশ বর্গাকার, নিম্নাংশ আয়তাকার; উর্ধ্বাংশের ভাষা প্রাচীন, নিম্নাংশের নবীন—ড: রবীন্দ্রনাথ সামন্তের ভাষায় "প্রাচীনে, অর্বাচীনে, নবীনে এমন এক নিবিড় রহস্য গড়ে তুলেছে ঐ একটি মাত্র মন্দিরলিপি যা বহু মানুষকে ভাবিয়েছে এবং আরও ভাবাবে"। লিপির নিচের অংশে উল্লেখিত রাম দে বিশ্বাস ও তাঁর পত্নী (কামিনা) পুষ্পদেবী নিকটস্থ জয়কৃষ্ণপুরের প্রাচীন জমিদার-বংশীয় বলে আচার্য বিনয় ঘোষ ও অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই তাঁদের প্রাগুক্ত রচনায় জানিয়েছেন, এবং বৈষ্ণব শ্রী পরমানন্দ শর্ম্মণ হয়ত তাঁদের গুরু—'বৈষ্ণব' শব্দটিই গুরুত্বপূর্ণ—একটি প্রাচীনতর জৈন দেউলকে বৈষ্ণব

* 'বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা', পুস্তক বিপণি, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ১২২।
** প্রাগুক্ত 'প বঙ্গের সংস্কৃতি— ১', পৃ: ৩৯১।
*** প্রাগুক্ত 'ম্যাকাচিয়ন' p. 20.
**** 'Brick Temples of Bengal from the Archives of David McCutchion', Princeton University Press, 1983, p 212

মন্দিরে পরিণত করতে গিয়ে এইসব কাণ্ড ঘটানো হয়েছে, সম্ভবত মূল লিপিরও ক্ষতি করা হয়েছে—মূর্তি-রহস্য এমনই ইঙ্গিত দেয়।

(ii) **মূর্তি রহস্য:** মূর্তি চারটি— তিনটি দেউলগাত্রে এবং একটি রাস্তার অপর পারে একটি পাকা ঘরে। দেউলটির পশ্চিমগাত্রের কুলুঙ্গিতে আছে চারফুট দু ইঞ্চি লম্বা ও দু ফুট এক ইঞ্চি চওড়া একটি জৈন দিগম্বর পার্শ্বনাথ মূর্তি, উত্তরগাত্রের বৃহৎ কুলুঙ্গিতে রয়েছে একটি প্রমাণ মাপের (লম্বায় প্রায় সাত ফুট ও চওড়ায় প্রায় তিনফুট) দিগম্বর জৈন আদিনাথ মূর্তি— দুটি মূর্তি-ই অত্যন্ত উচ্চমানের শিল্পকর্ম, আর পূবের দেওয়ালে চূড়ান্ত ছন্দপতন। ঐ দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে রয়েছে দুর্বল ও কাঁচা হাতে তৈরী তিন ফুট লম্বা একটি বাসুদেব মূর্তি। দুটি প্রশ্ন: (ক) দুটি অত উৎকৃষ্ট ভাস্কর্যের সঙ্গে একটি এত দুর্বল ভাস্কর্য কি ভাবে এল? (২) দুটি জৈন ভাস্কর্যের সঙ্গে একটি ব্রাহ্মণ্য ভাস্কর্য কিভাবে এল?—উত্তর আছে রাস্তার ওপারে, দেউলটি থেকে মাত্র ফুট ১৫/২০ দূরে একটি. পাকা ঘরে মনসা-রূপে পূজিত নাগছত্রধারী ও চারফুটের মত লম্বা জৈন তীর্থংকর মূর্তিতে। মূর্তিটিকে বিষ্ণুমূর্তিতে পরিণত করার চেষ্টা স্পষ্ট—শঙ্খ-চক্রসহ উপরের দুটি হাত খোদাই করা হয়েছে, পাদদেশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্তি খোদিত হয়েছে, নগ্ন তীর্থঙ্করের পুরুষচিহ্নটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে, এত করেও যখন হল না তখন মন্দিরেব কাছেই ফেলে রাখা হয়েছে এবং মূর্তিটির মাপ ও অনুপাত দেউলের পূর্ব দিকের কুলুঙ্গির সঙ্গে একান্তভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং অনুমান করা চলে যে আদিতে এটিই ছিল দেউলের পূর্বগাত্রের কুলুঙ্গিতে — সেখান থেকেই এটিকে ছাড়িয়ে এনে, ড: সামন্তের কথায়, 'শুধু ধর্মান্তরই নয়, লিঙ্গান্তরও' ঘটানো হয়।

৭৬। (ক) **দাঁতন (বাজারের কাছে), পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) জগন্নাথ। (ঘ) মাকড়া পাথরের নবরথ দেউল (উচ্চতা আনু. ৪৫ ফুট। (ঙ) ১৭-১৮ শতক। (চ) খড়্গপুর থেকে বাসে।

৭৭। (ক) **বালাগড়, রায়না, বর্ধমান।** (খ) শিব (পরিত্যক্ত)। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা। দ্বারশীর্ষে পুরাতন ধরণের টেরাকোটা। (ঙ) ১৭-১৮ শতক। (চ) বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যাণ্ড থেকে বাসে বোড়ো বলরাম—এই মন্দিরের সামনে থেকে বেরুনো রাস্তা ধরে সাদিপুরের দিকে কিছু হেঁটে।

৭৮। (ক) **বোড়গ্রাম, রায়না, বর্ধমান।** (খ) বলরাম (লৌকিক)। (ঘ) আনু. ৫০ ফুট উচ্চতার, রেখবর্গের তবে সারা শিখরে কচ্ছপের খোলের মত উঁচু উঁচু অলংকরণ। সামনে একবাংলা জগমোহন, পাশে পরিত্যক্ত একটি ছোট পঞ্চরত্ন। আশপাশের জমি থেকে মন্দির-ক্ষেত্র দশ বারো ফুট উঁচু, হতে পারে যে বর্তমান মন্দিরটি আরও পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের উপরে স্থাপিত—সিংহদুয়ারটি ৫০/৬০ বছর আগে সংযোজিত। (ঙ) ১৮ শতকের প্রথমে। (চ) বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যাণ্ড থেকে সরাসরি বাসে, মন্দিরের সামনেই নামা। **প্রাসঙ্গিকী** : রেবতী-বাসুদেব মন্ত্রে পূজা হলেও বোড়গ্রামের বলরাম সর্বার্থে লৌকিক কৃষি দেবতা। সুবৃষ্টির আশায় ও অনাবৃষ্টির বিপদ হতে পরিত্রাণের জন্য বলরামকে আজও 'জোলো ভোগ' দেওয়া হয়। ধর্মঠাকুরের মতন বৈশাখ মাসে বলরামেরও গাজন হয়। বলরামের হাতে লাঙ্গল দেখে মনে হয় পৌরাণিক হলধর বলরামই হয়ত লোককল্পনায় কৃষি-দেবতা বলরাম

হয়েছেন। বলরামের প্রায় ১২ ফুট উঁচু, নিমকাঠের, শ্বেতবর্ণ, গোল চক্ষু-বিশিষ্ট মূর্তিটিও আকর্ষণীয়। তিনি অর্ধেক পুরুষ (উপরের অংশ) ও অর্ধেক প্রকৃতি (নিম্নাংশ, কৃষি প্রজননের প্রতীক), তাঁর মাথার নাগছত্র (নাগ বা সাপ উর্বরতার প্রতীক) এবং তাঁর চৌদ্দটি হাত (কর্মমুখরতার প্রতীক)। এইভাবে কৃষি-সমৃদ্ধির লোককল্পনাই যেন তাঁর মূর্তিতে রূপ পেয়েছে।

৭৯। (ক) **কাষ্টখামার (ধলহরা), কেশপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) বটেশ্বর শিব। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতার মাকড়া পাথরের দেউল, পিড়া জগমোহন ও অন্তরাল। (ঙ) ১৮ শতকের প্রথমে। (চ) মোদিনীপুর শহর থেকে বাসে পঞ্চমী—এখান থেকে ভ্যানরিক্সায়।

৮০। (ক) **চন্দ্রকোণা (অযোধ্যা), পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) রঘুনাথ। (ঘ) ঝামাপাথরে নির্মিত আনু. ৭৫/৮০ ফুট উচ্চতার সপ্তরথ দেউল ও পিড়ারীতির জগমোহন। ওড়িশী ধারার স্থাপত্য। শিখরের উত্তরভাগ ভগ্ন—এই ঠাকুরবাড়িতে আরও আছে একটি রাসমঞ্চ, রামেশ্বর শিবের পঞ্চরত্ন, লালজীর আটচালা, বক্রচাল ভোগমণ্ডপ, তুলসী-মঞ্চ, বৃহৎ কিন্তু লুপ্তচাল নাটমণ্ডপ প্রভৃতি। সবই পাথরের ও সবই দর্শনীয়। (ঙ) ১৭ শতকের শেষে। (চ) পাঁশকুড়া, ঘাটাল বা মেদিনীপুর শহর থেকে বাসে চন্দ্রকোণা টাউন—এখান থেকে সব দেখানোর চুক্তির রিক্সায়।

প্রাসঙ্গিকী

বাংলার সমস্ত প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ অঞ্চলের মত চন্দ্রকোণার প্রাচীন ইতিহাসও কিংবদন্তির কুয়াশায় ঢাকা। তবে, আসাম সরকার-কর্তৃক প্রকাশিত মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭) -এর রাজত্বকালের একটি বিবরণ, 'বাহারিস্তান-ই ঘায়েবী*-তে বাংলার জমিদারদের বিরুদ্ধে মুঘল অভিযানের কাহিনীতে চন্দ্রকোণার দু'জন জমিদারের নাম আছে—চন্দ্রভান এবং বীরভান, একই সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে বরদার জমিদার দলপত তখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক। কিন্তু এই দলিলেই পরে বীরভানের নাম আছে, চন্দ্রভানের নাম নেই। হতে পারে যে বীরভান চন্দ্রভানকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, এবং এও হতে পারে যে চন্দ্রভানের নাম অনুসারে স্থানটির নাম চন্দ্রকোণা হয়েছে। আবার চন্দ্রকোণার ঠাকুরবাড়ি অঞ্চলে রক্ষিত একটি শিলালিপিতে** দেখা যাচ্ছে যে ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে বীরভানের পুত্র হরিভান বা হবিনারায়ণের পত্নী রানী লক্ষ্মণাবতী একটি নবরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা করছেন। জাহাঙ্গীরের সময়ে (১৬০৫-২৭) বীরভান চন্দ্রকোণার জমিদার থাকলে ১৬৫৫-য় তাঁর পুত্র হরিভানের রাজত্ব থাকা খুবই সম্ভব! .....এর পরে সম্ভবত ১৮ শতকের প্রথমদিকে বর্ধমানরাজ কীর্তিচাঁদ চন্দ্রকোণা অধিকার করেন।

উপরের বৃত্তান্তে চন্দ্রকোণাব রাজেতিহাসের সামান্য পরিচয় মেলে, কিন্তু এ দিয়ে চন্দ্রকোণার '৫২ বাজার ৫৩ গলি'-র প্রবাদের ব্যাখ্যা হয় না। এর উৎস হল চন্দ্রকোণার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি। পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে থাকা অজস্র মন্দির, বেণে পাড়ার জীর্ণ ও অনেকাংশে পরিত্যক্ত

* বিনয় ঘোষ কর্তৃক উদ্ধৃত। 'প. বঙ্গের সংস্কৃতি পৃ. ৯৮।

** ঐ, পৃঃ ৯৫-৯৬।

প্রাসাদের সার, ইতস্তত ভগ্ন বা ভগ্নপ্রায় নহবৎ খানা—প্রভৃতি এই সাক্ষ্য দেয়। ১৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে আঁকা ভ্যালেন্টাইনের একটি মানচিত্রে চন্দ্রকোণাকে শিলাবতী নদীর তীরের একটি সমৃদ্ধ নগর হিসাবে দেখানো হয়েছে।* আচার্য বিনয় ঘোষ জানিয়েছেন যে, ম্যাথিয়াস হলষ্টীড নামে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে চন্দ্রকোণায় ব্যবসা করতে যান—তিনি সেপ্টেম্বর ১৩, ১৬৬০-এ লেখা একটি চিঠিতে লিখেছেন যে, তিনিই প্রথম ইংরেজ যিনি জলপথে চন্দ্রকোণায় সংগৃহীত পণ্য পাঠালেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন যে, চন্দ্রকোণা চিনি, সিল্ক, অন্যান্য বস্ত্রসম্পদে সমৃদ্ধ এবং সমুদ্র খুব দূরে না হওয়ায় ও নদীসংযোগ থাকায় বাণিজ্যিক দিক থেকে গভীর সম্ভাবনাপূর্ণ।** এই বাণিজ্যই চন্দ্রকোণাকে অতিশয় সমৃদ্ধ করেছিল।

৮১। (ক) **মালঞ্চ, খড়গপুর লোকাল, পশ্চিম মেদিনীপুর**। (খ) নন্দেশ্বর শিব (ঘ) ৪০ ফুট উচ্চতাসম্পন্ন ওড়িশী ধারার সপ্তরথ দেউল, পিড়া জগমোহন। (ঙ) ১৭২৯-২০। (চ) খড়গপুর স্টেশন থেকে ছোট বাসে, সহজে।

৮২। (ক) **চণ্ডীপুর, খড়গপুর লোকাল, পশ্চিম মেদিনীপুর**। (খ) বীজেশ্বর শিব। (ঘ) ৫০/৫২ ফুট উচ্চতা, সপ্তরথ, পিড়া জগমোহন-সম্পন্ন। (ঙ) ১৭৩০। (চ) ঐ।

৮৩। (ক) **পাইকভেরি (শীতাবাস), ভগবানপুর, পূর্ব মেদিনীপুর**। (খ) শ্যামসুন্দর। (ঘ) রেখ, চারচালা জগমোহন। (ঙ) ১৭৩০। (চ) মেছেদা থেকে বাসে বাড়-ভগবানপুর, এবার ভ্যানরিক্সা।

৮৪। (ক) **বৈকুণ্ঠপুর, বর্ধমান**। (খ) গোপেশ্বর শিব। (ঘ) ২০/২৫ ফুট উচ্চতা, খাঁজকাটা শিখর, দ্বারশীর্ষে টেরাকোটা পদ্ম, দুপাশে নকল দরজা। (ঙ) ১৭৩২। (চ) বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যাণ্ড থেকে হাটগোবিন্দপুর প্রভৃতি বাসে সহজে 'গঞ্জ', এবার সামান্য হেঁটে, পঞ্চায়তনের আগে।

৮৫। (ক) **নারিকেলবেড়িয়া (অধিকারী পাড়া), উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া**। (খ) লক্ষ্মীনারায়ণ। (গ) অধিকারী পরিবার। (ঘ) ২০ ফুট উচ্চ, সপ্তরথ, সামান্য নকাশি কাজ। (ঙ) ১৭৩২। (চ) হাওড়া থেকে জয়নগরঘাট (ভায়া মুনশীরহাট) বাসে নারিকেলবেড়িয়া, এবার হেঁটে বা রিক্সায়।

৮৬। (ক) **মাইথন (দেবীস্থান), কুলটি, বর্ধমান**। (খ) কল্যাণেশ্বরী। (ঘ) আনু. ২০/২২ ফুট উচ্চতার ত্রিস্তর পাথরের পিড়া দেউল। বাঁধের দিকে আরও দু/একটি রেখ দেউল। (ঙ) ১৭৩৯। (চ) প্রাগুক্ত বরাকর থেকে অটোরিক্সায়, সহজে।

প্রাসঙ্গিকী : বেগলারের প্রতিবেদন (১৮৭২-৭৩)

(i) বরাকর নদী (বর্তমানে মাইথন বাঁধ ও জলধারা)-র ধারে কয়েকটি মন্দির রয়েছে, সবই সাম্প্রতিক কালের, হয়ত পুরাতন উপাদানের।

(ii) আকর্ষনীয়. যে এত পরেও প্রাকমুসলিমযুগীয় সমান্তরাল খিলানরীতি প্রযুক্ত হয়েছে।

* পূ.বঙ্গ রেলের প্রাগুক্ত 'বাংলায় ভ্রমণ—২' পৃঃ ১৪৯।

** প.বঙ্গের সংস্কৃতি—২, পৃঃ ১০০-১০১, পাদটীকা।

দুটি মন্দিরে লিপি আছে, কিন্তু তা নরম পাথরে সাম্প্রতিক রিলিফ পদ্ধতিতে হওয়ায় ইতোমধ্যেই পাঠের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। একটিতে কল্যানকোটের এক রাজার কথা আছে। 'কোট' শব্দটির অর্থ 'দুর্গ'—হয়ত এখানে একটি ছোট দুর্গ ছিল।

(iii) প্রধান, অর্থাৎ দেবীর মন্দিরটি বৃহৎ, নিরলংকার, পিরামিডাকৃতি ছাদ, ক্ষুদ্র অলিন্দ স্তম্ভ ও অন্ধকার কক্ষ-বিশিষ্ট।—এর বাংলা লিপিটি হল "শ্রী শ্রী কল্যাণেশ্বরী চরণ পরায়ণ শ্রীযুক্ত দেবনাথ দেবশর্মা"।

(iv) **কিংবদন্তি** : রোহিণী দেওঘর নামে এক ব্রাহ্মণ একদিন বরাকরের জল থেকে একটি সালংকারা হাত উঠতে দেখে পাঁচেটের রাজা কলয় সিংহকে জানান। রাজা সেখানে এলে দেবী তাকে স্বপ্নে একটি বিশেষ পাথর দেখিয়ে জানান যে তিনি পাথরে বিরাজ করছেন। রাজা পাথরটি গর্ভগৃহে স্থাপন করে মন্দিরটি নির্মাণ করান। পাঁচেটের রাজাদের কাশীপুরে আসা অল্পকাল আগের ঘটনা—সুতরাং মন্দিরটি খুব পুরাতন নয়।*

৮৭। (ক) **মৌলপুর, মহম্মদবাজার, বীরভূম**। (গ) মৌলেশ্বর শিব। (ঘ) মুল মন্দির রসা ও কুমারডিহির মত সমান্তরাল খাঁজকাটা তবে ইটের দেউল—কিন্তু মন্দির ঘিরে একতলা ত্রিখিলান দালান দেওয়ায়, তার উপরে শিখরের সামনে দালানের ছাদে আমলক-কলসসহ আরও একটি শিখর ও দালানের ছাদের কোণে ক্ষুদ্র রেখ দেউল যোগ করায় মূল শিখরটি অর্ধেকের বেশি দেখা যায় না। (ঙ) ১৭৪৬। (চ) সিউড়ি রামপুরহাট-বাসপথের মহম্মদবাজারে নেমে রিক্সায়—ভতুরা (লোকাল বাস দাঁড়ায়) থেকে গ্রামের পথে গিয়ে মৌলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিপরীত দিকের তুলনায় সরু পথের শেষে, মাঠের ধারে।

৮৮। (ক) **ঐ**। (খ) ভৈরবনাথ শিব। (ঘ) বাড় ও গণ্ডীর ভেদহীন বক্ররেখ—আমলকের জায়গায় ক্ষুদ্র গম্বুজ, তার উপরে কলস। নিচু প্রবেশ পথ। (ঙ) (?) (চ) ঐ—অল্প তফাতে।

৮৯। (ক) **কুলিয়া, মহম্মদবাজার, বীরভূম**। (খ) কুলেশ্বর শিব। (ঘ) কুমারডিহির রীতিতে খাঁজকাটা রেখ। একসময়কার ফুলপাথরের অলংকরণ একরকম লুপ্ত। নাটদালান মনে হয় সম্প্রতি সংযোজিত। (ঙ) ১৭৪৯। (চ) মহম্মদ বাজার বাসস্টপেজের অদূরে মহম্মদ বাজার থানার কাছ থেকে সাঁইথিয়া রোড ছেড়ে রঘুনাথপুর হয়ে হেঁটে বা রিক্সায়।

৯০। (ক) **দামোদরপুর, দাঁতন, পশ্চিম মেদিনীপুর**। (খ) বৃন্দাবনচন্দ্র। (গ) দাসমহাপাত্র পরিবার। (ঘ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চতা, চারচালা জগমোহন, রেখ, কুলুঙ্গিতে বড় মাপের টেরাকোটা। (ঙ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ। (চ) এগরা-খড়গপুর বাসে সাউড়ী, এবার হেঁটে বা ভ্যানরিক্সায়।

৯১. (ক) **খারড়, খেজুরী, পূর্বমেদিনীপুর**। (খ) মহারুদ্রেশ্বর শিব, (ঘ) রেখ দেউল ও রেখ জগমোহন। টেরাকোটা-সম্পন্ন। (ঙ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ। (চ) মেছেদা থেকে বাসে হেঁড়িয়া, এর পর হেঁটে বা ভ্যানরিক্সায়। কাঁথি থেকেও সহজে আসা যায়।

৯২. (ক). **মেদিনীপুর শহর (বিবিগঞ্জ), পশ্চিম মেদিনীপুর**। (খ) দুর্গা। (ঘ) ৫০ ফুট উচ্চতার রেখ। (ঙ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ। (চ) শহরের বিক্সায়।

* প্রাগুক্ত 'Report' pp 154-55.

৯৩। (ক) **ভাণ্ডীরবন, সিউড়ি, বীরভূম।** (খ) ভাণ্ডীশ্বর শিব। (গ) রামনাথ ভাদুড়ী (মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ান)। (ঘ) আনু. ৪৫ ফুট উচ্চতার চোখা-খাড়া রেখা দেউল। বাড় ও গণ্ডী-ভেদ নেই। সমতল-গাত্র। (ঙ) ১৭৫৪। (চ) সিউড়ী থেকে আমজোড়া বা জামতাড়ার বাসে সরাসরি। দ্র: কিংবদন্তি অনুসারে ভাণ্ডীরবন হল বিভাণ্ডক ঋষির সাধন-স্থল। তাই শিব এখানে বিভাণ্ডীশ্বর বা ভাণ্ডীশ্বর।

৯৪। (ক) **মাহেশ, শ্রীরামপুর, হুগলী।** (খ) জগন্নাথ। (গ) নিমাইচরণ মল্লিক (বর্তমান মন্দির) (ঘ) রসা বা কুমারডিহির বিপরীতে 'বাড়' ও 'গণ্ডী'-র ভেদরেখা স্পষ্ট, আবার উড়িষ্যার বক্ররেখ শিখরের বিপরীতে কৌণিক শিখর। ব্যতিক্রমী স্থাপত্যের দেউল। (ঙ) ১৭৫৫ (বর্তমান মন্দির)। (চ) হাওড়া-শ্রীরামপুর বাসে—মন্দিরের প্রবেশ পথের সামনেই নামা। হাওড়া-ব্যাণ্ডেল শাখার শ্রীরামপুর স্টেশন থেকে রিক্সাতেও যাওয়া যায়।

প্রাসঙ্গিকী

(i) মাহেশের জগন্নাথের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রার খ্যাতি বর্তমান মন্দিরের চেয়ে প্রাচীন।

(ii) হান্টারের 'স্ট্যাটিসটিকাল এ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল' এবং ১৮৯৬-এ প্রকাশিত 'লিস্ট অফ এনসিয়েন্ট মনুমেন্টস ইন বেঙ্গল'-এ মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরকে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগের বলা হয়েছে—কিন্তু সে মন্দির লুপ্ত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে, শোনা যায় যে সেই পুরাতন মন্দিরের ইট সাজিয়েই নাকি বর্তমান মন্দিরের মাটি সমান করা হয়।*

(iii) একটি গুরুত্বপূণ দলিলে দেখা যাচ্ছে যে ১০৬০ হিজরী অর্থাৎ ১৬৮২ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল জায়গীরদার জগন্নাথ মহালকে নিষ্কর ঘোষণা করছেন ও জগন্নাথের তৎকালীন সেবায়েৎ রাজীব চক্রবর্তীকে 'অধিকারী' খেতাব দিচ্ছেন—দলিলটি নিচে উদ্ধার করা হল :

ঁজগন্নাথদেব ঠাকুর

নওয়াব খাঁনে আলী খাঁন

> **লিখিত** : চৌধুরিয়ান ও কাননগুয়ান পরগণে বোড়ো সরকার সাঁতগাও জায়গিরি শ্রীযুক্ত ঁ সাহেব জিউ মৌজে জগন্নাথপুর খারিজা জমা শ্রীযুক্ত ঁসেবার অর্থে দরোবস্ত হাসিল ও জঙ্গলবত্তস্ সীমা বদ্‌প্‌ স-জলস্থল দেবোত্তর দিলাম জুতিয়া জোতাইয়া শ্রী রাজীব অধিকারী সেবা করহ। কস্মিন কালে ইহার জমার সহিত দায় নাই। ইতি সনে জমা ছিল তাহা আসরা পরগণায় দিলাম। ইতি ১০৬০ (হাজার ষাটি) ১৯শে রমজান। (সাক্ষী) অস্পষ্ট শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সেন, শ্রীসেবারাম রায়, শ্রীরাঘব দত্ত।**

পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও এই দলিল অনুসারেই শ্রীরামপুরের জগন্নাথ মহালকে নিষ্কর রাখেন।—দেখা যাচ্ছে যে সপ্তদশ শতকের আশির দশকের গোড়াতে শ্রীরামপুরের জগন্নাথক্ষেত্র এত প্রতিপাত্তিশালী যে মুঘল জায়গীরদারও তার স্বীকৃতি দিচ্ছেন। এমন প্রভাব অল্পদিনে হয়

---

* সুধীরকুমার মিত্র : 'হুগলী জেলার দেবদেউল', অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯৯, পৃ: ৫৬।

** ঐ, পৃ: ৫৭।

না। কাজেই আদি মন্দিরটি ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—হান্টার প্রমুখের এই মত গ্রহণযোগ্য। তবে আদি স্থাপত্যটি এখন নেই।

৯৫। (ক) **বক্রেশ্বর, দুবরাজপুর, বীরভূম**। (খ) বক্রেশ্বরনাথ শিব। (গ) দর্পনারায়ণ (বীরভূমরাজ আসদ্‌জামানের মন্ত্রী)। (ঘ) রেখ, প্রস্তর-নির্মিত, সামনের মণ্ডপ পরে সংযোজিত। (ঙ) ১৭৬৩ (বর্তমান মন্দির)। (চ) দুবরাজপুর, সিউড়ি বা রামপুরহাট (তারাপীঠ) থেকে বাসে।

প্রাসঙ্গিকী

বক্রেশ্বর একাধারে গুহ্য শৈবতীর্থ ও শক্তিতীর্থ বা সতীপীঠ। অঘোরপন্থী শৈব-তান্ত্রিক সাধক অঘোরীবাবার সাধন-ক্ষেত্র বক্রেশ্বরে সিদ্ধিলাভ করেছেন আরও অনেক তান্ত্রিক সাধক। এখন থেকে ৫০/৬০ বছর আগেও স্থানটি ছিল নির্জন ও গুহ্য সাধানার উপযুক্ত। অন্যদিকে এখানে সতীর শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় 'মন' (দুই ভ্রু-র মধ্যবর্তী স্থান) পতিত হওয়ায় (অন্য মতে দেবীর দক্ষিণ বাহু) এটি শ্রেষ্ঠ সতীপীঠও বটে। এখানে প্রাপ্ত প্রাচীন ও অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দিনী, হরগৌরী প্রভৃতি মূর্তি ও স্থান-ঐতিহ্য হতে আচার্য বিনয় ঘোষের মনে হয়েছিল যে শৈব-শাক্ততীর্থ বক্রেশ্বরের "প্রাচীনতাও অতীতের হিন্দুযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া আশ্চর্য নয়।"*

বক্রেশ্বরের গরম ও ঠাণ্ডা জলের কুণ্ড ছাড়া আকর্ষণ করে কম করে ৪৩-টি মন্দির—এর মধ্যে ৩৬টি চারচালা, ১টি আটচালা, ৪-টি শিখর দেউল, ১-টি আটকোণা ও ১-টি দালান-রীতির মন্দির। মন্দিরগুলির মধ্যে কয়েকটি ২০ শতকের অন্যগুলি উনিশ শতকের এবং এইগুলিই বেগলার দেখেছিলেন।

বেগলারের প্রতিবেদন (১৮৭২-৭৩)

(i) তাঁতিপাড়ার কাছেই রয়েছে তীর্থ বক্রেশ্বর (বেগলারের বানানে 'বকেশ্বর' 'Bakeswar') —এখানে কয়েকটি নোংরা পুকুরপাড়ে কতগুলি মন্দিরের গুচ্ছ আছে।

(ii) প্রধান মন্দিরটি বৃহৎ—বৈজনাথের রীতিতে নির্মিত। এর লিপিটি ক্ষয়িত।

(iii) অন্য ছোট ও অসংখ্য মন্দিরগুলি স্পষ্টতই আধুনিক কালের—এগুলি ইট বা পাথরে নির্মিত—পাথরগুলি কোনটা মসৃণ করা হয়েছে, কোনটা হয়নি।

(iv) গরম জলের কুণ্ডগুলি হতে গন্ধকের গন্ধ আসে—এগুলিকে সঠিকভাবেই নানা রোগের নিরাময়কারী ভাবা হয়।

(v) মূল মন্দিরের পথের দুপাশে সার দিয়ে বসে থাকেন নগ্নপ্রায় যোগীগণ। **

—লক্ষ্যণীয়, বেগলার বক্রেশ্বর শিবের মন্দিরকে বৈজনাথ ধারার বলেছেন, ওড়িশী বলেননি। আমাদের ধারণা এই কথাটিই ঠিক। বক্রেশ্বরের গণ্ডী কাঁধের কাছে হঠাৎ শেষ হয়েছে, ওড়িশী ধারার মত নিখুঁত বক্ররেখায় আমলকের নিচে মিলিত নয়— নিকটস্থ কবিলাসপুর ও মহুলার দেউলেও এরকম হয়েছে।

---

* প্রাগুক্ত 'প.বঙ্গের সংস্কৃতি—১', পৃ: ২৫৪।

** প্রাগুক্ত 'Report', pp. 146-47.

৯৬। **(ক) বাসুদেবপুর, (হাটতলা), দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (ঘ) আনু.৩০ ফুট উচ্চতার পঞ্চরথ রেখ দেউল। সামান্য নকাশি কাজ। (ঙ) ১৭৬৬। (চ) পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে বাসুদেবপুর স্টপেজ।

৯৭। **(ক) বাসুদেবপুর, এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর।** (খ) জগন্নাথ। (ঘ) আনু. ৫০ ফুট উচ্চতার নবরথ দেউল— পিঢ়া রীতির জগমোহন। সামান্য পঙ্খের কাজ। (ঙ) অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ। (চ) হাওড়া থেকে বাসে কাঁথি অথবা এগরা— এবার, কাঁথি-এগরা (বা এগরা-কাঁথি) বাসে উঠে— বাসুদেবপুর স্টপেজে নামা।

৯৮। **(ক) পঁচেটগড়, পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর।** (খ) কিশোর রায়। (গ) দাস মহাপাত্র পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল, জগমোহন পিঢ়া রীতির হ'লেও চাল বাংলার খড়ো-চালের মত 'কোর' দেওয়া বা বক্র— এই হিসেবে ব্যতিক্রমী। ঘেরা মন্দির ক্ষেত্রে পাশেই ত্রিখিলান দুর্গামণ্ডপ ও তার পাশে আড়াআড়ি খ'ড়ো চালের সম্ভবত ভোগমণ্ডপ। রাস্তার ঠিক বিপরীতে পঞ্চেশ্বর শিবের রাজসিক তোরণসহ মন্দির। (ঙ) অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ। (চ) এগরা থেকে মেছেদামুখী বাসে উঠে নিমজা স্টপেজে নেমে ভ্যান-রিক্সায়।

৯৯। **(ক) খানাকুল, হুগলী।** (খ) ঘণ্টেশ্বর শিব। (গ) মটুক কারক ও কানাইলাল দে (বর্তমান মন্দির)। (ঘ) আনু. ৫০ ফুট উচ্চতার ব্যতিক্রমী ধরণের 'রেখ' দেউল'। 'বাঢ়'-এর উপর 'গণ্ডী' থাকলেও 'বেঁকি' (কণ্ঠ) ও 'আমলক' নেই— চারচালা জগমোহন। (ঙ) অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ। (চ) আরামবাগ থেকে 'গড়ের হাট'-বাসে খানাকুল হয়ে রিক্সায়। **প্রাসঙ্গিকী** : মন্দির-ক্ষেত্রে আরও কটি গৌণ দেবালয় আছে— শ্মশানকালী, বিশালাক্ষী, অন্নপূর্ণা, ষষ্ঠী, ধর্মঠাকুর, গৌর-নিতাই। এই স্থানকে তাই বলা হ'য়েছে 'গুপ্তকাশী' এবং এর 'পতি' বা 'প্রধান' হ'লেন ঘণ্টেশ্বর শিব— "গুপ্তকাশীধামপতিং ভজ ঘণ্টেশ্বরম্।" নহবৎ খানা ও নাটমন্দির শোভা আরও বাড়িয়েছে।

১০০। **(ক) মানকর, (রায়পুর), বুদবুদ, বর্ধমান।** (খ) দেউলেশ্বর শিব। (গ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতার টেরাকোটা ও পঙ্খের কাজে সমৃদ্ধ দেউল। (ঘ) অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ। (ঙ) বর্ধমান থেকে ট্রেনে মানকর— এবার রিক্সায়। বুড়ো শিবতলার পিছনে।

প্রাসঙ্গিকী

বানিজ্য, বিদ্যাচর্চা ও স্বচ্ছল জমিদারী— এই তিনের সমন্বয় মানকরকে একসময় ঐহিক সমৃদ্ধি ও বিদ্বৎ সমাজে প্রতিষ্ঠা, দুই-ই এনে দিয়েছিল। তাঁতশিল্প (এখানকার 'বেনারসী চেলী', তসর ও মাছ ধরার জালের 'মুগো সুতো' ছিল বিখ্যাত), গহনা-শিল্প, ধানচালের আড়ৎদারী প্রভৃতি মানকরের অর্থনীতিকে রীতিমত চাঙ্গা রাখত। অন্যদিকে বর্ধমানের রাজপরিবার মানকরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। এখানকার শ্যামসুন্দর গোস্বামী ছিলেন বর্ধমানরাজ জগৎরামের দীক্ষাগুরু, তাঁর পুত্র ভক্তলাল গোস্বামী বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রকে দীক্ষা দিয়ে রায়পুরে ব্রহ্মোত্তর পান। এই গোস্বামী বংশই হন রায়পুরের জমিদার। এই বংশধারার হিতলাল মিশ্র ছিলেন একাধারে জমিদার, নীলকুঠির মালিক এবং প্রখর বিদ্যোৎসাহী।

তিনি পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা তো ক'রতেনই, এছাড়াও তিনি নিজে গীতার একটি ভাষ্য রচনা ক'রেছিলেন এবং পুঁথির একটি বৃহৎ সংগ্রহ গ'ড়ে তুলেছিলেন। অন্যদিকে তিনি একটি মসজিদের জন্য নিষ্কর জমি ও পুকুরও দান করেন। আচার্য বিনয় ঘোষ জানিয়েছেন যে হিতলালের দৌহিত্র রাজকৃষ্ণ দীক্ষিত হ'লেন বাংলার প্রথম জমিদার যিনি ১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলনে কারাবরণ করেন। ('পশ্চিম-বঙ্গের সংস্কৃতি', প্রথম খণ্ড, ১৯৯৫ মুদ্রণ, পৃষ্ঠা ১২০)। মানকরের বিখ্যাত পণ্ডিতগণের মধ্যে আরও ছিলেন, মদনমোহন সিদ্ধান্ত, গদাধর শিরোমণি, যাদবেন্দ্র সার্বভৌম প্রমুখ। এছাড়া ন্যায়শাস্ত্রের প্রখ্যাত পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দন গোস্বামীর জন্মস্থান হ'লো মানকর।

১০১। **(ক) অর্জুননগর, ভগবানপুর, পূর্বমেদিনীপুর।** (খ) মদন-গোপাল। (গ) রাণী সুগন্ধা (মাজনা-মুঠা রাজবংশ) (ঘ) আনু. ৫০ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। 'ভূমি' থেকে 'বরণ্ড' পর্যন্ত অংশ খাঁজকাটা। (ঙ) অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের মেছেদা থেকে বাসে কালীনগর— সেখান থেকে ভ্যান রিক্সায়।

১০২। (ক) বর্ধমান শহর, (খোসবাগান, শ্যামসায়র), বর্ধমান। (খ) ঈশানেশ্বর শিব। (গ) আনু. ১৮/২০ ফুট উচ্চতার রেখ। কয়েকটি ভাস্কর্য। (ঘ) অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ। (ঙ) বর্ধমান স্টেশন থেকে রিক্সায়— বিজয়চাঁদ হাসপাতাল ও রাজ কলেজের কাছে।

১০৩। **(ক) পলাশী, (সোনাপলাশী), বর্ধমান।** (খ) বুড়ো শিব। (গ) আনু ৩০ ফুট উচ্চতা— টেরাকোটা সম্পন্ন। (ঘ) ১৭৮২। (ঙ) বর্ধমান-কুসুমগ্রাম বাসে। কুড়মুনের লাগোয়া।

১০৪। **(ক) দিগনগর, বুদবুদ বর্ধমান।** (খ) আনু. ৪৫ ফুট উচ্চ। সম্প্রতি সংস্কৃত। (গ) ১৭৮৩। (ঘ) বুদবুদ-মানকর-গুসকরা বাসে আনন্দবাজারে নেমে ভ্যানরিক্সায়— বাঁধানো চাঁদনি ও পুকুর ছেড়ে, গ্রামের দিকে।

১০৫। **(ক) গন্তার, মেমারি, বর্ধমান।** (খ) চণ্ডী। (গ) টেরাকোটা-সমৃদ্ধ দেউল। (ঘ) হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনের মেমারী ষ্টেশান-সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে মন্তেশ্বরগামী বাসে।

১০৬। (ক) **বেঁউদিয়া, (শিববাজার), ভগবানপুর, পূর্ব মেদিনীপুর।** (খ) শিব। (গ) রায় পরিবার। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতার পঞ্চরথ রেখ দেউল— চারচালা জগমোহন সহ। (ঙ) অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক। (চ) মেছেদা-পটাশপুর-এগরা সড়কে— মেছেদা স্টেশান লাগোয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে সরাসরি বাসে।

১০৭। **(ক) পিঙলা, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) পিঙ্গলাক্ষী। (গ) আটকোণা, চারচালা ছাদ— চালাদেউল? (ঘ) অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক (?) (ঙ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বালিচক থেকে বাসে/ট্রেকারে।

১০৮। **(ক) পাথরা, মেদিনীপুর সদর, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) শীতলা (বুড়িমা)। (গ) মুখোপাধ্যায় পরিবার। (ঘ) আনু. ২০/২২ ফুট উচ্চতা— সম্প্রতি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক পূর্ণ সংস্কৃত। (ঙ) অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক। (চ) খড়গপুর-মেদিনীপুর বাসে আমতলা— এখান থেকে ট্রেকারে। নবরত্ন ছেড়ে এগিয়ে— বাঁধরাস্তার ধারে।

১০৯। **(ক) জাড়া, (সরকার পাড়া)।** (খ) শিব। (গ) প্রতিষ্ঠালিপি অনুসারে, "কমলিনি সম গিন্নিমার খরচাতে" মাণিক্যরাম মিস্ত্রী এটি নির্মাণ করেন। (ঘ) আনু. ১৮ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। (ঙ) ১৮১৬। (চ) ঘাটাল বা চন্দ্রকোণা থেকে বাসে ক্ষীরপাই। এখান থেকে রামজীবনপুরগামী বাসে।

১১০। **(ক) আদিত্যপুর, বোলপুর, বীরভূম।** (খ) শিব। (গ) রুদ্রায়ণ আচার্য্য। (ঘ) রেখ (উচ্চতা আনু. ২০ ফুট)— দ্বার-শীর্ষে টেরাকোটা অলংকরণ। (ঙ) ১৮১৭। (চ) বোলপুর থেকে বাসে/রিক্সায় কঙ্কালীপীঠ যাওয়ার পথে।

১১১। **(ক) মুকসুদপুর, খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) কাশীনাথ শিব। (গ) ভূঁইয়া পরিবার। (ঘ) চারচালা জগমোহনসহ আনু. ২০/২২ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। (ঙ) ১৯ শতকের প্রথম দিক। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বালিচক ষ্টেশান থেকে বাসে অতি সহজে ডেবরা—সেখান থেকে মেদিনীপুরগামী বাসে গিয়ে বসন্তপুর স্টপেজে নেমে ভ্যান রিক্সায় (আন্দাজ, ৭/৮ কি. মি.)।

১১২। **(ক) ব্রাহ্মণখলিশা, দাঁতন, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) সিদ্ধেশ্বর শিব। (গ) আনু. ৩০/৩৫ ফুট উচ্চ রেখ দেউল। সামনের দেওয়াল টেরাকোটা-শোভিত। প্রবেশদ্বারে মনোরম কাঠ-খোদাই। (গ) ১৯ শতকের প্রথমে। (ঘ) কাঁথি বা এগরা থেকে খড়গপুর-গামী বাসে গিয়ে জাহালদা স্টপেজে নেমে ভ্যান রিক্সায়।

১১৩। **(ক) চড়াইগ্রাম, দাঁতন, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) রাধা-গোবিন্দ। (গ) দাস-অধিকারী পরিবার। (ঘ) প্রায় ২৫ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। (ঙ) ১৯ শতকের প্রথম দিক। (চ) কাঁথি বা এগরা থেকে খড়গপুরের বাসে গিয়ে, কাশমলি স্টপেজে নেমে অল্প হাঁটা।

১১৪। **(ক) আদলাবাদ, এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর।** (খ) রাধামোহন। (গ) দাস পরিবার। (ঘ) আনু. ৪৫ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। খাঁজকাটা শিখর। পিরামিডাকৃতি জগমোহন। কিছু পঙ্খের কাজ। (ঙ) ১৯ শতকের প্রথম দিক। (চ) হাওড়া/খড়গপুর/কাঁথি থেকে বাসে এগরা। এগরার পূর্বালোচিত হটনাগর শিবের মন্দিরের পাশের পুকুর ঘেযে মূল রাস্তা থেকে ভিতরপানে চলা পথে রিক্সায়।

১১৫। **(ক) আলঙ্গিরী, এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর।** (খ) ভৈরবনাথ শিব। (গ) ৩০/৩৫ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। জীর্ণ। (ঘ) ১৯ শতকের প্রথম দিক। (ঙ) এগরা থেকে বাসে/ট্রেকারে আলঙ্গিরী স্টপেজে নেমে রিক্সায় (ভ্যান)— রাধাগোকুলানন্দের একরত্ন বাঁয়ে রেখে বিখ্যাত রঘুনাথ-নবরত্ন মন্দিরের পথে, ডানে।

১১৬। **(ক) চণ্ডীবুড়ি, ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) কুমারীনাথ মহাদেব। (গ) ৩০/৩৫ উচ্চতার রেখ দেউল। (ঘ) ১৯ শতকের প্রথম দিক। (ঙ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বালিচক স্টেশান থেকে ডেবরা হ'য়ে মেদিনীপুরগামী বাসে উঠে 'চণ্ডীবুড়ির' থানের পাশেই নামা।

১১৭। **(ক) কিশোরপুর, ভগবানপুর, পূর্ব-মেদিনীপুর।** (খ) কিশোরজীউ। (গ) কিশোর রায় (মাজনামুঠা রাজবংশ)। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল— সঙ্গের ত্রিখিলান দালান

একে বৈশিষ্ট্য দান ক'রেছে। (ঙ) অষ্টাদশ শতকের শেষদিক। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের মেছেদা ষ্টেশান লাগোয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে পটাশপুর ও এগরাগামী বাসে সরাসরি কিশোরপুর।

১১৮। **(ক) বালসি, (পূর্বপাড়া), পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া।** (খ) বিষ্ণু (শালগ্রাম)। (গ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল, খাঁজকাটা শিখর। সামান্য টেরাকোটা। (ঘ) ১৮ শতকের শেষে বা ১৯ শতকের শুরুতে। (ঙ) বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যাণ্ড থেকে পাত্রসায়ের হয়ে বিষ্ণুপুরগামী বাসে।

১১৯। **(ক) মলুটি, (রাজবাড়ি এলাকা), শিকারীপুর, ঝাড়খণ্ড।** (খ) শিব। (গ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। ঘন খাঁজকাটা শিখর। দ্বারশীর্ষে ফুলপাথরের কাজ। (ঘ) ১৮ শতকের শেষে বা ১৯ শতকের প্রথমে। (ঙ) রামপুরহাট (বীরভূম) থেকে অটো-রিক্সা বা গাড়ী রিজার্ভ ক'রে যাওয়াই (আন্দাজ ১৫ কি. মি.) সবথেকে সুবিধাজনক।

১২০। **(ক) ভালকী, আউসগ্রাম, বর্ধমান।** (খ) শিব। (গ) রেখ। আনু. ২৫ ফুট উচ্চতা। নিরলংকার। (ঘ) ১৮০২। (ঙ) মানকর থেকে গুসকরামুখী বাসে অভিরামপুর— এখান থেকে ভ্যান-রিক্সায়।

১২১। **(ক) জনার্দনপুর, দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) সীতারাম। (গ) চক্রবর্তী পরিবার। (ঘ) আনু. ১৮/২০ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। প্রবেশপথের উপর টেরাকোটা। (ঙ) ১৮১৪। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের পাঁশকুড়া থেকে ঘাটাল-গামী বাসে গিয়ে বেলতলা স্টপেজে নেমে ভ্যান-রিক্সায় কলমীজোড় ও কিশোরপুর হ'য়ে (আন্দাজ ৮/৯ কি. মি.)।

১২২। **(ক) দেউলী, বোলপুর, বীরভূম।** (খ) দেউলেশ্বর শিব। (গ) রেখ। উচ্চতা আনু. ৫০ ফুট। কিছু টেরাকোটা ফলক। (ঘ) ১৮২৪। (ঙ) বোলপুর-ইলামবাজার বাসে— সুপুরের পরের স্টপেজ রাইপুর থেকে রিক্সায়। **প্রাসঙ্গিকী** : অজয় নদের এক পারে বীরভূমের দেউলী, অপর পারে বর্ধমান জেলার অতি প্রাচীন পাণ্ডু রাজার ঢিবি। প্রকৃত পক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে দেউলীতে আদি ঐতিহাসিক যুগের মৃৎপাত্রাদি আবিষ্কৃত হ'য়েছে। পরবর্তীকালে এখানে বেশ কিছু দেবদেবীর প্রস্তর মূর্তিও আবিস্কৃত হ'য়েছে। চৈতন্যমঙ্গল-এর কবি লোচন দাসের শ্রীপাট দেউলীর কাছে, কাঁকুটিয়া গ্রামে। জনশ্রুতি, দেউলী গ্রামে একটি পাথরের উপর ব'সেই নাকি লোচনদাস 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন।

১২৩। **(ক) রত্নেশ্বরবাটি, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) হটনাগর শিব। (গ) ভূঁইয়া পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল, কিছু টেরাকোটা। (ঙ) ১৮২৯। (চ) পাঁশকুড়া থেকে বাসে ঘাটাল— ঘাটাল বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সায়।

১২৪। **(ক) থুপসরা, নানুর, বীরভূম।** (খ) শিব। (গ) ২০/২৫ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। তিনদিকে টেরাকোটা। (ঘ) ১৮৩৩। (ঙ) বোলপুর থেকে বাসে নানুর, সেখান থেকে রিক্সায় সরাসরি মন্দিরক্ষেত্রে।

১২৫। **(ক) পলাশপাই, (দক্ষিণপাড়া), দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) শ্রীধর। (গ) মাইতি পরিবার। (ঘ) আনু. ৩২/৩৩ ফুট উচ্চতার সপ্তরথ রেখ দেউল। টেরাকোটা-

শোভিত। (ঙ) ১৮৩৪। (চ) পাঁশকুড়া থেকে ঘাটালের বাসে গৌবা। গৌরা থেকে নিয়মিত চলা ট্রেকারে আজুড়িয়া— তার লাগোয়া।

১২৬। **(ক) উখরা, অন্ডাল, বর্ধমান।** (খ) শিব। (গ) আনু ৫০ ফুট উচ্চতার ও গভীর রথ-বিশিষ্ট রেখ দেউল। সামান্য টেরাকোটা। (ঘ) ১৮৩৬। (ঙ) রাণীগঞ্জ-আসানসোলগামী ট্রেনে অন্ডাল—ষ্টেশান-চত্বর থেকেই বাসে উখরা।

১২৭। **(ক) বীরসিংহ, (ঘোষপাড়া), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) শীতলানন্দ শিব। (গ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। (ঘ) ১৮৩৭। (ঙ) পাঁশকুড়া ষ্টেশান-চত্বর বা ঘাটাল থেকে খরার-গামী বাসে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ (স্থানীয় উচ্চরণে বীরসিং)।

১২৮। **(ক) রাজনগর, (হাটতলা), দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) শীতলানন্দ শিব। (গ) আনু. ১৮ ফুট উচ্চতার সপ্তরথ রেখ দেউল। (ঘ) ১৮৩৮। (ঙ) পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে বকুলতলা স্টপেজে নেমে রিক্সায় (সাকুল্যে আন্দাজ ৬ কি.মি)।

১২৯। **(ক) সুরানয়নপুর, দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) পার্বতীনাথ শিব। (গ) আনু. ১৫ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। সামান্য টেরাকোটা। (ঘ) ১৮৩৯। (ঙ) উপরে বলা পথের ডিহিচেতুয়া থেকে মাত্র ২ কি. মি.। শীতলানন্দ শিবের আটচালা মন্দিবের কাছে।

১৩০। **(ক) হরিশপুর, (সামুইপাড়া), উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া।** (খ) বাস্তু শিব। (গ) সামুই পরিবার। (ঘ) ১৬/১৭ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। (ঙ) ১৮৪১। (চ) হাওড়া থেকে বাসে মুনশীর হাট হয়ে কবি ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান পেঁড়ো— সেখান থেকে ভ্যান রিক্সায় বা হেঁটে।

১৩১। **(ক) লোয়াদা, (হাটতলা), ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) শিব। (গ) প্রতিষ্ঠাতা -- ? কারিগর : বৃন্দাবনচন্দ্র মিস্ত্রী। (ঘ) আনু ২০ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। (ঙ) ১৮৪৩। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের পাঁশকুড়া থেকে বাসে সরাসরি লোয়াদা— সেখানকার হাটতলায়।

১৩২। **(ক) দেবীপুর, মেমারি, বর্ধমান।** (খ) লক্ষ্মী-জনার্দন। (গ) নরোত্তম সিংহ। (ঘ) প্রায় ৬০ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল, খাঁজকাটা শিখর। এক বাংলা জগমোহন; পিছন ছাড়া তিনদিকে ইষৎ বড় মাপের সুন্দর টেরাকোটা। (ঙ) ১৮৪৪। (চ) হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনের দেবীপুব ষ্টেশানে নেমে বাস অথবা রিক্সায় (আন্দাজ ৩ ৩½ কি.মি.)।

১৩৩। **(ক) চন্দ্রামেড়, ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) কাশীনাথ শিব। (গ) চট্টোপাধ্যায় পরিবার। কারিগর : আনন্দ মিস্ত্রী। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। অদূরে ১৭ চূড়া রাসমঞ্চ। (ঙ) ১৮৪৪। (চ) পাঁশকুড়া থেকে পূর্বোক্ত লোয়াদা, সেখান থেকে ত্রিলোচনপুর-গামী বাসে গোলগ্রাম (সর্বমঙ্গলার নবরত্ন ও লক্ষ্মীনারায়ণের পঞ্চরত্ন)— এর কাছেই (১ কি. মি.) চন্দ্রামেড়।

১৩৪। **(ক) রাজনগর, দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) শিব। (গ) বসু পরিবার। (ঘ) আনু. ১২/১৩ ফুট উচ্চতার ছোট দেউল। (ঙ) ১৮৪৫। (চ) পূর্বোক্ত রাজনগর হাটতলার শীতলানন্দ শিবের দেউল ও শীতলার দালানের অদূরে।

১৩৫। **(ক) কালনা, বর্ধমান।** (খ) প্রতাপেশ্বর শিব। (গ) রাজা প্রতাপচাঁদের প্রথমা মহিষী—

প্যারিকুমারি দেবী। (ঘ) ২০/২৫ ফুট উচ্চতার ঘন খাঁজকাটা শিখর ও চারপাশই মনোহর টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। (ঙ) ১৮৪৯। (চ) হাওড়া-কাটোয়া লাইনের অম্বিকা-কালনা স্টেশানে নেমে রিক্সায় বা হেঁটে '১০৮ মন্দির'—তার ঠিক বিপরীতে, ২৫ চূড়া লালজী মন্দির ক্ষেত্রে। **প্রাসঙ্গিকী** : ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে 'মহারাজা' প্রতাপচাঁদের ''মৃত্যু'' বা রহস্যজনক 'অন্তর্ধান' ঘটেছিল কালনাতেই— এরপর ১৮৩৫-এ আবার প্রতাপচাঁদের ''আবির্ভাব'', তাকে ''জাল'' ঘোষণা করা ও সে সম্পর্কিত মামলা একসময় আলোড়ন সৃষ্টি ক'রেছিল।

১৩৬। **(ক) আমনপুর, (দক্ষিণপাড়া), কেশপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) বুড়ো শিব। (গ) বসু পরিবার। (ঘ) আনু. ১৪/১৫ ফুট উচ্চতার মাকড়া পাথরে নির্মিত দেউল। দ্বারশীর্ষে ও দুপাশে টেরাকোটা ফলক। বরন্ড-শীর্ষেও আড়াআড়ি একসার টেরাকোটা ফলক। (ঙ) ১৯ শতকের প্রথমার্ধ। (চ) মেদিনীপুর শহর থেকে চন্দ্রকোণা-মুখী বাসে কুঁয়াপুর, সেখান থেকে আন্দাজ ৪½/৫ কি. মি.— সরাসরি ভ্যান রিক্সায়।

১৩৭। **(ক) মীর্জাপুর, পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর।** (খ) গোপাল। (গ) দাস পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০/৩৫ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। চারচালা জগমোহন। কিছু টেরাকোটা। (ঙ) ১৯ শতকের প্রথমার্ধ। (চ) নৈপুর (ক্রমাঙ্ক ১৯৩) থেকে অতি সহজে, বড়জোড় এক কি. মি.।

১৩৮। **(ক) কাঁকড়া-শিবরাম, ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) শিব। (গ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। নিরলংকার। (ঘ) ১৯ শতকের প্রথমার্ধ। (ঙ) পাঁশকুড়া থেকে বাসে লোয়াদা— ওখান থেকে টানা ভ্যানরিক্সায় (আন্দাজ ২½/৩ কি. মি.)।

১৩৯। **(ক) চাঁদুল, জগৎবল্লভপুর, হাওড়া।** (খ) পরিত্যক্ত দেউল (রঘুনাথ)। (গ) আনু. ৩০/৩২ ফুট উচ্চতার দেউল— অনেকটা বীরভূম শৈলীর মত চোখা শিখর। (ঘ) ১৯ শতকের প্রথমার্ধ। (ঙ) হাওড়া থেকে মুনশীরহাটগামী বাসে পাতিহাল— ওখান থেকে রিক্সায় অতি সহজে।

১৪০। **(ক) কৈতারা, গলসী, বর্ধমান।** (খ) শিব। (গ) কর্মকার পরিবার। (ঘ) আনু. ৫০ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। (ঙ) ১৯ শতকের প্রথমার্ধ। (চ) বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে গোহগ্রামগামী বাসে সরাসরি কৈতারা।

১৪১। **(ক) সর, আউসগ্রাম, বর্ধমান।** (খ) শিব। (গ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতার আটকোণা দেউল। অতি জীর্ণ ও বৃক্ষাক্রান্ত। (ঘ) ১৯ শতকের প্রথমার্ধ। (ঙ) ক্রমাঙ্ক (১৬৪) দেখুন। সরেশ্বরের সুউচ্চ দেউলের সামান্য তফাতে— রাস্তার অপরপারে।

১৪২। **(ক) মানকর, (রায়পুর— বুড়োশিবতলা), বুদবুদ, বর্ধমান।** (খ) শিব। (গ) আনু. ১২/১৪ ফুট উচ্চতার আটকোণা দেউল। অতি করুণ ও জীর্ণদশাপ্রাপ্ত। অলংকরণ-লুপ্ত। (ঘ) ১৯ শতকের প্রথমার্ধ। (ঙ) ক্রমাঙ্ক দেখুন। ওখানে বলা বুড়োশিবের মন্দিরের নাটমন্দিরের সামনের রাস্তার অপরধারে, একটি পুকুরপারে।

১৪৩। **(ক) গৌরা, (মন্ডলপাড়া), দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) বিশ্বেশ্বর শিব।

(গ) মন্ডল পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। (ঙ) ১৮৫০। (চ) পাঁশকুড়া থেকে ঘাটালের বাসে সহজেই গৌরা।

১৪৪। **(ক) ঐ (দক্ষিণপাড়া)।** (খ) মহাপ্রভু। (গ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। (ঘ) ১৯ শতকের মধ্যভাগ। (ঙ) ঐ।

১৪৫। **(ক) নারায়ণগড়, (হাঁদলা-মধ্যপাড়া) পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) রসবিলাসেশ্বর শিব। (গ) আনু. ১৭/১৮ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। (ঘ) ১৯ শতকের মধ্যভাগ। (ঙ) খড়গপুর ষ্টেশান-সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে বেলদাগামী বাসে সদর নারায়ণগড়— সেখান থেকে ভ্যান রিক্সায় কসবা-নারায়ণগড় হ'য়ে।

১৪৬। **(ক) দন্দীপুর, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) শিব। (গ) আনু. ২০/২২ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। প্রবেশদ্বারের দুপাশে টেরাকোটা দ্বারপাল। (ঘ) ১৯ শতকের মধ্যভাগ। (ঙ) পাঁশকুড়া থেকে ইড়পালা-গামী বাসে দন্দীপুর।

১৪৭। **(ক) চকবাজিত, ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) শ্রীধর। (গ) দে পরিবার। (ঘ) আনু. ২০/২২ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। কাঠের দরজায় নকাশি কাজ। (ঙ) ১৯ শতকের মধ্যভাগ। (চ) পাঁশকুড়া থেকে ডেবরা-গামী বাসে ধামাতোড়-এ গিয়ে ভ্যান রিক্সায়।

১৪৮। **(ক) মেদিনীপুর শহর, (সুজাগঞ্জ, ভীমতলা চক), পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) জগন্নাথ। (গ) আনু. ৭০ ফুট উচ্চতার নবরথ রেখ দেউল— চারচালা জগমোহন। সামান্য টেরাকোটা। দরজার পাল্লায় দশাবতার-কাঠ খোদাই-এর কাজ। (ঘ) ১৮৫১। (ঙ) মেদিনীপুর স্টেশান বা বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সায়।

১৪৯। **(ক) বসনছোড়া, (উত্তরপাড়া), চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) শিব। (গ) সরকার পরিবার। কারিগর : গিরীশচন্দ্র সূত্রধর। (ঘ) আনু. ১৫ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। (ঙ) ১৮৫৬। (চ) চন্দ্রকোণা টাউন থেকে কয়েকটি বাস সরাসরি বসনছোড়া গ্রামে যায়। না পেলে, ঐ একই জায়গা থেকে ট্রেকারে (বা অন্য বাসে) গোসাঁইবাধ পর্যন্ত গিয়ে হেঁটে।

১৫০। **(ক) লোয়াদা, ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) রাধাগোবিন্দ (পবিত্যক্ত)। (গ) আনু. ৪৫ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। চারচালা জগমোহন। টেরাকোটা-সম্পন্ন। (ঘ) ১৮৬০। (ঙ) পাঁশকুড়া থেকে বাসে সরাসরি লোয়াদা— স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়ের কাছে দেউলটি।

১৫১। **(ক) সুরুল, (পশ্চিমপাড়া), বোলপুর, বীরভূম।** (খ) শিব। (গ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতার ঘন-খাঁজকাটা শিখর সম্পন্ন দেউল। জীর্ণ কিন্তু ভাল মানের টেরাকোটা সমৃদ্ধ। (ঘ) ১৮৬১। (ঙ) বোলপুর-শান্তিনিকেতন থেকে রিক্সায় ৩ কি. মি.।

১৫২। **(ক) বলরামপুর, ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) সীতারাম। (গ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চতার সপ্তরথ রেখ দেউল। পিঢ়া-রীতির জগমোহন। (ঘ) ১৮৬১। (ঙ) লোয়াদা থেকে কাঁকড়া-শিবরাম (৩ কি. মি.) হ'য়ে আরও ১/১½ কি. মি. ভ্যানরিক্সায়।

১৫৩। **(ক) শ্রীপুর, দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) শীতলানন্দ শিব। (গ) কারিগর : বৈষ্ণবদাস মিস্ত্রী। (ঘ) আনু. ৪৫ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। টেরাকোটা দ্বারপাল।

(ঙ) ১৮৬২। (চ) পাঁশকুড়া থেকে ঘাটালের বাসে খুকুড়দহ— সেখান থেকে ভ্যানরিক্সায় (বা হেঁটে)।

১৫৪। **(ক) চকবাজিত, ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) রামেশ্বর শিব। (গ) কারিগর : ঠাকুরদাস শীল। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। (ঙ) ১৮৬৬। (চ) ক্রমাঙ্ক ১৪৭ দেখুন।

১৫৫। **(ক) রাজপুরা, খড়গপুর লোকাল, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) শিব। (গ) দত্ত পরিবার। (ঘ) আনু. ২৫ উচ্চতার রেখ দেউল। (ঙ) ১৮৬৮। (চ) খড়গপুর ষ্টেশান চত্বর থেকে ছোট বাসে বিখ্যাত মালঞ্চ গ্রামে গিয়ে সামান্য হাঁটাপথে।

১৫৬। **(ক) জয়ন্তী, (লাহাপাড়া), আমতা, হাওড়া।** (খ) শিব। (গ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতার সপ্তরথ রেখ দেউল। (ঘ) ১৮৬৮। (ঙ) হাওড়া ষ্টেশান-চত্বর থেকে বাসে নারিট— সেখান থেকে বড়জোর ১ কি. মি.।

১৫৭। **(ক) পিঙ্‌লা পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) সদানন্দ শিব। (গ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতার সপ্তরথ রেখ দেউল। দুটি টেরাকোটা মালাজপকারী মূর্তি। (ঘ) ১৮৬৯। (ঙ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বালিচক ষ্টেশান থেকে বাসে বা ট্রেকারে।

১৫৮। **(ক) পুতুন্ডা, বর্ধমান।** (খ) শিব। (গ) পিড়া (?) ধরণের দেউল। (ঘ) ১৮৭০। (ঙ) হাওড়া-বর্ধমান লাইনের শক্তিগড় ষ্টেশান থেকে রিক্সায়।

১৫৯। **(ক) সারতা, সবং, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) লক্ষ্মী-জনার্দন। (গ) দত্ত পরিবার। (ঘ) আনু. ৫০ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। টেরাকোটা-শোভিত। দেউলের সামনে পঙ্খ-অলংকৃত ১৭ চূড়া রাসমঞ্চ। (ঙ) ১৮৭০। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বালিচক ষ্টেশান থেকে দেহাটি-গামী বাসে চাঁদকুড়ি, সেখান থেকে ভ্যানরিক্সায়।

১৬০। **(ক) গোহগ্রাম, গলসী, বর্ধমান।** (খ) রাধা-দামোদর। (স্থানীয়রা বলেন, রাধা-গোবিন্দ)। (গ) চন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী। (ঘ) আনু. ৭০/৭৫ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। মনোহর টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। সুউচ্চ প্রাচীর ও রাজসিক দালানবেষ্টিত। (ঙ) ১৮৭১। (চ) বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে সরাসরি, গোহগ্রামের বাসে। **প্রাসঙ্গিকী** : বলা হয়, গোপচন্দ্রের মল্লসারুল তাম্রশাসনে উল্লেখিত গোধগ্রাম-ই বর্তমান গোহগ্রাম— সেক্ষেত্রে গ্রামটি যথেষ্ট প্রাচীন।

১৬১। **(ক) দলপতিপুর, (মিদ্যাপাড়া), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) শীতলানন্দ শিব। (গ) মিদ্যা-পরিবার। (ঘ) আনু. ২০/২৫ ফুট উচ্চতার সপ্তরথ রেখ দেউল। (ঙ) ১৮৭২। (চ) পাঁশকুড়া বা ঘাটাল থেকে বাসে খড়ার-এ গিয়ে রিক্সায় বা হেঁটে। **প্রাসঙ্গিকী** : 'বাহারিস্তান-ই-ঘায়েবী'তে চন্দ্রকোণার জমিদার চন্দ্রভানের নিকটাত্মীয় ও বরদার অপ্রাপ্তবয়স্ক জমিদাররূপে দলপতের উল্লেখ আছে।

১৬২। **(ক) দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) পরিত্যক্ত মন্দির। (গ) পাল পরিবার। (ঘ) আনু. ১৭/১৮ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল — ক্ষুদ্র জগমোহন-বিশিষ্ট। (ঙ) ১৯ শতকের

দ্বিতীয়ার্ধ। (চ) পাঁশকুড়া থেকে ঘাটালগামী বাসে সরাসরি দাসপুর। দাসপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছে দেউলটি দেখা যাবে।

১৬৩। **(ক) সুপুর, বোলপুর, বীরভূম।** (খ) শিব (পরিত্যক্ত মন্দির)। (গ) আনু. ১৫ ফুট উচ্চতার ঘন-খাঁজকাটা শিখর-সম্পন্ন দেউল। (ঘ) ১৯ শতকেব দ্বিতীয় অর্ধ। (ঙ) বোলপুর হ'তে ইলামবাজারের বাসে অতি সহজেই সুপুর।

১৬৪। **(ক) সর, (সরবৃন্দাবন), আউসগ্রাম, বর্ধমান।** (খ) সরেশ্বর (গ্রামদেবতা)। (গ) অন্তত ৬০/৬৫ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। নিরলংকার। সামনের নাটমন্ডপ পরে সংযোজিত। (ঘ) ১৯ শতক। (ঙ) বর্ধমান থেকে ট্রেনে/বাসে গলসী, এখান থেকে ভ্যানরিক্সায়। দু/একটা সরাসরি বাসও আছে।

১৬৫। **(ক) শেরাণ্ডী (ধর্মতলা),** বোলপুর, বীরভূম। (খ) ধর্ম। (ঘ) আনু. ৩০/৩৫ ফুট উচ্চতার খাঁজকাটা রেখ দেউল। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) বোলপুর থেকে বাসাপাড়া/কাটোয়া বাস।

১৬৬। **(ক) ইলামবাজার (বামুন-পাড়া) বীরভূম।** (খ) শিব। (গ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। ঘন খাঁজকাটা শিখর দ্বারশীর্ষে ও সামনের দেওয়ালগাত্রে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট টেরাকোটা (ঘ) ১৯ শতক। (ঙ) বোলপুর থেকে বাসে, এবার রিক্সায় বা হেঁটে।

১৬৭। **(ক) ঐ।** (খ) পরিত্যক্ত দেউল। (গ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতার ঘন খাঁজকাটা শিখরের বীরভূম-বর্ধমান শৈলীর দেউল। (ঘ) ১৯ শতক। (ঙ) ঐ। সামান্য আগে। মূল রাস্তার পাশে একটি পাঁচিলের ভিতর-পাশ ঘেষে।

১৬৮। **(ক) পাঁচড়া, খয়রাশোল, বীরভূম।** (খ) শিব। (গ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতার ঘন খাঁজকাটা শিখর-সম্পন্ন বীরভূম-বর্ধমান শৈলীর দেউল। (ঘ) ১৯ শতক। (ঙ) ক্রমাঙ্ক (৬৩) দেখুন। ওখানে বলা ভৈরবথানের অল্প আগে।

১৬৯। **(ক) গোকুলনগর, জয়পুর, বাঁকুড়া।** (খ) গন্ধেশ্বর শিব। (গ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতার পাথরে নির্মিত সপ্তরথ রেখ দেউল। সংস্কৃত। (ঘ) ১৯ শতকে পুননির্মিত? (ঙ) জয়রামবাটি-কোতুলপুর-বিষ্ণুপুর বাসে যাত্রা ক'রে কুম্ভস্থল বা জয়পুর থেকে রিক্সায়।

১৭০। **(ক) ঐ।** (খ) ভুবনেশ্বর শিব। (গ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতার পাথরের দেউল। সংস্কৃত। (ঘ) ১৯ শতক। (ঙ) ঐ। গন্ধেশ্বর-মন্দির হ'তে মোরাম রাস্তায় গ্রামের ভিতর দিকে।

১৭১। **(ক) আমরারগড়, আউসগ্রাম, বর্ধমান।** (খ) দুগ্ধেশ্বর শিব (বুদ্ধেশ্বর শিব?) (গ) আনু. ৫০/৬০ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। সংস্কৃত ও সংস্কারে টেরাকোটা লুপ্ত। (ঘ) ১৯ শতক। (ঙ) পূর্বোক্ত মানকর থেকে রিক্সায়— বাসও আছে।

প্রাসঙ্গিকী

অমরারগড়ে এখন গড় নেই আশপাশের ঢিবিগুলির মধ্যে গড়ের স্মৃতি আছে। দশম-একাদশ শতকেই হয়ত অমরারগড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। অমরারগড়ের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা মহেন্দ্রনাথ

তাঁর স্ত্রী অমরাবতীর নামে গড় নির্মাণ কবান ব'লেই জায়গাটির নাম অমরারগড় হয়েছে এমন বলা হয়। তিনিই খাজুরডিহির (কাটোয়ার কাছে) জগৎসিংহের বাড়ি থেকে জোর ক'রে সিংহবাহিনী মূর্তি নিয়ে এসে স্বগ্রামে 'শিবাখ্যা' নামে প্রতিষ্ঠা করেন— শিবাখ্যা আজও অমরারগড়ের অতীব মান্য দেবী। দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'শিবাখ্যা-কিঙ্কর' কাব্যে এইসব কীর্তি বর্ণিত আছে। যাই হোক, নিকটবর্তী কাঁকসার সদ্‌গোপ রাজা ১৩/১৪ শতকে সৈয়দ বোখারীর আক্রমণে ধ্বংস হ'লেও অমরারগড়ের রাজ্য ১৭ শতক পর্যন্ত টিকেছিল— ১৭ শতকে বর্ধমানের রাজাদের আক্রমণে এই রাজত্ব লোপ পায়।

১৭২। **(ক) চকদীঘি, জামালপুর, বর্ধমান।** (খ) শিব। (গ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। বীরভূম-বর্ধমান রীতি। অতি জীর্ণ। সামান্য টেরাকোটা। (ঘ) ১৯ শতক। (ঙ) তারকেশ্বর থেকে বাসে, ও চকদীঘি ফকিরতলা স্টপেজে নেমে।

১৭৩। **(ক) আমাদপুর, মেমারি, বর্ধমান।** (খ) মদন-গোপাল। (গ) রেখ। আনু. ৩০ ফুট। নিরলংকার। (ঘ) ১৯ শতক। (ঙ) বর্ধমান মেইন লাইনের মেমারি থেকে রিক্সায়।

১৭৪। **(ক) কয়রাপুর, বর্ধমান।** (খ) সিংহবাহিনী। (গ) আনু. ৪০/৪৫ ফুট উচ্চতা। নিরলংকার। (ঘ) ১৯ শতক। (ঙ) বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যাণ্ড থেকে সরাসরি বাসে।

১৭৫। **(ক) মৌখিরা, আউসগ্রাম, বর্ধমান।** (খ) শিব। (গ) মৌখিরার রায় উপাধিধারী সদ্‌গোপ বংশীয় জমিদার পরিবার। (ঘ) আনু. ১৫/১৬ ফুট উচ্চতার ব্যতিক্রমী দেউল। দুপাশ উঁচু ও মাঝখানটি নিচু হ'য়ে অর্ধবৃত্তাকারে ঢেউ খেলানো দেওয়াল। আচার্য বিনয় ঘোষের ভাষায় "অদ্ভুত গড়নের" (প. বঙ্গের সংস্কৃতি, ১, ১৯৯৫, পৃ: ২৭১)। বড় বড় (১ থেকে ২ বর্গফুট) টেরাকোটা ফ্রেমে বড় মাপের টেরাকোটা মূর্তিগুলি (অধিকাংশই বিনষ্ট), প্রায় সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ধারার। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) বোলপুর বা ইলামবাজার থেকে পানাগড়গামী বাসে অজয় নদের উপরকার সেতু পেরিয়ে বসুধা স্টপেজে নেমে মৌখিরা ও কালিকাপুরের সব মন্দির ইত্যাদি দেখানোর চুক্তিতে ভ্যান রিক্সায়।

১৭৬। **(ক) ঐ।** (খ) শিব। (গ) ঐ (ঘ) আনু. ২০/২৫ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। বীরভূম-বর্ধমান শৈলী। দ্বারশীর্ষে কিছু টেরাকোটা অবশিষ্ট। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) ঐ। উপরে বলা "অদ্ভুত গড়নে"র দেউলের পথে।

১৭৭। **(ক) ঐ।** (খ) শিব (পরিত্যক্ত দেউল)। (গ) ঐ। (ঘ) আনু. ২০/২৫ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। দ্বার ও বাকী তিনদিকের বরন্ডশীর্ষে মনোমুগ্ধকর টেরাকোটা। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) ঐ।

১৭৮। **(ক) মানকর, (ভট্টাচার্যপাড়া), বুদবুদ, বর্ধমান।** (খ) শিব। (ঘ) রেখ। বাঁ-পাশ ও পিছনের দেওয়ালে সুন্দর টেরাকোটা। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) মানকর উচ্চবিদ্যালয় অতিক্রম করলেই বাঁয়ে পাড়ায় ঢোকা রাস্তার ডানে দেখা যাবে।

১৭৯। **(ক) ঐ (আনন্দময়ী কালীতলার কাছে)।** (খ) মল্লিকেশ্বর শিব। (ঘ) আনু. ২৫/২৬ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। বীরভূম-বর্ধমান শৈলী। কিছুটা অন্তর অন্তর আড়াআড়ি ও সমান্তরাল

খাঁজকাটা শিখর। দেউলের ডানপাশের দেওয়ালে পঙ্খের নকল জানালা ও দরজা। অন্যান্য দেওয়াল গাত্রের অলংকরণ সম্ভবত সংস্কারে লুপ্ত। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) অমরারগড়মুখী রাস্তার ধারে।

১৮০। **(ক) সোনামুখী, (চন্দ্রপাড়া) বাঁকুড়া।** (খ) শিব। (গ) চন্দ্র পরিবার। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতার খাঁজকাটা শিখর-সম্পন্ন রেখ দেউল। প্রবেশদ্বারের উপরে ও দুপাশে টেরাকোটা অলংকরণ জীর্ণ হ'লেও আকর্ষণীয়। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) বর্ধমান বা বিষ্ণুপুর থেকে সোনামুখীর বাসে সোনামুখী বাজারপাড়া— এখানে শ্রীধরের অনন্য টেরাকোটা-সমৃদ্ধ ২৫ চূড়া মন্দির ছেড়ে সামান্য দক্ষিণে।

১৮১। **(ক) ঐ। (রাণীর বাজার)।** (খ) শিব। (গ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। নিরলংকার। খাঁজকাটা শিখর। (ঘ) ১৯ শতক। (ঙ) ঠিক আগেরটিতে বলা বাসে রাণীর বাজার স্টপেজ।

১৮২। **(ক) এরুয়ার, (বেণীচত্বর), ভাতাড়, বর্ধমান।** (খ) শিব। (গ) আনু. ২০/২২ ফুট উচ্চতার দেউল। ঘন খাঁজ-কাঁটা শিখর। দ্বারশীর্ষে ও দুপাশে কিছু জীর্ণ-টেরাকোটা অবশিষ্ট। (ঘ) ১৯ শতক। (ঙ) বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে সরাসরি বাসে। **প্রাসঙ্গিকী** : এরুয়ার গ্রামটি খুবই প্রাচীন। বীরভানপুর, পাণ্ডুরাজার ঢিবি, বনকাটি, বাণেশ্বরডাঙা, সাঁওতালডাঙা, মঙ্গলকোট, ভরতপুর প্রভৃতির মতন বর্ধমান জেলার বিভিন্ন গ্রামে যেমন, এরুয়ারেও তেমন প্রাচীন পাথরের যুগ থেকে প্রায় ধারাবাহিক গোষ্ঠীজীবনের সাক্ষ্য মিলেছে।

১৮৩। **(ক) পাইকপাড়া, (জয়কৃষ্ণপুর), বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।** (খ) শিব। (গ) আনু. ২০/২২ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। নিরলংকার। (ঘ) ১৯ শতক। (ঙ) বিষ্ণুপুর শহরের রসিকগঞ্জ বাসস্ট্যাণ্ড থেকে সোনামুখীগামী বাসে জয়কৃষ্ণপুর (৬ কি. মি.)। মূল বাসরাস্তা হ'তে যে পাকা রাস্তা অযোধ্যার দিকে গেছে, সেই রাস্তা ধরে জয়কৃষ্ণপুর অতিক্রম ক'রলেই পাইকপাড়া।

১৮৪। **(ক) আজুরিয়া, দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) শীতলা। (গ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। পঙ্খের কাজ ও কিছু টেরাকোটা এখনও বর্তমান। (ঘ) ১৯ শতক। (ঙ) পাঁশকুড়া থেকে বাসে গৌরা-য় গিয়ে ট্রেকারে।

১৮৫। **(ক) মোহনপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।** (খ) বিশালাক্ষী। (গ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতার সপ্তরথ রেখ দেউল। (ঘ) ১৯ শতক। (ঙ) এগরা থেকে বাসে/ট্রেকারে সরাসরি।

১৮৬। **(ক) শ্রীপুর, বলাগড়, হুগলী।** (খ) শিব। (গ) ১৫/২০ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল। খাঁজকাটা শিখর। (ঘ) ১৯ শতক। (ঙ) হাওড়া-কাটোয়া লাইনের বলাগড় ষ্টেশানে নেমে টানা রিক্সায়।

১৮৭। **(ক) সৈদাবাদ, (ঘাটবন্দর— বৈকুণ্ঠবিশ্রাম ঘাট), বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।** (খ) রাজীবেশ্বর শিব। (গ) রাজীবলোচন রায়ের উইল অনুসারে বৈকুণ্ঠ সেন এবং গোকুলচন্দ্র গুহ। (ঘ) লালচে বেলে পাথরে নির্মিত। উচ্চতা আনু. ৩০ ফুট। চোখা সূক্ষ্মাগ্র শিখর। (ঙ) ১৮৯১। (চ) বহরমপুর শহর বাসস্ট্যান্ডের অনতিদূরে গঙ্গার উপর সেতুর নিকট হ'তে 'কাজী নজরুল ইসলাম সরণী'র 'ঘাটবন্দর' ছাড়িয়ে, রাস্তার ডানে।

১৮৮। **(ক) খটনগর (সায়ের), আউসগ্রাম, বর্ধমান।** (খ) শিব। (গ) স্থানীয় কিংবদন্তি অনুসারে বুলচাঁদ রায়। (ঘ) আনু ২৫ ফুট উচ্চতার চিত্তাকর্ষক দেউল। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) বোলপুর বা ভেদিয়া থেকে বাসে উত্তর-রামনগর স্টপেজ এখান থেকে উত্তর-রামনগর এবং খটনগরের সব মন্দির দেখানোর চুক্তিতে ভ্যান রিক্সায়। গুসকরা থেকেও যাওয়া চলে।

১৮৯। **(ক) ঐ (খিড়কী পুকুর)** (খ) শিব। (গ) বুলচাঁদ রায়। (ঘ) ফুট কুড়ি উচ্চতার চমৎকার দেউল— অসাধারণ টেরাকোটার বেশির ভাগই অপহৃত। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) ঐ। মজুমদারদের পঞ্চরত্নের পিছনে, পুকুরপাড়ে।

১৯০। (ক) **ইলামবাজার (হাটতলা), বীরভূম।** (খ) বিগ্রহ নেই, তবে বছরে একবার গৌরাঙ্গ-মূর্তি এনে পূজা হয়। (ঘ) আনু. ১২/১৩ ফুট উচ্চতার আটকোণা দেউল—আটটি কোণই অত্যন্ত মনোরম টেরাকোটায় সুসজ্জিত। (ঙ) ১৯ শতকের শেষে। (চ) বোলপুর থেকে বাসে সহজে ইলামবাজার—বাসস্ট্যাণ্ড-লাগোয়া বাজারে।

১৯১। (ক) **খামারপাড়া (সাহাগঞ্জ-খামারপাড়া), চুঁচুড়া, হুগলী।** (খ) গন্ধেশ্বরী। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও পিরামিডাকৃতি শিখর-বিশিষ্ট। সামনে পাঁচখিলান-যুক্ত বড় নাটমণ্ডপ—এর শেষে দেবীর ভৈরব শিবের গোল পিপার মতন আকারে ছোট মন্দির। (ঙ) ১৯ শতকের শেষে। (চ) চুঁচুড়া-বাঁশবেড়িয়া বাসে খামারপাড়ার গন্ধেশ্বরীতলা।

১৯২। (ক) **মল্লারপুর, ময়ূরেশ্বর, বীরভূম।** (খ) সিদ্ধেশ্বরী—ক্ষেত্রে আরও ২৬ টি মন্দির আছে। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতার আটকোণা দেউল, সামনে একবাংলা জগমোহন। (ঙ) জগমোহনটির গায়ে খোদিত আছে '১১২৪', কিন্তু এটি শকাব্দ, মল্লাব্দ না বঙ্গাব্দ তা বোঝার উপায় নেই—? (চ) রামপুর হাট-সিউড়ি বাসপথের মল্লারপুর বটতলা স্টপেজ, বাসরাস্তার অদূরে।

১৯৩। (ক) **নৈপুর, পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর।** (খ) মদনমোহন। (গ) দাসকানুনগো পরিবার। (ঘ) আনু. ৫০/৬০ উচ্চতা ও চারচালা জগমোহন-সম্পন্ন সপ্তরথ দেউল। (ঙ) স্থানীয়ভাবে শোনা গেছে মন্দিরটি নাকি ৩০০/৩৫০ বছরের পুরাতন, কিন্তু দেখে আমরা নিশ্চিত নই—? (উল্লেখ্য এই গ্রামের শেষে তুলনায় ছোট আর একটি শিবের দেউল আছে, এটি ১৯ শতক-শেষের)। (চ) মেছেদা-এগরা বাসে।

[উল্টোপদ্ম শিখর : মুর্শিদাবাদ-রীতি]

১৯৪। (ক) **বড়নগর, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।** (খ) ভবানীশ্বর শিব। (গ) রানী ভবানী। (ঘ) আনু. ৭০ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট, আটকোণা, আট দিকেই ঢাকা বারান্দা, আটটি কৌণিক খিলানেই চুনবালির কাজ, শীর্ষ থেকে অতি বিশাল এক উল্টানো পদ্মের আটটি পাঁপড়ি আটকোণের দেওয়ালে নেমে এসেছে। (ঙ) আনু. ১৭৫৩। (চ) শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের জিয়াগঞ্জ থেকে গঙ্গা পার হয়ে বা ট্রেনে কাটোয়া হয়ে আজিমগঞ্জ—এখান থেকে গঙ্গার তীর ঘেষে উত্তরে রিক্সায় / হেঁটে, চারবাংলা মন্দিরের পরে।

১৯৫। (ক) **জঙ্গীপুর (সদরঘাট, বাবুবাজার)**, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা, আটকোণা, উল্টো-পদ্ম শিখব---সম্প্রতি সংস্কৃত। (ঙ) ১৮ শতক (চ) লালগোলা বা বহরমপুর থেকে বাসে জঙ্গীপুর---বাসস্ট্যাণ্ড থেকে হেঁটে বা রিক্সায়---সিংহ পরিবারের দ্বিতল রামসীতা মন্দিরের পথে।

১৯৬। (ক) **ঐ**। বারুই-পাড়া। (খ) শিব। (ঘ) আনু. ১২/১৪ ফুট উচ্চতার। পূর্ববৎ। পূর্ণ সংস্কৃত। (ঙ) ১৭৬৩। (চ) বাবুবাজার থেকে মূল পিচ্-রাস্তা ধবে এগিয়ে, বৃন্দাবনবিহারীর বিশাল দালান-মন্দিরের পথে।

১৯৭। (ক) **ঐ। বাগিচাবাড়ি**। (খ) শিব। (ঘ) বিস্তৃত চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ (গোবর্দ্ধনযাত্রা প্রাঙ্গণ)-এর চারকোণে চারটি, অষ্টকোণ, উল্টেপদ্ম শিখর দেউল, আনু. ২৫ ফুট করে উচ্চতা, কিছু পঙ্খের কাজ---প্রাঙ্গণ-কেন্দ্রে রঘুনাথের ত্রিতল মন্দিরের ধ্বংস-স্তূপ। (ঙ) ১৮ শতকের শেষদিক। (চ) পূর্বোক্ত বারুই-পাড়া হতে একই মূল রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে।

১৯৮। (ক) **রঘুনাথগঞ্জ (বাজার), মুর্শিদাবাদ**। (খ) শিব। (ঘ) আনু. ১৮/২০ ফুট উচ্চতার, পূর্ববৎ স্থাপত্য, পূর্ণ সংস্কৃত। (ঙ) ১৮ শতক। (চ) জঙ্গীপুর থেকে গঙ্গা পার হলেই রঘুনাথগঞ্জ (লালগোলা ও বহরমপুর থেকে বাসও আছে)---এখানকার বাজারে তুলসীবিহারীর বিশাল দালান-মন্দিরের পরে দোকানপাটের মধ্য দিয়ে সরু পথ পেবিয়ে অন্যদিকের রাস্তার পাশে।

১৯৯। (ক) **ব্যাসপুর (কাশিমবাজার)**, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব। (গ) রামকেশব দেবশর্মন---পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের পিতা। (ঘ) আনু ৬৫/৭০ ফুট উচ্চতা, ৩০/৩৫ ফুট উঁচু ও বক্র কার্ণিশযুক্ত আটকোণা দেওয়ালের একই উচ্চতার উল্টানো পদ্মের আটটি দল---সামনে আনু.১৫ ফুট উচ্চতার ও মনোহর টেরাকোটা-সজ্জিত এক বাংলা জগমোহন। (ঙ) ১৮১১। (চ) শিয়ালদহ-লালগোলা শাখার কাশিমবাজার স্টেশনের প্রায় সংলগ্ন ডাচ সমাধিক্ষেত্রের বিপরীত পারের রাস্তায়, রেলগেট পেরিয়ে, সোজা।

২০০। (ক) **নশীপুর**, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব। (গ) রায় পরিবার। (ঘ) **পঞ্চায়তন** নামে পরিচিত বৃহৎ পঞ্চরত্ন মন্দিরের সামনে আনু. [illegible]০ ফুট উচ্চতার---পিরামিডাকৃতি জগমোহন। (ঙ) ১৯ শতকের শেষে। (চ) লালগোলা শাখার মুর্শিদাবাদ স্টেশন থেকে রিক্সায় বা ঘোড়ার গাড়ীতে। নশীপুব রাজবাড়ির নহবৎ-খানার বিপরীতে গঙ্গামুখী পথে সামান্য গিয়ে ডানে ঘুরে সামান্য গিয়ে বাঁয়ের গলিতে।

২০১। **(ক) ঐ**। (খ) শিব। (গ) রায় পরিবার। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতা। (ঙ) ১৯ শতকের শেষে। (চ) ঐ, পিছন দিকে, পথের ধারে।

২০২। (ক) **ঐ**। (খ) শিব। (ঘ) পাঁচিলঘেরা ক্ষুদ্র ক্ষেত্র। কিছু চুনবালির ভাস্কর্য। উচ্চতা আনু. ২০/২২ ফুট। (ঙ) বিশ শতকের শুরুতে (?)। (চ) ঐ। পথের শেষে, আড়াআড়ি চলা অন্য পথের পাশে।

২০৩। (ক) **ঐ**। (খ) জৈন দেউল। (ঘ) আনু ৫০/৬০ ফুট উচ্চতার, পূর্বোক্ত রীতির,

সামনে সমতল ছাদের মুখমণ্ডপ—পাঁচিল-ঘেরা ক্ষেত্র। (ঙ) ? (চ) রাজবাড়ির সামনে দিয়ে চলা মূল পিচ্ রাস্তার ডানে—বিখ্যাত কাঠগোলার বাগোনে যাওয়ার পথের মুখে, 'জগৎ শেঠের বাড়ি' বলে কথিত ক্ষেত্রে।

[তিন থাকে বিন্যস্ত রথাকৃতি স্থাপত্য]

২০৪। (ক) **ক্ষীরগ্রাম, মঙ্গলকোট, বর্ধমান**। (খ) যোগাদ্যা। (গ) বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্র (বর্তমান মন্দির)। (ঘ) পূর্ণ ব্যতিক্রমী দেউল, পশ্চিমবঙ্গে অদ্বিতীয়। দুটি থাকে বিভক্ত দেওয়ালের উপরে, তৃতীয় থাকে শিখর-শীর্ষরূপে রেখ দেউলের অনুকৃতি। সব মিলিয়ে উচ্চতা আনু. ৩০ ফুট। নিচু ও ক্ষুদ্র গর্ভগৃহে একটি সুরঙ্গ। গর্ভগৃহের দরজার দুপাশের বাজুতে আনু. ১১/১২ শতকের খোদিত অলংকরণ-মণ্ডিত পাথর—এগুলি হয়ত বর্তমানে লুপ্ত প্রাচীন ও আদি মন্দিরের অঙ্গ ছিল। গর্ভগৃহের সামনে ইসলামী ধারার বৃহৎ গম্বুজ-সম্পন্ন অর্ধমণ্ডপ ও তারও সামনে আটটি থামের উপর সমতল ছাদ-সম্পন্ন বৃহৎ নাটমণ্ডপ। মন্দিরের পিছনে পাকঘর এবং শ্যামরায়ের দালান-মন্দির। উত্তরপাশে মালি ও 'দারোগা' বা প্রাক্তন বর্ধমানরাজের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর ঘর। মাঠের মত বড় ও পাঁচিলঘেরা ক্ষেত্রের দুটি প্রবেশদ্বার—পূবেরটি জোড়বাংলা এবং পশ্চিমেরটি একবাংলা বা দোচালা রীতির। অনতিদূরে দেবীর ভৈরব ক্ষীরকন্টক মহাদেবের সাধারণ দালান মন্দিরটি (বর্তমান মন্দির উনিশ শতকের শেষদিকে প্রতিষ্ঠিত) রয়েছে ২০/২৫ ফুট উচ্চতায়, খাড়া সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। দীঘির পাড়ে রয়েছে আধুনিক 'উত্থান-মন্দির'ও সম্প্রতি ক্ষীর দীঘির জলমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেবীর সারা বছরের 'অবস্থান মন্দির।'

প্রাসঙ্গিকী

"ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যাকে করিয়া বন্দন।
বড়ই পিরিত হএ নরবলি দান।।"[১]

—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গের যে কয়েকটি জায়গায় লৌকিক, প্রাগার্য, অন্ত্যজ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মধ্যে সংঘাত ও শেষে মিলনের চিত্রটি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায়, ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা-ক্ষেত্র সেগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। বিষয়টি ছড়িয়ে আছে নানা লৌকিক, অন্ত্যজ ও ব্রাহ্মণ্য আচারের মধ্যে :

(ক) **লৌকিক উপাদান** :

(।) **মায়ের শাঁখা পরা** : ভক্ত পুরোহিতের রূপবতী মেয়ের রূপ ধরে শাঁখারীর হাত থেকে দেবীব শাঁখা পরা ও তারপর দীঘির জল থেকে দু হাত তুলে প্রমাণ দেখানোর গল্প বাংলার বেশ কিছু গ্রামে চলিত আছে—শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ মিত্র এমন ছয়টি গ্রামের (কল্যাণেশ্বরী, বর্ধমান; সেনহাটি ও বায়ড়া, হুগলী; ছাতনা ও রায়পুর, বাঁকুড়া এবং আমাদের আলোচ্য

১। 'চণ্ডীমঙ্গল', পঞ্চানন মণ্ডল-সম্পাদিত 'ভারবি' ১৯৯২ মুদ্রণ, 'দিগ্‌দেবতাবন্দনা,' পৃ: ৫।

ক্ষীরগ্রাম) উল্লেখ করেছেন।[২] ক্ষীরগ্রামের গল্পটি এই রকম : একবার দেবী যোগাদ্যা একজন পরমা রূপবতী মেয়ের রূপ ধরে ধামাচিয়া (ধামচে) দীঘির পাড়ে বসে এক শাঁখারীর কাছে শাঁখা পরেন। শাঁখারী শাঁখা পরানোর সময় লক্ষ্য করেন যে মেয়েটির

"....হাতে পদ্ম পায়ে পদ্ম পদ্ম গন্ধ গায়!
হাতে তৈল শঙ্খবেণে ভয়ে চমকায়।।"[৩]

ত্রস্ত শাঁখারী পরিচয় চাইলে মেয়েটি অভয় দিয়ে বলে :

"শুন বাছা শাঁখারী পরিচয় দি।
পূজারী বামুন আমি তার ঝি।।
ব্রাহ্মণের কন্যা আমি নাম ভগবতী।
পাগল আমার স্বামী দ্বন্দ্ব দিবারাতি।।
দুই পুত্র লৈয়া আমি আছি বাপঘরে।
দরিদ্র আমার স্বামী অন্ন দিতে নারে।"[৪]

অর্থাৎ দেবী যোগাদ্যা দ্ব্যর্থক ভাষায় আপন পরিচয় দিলেন (স্মরণীয়, ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' দেবী অন্নপূর্ণা কর্তৃক ঈশ্বরী পাটনির কাছে আত্মপরিচয় দান), ও বললেন যে মন্দিরের 'গম্ভীরে' (পুরীর অভ্যন্তর ভাগে বা 'গম্ভীরা'-য়) পাঁচটি তঙ্কা আছে আর তা-ই শাঁখার দাম। শাঁখারী মন্দিরে গিয়ে পূজারীর কাছে তাঁর মেয়ের পরা শাঁখার দাম চাইলে পূজারী বললেন :

".... বেণে আমি তোরে কই।
কার কন্যা শঙ্খ পরে মোর কন্যা নাই।।[৫]

শাঁখারী তখন মন্দির-ভিতরের মেয়েটির বলা পাঁচ তঙ্কার কথা বললে পূজারী মন্দিরের ভিতরে গিয়ে তা পেয়ে বুঝলেন যে দেবী যোগাদ্যাই রূপবতী মেয়ের রূপ ধরে শাঁখা পরেছেন, এবার পূজারী ব্রাহ্মণ ও শঙ্খবেণে উভয়েই উর্ধ্বশ্বাসে ধামচে দীঘির পাড়ে ছুটে গিয়ে দেখলেন যে দেবী অন্তর্হিতা হয়েছেন, তখন :

"জোড়হস্তে ব্রাহ্মণ দেবীকে করে স্তুতি।
কৃপা করি দরশন দেহ ভগবতী।।
যদি দরশন মাগো না দিবে আমারে।
ব্রহ্মহত্যা হব আমি তোমার উপরে।।
ব্রাহ্মণের বাক্যে দেবী বড় ভয় পায়।
জল হৈতে দুই বাই শঙ্খ যে দেখায়।।"[৬]

২। হীরেন্দ্রনাথ মিত্র : 'বাংলার লোক-উৎসব ও লোক-শিল্প', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪১৪, পৃ: ২০।

৩। হীরেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক সংগৃহীত ও উদ্ধৃত 'যোগাদ্যা বন্দনা,' ঐ, পৃ: ১৬।

৪। ঐ।

৫। ঐ। পৃ: ১৭।

৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮।

(ii) **দেবীর জলমধ্যে অবস্থান ও উত্থান** : দেবী যোগাদ্যার মহিষমর্দিনী-রূপী কষ্টিপাথরের মূর্তি সারা বৎসর ক্ষীর-দীঘির জলে ডোবানো থাকে, শুধুমাত্র বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির দিনে জল থেকে তুলে চব্বিশ ঘন্টার জন্য মূর্তিটি দীঘির তীরবর্তী 'উত্থান মন্দিরে' রাখা হয় এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলে মূর্তিটিকে স্পর্শ করার ও মূর্তিটির হাতে লোহা এবং কপালে সিঁদুর দিয়ে পূজা করার অধিকার পান। বৎসরে আরো কয়েকবার তোলা হলেও তখন নির্দিষ্ট কয়েকজন ছাড়া কেউ দর্শন করতে পারেন না। মায়ের শাঁখা পরার মীথের মতই এই ব্যাপারটিও লোক বিশ্বাস ও লোকাচারের ব্যাপার। মাত্র চব্বিশ ঘন্টার জন্য হলেও আচণ্ডাল সকলের 'মা'-কে স্পর্শ করার ও পূজা করার অধিকারও একান্তভাবে লোকধর্মের বৈশিষ্ট্য। তবে, বিশেষ পূজার দিনটি ছাড়া দেবী বা দেবতার প্রস্তর-মূর্তি সারা বৎসর জলমধ্যে রাখার দৃষ্টান্ত রাঢ়বঙ্গে আরও আছে, যেমন, বীরভূমের মৌড়পুর বা মহুরাপুর (থানা: ময়ূরেশ্বর)-এর কাশীশ্বর শিব। এই ব্যাপারটিব ব্যাখ্যা কি বলা শক্ত—একটি প্রবাদ হল মূর্তবিদ্বেষী কালাপাহাড়ের ভয়ে মূর্তিগুলি এইভাবে জলের তলায় লুকিয়ে রাখা হত, তবে আমাদের মনে হয়েছে যে দেবী বা দেবতাকে জলে ডুবিয়ে রাখলে গ্রামজীবনে ও কৃষিকাজে জলাভাব ঘটবে না, এমন বিশ্বাস এর মূলে রয়ে গেছে। ক্ষীরগ্রামের 'ক্ষীরকলস' অনুষ্ঠানটি আমাদের এই ধারণাকে পুষ্ট করে।

(iii) **'ক্ষীরকলস'** : চৈত্র-সংক্রান্তির দিন বিকেলে 'মা' যোগদ্যা যে দীঘির জলে আছেন, সেই ক্ষীরদীঘি থেকে এক কলস জল বাদ্য ও শোভযাত্রা সহকারে প্রথমে যজ্ঞকুণ্ড ও পরে মন্দিরের কাছে 'গণেশমুণ্ডে'র (একটি ক্ষয়িত-মণ্ডিত প্রস্তরখণ্ড, হয়ত লুপ্ত আদি মন্দিরের অংশ, তার) উপরে রাখা হয়, শেষে গ্রামসভার পরে পুরোহিত ঐ জল মন্দিরে দেবীর বেদীর উপরে একটি তামার কলসে রেখে দেন। এই হল ক্ষীরকলস—এক মাস পরে, বৈশাখ-সংক্রান্তির আগের দিন (৩০শে বৈশাখ) বিকেলে দত্তবংশীয় কেউ (কারণ এঁদের পূর্বপুরুষ রাজা হরি দত্তকে স্বপ্ন দিয়ে দেবী প্রকাশিতা হন বলে বিশ্বাস) ঐ কলসের জল গ্রামে ও চাষমাঠে ছিটিয়ে বেড়ান—লোকবিশ্বাস অনুসারে এই জল অমৃত-সমান, এর স্পর্শে বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হন, জমি মহা-উর্বরা হয়। নারী ও ভূমির প্রজনন-শক্তির জন্য আদিম কৃষিজীবী সমাজের জাদু ও তুকতাকের স্মৃতিই যেন বহন করছে ক্ষীরকলস।

(iv) **হাল-লাঙল** : ক্ষীরকলসের অমৃতবারি-সিঞ্চনের পরে, ঐ দিনেই একজোড়া নতুন ষাঁড় ('মামা-ভাগ্নে' বলে কথিত) সহযোগে হয় হাল-লাঙল অনুষ্ঠান—এটিও যেন কৃষি-সমাজের আদিম জাদু-অনুষ্ঠানের স্মৃতি।

(v) **'চ্যাঙ-ব্যাঙ'** : মহাপূজার দিনটি ছাড়া বৎসরের আরও যে কয়েকটি দিন যোগ্যাদার মহিষমর্দিনী মূর্তি ক্ষীরদীঘির জল থেকে তুলে বলি সহযোগে গুপ্ত পূজা করা হয় তার কয়েক দিনের পূজাকে বলা হয় 'উগল পূজা'। মাঘ মাসে মাকরী সপ্তমীর উগল পূজোর দিনে মন্দিরে সূর্য পূজা ও যজ্ঞের পরে একটি চতুঃষ্কোণ ক্ষেত্রে যজ্ঞের ছাই ছিটিয়ে দেওয়া হয়, মন্দিরের মালাকর সেই জায়গাটি লাঙলের ফলা দিয়ে চযে সেখানে কয়েকটি চ্যাঙ মাছ ও ব্যাঙ ছেড়ে দেন। গ্রামবাসীরা ঐ ছাই, চ্যাঙ মাছ ও ব্যাঙ নিজেদের সারগাদায় রেখে দেন এই বিশ্বাসে এতে তাঁদের সারের উর্বরতা-শক্তি বাড়বে। চ্যাঙ মাছ ও ব্যাঙ সুবৃষ্টির সহায়ক বলেও মনে করা হয়।

(vi) **মালাকরের বিয়ে** : মাঘ মাসে 'চ্যাঙ-ব্যাঙ' অনুষ্ঠানের পরে মন্দিরের মালাকর আর তাঁর স্ত্রীকে পুরোদস্তর নতুন বরকনে সাজিয়ে গ্রাম-প্রদক্ষিণ করানো হয়ে—এই ব্যাপারটিও প্রজনন ও উর্বরতা কাল্টের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে হয়।

(vii) **মাঝ-আগলানো** : এক গ্রামের দল মন্দির দখল করলেন আর অন্য গ্রামের লোক জোর করে তাঁদের হঠিয়ে দখল নেওয়ার চেষ্টা করলেন—লেগে গেল সংঘাত। মহাপূজার দিনের বিকেলের এই অনুষ্ঠান হয়ত মন্দিব নিয়ে এককালে বিভিন্ন জাত ও গোষ্ঠীর মধ্যে যে সংঘর্ষ চলেছিল তারই লোকস্মৃতি।

উপরের অনুষ্ঠানগুলি ছাড়াও আরও নানা অনুষ্ঠান ও প্রথা ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা-ক্ষেত্রের লৌকিক চরিত্রের ইঙ্গিত দেয়, যেমন 'গুয়ো-ডাকা' (সুপারি দিয়ে অভ্যর্থনার জন্য কুড়মুন, গোহগ্রাম প্রভৃতি প্রাচীন গ্রামের প্রতিনিধিদের ডাকা), 'মোর-নাচ', বৈশাখ মাসজুড়ে বিবিধ বিধিনিষেধ—চাষ না দেওয়া, ছাতা মাথায় না দেওয়া, স্বামী-স্ত্রীর একত্র না শোওয়া, পূর্ণগর্ভা নারীর গ্রামে অবস্থান না করা, ১ তারিখ, ১৫ তারিখ আব মাসের শেষ পাঁচদিন কিছু না লেখা, অন্য দিনগুলিতে লাল কালিতে লেখা প্রভৃতি—একই ইঙ্গিত দেয়।

(খ) **অন্ত্যজ উপাদান** : ক্ষীরগ্রামের যোগদ্যা পূজা ও উৎসব অন্ত্যজ জাত ও গোষ্ঠীগুলির প্রত্যক্ষ ভূমিকার গুরুত্ব অপ্রমেয়। হাড়ি পরিবারের লোকেরা দেবীকে জল থেকে তোলার সময়ে ১০টি মশাল জ্বেলে অপেক্ষা করেন, বাগদী পরিবারের লোকেরা দেবীর পতাকা বহন করেন, ডোমদের ভূমিকা আরো প্রত্যক্ষ :

(।) **'নে মা নররক্ত খা'** : মহাপূজার দিন ভোরবেলায় যোগ্যদার মহিষমর্দিনী মূর্তি জল থেকে তোলা হলে একজন ডোম বেলকাঁটা ফুটিয়ে নিজের বুক থেকে রক্ত বের করে সেই রক্ত মূর্তির ঠোঁটে ঠেকিয়ে বলেন 'নে মা নররক্ত খাঁ।' বিভিন্ন সূত্র হতে জানা যায় ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যার উদ্দেশে নরবলি দেওয়া হত। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামও ক্ষীরগ্রামে নরবলির কথা বলেছেন। আদিম কৌম কৃষি-সমাজে নররক্তকে জমির উর্বরতা বৃদ্ধিকারক মনে করা হত। ক্ষীরগ্রামের ডোমেব নিজের বুক থেকে রক্ত বের করে যোগাদ্যাকে পান করানো সেই আদিম কৌম কৃষি সমাজের স্মারক। স্মরণীয় মহাপূজার দিন ভোরে যোগাদ্যার উদ্দেশে প্রথম যে ছাগ বলি দেওয়া হয়, তা নরবলির অনুকল্প বলে উচ্চ বর্ণভুক্ত পরিবারগুলি তার মাংস খান না।

(i) **'ডোম-চোয়াড়ি'** : মহাপূজার দিন সকালে যোগদ্যা-মূর্তি 'উত্থান-মন্দিরে' স্থাপনের পবে প্রথমে পুরোহিত হাতে একখানি তরোয়াল নিয়ে দেবীকে অধিকারের জন্য ডোমদের যুদ্ধে আহ্বান করেন, কিন্তু ইতিহাসের বীর জাতির প্রতিনিধি বংশ বাঁশ হাতেই তরোয়ালের মুখোমুখী হন; শুরু হয় ব্রাহ্মণ ও ডোমের মধ্যে নকল যুদ্ধ। স্বাভাবিক ভাবেই বীর ডোমের হাতে ব্রাহ্মণ পরাজিত হন, কিন্তু জয়ী হয়েও ডোম পরাজিত ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে তাঁর হাতে একটি তালপাতার পাখা ধরিয়ে দেন। এরপর হয় উগ্রক্ষত্রিয়ের সঙ্গে ডোমের নকল যুদ্ধ এবং তারও একই পরিণতি হয়। এই নকল যুদ্ধ সম্ভবত রাঢ় দেশের প্রাগার্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে আর্যভাবাপন্ন জাতিগোষ্ঠীর দীর্ঘ সংঘাত ও শেষে যোগদ্যার মাধ্যমে এক ধরনের বোঝাপড়া গড়ে ওঠার সুপ্রাচীন ইতিহাসের জীবন্ত স্মারক। 'ডোম-চোয়াড়ি'-র চোয়াড়ি হল 'চুয়াড়' বা ডোমের মতই একটি তথাকথিত অস্পৃশ্য জাত।—

এই অনুষ্ঠান হতে বোঝা যায় যে দেবী যোগাদ্যা একসময় রাঢ়দেশের জোম, চুয়াড় প্রভৃতি অন্ত্যজদেরই দেবী ছিলেন—দীর্ঘ সংঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁর ব্রাহ্মণ্যায়ন ঘটলেও আদিম প্রাগার্য বৈশিষ্ট্যগুলিও বহুল পরিমাণে রয়ে গেছে।

(iii) **'উগল পুজো'** : ইতোপূর্বেই দেখা গেছে বৈশাখ-সংক্রান্তির দিনে ছাড়া আরও কয়েকদিন যোগাদ্যা-মূর্তি জল থেকে তোলা হয়—'উগল পুজো' হয় এর বিশেষ কয়েকদিন। এই সময়ে নির্দিষ্ট কয়েকজন ছাড়া কেউ উপস্থিত থাকতে পারেন না, কিন্তু ডোমের উপস্থিতি অতি আবশ্যিক—ডোমই এই পূজার প্রধান বলিদাতা।

(গ) **ব্রাহ্মণ্যায়ন** : গবেষক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী যে অধ্যবসায়ী অনুসন্ধান করেছেন তাতে দেখা যায় যে তিব্বতে প্রাপ্ত প্রাচীন 'কুব্জিকাতন্ত্র' থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতকীয় 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিনী' পর্যন্ত বিভিন্ন তন্ত্র-গ্রন্থে ক্ষীরগ্রাম ও যোগাদ্যার সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে।[৭] মুকুন্দরাম ছাড়াও রামানন্দ যতি (চণ্ডীমঙ্গল), ঘনরাম চক্রবর্তী (ধর্মমঙ্গল), রূপরাম চক্রবর্তী (ধর্মমঙ্গল), বলরাম চক্রবর্তী (কালিকামঙ্গল), রামদাস আদক (অভয়ামঙ্গল), কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ (মনসামঙ্গল), মানিক গাঙ্গুলি (ধর্মমঙ্গল) এবং ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (অন্নদামঙ্গল) ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যার উল্লেখ করেছেন।[৮] ক্ষীরগ্রাম সতীপীঠ না হয়েও তন্ত্র-গ্রন্থ-সমূহে সিদ্ধপীঠ ও মহাপীঠ বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত বলেই মঙ্গলকাব্যগুলিতে তার স্বীকৃতি এত ব্যাপক।—এভাবেই প্রাগার্য আদিম গোষ্ঠীসমূহের দেবী যোগাদ্যা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রেও গুরুত্বপূর্ণ হলেন।

শুধু ক্ষীরগ্রামে নয়, বর্ধমান জেলার আরও বেশ কিছু গ্রামে তো বটেই, বাঁকুড়া, এমনকি হুগলীরও কোথাও কোথাও যোগাদ্যা-পূজা হয়ে থাকে, তবে তা হয় গাছতলায় কোনো শিলাখণ্ড বা কোনও গাছকেই যোগাদ্যা মনে করে—লক্ষণীয়ভাবে সমস্ত ক্ষেত্রেই গ্রামগুলি হাড়ি-বাগদী-ডোম-চুয়াড় প্রধান।

[ব্যতিক্রমী, পঞ্চরত্নাকৃতি]

২০৫। (ক) **জগদানন্দপুর, কাটোয়া, বর্ধমান।** (খ) রাধাগোবিন্দ। (গ) কৃষ্ণদুলাল ঘোষচৌধুরী। প্রস্তর-নির্মিত, আনু. ৪৫ ফুট উচ্চতার রেখ দেউল—কিন্তু 'গণ্ডী'-র কিছুটা নিচে হাতে চারপাশে সমতল ছাদের বারান্দা যুক্ত করে তার চারকোণে চারটি খাঁজকাটা রেখ বীতির তুলনায় ছোট চুড়া বসানোর ফলে দেখতে হয়েছে সমতল ছাদবিশিষ্ট পঞ্চরত্নের মতন। (ঙ) ১৮৩৬। (চ) ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া শাখার দাঁইহাট স্টেশন থেকে রিক্সায়।

[ব্যতিক্রমী, পরপর বক্রচালাকৃতি রেখা]

২০৬। (ক) **নন্দী, জামুরিয়া, বর্ধমান।** (খ) শিব। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন, একদুয়ারী, চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের উপরে চারপাশে কোর-দেওয়া ঘরের মত বক্রচাল—এরপর সমগ্র 'গণ্ডী' জুড়ে একের পরে এক বক্ররেখা, দেখেতে হয়েছে জটাধারীর মত, কিন্তু অগ্রভাগ যেন হঠাৎ শেষ হয়েছে একটি ছোট সমতল ছাদে। সামান্য টেরাকোটা অবশিষ্ট। (ঙ) ১৯

৭। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি', পুস্তক বিপণি, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৯৪, পৃ: ৮০-৮৩

শতক। (চ) আসানসোল থেকে বাসে জামুরিয়া, এরপব রিক্সায়, নন্দীতে ঢোকার পরে ডানে ঘুরে, ডাকঘরের পরে।

[ব্যতিক্রমী, চারকোণা, পিরামিডাকৃতি]

২০৭ (ক) **কিরীটেশ্বরী, নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ।** (খ) শিব। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন 'বাড়' বা দেওয়াল ও শিখর বা 'গণ্ডী' উভয়েরই উচ্চতা প্রায় সমান—১৫ ফুট বা তার কিছু বেশি। গণ্ডী চারকোণা সমতল রেখা সম্পন্ন, চতুষ্কোণ শিখর ক্রমশ ছোট হতে হতে শীর্ষে পৌঁছিয়েছে, আমলক ও কলস নেই। (ঙ) ১৮/১৯ শতক। (চ) শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের মুর্শিদাবাদ স্টেশন থেকে রিক্সায় ইচ্ছাগঞ্জ ঘাট, এখান থেকে গঙ্গা পেরিয়ে চার কিমি হাঁটা। কাটোয়া-আজিমগঞ্জ লাইনের ডাহাপাড়া ধাম স্টেশন থেকে একই পথে হাঁটা কিছু কম। সতীপীঠরূপে বিখ্যাত ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ মন্দিরটি।

[ব্যতিক্রমী, গির্জার মত চূড়া]

২০৮। (ক) **মহানাদ (করপাড়া)**, পোলবা, হুগলী। (খ) লালজী। (গ) অর্জুনদাস কর ও দ্রবময়ী দাসী। (ঘ) ২৫ ফুট উচ্চ সমতল ছাদের উপর ৭৫ ফুট উচ্চ গির্জার চূড়া। এখন পরিত্যক্ত। (ঙ) ১৮৫১। (চ) পাণ্ডুয়া বা চুঁচুড়া থেকে বাসে।

পঞ্জি—১ (ক)

গুচ্ছ দেউল

অন্যরকম উল্লেখ না থাকলে, উপাদান : ইট

জোড়া দেউল : ১. (ক) **বরাকর**, কুলটি, বর্ধমান। (খ) গণেশ ও শিব। (গ) বাঁয়ের মন্দিরটির লিপি অনুসারে রাজা হরিশচন্দ্র, তাঁর প্রিয়তমা পত্নী হরিপ্রিয়ার নামে। (ঘ) পাশাপাশি দুটি, উভয়ই উচ্চতায় আনু. ৪০ ফুট। বেলেপাথরে নির্মিত ও খোদাই শিল্পে অতি সমৃদ্ধ। (ঙ) ১৪৭১। লিপিটির নিচে ১৫৪৬ খ্রিষ্টাব্দের সংস্কার-লিপিও খোদিত আছে। (চ) পঞ্জি-১, ক্রম-২ দেখুন।

২. (ক) **কাগ্রাম,** ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব। (গ) হর বকসী (মুর্শিদাবাদের নবাবের কর্মচারী)। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা, পঞ্চরথ, সম্মুখভাগ টেরাকোটা-সজ্জিত, পাশাপাশি। (ঙ) ১৮ শতকের মাঝামাঝি। (চ) কাটোয়া (ট্রেন/বাস) বা বর্ধমান (বাস) থেকে সালারে এসে ভ্যানরিক্সায় (চার কি.মি)।

৩. (ক) **তমলুক,** রাজবাড়ি এলাকা, পূর্ব মেদিনীপুর। (খ) রাধামাধব ও রাধারমণ। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট করে উচ্চতা, পাশাপাশি, উভয়েরই সামনে চারচালা জগমোহন। (ঙ) ১৮ শতকের মাঝামাঝি। (চ) পঞ্জি-১, ক্রম ৪১ দেখুন।

৪। (ক) **রাজনগর,** পাঁশকুড়া, প: মেদিনীপুর। (খ) ঝাড়েশ্বর ও রামেশ্বর শিব। (গ) সামন্ত পরিবার। (ঘ) পাশাপাশি, যথাক্রমে ৩৫ ও ২৫ ফুট। ঝাড়েশ্বরের চারপাশ উৎকৃষ্ট টেরাকোটা সজ্জিত। (ঙ) ১৮/১৯ শতক। (চ) পাঁশকুড়া থেকে টেবাগেড়্যা-গামী বাসে রাতুলিয়া বাজার, এখান থেকে রিক্সায় (৫ কি.মি.)।

৫। (ক) **সর,** আউসগ্রাম, বর্ধমান। (খ) শিব (পরিত্যক্ত) (ঘ) পাশাপাশি, সম উচ্চতার (আনু. ২৫ ফুট)। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) গলসী থেকে ভ্যান রিক্সায়, গ্রামের শুরুতেই, পথের পাশে।

৬। (ক) **হাটশেরাণ্ডী,** (ধর্মতলার অদূরে); বোলপুর, বীরভূম। (খ) শিব। (ঘ) পাশাপাশি, ১৫/১৬ ফুট করে উচ্চতা, এক হাত অন্তর সমান্তরাল খাঁজকাটা শিখর। (ঙ) ১৮২৯। (চ) বোলপুর থেকে নতুন হাট, বাসপাড়া, পালিতপুর প্রভৃতি বাসে শেরাণ্ডি, এখান থেকে রিক্সা।

৭। (ক) **কালিকাপুর** (মৌখিরা), আউসগ্রাম, বর্ধমান। (খ) শিব। (ঘ) ঘন খাঁজকাটা শিখর ও সমৃদ্ধ টেরাকোটা সহ একই অধিষ্ঠানে ২৫ ফুট উচ্চতার, পাশাপাশি। (ঙ) ১৮৩৯। (চ) বোলপুর-পানাগড় বাসপথের বসুধা স্টপেজ থেকে ভ্যানরক্সিায়।

৮। (ক) **সিউড়ি** (কালীবাড়ি), বীরভূম। (খ) গোবিন্দেশ্বর ও কুলদেশ্বর শিব। (ঘ) একই অধিষ্ঠানে পাশাপাশি আনু. ২৫ ফুট করে উচ্চতা, সামান্য টেরাকোটা, কুলদেশ্বরের দেওয়ালে পঙ্খের বাতায়নবর্তিনী। (ঙ) ১৮৭৬। (চ) সিউড়ি বাসস্ট্যাণ্ড থেকে সহজে রিক্সায়/হেঁটে।

৯। (ক) **পুটশুড়ি,** মন্তেশ্বর, বর্ধমান। (খ) শিব। (ঘ) আনু. ১৫/১৬ ফুট উচ্চতাব, পাশাপাশি, টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) বর্ধমান বা মেমারী থেকে কুসুমগ্রাম হয়ে বাসে। বাসস্ট্যাণ্ড-লাগোয়া বালিকা বিদ্যালয়ের বিপরীতের পথে কিছু গিয়ে।

১০। (ক) **ওরগ্রাম** (জেটেলপাড়া), ভাতাড়, বর্ধমান। (খ) শিব। (ঘ) একই অধিষ্ঠানে, পাশাপাশি, উচ্চতা আনু. ২৫ ফুট করে, উভয়েরই পিছন ছাড়া বাকি তিন দিকেই উৎকৃষ্ট টেরাকোটা। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) গুসকরা থেকে বাসে মাত্র চার কি.মি.।

১১। (ক) **ঐ।** (খ) শিব। (ঘ) ২০/২২ ফুট করে উচ্চতা, সমগাত্র। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) ঐ। পিছনে।

১২। (ক) **জয়কৃষ্ণপুর,** বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। (খ) শিব। (খ) যথাক্রমে ২০ ও ১৬ ফুটের মত উচ্চতার, সমগাত্র। (ঙ) ১৯ শতকেব শেষে। (চ) বিষ্ণুপুর থেকে সোনামুখী, বর্ধমান ইত্যাদি বাসে অতি সহজে। গ্রামের মধ্য দিয়ে অযোধ্যামুখী পাকা রাস্তার ধারে।

১৩। (ক) **ঐ।** (খ) শিব। (গ) মুখার্জী পরিবার। (ঘ) ২০/২২ ফুট করে উচ্চতা, একই অধিষ্ঠানে, পাশাপাশি, সমগাত্র। (ঙ) ১৯ শতকের শেষে। (চ) গ্রামের মধ্যে।

১৪। (ক) **সরপী,** ফরিদপুর, বর্ধমান। (খ) শিব। (গ) রায়চৌধুরী পরিবার। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট করে উচ্চতা। একটি থেকে অন্যটি সামান্য তফাতে। সমগাত্র। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) অণ্ডাল বা উখরা থেকে বাসে সবপী মোড়—এখান থেকে বিক্সায বা হেঁটে—গ্রামে ঢোকার মুখে, রাস্তার বাঁয়ে।

১৫। (ক) **ভালকি** (বনমালীপুর), আউসগ্রাম, বর্ধমান। (খ) বনমালীশ্বর এবং শ্রীধরেশ্বর। (ঘ) একই অধিষ্ঠানে, পাশাপাশি, যথাক্রমে ২৫ ফুট ও ২০ ফুট উচ্চতাসম্পন্ন, আন্দাজ একহাত অন্তর সমান্তরাল খাঁজ-সম্পন্ন শিখর। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) গুসকরা অথবা মানকর থেকে বাসে সুয়াতার কিংবা অভিরামপুর স্টপেজে নেমে ভ্যানরিক্সায় বা হেঁটে।

১৬। (ক) **ভালকি,** ঐ। (খ) শিব। (গ) মিশ্র পরিবার। (ঘ) স্থাপত্য আগেরটির মত—তবে ক্ষুদ্র আমলক ও কলস বিদ্যমান। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) ঐ।

১৭। (ক) **উখরা** (রথতলা, চাঁদনিবাড়ি দুর্গামন্দির), অণ্ডাল, বর্ধমান। (খ) শিব। (গ) হাণ্ডা পরিবার। (ঘ) পাশাপাশি, টেরাকোটা-মণ্ডিত। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) অণ্ডাল থেকে বাসে।

[উল্লেখ্য, ক্রম ১৪য় বলা সরপী গ্রামের একেবারে শেষে রামসায়র নামে একটি বৃহৎ পুকুরপাড়ে শীতল জলের একটি ক্ষুদ্র উৎসের কাছে ১৮ শতকের দ্বিতীয় শতকে নির্মিত পাশাপাশি দুটি পাথরের দেউলের কঙ্কাল আছে। আবার কমবেশি একই সময়কালে নির্মিত ও ঐ একই বাসপথের **খান্দরা** বাস স্টপেজ-ঘেষে পাথরের জোড়া দেউলের (শিব) একটির শুধু খাঁচার অংশটুকু আছে, অন্যটি সংস্কৃত হয়েছে।]

জোড়া দেউল (আটকোণা) : ১। (ক) **মানকর,** বুদবুদ, বর্ধমান। (খ) শিব। (ঘ) আনু. ১৮ ফুট করে উচ্চতা, ব্যতিক্রমী, আটকোণা দেওয়ালের উপর অনেকটা ছাতার আকারে গম্বুজধর্মী শিখর, শীর্ষে ক্ষুদ্র আমলক ও দণ্ড, উভয় শিখরই অঙ্গশিখরের অনুকৃতিতে নিচ থেকে গ্রীবা পর্যন্ত পরপর পঙ্খের ত্রিকোণ রেখায় অলংকৃত, প্রতি কোণের দেওয়ালেই একসময় পঙ্খের নকল দরজা ছিল ও তাদের শীর্ষদেশের কুলুঙ্গিগুলিতেও সুদৃশ্য পঙ্খের মূর্তি-ভাস্কর্য ছিল—সংস্কারে বেশ কিছু লুপ্ত। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) মানকর (বর্ধমান-আসানসোল লোকালে) স্টেশন থেকে রিক্সায়, বিখ্যাত বুড়োশিবতলা অতিক্রম করে, মূল রাস্তার পাশে। —উল্লেখ্য, মানকরের ভট্টচার্য পাড়া থেকে ভিতরের রাস্তা ধরে মল্লিকেশ্বর যাওয়ার পথের ধারে একটি ক্লাবের সামনের ফাঁকা জায়গায় অনুরূপ আর একটি জোড়া দেউল আছে, এটি নিরলংকার।

জোড়া দেউল (উল্টোপদ্ম শিখর) : ১। (ক) **বড়নগর,** জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। (খ) তারেশ্বর শিব। (গ) তারাদেবী (রাণী ভবানীর কন্যা)। (ঘ) মুখোমুখী, আনু. ১৬ ফুটের মত উচ্চতা, অতি ভগ্ন দশা, এক সময় চুন-বালির অসাধারণ কাজে সমৃদ্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে দেউলদুটি তারাদেবী প্রতিষ্ঠিত ও বর্তমানে লুপ্ত দালানরীতির গোপাল মন্দিরের প্রবেশ পথের দুপাশে প্রতিষ্ঠিত ছিল। (ঙ) ১৮ শতকের দ্বিতীয় ভাগ। (চ) শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের জিয়াগঞ্জ থেকে গঙ্গা পেরিয়ে বা হাওড়া থেকে ট্রেনে আজিমগঞ্জ—এখান থেকে রিক্সায়, চারবাংলা মন্দিরের পরে, ভবানীশ্বরের উচ্চ দেউলের বিপরীতে।

২। (ক) **লালবাগ** (প্রাক্তন হরি সিংহের দেউড়ি), মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব এবং পরিত্যক্ত। (ঘ) চতুষ্কোণ বরণ্ডের উপর উল্টোপদ্ম শিখর, পাশাপাশি, প্রথমটি আন্দাজ ৩৫ ফুট ও দ্বিতীয়টি আন্দাজ ৩০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। পার্শ্বস্থ 'হরি সিংয়ের দেউড়ি' নামে পরিচিত প্রকাণ্ড ও ঐতিহাসিক বাড়িটি নিশ্চিহ্ন করে সেই জমি প্লট হিসাবে বিক্রয় করায় ইতিহাস নষ্ট হয়েছে। (ঙ) ১৮/১৯ শতক। (চ) ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদ স্টেশন থেকে সহজে রিক্সায়—রেজেস্ট্রি অফিস ও জলট্যাঙ্কের পিছনে।

৩। (ক) **লালবাগ (সাহানগর),** মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব। (গ) বর্ধন পরিবার। (ঘ) গঙ্গাতীরে পাশাপাশি, পূবেরটি ২০/২২ ফুট ও পশ্চিমেরটি ১৭/১৮ ফুট উচ্চ, স্থাপত্য এর আগেরটির মত। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) মুর্শিদাবাদ স্টেশন/বাসস্ট্যাণ্ড থেকে রিক্সায়—পাঁচরাহা মোড় থেকে সুনীতা বস্ত্রালয়ের পথে গঙ্গাতীর—এবার ঐ রাস্তায় বাঁয়ে কিছুটা গিয়ে।

৩। (ক) **নশীপুর, মুর্শিদাবাদ**। (খ) শিব। (ঘ) আনু. ১২ ফুট উচ্চতার, পাশাপাশি, (ঙ) ১৯ শতকের শেষে। (চ) মুর্শিদাবাদ স্টেশন থেকে রিক্সায়—রাজবাড়ির নহবৎ খানার বিপরীত হতে গঙ্গার ঘাটের পথে, একটি পরিত্যক্ত মন্দিরের পরে।

ত্রৈকূটক : একই অধিষ্ঠানে পাশাপাশি তিনটি কূট বা শৃঙ্গের মত তিনটি মন্দির—মাঝেরটি উচ্চতম এবং তার দুপাশের দেওয়াল হতেই সুন্দর সামঞ্জস্য বজায় রেখে অনুপাতে কম উচ্চতা-সম্পন্ন অন্য দুটি। তিনটি মন্দিরই 'রেখ' বা শিখররীতির। রীতিটি সর্বভারতীয়, পশ্চিমবঙ্গে এর যথার্থ উদাহরণ হল হুগলীর **চাতরার** 'গৌরাঙ্গ মন্দির' (পঞ্জি-১, ক্রম ৬৯ দেখুন)।

২। (ক) **নন্দী (বাবুপাড়া), জামুরিয়া, বর্ধমান**। (খ) শিব, (গ) চট্টোপাধ্যায় পরিবার। (ঘ) একই অধিষ্ঠানে, পরস্পরের লগ্ন দেওয়াল, মাঝেরটি আনু. ২৫ ফুট ও দুপাশের দুটি ২০ ফুট করে উচ্চতা। কিছু চুনবালির কাজ, সংস্কৃত। (ঙ) ১৯ শতকের শেষে। (চ) আসানসোল থেকে বাসে জামুরিয়া, এখান থেকে রিক্সায়—গ্রামে ঢুকে বাঁদিকে 'ব্যাঘ্রচণ্ডীর থান'-মুখী পথের ধারে।

৩। (ক) **ঐ**। (খ) শিব। (গ) নায়েক পরিবার। (ঘ) স্থাপত্য ও উচ্চতা পূর্ববৎ তবে বর্তমানে পলেস্তরা খসা ও জীর্ণ। (ঙ) ১৯ শতকের শেষে। (চ) একই রাস্তায়, সামান্য আগে, প্রাক্তন জমিদার বাড়ির ঘেরা প্রাঙ্গণে।

তিন দেউল : ১। (ক) **করিধ্যা** (হাটতলা), সিউড়ি, বীরভূম। (খ) শিব। (গ) সেন পরিবার। (ঘ) প্রায় সমউচ্চতার (১৭/১৮ ফুট) ও একই অধিষ্ঠানে, পাশাপাশি, সামনে দাঁড়ালে ডানেরটি এক হাত অন্তর খাঁজকাটা শিখর, অন্যদুটি নিরলংকার। বাঁয়েরটি সংস্কৃত। (ঙ) ১৮ শতকের শেষে। (চ) সিউড়ি থেকে বাসে বা রিক্সায়।

২। (ক) **মল্লিকপুর,** গলসী, বর্ধমান। (খ) শিব। পরিত্যক্ত। (ঘ) এক অধিষ্ঠানে পাশাপাশি দুটি ও প্রথমটির মুখোমুখি একটি। ১৫/১৬ ফুট উচ্চতার, অতি জীর্ণ। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) বর্ধমান থেকে বাসে গলসী ও আদরাহাটি হয়ে। গ্রামের প্রধান দেবতা কাশীনাথ শিব মন্দিরের পথে, একটি বৃহৎ পুকুর পাড়ে।

৩। (ক) **বনপাস** (রায়পাড়া, খুরুল-রাস্তার মোড়), ভাতাড়, বর্ধমান। (খ) শিব। (ঘ) একই অধিষ্ঠানে তিনটি সম (আনু. ২৫/২৬ ফুট) উচ্চতার ও খাঁজকাটা শিখর-সম্পন্ন দেউল। উৎকৃষ্ট টেরাকোটা-সজ্জিত। ক্ষেত্রে একটি আটচালা ও তার পিছনে ভগ্ন ও পরিত্যক্ত একটি চারচালা ও একটি পঞ্চরত্ন (বৃহৎ) মন্দির এখনও কোনোক্রমে বর্তমান, এরও পিছনে, বাইরে, আরও একটি ভগ্ন ও পরিত্যক্ত চারচালা আছে। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যাণ্ড থেকে কামারপাড়াগামী বাসপথে—স্টপেজ থেকে সামান্য হাঁটা।

তিন আটকোণা দেউল : (ক) **মলুটি,** শিকারীপুর, ঝাড়খণ্ড। (খ) শিব। (ঘ) একই শীর্ণ অধিষ্ঠানে ও একই সারিতে, আনু. ১০ ফুট করে উচ্চতা, পিরামিডাকৃতি ও ঘন খাঁজ-কাটা শিখর। বেদী বা অধিষ্ঠানটি উঁচু ও সরল রেখাকার। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) রামপুরহাট থেকে বাস থাকলেও অটো বা গাড়ি রিজার্ভ করে যাওয়া সুবিধাজনক। ১৫ কি.মি.। রাজবাড়ি এলাকায়, একটি সুউচ্চ দেউলের কাছে।

তিন দেউল (গম্বুজ শীর্ষ), (ক) **বিলসরা** (উত্তরপাড়া), পাণ্ডুয়া, হুগলী। (খ) শিব। (ঘ) আনু. ২০/২২ ফুট করে উচ্চতা, গম্বুজ-শিখর। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনের বৈঁচি থেকে রিক্সায়।

চার দেউল : (ক) **অযোধ্যা (বনকাটি)** : কাঁকসা, বর্ধমান। (খ) শিব। (ঘ) একটি সরলরেখ অধিষ্ঠানে পাশাপাশি চারটি রেখ দেউল, উচ্চতা আনু. ২০/২২ ফুট করে। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) বোলপুর পানাগড় বাসপথের '১১ মাইল' স্টপেজ থেকে হেঁটে/রিক্সায়—রাস্তার পাশে। বনকাটি এর লাগোয়া গ্রাম—লোকমুখে তাই বনকাটি-অযোধ্যা।

চার আটকোণা গম্বুজ-শীর্ষ দেউল : (ক) **চন্দননগর** (বারাসত), হুগলী, (খ) শিব। (গ) আনন্দময়ী দাশ। (ঘ) আনু. ১০/১২ ফুট উচ্চতার, একই রেখা ও সারিতে পাশাপাশি। আটকোণা ও গম্বুজশীর্ষ। (ঙ) ১৮৪০। (চ) জি.টি রোডের পাশে—দশভূজাতলা ও বিখ্যাত নন্দদুলাল ক্ষেত্রের পরে বড়বাজার ছেড়ে বারাসতে। চন্দননগর হলেও হাওড়া ব্যাণ্ডেল-শাখার ভদ্রেশ্বর বা মানকুণ্ডু থেকে বিক্সায় যাওয়া সুবিধাজনক।

পঞ্চায়তন : [একটি চতুরস্র বা square অধিষ্ঠান বেদীব চার কোণে চারটি ছোট এবং সম মাপ ও প্রকৃতির দেউল, মাঝে তুলনায় বৃহত্তম মূল দেউল; যেমন খাজুরাহোর 'লক্ষ্মণ' বা ভুনেশ্বরের 'ব্রহ্মেশ্বর' মন্দির] ১। (ক) **দেউলি** (সুইসার লাগোয়া), বাঘমুণ্ডি, পুরুলিয়া। (খ) জৈন মন্দির। (ঘ) ধ্বংসস্তূপ দেখে মনে হয় ৩০ × ৪ ফুট অধিষ্ঠান বেদীর উপব পঞ্চায়তনটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমানে উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দেউলদুটি টিকে আছে, অন্য দুই কোণের দেউল দুটি লুপ্ত হয়েছে। মধ্যবর্তী মূল ও বৃহত্তম দেউলটির শুধু পিছনের দেওয়ালটি টিকে আছে। দেউলকটি পঞ্চরথ। মনে হয় এগুলি এক সময় পলেস্তরা-মণ্ডিত ছিল কেননা কোথাও কোথাও তার অবশেষ আছে। গর্ভগৃহে এখনও লোকদেবতা 'ইন্দুনাথ' বা 'অরুয়ানাথ' নামে পূজিত তীর্থঙ্কর মূর্তিটি অসাধারণ—আমলক এবং কলস-সহ একটি রেখ দেউলে দণ্ডায়মান নগ্ন মূর্তি। সাঠিকভাবেই বলা হয়েছে এমন চমৎকার মূর্তি পাকবিরড়াতেও নেই।* ভেঙে পড়া মন্দিরটিরই পাথরের স্তূপ অধিষ্ঠানটিতে এমনভাবে পড়ে আছে যে এর বেশি বোঝা যায় না—১৮৭২-৭৩-এ **বেগলার** এটুকুই দেখেছিলেন, তবে তাঁর মতে মন্দিরটি গর্ভগৃহ, অন্তরাল, মহামণ্ডপ, অর্ধমণ্ডপ ও সম্ভবত একটি বারান্দাযুক্ত ছিল—"The temple was once a very fine and large one, and had four subordinate temples near the four corners, of which two still exist ; the main temple is too far buried in, and surrounded by, rubbish for its plan to be made out without excavation, but it consisted of a sanctum, an antarala, a mahamandapa, an arddhamandapa, and probably a portico."**। (ঙ) অষ্টম-নবম শতক। (চ) পুরুলিয়া শহর থেকে গাড়ি রিজার্ভ করে ঝালদা হয়ে বাঘমুণ্ডি পথের সুইসা মোড় দিয়ে ঢোকাই সুবিধাজনক—অন্যথা বাঘমুণ্ডিগামী বাসপথের সুইসা মোড় স্টপেজ থেকে আন্দাজ চার কি.মি. হাঁটতে হবে। ২। (ক) **বুধপুর,** মানবাজার, পুরুলিয়া। (খ) বুদ্ধেশ্বর শিব। (ঘ) আদিতে পাথরের নির্মিত একটি বৃহৎ পঞ্চায়তন, কিন্তু বর্তমানে চারকোণের চারটি ছোট দেউলের মধ্যে মাত্র একটি অংশত টিকে আছে, এটি তেলকুপি ধাঁচের। মূল মন্দিরের উপরের অংশ অনেক

---

* Purulia District Gazetteer, p 434

** প্রাগুক্ত 'Report', p. 189

আগেই পড়ে গেছে, বেগলার সেখানে ইটের পুনর্নির্মাণ দেখেছিলেন*** (১৮৭২-৭৩)—১৯২৬-এ আবার পাথরের শিখর সংযোজিত হয়।**** (ঙ) দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক। (চ) পুরুলিয়া থেকে বাসে মানবাজার হয়ে হুরা রোড-এ। **প্রাসঙ্গিকী : বেগলার** তাঁর প্রাগুক্ত 'Report' (p. 197-98)-এ এখানে আরও পাঁচটি মন্দিরের অবশেষ ও কয়েকটি (তাঁর মতে) সতী-স্তম্ভের উল্লেখ করেছেন। এছাড়া মন্দিরের ভগ্ন নানা অংশ ও ভাস্কর্য এখানে পতিত অবস্থায় দেখা যায়—ভাস্কর্যগুলির মধ্যে দুটি গণেশ (একটি দণ্ডায়মান ও অন্যটি ললিতাসনে উপবিষ্ট) ও একটি বিষ্ণু মূর্তি উল্লেখযোগ্য। ৩। (ক) **পাঁচথুপী,** বড়ঞা, মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব। (গ) জগন্নাথপ্রসাদ ঘোষ হাজরা। (ঘ) একই চতুরস্র অধিষ্ঠানের চারকোণে চারটি ছোট ও মাঝে বৃহৎ (আনু. ৪০/৪৫ ফুট) রেখ দেউল। মূল দেউলের সম্মুখভাগে রামায়ণ, কৃষ্ণলীলা, দশাবতার প্রভৃতি টেরাকোটা অলংকরণ, চারকোণের দেউলকটিতে টেরাকোটা নকাশি কাজ। (ঙ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ। (চ) বহরমপুর বা কান্দী থেকে সরাসরি বাসে। **প্রাসঙ্গিকী :** (i) মূল মন্দিরের গর্ভগৃহ-মধ্যের চারকোণে চারটি ও মাঝে একটি, মোট পাঁচটি ও চারকোণের চারটি দেউলে চারটি—সর্বমোট নয়টি শিবলিঙ্গের জন্য স্থানীয়ভাবে এটিকে 'নবরত্ন মন্দির' বলা হয়—'রত্ন' এখানে শিবলিঙ্গ, মন্দিরের চূড়া নয়। (ii) অনতিদূরবর্তী কর্নসুবর্ণে উৎখনিত একটি মন্দিরের ভিৎ দেখে ভাবা হয় যে ওটি একটি পঞ্চায়তনেরই ভিৎ। (iii) শোনা যায় যে পাঁচটি বৌদ্ধ স্তূপ বা 'থুপ' থেকে 'পাঁচথুপী' নামটি এসেছে। এখন এখানে কোনো বৌদ্ধ স্তূপের চিহ্ন নেই—তবে তিন কি.মি. দূরের মুনিয়াডিহিতে 'বারোকোণার দেউল' নামে পরিচিত একটি বৌদ্ধ বিহারের অবশেষ আছে। ৪। (ক) **পঁচেট,** পটাশপুর, পূর্ব-মেদিনীপুর। (খ) পঞ্চেশ্বর শিব। (গ) দাস-মহাপাত্র পরিবার। (ঘ) সুউচ্চ প্রাকার বেষ্টিত, রাজসিক প্রবেশদ্বার ও মাঝে বৃহত্তম একটি রেখ দেউল, নিরলংকার—অধিষ্ঠানের চারকোণে চারটি ছোট দেউল। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) এগরা বা মেছেদা থেকে বাসে নিমজা—এখান থেকে ভ্যান-রিক্সায়। [স্মরণযোগ্য যে, বর্ধমানের **বৈকুণ্ঠপুরে** আটচালা মন্দিরের একটি পঞ্চায়তন আছে—উপযুক্ত স্থানে আলোচিত হবে।]

পাঁচ দেউল : (ক) **জয়কৃষ্ণপুর,** বিষ্ণুপুর। বাঁকুড়া। (খ) শিব। (গ) চণ্ডী রায়। (ঘ) একই শীর্ণ সরলরেখা-সম্পন্ন অধিষ্ঠানে একই সারিতে পরপর পাঁচটি ছোট (আনু. ১২/১৪ ফুট করে উচ্চতা) দেউল। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) পূর্বোক্ত। বাসস্ট্যাণ্ডের প্রায় লাগোয়া ব্যানার্জীদের ঠাকুরবাড়ি ও রাসমঞ্চ অতিক্রম করে।

ছয়দেউল : (ক) পাইকপাড়া, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। (খ) শিব। (ঘ) একই অধিষ্ঠানে, ১০/১২ ফুট করে উচ্চতা। প্রথমে পাশাপাশি দুটি, প্রথমটির পিছনে এক সারিতে আরও চারটি। ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত, ভগ্ন ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, তুলসী মঞ্চ ও একটি চারচালা বর্তমান। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) জয়কৃষ্ণপুরের পরে, একই মূল রাস্তার ধারে।

*** ঐ। P 197

**** ঐ 'Gazetteer' p 430

বারো দেউল : ১। (ক) **অযোধ্যা**, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। (খ) শিব। (গ) বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। (ঘ) একই সরল রেখাকার অধিষ্ঠানে একই সারিতে পরপর ১২টি সম-উচ্চতা-সম্পন্ন (আনু. ১৫ ফুট করে) পঞ্চরথ দেউল। ক্ষেত্রে একটি গিরিগোবর্ধন, একটি ১৭ চূড়া রাসমঞ্চ, ঠাকুরদালান প্রভৃতি বর্তমান। (ঙ) ১৯ শতকের শেষে। (চ) জয়কৃষ্ণপুর থেকে রিক্সায়/বাসে—পাইকপাড়া ও ধরাপাটের পরে। (২) **গড়বেতা** (বাজার-সন্নিহিত), পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শিব। (ঘ) প্রাচীর ঘেরা ক্ষেত্রে ১২টি শিখর মন্দির। ক্ষেত্রে একটি একরত্ন ও একটি ১৭ চূড়া রাসমঞ্চ বর্তমান। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) মেদিনীপুর শহর বা বিষ্ণুপুর থেকে বাসে।

চৌদ্দ দেউল : (ক) **চকদীঘি**, জামালপুর, বর্ধমান। (খ) শিব। (গ) ভোলানাথ সিংহরায়—পরে বর্ধমান রাজ-পরিবারে হস্তান্তরিত। (ঘ) চতুরস্র অঙ্গনের দুদিকে দুই রেখায় চারটি করে আটটি রেখ দেউল ও পিছনের রেখায় দুকোণে দুটি ঘন খাঁজ-কাটা রেখ দেউল ও তাদের মাঝে আরও চারটি রেখ দেউল—মোট (৪ + ৪ + ২ + ৪) চৌদ্দটি দেউল। সামনের রেখায় দুদিকে তিনটি করে বৃহৎ খিলান-সহ বারান্দা ও মাঝে প্রবেশদ্বারের উপরে চারচালা নহবৎখানা—প্রবেশপথের দুপাশ থেকে বর্গাকারে ঘোরানো একই অধিষ্ঠান, ফলত চারকোণা বারান্দায় ঘুরে সবকটি মন্দিরেই প্রবেশ করা যায়। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) তারকেশ্বর থেকে মসাগ্রামগামী বাসপথের চকদীঘি-ফকিরতলায় নেমে তার বিপরীত দিকের পথে সামান্য গিয়ে।

একই অধিষ্ঠানে বা ক্ষেত্রে রেখ দেউলের সঙ্গে অন্যান্য রীতির মন্দির :

রেখ + আটকোনা : ১। (ক) **সুপুর** (লালবাজার), বোলপুর, বীরভূম। (খ) শিব। (ঘ) একই উঁচু অধিষ্ঠানে পাশাপাশি ২০/২২ ফুট উচ্চতার দুটি দেউল, বাঁয়েরটি আটকোণা, দুটিই, বিশেষত আটকোণাটি, টেরাকোটা সমৃদ্ধ; অলংকরণে পাশ্চাত্য প্রভাব লক্ষণীয়। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) বোলপুর থেকে কিছু বাস সুপুর গ্রামের মধ্য দিয়ে যায়, সেগুলিতে সরাসরি, অথবা ইলামবাজার পথের সুপুর স্টপেজ থেকে হাঁটা। ২। (ক) **হেতমপুর**, দুবরাজপুর, বীরভূম। (খ) দেওয়ানজী শিব। (ঘ) একই বেদীতে লাগোয়া, ১২/১৪ ফুট করে উচ্চতা, আটকোণাটি টেরাকোটা সজ্জিত। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) ইলামবাজার বা দুবরাজপুর থেকে লোকাল বাসে হেতমপুর—হাতিতলা হতে চলা পথে।

রেখ + পঞ্চরত্ন + আটকোণা : (ক) **শ্রীবাটি**, কাটোয়া, বর্ধমান। (খ) ভোলানাথ, চন্দ্রেশ্বর এবং শঙ্কর শিব, (গ) প্রতিষ্ঠাতা, চন্দ পরিবার ও খোদাইকর—বদনচন্দ্র মিস্ত্রী, নিবাস, বনপাস। (ঘ) একই তেকোণা অধিষ্ঠান-বেদীর একপাশে রেখ দেউল (উচ্চতা আনু. ২৫ ফুট), অন্য পাশে একই উচ্চতার আটকোণা দেউল এবং মাঝে তিনটির মধ্যে উচ্চতম পঞ্চরত্নটি—সবক টিই মনোহর টেরাকোটা-সজ্জিত। (ঙ) ১৮৩৬-৪০। (চ) কাটোয়া থেকে কৈচরমুখী বাসে শ্রীবাটি স্টপেজ, কিছুটা হাঁটা।

উপরের দৃষ্টান্ত-দুটি ছাড়াও কখনও অন্য রীতির প্রধান মন্দিরের সঙ্গে এক বা একাধিক দেউল দেখা যায়। স্থানাভাবের জন্য সংক্ষেপে কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখিত হল—সব দৃষ্টান্তই ১৯শতকের:

(ক) একটি দেউল + অন্যরীতির মন্দির :

১। **পাত্রসায়ের** (শ্যাম-রঘুবীর ক্ষেত্র), বাঁকুড়া। আটচালা + দেউল + ব্যতিক্রমী দালান, (বর্ধমান থেকে বাসে সরাসরি)। ২। **ইয়াকুবপুর,** ঘাটাল, প: মেদিনীপুর। দেউল + দালান, (ঘাটাল থেকে কুঠীঘাটগামী সরাসরি বাসে)। ৩। **বরুইপুর** (নন্দীপাড়া), উদায়নারায়ণপুর, হওড়া। আট চালা + দেউল + আটচালা। (তারকেশ্বর-লাইনের হরিপাল থেকে বাসে উদয়নারায়ণপুরে গিয়ে রিক্সায়)। ৪। **দেবীপুর,** মেমারি, বর্ধমান। আটচালা + রেখ (দোলমঞ্চাকৃতি) + আটচালা। (বর্ধমান মেইন লাইনের দেবীপুর থেকে রিক্সায়/বাসে তিন কি.মি)। ৫। **গুড়াপ,** ধনিয়াখালি, হুগলী। দেউল + বৃহৎ আটচালা (নন্দদুলাল)—বর্ধমান কর্ড লাইনের গুড়াপ থেকে সহজেই বিখ্যাত নন্দদুলাল ক্ষেত্র। ৬। **সুরুল,** বোলপুর, বীরভূম। দেউল + আটচালা। (বোলপুর-শান্তিনিকেতন থেকে রিক্সায়—সরকার পাড়ার আগে, সামান্য ঢুকে)। ৭। **উদয়গঞ্জ,** খড়ার, পশ্চিম মেদিনীপুর। নবরত্ন + দেউল। (ঘাটাল থেকে সরাসরি বাসে)। ৮। **মানকর,** বুদবুদ, বর্ধমান। দেউল + দালান। (বর্ধমান-আসানসোল লাইনের মানকর থেকে রিস্কায়) ৯। **মৌখিরা,** আউসগ্রাম, বর্ধমান। দেউল + দালান, (বোলপুর- পানাগড় বাসপথের বসুধা থেকে ভ্যানরিক্সায়—স্থানীয় ব্যাণার্জীদেরে প্রাচীর-ঘেরা গৃহাঙ্গনে)। ১০। **শেরাণ্ডী** (মাঝপাড়া), বোলপুর, বীরভূম। দেউল + চারচালা। (বোলপুর থেকে কাটোয়া প্রভৃতি বাসে গিয়ে রিক্সায়)।

(খ) দুটি দেউল + অন্যরীতির মন্দির :

১। **মসাগ্রাম,** জামালপুর, বর্ধমান। দেউল + আটচালা। (হাওড়া-বর্ধমান কর্ড-লাইনের মসাগ্রাম স্টেশান থেকে হেঁটে/রিস্কায়—সর্ব-পরিচিত প্রাণেশ্বরতলার পথের ধারে)। ২। **বর্ধমান শহর** (বিখ্যাত সর্বমঙ্গলা-ক্ষেত্র)। দেউল + ব্যতিক্রমী আটাচালা + দেউল। (বর্ধমান স্টেশন থেকে রিস্কায়) ৩। **হৃদলনারায়ণপুর,** পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া। ব্যতিক্রমী নবরত্ন + দেউল। (বর্ধমান থেকে সরাসরি বাসে বা সোনামুখীগামী বাসপথের ধাগরিয়া থেকে ভ্যানরিক্সায়—মণ্ডলদের ছোট তরফ। ৪। **সুরুল** (সরকার-পাড়া), বোলপুর, বীরভূম। পঞ্চরত্ন + দেউল + দেউল, (শান্তিনিকেতন থেকে রিক্সায়)। ৫। **করিধ্যা** (বাসন্তীতলা), সিউড়ি, বীরভূম। দেউল + দুর্গাদালান + দেউল। (সিউড়ি থেকে রিক্সায়/ বাসে)।

(গ) তিনটি দেউল + অন্যরীতির মন্দির :

১। **বনকাটি (অযোধ্যা),** কাঁকসা, বর্ধমান। দেউল + দেউল + শিবের জোড়া আটচালা—ক্ষেত্রে একটি আধুনিক কালীদালান, জোড়া আটচালার পিছনে একটি বৃহৎ মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ, প্রাঙ্গণে একটি খেলকদম্ব গাছের নিচে জনৈক মহাত্মার সমাধি, গাছটিতে অসংখ্য পাখি। (বোলপুর-পানাগড় বাসপথের '১১ মাইল' স্টপেজ থেকে রিক্সায় ২। **গুসকরা, বর্ধমান।** সারদা মুখার্জী প্রতিষ্ঠিত দেউল + দেউল + দেউল + আটচালা।

দ্র : আরও বৈচিত্রের জন্য অমরারগড়ের দশমন্দিরতলার মত কয়েকটি ক্ষেত্র পৃথকভাবে পঞ্জিকত।

পঞ্জি—২

একবাংলা (দোচালা); উপাদান : ইট

(i) **মুসলিম স্থাপত্য** : ১। (ক) **পাণ্ডুয়া**, মালাদহ। (খ) ছোটি দরদাহ্। (গ) কুতবুল আলম ও আলাউল হক। (ঘ) দরগাহের ভিতরে দরবেশের সমাধির পরে পুরাতন এক-গম্বুজ মসজিদের লাগোয়া দ্বারশীর্ষ, 'বেহেস্তকা দরওয়াজা', সংস্কৃত। (ঙ) ১৫ শতক। (চ) মালদহ শহরের ইংলিশ বাজার বা রথবাড়ি, থেকে বাসে পাণ্ডুয়া—এখানকার 'সালামী দরওয়াজা' অতিক্রম করে। ২। (ক) ঐ। (খ) 'সালামী দরওয়াজা'। (ঘ) উচ্চতা ও প্রস্থ ২২ ফুট করে, মাঝ দিয়ে রাস্তা—তোরণ; তলা থেকে দেখলে সমতল ছাদ কিন্তু তার উপরে একবাংলা স্থাপত্য—দূর থেকে দেখলে দোচালা ঘর বলে মনে হয়। ইটের স্থাপত্য হলেও ভিৎ ও খিলানে পাথর ব্যবহৃত। (ঙ) ১৬/১৭ শতক। (চ) আগেরটির পথে। ৩। (ক) **গৌড়** (কদমরসুল), মালদহ। (খ) ফতে খানের সমাধি-গৃহ। (ঘ) আনু ১৪ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন ও আনু. ৩০ × ২২ ফুট ক্ষেত্র-বিশিষ্ট দোচালা, হাতির পিঠের মত কোর দেওয়া বক্রচাল। সম্মুখ ভাগে আড়াআড়ি ও খাড়াখাড়ি বাঁধা বাঁশের আদলে পলেস্তরার অলংকরণ এবং বাঁশের দোচালার মতই চালের দুদিকের ঢালের মিলিত রেখার শীর্ষে বন্ধনী। (ঙ) ১৬৫৭-৬০। (চ) মালদহের ইংলিশ বাজার থেকে মহদীপুরগামী বাসে পিয়াসবারি—এখান থেকে ভ্যানরিক্সায় 'কদমরসুল', ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেই দেখা যাবে। **প্রাসঙ্গিকী** : (i) কেউ কেউ এটি আদিতে হিন্দু মন্দির ছিল বলে ভাবেন, কিন্তু কেন অমন ভাবেন তা তাঁরাই জানেন। (ii) মুঘল-সম্রাট আওরঙ্গজেব শাহ সুজার বিরুদ্ধে অভিযানে দিলীর খান-কে গৌড়ে পাঠান, কিন্তু এখানে আসার পরে দিলীর খানের ছোট ছেলে ফতে খান রক্তবমি করে মারা যান (১৬৫৭ থেকে ১৬৬০-এর মধ্যে)। (iii) 'কদমরসুল' ক্ষেত্রের বাইরের সমাধি-ক্ষেত্রে একটি সমাধির উপরে একটি ক্ষুদ্র দোচালা স্থাপত্য (১৭ শতক?) আছে। ৪। (ক) **বর্ধমান শহর**। (খ) খাজা আনোয়ারের সমাধি (বের)। (ঘ) একটি বৃহৎ চার বুরুজ ও এক গম্বুজ সৌধের দুপাশে দুটি এক বাংলা স্থাপত্য। (ঙ) ১৮ শতকের প্রথম দিক। (চ) বর্ধমান স্টেশন থেকে রিক্সায়, আলমগঞ্জের দিকে—পরিচিত 'নবাববাড়ি' ৫। (ক) **কলিগ্রাম**, চাঁচল, মালদহ। (খ) জিন্দাপীরের সমাধি। (ঘ) আনু. ১৪ ফুট উচ্চতা, দৈর্ঘ্য-২০ ফুট ও প্রস্থ ১৪ ফুট—হাতির পিঠের মত বক্রচাল। (ঙ) ১৯ শতকের শেষে। (চ) মালদহ শহরের রথবাড়ি থেকে সরাসরি বাসে বা গাজোল হয়ে চাঁচলে গিয়ে রিক্সায়/বাসে। বাজারের বিপরীতে, রাস্তার ধারে।*

---

* "ঢাকার বেগমবাজারের কর্তালব খানের মসজিদ...মুর্শিদকুলি খানের সময় তৈরি হয়।...এটি তৈরি হয়েছিলো কতোগুলো কক্ষের উপর। এবং এর সঙ্গে লাগোয়া উত্তর পাশে আছে একটি দোচালা 'কুটীর।' কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে, এই ভবনে মসজিদের ইমাম বাস করতেন। মসজিদের উত্তর পাশে একটি দোচালা থাকার দৃষ্টান্ত এর আগেই তৈরি হয়েছিলো এগারাসিন্দুরের শাহ মোহাম্মদ মসজিদে।" —গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি,' পৃ. ৪১৭।

(ii) **হিন্দু-পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত পীরের দরগা :**

(ক) **রাউতাড়া** (ঝিখিরা), আমতা, হাওড়া। (খ) মানিক পীরের দরগা। (গ) রামজয় রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও রায় পরিবার কর্তৃক রক্ষিত। (ঘ) ছোট সাধারণ দোচালা। ক্ষেত্রে রায় পরিবারের বেশ কয়েকজনের সমাধি ফলক প্রোথিত আছে। (ঙ) ১৭৯৭। (চ) হাওড়া থেকে ঝিখিরা-গামী বাসে সরাসরি—দরগার পাশেই নামা। **প্রাসঙ্গিকী** : রাউতাড়ার 'মানিক পীরের দরগা' হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন। প্রতি ২-রা বৈশাখ পীরের মেলায় হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বহু মানুষ যোগ দেন ও সারা বৎসরই আশপাশের গ্রামগুলির বহু হিন্দু ও মুসলমান এখানে মানত করেন। একটি বিশিষ্ট হিন্দু পরিবার দরগাটি প্রতিষ্ঠা করেছেন ও দুশো বছরেরও বেশি সময় ধরে শ্রদ্ধার সঙ্গে চমৎকারভাবে দরগা-টি রক্ষা করে আসছেন—এই ব্যাপারটিও অতি শিক্ষণীয়।

(iii) **মন্দির :**

১। (ক) **বাঘডাঙা**, কান্দী, মুর্শিদাবাদ। (খ) সূর্যেশ্বর শিব। (গ) সূর্যমণি চোধুরী—বাঘডাঙা রাজবংশের প্রতিষ্টাতা। (ঘ) অতিভগ্ন ও প্রায় অবলুপ্ত, তবু এখনও একবাংলা ধাঁচটুকু বোঝা যায়, যদিও ছাদটির অংশমাত্র আছে। সামনের ভগ্ন ও জীর্ণ দেওয়ালে কিছু উৎকৃষ্ট টেরাকোটা—আদিতে ছোট কুটিরের মত ছিল বলে মনে হয়। (ঙ) ১৭ শতকের শেষে। (চ) শিয়ালদহ-লালগোলা শাখার বহরমপুর থেকে বাসে কান্দীতে গিয়ে রিক্সায়—১৩ মন্দির-সম্পন্ন কালীশ্বর (পঞ্চমুখী) শিব-মন্দিরের সামনে হতে ঘুরে, রাসবাড়ি ছেড়ে, একটি বৃহৎ পুকুর-পাড়ের পাড়ার মধ্যে।

২। (ক) **চন্দননগর**, বড়বাজার, হুগলী। (খ) নন্দদুলাল, (গ) ইন্দ্রনারায়ণ রায়। (ঘ) অতিবৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৩০ ফুট, দৈর্ঘ্য আনু. ৪০ ফুট ও প্রস্থ আনু. ২০/২২ ফুট) মুখমণ্ডপ বা জগমোহন দালান-রীতির গর্ভগৃহকে এমন ভাবে আচ্ছাদন করে রেখেছে যে সামনে দাঁড়ালে একবাংলা মন্দির-ই মনে হয়। বহুল-সংস্কৃত। পুরাতন ধারার চুন-বালির কাজের সামান্যমাত্র অবশিষ্ট। (ঙ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ। (চ) বড়বাজার এলাকায় জি.টি. রোড থেকে সামান্য ভিতরে গেলেই দেখা যাবে। চন্দননগরে হলেও শিয়ালদহ-নৈহাটি লাইনের বারাকপুর থেকে ৮৬ নং বাসে জগদ্দল-ঘাটে গিয়ে গঙ্গা পার যাওয়াই সবচেয়ে সুবিধার। হাওড়া-চুচূড়া বাসও ধরা যেতে পারে।

প্রাসঙ্গিকী : ভারতে ফরাসীদের প্রথম কুঠী হয় সুরাটে (১৬৬৮), এরপর চন্দননগরে (১৬৯০-৯২)। চন্দননগরের ফরাসী কুঠীর দেওয়ান হিসাবে ইন্দ্রনারায়ণ রায় প্রভূত বিত্তের অধিকারী হন। ১৭৫৬-য় ইওরোপে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সপ্তবর্ষের যুদ্ধ শুরু হলে ক্লাইভ ও ওয়াটসন নবাবের অনুমতি ছাড়াই চন্দননগর দখল করেন। সংঘর্ষকালে নন্দদুলাল মন্দিরের দেওয়ালেও গোলা পড়ে। ইংরেজরা ইন্দ্রনারায়ণের বাড়ি থেকে বহুলক্ষ টাকা লুঠ করে। কিন্তু নবাবের তোয়াক্কা না করায় ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের সম্পর্ক আরও খারাপ হয়। পলাশীর যুদ্ধ ত্বরান্বিত হয়।

৩। (ক) **বড়নগর**, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। (খ) পঞ্চানন শিব—'পঞ্চমুখী' শিবলিঙ্গ। (ঘ) ছোট একবাংলা কুটিরের মত, সামনের দেওয়াল টেরাকোটা মণ্ডিত, গঙ্গাতীরে, ঘেরা-উদ্যানে চমৎকারভাবে রক্ষিত। (ঙ) ১৮ শতক। (চ) কাটোয়া-আজিমগঞ্জ লাইনের আজিমগঞ্জ সিটি (জিয়াগঞ্জ সদর-ঘাট থেকে গঙ্গা পেরিয়েও আসা যায়) থেকে রিক্সায়—বিখ্যাত চার বাংলা মন্দিরের কিছু আগে, গঙ্গাপাড়ের শিশুউদ্যানের লাগোয়া।

৪। (ক) **মলুটি**, শিকারীপুর, ঝাড়খণ্ড। (খ) মৌলীক্ষা। (ঘ) নিরলংকার একবাংলা, সামনে বৃহৎ নাটমণ্ডপ। ঘেরা ক্ষেত্রে প্রবেশ পথের পাশে শিবের আটচালা। (ঙ) ১৮ শতক? (চ) রামপুরহাট থেকে রিজার্ভ আটো/গাড়ি (১৫ কি.মি.)—বাস কম হলেও আছে।

উপরের কটি ছাড়া নিরলংকার ও সাধাবণ একবাংলা মন্দির আছে যেসব জায়গায়, সেগুলি হল : ৫। **শক্তিগড়** (থানা বর্ধমান); 'কালিকা দেবী (১৮/১৯ শতক)—জি.টি রোডের ধারে, পাশে রাধা বল্লভের পঞ্চরত্ন। ৬। **রামপুর** (মাড়োতলা), থানা, দাসপুর, প : মেদিনীপুর; কালু রায় (ধর্ম) (১৯ শতক—পাঁশকুড়া থেকে বাসে গৌড়া-য় গিয়ে ট্রেকারে, আজুড়িয়ার লাগোয়া)। ৭। **শেরাণ্ডী** (মাঝপাড়া), থানা বোলপুর, বীরভূম; শিব (১৯ শতক)—বোলপুর থেকে বাসাপাড়া, নূতনহাট, কাটোয়া, প্রভৃতি বাসে। ৮। **অমরারগড়** (দশমন্দিরতলা), থানা আউসগ্রাম, বর্ধমান; দুর্গাদালান (খিলান শীর্ষে এক সার টেরাকোটা। মানকর থেকে রিক্সা/বাস)। ৯। **গণপুর** (কালীতলা), থানা মহম্মদ বাজার বীরভূম—দ্বিতীয় মন্দিরগুচ্ছের ঘেরা ক্ষেত্রে প্রবেশ পথের পাশে (১৯ শতক)—সিউড়ি বা রামপুরহাট থেকে বাসে। ১০। **মানকর**, থানা বুদবুদ, বর্ধমান; 'আনন্দময়ী কালী (১৯৪২—নবনির্মাণ)—মানকর-অমরারগড় পথের ধারে। ১১। বর্ধমান জেলার **কালনার** ২৫ রত্ন লালজী মন্দিরক্ষেত্রের প্রবেশদ্বারের পাশে সম্ভবত উৎসবাদিতে ব্যবহারের জন্য একটি একবাংলা স্থাপত্যের উপর পঙ্খের পশু, পাখি, পাথর ইত্যাদি বসিয়ে 'গিরিগোবর্ধন' রীতির মন্দিরের রূপ দেওয়া হয়েছে (১৯ শতক)। ১২। **কুমোরটুলি** (কলকাতা) -তে গোবিন্দরামের প্যাগোডা নামে পরিচিত নবরত্নের পাশের একটি স্থাপত্য (১৮/১৯ শতক) এবং ১৩। **বাগবাজার**, ২৬/১ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ অ্যাভেনিউতে জগৎরাম হালদার প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির। (১৯ শতক)।

অন্যদিকে ক্ষেত্রদ্বার-রূপেও এক বাংলা বা দোচালা রীতির যথেষ্ট প্রয়োগ হয়েছে, যেমন পূর্বোক্ত ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা ক্ষেত্রের পশ্চিমের প্রবেশদ্বার, কালনার পূর্বোক্ত লালজী ক্ষেত্রের প্রবেশদ্বার বা বর্ধমানের পাঁচড়ার (থানা জামালপুর) জোড়া শিবের মধ্যবর্তী পথ—সবই ১৯ শতকের। এছাড়া মন্দিরের মুখমণ্ডপ বা জগমোহন-রূপেও একবাংলা রীতির প্রয়োগ আছে, যেমন, পাঁচড়া (বীরভূম, থানা খয়রাশোল)-র 'ভৈরব' দেবীপুর, (বর্ধমান, থানা মেমারি)-এর 'লক্ষ্মী-জানার্দন'-এর দেউল এবং বোরগ্রাম (বর্ধমান, রায়না)—বলরামের মন্দির।

বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মদনমোহন মন্দিরের প্রবেশদ্বারটি একটি চমৎকার একবাংলা, এবং লালবাঁধের দক্ষিণে রাধা-মাধব মন্দিরের ভোগঘরটিও একটি অসামান্য একবাংলা স্থাপত্য।

এজাতীয় দৃষ্টান্ত পশ্চিমবঙ্গে আরও আছে।

পঞ্জি—২ (ক)

গুচ্ছ একবাংলা : 'চারবাংলা মন্দির'

(ক) **বড়নগর** (চারবাংলা মন্দির), জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব—চারটি মন্দিরের প্রত্যেকটিতে তিনটি করে, মোট ১২টি শিবলিঙ্গ। (গ) নাটোরের রানী ভবানী। (গ) চতুষ্কোণ অঙ্গন মাঝে রেখে ও উত্তর-পূর্ব কোণের প্রবেশপথটি ছেড়ে প্রায় পাঁচ ফুট উচ্চতার বর্গাকারে ঘোরানো অধিষ্ঠান-বেদীতে পূর্ব-পশ্চিমে মুখোমুখী দুটি এবং উত্তর-দক্ষিণেও মুখোমুখী দুটি—মোট চারটি ত্রি-খিলান খাঁটি একবাংলা বা দোচালা মন্দির (প্রতিটির উচ্চতা আনু. ১৮ ফুট, দৈর্ঘ্য আনু. ৩০ ফুট ও প্রস্থ আনু. ১৫ ফুট। পশ্চিমের (বা পূবমুখী) মন্দিরের সম্মুখভাগের চুনবালির অলংকরণ পশ্চিমবাংলায় অদ্বিতীয়। দক্ষিণের (বা উত্তরমুখী) মন্দিরটি নিরলংকার। প্রবেশপথের ডানে উত্তরের (দক্ষিণমুখী) মন্দিরের পূবপাশের দেওয়াল জুড়ে দেউলমধ্যে আসীন শিবের বৃহৎ টেরাকোটা মূর্তি স্থানটির শৈব চরিত্রকে ধারণ করে আছে। এটি এবং এর ডানের পূবমুখী মন্দিরটির সারা সম্মুখগাত্র অসাধারণ টেরাকোটা-শোভিত। (ঙ) ১৭৫৭-৬০। (চ) পূর্বোক্ত। তথাপি—শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনেব জিয়াগঞ্জের সদরঘাট থেকে গঙ্গা পেরিয়ে বা কাটোয়া-আজিমগঞ্জ লাইনের ট্রেণে আজিমগঞ্জ সিটি—এখান থেকে রিক্সায়। গঙ্গা-ঘেষে চলা পথে। [নির্মীয়মান নশীপুর-আজিমগঞ্জ- সেতুটি প্রস্তুত হলে শিয়ালদহ থেকে সরাসরি ট্রেনে আজিমগঞ্জ সিটি যাওয়া যাবে।]

প্রাসঙ্গিকী

(i) বড়নগর ছিল প্রায় সংলগ্ন বাংলাদেশের রাজশাহি-র নাটোর (বর্তমানে জেলা)-এর সুবৃহৎ জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত এবং গঙ্গাবাস। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে এটি ছিল একটি গঞ্জ, এখানকার পিতলের ঘড়া বিখ্যাত ছিল, খাগড়ার কাঁসারিদের অনেকের পূর্বপুরুষের বাস ছিল এখানে, অনেক ইউরোপীয় বণিকও তখন আসতেন।[১]

(ii) বড়নগরের মন্দিরগুলির অধিকাংশই নাটোরের রাজা রামকান্তের বিধবা পত্নী রানী ভবানীর অক্ষয় কীর্তি। বেশির ভাগই শিব মন্দির। দুঃখের বিষয় অনেক মন্দিরই ধ্বংসপ্রাপ্ত ও লুপ্ত [যেমন, রানী ভবানীর কন্যা তারাদেবী-প্রতিষ্ঠিত 'গোপাল মন্দির' (দালান রীতি)]। বর্তমানে চারবাংলা, ভবানীশ্বর (উল্টোপদ্ম শিখর দেউল) ও গঙ্গেশ্বর (জোড়বাংলা) মন্দির পুরাতত্ত্ব বিভাগ-কর্তৃক রক্ষিত—এছাড়াও কটি মন্দির (যেমন—ভবানীশ্বরের কাছে দুটি ছোট উল্টোপদ্মশিখর দেউল ও গ্রামের উত্তরতম প্রান্তে রামনাথেশ্বর শিবের জীর্ণ চারচালা) কোনোক্রমে টিকে আছে।

(iii) 'ময়মনসিংহ গীতিকা'-য় যে 'বারদুয়ারী' ঘরের কথা আছে, কামিনীকুমার রায়ের 'লৌকিক শব্দকোষ' এবং আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎ বঙ্গে' যার অসামান্য বর্ণনা আছে*

১। 'মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার', জেলাশাসক ও সমাহর্তা, মুর্শিদাবাদ, ২০০৩, পৃ: ৬৫২।

২। 'কামিনীকুমার ও দীনেশচন্দ্র-কৃত বিবরণের জন্য দেখুন এই বইয়ের প্রথম পরিচ্ছেদ, 'খ'ড়ো চালের মাটির ঘর,

—তার শ্রেষ্ঠস্তরের দৃষ্টান্ত হওয়ার যোগ্য বড়নগরের 'চারবাংলা মন্দির'। এই মন্দিরগুচ্ছের টেরাকোটা ও চুনবালির কাজ অতি বিখ্যাত, কিন্তু আমাদের মনে হয় স্থাপত্যটি আরও অনেক বেশি গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ—বাঙালির শিল্প-ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির একটি পূর্ণরূপে ধৃত আছে এতে। নিখুঁত ও খাঁটি 'হস্তিপৃষ্ঠ' ছাদ, অপরূপ কোনাচ, অতীব সুসমঞ্জস ত্রিখিলান প্রবেশপথ, সর্বোপরি কোমল-গম্ভীর শিল্পসাম্যের চিত্তপ্লাবী মর্যাদা—এসবই বর্ণনাতীত, দেখেই অনুভব করতে হয়।

(iv) 'চতুরায়তন' নামে একধরণের মন্দির সংস্থানের কথা কখনও কখনও শোনা যায়। এছাড়া 'চতুর-আয়ন' নামে একটি সংস্থানের কথাও কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন।[৩] কিন্তু পঞ্চায়তনের মতন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা চতুরায়তনের ক্ষেত্রে আমরা পাইনি, অতএব আমরা বড়নগরের 'চারবাংলা' মন্দিরকে 'চতুরায়তন'-রূপে বিবেচনা করিনি।—তবে বৈদিক যজ্ঞবেদী ছিল চতুষ্কোণ, চতুষ্কোণ অধিষ্ঠান নির্মাণের ক্ষেত্রে এমন বোধ কাজ করেছিল কিনা বলা শক্ত।

(v) গঙ্গার আগ্রাসী খাত থেকে 'চারবাংলা' মন্দিরের দূরত্ব ২৫/৩০ ফুট। বিষয়টি গুরুতর উদ্বেগের ব্যাপার।

৩। Adris Banerjee, 'Gaudiya Temples and their Diffusion : Indian Museum Bulletin, vol. v, No. I—January 1970, p. 119

পঞ্জি-৩

জোড়বাংলা (ত্রিখিলান)

[অন্যরকম উল্লেখ না থাকলে উপাদান : ইট]

১। (ক) **গুপ্তিপাড়া** (মঠবাড়ি), বলাগড়, হুগলী। (খ) চৈতন্য। (ঘ) ছোট ও আদি ধরণের। সংস্কারে বাইরের টেরাকোটা লুপ্ত কিন্তু গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের উপরে ও দুপাশের দেওয়ালে কিছু বর্তমান। (ঙ) ১৬ শতক। (চ) হাওড়া ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইনের গুপ্তিপাড়া স্টেশন থেকে রিক্সায়—কৃষ্ণচন্দ্র, বৃন্দাবনচন্দ্র ও রামচন্দ্রের মঠবাড়িতে; কৃষ্ণচন্দ্র ও বৃন্দাবনচন্দ্রের দুই বৃহৎ আটচালার মাঝের কোণে।

২। (ক) **চন্দ্রকোণা** (দক্ষিণ বাজার), পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) পরিত্যক্ত। (ঘ) ঝামাপাথরে নির্মিত, দৈর্ঘ্যেব (আনু.২৮ ফুট) তুলনায় উচ্চতা (আনু . ২০ ফুট) কম হওয়ায় চাপা দেখায়, একবাংলা দুটির সংযোগও আড়ষ্ট। চালের উচ্চতম বক্ররেখায় পরপর পাঁচটি শীর্ণ চূড়া। (ঙ) ১৭ শতকের প্রথম দিক। (চ) মেদিনীপুর শহর, পাঁশকুড়া বা ঘাটাল থেকে বাসে, চন্দ্রকোণা টাউন স্টপেজে নেমে সামান্য হেঁটে, বুড়োশিবের বৃহৎ নবরত্নের পরে।

৩। (ক) **তেহট্ট** (ঠাকুরপাড়া), নদীয়া। (খ) কৃষ্ণ রায়। (ঘ) উচ্চতা আনু.২২ ফুট, প্রস্থ আনু. ১৮ ফুট (দুটি একবাংলা আনু. ৮½ ফুট করে ও মাঝের দেওয়াল এক ফুট) এবং দৈর্ঘ্য আনু. ২০ ফুট। সংস্কারে একটি/দুটি টেরাকোটা ফলক অবশিষ্ট। ঘেরা মন্দিরের লাগোয়া আধুনিক ভোগঘর ও সামনের প্রাঙ্গণে আধুনিক দোলমঞ্চ। (ঙ) ১৬৭৮। (চ) শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের কৃষ্ণনগর অথবা পলাশী থেকে বাসে, বাসস্ট্যাণ্ড থেকে সহজে হেঁটে।

৪। (ক) **রাইগ্রাম,** মন্তেশ্বর, বর্ধমান। (খ) বরাহ-বিষ্ণু। (ঘ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতা, উভয় একবাংলা প্রস্থে আনু. ৯ ফুট করে, দৈর্ঘ্য আনু. ১৮/১৯ ফুট। সম্মুখভাগ টেরাকোটা-সজ্জিত। (ঙ) ১৬৮৪। (চ) বর্ধমান মেইন লাইনের মেমারি থেকে বাসে মন্তেশ্বরে গিয়ে ভ্যানরিক্সা।

৫। (ক) **বীরনগর** (মুস্তৌফিপাড়া), রাণাঘাট, নদীয়া। (খ) রাধাকৃষ্ণ। (গ) রামেশ্বর মিত্রমুস্তৌফি। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন, উভয় একবাংলাই প্রস্থে আনু . ১০ ফুট করে। কিছু টেরাকোটা অবশিষ্ট। (ঙ) ১৬৯৪। (চ) শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর লাইনের বীরনগর স্টেশন থেকে রিক্সায়।

প্রাসঙ্গিকী : (i) বীরনগরের প্রাচীন নাম উলা। "বাহ বাহ বলিঞা পড়িয়া গেল সাড়া।/ বামে শান্তিপুর যে ডাহিনে গুপ্তিপাড়া।।/ উলা বাহিঞা কেসিমার পাশে পাশে। মহেশপুর আসিঞা সাধুর ডিঙ্গা ভাসে।।'* (ii) 'আইন-ই -আকবরী'-তে উলাকে সরকার সুলেইমান-বাদেব ৩২টি মহালের অন্যতম বলা হয়েছে। (iii) ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে স্থানীয় ধনী মহাদেব মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে একটি বৃহৎ ডাকাত-দল আক্রমণ করলে গ্রামবাসীরা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে তাদের প্রতিরোধ করেন। এবজন্য তখনকাব ব্রিটিশ সরকার উলার নামকরণ করেন

* মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, 'চণ্ডীমঙ্গল', বণিকখণ্ড, পঞ্চানন মণ্ডল-সম্পাদিত 'ভারবি' ১৯৯২ মুদ্রণ, পৃ: ২২৬

'বীরনগর'। (iv) সমগ্র বীরনগর-জুড়ে একদা অতি ধনী মুস্তৌফি ও মুখোপাধ্যায় বংশের অনেক কীর্তি ছড়িয়ে আছে। মুস্তৌফিদের কাঠ-বাঁশ-খড়ের চণ্ডীমণ্ডপের শিল্পশোভার বিপুল খ্যাতি ছিল।

৬। (ক) **বসনছোড়া,** চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) রাধাগোবিন্দ। (গ)। (ঘ) ল্যাটেরাইট পাথরে নির্মিত। উচ্চতা আনু. ১৬ ফুট। উভয় একবাংলাই প্রস্থে ৭১/২ ফুট করে, দৈর্ঘ্য ২০ ফুটের মত। পাশের নাটমন্দির পরে (১৮১২-য়) নির্মিত কিন্তু ভগ্ন ও পরিত্যক্ত। (ঙ) ১৮ শতকের প্রথম দিক। (চ) চন্দ্রকোণা থেকে বাসে—সরাসবি মন্দিরের পাশেই নামা।

৭। (ক) **ছোট দিঘরি,** হীরাপুর, বর্ধমান। (খ) রঘুনাথ। (ঘ) বেলেপাথরে নির্মিত, উচ্চতা আনু. ২৫ ফুট। সামনের ত্রিখিলান ও মন্দিরের ডানপাশের খিলান-শীর্ষে চমৎকার খোদাই কাজ। (ঙ) ১৮ শতকের প্রথম দিক। (চ) আসনসোল থেকে 'নিউ টাউন' অথবা চিনাকুড়ি-গামী বাসে ছোট দিঘ্রি মোড়— এবার নিউ টাউনে ঢুকে জলট্যাঙ্কেব বিপরীতে, ডানে চলা পথে।

৮। (ক) **কালনা** (অম্বিকা-কালনা), বর্ধমান। (খ) সিদ্ধেশ্বরী কালিকা। (গ) চিত্রসেন রায়। (ঘ) সাতধাপ সিঁড়ির উপরে উঁচু অধিষ্ঠানে, আনু. ১৮ ফুট উচ্চতা, উভয় একবাংলা প্রস্থে আনু. ৮ ফুট করে। ত্রিখিলানের উপর কিছু টেরাকোটা পদ্ম। (ঙ) ১৭৪১। (চ) হাওড়া-ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া শাখার অম্বিকা-কালনা স্টেশন থেকে রিক্সায়।

প্রাসঙ্গিকী : (i) বৃন্দাবনদাস লিখেছেন : ''অন্যের কি দায়, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।/ তাহারাও পাদপদ্মে লাইল শরণ।।/ ..... এইমতে সপ্তগ্রামে আম্বুয়া-মুলুকে। বিহরেন নিত্যানন্দস্বরূপ কৌতুকে।।''* এবং কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখেছেন : ''ন্যায়াপাকি গীত গায় শুনিতে কৌতুক।/ ডাহিনে রহিল পুরী আম্বুয়ামুলুক।।''** —বৃন্দাবনদাস ও মুকুন্দরাম উভয়েই যে আম্বুয়া বা বর্তমান, অম্বিকা কালনাকে 'আম্বুয়ামুলুক' বলেছেন তার কারণ তাঁদেব সময়ের অন্তত ১০০ বছর আগেই এখানে একটি সমৃদ্ধ মুসলমান জনপদ গড়ে উঠেছিল। কালনায় ১৪৯০, ১৫৩৩ ও ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত তিনটি মসজিদের শিলালেখ পাওয়া গেছে, এর মধ্যে ১৫৩৩- এ নির্মিত ও টেরাকোটা অলংকৃত বৃহৎ জামিয়া মসজিদের অবশেষ এখনও কালনার খাসপুরে টিকে আছে। (ii) আইন-ই-আকবরী-তে আম্বোয়াকে সাতগাঁও পরগণার অন্তর্ভূক্ত বলা হয়েছে। অন্যদিকে ১৬৬০-এ প্রস্তুত ব্রুকের মানচিত্রে 'আম্বোয়া'কে গুরুত্বের সঙ্গে দেখানো হয়েছে। (iii) সিদ্ধেশ্বরী-ক্ষেত্রে বর্ধমান-রাজ ত্রিলোকচাঁদের মাতা প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দির ছাড়াও, রাজকর্মচারী রামচন্দ্র-নাগ প্রতিষ্ঠিত একটি আটচালা শিবমন্দির আছে—ইনি হলেন সেই রামচন্দ্র নাগ উত্তর ২৪ পরগণার মূলাযোরে (নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে বর্ধমান রাজপরিবার এর পত্তনি নেন) যার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কবি ভারতচন্দ্র 'নাগাষ্টক' রচনা করে প্রত্যেক শ্লোকের শেষে লেখেন : ''সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি।'' (iv) অম্বিকা কালনার অম্বিকা

* 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত', বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত 'দে'জ' ১৯৯৫ মুদ্রণ, শেষখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ: ৩৪৯

** প্রাগুক্ত 'চণ্ডীমঙ্গল', পৃ: ২২৬।

আদতে হয়ত জৈন দেবী, তবে মহাকবি কালিদাসের ‘কুমারসম্ভব-এ অম্বিকা হলেন পার্বতী বা দুর্গা—মাইকেল মধুসূদন দত্ত-ও ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’ এই অর্থেই ‘অম্বিকা’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন :

> "কোন্ পিতা দুহিতারে পতি-গৃহ হতে
> রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও বিজ্ঞ জটাধরে।
> ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে
> কহিও এ সব কথা।"***

৯। (ক) **ইটাণ্ডা,** বোলপুর, বীরভূম। (খ) কালী—বিগ্রহ নেই, তবে প্রতি বৎসর মাটির প্রতিমা বসিয়ে পূজো হয়। (ঘ) অতীব জীর্ণ। উচ্চতা আনু ২৫ ফুট, দুটি একবাংলাই আনু .৮ ফুটের প্রস্থেভাগ-সম্পন্ন। সমগ্র সম্মুখভাগ অপরূপ টেরাকোটা-সজ্জিত। (ঙ) ১৮ শতকের মধ্যবাগ। (চ) বোলপুর থেকে পাঁচশোয়া হয়ে বাসাপাড়া যাচ্ছে এমন বাসে সরাসরি ইটাণ্ডা-কালীতলা।

১০। (ক) **পাঁচথুপি** (দক্ষিণপাড়া), বড়এ্যা, মুর্শিদাবাদ, (খ) শ্যামসুন্দর। (গ) অধিকারী (এখন মুখোপাধ্যায়) পরিবার। (ঘ) আনু. ২২ ফুট উচ্চতা, দৈর্ঘ্য আনু . ২৫ ফুট, উভয় একবাংলা প্রস্থে আনু. ৯ ফুট করে। সামনে সমতল ছাদের বড় নাটমণ্ডপ। (ঙ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ। (চ) বহরমপুর থেকে সরাসরি বাসে বা কান্দী থেকে বাস বদল করে।

১১। (ক) **সিঙ্গারকোণ,** কালনা, বর্ধমান। (খ) রাধাকান্ত। (গ) গোস্বামী পরিবার। (খ) উঁচু দেওয়াল-ঘেরা ক্ষেত্র, আনু. ১৬ ফুট উচ্চতা, দৈর্ঘ্য ২০ ফুট ও উভয় একবাংলা মিলে প্রস্থ ১৫/১৬ ফুট। খিলান-শীর্ষের টেরাকোটা ক্ষয়িত। সামনে নাটমণ্ডপ। ঘেরা ক্ষেত্রের বাইরে দ্বিতল দোলমঞ্চ— অদূরে দুপাশে দুটি শিবের ছোট আটচালা। (ঙ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ। (চ) বর্ধমান মেইন লাইনের বৈঁচি স্টেশন-লগ্ন বাসস্ট্যাণ্ড থেকে কালনাগামী বাসে সিঙ্গারকোণ হাটতলা, এবার বিপরীত দিক ধরে চলা পাকা রাস্তায়, পীরতলা ছেড়ে এগিয়ে, ডানে, ঘরবাড়ির আড়ালে।

১২। (ক) **বড়নগর,** জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। (খ) গঙ্গেশ্বর শিব—তিনটি শিবলিঙ্গ। (গ) রানী ভবানী। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট দৈর্ঘ্য, ২০ ফুট উচ্চতা ও উভয় একবাংলা মিলে ২২ ফুট প্রস্থ-সম্পন্ন। সমগ্র সম্মুখ ভাগে অপরূপ টেরাকোটা-সজ্জা। (ঙ) ১৭৫০-৭০ এর মধ্যে। (চ) পঞ্জি ২। (ক) দেখুন—ঐ ‘চারবাংলা’ ছেড়ে উত্তরে আরও ১ কি.মি.।

১৩। (ক) **সৈদাবাদ** (‘দয়াময়ী পাড়া’, কাশিমবাজার), বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। (খ) দয়াময়ী কালী। (গ) কৃষ্ণেন্দু হোতা। (ঘ) ১৮ ফুটের মত উচ্চতা, ২০ ফুট প্রস্থ (উভয় এক বাংলা নিয়ে) ও দৈর্ঘ্য ২০ ফুটের মত। সামনের ত্রিখিলান প্রবেশপথ ছাড়াও প্রথম একবাংলাটির দু পাশেও খিলান—ফলে প্রথম একবাংলাটি হয়ে পড়েছে বারান্দার মতন। সামনে দু পাশের দুই সারিতে ৬টি করে মোট ১২ টি চারচালা শিব মন্দির—একটি সারি পূব ও অন্য সারিটি পশ্চিম-মুখী। পূবমুখী সারিটির পিছনে আরও একটি চারচালা এবং এর বিপরীতে ভগ্ন দালান-মন্দির। (ঙ) ১৭৫৯। (চ) শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের কাশিমবাজার থেকে রিক্সায়।

*** ‘মেঘনাদবধ কাব্য’, দ্বিতীয় সর্গ; মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৯ মুদ্রণ, পৃ. ৪৭।

১৪। (ক) **গোগুলপাড়া** (হালদার-পাড়া) , পাঁচলা, হাওড়া, (খ) চণ্ডী। (গ) হালদার পরিবার। (ঘ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য এবং উভয় একবাংলা মিলে অনুরূপ প্রস্থ-সম্পন্ন—টেরাকোটা-সজ্জিত সম্মুখভাগ। (ঙ) ১৭৬৮। (চ) হাওড়া থেকে উলুবেরিয়া-গামী বাসে ধূলাগড়ি, এখান থেকে বাস বদল করে বা ভ্যানরিক্সায়।

১৫। (ক) **চাকলতোড়,** পুরুলিয়া-মফস্বল, পুরুলিয়া। (খ) শ্যামচাঁদ। (ঘ) উঁচু অধিষ্ঠানের উপরে আনু. ২০ ফুট— দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা। সামান্য পঙ্খ। ঘেরা ক্ষেত্র। (ঙ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ। (চ) পুরুলিয়া থেকে মানবাজার প্রভৃতি বাসে, সহজে।

১৬। (ক) **দশঘরা,** ধনিয়াখালি, হুগলী,। (খ) বাসুলি। (গ) বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। (ঘ) দৈর্ঘ্য আনু. ১৮ ফুট, উচ্চতা ও দুটি একবাংলা মিলে প্রস্থ আনু . ১৮ ফুট, সংস্কৃত, নিরলংকার—তবে দুটি এক বাংলা চালের মিলনরেখা আড়ষ্ট ও কিছুটা চাপা। এক পাশে শিবের আটচালা। (ঙ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ। (চ) তারকেশ্বর অথবা বর্ধমান কর্ড লাইনের গুড়াপ থেকে বাসে বা ট্রেকারে—বিশ্বাসপাড়ার বিখ্যাত গোপীনাথ মন্দিরের পথে।

১৭। (ক) **লালগড়,** বীনপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) রাধামোহন ও কৃষ্ণরাধিকা। (গ) লালগড় রাজ-পরিবার। (ঘ) ল্যাটেরাইট পাথরে নির্মিত। কিছু টেরাকোটা। (ঙ) ১৮ শতক। (চ) মেদিনীপুর শহর থেকে বাসে।

১৮। (ক) **মহানাদ** (ঝাপতলা), পোলবা, হুগলী। (খ) অন্নপূর্ণা। (ঘ) ক্ষুদ্র জোড়বাংলা—১০/১২ ফুট উচ্চতা, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ। গর্ভগৃহে দেবীমূর্তির পাশে বুদ্ধমূর্তি। (ঙ) ১৮ শতকের শেষে। (চ) বর্ধমান মেইন লাইনের চুঁচুড়া বা পাণ্ডুয়া স্টেশন থেকে বাসে—বাসরাস্তা ধরেই সামান্য এগিয়ে ডানে। জটেশ্বরনাথ শিবের সুউচ্চ মন্দিরের সামনে।

১৯। (ক) **সেনেট,** দাদপুর, হুগলী। (খ) বিশালাক্ষী। (ঘ) ঘেবা চত্বরে বৃহৎ জোড়াবাংলা, উচ্চতা আনু. ৩৫ ফুট, দৈর্ঘ্য আনু. ২৫ ফুট ও প্রস্থ উভয় একবাংলা মিলে আনু.২০ ফুট। সংস্কারে টেরাকোটা লুপ্ত। (ঙ) ১৮২২। (চ) হওড়া-ব্যাণ্ডেল লাইনের চুঁচুড়ার ঘড়িমোড় থেকে বাসে সরাসরি—মন্দিরের কাছেই নামা।

উপবেরগুলি ছাড়া গড় পঞ্চকোট (পুরুলিয়া) ও কাঞ্চনগর (বর্ধমান)-এ আছে ভগ্ন ও প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত জোডবাংলা। গড় পঞ্চকোটের দৃষ্টান্ত কটি পাথরের ও এই বইয়ে উল্লেখিত (পঞ্চি-১, ক্রম, 'গড়পঞ্চকোটের মন্দির' দেখুন)। কাঞ্চননগরে যাওয়া যায় বর্ধমান শহর থেকে রিক্সায় বা টাউন-বাসে। মেদিনীপুর শহরে জোড়বাংলা দুটি।

হুগলীর চন্দননগরের বোড়াইচণ্ডীর মন্দিরটিও জোড়া বাংলা ধারার কিন্তু সরু রাস্তা ঘেষে হওয়ায় বোঝা শক্ত (শিয়ালদহ মেইন লাইনের শ্যামনগরের কালীবাড়ি-লাগোয়া ঘাট থেকে গঙ্গা পেরিয়ে রিক্সায় যাওয়া সুবিধাজনক)। মুর্শিদাবাদের পাঁচথুপিতে আরও একটি জোড়বাংলা মন্দির আছে। পুরুলিয়ার বেরো (সাঁতুরি থানা) ও ঝালদাতে দুটি জোড়বাংলা মন্দির আছে—কিন্তু আমাদের ওদুটি দেখা হয়নি—। এইসব দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে গড় পঞ্চকোট ও কাঞ্চননগরের দৃষ্টান্তগুলি হয়ত ১৭/১৮ শতকের, অন্য সব কটিই ১৯ শতকের। পশ্চিম মেদিনীপুরের পাইকপারির (পাঁশকুড়া-টেবাগেড়া বাসে সত্যপুর, এরপর সামান্য হাঁটা) ১৯ শতকীয় জোড়বাংলা দুর্গা মন্দিরটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত।

পঞ্জি—৩(ক)
জোড়াবাংলার উপরে অন্য স্থাপত্য

১। জোড়বাংলার উপরে চারচালা :

(ক) **বিষ্ণুপুর,** বাঁকুড়া। (খ) মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ। (গ) কেষ্ট রায়। (ঘ) অনুপম জোড়াবাংলার উপরে ক্ষুদ্র চারচালা। দুপাশের দেওয়ালে বাঁশ-খড়ের কুটিরের আদলে ফ্রেমের নক্সা। চার পাশই অপরূপ টেরাকোটা শিল্পে বিপুল সমৃদ্ধ। ভিতরে গভগৃহের দেওয়ালে চিত্রশিল্প। নিখুঁত চতুষ্কোণ অধিষ্ঠান—দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা সমান বা প্রায় সমান (আনু. ৩৫/৩৬ ফুট)—সামনে ও পিছনে ত্রিখিলান। অসামান্য ভারসাম্য-মণ্ডিত নির্মাণ। পশ্চিমবঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দিরগুলির একটি। (ঙ) ১৬৫৫। (চ) বিষ্ণুপুর শহরের রসিকগঞ্জ বাসস্ট্যাণ্ড থেকে রিক্সায়।

২। জোড়াবাংলার উপরে আটচালা :

(ক) **বিষ্ণুপুর।** (খ) মহাপ্রভু (১৭৩৪)—ধ্বংসপ্রাপ্ত।

৩। জোড়বাংলার উপরে নবরত্ন :

(ক) **বালি-দেওয়ানগঞ্জ,** গোঘাট, হুগলী। (খ) দুর্গা। (ঘ) আনু. ২২ ফুটের বর্গাকার অধিষ্ঠানের উপরে প্রথমে ১৫/১৬ ফুট উচ্চতার একটি জোড়বাংলা আর তারপরে জোড়বাংলাটির উপরে বসানো হয়েছে একটি ৩০ ফুটের মত নবরত্ন—দেখে মনে হয় যেন একটি শক্তপোক্ত জোড়বাংলা বানানোব পরে প্রতিষ্ঠাতার মন না ওঠায় তার উপরে নবরত্নটি চাপানো হয়েছে। পরিকল্পিত হলে ব্যাপারটি অভিনব, কিন্তু অধিষ্ঠানের তুলনায় উচ্চতা অনেক বেশি হওয়ায় দেখতে হয়েছে লম্বাটে। সামনের ত্রিখিলান-গাত্রের ঈষৎ বড় মাপের টেরাকোটা কিন্তু আকর্ষনীয়। ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি মন্দিরের অবশেষ আছে। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) আরামবাগ থেকে বাসে বালি-দেওয়ানগঞ্জ—বাসস্ট্যাণ্ড থেকে ট্যাক্সিতে, অঞ্চলের সব মন্দির দেখানোর চুক্তিতে।
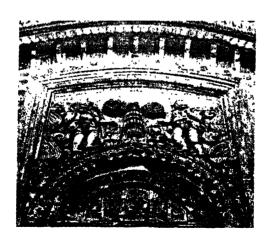
পঞ্জি—৪
চারচালা

১। (ক) **ঘাটাল** (কোন্নগর, কর্মকার পাড়া), **পশ্চিম** মেদিনীপুর। (খ) সিংহবাহিনী। (ঘ) ছোট চারচালা মন্দিরের মুখমণ্ডপ বা জগমোহনটিও চারচালা, ম্যাকাচিয়নের ভাষায় জোড়বাংলার একমাত্র চারচালা সগোত্র—"the only exampie of a *charchala* equivalent of the *jor-bangla*"* সংস্কারে টেরাকোটা লুপ্ত। (ঙ) ১৪৯০। (চ) হাওড়া অথবা পাঁশকুড়া থেকে বাসে—শিলাবতী সেতুর কাছে নেমে বিপরীতে নদী-ঘেষে চলা পথে, উচ্চবিদ্যালয় ও আদালত অতিক্রম করে।

২। (ক) **গোকর্ণ,** কান্দী, মুর্শিদাবাদ। (খ) নৃসিংহ। (ঘ) ৭/৮ ফুট উঁচু ভিত্তিবেদীর উপরে, ২৭/২৮ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। মাত্র কয়েকটি পুরাতন ধারার টেরাকোটা অবশিষ্ট। পাশে পরে নির্মিত আর একটি চারচালা। মন্দির দিয়েই ঘেরা অঙ্গণে আরও কয়েকটি জীর্ণ মন্দির। (ঙ) ষোড়শ শতক— ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দের সংস্কার-লিপি আছে। (চ) বহরমপুর-কান্দী বাস পথের গোকর্ণ বায়েনপাড়া হতে, সহজে।

৩। (ক) **পালপাড়া,** চাকদহ, নদীয়া। (খ) সংরক্ষিত মন্দির। (ঘ) বড় ও ৩/৪ ফুট উঁচু ভিত্তিবেদীর উপরে, উচ্চতা আনু. ৪০ ফুট। দৈর্ঘ্য আনু ২৭ ও প্রস্থ আনু.২১ ফুট। দ্বারশীর্ষে টেরাকোটা রাময়ণ প্যানেল ও সম্মুখগাত্রে দুপাশে ও উপরে দুই সারি টেরাকোটা পদ্ম। পূণ সংস্কৃত। ম্যাকাচিয়নের মতে পুরাতত্ত্ব বিভাগের এই সংস্কারে চালাটি তীক্ষ্ণ হয়েছে—"the roof has been brought to a point by A.S.I. repairs"** (ঙ) ১৬ শতকের শেষে। (চ) শিয়ালদহ থেকে রাণাঘাট বা কৃষ্ণনগর লোকালে, পালপাড়া স্টেশন-এর পশ্চিমে, হেঁটে। **প্রাসঙ্গিকী** : অদূরবর্তী যশোড়া ও কামালপুরের মতই পালাপাড়া প্রাচীন গ্রাম এবং ঐসব অঞ্চলের মতই পালপাড়ার বিদ্যাসমাজও বিখ্যাত ছিল—রাজা রামমোহন রায় এখানকার পণ্ডিত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের কাছে তন্ত্রশাস্ত্রের পাঠ নেন এবং পণ্ডিত নন্দকুমারেব ভাই রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ হলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য।

৪। (ক) **বাসুদেবপুর,** বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। (খ) বাসুদেব। (গ) সম্ভবত মল্লরাজ বীরসিংহ। (ঘ) ঝামাপাথরে নির্মিত, উচ্চতা আনু. ২০/২২ ফুট। (ঙ) ১৬২৬। (চ) বিষ্ণুপুর-মেদিনীপুর বাস পথে, স্টপেজ থেকে ভ্যান-রিক্সায়।

৫। (ক) **ঘুরিষা** (শ্রীপুর, পণ্ডিতপাড়া), ইলামবাজার, বীরভূম। (খ) রঘুনাথ—বর্তমানে শিব। লোকমতে বর্গী হামলায় রঘুনাথ বিগ্রহ লুণ্ঠিত হওয়ার পরে শিবস্থাপনা হয়। (গ) রঘুত্তম ভট্টাচার্য। (ঘ) উঁচু বেদীর উপরে—পূর্ব এবং উত্তর দেওয়াল বিপুল টেরাকোটা সমৃদ্ধ। (ঙ) ১৬৩৩। (চ) বোলপুর থেকে ইলামবাজারে গিয়ে দুবরাজপুরমুখী লোকাল বাসে সহজে ঘুরিষা—এবার রিক্সায় বা হেঁটে।

* ম্যাকাচিয়ন, প্রাগুক্ত, p. 5.

** ঐ, p. 31

প্রাসঙ্গিকী : হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বসবাস-সম্পন্ন ঘুরিষা বীরভূমের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম গ্রামগুলির অন্যতম। এখানে একদিকে যেমন ছিলেন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত-সমাজ অন্যদিকে তেমনই এখানকার বণিক-সমাজ অনতিদূরের ইলামবাজারের লাক্ষা ব্যবসায়ে অংশ নিয়ে যথেষ্ট বিত্ত সঞ্চয় করেন। আলোচ্য মন্দিরটি যেমন পণ্ডিত রঘুত্তম ভট্টাচার্য-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, গ্রামের নবরত্ন মন্দিরটি তেমন একটি প্রাক্তন বণিক-পরিবার-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

৬। (ক) **মাটিয়ারি,** কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া। (খ) রুদ্রেশ্বর শিব। (গ) রাঘব রায়। (ঘ) কিছুটা উঁচু কিন্তু সুবৃহৎ বর্গাকার অধিষ্ঠানের মাঝে, উচ্চতা আনু. ১৫ ফুট, সম্মুখভাগ মনোহর টেরাকোটা-সজ্জিত, নিচের প্যানেলে মুঘল সৈন্যদলের বিরল টেরাকোটা ভাস্কর্য। (ঙ) ১৬৬৪। (চ) শিয়ালদহ বা রানাঘাট থেকে গেদে লোকালে বাণপুরে গিয়ে রিক্সায়, মূলরাস্তা হতে পীরের দরগার পাশ দিয়ে ঢুকে। **প্রাসঙ্গিকী** : (i) কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের শ্রীমন্ত সিংহলযাত্রাকালে জলপথে যে "ম্যাটারি শহরখান বামে তেয়াগিএগ্রা"* নৌযাত্রা করেছিলেন সেই 'ম্যাটারি'-ই এখন মাটিয়ারি। (ii) যতদূর জানা যায়, নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ ১৬০৬-এ সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে রাজা উপাধি ও নদীয়ার জমিদারী পেয়ে মাটিয়ারিকে তার কেন্দ্র করেন। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা রাঘব রায় ভবানন্দের পৌত্র। রাঘব রায় তাঁর পুত্র রুদ্রদেবের নামে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন।

৭। (ক) **সুলতানপুর** (মল্লিকপাড়া), শ্যামপুর, হাওড়া। (খ) খাটিয়াল শিব। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আনু. ১৭ ফুট। (ঙ) ১৬৬৬। (চ) হাওড়া-খড়গপুর বাসপথের বাগনান থেকে শ্যামপুর কমলপুর, বাসে বেলপুকুর হাট স্টপ, রাস্তার পাশে।

৮। (ক) **দিগ্‌নগর,** কোতোয়ালি (কৃষ্ণনগর), নদীয়া। (খ) রাঘবেশ্বর শিব। (গ) রাঘব রায়। (ঘ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতা—সম্মুখগাত্র অত্যন্ত উৎকৃষ্ট টেরাকোটায় সুসমৃদ্ধ। (ঙ) ১৬৬৯। (চ) শান্তিপুর (শিয়ালদহ থেকে) স্টেশান-লাগোয়া বাসস্ট্যাণ্ড থেকে কৃষ্ণনগরের বাসে অতি সহজে দিগ্‌নগর, এরপরে ভ্যানরিক্সায় বা হেঁটে।

৯। (ক) **পাঁচড়া,** খয়রাশোল, বীরভূম। (খ) কালী। (ঘ) ল্যাটেরাইট পাথরে নির্মিত। কিছু খোদাই-কাজ। (ঙ) ১৬৮২। (চ) সিউড়ি (বা দুবরাজপুর) থেকে লোকপুর, বাবাইজোড়-গামী বাসে পাঁচড়া মোড়, এরপর রিক্সায়।

দ্র: উখরার শ্যামরায়ের চারচালা (১৬৮৬) সামনে সমতল ছাদের মণ্ডপের জন্য পৃথকভাবে পঞ্জিকৃত।

১০। (ক) **গোয়ালতোড়,** গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) সনকা (লৌকিক)। (ঘ) মাকড়া পাথরে নির্মিত ৩৫/৩৬ ফুট উচ্চতার বৃহৎ চারচালা। ত্রিখিলান। (ঙ) ১৭ শতক। (চ) মেদিনীপুর শহর থেকে বাসে।

১১। (ক) **যুগশ্বরা** (যুগসরা, শিবালয়), বড়এগ্রা, মুর্শিদাবাদ। (খ) যোগেশ্বর শিব। (গ) রামজীবন রায় (ঢেকার রাজা)। (ঘ) ২৫ ফুটের মত উচ্চতা, নিরলংকার। (ঙ) ১৭

* প্রাগুক্ত, 'চণ্ডীমঙ্গল', পৃ. ২২৫।

শতক—লিপি অনুসারে ১৭৭৪-এ সংস্কৃত। (চ) বহরমপুর (বা কান্দী) থেকে বাসে বড়ঞা—থানা স্টপেজে নেমে ভ্যানরিক্সায়।

১২। (ক) ঐ। (খ) শিব। (গ) পাঠক পরিবার (বর্তমানে লুপ্ত)। (ঘ) ২২ ফুটের মত উচ্চতার—ঈষৎ শীর্ণ ধরণের টেরাকোটা-সজ্জিত। (ঙ) ১৭/১৮ শতক। (চ) ঐ। পাশে।

১৩। (ক) **গোকর্ণ,** কান্দী, মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব। (ঘ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতার। নিরলংকার। উঁচু বেদীতে, নৃসিংহ মন্দিরের পাশে। (ঙ) ১৮ শতকের প্রথম দিক। (চ) ক্রম ২ দেখুন।

১৪। (ক) **চন্দ্রকোণা** (রঘুনাথপুর), পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) রাধাবল্লভ। (গ) বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। (ঘ) ঝামাপাথরে নির্মিত, আমলক-সম্পন্ন। (ঙ) ১৮ শতকের প্রথম দিকে। (চ) চন্দ্রকোণা টাউন (পূর্বোক্ত) স্টপেজ থেকে রিক্সায়।

১৫। (ক) **শান্তিপুর** (মতিগঞ্জ-বেজপাড়া), নদীয়া। (খ) জলেশ্বর শিব। (গ) কৃষ্ণনগর-রাজ রাঘব রায় বা তাঁর পুত্র রুদ্র রায়। (ঘ) আনু. ২২ ফুট উচ্চতা, টেরাকোটা সজ্জিত। (ঙ) ১৮ শতকের প্রথম দিক। (চ) শিয়ালদহ থেকে লোকালে শান্তিপুরে গিয়ে রিক্সায়।

১৬। (ক) **নারিচা** (স্থানীয় উচ্চারণে নারচে), পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া। (খ) সর্বমঙ্গলা। (ঘ) পাথরে নির্মিত। উচ্চতা ২০ ফুটের মত। উঁচু ভিত্তিবেদীর উপরে। বাঁকুড়া জেলা পরিষদ-কতৃক সম্পূণ সংস্কৃত। (ঙ) ১৮ শতকের প্রথম দিক। (চ) বর্ধমান-পাত্রসায়ের-বিষ্ণুপুর বাসে নারিচা—এরপর হেঁটে গ্রামের শেষে মাঠ ও শিশু উদ্যানের শুরুতে।

১৭। (ক) **জুবুটিয়া,** নানুর, বীরভূম। (খ) শিব। (ঘ) ছোট। টেরাকোটা-সম্পন্ন। (ঙ) ১৭২৮। (চ) বোলপুর থেকে বাসে কীর্ণাহারে গিয়ে ভ্যানরিক্সায় দাসকল গ্রামের পথে, জপেশ্বর মন্দির-ক্ষেত্রে।

১৮। (ক) **রামনগর,** ময়ূরেশ্বর, বীরভূম। (খ) রামেশ্বর শিব —দুইটি মন্দির। একটি ছোট ঘেরা ক্ষেত্রে, পাশাপাশি। বড়টি (আনু. ২৫ ফুট উচ্চতা) নিরলংকার, ছোটটি (আনু. ১৫ ফুট উচ্চতা) টেরাকোটা-সজ্জিত। (ঙ) ১৭৩৮। (চ) বীরভূমে হলেও সুবিধা হল : মুর্শিদাবাদের বহরমপুর বা কান্দী থেকে সরাসরি রামনগরের বাস—বাসস্টাণ্ডের পরে হাটতলা, এরপর একটি জোড়া শিবের মন্দির ডানে রেখে এগিয়ে ডানেই ঢোকা রাস্তার শেষে। সহজে হেঁটে।

১৯। (ক) ঐ। (খ) শিব। (ঘ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতা, জীর্ণ। নিরলংকার। (ঙ) ১৭৩৮/৩৯। (চ) ঐ। সামান্য আগে—একটি পুকুরের কাছে।

২০। (ক) **বড়নগর,** জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। (খ) রামনাথেশ্বর শিব। (গ) রামনাথ—লিপিতে এঁর সম্পর্কে আর কিছু নেই। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতা, উৎকৃষ্ট টেরাকোটা শোভিত দ্বারশীর্ষের ফলকগুলি. অপহৃত। (ঙ) ১৭৪১। (চ) পঞ্জি-৩, ক্রম ১২ দেখুন—ঐ মন্দিরটি হতে ১ কি.মি. উত্তরে।

২১। (ক) **বহিরগাছি,** নাকাশিপাড়া, নদীয়া। (খ) শিব। (গ) নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁর গুরুগৃহে। (ঘ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতা, বহুল সংস্কারে টেরাকোটা লুপ্ত। (ঙ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ। (চ) শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের মুড়াগাছা স্টেশন থেকে রিক্সায়। **প্রাসঙ্গিকী :**

আদিতে যশোহরবাসী পণ্ডিত রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ ছিলেন নদীয়ারাজ রুদ্র রায়ের গুরু, এই পণ্ডিতবংশই হ'ল নদীরাজবংশের গুরুবংশ। বিখ্যাত এই পণ্ডিতবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হলেন রঘুমণি বিদ্যাভূষণ। কৃষ্ণচন্দ্র নাকি গুরুগৃহে ১২টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন—এখন এই একটিই টিকে আছে।

২২। (ক) **শিবনিবাস** (হালদার পাড়া), কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া। (খ) পরিত্যক্ত মন্দির। শিব। (গ) নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। (ঘ) প্রায় ৪০ ফুট উচ্চতা, দ্বারের দুপাশে পঙ্খের পদ্ম। (ঙ) ১৭৫৪-৬২। (চ) শিয়ালদহ-রানাঘাট-গেদে লোকালে মাঝদিয়া স্টেশন, এখান থেকে ভ্যানরিক্সায় চুর্ণী-নদীর উপরে বাঁশের সেতু, হেঁটে সেতু পার হলে রামসীতা মন্দির, বিপরীতে রাজ্ঞীশ্বর ও রাঘবেশ্বর শিবের উচ্চ মন্দির—এদের ডানে রেখে কিছুটা গেলে জীর্ণ শীতলা-মন্দির ও উচ্চবিদ্যালয়, এই সব পেরিয়ে একটি পাকা রাস্তা—এর বিপরীতে।

২৩। (ক) **ঐ** (উচ্চ-বিদ্যালয়ের কাছে)। (খ) শীতলা। (গ) নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র (?)। (ঘ) পূব, পশ্চিম ও দক্ষিণে খিলান-সম্পন্ন প্রবেশ-দ্বার। উচ্চতা ১৮/২০ ফুট। (ঙ) ১৭৫৪-৬২। (চ) আগেরটির পথে।

২৪। (ক) **ভট্টবাটি (মাটি)**, নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব। (ঘ) আনু. ১৪/১৫ ফুট উচ্চতা, নিরলংকার, পুরাতত্ত্ব বিভাগ-কর্তৃক পূর্ণ সংস্কৃত। (ঙ) ১৮ শতক। (চ) রত্নেশ্বর শিবের পঞ্চরত্নের সামনেব অঙ্গনে। (চ) ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদ (লালবাগ) শহরের খোশবাগ ঘাট থেকে গঙ্গা পেরিয়ে রিক্সায় ৫ কি.মি., বা কাটোয়া-অজিমগঞ্জ লাইনের লালবাগ কোর্ট ঘাট স্টেশান থেকে একই পথে রিক্সায় ৩½ কি.মি.। নারিকেলবাগান মোড় থেকে গ্রামপথে ঢুকে, চাড়ালপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরে।

২৫। (ক) **সৈদাবাদ** (মহারাজা নন্দকুমার রোড), বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব (বর্তমানে কালী)। (গ) কৃষ্ণেন্দু হোতা। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন, চারপাশে টেরাকোটা ও পঙ্খের চমৎকার কাজ। (ঙ) ১৭৬৬। (চ) বহরমপুর বা কাশিমবাজার (এখান থেকেই সুবিধা) স্টেশন থেকে রিক্সায়, মহাবাজা নন্দকুমার রোডে ঐ একই নামের টাউন লাইব্রেরীর কাছে—রাস্তার পাশে 'মাতৃমন্দির' লেখা গ্রিলের গেট।

২৬। (ক) **ঐ** (বানবপাড়া)। (খ) পরিত্যক্ত মন্দির। (ঘ) আনু ২৫ ফুটের মত উচ্চতা, সামান্য পঙ্খের কাজ। (ঙ) ১৭৬৬-৬৭। (চ) কাশিমবাজার স্টেশন থেকে কাটিগঙ্গা ও ফরাসডাঙা যাওয়ার পথে—বৃন্দাবন ঘোষের চাষজমিতে।

২৭। (ক) **মৃগী,** তেহট্ট, নদীয়া। (খ) শিব। (ঘ) ছোট। টেরাকোটা সম্পন্ন। (ঙ) ১৭৬৭। (চ) কৃষ্ণনগর-করিমপুর বাসপথের ডাঙ্গাপাড়া থেকে হেঁটে/ভ্যানরিক্সায় (৩কি.মি)।

২৮। (ক) **কোটালপুর** (পূবপাড়া), দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) বৈষ্ণব গোঁসাইয়ের সমাধি। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (ঙ) ১৮ শতকের শেষে। (চ) পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসপথের বেলিয়াঘাটা থেকে রিক্সায়।

২৯। (ক) **কোটাসুর,** ময়ূরেশ্বর, বীরভূম। (খ) মদনেশ্বর শিব। (ঘ) উঁচু ঢিবির উপরে নাটমণ্ডপসহ নিরলংকার চারচালা। (ঙ) ১৮ শতক। (চ) সাঁইথিয়া থেকে বাসে, সরাসরি। **প্রাসঙ্গিকী** : বাঁকুড়ার পাখন্না, বীরভূমের কোটাসুর ও বর্ধমানের মঙ্গলকোট হল রাঢ়-বঙ্গের আদি বা আদিম 'নগর' কেন্দ্রের মুল এলাকা (core area)—খ্রিষ্টজন্মের কম করে ৩০০ বছর আগে কোটাসুরে আদি নগরায়ণের সূচনা হয়েছিল—উৎখননে বৃত্তাকারে প্রায় ১ কি.মি মাটির দেওয়াল ও সম্ভাব্য পরিখার সন্ধানও মিলেছে, এবং এগুলি যে খ্রিষ্টজন্মের ৩০০ বছরেরও আগে নির্মিত হয়েছিল তারও প্রমাণ মিলেছে।*

৩০। (ক) **কিরীটেশ্বরী,** নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ। (খ) বাঁকা ভবানী (বর্তমানে পরিত্যক্ত)। (ঘ) ঘনভাবে বেড়ে উঠতে থাকা তালগাছের প্রায় জঙ্গলের মধ্যে আনু. ২৫ ফুট উচ্চতার তীক্ষ্ণ চাল চারচালা। সামনের নাটমণ্ডপটির চাল লুপ্ত। পাশে সুদৃশ্য পুকুর, পুরাতন ঘাট সহ। (ঙ) ১৮ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ। (চ) শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের মুর্শিদাবাদ স্টেশন থেকে রিক্সায় ইচ্ছাগঞ্জ ঘাটে গিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে চার কি.মি. বা কাটোয়া-আজিমগঞ্জ লাইনের ডাহাপাড়া থেকে তিন কি.মি.। ক্ষেত্রের সবথেকে উঁচু মন্দিরটিকে ডানে রেখে পুকুর ছেড়ে, বাঁয়ে উঁচু চাষমাঠের মধ্যে। **প্রাসঙ্গিকী** : এই মন্দিরে একদা প্রতিষ্ঠিত ও 'বাঁকা ভবানী' নামে পরিচিত অষ্টভূজা মহিষমর্দিনী-র প্রস্তর বিগ্রহটি বড়নগরের রানী ভবানী দান করেছিলেন বলে কথিত।

৩১। (ক) **কৃষ্ণনগর** (রাজা রোড, আনন্দময়ীতলার কাছে), নদীয়া। (খ) শিব। (গ) জহরলাল দাশ। (ঘ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতা, দ্বারশীর্ষে পঙ্খের আটচালা মন্দিরের অনুকৃতি। ক্ষেত্রে একটি ছোট দুর্গাদালান। (ঙ) ১৮ শতকের শেষে। (চ) শিয়ালদহ মেইন লাইনের কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে রিক্সায়, রাজবাড়ির আগে, রাস্তার পাশে।

৩২। (ক) **ইনাথনগর,** ধনিয়াখালি, হুগলী। (খ) বিশালাক্ষী। (ঘ) নিরলংকার, সামনের বারান্দা পরে যুক্ত। (ঙ) ১৮০৭। (চ) তারকেশ্বর থেকে বাসে ধনিয়াখালি সিনেমাতলা, এবার হেঁটে/রিক্সায়।

৩৩। (ক) ঐ। (খ) বুড়োশিব। (ঘ) সাধারণ। (ঙ) ১৮০৮। (চ) ঐ।

৩৪। (ক) **বড়এঞা,** মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব। (গ) গুরুপ্রসাদ ঘোষ। (ঘ) মাঝারি, টেরাকোটা নক্সা। (ঙ) ১৮২৬। (চ) বহরমপুর-বড়এঞা বাস পথের বড়এঞা থানা স্টপেজ। উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছে।

৩৫। (ক) **আমনপুর** (মাঝপাড়া), কেশপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) রামেশ্বর শিব। (গ) রায় পরিবার। (ঘ) মাকড়া পাথরে নির্মিত। সামান্য টেরাকোটা। (ঙ) ১৯ শতকের মধ্যভাগ। (চ) মেদিনীপুর বা চন্দ্রকোণা টাউন থেকে বাসে কুঁয়াপুর। ভ্যানরিক্সা (৬ কি.মি.)।

৩৬। (ক) **ঐ** (উত্তরপাড়া)। (খ) দধিপাবন। (গ) বক্সী পরিবার। (ঘ) নিরলংকার। (ঙ) ১৯ শতকের মধ্যভাগ। (চ) ঐ।

* B.D. Chattopadhyaya : 'Urban centres in early Bengal, 'PRATNA SAMIKSHA' 2 & 3, 1993-94, p. 179.

৩৭। (ক) **মহানাদ,** পোলবা, হুগলী। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি, নিরলংকার। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) পাণ্ডুয়া থেকে বাসে। ব্রহ্মময়ী কালিবাড়ির পথে।

৩৮। (ক) **বেলিয়াঘাটা,** দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) রাধাকৃষ্ণ। (ঘ) ক্ষুদ্র। পূর্ণ সংস্কৃত। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে।

৩৯। (ক) **কাগ্রাম** (দক্ষিণপাড়া), ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতা। নিরলংকার। সংস্কৃত। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) কাটোয়া-আজিমগঞ্জ লাইনের সালার থেকে ভ্যানরিক্সা।

৪০। (ক) ঐ। (খ) শিব। (ঘ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতা। নিরলংকার। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) ঐ। অদূরে।

৪১। (ক) **কলিগ্রাম,** বর্ধমান। (খ) জয়দুর্গা। (ঘ) উঁচু বেদীর উপরে। আনু. ২৫ ফুট উচ্চতা। সম্পূর্ণ সংস্কৃত। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) বর্ধমান-কুসুমগ্রাম বাসে। বাসপথের পাশে।

৪২। (ক) **শেরাণ্ডী** (মাঝপাড়া), বোলপুর, বীরভূম। (খ) শিব। (ঘ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতা। খাড়া চাল। একই বেদীতে একটি দেউল। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) বোলপুর থেকে বাসাপাড়া, কাটোয় প্রভৃতি বাসে।

৪৩। (ক) **দিগ্‌নগর** (আদিপাড়া, সদ্‌গোপপাড়া), কোতোয়ালি, নদীয়া। (খ) শিব। (গ) চক্রবর্তী পরিবার। (ঘ) ২০/২২ ফুট উচ্চতা। পঙ্খের কাজ। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) ক্রম ৮ দেখুন। অনতিদূরে।

৪৪। (ক) **রূপপুর,** কান্দী, মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব। (গ) প্রামানিক পরিবার। (ঘ) ছোট, নিরলংকার। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) বহরমপুর থেকে বাসে কান্দী গিয়ে রিক্সায়—বিখ্যাত রুদ্রদেবতলার সামান্য আগে, রাস্তার ধারে।

৪৫। (ক) **খটনগর,** আউসগ্রাম, বর্ধমান। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি, শীর্ষে তাম্রকলস। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) বর্ধমান-বোলপুর লাইনের গুসকরা অথবা ভেদিয়া থেকে বাসে রামনগর—এর বিপরীতে গ্রামে।

৪৬। (ক) **শান্তিপুর** ((শম্ভুচন্দ্র প্রামানিক স্ট্রিট), নদীয়া। (খ) রাধারমণ। (গ) চন্দ্রমোহন ও লালমোহন গোস্বামী (উড়িয়া গোস্বামী) (ঘ) উচ্চতা আনু. ২৫ ফুট। তীক্ষ্ণচাল। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) শিয়ালদহ থেকে শান্তিপুর লোকাল। রিক্সা।

৪৭। (ক) **কৃষ্ণনগর** (নাজিরাপাড়া), নদীয়া। (খ) শিব। (গ) মতিলাল সরকার। (ঘ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতার নিরলংকার। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) কৃষ্ণনগর স্টেশন (শিয়ালদহ মেইন লাইন) থেকে রিক্সায়।

৪৮। (ক) **আজুড়িয়া,** দাসপুর পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) মনসা। (গ) সাঁই পরিবার। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট, ব্যতিক্রমীভাবে 'রথপগ'-যুক্ত। একসারি টেরাকোটা ফলক ও কিছু পঙ্খের কাজ। (ঙ) ১৮৭০। (চ) পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে গৌরা, এখান থেকে ট্রেকারে আজুড়িয়া—স্ট্যাণ্ড থেকে বাঁয়ের পথে গ্রামে ঢুকে ডানে—হাটপুকুরের কাছে।

৪৯। (ক) **লালবাগ** (কলন্দরবাগ, স্টেশান রোড), মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব। (ঘ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতা। মূলদ্বার ছাড়াও পাশের দেওয়ালে অতিরিক্ত দ্বার। নিরলংকার। (ঙ) ১৯ শতকের শেষে। (চ) শিয়ালদহ লালগোলা শাখার মুর্শিদাবাদ স্টেশন থেকে সহজে রিক্সায়/ হেঁটে— রেজেস্ট্রি অফিসের মোড় থেকে একটি তিনগম্বুজ মসজিদ ডানে ও উপসংশোধনাগারের দেওয়াল বাঁয়ে রেখে স্টেশান রোড ধরে সামান্য এগিয়ে ঐ দেওয়াল-শেষে ডানের গলিপথে।

৫০। (ক) **শ্যামপুর** (ইচ্ছাগঞ্জ), লালবাগ, মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব। (গ) ভত্তুলাল পোদ্দার। (ঘ) আনু, ১৫ ফুট উচ্চতা। সংস্কৃত। (ঙ) ১৮৯৯। (চ) মুর্শিদাবাদ স্টেশন থেকে নবাব বাহাদুর রোড ধরে নশীপুর যাওয়ার পথে—'হুসেনি দালানের' রাস্তার মুখে।

৫১। (ক) **নশীপুর** (পঞ্চায়তন), লালবাগ, মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব। (গ) রায় পরিবার। (ঘ) আনু. ২২ ফুটের মত উচ্চতা। খাড়া তীক্ষ্ম চাল। দেওয়াল আংশিক ভগ্ন। জীর্ণ। (ঙ) ১৯ শতকের শেষে (চ) আগেরটির পথে—নশীপুর রাজবাড়ির নহবৎ খানার বিপরীতের পথে ঢুকে, ডানের গলিপথে এগিয়ে বাঁয়ের গলিতে। মুর্শিদাবাদ-রীতির বৃহৎ পঞ্চরত্নের সামনের অঙ্গনে।

৫২। (ক) **কিরীটেশ্বরী** (গুপ্ত-মন্দিরের অনতিদূরে), নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব। (ঘ) ছোট, জীর্ণ ও তীক্ষ্ণচাল। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) ক্রম ৩০ দেখুন—বিপরীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের পথ ধরে গিয়ে, গুপ্ত মন্দিরের পথ ডানে রেখে বাঁয়ের পথে গিয়ে, প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত পঞ্চরত্নের কাছে—। দ্র: কিরীটেশ্বরীর অন্য চারচালাগুলি 'গুচ্ছ চারচালা'-রূপে পঞ্জিকৃত হয়েছে।]

৫৩। (ক) **মৌড়েশ্বর** (শিবপুকুর), ময়ূরেশ্বর, বীরভুম। (খ) মোড়েশ্বর শিব। (ঘ) পুকুরের মাঝে তীক্ষ্ম চাল চারচালা স্থাপত্য। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) সাঁইথিয়া-রামপুরহাট বাসে— মৌড়পুর (মহুরাপুর) ক্যানেল-অফিস মোড়ে নেমে।

প্রাসঙ্গিকী : (i) বর্ধমানের ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যার মতন মৌড়পুর বা মহুরাপুরের শিব চৈত্রমাসের শেষ তিনটি দিনের উৎসবকালে ছাড়া সারা বছর জলে ডোবানো থাকেন, একারণে 'শিবপুকুরের' মধ্যখানে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। (ii) বৃন্দাবনদাসের মহাগ্রন্থ 'চৈতন্যভাগবত'-এ মৌড়েশ্বরের উল্লেখ আছে :

(ক) "হাড়ো-ওঝা নামে পিতা, মাতা পদ্মাবতী।
একচাকা নামে গ্রাম মৌড়েশ্বর যথি।।"[১]

(খ) "যে দিনে জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র।
বাঢ়ে থাকি হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ।।
* * * * *
কথো লোকে বলিলেক জানিল কারণ।
মৌড়েশ্বর-গোসাঞির হইল গর্জন।।"[২]

১ এবং ২ : বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত 'দে-জ ১৯৯৫ মুদ্রণ, পৃ: ৪৬। (আদিখণ্ড)

নিত্যানন্দের জন্মস্থান একচাকা (একচক্রা, বর্তমানে বীরচন্দ্রপুর) মৌড়েশ্বর থেকে দূরে নয় বলেই বৃন্দাবনদাস তাঁকে বলেছেন 'মৌড়েশ্বর-গোসাঁই।' (iii) 'ভক্তিরত্নাকর' অনুসারে নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবীদেবী মৌড়েশ্বর শিবের পূজা করেন।

৫৪। (ক) **গোটপাড়া**, নাকাশীপাড়া, নদীয়া। (খ) শিব। (ঘ) ২০ ফুটের মতন উচ্চতা। নিরলংকার। (ঙ) ১৯ শতকের শেষে। (চ) শিয়ালদহ লালগোলা লাইনের বেথুয়াডহরী স্টেশন হতে রিক্সা (ভ্যান)।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি ছাড়া হুগলীর পুরশুরা থানার **বাখরপুর** (আধকাটা) গ্রামের চমৎকার চারচালার শুধু টেরাকোটা সজ্জিত দেওয়াল টিকে আছে (পথ: তারকেশ্বর-অমরপুর বাসে/ট্রেকারে ভাঙ্গামোড়া স্টপ)। মুর্শিদাবাদের **সাদপুরের** (থানা বড়এঞা, যুগশ্বরা থেকে ৫ কি.মি.) চারচালাটি বিনষ্ট হয়েছে। আবও চারচালা মন্দির আছে বর্ধমানের **দাঁইহাট** (থানা: কাটোয়া, ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইনে কাটোয়ার আগের স্টেশন), হুগলীর **সেলানপুর** ও **শ্যামবাজার** (থানা: গোঘাট, আরামবাগ থেকে পাণ্ডুগ্রাম হয়ে), বাঁকুড়ার **অযোধ্যা** ও **পাইকপাড়া** (পূর্বোক্ত) এবং বর্ধমানের **পুটশুড়ি, মৌখিরা** (পূর্বোক্ত) ও **এরুয়ার** গ্রামে এবং নদীয়ার **শান্তিপুরের** বাজারপাড়া সিদ্ধেশ্বরতলায়।

পঞ্জি-৪(ক)

[পীরের মাজার : চারচালা]

(ক) **বাণীবন** (পীরপুর), উলুবেড়িয়া, হাওড়া। (খ) জঙ্গল-বিলাস পীরের মাজার। (গ) আব্বাসউদ্দিন শাহ। (ঘ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতার (বর্তমানে) নিরলংকার চারচালা। সামনের টিনের চালের বারান্দা পরে যুক্ত। (ঙ) ১৮ শতক। (চ) হাওড়া-খরগপুর লাইনের উলুবেড়িয়া স্টেশন থেকে হেঁটে/রিক্সায়। এছাড়া ৬ নং জাতীয় সড়কের নিমদিঘি, মনসাতলা ও জোড়াকলতলা স্টপেজগুলি থেকেও বাণীবনে যাওয়া যায়।

প্রাসঙ্গিকী : প্রাপ্ত সূত্র হতে জানা যায় যে ষোড়শ শতকের শেষদিক পর্যন্ত বাণীবন ঘোর জঙ্গলাবৃত ছিল, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকেও দুর্গমতা বিশেষ কমেনি—প্রকৃতপক্ষে ১৯২৫-৩০শেও এখানে কিছু বন ও বন্যপ্রাণী ছিল। এর কারণ দামোদর, কানা দামোদর প্রভৃতির মজা খাত, খন্দ প্রভৃতিতে বাঁশবন, হেতালবন, বেনাবন প্রভৃতি ছিল—বাঘের ভয়ও যে যথেষ্ট তীব্র ছিল তা এখনও এ অঞ্চলের বাঘপোতা, বাঘহানা প্রভৃতি গ্রামনাম থেকে বোঝা যায়। ফলত: মাছধরা, কাঠুরে বা মধুসংগ্রাহকদের মতন যাঁদের সুন্দরবনে ঢুকতে হত বা যে সমস্ত বণিকদের এই পথ ব্যবহার করতে হত, —তাঁদের আশ্রয়, মানত, ঝারফুঁক প্রভৃতির প্রয়োজন মেটাতেই সম্ভবত জঙ্গলবিলাস পীর নামে অভিহিত আব্বাসউদ্দিন শাহ এই আস্তানাটি গড়ে তোলেন। আস্তানাটি দক্ষিণমুখী এবং এখানকার মূল উৎসব পৌষ-সংক্রান্তিতে—কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে এটি আদতে হিন্দু মন্দির ছিল।

পঞ্জি-৪(খ)

(ক) **উখরা**, অণ্ডাল. বর্ধমান। (খ) শ্যাম রায়। (ঘ) মাকড়া পাথরে নির্মিত, দৈর্ঘ্য আনু. ২৩ ফুট, প্রস্থ আনু. ১৬ ফুট। সামনে সমতল ছাদের মাকড়া পাথরেরই মণ্ডপ। (ঙ) ১৬৮৬। (চ) অণ্ডাল থেকে বাসে। পুরাতন হাটতলা থেকে বাঁ দিকের পথে।

পঞ্জি-৪(গ)

[দালানের উপরে চারচালা]

১। (ক) **শিবনিবাস**, কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া। (খ) রামসীতা। (গ) নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। (ঘ) আনু. ৪৫ ফুট উচ্চতা, কিন্তু চালাটির নিচে চারিদিকে ৪২ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৩২ ফুট প্রস্থ-সম্পন্ন পাঁচখিলান দালান যোগ করায় মনে হয় চালাটি দালানের ছাদের উপর বসানো, এছাড়া গর্ভগৃহও ত্রিখিলান যা চারচালার ক্ষেত্রে বিরল, চালার ঢালগুলিও প্রথাগত ত্রিভুজাকৃতি নয়, ঘন্টাকৃতি। (ঙ) ১৭৬২। (চ) পঞ্জি-৪, ক্রম ২২ দেখুন।

২। (ক) **কৃষ্ণনগর** (আনন্দময়ীতলা), নদীয়া। (খ) আনন্দময়ী কালী। (গ) নদীয়ারাজ গিরীশচন্দ্র। (ঘ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ২০ ফুট করে—কিন্তু চালাটির পিছন ছাড়া বাকি তিনদিকেই আনু. ২৫ ফুট উচ্চতার সমতল-ছাদ-সম্পন্ন দালান যোগ করায় মনে হয় দালানের উপরে চারচালা। দালানটি সামনের দিকে পাঁচখিলান। অঙ্গনের বাঁ পাশে জ্বরাসুর ও মহাদেবের পাশাপাশি দুটি চারচালা ও অঙ্গনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ব্যতিক্রমী ধরনের ক্ষুদ্র দ্বিতল মন্দিরে (গম্বুজ-শীর্ষ) শিব উপরতলে ও নিচের তলে কৃষ্ণ। (ঙ) ১৮০২-০৪। (চ) শিয়ালদহ মেইন লাইনের কৃষ্ণনগব স্টেশন থেকে রিক্সায়।

৩। (ক) **নবদ্বীপ** (পোড়ামাতলা), নদীয়া। (খ) ভবতারণ শিব এবং ভবতারিণী কালী। (গ) নদীয়ারাজ গিরীশচন্দ্র। (ঘ) একই ক্ষেত্রে দুটি মন্দির, আনু. ৩০ ফুট করে উচ্চতা—স্থাপত্য কৃষ্ণনগরে গিরীশচন্দ্রেরই প্রতিষ্ঠিত আনন্দময়ী কালীর অনুরূপ। দুটি মন্দিরই বটের অসংখ্য ঝুরি ও ডালপালার মধ্যে হওয়ায় স্থাপত্য বোঝা শক্ত। (ঙ) ১৮২৫। (চ) ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লোকালে বা কৃষ্ণনগর থেকে বাসে নবদ্বীপ, এরপর রিক্সায় অঞ্চলের অতীব বিখ্যাত স্থান। **প্রাসঙ্গিকী** : আচার্য বিনয় ঘোষ যথার্থ ভাবে লিখেছেন: "পোড়া-মা, বিদ্যাসমাজ ও শ্রীচৈতন্য—এই হল নবদ্বীপের ইতিহাসের অনুক্রম।"* চৈতন্যের আগেই নবদ্বীপ পোড়া-মা ও মহাশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত সমাজের জন্য প্রভূত খ্যাতিমান ছিল। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যের অব্যবহিত পূর্বে পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণি সর্বভারতীয় খ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। পোড়া-মা-কে নিয়ে কিংবদন্তি নানা—যেমন, লক্ষ্মণসেনের ১০০ বছর আগে জনৈক সিদ্ধ যোগী একটি বিশাল গাছের তলায় দক্ষিণা কালী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু একটি আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে গাছটি পুড়ে যায়, কালীও এখানে তাই পোড়া-মা। আরেকটি কিংবদন্তি অনুসারে, তাঁর 'থানে' একদিন শাক্ত-বৈষ্ণব বিতর্কের পর হঠাৎ দেখা যায় যে সমগ্র গাছটি দাউ দাউ

* প.বঙ্গের সংস্কৃতি-৩, পৃ. ৭৫।

করে জ্বলছে আর আগুনের লেলিহান শিখার মধ্যে বসে আছেন স্বয়ং কালী এবং তাঁর কোলে রয়েছেন গোপাল। যাই হোক, নবদ্বীপে চৈতন্যলীলাও যে লোকদেবী পোড়া-মায়ের খ্যাতি ও প্রভাব কিছুমাত্র ম্লান করতে পারেনি তাতেই বোঝা যায় লৌকিক সংস্কৃতির শিকড় কত গভীরগামী।

পঞ্জি-৪(ঘ)

[সুউচ্চ দেউলের মত চালা, চালাদেউল]

১। (ক) **শিবনিবাস**, কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া। (খ) রাজরাজেশ্বর—'বুড়োশিব' নামে পরিচিত। (গ) নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। (ঘ) উচ্চতা ৮০ ফুট, আটকোণা খাড়া দেওয়াল, প্রতি কোণের দেওয়াল ১৭ ফুট কয়েক ইঞ্চি করে চওড়া। আট দেওয়ালের আট কোণে আলংকারিক স্তম্ভ। আট-দেওয়াল-শীর্ষে মন্দিরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ থেকে ক্রমশ প্রসারমান ছাতার মত নেমে এসেছে চালের আটটি ঢাল। পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে তিনটি প্রবেশদ্বার—বাকি পাঁচ দেওয়ালেই নকল দরজা। এর উপরে দুটি বক্র থাকে তিনটি করে মন্দিরের অনুকৃতি। মন্দির-শীর্ষে তুলনায় ক্ষুদ্র আমলক ও স্তূপিকা। প্রতিষ্ঠালিপিতে বলা হয়েছে যে এই মন্দির এত উঁচু যে চাঁদকে চুম্বন করে এর 'শিখর'—''মন্দিরমিন্দুচুম্বিশিখরং''—অতএব নির্মাতাগণ 'শিখর দেউল' বিষয়ে সচেতন ছিলেন।* (ঙ) ১৭৫৪। (চ) পঞ্জি-৪, ক্রম ২২ দেখুন।

২। (ক) ঐ। (খ) রাজ্ঞীশ্বর শিব। (গ) নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। (ঘ) উচ্চতা ৬০ ফুট। অধিষ্ঠানবেদীটি ৪ ফুটের মত উঁচু। বর্গাকারে নির্মিত ও ২৫/২৬ ফুট চওড়া চারটি দেওয়াল খাড়া উঠে গেছে ৪০/৪৫ ফুট, এর উপরে শীর্ষ হতে চারদিকে নেমে এসেছে চারটি চালের ঢাল। (ঙ) ১৭৬২। (চ) ঐ। পাশে।

৩। (ক) **ডাবুক**, ময়ূরেশ্বর, বীরভূম। (খ) ডাবুকেশ্বর শিব। (গ) কৈলাসানন্দ স্বামী নামে একজন সাধু বলে কথিত। (ঘ) উচ্চতা আনু. ৮০ ফুট, স্থাপত্য মোটের উপর এর আগে বলা মন্দিরটির মতন। আয়তাকারে ঘেরা ক্ষেত্রে প্রবেশদ্বারের দুপাশে ক্ষয়িত ও ভগ্ন দালান। (ঙ) ১৮৮০। (চ) রামপুরহাট থেকে বাসে সাঁইথিয়া-গামী বাসে—তারাপীঠের পরে ও বীরচন্দ্রপুরের আগে, স্টপেজ থেকে হাঁটা। তারাপীঠ থেকে ভ্যানরিক্সায় যাওয়া সুবিধাজনক।

৪। (ক) **মলুটি**, শিকারীপুর, ঝাড়খণ্ড। (খ) শিব। (ঘ) আনু. ৫০ ফুট উচ্চতা, খাঁজকাটা দেওয়াল, দ্বারশীর্ষে কিছু ফুলপাথরের কাজ। আনু. ৩৫/৪০ ফুট খাড়া চারদেওয়ালের উপরে চারচালা ছাদ। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) রামপুরহাট থেকে রিজার্ভ অটোয়, সরাসরি।

* (i) এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি (উচ্চতা ৯ ফুট, বেড় প্রায় ২২ ফুট) পূর্ব-ভারতে বৃহত্তম। (ii) শ্রদ্ধেয় তারাপদ সাঁতরা এর স্থাপত্যের সঙ্গে একাদশ শতকীয় ফ্রান্সের নরম্যান্ডির সেন্ট নিকোলাস গির্জার একটি বিশেষ স্থাপত্যের সঙ্গে সাদৃশ্যের দিকে চিত্র-সহকারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, 'পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য, মন্দির ও মসজিদ,' পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮, পৃ: ৭৫।

পঞ্জিকা—৪ (ঙ)
গুচ্ছ চারচালা

মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার নানা গ্রামে স্থানে স্থানে পুঞ্জিভূত ছোট ছোট একদুয়ারী চারচালা মন্দির দেখা যায়। সামাজিক ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও এগুলির নব্বই শতাংশই চূড়ান্ত অবহেলিত এবং বিপজ্জনক দ্রুততায় হ্রাসমান। মুর্শিদাবাদ জেলায় **কিরীটেশ্বরীর** বেশির ভাগ মন্দিরই ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও মূল ও গুপ্ত উভয়ক্ষেত্র নিয়ে এখনো চিহ্নিত কবা যায় ১৬টি চারচালা; এই জেলায় এমন দৃষ্টান্ত আরও আছে, যেমন **গোকর্ণে** ১৮টি, **যুগশ্বরয়ায়** ১১টি ও **সৈদাবাদে** অন্তত ২০টি চারচালা আছে। একইভবে বীরভূমের **গণপুরে** ২০টি, **মল্লারপুরে** ২৪টি, **নানুরে** ১২টি ও বীরভূম লাগোয়া ঝাড়খণ্ডের **মলুটিতে** আছে ২৫/৩০টি চারচালা। কিন্তু আরও বেশি সংখ্যক চারচালা মন্দির কেন্দ্রীভূত আছে বীরভূমের **বক্রেশ্বরে**—কম করে ৩৬টি। কিরীটেশ্বরী ও বক্রেশ্বর পীঠক্ষেত্র; গোকর্ণের নৃসিংহ, নানুরের বিশালাক্ষী এবং মল্লারপুরের মল্লেশ্বর শিব অত্যন্ত মান্য—ভক্তবৃন্দ এসব জায়গায় যে নিজ নিজ সাধ্যের মধ্যে মানসিকে মন্দির বা উৎসর্গ-মন্দির নিবেদন করবেন তা স্বাভাবিক (প্রকৃতপক্ষে, বক্রেশ্বর ও মল্লারপুরের কয়েকটি মন্দির গাত্রে উৎসর্গলিপিও আছে)। কিন্তু যুগশ্বরা, সৈদাবাদ, গণপুর ও মলুটি (গ্রামদেবী মৌলীক্ষার প্রবল প্রতাপ সত্ত্বেও) পীঠস্থান নয় অথচ এইসব গ্রামের চারচালা মন্দিরগুলিই সবচেয়ে সুনির্মিত, সুঅলংকৃত ও ব্যয়বহুল। অতএব কোনও সরল ও সাধারণীকৃত সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়।

যাইহোক, স্থান-সংকোচনের জন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে ঈষৎ বিবরণ ছাড়া মন্দিরগুলির উল্লেখমাত্র করছি। (i) ঠিকানা/পথনির্দেশ না থাকলে বুঝতে হবে তা পূর্বোক্ত। (ii) সব মন্দিরই ইটের। (iii) উচ্চতা উল্লেখিত না হলে ছোট, সাধারণ। (iv) বক্রেশ্বর পূর্বালোচিত (পঞ্জি-১, ক্রম-৯৫)। (v) উল্লেখিত না হলে সব মন্দিরই শিবের। (vi) অন্যরকম উল্লেখ না থাকলে, পাশাপাশি। (vii) সময় উল্লেখিত না হলে ১৯ শতক ঃ

জোড়া চারচালা ঃ ১। কিরীটেশ্বরী, (i) গুপ্তমন্দিরের পথে, শীর্ণ পথের দুপাশে একটি করে ডানেরটি ঘন-খাঁজকাটা চালযুক্ত। ১৮ শতকের শেষে। (ii) গুপ্তমন্দিরের বিপরীতে ১৮/২০ ফুট করে উচ্চতা। সংস্কৃত। ১৮/১৯ শতক। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে যাওয়া। ২। **গোকর্ণ**—(i) নৃসিংহ মন্দিরের পথে, জীর্ণ ও বৃক্ষাক্রান্ত, বিপরীতে আরও একটি জোড়ার ধ্বংসাবশেষ। (ii) নৃসিংহ ক্ষেত্রের ডানে, বাইরে, সংস্কৃত। ১৮/১৯ শতক। ৩। **সৈদাবাদ,** কুঞ্জঘাটার ভেঙে ফেলা রাজবাড়ির এখনো টিকে থাকা ও মহারাজা নন্দকুমারের নামাঙ্কিত বৃহৎ তোরনের অদূরে। ১৮/১৯ শতক। শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের কাশিমবাজার থেকে রিক্সায়। ৪। **ডাহাপাড়া,** লালবাগ, মুর্শিদাবাদ। মুখোমুখী। পঙ্খ-অলংকৃত। ২০/২২ ফুট করে উচ্চতা। ১৮ শতক কিরীটেশ্বরী পথের ইচ্ছাগঞ্জ থেকে গঙ্গা পেরিয়ে, ডানে চলা পাকা রাস্তা ধরে, স্থানীয় বন্ধুকুঞ্জ আদিবাসী শিক্ষানিকেতনের সামনে। ৫। **কাগ্রাম,** ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ। ২০ ফুট করে উচ্চতা। বিখ্যাত জোড়া দেউলের সামনে। ১৯ শতক। সালার থেকে ভ্যানরিক্সা।

দুদিকে দুই চারচালা, মাঝে আটচালা ঃ খড়শা, খড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ। একই অধিষ্ঠান বেদীতে পাশাপাশি। মাঝের আট-চালাটি বৃহত্তম (উচ্চতা আনু. ৩০/৩২ ফুট— বর্তমানে কালী), দুপাশে দুটি চারচালা (উচ্চতা আনু. ২৫ ফুট করে) শিব-মন্দির। ১৮ শতক। চাষ মাঠের ধারে ঘেরা ক্ষেত্রে, প্রচুর গাছপালা সম্পন্ন বাগানের মত জায়গায়। বহরমপুর থেকে বাসে কান্দীতে গিয়ে রিক্সায়—মোর নদীসেতু পেরিয়ে নদী ধরে ডানে বাকুরগামী পথে দেড় কি.মি.।

দুদিকে দুই চারচালা মাঝে মুর্শিদাবাদী পঞ্চরত্ন ঃ যুগশ্বরা (শিবালয়)। দুদিকের চারচালা আনু. ২০ ফুট ও মাঝের পঞ্চরত্ন আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। একই বেদীতে। কিছু পঙ্খের কাজ। ক্ষেত্রের পশ্চিমে। ১৮/১৯ শতক।

দুদিকে চারচালা, মাঝে দালান, অঙ্গনে দোলমঞ্চ ঃ চিনপাই (ধর্মতলা), দুবরাজপুর, বীরভূম। ধর্ম। সিউড়ি দুবরাজপুর বাসপথের চিনপাই-কালীতলা স্টপেজে নেমে সামান্য এগিয়ে, সড়কের ডানে। (১৯ শতক)

তিনটি চারচালা ঃ ১। **যুগশ্বরা** (শিবালয়)। অঙ্গনের পূবে। এক বেদীতে। দ্বারশীর্ষে টেরাকোটা, বাম কোণেরটি ধ্বংসপ্রায়। দোবে পরিবার (এখন লুপ্ত)। ১৮ শতকের মধ্যভাগ।

২। **মলুটি,** শিকারীপুর, ঝাড়খণ্ড। মৌলীক্ষা মন্দিরে যেতে এক সময় পথের দুপাশে দুটি দুর্গাদালান—বাঁয়েরটির অঙ্গনে। একই বেদীতে দুটি পূব ও একটি পশ্চিমমুখী। ১৯ শতক রামপুরহাট থেকে রিজার্ভ অটোয় (১৫ কি.মি.)।

৩। **চিনপাই** (কালীতলা)। ক্ষুদ্র, অতি জীর্ণ। সঙ্গে একটি দেউল ১৯ শতক।

৪। **গোকর্ণ** (বাবুপাড়া)। রায় পরিবার। একই বেদীতে—ডানেরটি বৃহত্তম। ১৯ শতক বাসস্টপ বায়েনপাড়ার পরে, রাস্তার পাশে একটু ফাঁকা জায়গায়।

৫। **নাকাশীপাড়া,** নদীয়া। সিংহরায় পরিবার। উঁচু বারান্দার মত বেদীতে। আনু. ২০ ফুটের মত করে উচ্চতা। সামান্য পঙ্খের কাজ। ১৯ শতক। পাঁচিলঘেরা ক্ষেত্র। শিয়ালদহ-লালগোলা শাখার বেথুয়াডহরী স্টেশন থেকে ভ্যানরিক্সায়।

৬। **ইটা,** মঙ্গলকোট, বর্ধমান। বর্ধমান বা কাটোয়া থেকে বাসে কৈচর হয়ে ভ্যানরিক্সায়।

চারটি চারচালা ঃ ১। **রূপপুর,** কান্দী, মুর্শিদাবাদ। অঞ্চলের বিখ্যাত রুদ্রেশ্বর প্রাঙ্গণের দুপাশে মুখোমুখী দু জোড়া। প্রতিটি আনু. ২৫ ফুট করে উচ্চতার। অতি বহুল সংস্কারে টেরাকোটা শুধু পূবেরটিতে সামান্য অবশিষ্ট্য। ১৭/১৮ শতক। বহরমপুর থেকে বাসে কান্দী গিয়ে রিক্সায়। ২। **মুলুক,** বোলপুর, বীরভূম। রামকানাই ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বর শিব ও আরও তিনটি চারচালা। নীচু পাঁচিল ঘেরা প্রবেশ পথের পাশে ও লাগোয়া সামনের বেদীতে তিনটি— প্রথমটি ২০ ও অন্য তিনটি ১৫ ফুট করে উচ্চতার। ১৮ শতক প্রথম দিক। বোলপুর থেকে রিক্সায়, অনেক বাস ঐ পথে যায়। ৩। **উচকরণ,** নানুর, বীরভূম। তিন ফুটের মত উঁচু বারান্দার মত অধিষ্ঠানে। ২০ ফুটের মতন করে উচ্চতা। অতি মনোহর টেরাকোটা-সজ্জিত। ১৭৬৮। বোলপুর থেকে বাসে নানুরে গিয়ে ভ্যানরিক্সায়। ৪। **সৈদাবাদ** (গির্জাপাড়া)। লক্ষ্মীমণি বর্মণ প্রতিষ্ঠিত চারটি চারচালা মন্দির। একই ভিত্তিবেদীর দুপাশে দুটি ও বারান্দা রেখে ফুট কয়েক পিছিয়ে আরও দুটি। দুপাশের

দুটিই খাড়া চৌচালা ও বৃহত্তম। মাঝের দুটি পঙ্খের অলংকরণে সমৃদ্ধ ছিল—সামান্যাবশেষে বোঝা যায়। ১৮৫৪। পূর্বোক্ত কাশিমবাজার থেকে রিক্সায়, বিখ্যাত দয়াময়ী মন্দিরের অদূরে, উত্তরে। ৫। **বাপুলিবাজার,** মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। একটি বৃহৎ পুকুরের ঘাটের দু'পাশে দুই জোড়া চারচালা মন্দির। সামান্য পঙ্খের কাজ। ১৯ শতক। ডানের জোড়াটির সামনে সিমেন্টের সমতল ঢালাই ছাদের বারান্দা যোগ করায় রসভঙ্গ হয়েছে। শিয়ালদহ দক্ষিণ থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর / কাকদ্বীপ লোকালে মথুরাপুর—স্টেশন চত্বর পেরিয়ে রেলগেটের বিপরীত পার হতে ভ্যান-রিক্সায়—বাজার এলাকার পিছনে, সরু পথে ঢুকে। ৬। **করিধ্যা,** সিউড়ি, বীরভূম—(i) মনসাতলা, মনসার দালানের প্রাঙ্গণের দুপাশে দু জোড়া ও (ii) মাঝপাড়া, রাস্তার ডানে তিনটি ও বাঁয়ে বৃহত্তমটি। সিউড়ি থেকে রিক্সা/বাস। ৭। **যুগশ্বরা** (শিবালয়), নায়েক পরিবার, একই বেদী ও সারিতে, দ্বারশীর্ষে পঙ্খের কাজ।

১। **পাঁচটি চারচালা : দোহালিয়া** (কালীবাড়ি), কান্দী, মুর্শিদাবাদ। আটচালা ও বৃহৎ কালীমন্দিরের অঙ্গনে, পশ্চিমে তিনটি (প্রতিষ্ঠাতা, বাঘডাঙার দেওয়ান বিশ্বনাথ রায়) ও পূবে দুটি (প্রতিষ্ঠাতা কান্দী-রাজ রুদ্রনারায়ণ সিংহ) চার চালা (ঈষৎ টেরাকোটা)। ১৭/১৮ শতক। বহরমপুর থেকে বাসে কান্দীতে গিয়ে রিক্সায়। দ্রঃ উভয়দিকে একটি করে ছোট আটচালাও আছে।

২। **গণপুর,** মহম্মদবাজার, বীরভূম। একই বেদীতে ও মাঝে বৃহত্তমটি আনু. ২০ ফুট উচ্চতার। প্রতিটি মন্দিরই ফুলপাথরের অসাধারণ কাজে সজ্জিত। প্যানেলগুলির বিষয়-বৈচিত্রও অসাধারণ, পদ্ম এবং ফুল-লতাপাতার সঙ্গে কৃষ্ণলীলা দেবদেবী তো আছেই—আরও আছে কর্মরত শ্রমিক, যোগব্যায়াম প্রভৃতির আকর্ষক প্যানেল। ১৮ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ। রামপুরহাট-সিউড়ি বাসে—স্টপেজ থেকে গ্রামে ঢুকে বাঁয়ে-ঘোরা পথে চললে রাস্তার পাশেই প্রথম গুচ্ছ।

৩। **মুলটি** (রাজবাড়ি এলাকা),বন্দোপাধ্যায় পরিবার। একই বেদীতে ঘেষাঘেষি পাঁচটি চারচালা, কয়েকটি অতি জীর্ণ। সব কটিরই দ্বারশীর্ষে ফুলপাথরের অলংকরণ, একটির খিলানে দুর্গার অপূর্ব প্যানেল। ১৮/১৯ শতক গ্রামের মূল রাস্তায় সবচেয়ে উঁচু দেউলটির বিপরীতে।

৪। **চিনপাই** (চাষাপাড়া)। একটি বেড়াঘেরা আয়তাকার ক্ষেত্রে—প্রবেশপথের ডানে এক বেদীতে তিনটি ও বাঁয়ে আরও দুটি চারচালা ও একটি দোলমঞ্চ— সবই জীর্ণ ১৯ শতক। পূর্বোক্ত কালীতলা স্টপ থেকে গ্রামে ঢুকে মিত্রপাড়ার পরে, ডানে।

৫। **তেজহাটি,** নলহাটি, বীরভূম। সরকার পরিবার। রাস্তাব একপাশে তিনটি ও অন্যপাশে দুটি চারচালা। ১৯ শতক। রামপুরহাট থেকে বাসে।

সাতটি চারচালা : মলুটি (সিকি তরফ)। প্রবেশপথের পাশের ২টি মনোহর ফুলপাথরের অলংকরণ (বিশেষত পশ্চিম মুখী দুটি। আগেরটি হতে এগিয়ে, রাস্তায় দুদিকে দুই দুর্গাদালান—ডানেরটির ক্ষেত্রে। ১৯ শতক।

নয়টি চারচালা : ১। দয়ানগর (নবরত্ন শিব মন্দির), কাশিমবাজার, থানাঃ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। প্রতিষ্ঠাতা—গোপালদাস নিয়োগীচৌধুরী। ৫ ফুট উঁচু ও ৪০ বর্গফুট অধিষ্ঠানের

উপর পরস্পর-সংলগ্ন তিনসারিতে তিনটি করে (৩ × ৩) চারচালা—মাঝেরটি সর্বোচ্চ (আনু. ৪৫ ফুট) ও এর চারপাশের আটটি আনু. ২৫ ফুট কবে উচ্চতা-সম্পন্ন। ১৭৫৭/৫৮। অতি ব্যতিক্রমী সংস্থানটি এমন :

১	২	৩
৪	৫	৬
৭	৮	৯

৫ নম্বরটি কেন্দ্রীয় ও সর্বোচ্চ—এটি যেন বাস্তুশাস্ত্র কথিত বাস্তুপুরুমণ্ডলের ছক আর ৫ নম্বরটি যেমন তার কেন্দ্রে 'ব্রহ্মাপুর' বা 'ব্রহ্মাস্থান'। অঙ্গনে ছোট 'নন্দী'ও বর্তমান। নয়টি মন্দিরে নয়টি শিবলিঙ্গ, একারণেই সংস্থানটি অঞ্চলে 'নবরত্ন মন্দির' নামে পরিচিত—অর্থাৎ পাঁচথুপীর পঞ্চায়তনের মত 'রত্ন' এখানে শিবলিঙ্গ বোঝায়, মন্দিরের চূড়া নয়। ১৮ শতক। —শিয়ালদহ লালগোলা লাইনের কাশিমবাজার স্টেশন থেকে রিক্সায় বা স্টেশন থেকে বেরিয়ে ঝাউখোলা মোড় থেকে সোজা খাগড়ামুখী রাস্তা ধরে একটি পাথর-খিলান ('হোতার খিলান') পেরিয়ে দয়ানগর রোড ধরে হেঁটে। রাস্তার পাশে।

২। **মলুটি** (ছয় তরফ): পুব কোণেরটি ভগ্ন, এর পাশে ২নং, তফাতে ৫নং ও ৩/৪-এর সামনের অঙ্গনে ৬, ৭, ৮ এবং ৯নং চারচালা। সবকটিরই দ্বারশীর্ষে ফুলপাথরের অলংকরণ, শুধু ৩ নম্বরটির সারা সম্মুখগাত্রে ফুল পাথরের অনবদ্য অলংকরণ—বিশেষত দেওয়ালের নিচের স্তরে দুধ দোয়ানো, লাঙ্গল-দেওয়া প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের প্যানেল মুগ্ধ করে। তিন নম্বরটির লিপি অনুসারে ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত, অন্যগুলি পরে, ক্রমে।—গ্রামশেষে, মৌলীক্ষা মন্দিবের সামান্য আগে হতে ডানে ঘুবে কিছু গিয়ে।

দশটি চারচালা : কিরীটেশ্বরী (মূল-মন্দির ক্ষেত্র, 'কালী-সাগর'-পুকুর-পাড়ে)। ঘাটের বাঁয়ে ১টি, আনু ১৭/১৮ ফুট উচ্চতা, পাশের দেওয়ালে অতিরিক্ত দ্বার, সামান্য পঙ্খের কাজ অবশিষ্ট, সংস্কৃত। ঘাটের ডানেরটি অতি জীর্ণ মৃতপ্রায়, এর কাছে তৃতীয়টির চাল থেকে বিশাল বট গগনচুম্বী হয়েছে। পঞ্চমুণ্ডীর আসন ঘিরে দালান-মন্দিরের পিছনে একত্র এবং একঝাঁকে অন্তত সাতটি বৃহৎ চারচালার লুপ্ত-চাল ভগ্ন দেওয়াল ও ভিৎ—অপেক্ষাকৃত ছোটটি পুনর্নির্মিত। ক্ষেত্রে এমন মন্দির আরও ছিল, তাই স্মৃতিরূপে এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। এগুলি লুপ্ত হলে বোঝাই যাবে না জায়গাটি কেমন ছিল। ১৮/১৯ শতক।

এগারোটি চারচালা : বাঘডাঙা (কালীশ্বর শিবের মুর্শিদাবাদ-রীতির পঞ্চরত্নের সামনে, দুপাশে দুই সারিতে), কান্দী, মুর্শিদাবাদ। আনু. ১৮/২০ ফুট করে উচ্চতা, নিরলংকার। উত্তরে সরলরেখ এক বেদী ও সারিতে ৪টি চারচালা ও একটি আটচালা। দক্ষিণের সরলরেখ বেদী ও সারিতে ৭টি চারচালা ও একটি আটচালা—দুই সারি মুখোমুখী। ১৭/১৮ শতক। —বহরমপুর থেকে বাসে কান্দীতে গিয়ে রিক্সায়।

বারোটি চারচালা : চণ্ডীদাস-নানুর, নানুর, বীরভূম। প্রাচীন ঢিবির পাশের প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকলে মাঠে বিচ্ছিন্ন ১নং, বাশুলীর দালানের ডানে এক বেদী ও সারিতে ২, ৩, ৪ এবং ৫ নং—সবকটির দ্বারশীর্ষে ও দুপাশে পঙ্খের ফুল, পাখি, সূর্য ইত্যাদির অলংকরণ; ঐ দালানেরই বাঁয়ে ৬নং, আয়ত অঙ্গনের বিপরীত দিকে বাশুলীর মুখোমুখী জোড়া আটচালার ডানে ৭নং এবং এর পিছনে একই বেদী ও সারিতে ৮, ৯, ১০, ১১ এবং ১২নং চারচালা মন্দির। ১৭/১৮ শতক। —বোলপুর থেকে বাসে, সরাসরি।

তেরোটি চারচালা : সৈদাবাদ (দয়াময়ী পাড়া)। দয়াময়ী কালীর জোড়বাংলা মন্দিরের সামনের অঙ্গনের দুপাশে ৪ ফুট করে উঁচু ভিত্তিবেদীর উপরে মুখোমুখি দুই সারিতে—প্রতি সারিতে ৬টি করে ১২টি এবং দয়াময়ীর সামনে, ডান কোণে আরও একটি চারচালা মন্দির। ১৭৫৯।

চৌদ্দটি চারচালা : গণপুর (কালীতলা)। ঘেরা ও সুবৃহৎ আয়তাকার ক্ষেত্রের পূব পাশে এক বেদী ও সারিতে ৭টি, পশ্চিমপাশে এক বেদী ও সারিতে ৪টি এবং উত্তরপাশে এক সারিতে ৩টি (৭ + ৪ + ৩), মোট চৌদ্দটি চারচালা মন্দির; এছাড়া উত্তর-পশ্চিম কোণে সুউচ্চ মঞ্চের উপরে চারচালা দোলমঞ্চ—সব স্থাপত্যই (বিশেষ করে দোলমঞ্চটি) ফুলপাথরের অলংকরণে সজ্জিত। প্রবেশ পথের পাশে দোচালা ধরণের একটি স্থাপত্য। ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে একটি টিনের চালায় গ্রামের বাৎসরিক কালীপূজা হয়। ১৮ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ। —গণপুরের আগে বলা গুচ্ছটি হতে সামান্য এগিয়ে, বাঁয়ে।

চব্বিশটি চারচালা : মল্লারপুর, ময়ূরেশ্বর, বীরভূম। আয়তাকার ক্ষেত্র, উত্তরে প্রবেশ পথের উপরে ত্রিখিলান নহবৎখানা। ক্ষেত্রের মাঝে বৃহৎ ও সমতলছাদের নাটমণ্ডপ, এর তিনপাশে মন্দিরের সার। প্রবেশ করলে—পশ্চিমে প্রথমে একটি আধুনিক মন্দির, এরপর সিদ্ধেশ্বরীর দোচালা জগমোহন-সহ আটকোণা দেউল, এরপর মল্লেশ্বর শিবের চারচালা, আধুনিক ভোগঘর এবং একই বেদীতে তিনটি চারচালা; দক্ষিণে প্রস্থের দিকে একই বেদী ও সারিতে চারটি চারচালা; পূবে দৈর্ঘের দিকে, পুকুরপাড়ে প্রথমে এক বেদীতে পাঁচটি চারচালা, পাশে একই রেখায় আরেকটি বেদীতে তিনটি চারচালা, পুকুরের ঘাট, এরপর সব একই রেখায়

পরপর—এক বেদীতে দুটি চারচালা, এক বেদীতে একটি পঞ্চরত্ন, এক বেদীতে দুটি চারচালা, এক বেদীতে একটি বৃহৎ চারচালা ও শেষে এক বেদীতে তিনটি চারচালা মন্দির :
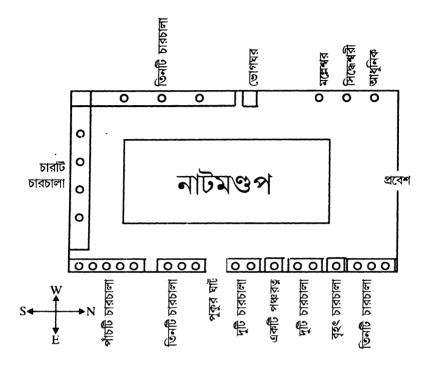
আগেই বলা হয়েছে সিদ্ধেশ্বরী দোচালা জগমোহন-সহ আটকোণা দেউল ও মল্লেশ্বর চারচালা। মল্লেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বরী নিরলংকার—বাকি সব মন্দিরেই কমবেশি ফুলপাথবের অলংকরণ আছে। ক্ষেত্র প্রাচীন, কিংবদন্তিও নানা। তবে, মল্লেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বরী প্রাচীনতর কিন্তু বাকি সব মন্দিরই ১৯ শতকীয়—রামপুরহাট-সিউড়ি বাসপথের মল্লারপুর বটতলা স্টপেজ থেকে নামে মাত্র হাটা। বর্ধমান রামপুরহাট লাইনের মল্লারপুর স্টেশন থেকে রিক্সাতেও আসা যায়।

পঞ্জি-৫
আটচালা

(i) বিষয়ক্রম পূর্ববৎ। (ii) অন্যরকম উল্লেখ না থাকলে উপাদান ইট। (iii) খিলান বলা না হলে একদুয়ারী। (iv) উচ্চতা : বৃহৎ = ৩০ ফুটের বেশি; মাঝারি = ২০-৩০ ফুট; ছোট = ২০ ফুটের কম এবং অতিবৃহৎ ৪৫ ফুটের বেশি। (v) অলংকরণ : (ক) টেরাকোটা = পোড়ামাটির কাজ; (খ) ফুলপাথর = ফুলপাথরের কাজ। (গ) পঙ্খ = চুনবালি ইত্যাদির কাজ; (ঘ) কাঠের কাজ = দরজা প্রভৃতির পাল্লায়/ফ্রেমে করা খোদাই শিল্প। (vi) কাল উল্লেখ না থাকলে তা আগের মন্দির বা মন্দিরগুলির কাল। (vii) থানা বা জেলার উল্লেখ না থাকলে স্থাননামই জেলা/থানার নাম।

১। (ক) **বল্লভপুর,** শ্রীরামপুর, হুগলী। (খ) রাধাবল্লভ—আদি, পরিত্যক্ত। (ঘ) অতিবৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৫০ ফুট), দৈর্ঘ্য আনু ৩০ ও প্রস্থ ২২ ফুট (আনু.)। দক্ষিণমুখী, ত্রিখিলান প্রবেশপথের পরে ঢাকা বারান্দা, এরপর গর্ভগৃহের ঘনদ্বারের খিলান, তুলনায় বৃহৎ গর্ভগৃহের মাঝে দাঁড়িয়ে উপরে তাকালে ঘণ্টার তলদেশের মত সুউচ্চ গম্বুজ (মুসলমি রীতি), এটিই নীচের অতি বৃহৎ চারচালার ছাদ, গর্ভগৃহের দেওয়ালে কটি কুলুঙ্গী, পূবে (গঙ্গার দিকে), পশ্চিমে ও উত্তরে অতিরিক্ত দুটি করে তুলনায় ছোট প্রবেশ পথ—পিছনের খিড়কী ছাড়া সবই পত্রাকৃতি খিলান। গর্ভগৃহের পশ্চিমের অতি ভারী (চওড়ায় অন্তত তিন ফুট) দেওয়াল মাঝ থেকে নিশ্চিহ্ন হলেও দুপাশের ও গর্ভগৃহের অতি উচ্চ দেওয়ালে ভর দিয়ে নীচের বিশাল চারচালার বক্রচাল ছাদ আজও ঝুলে আছে। সব মিলিয়ে অতি ভারী নির্মাণ, আদি ধারার ছাপ স্পষ্ট। আটচালার সুসমঞ্জস রূপটি এখনও অধরা, চেষ্টাটি আছে। উপরের চারচালাটি সম্পূর্ণ বৃক্ষাচ্ছাদিত—তথাপি বোঝা যায় যে ওটি অনেকটাই আড়ষ্ট আদি প্রকৃতির বা আদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরের। একদা টেরাকোটা অলংকরণ থাকলেও এখন সম্পূর্ণ লুপ্ত। —মন্দিরের পূব পাশ থেকে গঙ্গার জলস্রোতের দূরত্ব বড়জোর ১৫ ফুট; পশ্চিম পাশে পরপর শ্রীরামপুর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের পুকুরগুলি—এর উত্তরে গঙ্গাতীরে ঐতিহাসিক শ্রীরামপুর কলেজের সর্পক্লিষ্ট জীর্ণাবশেষ। (ঙ) ষোড়শ শতকের প্রথম অর্ধ [দ্র: প্রতিবেদন-শেষের প্রাসঙ্গিকী (ii)] (চ) শিয়ালদহ 'মেইন' লাইনের টিটাগড় অথবা বারাকপুর স্টেশন থেকে রিক্সায় গঙ্গোত্রীপাড়া খেয়াঘাট (কেষ্টমুখার্জীর ঘাট নামে পরিচিত—রাসমণি ঘাটের পাশে) গঙ্গা পেরিয়ে, অতি সহজে। আবার হাওড়া শ্রীরামপুর বাসে, বল্লভপুর স্টপ থেকে হাঁটা/রিক্সা। **প্রাসঙ্গিকী** : (i) কোনো এক কারণে মন্দিরটি পরিত্যক্ত হলে বিগ্রহ অদূরে নতুন মন্দির নিয়ে যাওয়া হয়—নতুন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৬৪। এরপরে পাদ্রী ডেভিড ব্রাউন এটি কেনেন। ১৮০৬ থেকে কিছুকাল মিশনারী হেনরী মার্টিন এটি খ্রীষ্টিয় ভজনালয়-রূপে ব্যবহার করেন ও এটি 'হেনরী

মার্টিনের প্যাগোডা' নামে পরিচিত হয়। কিন্তু 'শ্রীরামপুর গির্জা' নির্মিত হলে মন্দিরটি আবার পরিত্যক্ত হয়। এক সময় মন্দিরটিকে মদ চোলাই করার কারখানা হিসেবেও ব্যবহার করা হয় ও সেই মদ 'প্যাগোডা রাম' নামে পরিচিত ছিল। (ii) ১৮৯৬-এ প্রকাশিত 'List of Ancient Monuments of Bengal'-এ বলা হয়েছে : "Radhavallabha must be more than 350 years old."[১]। হুগলী ডিস্ট্রিক্ট্ সেনসাস হ্যান্ডবুক' (১৯৬১)-এ মন্দিরটি সম্পর্কে বলা হয়েছে : "The temple may have been built as early as the 16th century, which would make it one of the earliest, if not the earliest hut style temple still standing in Bengal"[২]—এখন, মন্দিরটি ১৮৯৬-এ ৩৫০ বছরের বেশি পুরাতন হলে হয় ১৫৪৬-এর আগেকার, সেক্ষেত্রে এটির পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বেশি পুরাতন চালা-শৈলীর মন্দিরগুলির একটি হতে বাধা নেই। আবার, ১৫৭৫ নাগাদ প্রতিষ্ঠিত উড়িষ্যার হরিপুরগড়ের 'রসিক রায় মন্দির' আদি রাধাবল্লভ মন্দিরের তুলনায় অনেক পরিণত স্থাপত্য—পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেখানে প্রায় শেষ। আদি রাধাবল্লভ মন্দিরটিকেই আমাদের প্রাচীনতর মনে হয়েছে।

২। (ক) **হরিপুরগড়,** বারিপদা, ময়ূরভঞ্জ, উড়িষ্যা। (খ) রসিকরায়। (গ) ময়ূরভঞ্জের রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ। (ঘ) অতি বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৫০ ফুট)। দৈর্ঘ্য আনু. ৩০ ও প্রস্থ আনু. ২৮ ফুট। নীচের চারচালাটি অতি ভারী ও উপরের চারচালার তুলনায় অতি বিপুল। ত্রিখিলান। নির্মাণ আদি রাধাবল্লভের তুলনায় অনেক পরিমাজিত। ঈষৎ টেরাকোটা অবশিষ্ট। ম্যাকাচিয়ন তাৎপর্যপূর্ণভাবে হরিপুরগড়ের এই মন্দিরটি সম্পর্কে বলেছেন : "this is already the fully developed, fully decorated *at chala* type"[৩]—স্থাপত্যটির এমন 'পূর্ণ বিকশিত ও পূর্ণ সজ্জিত' হওয়ার আগে বল্লভপুরে মতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা জরুরী ছিল। লক্ষণীয়ভাবে উড়িষ্যায় এটিকে 'গৌড়ীয় রীতি'-র বলা হয়। (ঙ) ১৫৭৫ (ক্ষেত্রে একই প্রতিষ্ঠাতার জগন্নাথ মন্দিরের লিপি)। (চ) হাওড়া থেকে পুরী/ভুবনেশ্বর প্রভৃতি ট্রেনে বালেশ্বরে গিয়ে বাসে বারিপদা, এবার রিজার্ভ অটো বা গাড়িতে নদী-সেতু পেরিয়ে ১৬ কিমি। মাঠের মত ক্ষেত্রের কোণে পরিত্যক্ত জগন্নাথ আর মাঝে রসিকরায়।

৩। (ক) **গোস্বামী-মালিপাড়া,** দাদপুর, হুগলী। (খ) মদন-গোপাল। (গ) বিগ্রহ—ভগবান আচার্য ও মন্দির—শ্রীপাদ বল্লভ গোস্বামী। (ঘ) বৃহৎ, নিরলংকার। বৃহৎনাটমণ্ডপ। ঘেরা চত্বর। বহুল সংস্কৃত। (ঙ) ১৬/১৭ শতক। (চ) হাওড়া-ব্যাণ্ডেল লাইনের চুঁচুড়ার ঘড়িমোড় থেকে বাসে, সরাসরি বা সেনেটের বিশালাক্ষী মন্দিরের বিপরীত হতে ভ্যান-রিক্সায়/ বাস বদল করে। **প্রাসঙ্গিকী** : বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যভাগবতে' নীলচলে চৈতন্য-সমীপে সমাগত ভক্তদের যে তালিকা দিয়েছেন তার অন্যতম ভগবান আচার্য—"ভগবান আচার্য আইলা মহাশয়। /

১। 'হুগলী জেলার দেবদেউল' (অপর্ণা, ১৯৯১, পৃ. ৮৩)-এ সুধীরকুমার মিত্র কর্তৃক উদ্ধৃত।)
২। ঐ; পৃ. ৮৫।
৩। প্রাগুক্ত 'Late Mediaeval....', p. 5.

শ্রবণেও যাঁরে নাহি পরশে বিষয়।।"[৪]—চৈতন্যদেব নীলাচলে ছিলেন তাঁর জীবনের শেষ ১৮ বছর (আনু. ১৫১৫-৩৩)। বর্তমান মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় এর পরে কিন্তু ভগবান আচার্যের পৌত্র ভাগবতানন্দ গোস্বামী কর্তৃক এই গ্রামেই প্রতিষ্ঠিত রাধাকান্ত মন্দিরের আগে।

৪। (ক) **ঐ**। (খ) রাধাকান্ত। (গ) ভাগবতানন্দ গোস্বামী। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৩০/৩৫ ফুট)। নিরলংকার। বৃহৎ নাটমণ্ডপ পরে সংযোজিত। (ঙ) ১৭ শতকের শুরুতে। (চ) ঐ। অদূরে।

৫। (ক) **বাঘনাপাড়া,** কালনা, বর্ধমান। (i) (খ) কৃষ্ণ-বলরাম। (গ) শচীনন্দন গোস্বামী। (ঘ) বৃহৎ (আনু. উচ্চতা ৪০/৪৫ ফুট) ত্রিখিলান। রাজবাড়ি-সদৃশ নাটদালান ও ইওরোপীয় দুর্গবাড়ির মতন সুউচ্চ সিংদুয়ার পরে সংযোজিত। (ঙ) ১৬১৬। (ii) (খ) রেবতী-রাধারানী। (ঘ) অতি বৃহৎ। নিরলংকার ত্রিখিলান। (ঙ)? (চ) কালনা থেকে বাসে/ট্রেকারে বাঘনাপাড়া ঠাকুরবাড়ি মোড়—এখান থেকে নেতাজী সুভাষ পথ ধরে ছেলেদের ও মেয়েদের স্কুল পেরিয়ে। ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইনের বাঘনাপাড়া স্টেশন থেকেও ভ্যানরিক্সায় যাওয়া চলে।

৬। (ক) **দক্ষিণ বারাশত,** জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। (খ) আদ্যামহেশ। (গ) রায়চৌধুরী পরিবার। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা ৩৬/৩৭ ফুট)। নিরলংকার। দুপাশে একজোড়া করে কলাগাছের গোড়ার মত ভারী ও গোল স্তম্ভের উপরে স্থাপন করা সমতল ছাদের বারান্দা পরে সংযোজিত। (ঙ) ১৬০৯? (চ) শিয়ালদহ-দক্ষিণ থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালে দক্ষিণ বারাশত। রিক্সা। **প্রাসঙ্গিকী** : কৃষ্ণরামদাসের 'রায়মঙ্গলে' (আনু.১৬৮৬) আছে : "সঘনে দামামা ধ্বনি/শুনি রায় গুণমণি/বড়ু ক্ষেত্র বাহিল আনন্দে/ বারাশতে উপনীত হইয়া সাধু হরষিত/ পূজিত ঠাকুর সদানন্দে।"

৭। (ক) **আমতা,** হাওড়া। (খ) মেলাই চণ্ডী (গ) শ্রুতি অনুসারে কলকাতার হাটখোলার কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত—বর্তমান মন্দির। (ঘ) মাঝারি (উচ্চতা আনু. ২৫ ফুট)। সংস্কারে টেরাকোটা লুপ্ত। সামনের বারান্দা পরে যুক্ত। ঘেরা চত্বরের বাম কোণে দুর্গেশ্বর শিবের ছোট আটচালা। (ঙ) ১৬৪৯। (চ) হাওড়া থেকে বাসে আমতা। বাসস্ট্যাণ্ডের অদূরে বাজারের পিছনে। **প্রাসঙ্গিকী** : তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গলের 'দিগ্‌দেবতাবন্দনায় মুকুন্দরাম লিখেছেন : "পাড়াগ্রি নগরে বন্দোঁ খেপুতের খেপ্তাই/ প্রণতি করিঞা বন্দোঁ আমতার মেলাই"।। (প্রাগুক্ত, পৃ: ৫)

৮। (ক) **মেল্লক,** বাগনান, হাওড়া। (খ) মদনগোপাল। (গ) মুকুন্দপ্রসাদ রায়চৌধুরী। (ঘ) আংশিক ভগ্ন। বৃহৎ (উচ্চতা, আনু. ৪৫ফুট। ত্রিখিলান—টেরাকোটা। পূর্বদ্বারের উপরে ঝম্পসিংহ (উড়িষ্যার প্রভাব?) (ঙ) ১৬৫১। (চ) হাওড়া খড়গপুর শাখার দেউলটি থেকে ভ্যানরিক্সায়।

৯। (ক) **বালসি** (মজকুড়ি পাড়া), পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া। (খ) লক্ষ্মীনারায়ণ। (গ) মল্লরাজবংশের জামঁকুড়ি শাখা? (ঘ) পাথরে নির্মিত উপরের চারচালাটি অনুপাতে ছোট, নীচু ও চাপা। ম্যাকাচিয়ন একে বলেছেন 'বিষ্ণুপুর-রীতি' (প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৯)। ত্রিখিলান। উচ্চতা আনু. ৪০ ফুট। টেরাকোটা ও কাঠের কাজ। (ঙ) ১৬৫২। (চ) বর্ধমান (তিনকোণিয়া

৪। প্রাগুক্ত 'চৈতন্যভাগবত', শেষখণ্ড, পৃ. ৩০৮।

বাসস্ট্যাণ্ড) থেকে পাত্রসায়ের হয়ে বিষ্ণুপুরে যাচ্ছে এমন বাসে বালসি (স্থানীয় উচ্চারণে **বালসে**) মোড়। হাঁটাপথে।

১০। (ক) **হরিপাল** (রায়পাড়া), হুগলী। (খ) রাধাগোবিন্দ। (গ) রায় পরিবার। (ঘ) বৃহৎ। সামনে প্রশস্ত ঢাকা বারান্দা যোগ করায় দৃষ্ট হয় না। ত্রিখিলান। সংস্কারে টেরাকোটা হয়ত ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ঘেরা ক্ষেত্রে পাথরে নির্মিত 'রেখ' স্নানমন্দির ও পঞ্চরত্ন দোলমঞ্চ। (ঙ) ১৬৫৪। (চ) হাওড়া-তারকেশ্বর লাইনের হরিপাল স্টেশন থেকে রিক্সায়।

[১৬৫৪-তেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার **দোগাছিয়া** গ্রামের টেরাকোটা-সজ্জিত আটচালা গোপানাথ মন্দির—ম্যাকাচিয়ন, পৃ: ৩৩]

১১। (ক) **সিমলাপাল,** বাঁকুড়া। (খ) বলরাম। (গ) মহাপাত্র পরিবার। (ঘ) মাকড়াপাথরে নির্মিত, ত্রিখিলান, উচ্চতা আনু. ৩৫ ফুট, উপরের চারচালা অনুপাতে ছোট ও চাপা। চারফুটের মত উঁচু বেদীর উপরে—সামনে চার জোড়া স্তম্ভের উপরে বক্রচাল বারান্দা পরে যুক্ত। (ঙ) ১৬৬২। (চ) বাঁকুড়া বা খাতরা থেকে সরাসরি বাসে।

১২। (ক) **তেজপাল,** বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। (খ) রাধাকৃষ্ণ। (গ) মল্লরাজ বীরসিংহ। (ঘ) ফুট চারেক উঁচু অধিষ্ঠানের উপরে ৩০/৩২ ফুট উঁচু নিরলংকার পাথরের ত্রিখিলান আটচালা—উপরের চারচালাটি নীচু/চাপা (এর পর থেকে 'বিষ্ণুপুরী')। (ঙ) ১৬৭২। (চ) বিষ্ণুপুর শহর থেকে টানা রিক্সায় (বাসও আছে)।

১৩। (ক) **সাব্রাকোণ,** তালডাংরা, বাঁকুড়া। (খ) রামকৃষ্ণ। (গ) মল্লরাজ দ্বিতীয় বীরসিংহ। (ঘ) ঘেরা ক্ষেত্র। মাকড়া পাথরে নির্মিত। উচ্চতা আনু. ৩০ ফুট। বিষ্ণুপুর রীতি। বাইরের মাঠে রাসমঞ্চ। অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ। (ঙ) ১৬৭৭। (চ) বিষ্ণুপুর শহরের রসিকগঞ্জ বাসস্ট্যাণ্ড থেকে তালডাংরামুখী বাসের সাব্রাকোণ স্টপ থেকে ২ কি.মি. হাঁটা।

১৪। (ক) **পাথরবেড়িয়া,** গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) রামসীতা। (গ) সাধক বাগবীজ গোস্বামী (ঘ) পাথরের, ছোট। (ঙ) ১৭ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ। (চ) গড়বেতা থেকে বাসে হুমগড়। ভ্যান-রিক্সায়। (মেদিনীপুর শহর বা বিষ্ণুপুর থেকে বাসে গড়বেতা, এখান থেকে বাসে হুমগড়ে গিয়ে ভ্যানরিক্সায়)।

১৫। (ক) **বীরনগর** (উলা; মুস্তৌফিপাড়া), রাণাঘাট, নদীয়া। (খ) বিষ্ণু। (গ) কাশীশ্বর মিত্রমুস্তৌফি। (ঘ) ভগ্ন, লুপ্তপ্রায়—কটি টেরাকোটা পদ্ম। (ঙ) ১৬৭৯। (চ) শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর লাইনের বীরনগর স্টেশন থেকে রিক্সায়।

১৬। (ক) **বোড়াগড়ি,** পাণ্ডুয়া, হুগলী। (খ) গোপাল। (গ) সিংহরায় পরিবার। (ঘ) বৃহৎ। ত্রিখিলান। টেরাকোটা। (ঙ) ১৬৭৯। (চ) বর্ধমান মেইন লাইনের বৈঁচি স্টেশন থেকে রিক্সায়—বৈঁচি থেকে বর্ধমানমুখী বাসে গেলে মাত্র তিন কি.মি. দূরের বেলতলা স্টপ থেকে হেঁটে।

১৭। (ক) **মহিষামুড়ি,** আমতা, হাওড়া। (খ) ভুবনেশ্বরী (দুর্গা)। (গ) ঘোষ পরিবার। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা ৩৫ ফুট)। টেরাকোটা। ত্রিখিলান। (ঙ) ১৬৭৯। (চ) বাগনান থেকে বাসে মহিষামুড়ি-ঘাট—এখান থেকে দামোদর পেরিয়ে অল্প হাঁটা।

১৮। (ক) **খরিয়প** (স্থানীয় উচ্চারণে খরোপ), আমতা, হাওড়া। (খ) খড়োশ্বর শিব। (গ) হরিদাস কর্মকার। (ঘ) উচ্চ অধিষ্ঠানের উপর। মাধারি (উচ্চতা ২৫/২৬ ফুট। দু-একটি টেরাকোটা পদ্ম। (ঙ) ১৬৮১। (চ) হাওড়া-ঝিখিরা/জয়পুর বাসপথের ধারে। আমতা থেকেও বাস/রিক্সা।

১৯। (ক) **জয়পুর** (সাঁতরাপাড়া), আমতা, হাওড়া। (খ) ধর্ম (মতিলাল), (ঘ) আনু. ৩০ ফুটের মতন উঁচু। টেরাকোটা-মণ্ডিত ছিল—বর্তমানে একরকম লুপ্ত। (ঙ) ১৬৮৪। (চ) হাওড়া বা আমতা থেকে জয়পুর বা ঝিখিরার বাসে—ফকিরদাস বিদ্যালয়ের নিকট হতে রিক্সায়।

২০। (ক) **খালনা** (বারুইপাড়া), আমতা, হাওড়া। (খ) কৃষ্ণরায়। (গ) রায়-পরিবার। (ঘ) মাঝারি, নিরলংকার। (ঙ) ১৬৮৫। (চ) হাওড়া-খড়গপুর শাখার বাগনান স্টেশন থেকে বাসে।

২১। (ক) **গড়বেতা**, ব্রাহ্মণপাড়া, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) রাধাবল্লভ। (গ) মল্লরাজ দুর্জন সিংহ। (ঘ) ২৩/২৪ উঁচু, পাথরে নির্মিত, নিরলংকার। 'বিষ্ণুপুরী'। (ঙ) ১৬৮৬। (চ) বিষ্ণুপুর বা মেদিনীপুর শহর থেকে বাসে গড়বেতা। রিক্সা।

২২। (ক) **ঝিখিরা** (মাঝপাড়া), আমতা, হাওড়া। (খ) শ্যামসুন্দর। (গ) মল্লিক পরিবার। (ঘ) বৃহৎ, ৩০/৩৫ ফুট। টেরাকোটা, ত্রিখিলান। (ঙ) ১৬৯১। (চ) হাওড়া থেকে সরাসরি বাসে।

২৩। (ক) **কল্যাণচক**, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া। (খ) রামেশ্বর শিব। (গ) দুর্গাচরণ দ্বারী। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা ৩৫ ফুট)। সামান্য টেরাকোটা। (ঙ) ১৬৯২। (চ) হাওড়া থেকে বাসে মুনশীরহাট হয়ে নারিকেলবেড়িয়া। অল্প হাঁটা।

২৪। (ক) **মূলগ্রাম**, মন্তেশ্বর, বর্ধমান। (খ) লক্ষ্মীনারায়ণ। (ঘ) মাঝারি, ত্রিখিলান, টেরাকোটা। (ঙ) ১৬৯২। (চ) বর্ধমান মেইন লাইনের মেমারী স্টেশন থেকে বাসে মন্তেশ্বব। ভ্যানরিক্সা।

২৫। (ক) **বরুইপুর** (মাজীপাড়া), উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া। (খ) রঘুনাথ শিব। (গ) মাজী পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উঁচু, কিছু উৎকৃষ্ট টেরাকোটা অবশিষ্ট। (ঙ) ১৬৯৪। (চ) হাওড়া থেকে ভায়া মুনশীরহাট বাসে খিলাহাটে গিয়ে অল্প হাঁটা।

২৬। (ক) **কোতলপুর**, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী, (খ) রাজরাজেশ্বর শিব, (গ) বাকুলি পরিবার, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত। (ঘ) ৩০/৩৫ ফুট উচ্চ, ত্রিখিলান, মনোহর টেরাকোটা। (ঙ) ১৬৯৪। (চ) তারকেশ্বর লাইনের হরিপাল থেকে বড়গাছিয়াগামী বাসে সীতাপুর হাট—এখান থেকে হাঁটা। (হরিপাল থেকে বাসে/ট্রেকারে জাঙ্গীপাড়া গিয়েও গাড়ী বদল করে একই পথে)।

২৭। (ক) **চেলিয়ামা**। (খ) রাধাবিনোদ। (ঘ) ত্রিখিলান। ৩০/৩৫ ফুট উচ্চতা, অত্যন্ত সমৃদ্ধ টেরাকোটা। (ঙ) ১৬৯৭। (চ) পুরুলিয়া থেকে সাঁওতালডি বাসে সরাসরি বা বরাকর রোডের ঝাপড়া মোড় পর্যন্ত বাসে এসে, ট্রেকারে। বিখ্যাত পাড়া অতিক্রম করে স্ট্যাণ্ড থেকে হেঁটে।

২৮। (ক) **হাটগোবিন্দপুর**, বর্ধমান। (খ) শ্রীধর। (ঘ) মাঝারি, ত্রিখিলান, টেরাকোটা। (ঙ) ১৭ শতক। (চ) বর্ধমান (তিনকোণিয়া) থেকে কালনা প্রভৃতি বাসে হাটগোবিন্দপুর স্টপ থেকে হাঁটা।

২৯। (ক) **বৈতল** (উত্তরবাড়), জয়পুর, বাঁকুড়া। (খ) দামোদর। (গ) মল্লরাজবংশ। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতার পাথরের আটচালা। 'বিষ্ণুপুরী', ত্রিখিলান। (ঙ) ১৭ শতক। (চ) বিষ্ণুপুর থেকে বাসে বাঁকাদহ বৈতল মোড়ে গিয়ে বাস পাল্টিয়ে বা জয়রামবাটি থেকে ছোট বাসে বা তারকেশ্বর-খাতরা বাসে বৈতলের পাতরপুকুর মোড়ে নেমে। উত্তবাড়ের ঝগড়াই চণ্ডীর বিখ্যাত দেউলের সামান্য আগে, রাস্তা ঘেষে।

৩০। (ক) **ঐ** (দক্ষিণবাড়, পণ্ডিতপাড়া)। (খ) ধর্ম (বাঁকুড়া রায়)। (গ) মল্লরাজবংশ?। (ঘ) পাথরের, মাঝারি ত্রিখিলান। (ঙ) ১৭ শতক। (চ) ঐ—পাতরপুকুর মোড় থেকে বিপরীত পথে, গঙ্গাধর শিবের দেউল ছেড়ে, বাঁয়ে।

৩১। (ক) **জৌগ্রাম**, জামালপুর, বর্ধমান। (খ) রাধাকান্ত। (ঘ) বৃহৎ, ত্রিখিলান, টেরাকোটা। (ঙ) ১৭ শতক। (চ) বর্ধমান কর্ড লাইনের জৌগ্রাম থেকে রিক্সা।

৩২। (ক) **ঝিখিরা,** (কেরাণীবাটি), আমতা, হাওড়া। (খ) মনসা। (ঘ) বৃহৎ, ত্রিখিলান। (ঙ) ১৭ শতক। (চ) হাওড়া থেকে সরাসরি বাসে।

৩৩। (ক) **গাঙপুর,** সাঁতুরি, পুরুলিয়া। (খ) রঘুনাথ—পরিত্যক্ত মন্দির। (ঘ) মাঝারি। বরাকরের বেলেপাথরে নির্মিত। 'বিষ্ণুপুরী', উপরের চারচালা শুধু চাপা ও ছোটই নয়, কোণগুলি এমনভাবে নীচের বৃহত্তর চারচালার কোণগুলির সাথে পূর্ণ জ্যামিতিকভাবে মেলানো যে হঠাৎ দেখলে চারচালা বলে ভ্রম হয়। বলা হয়েছে যে এখানে একসময় একটি ইটের রাসমঞ্চও ছিল এবং রঘুনাথ বিগ্রহ বর্ধমান জেলার কুলটি থানার ছোলবালপুরে স্থানান্তরিত।[১] (ঙ) ১৭ শতক। (চ) পুরুলিয়া থেকে ট্রেনে মুরাড়ি স্টেশন, এখান থেকে নিজব্যবস্থায় (অনতিদূরে)।

৩৪। (ক) **কলাগাছিয়া (পাটদহ)**, ডায়মণ্ড-হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। (খ) পাটেশ্বরী। (গ) প্রতিষ্ঠাতা কর পরিবার (পরে রায়চৌধুরী পরিবারে হস্তান্তরিত)। (ঘ) মাঝারি, ত্রিখিলান. বহুল সংস্কারে টেরাকোটা লুপ্ত। (ঙ) ১৭ শতক? (চ) শিয়ালদহ দক্ষিণ থেকে ট্রেনে ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে ফলতার বাসে, সহজে বাসস্ট্যান্ডেই।

৩৫। (ক) **পলাশী,** ধনিয়াখালি, হুগলী। (খ) পতিদুর্গা (শিবদুর্গা)। (গ) মাঝারি, নিরলংকার। (ঙ) ১৭ শতক? (চ) বর্ধমান কর্ড লাইনের হাজিপুর থেকে ভ্যানরিক্সা।

৩৬। (ক) **সাতগাছিয়া,** কালনা, বর্ধমান। (খ) সিংহবাহিনী। (ঘ) মাঝারি, ত্রিখিলান, টেরাকোটা। (ঙ) ১৭ শতক। (চ) বর্ধমান-কালনা বাসে।

৩৭। (ক) **সিউড়ি** (সোনাতোড়পাড়া), বীরভূম। (খ) রাধা-দামোদর; ঘুনসার মন্দির নামে পরিচিত। (গ) ঘনশ্যাম দাস। (ঘ) ঝামাপাথরের অধিষ্ঠানের উপরে ইটের আটচালা। বৃহৎ (উচ্চতা ৩৫ ফুটের মত)। ত্রিখিলান। 'বিষ্ণুপুরী', সমগ্র সম্মুখগাত্র ফুলপাথরের অলংকরণের সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। (ঙ) ১৭/১৮ শতক। (চ) বোলপুর থেকে বাসে সিউড়ি—বাসস্ট্যাণ্ডের বিপরীতের পাকা রাস্তা পেরিয়ে মাদ্রাসা-গলি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড— ডানে সামান্য এগিয়ে।

১। Puruliya District Gazetteer, p. 437

৩৮। (ক) **বড়াশী** (অম্বুলিঙ্গ—এখানে বদরিকানাথ শিবলিঙ্গ জলমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এখন আদিগঙ্গা মজে যাওয়ায় হয় না।), মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। (খ) বদরিকানাথ। (ঘ) মাঝারি (উচ্চতা আনু. ২৫ ফুট), গর্ভগৃহের চারদিকে টিনের একচালা প্রদক্ষিণ পরে যুক্ত। সামনে সমতল ছাদের আধুনিক নাটদালানে সিমেন্টের নানা মূর্তি। অতি বহুল সংস্কৃত। পুনর্নির্মিত। (ঙ) ১৭/১৮ শতক— বর্তমান মন্দির। (চ) শিয়ালদহ দক্ষিণ থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর / কাকদ্বীপ লোকালে মথুরাপুর—এখান থেকে কাশীনগরগামী অটো-য় 'শ্রীমতীর মোড়'—এবার গ্রামে সামান্য ঢুকে।

প্রাসঙ্গিকী

(i) ছত্রভোগ, ত্রিপুরাসুন্দরী ও তাঁর ভৈরব অম্বুলিঙ্গ বদরিকানাথ শিব কত প্রাচীন তা বলা যায় না। আচার্য বিনয় ঘোষ লিখেছেন : "মনসার ভাসান, চণ্ডীর গান, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, রায়মঙ্গল প্রভৃতি পুঁথি ও গ্রন্থাদি থেকে জানা যায় যে, আজ থেকে চার-পাঁচশো বছর আগেও আদিগঙ্গার এই পথে নিম্নবঙ্গের অন্যতম শক্তিপীঠ ছত্রভোগে বাঙালী সদাগর ও তীর্থযাত্রীরা অবতরণ করে ত্রিপুরা-সুন্দরী দেবী ও ভৈরব অম্বুলিঙ্গ শিব দর্শন করে, চক্রতীর্থে স্নান করে, সমুদ্রের বুকে নৌকা ভাসিয়ে বাণিজ্যযাত্রা করতেন।"[২] আমরা দৃষ্টান্তরূপে কয়েকটি সূত্র উল্লেখ করতে পারি :

বৌদ্ধ 'ডাকার্ণব' গ্রন্থে ছত্রভোগ, ত্রিপুরাসুন্দরী. অম্বুলিঙ্গ ঘাট প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে গঠিত 'খড়িমণ্ডল'-কে শক্তিপীঠ বলা হয়েছে।

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে' বলা হয়েছে যে, নীলাচলের পথে আটিসারায় অনন্ত-পণ্ডিতের ঘরে রাতভোর 'কৃষ্ণ-কথা-কীর্তন' করে চৈতন্যদেব:

"শুভদৃষ্টি অনন্ত-পণ্ডিত প্রতি করি।
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি 'হরি হরি'।।
এইমত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগ মহাকুতূহলে।।
সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হই শতমুখী।
বহিতে আছেন সর্বলোকে করি সুখী।।
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।
'অম্বুলিঙ্গঘাট' করি বোলে সর্বজনে।।"[৩]

কৃষ্ণদাস কবিরাজের মহাগ্রন্থ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' আছে:

"গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু চারিজন সাথে। নীলাদ্রি চলিল প্রভু ছত্রভোগ পথে।।
চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রি গমন। বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।।"[৪]

২। 'প. বঙ্গের সংস্কৃতি— ৩, পৃ: ২৫৭।

৩। প্রাগুক্ত 'দে'জ' ১৯৯৫ সংস্করণ, পৃ. ২৮।

৪। অক্ষয়কুমার কয়াল-সম্পাদিত 'ভারবি' ১৯৯৮ সংস্করণ, পৃ: ১৩০। 'চারিজন' হলেন : নিত্যানন্দ গোসাঁই, পণ্ডিত জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত ও মুকুন্দ দত্ত।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গলে' ধনপতি ও শ্রীমন্ত উভয়েই ছত্রভোগ হয়ে সিংহলযাত্রা করেন :

"অতি বেগ ডিঙ্গা হয়্যা গেল জড়।
বামভাগে ছত্রভোগ রহে হাত্যাগড়।।"[৫]

স্মরণীয় যে 'হাত্যাগড়' হল জটার দেউলের অনতিদূরবর্তী হাতিয়াগড়, যেখানে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ছিল বলে শোনা যায়। ধনপতি ও শ্রীমন্ত এই 'হতো-ঘরে' থেকে অম্বুলিঙ্গ শিব ও নীলমাধবের পূজা করেন।

এছাড়া 'মনসামঙ্গলের' বিভিন্ন সংস্করণে বলা আছে যে চাঁদ-সদাগরও ছত্রভোগ ও অম্বুলিঙ্গঘাটে তীর্থদর্শন করে সমুদ্রযাত্রা করেন।

(ii) সাহিত্যের তথ্যকে সমর্থন করে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম থেকে পাওয়া প্রাচীন (প্রাকমুসলিম) প্রস্তর-মূর্তি গুলি যার মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তিও আছে। এমন দৃষ্টান্ত মিলেছে ছত্রভোগ, বোড়াল, মণিরতট, আটঘরা, মন্দিরতলা, ঘাটেশ্বর, রায়দিঘি, খাড়ি, কাশীনগর প্রভৃতি অনেকগ্রাম থেকে। এ অঞ্চলের প্রাচীন দিঘিগুলি ও সুন্দরবনের জায়গায় জায়গায় পড়ে থাকা ইটের পাঁজা ও নির্মাণের চিহ্নগুলিও বড় প্রমাণ।

৩৯। (ক) **রাউতাড়া** (ঘোষপাড়া), আমতা, হাওড়া। (খ) সীতারাম। (গ) ঘোষ পরিবার। কারিগর গোপাল কর্মি (কর্মকার?)। (ঘ) বৃহৎ। ত্রিখিলান। উৎকৃষ্ট টেরাকোটা-সজ্জা। (ঙ) ১৭০০। (চ) হাওড়া থেকে সরাসরি বাসে ঝিখিরা। ভ্যান-রিক্সা/হাঁটা।

৪০। (ক) **বাখরপুর** (আধকাটা), পরশুড়া, হুগলী। (খ) পরিত্যক্ত মন্দির। (গ) ভট্টাচার্য পরিবার। (ঘ) বৃহৎ। ত্রিখিলান। মনোহর টেরাকোটা। (ঙ) ১৮ শতকের শুরুতে। (চ) তারকেশ্বর থেকে অমরপুরগামী বাসে/ট্রেকারে গিয়ে ভাঙামোড়া স্কুল স্টপেজ থেকে বাঁধরাস্তা হতে নামলে পাশাপাশি দুই গ্রাম—ভাঙামোড়া ও বাখরপুর।*

৪১। (ক) **ধসা,** জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) গোপীনাথ। (গ) চৌধুরী পরিবার। (ঘ) মাঝারি (আনু. ২৫/৩০ ফুট উচ্চতা)। ত্রিখিলান। চারচালা জগমোহন। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭০৮। (চ) হাওড়া থেকে বাসে মুনসীরহাট। ভ্যান-রিক্সা। পরের স্টপ থেকে হেঁটেও যাওয়া যায়।

৪২। (ক) **মালঞ্চ,** খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) দক্ষিণাকালী। (গ) গোবিন্দরাম রায়। (ঘ) অতিবৃহৎ (উচ্চতা ৪৫/৫০ ফুট)। ত্রিখিলান। উৎকৃষ্ট টেরাকোটা। (ঙ) ১৭১২। (চ) খড়গপুর স্টেশন থেকে ছোট বাসে। সরাসরি।

৪৩। (ক) **বৈঁচিগ্রাম,** পাণ্ডুয়া, হুগলী। (খ) কর পরিবার। (গ) ছোট। টেরাকোটা। (ঘ) বর্ধমান মেইন লাইনের বৈঁচিগ্রাম স্টেশন থেকে হেঁটে/ভ্যানরিক্সায়।

৪৪। (ক) **চৈতন্যবাটি** (বাগনান), ধনিয়াখালি, হুগলী। (খ) শিব। (ঘ) বিশ্বাস পরিবার। (ঙ) ছোট। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭১৮। (চ) বর্ধমান কর্ড লাইনেব বেলমুড়ি থেকে রিক্সা।

৫। প্রাগুক্ত সংস্করণ, পৃ: ১৯৭।

* আসামের জয়সাগরে ১৮ শতকের শুরুতে প্রতিষ্ঠিত 'ঘনশ্যামের ঘর' নামে একটি ত্রিখিলান ও খাঁটি আটচালা মন্দির আছে।

৪৫। (ক) **রাজবলহাট** (শীলপাড়া), জাঙ্গীপাড়া, হুগলী। (খ) দামোদর। (গ) শীল পরিবার। (ঘ) মাঝারি। উৎকৃষ্ট টেরাকোটা। (ঙ) ১৭২৪। (চ) তারকেশ্বর লাইনের হরিপাল স্টেশন থেকে উদয়নারায়ণপুরগামী বাসে। 'মায়ের মন্দিরে'র আগের স্টপেজ।—বৃহৎ গ্রাম রাজবলহাটের বিভিন্ন পাড়ায় ছড়িয়ে থাকা মন্দিরগুলি দেখতে স্থানীয় ভ্যানরিক্সা নেওয়া সুবিধাজনক। (হাওড়া থেকে সরাসরি বাসেও এখানে আসা যায়।).

৪৬। (ক) **সাহাগঞ্জ (খামারপাড়া)**, চুঁচুড়া, হুগলী। (খ) পরিত্যক্ত। (গ) পদ্মমণি নামক একজন মহিলা। (ঘ) ছোট। রাস্তা উঁচু করায় নিচের কিছু অংশ ঢাকা পড়েছে। মনোহর টেরাকোটা-সজ্জিত। (ঙ) ১৭২৫। (চ) চুঁচুড়া-বাঁশবেড়িয়া বাসপথের ধারে—সাহাগঞ্জ খেয়াঘাটের অদূরে, নবনির্মিত মদনমোহন মন্দিরের লাগোয়া।

৪৭। (ক) **শান্তিপুর** (শ্যামচাঁদপাড়া), নদীয়া। (খ) শ্যামচাঁদ। (গ) রামগোপাল খাঁচৌধুরী। (ঘ) অতিবৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৭০ ফুট)। পাঁচখিলান। সমগ্র সম্মুখভাগ (দৈর্ঘ্য ৫২ ফুট) টেরাকোটা মণ্ডিত। সামনে বৃহৎ নাটমণ্ডপ ও তার ডানে শিবের চারচালা ধাঁচের মন্দির বহু পরে যুক্ত। মন্দিরের ডানে দ্বিতল গৃহটি সম্ভবত শ্যামচাঁদের স্নানঘর। (ঙ) ১৭২৬। (চ) শিয়ালদহ থেকে শান্তিপুর লোকাল। রিক্সা। (কৃষ্ণনগর থেকেও বাসে, সহজে।)
প্রাসঙ্গিকী : (i) চৈতন্যপার্ষদ অদ্বৈত আচার্যের জন্ম (১৪৩৪) স্থান হওয়ায় শান্তিপুর বৈষ্ণবতীর্থ। চৈতন্যদেব বলেছিলেন যে অদ্বৈতের কারণেই তিনি আবির্ভূত হন—"অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।/ সেই প্রভু কহিয়াছেন বার বার।"[১] একারণেই বৃন্দাবনদাস অদ্বৈত আচার্যকে বলেছেন 'শান্তিপুররায়' ও 'শান্তিপুরনাথ'[২]। এছাড়া বিশিষ্ট সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আবির্ভাব-স্থলও শান্তিপুর। অন্যদিকে, তান্ত্রিকাচার্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের একজন বংশধর শান্তিপুরে দক্ষিণাকালী (আগমেশ্বরী) পূজা প্রচলন করেন। পটেশ্বরী (পটে আঁকা কালী) শান্তিপুরের অন্যতম প্রধান দেবী—লক্ষণীয় পটেশ্বরী পূজা হয় রাসপূর্ণিমাতে এবং নিরঞ্জনের জন্য পটেশ্বরী বেব না হলে রাসমেলা মেলা শেষ হয় না। এইভাবে শান্তিপুরে একদিকে যেমন আছে নানা বিখ্যাত গোস্বামী বাড়ি (অদ্বৈত আচার্যের বংশের বিভিন্ন শাখা : বড় গোস্বামী, মধ্যম গোস্বামী, পাগলা গোস্বামী; উড়িয়া গোস্বামী ও নানা বিগ্রহবাড়ি) অন্যদিকে তেমনই আছে ঘাটচাঁদুনি, শ্যামচাঁদুনি, মহিষখাগী, বিলেশ্বরী, সিদ্ধেশ্বরী প্রভৃতি লৌকিক কালীবাড়ি। এছাড়া শান্তিপুরেরই সূত্রাগড়ে প্রধান উৎসব জগদ্ধাত্রী পূজা এবং তা হয় রাসের সামান্য আগে। (ii) নবদ্বীপের মত না হলেও শান্তিপুরের পণ্ডিত সমাজও একসময় যথেষ্ট প্রসিদ্ধ ছিল। (iii) শ্যামচাঁদের এই অতিবিশাল মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রামগোপাল খাঁচৌধুরী ছিলেন বিপুল বিত্তশালী তাঁতবস্ত্র ব্যবসায়ী। মন্দিরটি নির্মাণে সে যুগেই দুই লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল বলে বলা হয়।[৩] অষ্টাদশ শতকের প্রথম অর্ধে শান্তিপুরের তাঁত ও তাতবস্ত্র ব্যবসা কিরকম সমৃদ্ধ ছিল মন্দিরটি তা সাক্ষী। শান্তিপুর-ফুলিয়ার তাঁতবস্ত্র বাণিজ্য এখনও টিকে আছে।

১। বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত' (আদি খণ্ড), প্রাগুক্ত সংস্করণ, পৃ. ১৩।

২। ঐ, (মধ্য খণ্ড), পৃ. ২২০।

৩। মোহিত রায়, 'নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি', পূর্ত বিভাগ। প.ব. সরকার, ১৯৭৫, পৃ. ৯০।

৪৮। (ক) **মাজুক্ষেত্র** (ধলেপাড়া), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) বুড়ো শিব। (গ) ধলে পরিবার। (ঘ) মাঝারি। সামান্য টেরাকোটা। (ঙ) ১৭২৬। (চ) হাওড়া থেকে বাসে ভাণ্ডারগাছা। ভ্যানরিক্সা। (হাওড়া-মাজু বাসও আছে)।

৪৯। (ক) **ইলছোবা,** পাণ্ডুয়া, হুগলী। (খ) শিব। (গ) ঘোষ পরিবার। (ঘ) মাঝারি—ঈষৎ টেরাকোটা। (ঙ) ১৭২৬। (চ) বর্ধমান মেইন লাইনের খন্যান বা পাণ্ডুয়া। ভ্যানরিক্সা।

৫০। (ক) **রায়না,** বর্ধমান। (খ) শ্রীধর। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা-সজ্জিত। (ঙ) ১৭২৬। (চ) বর্ধমান (তিনকোণিয়া) থেকে সরাসরি বাসে।

৫১। (ক) **বৈঁচিগ্রাম,** পাণ্ডুয়া, হুগলী। (খ) শিব। (গ) কর পরিবার। (ঘ) ছোট। সামান্য টেরাকোটা। (ঙ) ১৭২৭। (চ) ক্রম ৪৩ দেখুন।

৫২। (ক) **দ্বারহাট্টা,** হরিপাল, হুগলী। (খ) রাজরাজেশ্বর। (গ) অপূর্বমোহন সিংহরায়। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চটা অনু. ৩৫ ফুট)। ত্রিখিলান। অপূর্ব টেরাকোটা। (ঙ) ১৭২৮। (চ) তারকেশ্বর লাইনের হরিপাল থেকে উদয়নারায়ণপুর বা জাঙ্গীপাড়াগামী বাসের দ্বারাহাট্টা স্টপেজ থেকে রিক্সা।

৫৩। (ক) **অমরাগড়ি,** আমতা, হাওড়া। (খ) গজলক্ষ্মী। (গ) রায় পবিবার। (ঘ) মাঝারি ত্রিখিলান টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। (ঙ) ১৭২৯। (চ) হাওড়া-ঝিখিরা বাসে। অমরাগড়ি পাঠাগারের সামনে নেমে বিপরীত দিক দিয়ে ঢোকা পথে হেঁটে, মাদারডাঙা বারোয়ারী পূজা-মণ্ডপের পরে ডানে পুকুরপাড় ধরে ঘুরে।*

৫৪। (ক) **সিঙ্গুর,** হুগলী। (খ) বিশালাক্ষী। (ঘ) মাঝারি। ত্রিখিলান ও নিরলংকার। (ঙ) ১৭৩১। (চ) তারকেশ্বর লাইনের সিঙ্গুর স্টেশন থেকে জলঘাটা ও সাতমন্দিরতলা সহ চুক্তির রিক্সায়।

৫৫। (ক) **দেউলপাড়া,** পুরশুড়া, হুগলী। (খ) শিব। (গ) দেবনাথ পরিবার। (ঘ) মাঝারি। ত্রিখিলান টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৩২। (চ) তারকেশ্বর-অমরপুর বাস/ট্রেকারে দেউলপাড়া বুদ্ধমন্দির স্টপেজ।

৫৬। (ক) **কাঁকড়াকুলি,** ধনিয়াখালি, হুগলী। (খ) লক্ষ্মী-জনার্দন। (গ) চন্দ্রশেখর কর। (ঙ) ১৭৩৩। (চ) তারকেশ্বর-ধনিয়াখালি বাসপথের ধনিয়াখালি সিনেতলা স্টপেজ। রিক্সা/ভ্যানরিক্সা (৩½ কি.মি.)।

৫৭। (ক) **রাজবলহাট,** জাঙ্গীপাড়া, হুগলী। (খ) রাধাকান্ত। (গ) ঘটক পরিবার। (ঘ) মাঝারি। ত্রিখিলান। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৩৩। (চ) ক্রম ৪৫।

৫৮। (ক) **ঐ।** (খ) সীতারাম। (গ) চক্রবর্তী পরিবার। (ঘ) ঐ। (ঙ) ১৭৩৩। (চ) ক্রম ৪৫।

৫৯। (ক) **হাটবসন্তপুর,** আরামবাগ, হুগলী। (খ) জয়চণ্ডী। (গ) চীনা পরিবার। (ঘ) বৃহৎ (আনু. উচ্চতা ৩৫ ফুট)। ত্রিখিলান। টেরাকোটা। (ঘ) ১৭৩৪। (ঙ) তারকেশ্বর-আরামবাগ বা আরামবাগ-গড়ের হাট বাসপথের বলরামপুর স্টপেজে নেমে হাঁটা (১½ কি.মি.)।

৬০। (ক) **ধসা,** আমতা, হাওড়া। (খ) চন্দ্রচূড় শিব। (গ) চৌধুরী পরিবার। (ঘ) ছোট। সামান্য টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৩৫। (চ) ক্রম ৪১।

---

* ১৬৫১ শক বা ১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশরী কালীর আটচালা আছে উত্তর ২৪ পরগনার বারাকপুরের কাছে, দেবপুকুরে।

৬১। (ক) **হরিপাল** (রায়পাড়া), হুগলী। (খ) সীতারাম। (ঘ) মাঝারি। ত্রিখিলান। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৩৬। (চ) তারকেশ্বর লাইনের হরিপাল স্টেশন থেকে চুক্তির রিক্সায়।

৬২। (ক) **মালঞ্চ,** গোঘাট, হুগলী। (খ) শিব। (গ) চক্রবর্তী পরিবার। (ঘ) মাঝারি। ত্রিখিলান। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৩৭। (চ) আরামবাগ থেকে বাসে বলিদেওয়ানগঞ্জ—বাসস্ট্যান্ড থেকেই স্থানীয় ট্যাক্সিতে।

৬৩। (ক) **কুমোরটুলি।** ৫১, নন্দরাম সেন স্ট্রিট। কলকাতা। রামেশ্বর শিব। (গ) নন্দরাম সেন। (ঘ) অতি বৃহৎ (আনু. উচ্চতা ৭০/৮০ ফুট)। ত্রিখিলান। নিরলংকার। (ঙ) ১৭৩৯।

৬৪। (ক) **জগৎবল্লভপুর** (কালীতলা), হাওড়া। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। সামান্য টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৪০। (চ) হাওড়া থেকে বাসে সরাসরি।

৬৫। (ক) **রামনগর,** আরামবাগ, হুগলী। (খ) লক্ষ্মী-জনার্দন। (গ) হালদার পরিবার। (ঘ) মাঝারি। ত্রিখিলালন। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৪০। (চ) আরামবাগ থেকে গাড়ি/অটো/ভ্যানরিক্সা।

৬৬। (ক) **বাহিরগড়,** জাঙ্গীপাড়া, হুগলী। (খ) দামোদর। (গ) সিংহরায় পরিবার (বর্তমান অধিকারী শেঠ পরিবার)। (ঘ) অতিবৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৪৫/৫০ ফুট)। ত্রিখিলান। টেরাকোটা জীর্ণ। ঘেরা চত্বর। (ঙ) ১৭৪৩। (চ) প্রাগুক্ত হরিপাল বা জাঙ্গীপাড়া থেকে বড়গাছিয়াগামী বাসপথের বাহিরগড় স্টপ থেকে সামান্য ঢুকে। ডানে। **প্রাসঙ্গিকী** : বাংলার ইতিহাসের একটি বিশেষ দিকের প্রতীক চিহ্ন হল বাহিরগড় জমিদারী ও তারকেশ্বরের দশনামী শৈব মঠ। অষ্টাদশ শতকে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বাংলাদেশ মধ্য ও পশ্চিম ভারতের নানা যুদ্ধবাজ সন্ন্যাসীদল ('Sannyasi-Faqir Raiders'), বিভিন্ন স্থানচ্যুত রাজপুত গোষ্ঠী ও বর্গী আক্রমণের শিকার হয়। এই সঙ্গে ছিল ইংরেজ, ডাচ ও পর্তুগীজরা—বাংলা আক্ষরিক অর্থেই 'মগের মুল্লুক' হয়ে ওঠে। হুগলী, চুঁচড়া ও চন্দননগর যেহেতু এই রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার কেন্দ্রে ছিল, সেইহেতু ভাগ্যান্বেষীদের উৎপাতও এখানে বেশি ছিল। উত্তর প্রদেশের জৌনপুর অঞ্চলের একজন রাজপুত ছত্রী রাজা, কেশব হাজারী, নিজের অঞ্চলে তাড়া খেয়ে এইভাবে নানা অঞ্চল ঘুরে শেষে বাহিরগড় অঞ্চলে বলপ্রয়োগ করে বেশ কিছু অঞ্চল কব্জা করেন। তাঁর দুই ছেলে বিষ্ণুদাস ও ভারামল্ল নবাব মুর্শীদকুলি খানের কাছ থেকে যথাক্রমে 'রাজা' ও 'রাওরাঁইয়া' উপাধি সহ বালিগড়ি ও মহেনাবাগ পরগণার জমিদারী লাভ করেন। একই সময়ে পশ্চিম ভারতের দশনামী শৈব সন্ন্যাসীরা একই সুযোগে এসে তারকেশ্বর মন্দিরে ঘাঁটি গাড়েন। বাংলাদেশে মঠ প্রতিষ্ঠার প্রথা ছিল না, পশ্চিম ভারতে ছিল। এবার বাহিরগড়ের ভুঁইফোড় ছত্রী রাজপুত জমিদার তারকেশ্বরের ভুঁইফোঁড় অবাঙালি সন্ন্যাসীদের আখড়া (সে সময়ে মোহান্ত ছিলেন মায়াগিরি ধূম্রপান বা সমুদ্রনাথ গিরি)-কে বিরাট পরিমাণ নিষ্কর জমি লিখে দিলে তারকেশ্বরের মঠ-প্রতিষ্ঠা হয় (১৭২৯)।.

৬৭। (ক) **কুড়মুন** (গাজনতলা), বর্ধমান। (খ) ঈশানেশ্বর (গাজনেশ্বর) শিব। (গ) কিংবদন্তি অনুসারে গাজনের তত্ত্বাবধায়ক মণ্ডল পবিবারের আদি পুরুষ সন্তোষ মণ্ডল। (ঘ) মাঝারি। নিবলংকার। (ঙ) ১৭৪৫। (চ) বর্ধমান (তিনকোণিয়া) কুসুমগ্রাম বাসে সরাসরি। **প্রাসঙ্গিকী** : (i) আচার্য বিনয় ঘোষ লিখেছেন : "মণ্ডলদের পূর্বপুরুষ সন্তোষ মণ্ডল বাংলা

১১৬১ সনে যে জীবিত ছিলেন, মুন্সী পরিবারের একটি প্রাচীন তায়দাদ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১১৬১ সনের একটি তায়দাদে দেখা যায় যে বর্ধমানরাজ মাদদ্‌মাস দিচ্ছেন সেখ আজিমুদ্দিন ও তস্য পুত্র কলিমুদ্দিনকে এবং সন্তোষ মণ্ডল তার অন্যতম সাক্ষী।....কিংবদন্তী হল, এই সন্তোষ মণ্ডল স্বপ্ন দেখে খড়িনদীর কলমিসায়রের দহ থেকে ঈশানেশ্বর শিবকে নিয়ে এসে গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন।''* বাংলা ১১৬১ হল খ্রিস্টাব্দ ১৭৫৪-এর ৯ বৎসর আগে তাঁর পক্ষে মন্দির প্রতিষ্ঠা অসম্ভব নয়। (ii) ঈশানেশ্বর সারা বছর ব্রাহ্মণ পুরোহিতের হেপাজতে দালান মন্দিরে থাকেন—১৩ই চৈত্র তাঁকে শোভাযাত্রা-সহকারে নিয়ে আসা হয় গাজনতলার আটচালা মন্দিরে, তখন তিনি গাজনেশ্বর শিব। গাজনের সময় শিব থাকেন হাড়ি, বাগদি, দুলে ডোম প্রভৃতি ধর্ম-ঠাকুর-পূজক গোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে। গ্রামে কালাচাঁদ নামে ধর্ম-ঠাকুরও প্রতিষ্ঠিত আছেন। কুড়মুনের গাজনের আদিমতা, বিশেষত ভোরের আধো অন্ধকারে শ্মশান-সন্ন্যাসীগণ কাঁচা বা শুকনো মড়ার-মাথা তরোয়ালের বা বেত্তের ডগায় গেঁথে ঢাকের প্রবল বাজনার সঙ্গে যে ভয়াল নাচ করেন, তা হতে মনে হয় ধর্ম-ঠাকুরের গাজনই এখানে ঈশানেশ্বর শিবের গাজনে পরিণত হয়েছে। (iii) রাজা রামমোহন দ্বিতীয় বিবাহ করেন কুড়মুন গ্রামের ঈশানেশ্বরপাড়ার একজন ব্রাহ্মণ কন্যাকে।

৬৮। (ক) **গুপ্তিপাড়া** (মঠবাড়ি), বলাগড়, হুগলী। (খ) কৃষ্ণচন্দ্র। (গ) মঠবাড়ির নবম দণ্ডী মহান্ত। (ঘ) অতিবৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৫০ ফুট। ত্রিখিলান। কিছু টেরাকোটা পদ্ম ও পঙ্খের কাজ। প.ব. সরকার কর্তৃক সংস্কৃত। (ঙ) ১৭৪৫। (চ) ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইনের গুপ্তিপাড়া স্টেশন থেকে রিক্সায়। ঘেরা ক্ষেত্রের প্রথম মন্দিরটি।

৬৯। (ক) **দশঘরা,** ধনিয়াখালি, হুগলী। (খ) শিব। (গ) বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। (ঘ) মাঝারি। ত্রিখিলান। সামান্য টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৪৬। (চ) তারকেশ্বর অথবা বর্ধমান কর্ড লাইনের গুড়াপ থেকে বাসে/ট্রেকারে দশঘরা—বিশ্বাস পাড়ার বিখ্যাত গোপীনাথ মন্দিরের পথে, বাশুলির জোড়বাংলার পাশে।

৭০। (ক) **রামেশ্বরপুর,** জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) শিব (পরিত্যক্ত)। (গ) মিত্র পরিবার। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা। জীর্ণ। (ঙ) ১৭৪৬। (চ) হাওড়া থেকে বাসে মুনশীর হাট। অল্প হাঁটা।

৭১। (ক) **মন্দিরবাজার** (বহিনচাওড়া, হাটতলা), দক্ষিণ ২৪ পরগণা। (খ) কেশবেশ্বর শিব। (গ) প্রতিষ্ঠাতা কেশব রায়চৌধুরী। নির্মাতা বাসুদেব যাঁকে লিপিতে 'শিল্পী' বলা হয়েছে। (ঘ) অতি বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৫০ ফুট)। ত্রিখিলান। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৪৮। (চ) শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনের জয়নগর-মজিলপুর স্টেশান হতে রিক্সায় বিষ্ণুপুর মোড়—এখান থেকে বাসে মন্দিরবাজার। সামান্য হাঁটা।

৭২। (ক) **পুতুণ্ডা,** বর্ধমান। (খ) দামোদর। (গ) চৌধুরী পরিবার। (ঘ) অতিবৃহৎ। উচ্চতা আনু. ৪৫ ফুট। ত্রিখিলান। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৪৯। (চ) হাওড়া-বর্ধমান লাইনের শক্তিগড় থেকে ভ্যানরিক্সা।

১। প্রাগুক্ত 'প. বঙ্গের সংস্কৃতি—১', পৃ. ২৩২।

৭৩। (ক) **সুহারী,** বর্ধমান। (খ) রাজরাজেশ্বর। (গ) কোঙার পরিবার। (ঘ) মাঝাবি। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৪৯। (চ) পূর্বোক্ত শক্তিগড় থেকে ভ্যানরিক্সা।

৭৪। (ক) **জয়নগর,** তারকেশ্বর, হুগলী। (খ) শিব—পরিত্যক্ত। (গ) চট্টোপাধ্যায় পরিবার। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৪৯। (চ) তারকেশ্বর লাইনের বাহিরখণ্ড স্টেশন থেকে ভ্যানরিক্সায়। সহজে।

৭৫। (ক) **ঝিখিরা** (সরখেলপাড়া), আমতা, হাওড়া। (খ) জয়চণ্ডী। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৩০ ফুট)। ত্রিখিলান। ঈষৎ টেরাকোটা অবশিষ্ট। (ঙ) ১৭৫০। (চ) হাওড়া-ঝিখিরা বাস। ভ্যানরিক্সা। গড়চণ্ডীর নবরত্নের অদূরে।

৭৬। (ক) **পাতিহাল** (মহেশতলা), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) কালীনাথ জীউ। (গ) চক্রবর্তী পরিবার। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (ঙ) **১৮ শতকের মধ্যভাগ।** (চ) হাওড়া-মুনশীরহাট বাসে সরাসরি. পাতিহাল। চুক্তির ভ্যানরিক্সায়।

৭৭। (ক) **জয়নগর** (রাধাবল্লভতলা), দক্ষিণ ২৪ পরগণা। (খ) রাধাবল্লভ। (গ) পুরাতন মন্দির বিনষ্ট হলে বর্তমান মন্দির নির্মাণ করেন দক্ষিণ বারাশতের বসু পবিবার। নাটমণ্ডপ—কৃষ্ণমোহন মিত্র এবং দোতলা দোলমঞ্চ মধুসূদন মিত্র। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৩০ ফুট)। ত্রিখিলান। নিরলংকার। সামনে নাটমণ্ডপ। —আমূল সংস্কৃত। (চ) শিয়ালদহ দক্ষিণ থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর/কাকদ্বীপ লোকালে জয়নগর-মজিলপুর স্টেশন। রিক্সা।

৭৮। (ক) **(ক) ঐ** (দুর্গাপুর)। (খ) শ্রীরাধার শ্যামসুন্দব। (গ) সরখেল পরিবার। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৪০ ফুট)। ত্রিখিলান। নিরলংকার। সামনে বক্রচাল আধুনিক বারান্দা পরে সংযোজিত। ঘেরা অঙ্গনের বাইরের দোলমাঠে দ্বিতল দোলমঞ্চ। (চ) ঐ। নেতাজী সুভাষ রোড ধরে উত্তরে।

৭৯। (ক) **খণ্ডরুই,** দাঁতন, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) রাধাবল্লভ। (গ) সিংহগজেন্দ্র মহাপাত্র পরিবার। (ঘ) মাঝারি। ঈষৎ টেরাকোটা। চারচালা মুখমণ্ডপ। (চ) কাঁথি বা এগরা থেকে খড়গপুরগামী বাসে খাকুরদহ গিয়ে ভ্যানরিক্সায় (৬/৭ কি.মি.)।

৮০। (ক) **চন্দ্রকোণা** (রঘুনাথবাড়ি, আযোধ্যা), পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) লালজী। (গ) চন্দ্রকোণা রাজ-পরিবার। (ঘ) ঝামপাথরে নির্মিত। বৃহৎ। ত্রিখিলান। ঈষৎ পঙ্খ। তিনটি স্তূপিকা– প্রতিটি আমলক ও কলস শোভিত। উচ্চতা আনু. ৪০ ফুট। (চ) পাঁশকুড়া, ঘাটাল বা মেদিনীপুর শহর থেকে বাসে চন্দ্রকোণা টাউন। চুক্তির রিক্সা।

৮১। (ক) **কামারপোল,** ডায়মণ্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। (খ) রাধাকান্ত। (গ) অর্ণব পরিবার। (ঘ) অতি বৃহৎ (উচ্চতা ৫০/৫৫ ফুট)। পঙ্খের কাজ। পদচিহ্নযুক্ত ইটের বিরল ব্যবহার। টেরাকোটা পদ্মশোভিত। ত্রিখিলান। (চ) ডায়মণ্ড হারবার থেকে নূরপুর/রায়চকমুখী বাসে সরাসরি। অথবা ডায়মণ্ডহারবার থেকে বাসে/ট্রেকারে সরিশা মোড়ে গিয়ে ভ্যানরিক্সায়।

৮২। (ক) **নিমতলা,** দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) হেমন্তনাথ শিব। (গ) শোভা সিংহের ভাই হেম্মৎ সিংহ? (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৩০/৩৫ ফুট। ত্রিখিলান। অত্যন্ত উৎকৃষ্ট টেরাকোটা। (চ) ঘাটাল শহরের লাগোয়া। পাঁশকুড়া থেকে বাসে।

৮৩। (ক) **আঁটপুর,** জাঙ্গীপাড়া, হুগলী। (খ) শিব। (গ) মিত্র পরিবার। (ঘ) মাঝারি। উৎকৃষ্ট টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৫১। (চ) হরিপাল থেকে উদয়নারায়ণপুরের বাসে, বিখ্যাত রাধাগোবিন্দের প্রবেশ পথের পাশে।

৮৪। (ক) **গুড়াপ,** ধনিয়াখালি, হুগলী। (খ) নন্দদুলাল। (গ) রামদেব নাগ। (ঘ) অতি বৃহৎ (উচ্চতা ৫০/৫২ ফুট)। ত্রিখিলান। টেরাকোটা। ঘেরা ক্ষেত্রে পাশে শিবের রেখ দেউল, সামনে বৃহৎ নাটমণ্ডপ। বাইরের প্রাঙ্গণে দোলমঞ্চ। (ঙ) ১৭৫১। (চ) বর্ধমান কর্ড লাইনের গুড়াপ স্টেশন থেকে ভ্যানরিক্সায়।

৮৫। (ক) **গৌরহাটি,** আরামবাগ, হুগলী। (খ) গঙ্গাধর শিব। (গ) দালাল পরিবার। (ঘ) ছোট। সামান্য টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৫২। (চ) আরামবাগ থেকে সরাসরি বাসে।

৮৬। (ক) **হাটগোবিন্দপুর,** বর্ধমান। (খ) অষ্টনায়িকা দুর্গা। (ঘ) মাঝারি। ত্রিখিলান। টেরাকোটা সমৃদ্ধ। —বর্তমানে মন্দিরটি পরিত্যক্ত, বিগ্রহ পাশে নবনির্মিত দালানে অপসারিত। (ঙ) ১৭৫২। (চ) বর্ধমান (তিনকোণিয়া) থেকে বাসে, হাটগোবিন্দপুর চড়কতলা স্টপ থেকে সামান্য হেঁটে।

৮৭। (ক) **কালনা,** বর্ধমান। (খ) অনন্ত বাসুদেব। (ঘ) অতি বৃহৎ (উচ্চতা ৫০/৫২ ফুট)। ত্রিখিলান। আমূল সংস্কৃত। ঘেরা ক্ষেত্র। (ঙ) ১৭৫২। (চ) ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইনের অম্বিকা-কালনা স্টেশন থেকে রিক্সা।

৮৮। (ক) **পুরশুড়া,** হুগলী। (খ) রঘুনাথ। (গ) সিংহ পরিবার। (ঘ) মাঝারি। ত্রিখিলান। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৫৩। (চ) তারকেশ্বর থেকে সরাসরি বাসে।

৮৯। (ক) **রামপুর,** দাসপুর, প. মেদিনীপুর। (খ) শিব। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (ঙ) ১৭৫৫। (চ) পাঁশকুড়া থেকে বাসে গৌরা। এখান থেকে আজুড়িয়ার ট্রেকারে।

৯০। (ক) **কাঁকড়াকুলি,** ধনিয়াখালি, হুগলী। (খ) শিব। (গ) দত্ত পরিবার। (ঘ) ছোট। দ্বারশীর্ষে কিছু টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৫৫। (চ) ক্রম ৫৬। —সামান্য এগিয়ে।

৯১। (ক) **গোগুলপাড়া** (ভৈরবীতলা), পাঁচলা, হাওড়া। (খ) ভৈরবী। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা ৩০/৩৫ ফুট)। সংস্কৃত। ত্রিখিলান। সামান্য টেরাকোটা অবশিষ্ট। (ঙ) ১৭৫৭। (চ) হাওড়া-উলুবেড়িয়া বাসপথের ধূলাগড়ি থেকে বাস বদল করে বা ভ্যানরিকসা (৫/৬ কি.মি.)।

৯২। (ক) **মাগুলাই,** পাণ্ডুয়া, হুগলী। (খ) গোপাল। (গ) কর পরিবার। (ঘ) অতি বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৪৫ ফুট)। সংস্কৃত। সামান্য টেরাকোটা অবশিষ্ট। বিশাল পুকুর শেষের ঘেরা ক্ষেত্রে আরও আছে রাস ও দোলমঞ্চ। (ঙ) ১৭৫৮। (চ) বর্ধমান মেইন লাইনের পাণ্ডুয়া থেকে ভ্যানরিক্সায় (৫ কি.মি.)।

৯৩। (ক) **বাঁকুল** (পূবপাড়া), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) শিব। (গ) কবিরাজ পরিবার। (ঘ) ছোট। দ্বারশীর্ষে টেরাকোটা। সামনে আর একটি আটচালা। (ঙ) ১৭৫৯। (চ) হাওড়া থেকে জগৎবল্লভপুর, মুনশীরহাট প্রভৃতি বাসে পাতিহাল হাটতলা। অল্প হাঁটা।

৯৪। (ক) **ঐ** (খাঁড়াপাড়া)। (খ) শিব। (গ) ঐ। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (ঙ) ১৭৬০। (চ) ঐ।

৯৫। (ক) **চাঁইপাট** (নায়েকপাড়া), দাসপুর, প. মেদিনীপুর। (খ) রাধাগোবিন্দ। (গ) বৃহৎ। ত্রিখিলান। উৎকৃষ্ট টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৬০। (চ) পাঁশকুড়া-গোপীগঞ্জ বাসে সরাসরি।

৯৬। (ক) **গ্রাম কুলটি,** কালনা, বর্ধমান। (খ) শিব। (গ) নন্দী পরিবার। (ঘ) ছোট, নিরলংকার। (ঙ) ১৭৬০। (চ) পাণ্ডুয়া থেকে বাসে।

৯৭। (ক) **আকনাপুর,** তারকেশ্বর, হুগলী, (খ) রঘুনাথ। (গ) মল্লিক পরিবার। (ঘ) ছোট। সামান্য টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৬-। (চ) তারকেশ্বর লাইনের বালিগড়ি থেকে ভ্যানরিক্সায়।

৯৮। (ক) **শাঁকারি** (দক্ষিণপাড়া), খণ্ডঘোষ, বর্ধমান। (খ) শিব। (ঘ) ছোট। টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। ব্যতিক্রমী—উপরের চারচালাটির গলাটি রেখ-দেউলের অনুকৃতি, খানিক সোজা উপরে ওঠার পরে তার উপরে চালটি বসানো হয়েছে, ম্যাকাচিয়নের মতে উপরের চারচালাটি ডাবুক বা শিবনিবাসের চালাদেউলের অনুরূপ।[1] (ঙ) ১৭৬১। (চ) বর্ধমান (তিনকোণিয়া) থেকে বাসে।

৯৯। (ক) **কৃষ্ণপুর,** পোলবা, হুগলী। (খ) শিব। (গ) ঘোষ পরিবার। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৪০ ফুট)। টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। ঘেরা ক্ষেত্র। (ঙ) ১৭৬২। (চ) বর্ধমান কর্ড লাইনের বেলমুড়ি স্টেশন থেকে রিক্সা (৫ কি.মি.)।

১০০। (ক) **গৌরাঙ্গচক** (বোধকপাড়া), উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া। (খ) ধর্ম। (গ) রামজীবন বোধক। কারিগর : স্বরূপ মিস্ত্রী। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (ঙ) ১৭৬২। (চ) হাওড়া-জয়নগরঘাট (ভায়া মুনশীর হাট) বাসে খিলাহাট। ভ্যানরিক্সা।

১০১। (ক) **রাউতাড়া** (সরকারপাড়া), আমতা, হাওড়া। (খ) দামোদর। (গ) রায় পরিবার। (ঘ) বৃহৎ। ত্রিখিলান। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৬২। ক্রম ৩৯। খালের ওপাড়ে।

১০২। (ক) **জগৎবল্লভপুর,** হাওড়া। (খ) শিব। (গ) পাল পরিবার, (ঘ) বৃহৎ। টেরাকোটা। দেওয়ালে বৃহৎ ফাটল। বৃক্ষাক্রান্ত। বিপরীতে দোলমঞ্চ। (ঙ) ১৭৬৩। (চ) হাওড়া থেকে সরাসরি বাসে।

১০৩। (ক) **বল্লভপুর** (ঠাকুরবাটি স্ট্রীট), শ্রীরামপুর, হুগলী। (খ) রাধাবল্লভ। (গ) নয়নচাঁদ মল্লিক। 'শিলুকার' শ্রীকৃষ্ণদাস। (ঘ) অতি বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৬০ ফুট)। সামনে বৃহৎ নাটদালান। ত্রিখিলান। (ঙ) ১৭৬৪ (গঙ্গাতীরের আদি মন্দির পরিত্যক্ত হওয়ার পরে)। (চ) হাওড়া-শ্রীরামপুর বাসপথের বল্লভপুর স্টপ তেকে পূবমুখী রাস্তায় হেঁটে/রিক্সায়। **কিংবদন্তি** : (i) সাধক রুদ্ররাম স্বপ্নাদেশ অনুসারে গৌড় থেকে গঙ্গার জলে ভেসে আসা একটি প্রস্তরখণ্ড হতে বল্লভপুরে রাধাবল্লভ, খড়দহের শ্যামসুন্দর ও সাঁইবোনার নন্দদুলাল বিগ্রহ নির্মাণ করান। (ii) শ্রীপাট খড়দহের বীরচন্দ্র প্রভু (নিত্যানন্দ পুত্র) রুদ্ররামকে রাধাবল্লভ বিগ্রহ দেন ও শ্যামসুন্দরকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। —এর ফলে একই দিনে ঐ তিন বিগ্রহ দর্শনের রীতিগড়ে উঠেছিল।

১০৪। (ক) **অমরাগড়ি,** আমতা, হাওড়া। (খ) দধিমাধব। (গ) রায় পরিবার। (ঘ) একদা মাঝারি, ত্রিখিলান ও টেরাকোটা-মণ্ডিত এই মন্দির বর্তমানে প্রায় সম্পূর্ণ বৃক্ষ কবলিত, দধিমাধব পূজিত হচ্ছেন পাশে নবনির্মিত দালান মন্দিরে। (ঙ) ১৭৬৪। (চ) হাওড়া/জয়পুর/ঝিখিড়া বাসে, গ্রামে ঢুকে প্রথম রাস্তায় ডানে ঘুরে।

১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

১০৫। (ক) **দ্বারহাট্টা,** হরিপাল, হুগলী। (খ) দ্বারিকাচণ্ডী। (গ) সিংহরায় পরিবার। (ঘ) মাঝারি, ত্রিখিলান, টেরাকোটা কিন্তু বটের গ্রাসে। (ঙ) ১৭৬৪। (চ) ক্রম ৫২। অদূরে।

১০৬। (ক) **দেউলপাড়া,** পুরশুড়া, হুগলী। (খ) শিব (পরিত্যক্ত)। (গ) দেবনাথ পরিবার। (ঘ) মাঝারি। ত্রিখিলান। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৬৪। (চ) তারকেশ্বর-অমরপুর বাসে/ট্রেকারে দেউলপাড়া বুদ্ধমন্দির স্টপ। সামান্য হাঁটা।

১০৭। (ক) **খেদাইল,** আরামবাগ, হুগলী। (খ) দামোদর। (গ) নন্দী পরিবার। (ঘ) মাঝারি। ত্রিখিলান। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৬৭। (চ) পুরশুড়া থেকে রিজার্ভ গাড়ীতে।

১০৮। (ক) **দেউলপাড়া,** পুরশুড়া, হুগলী। (খ) জয়চণ্ডী। (গ) দে পরিবার। (ঘ) মাঝারি। ত্রিখিলান। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৬৯। (চ) ক্রম ১০৬।

১০৯। (ক) **বাহিরগড়,** জাঙ্গীপাড়া, হুগলী। (খ) বিশ্বেশ্বর শিব। (গ) সিংহরায় পরিবার। (ঘ) ছোট, আমূল সংস্কৃত। (ঙ) ১৭৬৯। (চ) ক্রম ৬৬। প্রা: বিদ্যালয়ের মাঠের বিপরীতে।

১১০। (ক) **চিংড়াজোল** (ঝিখিরা), আমতা, হাওড়া। (খ) দামোদর। (গ) মণ্ডল পরিবার। কারিগর শুকদেব মিস্ত্রী। (ঘ) বৃহৎ। আনু. উচ্চতা ৩০/৩২ ফুট। উৎকৃষ্ট টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৬৯। (চ) হাওড়া থেকে বাসে ঝিখিরা। ভ্যানরিক্সা।

১১১। (ক) **বাওয়ালি** (দক্ষিণ), বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। (খ) রাধাকান্ত। (গ) হরানন্দ মণ্ডল। (ঘ) অতিবৃহৎ। আনু. উচ্চতা প্রায় ৫০ ফুট। ত্রিখিলান। দু এক জায়গায় টেরাকোটা অবশিষ্ট। সামনে পরিত্যক্ত ঝুলনমঞ্চ ও চারচালা দোলমঞ্চ— পাশে ও পিছনে পরিত্যক্ত দুটি বৃহৎ আটচালা মন্দির। (ঙ) ১৭৭১। (চ) শিয়ালদহ-বজবজ লাইনের বজবজ স্টেশন থেকে বেরিয়ে মহাত্মা গান্ধী রোডে থানার সামনে হতে ৭৬নং বাস বা ট্রেকারে দক্ষিণ বাওয়ালী, তেঁতুলতলা স্টপেজ হতে সামান্য হাঁটা। গোপীনাথের নবরত্নের পিছনে।

১১২। (ক) **বড়র** (কালীতলা), জামালপুর, বর্ধমান। (খ) শিব। (ঘ) ছোট। ঈষৎ টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৭২। (চ) বর্ধমান কর্ড লাইনের মসাগ্রাম থেকে ভ্যানরিক্সা।

১১৩। (ক) **ভালিয়া,** আরামবাগ, হুগলী। (খ) রঘুনাথ। (গ) সরকার পরিবার। (ঘ) মাঝারি। ত্রিখিলান। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৭২। (চ) আরামবাগ থেকে রিজার্ভ গাড়িতে (১০/১২ কি.মি.)।

১১৪। (ক) **দেউলপাড়া,** পুরশুড়া, হুগলী। (খ) পরিত্যক্ত মন্দির। (গ) দে পরিবার। (ঘ) মাঝারি। ত্রিখিলান। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৭২। (চ) ক্রম ১০৬।

১১৫। (ক) **আমতা,** হাওড়া। (খ) শিব। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (ঙ) ১৭৭৩। (চ) হাওড়া থেকে সরাসরি বাসে। বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে।

১১৬। (ক) **নাইকুলি** (বিশালাক্ষীতলা), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) শিব। (ঘ) ছোট। সামান্য পঙ্খ। (ঙ) ১৭৭৩। (চ) হাওড়া থেকে বাসে মুনশীরহাট—এক কি.মি.।

১১৭। (ক) **মহানাদ** (করপাড়া), পোলবা, হুগলী। (খ) ভুবনেশ্বর শিব। (গ) ভীমচন্দ্র কর। (ঘ) মাঝারি। সামান্য নক্সা। (ঙ) ১৭৭৪। (চ) চুঁচড়া বা পাণ্ডুয়া থেকে বাসে।

১১৮। (ক) **ঐ।** (খ) চন্দ্রশেখর শিব। (ঘ) ঐ। (ঙ) ঐ। (চ) ঐ। কাছেই।

১১৯। (ক) **কোতলপুর,** জাঙ্গীপাড়া, হুগলী। (খ) শিব—পরিত্যক্ত। (গ) বাকুলি পরিবার। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৭৪। (চ) ক্রম ২৬। সামান্য আগে।

১২০। (ক) **নিজবালিয়া,** জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। কিছুটা ব্যতিক্রমী ধরণের টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৭৬। (চ) হাওড়া থেকে জগৎবল্লভপুর, মুনশীরহাট প্রভৃতি বাসে পাতিহাল হাটতলা। ভ্যানরিক্সা।

১২১। (ক) **ঝিখিরা** (পশ্চিমপাড়া), আমতা, হাওড়া। (খ) দামোদর। (গ) রায়পরিবার। (ঘ) মাঝারি। ত্রিখিলান। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৭৬। (চ) ক্রম ৭৪।

১২২। (ক) **জগৎবল্লভপুর** (যষ্ঠীতলা), হাওড়া। (খ) শিব। (ঘ) ছোট। দ্বারের দুপাশে টেরাকোটা দ্বারপাল। (ঙ) ১৭৭৭। (চ) ক্রম ১০২।

১২৩। (ক) **সিংটি** (বেরাপাড়া), উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া। (খ) লক্ষ্মীজনার্দন। (গ) বেরাপরিবার। (ঘ) ছোট। সামান্য টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৭৭। (চ) হরিপাল থেকে উদয়নারায়ণপুরের বাসে সরাসরি।

১২৪। (ক) **খিদিরপুর,** ভূকৈলাস রাজবাড়ি, কলকাতা। (খ) রক্তকমলেশ্বর শিব। (গ) ঘোষাল পরিবার। (ঘ) অতি বৃহৎ। উচ্চতা আনু. ৭০/৭৫ ফুট। ত্রিখিলান। নিরলংকার। (ঙ) ১৭৮০।

১২৫। (ক) **ঐ।** (খ) 'কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর শিব।' (গ) ঐ। (ঘ) ঐ। (ঙ) ঐ (?)।

১২৬। (ক) **পাতিহাল** (মজুমদারপাড়া, মন্দিরতলা), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) শিব, (ঘ) ছোট। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৮১। (চ) ক্রম ৭৬।

১২৭। (ক) **ঐ।** (খ) ঐ। (ঘ) ঐ। মুখোমুখী। (চ) ঐ।

১২৮। (ক) **পলাশী,** বর্ধমান। (খ) বুড়ো শিব। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৮২। (চ) বর্ধমান (তিনকোণিয়া) থেকে কুসুমগ্রামের বাসে। কুড়মুনের লাগোয়া।

১২৯। (ক) **ঝিখিরা** (কাঁড়ারপাড়া), আমতা, হাওড়া। (খ) সীতানাথ। (ঘ) মাঝারি। ত্রিখিলান। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৮৩। (চ) ক্রম ৮৪। পিছনে রাসমঞ্চ।

১৩০। (ক) **রামপুর** (গোস্বামীপাড়া), উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া। (খ) বৃন্দাবনজীউ। (গ) গোস্বামী পরিবার। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৩৫ ফুট)। আমূল সংস্কৃত। (ঙ) ১৭৮৩। (চ) হরিপাল বা হাওড়া থেকে বাসে উদয়নারায়ণপুর। রিক্সা/ভ্যানরিক্সা।

১৩১। (ক) **জাঙ্গীপাড়া** (বাজারপাড়া), হুগলী। (খ) শিব। (ঘ) ছোট, আমূল সংস্কৃত। (ঙ) ১৭৮৩। (চ) হাওড়া বা হরিপাল থেকে বাসে জাঙ্গীপাড়া—এখান থেকে রিক্সায়।

১৩২। (ক) **জয়পুর** (জয়চণ্ডীতলা), আমতা, হাওড়া। (খ) শ্রীধর। (ঘ) মাঝারি। ত্রিখিলান। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৮৪। (চ) হাওড়া-ঝিখিরা বাসপথের জয়পুর মোড় থেকে ভ্যান-রিক্সায়। ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ বটগাছের নীচে বাঁধানো জয়চণ্ডীর থান, সামনে নবরত্ন রাসমঞ্চ।

১৩৩। (ক) **ভাণ্ডারগাছা** (কাউরপাড়া), আমতা, হাওড়া। (খ) দুর্গা (গজবাহিতা)। (গ) কাউর পরিবার। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৩৫ ফুট)। ত্রিখিলান। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৮৫। (চ) আমতা বাস স্টপ থেকে ভ্যানরিক্সা।

১৩৪। (ক) **বেলিয়াঘাটা** (পূবপাড়া), দাসপুর, প: মেদিনীপুর। (খ) শ্রীধর (পরিত্যক্ত)। (গ) সরকার পরিবার। (ঘ) ছোট। টেরাকোটা প্রায় সম্পূর্ণ অপসৃত। (ঙ) ১৭৮৫। (চ) ঘাটালের কাছে। পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে।

১৩৫। (ক) **কাঞ্চনপল্লী** (কাঁচড়াপাড়া রথতলা), কল্যানী, নদীয়া। (খ) কৃষ্ণ রায়। (গ) নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক। (ঘ) অতি বৃহৎ (উচ্চতা অন্তত ৬০ ফুট)। ত্রিখিলান, কিন্তু খিলানদ্বার তিনটির দুপাশে দুটি নকল দরজার মত কুলুঙ্গী থাকায় দেখায় পাঁচখিলান স্থাপত্যের মতন। খিলান-শীর্ষে ও দুপাশে টেরাকোটা পদ্ম। বর্গাকার প্রাঙ্গণের মাঝ বরাবর দুপাশে দুটি সমমাপের ত্রিখিলান একতলা দালান। মন্দিরের পিছনে একতলা ত্রিখিলান ভোগঘর। ঘেরা বর্গক্ষেত্র। দুদিকে ত্রিখিলানসহ প্রবেশদ্বার—একই রেখায় রাস্তার পাশে পঙ্খের সিংহ অঙ্কিত বহির্দ্বার। ক্ষেত্রের বাইরে মাঠের কোণে আটচালা দোলমঞ্চ। (ঙ) ১৭৮৫। (চ) শিয়ালদহ-রাণাঘাট লাইনের কাঁচড়াপাড়া থেকে ট্রেকারে বাগেব মোড়ে গিয়ে রিক্সায়/হেঁটে অথবা কল্যাণীগামী বাসে—মন্দিরের পথেই নামা। **প্রাসঙ্গিকী** : (i) "চলিলা মুকুন্দ দত্ত—কৃষ্ণের গায়ন। / শিবানন্দ সেন আদি লই আপ্তগণ।।"* এই শিবানন্দ সেন হলেন কাঁচড়াপাড়াবাসী চৈতন্যপার্ষদ এবং 'আপ্তগণ' হলেন চৈতন্য ভক্তগণ—চৈতন্যদেবের পুরীতে অবস্থানকালে শিবানন্দ প্রতি বৎসর ভক্তদলকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। শিবানন্দের কাঁচড়াপাড়ার বাড়িতে স্বয়ং চৈতন্যদেব আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। পরন্তু শিবানন্দের ছোট ছেলে হলেন সংস্কৃত ভাষায় 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক ও 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' গ্রন্থ এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্য রচয়িতা পরমানন্দ সেন যাঁকে স্বয়ং চৈতন্য 'কবিকর্ণপুর' আখ্যা দেন। (ii) কৃষ্ণ রায় বিগ্রহ শিবানন্দ-পূজিত। (iii) যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের পরিবারের রাঘব রায় (কচু রায়) প্রতিষ্ঠিত আদি-মন্দির গঙ্গাগর্ভে বিলীন হলে মল্লিক ভ্রাতৃদ্বয় বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করান।**

১৩৬। (ক) **আঁটপুর,** জাঙ্গীপাড়া, হুগলী। (খ) রাধাগোবিন্দ। (গ) কৃষ্ণরাম মিত্র। (ঘ) অতি বৃহৎ, উচ্চতা কম করে ৫০ ফুট। চারচালা জগমোহন। সামনের ও দুপাশের দেওয়াল অসাধারণ টেরাকোটা-মণ্ডিত। ঘেরা ক্ষেত্র। বাইরের প্রাঙ্গণে আরও চারটি আটচালা, আটকোণা রাসমঞ্চ ও পঞ্চরত্ন দোলমঞ্চ, মন্দিরের বাঁ-পাশে অসাধারণ কারুকার্য-মণ্ডিত কাঠের ফ্রেমের উপরে খড়ের ছাউনির বিখ্যাত দোচালা চণ্ডীমণ্ডপ। (ঙ) ১৭৮৬। (চ) তারকেশ্বর লাইনের হরিপাল থেকে উদয়নারায়ণপুরের বাসে—মন্দিরের পাশেই নামা। **প্রাসঙ্গিকী** : (i) আঁটপুরের চৈতন্যপদধূলিধন্য আনারবাটিতে চৈতন্য পার্ষদ পরমেশ্বরদাসের সমাধি আছে এবং একটি ছোট দালান মন্দিরে তৎপ্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর এখনও বিরাজ করছেন। (ii) রাধাগোবিন্দ মন্দিরের অদূরে যে বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর কয়েকজন সাথী সন্ন্যাস গ্রহণে মনস্থ করেন, সেই বাড়িটি রক্ষিত আছে।

১৩৭। (ক) **জাঙ্গীপাড়া,** হুগলী। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। ত্রিখিলান। টেরাকোটা। (ঘ) ১৭৮৬। (চ) হাওড়া থেকে বাসে বা হরিপাল থেকে বাসে/ট্রেকারে।

* বৃন্দাবনদাস, 'চৈতন্যভাগবত' দে'জ ১৯৯৫ সংস্করণ, শেষ খণ্ড, নবম অধ্যায়, পৃ. ৩৬৮।

** সমগ্র বিষয়টির জন্য দেখুন 'বাংলায় ভ্রমণ', পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথ, প্রচার বিভাগ, ১৯৪০, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮০।

১৩৮। (ক) **গড়বালিয়া** (শিবতলা), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) বুড়োশিব। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (ঙ) ১৭৮৭। (চ) হাওড়া থেকে বাসে পাতিহাল হাটতলা। ভ্যানরিক্সা (নিজবালিয়া হয়ে)।

১৩৯। (ক) **বীরনগর** (মুখার্জীপাড়া), রাণাঘাট, নদীয়া। (খ) শিব। (গ) মহাদেব মুখার্জী। (ঘ) মাঝারি। সামান্য টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৮৮। (চ) শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর শাখার বীরনগর স্টেশন। রিক্সা।

১৪০। (ক) **রাজপুর,** সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। (খ) ভবানীশ্বর শিব। (ঘ) মাঝারি। ঈষৎ টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৮৯। (চ) শিয়ালদহ দক্ষিণ হতে ডায়মণ্ড হারবার বা লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালে সুভাষগ্রাম। বাস/অটো।

১৪১। (ক) **নিজবালিয়া,** জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) সিংহবাহিনী। (গ) রামনারায়ণ মল্লিক। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৪০/৪.২)। নিরলংকার। চারচালা জগমোহন। সামনে সমতল ছাদের বৃহৎ নাটমণ্ডপ। ঘেরা ক্ষেত্র। সবই আমূল সংস্কৃত। বাইরে, পিছনে শিবের রেখ দেউল। (ঙ) ১৭৯০। (চ) হাওড়া থেকে বাসে পাতিহাল। ভ্যানরিক্সা।

১৪২। (ক) **উত্তর বানুচক** (চক্রবর্তীপাড়া), উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া। (খ) রাধাকৃষ্ণ। (গ) জগন্নাথ বাগ। (ঘ) মাঝারি। সংস্কারে টেরাকোটা লুপ্ত। (ঙ) ১৭৯১। (চ) হাওড়া থেকে বাসে মুনশীবহাট হয়ে কবি ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান পেঁড়ো। ভ্যানরিক্সা।

১৪৩। (ক) **জয়নগর,** তারকেশ্বর, হুগলী। (খ) শিব। (গ) ভড় পরিবার। (ঘ) মাঝারি নিরলংকার। (ঙ) ১৭৯১। (চ) তারকেশ্বর লাইনের বাহিরখণ্ড থেকে রিক্সা।

১৪৪। (ক) **গ্রাম কুলটি,** কালনা, বর্ধমান। (খ) শিব। (গ) শীল পরিবার। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (ঘ) ১৭৯৩। (চ) ক্রম ৯৬।

১৪৫। (ক) **নিমতলা,** ১৬ মহঃ রমজান লেন, কলকাতা। (খ) দুর্গেশ্বর শিব। (গ) দত্ত পরিবার। (ঘ) অতি বৃহৎ। উচ্চতা আনু. ৫০ ফুট। সামান্য পঙ্খ ও টেরাকোটা অবশিষ্ট। ত্রিখিলান। (ঙ) ১৭৯৪।

১৪৬। (ক) **গজা** (মাঝপাড়া, গজাইচণ্ডীতলা), উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া। (খ) শিব। (গ) কৃষ্ণ কাড়ার (কোলে). কারিগর : মাণিকরাম দাস। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (ঙ) ১৭৯৫। (চ) প্রাগুক্ত উদয়নারায়ণপুর থেকে রিক্সা/ভ্যানরিক্সা।

১৪৭। (ক) **খণ্ডঘোষ** (রায়পাড়া), বর্ধমান। (খ) শিব। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (ঙ) ১৭৯৫। (চ) বর্ধমান (তিনকোণিয়া) থেকে বাসে, সরাসরি।

১৪৮। (ক) **সুহারী,** বর্ধমান। (খ) রাজরাজেশ্বর। (গ) কোঙার পরিবার। (ঘ) মাঝারি। ত্রিখিলান। টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৯৬ ? (ম্যাকাচিয়ন, পৃ. ৩৫)। (চ) বর্ধমান (মেইন/কর্ড) লাইনের শক্তিগড় থেকে রিক্সা/ভ্যানরিক্সা।

১৪৯। (ক) **কুরচি** (বায়ড়া-কুরচি/বিনোদবাটি-কুরচি), উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া। (খ) বুড়োশিব। (গ) পাল পরিবার। (ঘ) মাঝারি—উপরের চারচালাটি অনুপাতে ক্ষীণ কিন্তু বিষ্ণুপুর রীতির মত নীচের চারচালার কোণাচগুলির সঙ্গে মেলানো নয়, অনেকটা রত্নের মত

খাড়া, পরে এই অঞ্চলের আরও কয়েকটি মন্দিরে এই রীতি অনুসৃত হয়ছিল। (ঙ) ১৭৯৭। (চ) পূর্বোক্ত উদয়নারায়ণপুর থেকে রিক্সা/ভ্যানরিক্সা।

১৫০। (ক) **কলিকাতা** (ধর্মতলা), আমতা, হাওড়া। (খ) ধর্ম। (গ) গয়াবাম দেয়াসি। কারিগর : থলে (থলিয়া) নিবাসী অভয়চরণ মিস্ত্রী। (ঘ) মাঝারি। সামান্য নক্সা। নাতিবৃহৎ। (ঙ) ১৭৯৮। (চ) হাওড়া-জয়পুর/ঝিখিরা বাসে দামোদর সেতু পেরিয়ে, বেতাই/নারিট থেকে ভ্যানরিক্সা।

১৫১। (ক) **ভৈটা** (পালসিট-ভৈটা, গোস্বামীপাড়া), মেমারী, বর্ধমান। (খ) মদনগোপাল। (গ) বিগ্রহ ১৬ শতকে প্রতিষ্ঠা করেন শ্যামাদাস আচার্য যিনি হয়ত অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য ছিলেন। (ঘ) অতি বৃহৎ। ত্রিখিলান। সার্বিক উচ্চতা আনু. ৫০/৫৫ ফুট। নিরলংকার। (ঙ) ১৮ শতক? তবে বর্তমান মন্দিরটি হয়ত আদি মন্দিরটি বিনষ্ট হলে তার জায়গাতেই নির্মিত হয়েছে। (চ) বর্ধমান মেইন লাইনের পালসিট স্টেশন থেকে ভ্যানরিক্সায়।

১৫২। (ক) **দেনুড়,** মন্তেশ্বর, বর্ধমান। (খ) দীনেশ্বর (দেনুড়েশ্বর শিব) (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। (ঙ) **১৮ শতক।** (চ) বর্ধমান (তিনকোণিয়া) থেকে বাসে কুসুমগ্রামে এসে বাস পাল্টিয়ে। সরাসরি বাস না পেলে ঐ পথেই পুটশুড়িতে এসে নিজ ব্যবস্থায়। **প্রাসঙ্গিকী** : দেনুড় একদিকে চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু কেশব ভারতীর জন্মস্থান অন্যদিকে 'চৈতন্যভাগবত'— প্রণেতা বৃন্দাবনদাসের শ্রীপাট। গুরু নিত্যানন্দের আদেশেই নাকি বৃন্দাবন দাস দেনুড়ে শ্রীপাট স্থাপন করেন ও এখানে বসেই নাকি 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করেন। দেনুড়ের শ্রীপাটে চৈতন্যভাগবতের একখানি পুঁথি রক্ষিত আছে, তবে পুঁথিখানি বৃন্দাবনদাসের স্বহস্ত লিখিত কিনা জানা নেই। বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণীও তাঁর শেষ জীবন এই গ্রামে কাটিয়েছেন। এই ব্যাপারটিও উল্লেখ করার মতন যে দীর্ঘকালব্যাপী বৈষ্ণব কেন্দ্ররূপে বহুমান্য হলেও এখনও ঐ গ্রামে শৈব ও শাক্তরাই প্রবল।

১৫৩। (ক) **শ্যামসুন্দর,** রায়না, বর্ধমান। (খ) শ্যামসুন্দর। (গ) বিশালাক্ষ বসু।(ঘ) মাঝারি, ত্রিখিলান, টেরাকোটা। (চ) বর্ধমান (তিনকোণিয়া) থেকে বাসে সরাসরি।

১৫৪। (ক) **রায়না**, বর্ধমান। (খ) শ্রীধর। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা। (চ) বর্ধমান (তিনকোণিয়া) থেকে বাসে, সরাসরি।

১৫৫। (ক) **বৈঁচিগ্রাম** (কদমতলা-গোস্বামীপাড়া), পাণ্ডুয়া, হুগলী। (খ) রাধামাধব। (ঘ) নাতিবৃহৎ। চারচালা মুখমণ্ডপ। ত্রিখিলান। (চ) বর্ধমান মেইন লাইনের বৈঁচিগ্রাম স্টেশন থেকে রিক্সায়/হেঁটে।

১৫৬। (ক) **খড়দহ** (গোস্বামীপাড়া), উত্তর ২৪ পরগণা। (খ) শ্যামসুন্দর। (গ) পটেশ্বরী গোস্বামী। (ঘ) অতি বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৫০/৫২ ফুট)। ত্রিখিলান। সামনের নাটদালান ইত্যাদি পরে সংযোজিত। (চ) কলকাতার ধর্মতলা বা শ্যামবাজার থেকে খড়দহ, বারাকপুর প্রভৃতি বাসে খড়দহ থানা বা তার পরের সন্ধ্যা সিনেমা স্টপ থেকে রিক্সায়। **প্রাসঙ্গিকী** : ঐতিহ্য অনুসারে খড়দহের শ্যামসুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী যিনি

বীরচন্দ্রপ্রভু নামে অধিক পরিচিত। বিগ্রহটি পূজিত হত নিত্যানন্দের বসতবাটি বলে কথিত রাইকুঞ্জে—মন্দিরটি নির্মিত হলে বিগ্রহটি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্যামসুন্দরকে কেন্দ্র করে নিত্যানন্দের শ্রীপাট খড়দহে বেশ কটি মন্দির ও বৈষ্ণব-স্থাপত্য গড়ে উঠেছে—উত্তর দিক থেকে : (i) গঙ্গাতীরে বাবুঘাটে বিশ্বাসদের ২৬ (আটচালা) মন্দির, (ii) পি. কে. বিশ্বাস রোডে মহাপ্রভুর বিশাল নবরত্ন, (iii) গোপীনাথের দালান, (iv) রাইকুঞ্জে নিত্যানন্দের বসতবাটি বলে কথিত দালান, (v) বিপরীতে দোতলা নহবতের ডানে মদনমোহনের আটচালা, (vi) শ্যামসুন্দর, (vii) পিছনের গলিতে দুটি দালান মন্দির, (viii) দোলমঞ্চ, (ix) রাসমঞ্চ প্রভৃতি। হান্টার তাই তাঁর 'Statistical Accounts'-এ শ্যামসুন্দরকে বলেছেন "a source of considerable wealth", ১৯৬৭-তে বিড়লা ট্রাস্ট কর্তৃক সংস্কারে শ্যামসুন্দরের দেওয়ালে সিমেন্টের ও কাঁচা হাতে করা মূর্তিফলক বসানোয় গুরুতর রসভঙ্গ হয়েছে।

১৫৭। (ক) **কুমোরটুলি,** ২/৫ বনমালী সরকার স্ট্রীট, কলকাতা। (খ) বাণেশ্বর। (গ) বনমালী সরকার। (ঘ) অতিবৃহৎ। আনু. উচ্চতা ৫৫/৬০ ফুট। সংস্কারে টেরাকোটা প্রায় সম্পূর্ণ লুপ্ত।

১৫৮। (ক) **পাউনান,** পোলবা, হুগলী। (খ) টাটেশ্বরনাথ শিব। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) হাওড়া-ব্যাণ্ডেল লাইনের চুঁচুড়ার ঘড়িমোড় থেকে সরাসরি বাসে।

১৫৯। (ক) **চন্দননগর** (বারাশত, দশভূজাতলা), হুগলী। (খ) দশভূজা। (ঘ) অতি বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৪৫ ফুট)। ত্রিখিলান। টেরাকোটা কিছু অবশিষ্ট। সামনে বৃহৎ নাটদালান। (চ) চন্দননগরে হলেও হাওড়া-ব্যাণ্ডেল লাইনের ভদ্রেশ্বর বা মানকুণ্ডু স্টেশন থেকে রিক্সায় আসা সুবিধা। হাওড়া থেকে বাসে জি.টি. রোড ধরে এলে দশভূজাতলাতেই নেমে সামান্য হাঁটা।

১৬০। (ক) **হরিপাল** (ভট্টাচার্যপাড়া), হুগলী। (খ) আনন্দ। (ঘ) অতি বৃহৎ। উচ্চতা আনু. ৫০/৬০ ফুট। ত্রিখিলান। টেরাকোটা (দ্বারশীর্ষে)। সামনে টিনের চালের সুবৃহৎ নাট মণ্ডপ। রাস্তার বিপরীতে একটি ছোট আটচালা। (চ) প্রাগুক্ত হরিপাল থেকে রিক্সা।

১৬১। (ক) **পাতিহাল** (মণ্ডলা, মহেশতলা), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) কালীনাথজীউ। (গ) চক্রবর্তী পরিবার। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (চ) হাওড়া থেকে বাসে পাতিহাল হাটতলা। ভ্যানরিক্সা।

১৬২। (ক) **ব্রাহ্মণগ্রাম,** গড়বেতা, প. মেদিনীপুর। (খ) শ্যামচাঁদ। (গ) ঘটক পরিবার। (ঘ) মাকড়া পাথরে নির্মিত। ছোট। (চ) মেদিনীপুর শহর বা গড়বেতা থেকে বাসে ঝাড়বনী। হাঁটা।

১৬৩। (ক) **রসকুণ্ড,** গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) বসন্ত রায় (শিব)। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা লুপ্ত। (চ) গড়বেতা-চন্দ্রকোণা বাসে, সরাসরি।

১৬৪। (ক) **শ্রীধরপুর,** মেমারি, বর্ধমান। (খ) শ্রীধর। (গ) সরকার পরিবার। (ঘ) নাতিবৃহৎ। ত্রিখিলান। টেরাকোটা। (চ) বর্ধমান মেইন লাইনের মেমারি থেকে বাসে কমলপুর। ভ্যানরিক্সা।

১৬৫। (ক) **দাঁইহাট** (ভাউসিংপাড়া), কাটোয়া, বর্ধমান। (খ) শিব (পরিত্যক্ত)। (ঘ) মাঝারি। খিলানশীর্ষ ও দুপাশে উৎকৃষ্ট টেরাকোটা। (চ) হাওড়া-ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লোকালে দাঁইহাট স্টেশন। রিক্সা/ভ্যানরিক্সা।

১৬৬। (ক) **বড়বেলুন (বাণেশ্বরডাঙা)**, ভাতাড়, বর্ধমান। (খ) বাণেশ্বর শিব। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। একটি সুবৃহৎ পুকুরপাড়ে— ঢিবির উপরে। (চ) বর্ধমান (তিনকোণিয়া) থেকে সরাসরি বাসে। ভাতাড়, নাসিগ্রাম হয়েও আসা যায়। **প্রাসঙ্গিকী** : (i) প্রত্নক্ষেত্র 'বাণেশ্বর ঢিবি'র আকৃতি অনেকটা রুটি বেলার বেলনার মতন। তা থেকে 'বড়বেলুন' নামটি এসে থাকতে পারে—১৫ কি.মি. দূরে 'ছোট বেলুন' নামেও একটি গ্রাম আছে। বাণেশ্বর ঢিবিতে খনন চালিয়ে তাম্রাশ্ম যুগ থেকে পালযুগের শেষ পর্যন্ত সময়কালের অনেক প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। (ii) এমন মনে করার কারণ আছে যে, প্রাচীনতর এক আদি মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের ঢিবির উপরে বর্তমান মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে। (iii) বাণেশ্বরডাঙার বিভিন্ন মাপের ইট, ইটের স্থাপত্যাবশেষ, জলনিকাশী নালার মকরমুখ, ইট নির্মিত ভিৎ প্রভৃতি গুপ্তযুগের শেষদিক হতে পালযুগের শেষকাল পর্যন্ত কালের বিভিন্ন সময়ে নির্মিত মন্দির বা স্তূপের স্মারক বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এই প্রসঙ্গে বর্ধমান জেলারই ভরতপুরের 'পঞ্চরথ' বৌদ্ধ স্তূপের মতন এখানেও একটি স্তূপ থাকার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে।*

১৬৭। (ক) **কুমারপাড়া**, বর্ধমান শহর, বর্ধমান। (খ) শিব। (গ) রায় পরিবার। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (চ) শহর রিক্সা/অটো।

১৬৮। (ক) **যদুপুর**, জগৎবল্লভপুর হাওড়া। (খ) ধর্ম। (ঘ) বৃহৎ (আনু. উচ্চতা ৩৫/৩৬ ফুট)। দু-একটি টেরাকোটা পদ্ম ভিন্ন নিরলংকার। উচ্চ অধিষ্ঠান। সামনে। ডানপাশে টালির চালের বারান্দা-সহ পঞ্চাননের দালান, পিছনে বাঁশ-টালির চালের বারান্দাসহ কালীর অতি সাধারণ দালান। (চ) হাওড়া থেকে বাসে পাতিহাল, ভ্যানরিক্সা, গড়বালিয়া হয়ে।

১৬৯। (ক) **আসণ্ডা** (বেরাপাড়া), উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া। (খ) সীতারাম। (গ) বেরা পরিবার। (ঘ) মাঝারি। কয়েকটি টেরাকোটা পদ্ম। (ঙ) ১৭৬৪-৭০-এর মধ্যে হলধর বেরা কর্তৃক 'সখা' রামেশ্বর মিস্ত্রী দ্বারা সংস্কৃত। (চ) হরিপাল থেকে বাসে উদয়নারায়ণপুরে গিয়ে রিক্সা।

১৭০। (ক) **ঐ। শিবতলা**। (খ) বুড়ো শিব। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) ঐ।

১৭১। (ক) **সিমুলিয়া**, ভগবানপুর, পূর্ব মেদিনীপুর। (খ) ভীমেশ্বরী (দুর্গা)। (ঘ) অতি বৃহৎ। উচ্চতা আনু. ৫০ ফুট। বিপজ্জনকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের মেছেদা পটাশপুর (ভায়া ভগবানপুর) বাসে সরাসরি।

১৭২। (ক) **মেদিনীপুর শহর** (পাটনাবাজার), পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) মহাপ্রভু। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) শহর-রিক্সা।

১৭৩। (ক) **রাধাপুর**, শ্যামপুর, হাওড়া। (খ) শ্রীধর। (গ) সামন্ত পরিবার। (ঘ) মাঝারি। দরজার পাল্লাতে অপরূপ কাঠের কাজ। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বাগনান থেকে কমলপুরের বাসে সরাসরি।

---

* S. C. Mukherjee, 'Excavation at Banesvar Danga, District Barddhaman, West Bengal'—PRATNA SAMIKSHA', Directorate of Archaeology and Museums, govt of W. Bnegal, vol. 2 & 3, 1993-94, pp 80-143.

১৭৪। (ক) **চন্দ্রকোণা** (রঘুনাথবাড়ি), পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) লালজী। (ঘ) বৃহৎ। ত্রিখিলান। উচ্চতা, আনু. ৪০/৪২ ফুট। ঝামাপাথরে তৈরী। পঙ্খ সজ্জিত। চালের বন্ধনায় এক সারিতে পরপর আমলক ও কলস-সহ তিনটি স্তূপিকা। (চ) পাঁশকুড়া/ঘাটাল বা মেদিনীপুর টাউন থেকে বাসে চন্দ্রকোণা টাউন। চুক্তির রিক্সা।

১৭৫। (ক) **রামপুর** (উত্তরপাড়া), উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া। (খ) রসিক রায়। (গ) ত্রিলোকরাম চক্রবর্তী। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) ক্রম ১২৮।

১৭৬। (ক) **বালসি** (স্থানীয় উচ্চারণে বালসে, পূবপাড়া), পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া। (খ) শিব। (গ) বরাট (মোদক) পরিবার। (ঘ) মাঝারি। দ্বারশীর্ষে টেরাকোটা। বর্ধমান (তিনকোণিয়া) থেকে পাত্রসায়ের হয়ে বিষ্ণুপুরে যাচ্ছে এমন বাসে বালসে মোড়। হাঁটা।

১৭৭। (ক) **ঐ**। (বাজারপাড়া)। (খ) পরিত্যক্ত। (গ) চন্দ পরিবার। (ঘ) প্রায় বিনষ্ট। সামান্য টেরাকোটা অবশিষ্ট। (চ) ঐ।

১৭৮। (ক) **ডেঙ্গালন**, ইঁদাস, বাঁকুড়া। (খ) রাধাবল্লভ। (গ) রায় পরিবার। (ঘ) নাতিবৃহৎ। ত্রিখিলান। ভিৎ, থাম ও দেওয়ালের কিছু অংশ মাকড়া পাথরে নির্মিত। (চ) বর্ধমান (তিনকোণিয়া) থেকে বাসে ইঁদাস। নিজ ব্যবস্থা।

১৭৯। (ক) **তারকেশ্বর**, হুগলী। (খ) তারকনাথ শিব। (গ) গোবর্ধন রক্ষিত (পাতুল-সন্ধিপুর)—বর্তমান মন্দির। (ঘ) মাঝারি। সাধারণ। অতি বহুল সংস্কৃত। (ঙ) ১৮ শতকের শেষে। বর্তমান মন্দির। (চ) হাওড়া থেকে ট্রেনে। স্টেশনের লাগোয়া। বাসও আসছে চতুর্দিক থেকে। **প্রাসঙ্গিকী** : (i) তারকেশ্বর পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে ব্যস্ত শৈব তীর্থ। প্রতি বৎসর শ্রাবণ ও চৈত্র মাসে এখানে বহু লক্ষ তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। এখানকার গাজন ও মেলাও বিখ্যাত। বৎসরের অন্যান্য মাসে তীর্থযাত্রীর স্রোত কম হলেও অব্যাহত থাকে। শেওড়াফুলি-বৈদ্যবাটির নিমাই-তীর্থ ঘাট থেকে গঙ্গার জল সংগ্রহ করে বাঁকে করে নিয়ে হেঁটে তারকেশ্বরে গিয়ে তারকনাথ শিবের মাথায় ঢালেন বৎসরে কয়েক লক্ষ ভক্ত। (ii) তারকনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠার আগেই প্রধানত রোগব্যাধি থেকে মুক্তির আশায় বহু মানুষ এখানে ধর্না দিতে আসতেন। (iii) বাংলার আরও কয়েকটি শৈব ক্ষেত্রের মত এখানেও জঙ্গলে গাভীর শিবলিঙ্গের উপরে আপনা হতেই দুধ দেওয়া ও তা দেখে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ শিব আবিষ্কৃত হওয়ার মীথ চালু আছে—অনেকেই মনে করেন বিশেষত রাঢবঙ্গে গোপজাতির প্রাধান্যের ইঙ্গিতই এই মীথ থেকে মেলে। (iv) ১৮৯৬-এর "List of Ancient Monuments"-এ* বলা হয়েছে যে পুরাতন মন্দিরটি বিনষ্ট হলে বর্ধমানের রাজার খরচে তখন যে মন্দিরটি দাঁড়িয়ে ছিল, সেটি নির্মিত হয়েছিল।

* "As time went on the temple fell into decay and over it the present one was built at the expense of Burdwan Raja". —সুধীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রাগুক্ত 'হুগলী জেলার দেবদেউল' পৃ. ৬২-তে উদ্ধৃত।

বর্তমান মন্দিরটি হল তৃতীয় মন্দির যেটি ১৮ শতকের শেষদিকে বর্ধমান-রাজ-নির্মিত মন্দিরের উপরে নির্মাণ করে দেন শিয়াখালার নিকটবর্তী পাতুল-সন্ধিপুরের গোবর্ধন রক্ষিত। ১৮০১-এ নাটমন্দিরটি নির্মাণ করেন হাওড়ার চিন্তামণি দে। (v) এক সময়ে মন্দিরটিতে টেরাকোটা-সজ্জা ছিল, এখন সংস্কারের প্রলেপে তার প্রায় সবটাই ঢাকা পড়েছে, পরন্তু স্থূল সংস্কারে এখন মন্দিরটির আদি রূপ বোঝা একরকম অসম্ভব। (vi) তারকেশ্বর শৈব দশনামী সম্প্রদায়ের মঠ এবং অবাঙালী এই সম্প্রদয়ের সঙ্গে বাংলা বা বাংলা-সংস্কৃতির সঙ্গে কোন যোগ নেই। শঙ্করাচার্যের চারজন প্রত্যক্ষ শিষ্যের দশজন শিষ্য হতে দশটি নামের স্বতন্ত্র সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। এঁরা মঠধারী বৈদিক সন্ন্যাসী এবং তান্ত্রিক নন। ১৯২০-এর নভেম্বরে হুগলী জেলা-আদালত এই মর্মে একটি বিখ্যাত রায় দেন, এবং ঐ রায়েই নানা অকাট্য প্রমাণ বলে বলা হয় যে তারকেশ্বর-মঠের সন্ন্যাসীরা সবাই অবাঙালী ব্রাহ্মণ, তাঁরা বৈদিক সন্ন্যাসী, তান্ত্রিক নন, এবং তারকেশ্বরের মঠকে বাহিরগড়ের রাজপুত ছত্রী রাজা ভারামল্ল কর্তৃক ভূমিদানের বছরটি হল ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দ।"* —অতএব তারকেশ্বরের মঠ প্রতিষ্ঠা ১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দের আগে হয়নি—কিন্তু আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে তারকেশ্বরের ঐতিহ্য এর অনেক পূর্ববর্তী। (vii) অষ্টাদশ শতকীয় বাংলায় যে রাষ্ট্রবিপ্লব চলছিল, তার সুযোগে যেমন আসে মারাঠা বর্গী দস্যুরা, তেমনই আসে নানা ভাগ্যান্বেষী ও সন্ন্যাসী ফকির লুঠেরা ('Sannyası Faqir Raiders)-র দল। তারকেশ্বরের দশনামী সন্ন্যাসীরা এইভাবেই এসেছিলেন এবং তাঁরা হুগলীকে বেছে নিয়েছিলেন কারণ এই জেলার চন্দননগর, চুঁচুড়া ও হুগলী তখন রাষ্ট্রবিপ্লবের কেন্দ্র ছিল। লক্ষণীয় বিপুল ভূমিদান করে মঠ প্রতিষ্ঠায় এঁদের সাহায্য করেছিলেন যাঁরা সেই বাহিরগড়ের রাজারাও ছিলেন এদেশে আসা ভাগ্যান্বেষী ছত্রী রাজপুত। (viii) দশনামী সম্প্রদায় তারকেশ্বর মঠকে কেন্দ্র করে গুপ্তিপাড়া, নয়নগড়, ভোটবাগান, বৈদ্যবাটি, গড়ভবানীপুর, সন্তোষপুর এবং চাঁইপাটে শৈব মঠ গড়ে তোলেন। মঠের প্রধান বা মোহান্তগণ অতি বিশাল ভূসম্পত্তিভোগী জমিদার হয়ে ওঠেন ও শ্রীমন্তগিরি বা মাধবগিরির মতন মোহান্তরা লম্পট জমিদারদের মতই দুশ্চরিত্র ছিলেন (বনকাটি-অযোধ্যার পঞ্চরত্নেব গায়ে নবীন-এলোকেশীর টেরাকোটা ফলক প্রসঙ্গে বিষয়টি আলোচিত হয়ছে)। (ix) গাজন, চণ্ডী বা কালিকা পূজা (তারকেশ্বরের অন্নপূর্ণা ও কালিকা মন্দিরও আছে) লৌকিক আচার, ধর্ম-ঠাকুরের প্রভাবও এতে আছে—কিন্তু এগুলি একেবারেই বৈদিক আচার-সম্মত নয়। বৈদিক সন্ন্যাসী হয়েও তারকেশ্বরের মোহান্তরা ঐসব অবৈদিক অনুষ্ঠান বন্ধ করার কোনোরকম চেষ্টাই করেননি, কারণ তাঁদের সময়ের অনেক আগে হতেই তারকেশ্বরে রাঢ়বঙ্গে অতীব লোকপ্রিয় এইসব আচারগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল---গণবিদ্রোহের ভয়েই মোহান্তরা এগুলিতে হাত দেননি। (x) আদালতের রায়ে তারকেশ্বরের মঠ এখন জনগণের সম্পত্তি, মোহান্তদের ক্ষমতা অনেকাংশে খর্ব হয়েছে, মঠ-পরিচালনায় জনপ্রতিনিধি ও সরকারী প্রতিনিধিদের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

১৮০। (ক) **খাড়ি** (মাইবিবির বাজার, কাশীনগর), মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। (খ) শিব।

---

* পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি— ২' পৃ. ৩৬৯, ৩৭০ ও ৩৭২

(ঘ) ছোট। নিরলংকার। (ঙ) **১৮/১৯ শতক।** (চ) শিয়ালদহ (দক্ষিণ) থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর/কাকদ্বীপ লোকালে মথুরাপুর। অটোতে কাশীনগর। হেঁটে।

[মোটামুটি একই সময়কালে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় প্রতিষ্ঠিত আরও কটি আটচালা মন্দিরের মধ্যে আছে—**দক্ষিণ ভাদুড়া** (ডায়মণ্ড হারবার), **বনসুন্দরিয়া** ও **হাসুড়ি** (মগরাহাট), **গোবিন্দপুর** (বিষ্ণুপুর), **রাজারামপুর** (বজবজ) প্রভৃতি]

১৮১। (ক) **পাকরি,** মগরা, হুগলী। (খ) শিব। (গ) হালদার পরিবার। (ঘ) মাঝারি, ঈষৎ টেরাকোটা। (চ) মগরা থেকে বাসে।

১৮২। (ক) **জগৎবল্লভপুর** (ষষ্ঠীতলা), হাওড়া। (খ) মহেন্দ্রেশ্বর শিব। (ঘ) মাঝারি। সামান্য টেরাকোটা। (ঙ) ১৮০২। (চ) ক্রম ৬৩। বিপরীত দিকের পথে।

১৮৩। (ক) **রামজীবনপুর** (পুরাতন হাট), চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) পার্শ্বনাথ। (গ) প্রামাণিক পরিবার? (ঘ) বৃহৎ। ত্রিখিলান। নিরলংকার। (ঙ) ১৮০২। (চ) পাঁশকুড়া/ঘাটাল থেকে বাসে, ক্ষীরপাই হয়ে। ভ্যানরিক্সা।

১৮৪। (ক) **নন্দীগ্রাম,** পূর্ব মেদিনীপুর। (খ) জানকীনাথ। (গ) মহিষাদলের রাণী জানকী। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা, আনু. ৪০/৪২ ফুট। ত্রিখিলান। নিরলংকার। (ঙ) ১৮০৩। (চ) পাঁশকুড়া/মহিষাদল থেকে বাসে তেরপেখিয়া—নদী পার হয়ে আবার বাসে।

১৮৫। (ক) **দেরবেড়িয়া,** জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। (খ) রাজরাজেশ্বর। (গ) রামচন্দ্র দেব। (ঘ) বৃহৎ (আনু. উচ্চতা ৪০ ফুট)। জীর্ণ। ত্রিখিলান। টেরাকোটা পদ্ম। (ঙ) ১৮০৫। (চ) শিয়ালদহ (দক্ষিণ) থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর/কাকদ্বীপ লোকালে জয়নগর-মজিলপুর স্টেশন—দেড়বেড়িয়া মজিলপুরের প্রান্তে—অনতিদূরে দত্তদের জোড়া আটচালা, দোলমঞ্চ ও গোপালের দালান। বিক্সায়।

১৮৬। (ক) **টালিগঞ্জ** (স্টুডিওপাড়া), মহেন্দ্র সেন লেন। কলকাতা। (খ) বিষ্ণুরামেশ্বর শিব। (গ) বাবুরাম ঘোষ। (ঘ) অতিবৃহৎ। উচ্চতা আনু. ৬০/৭০ ফুট। ত্রিখিলান। সামান্য পঙ্খ ও টেরাকোটা অবশিষ্ট। (ঙ) ১৮০৭।

১৮৭। (ক) **মাজুক্ষেত্র** (কুমোরপাড়া), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) শিব। (গ) চক্রবর্তী পরিবার। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (ঙ) ১৮০৮। (চ) হাওড়া-মাজু সরাসরি বাসে।

১৮৮। (ক) **কালীঘাট,** ৯, ভগবতী লেন, কলকাতা-২৬। (খ) কালী। (গ) সন্তোষ রায়, সাবর্ণ চৌধুরী পরিবার, বড়িশা (বর্তমান মন্দির)। (ঘ) অতিবৃহৎ। উচ্চতা আনু. ৬০ ফুট। বহুল সংস্কৃত। সামনে মুখমণ্ডপ ইত্যাদি সংযোজিত। (ঙ) ১৮০৯। **প্রাসঙ্গিকী** : (i) কিংবদন্তি অনুসারে প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় কালীঘাটের মন্দিরটি প্রথমে নির্মাণ করেন। সেই মন্দির বিনষ্ট হলে তার জায়গায় নাকি বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়। (ii) কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'দিগ্‌দেবতাবন্দনা'-য় লিখেছেন : "কালিঘাটে সিদ্ধপীঠ বন্দহুঁ কালিকা/সহিতে বন্দিনু মা-এর অষ্টনায়িকা।।"[১] আবার ঐ কাব্যেরই 'বণিককাণ্ডে' ধনপতির সিংহলযাত্রা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : "ঘন কেরুয়াল পড়ে জলে লাগে সাট। বামভাগে রহে পুরী নাম কালীঘাট।।[২] মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' ষোড়শ শতকের শেষ দিকে রচিত— দেখা

১/২ : প্রাগুক্ত 'চণ্ডীমঙ্গল' পৃ. ৫ এবং ১৯৭

যাচ্ছে কালীঘাট তখনই সিদ্ধপীঠরূপে বিখ্যাত। (iii) কালীঘাট 'সতীপীঠ' রূপেও স্বীকৃত —কোনো কোনো পীঠগ্রন্থ অনুসারে এখানে সতীর বাঁ পায়ের আঙুল পড়েছিল আবার কোনো কোনোটির মতে এখানে তাঁর বাঁ হাতের আঙুল পড়েছিল। (iv) অন্যান্য পীঠের মত কালীঘাট সম্বন্ধেও বেশ কিছু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। দেবীর ভৈরব নকুলেশ্বর শিবের আবিষ্কারের পিছনেও লিঙ্গ রূপী পাথরের উপর গাভীর আপনা থেকে দুধ দেওয়ার গল্পও চালু আছে।

(v) কালীঘাটের পট

কালীঘাটের মন্দিরের শ্রেষ্ঠ অবদান হল কালীঘাটের পট, অনন্য শিল্পকর্মরূপে এর কদর এখন সমগ্র শিল্প জগৎ জুড়ে। 'পট' হল "লেখনার্থ বা চিত্রীকরণার্থ কার্পাসিক বস্ত্র।"[৩] একারণে শিল্পীগণ 'পট' লেখেন, আঁকেন না। যাঁরা 'পট' লেখেন তাঁরা 'পটুয়া'। বাংলার পট দু'রকম : চৌকা একচিত্র এবং সারবন্দী করে আঁকা 'দীঘল' বা 'জড়ানো পট'— তবে কাপড়ের দাম বেশি হওয়ায় পরে কাগজই ব্যবহৃত হত। কালীঘাটের পট একচিত্রী ও কাগজে আঁকা হত। কালীঘাটের মন্দিরকে কেন্দ্র করে ক্রমে এখানে একটা বাজারের মত কিছু গড়ে উঠলে গ্রাম থেকে ধীরে ধীরে পটুয়ারা এখানে স্থায়ীভাবে ঠিকানা গড়তে আসা শুরু করেন, কিন্তু কোন সময় থেকে বলা শক্ত—হয়ত ষোড়শ-সপ্তদশ শতক থেকে। এঁদের লক্ষ ছিলেন গ্রাম থেকে আসা তীর্থযাত্রীগণ। কিন্তু এর প্রথম যুগে চৌরঙ্গি ও ভবানীপুরের অধিকাংশই ছিল জঙ্গ লাকীর্ণ, চোর ও ডাকাত-সঙ্কুল, বন্যজন্তুর ভয়ও ছিল। তীর্থযাত্রীরা আসতেন দল বেঁধে এবং এঁরাই ছিলেন কালীঘাটের পটের আদি পৃষ্ঠপোষক। তাঁরা তীর্থ ভ্রমণের স্মারক হিসেবে পট সংগ্রহ করতেন যেমন এখনও ঘটে ভারতের প্রত্যেক তীর্থস্থানে।

প্রথম প্রশ্ন পটুয়াগণ এসেছিলেন কোথা হতে? সঠিক উত্তর জানা নেই—সম্ভবত ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলা হতে। দ্বিতীয় প্রশ্ন পটুয়াদের পূর্ণ বিকাশের সময়কাল কি? এটিও বলা শক্ত, তবে কলাকাতা-মিউজিয়ামের সংগৃহীত পটগুলির প্রায় সবই সংগ্রহ করা হয়েছিল ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে—মনে হয় তার আগের তিরিশ-চল্লিশ বছর ছিল এর পূর্ণ বিকাশের কাল। অতএব ভাবা চলে যে ১৮০৯-এ কালীঘাটের বর্তমান মন্দির নির্মাণের পরে ধীরে ধীরে পটশিল্পটি পূর্ণ বিকাশের দিকে যাত্রা শুরু করে ১৮৪০/৫০-এর দশক থেকে শীর্ষে পৌঁছানো শুরু করে। এটি শহর কলকাতারও বিকাশের যুগ, ফলে কালীঘাটে তীর্থযাত্রীর সংখ্যাও ছিল ক্রমবর্ধমান। ১৯৩০-এর পরে পটশিল্প কার্যত লুপ্ত হয়ে যায়।—কিন্তু প্রথমাবধি এইভাবে ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে বেড়ে ওঠায় প্রথম থেকেই কালীঘাটের পট শাস্ত্রীয় বিধি বিধান মুক্ত ছিল। পটুয়াদের আঁকা দেবদেবীর পট মূর্তিতত্ত্ববিদ্যানুসারী নয়, তাঁরা সামাজিক পটচিত্র বা জন্তু-জানোয়ারের ছবিও এঁকেছেন স্বাধীনভাবে, বিধি-বিধানকে গ্রাহ্য না করে। তাঁদের পদ্ধতিটি তাহলে কি? জমিতে রঙের আস্তরহীন (unprimed) সস্তা কাগজে প্রায় ঝড়ের গতিতে প্রচণ্ড বলশালী একটি মাত্র টানে বিষয়টিকে আঁকা—এই তুলির টান এতটাই দ্বিধাহীন ও এতটাই আত্মপ্রত্যয়ী যে দর্শক বুঝবেনই না যে ঠিক কোথায় শিল্পী তুলির প্রথম ছোঁয়াটি

৩। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য আকাদেমি ২০০১ মুদ্রণ, পৃ. ১২৫৫।

দিয়েছিলেন।[১] বাংলার লোকায়ত ঐতিহ্য পটুয়াদের চিত্রভাবনার উৎস ছিল বলেই এমনটি সম্ভব হয়েছিল। এখানেই বাংলার মন্দির টেরাকোটার সাথে কালীঘাটের পটের মিল। মন্দির টেরাকোটায়, বা বাংলার মাটির পুতুল বা মূর্তিতে, যেমন ঘন 'Mass' তৈরী করা হত কালীঘাটের পটেও তেমন। চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত হল নিবারণ চন্দ্র ঘোষের আঁকা একটি গোলাপ সুন্দরীর ছবি যেখানে পিছনের তাকিয়া-সহ তাঁর সমগ্র দেহটি একটি ঘন 'Mass' হয়ে উঠেছে। তুলির কয়েকটি মাত্র সমান্তরাল আঁচড়ে ঘাসের মাঠ, পথ বা ঘরের পর্দা দেখিয়ে বিষয়টিকে ধরা আরেকটি বৈশিষ্ট্য—এটি ১৬৮৯-৯০-এ ভাগবত পুরাণের একটি পুঁথির অলংকরণে ও ১৮ শতকে 'রামচরিত-মানসে'র আরেকটি পুঁথির অলংকরণেও দেখা গেছে, এতে বোঝা যায় সে কালীঘাটের পটুয়াগণ বাংলার ঐতিহ্যের শক্তিতেই শক্তিমান ছিলেন।[২] দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর থানার বহড়ুতে ১৮২১-এর নির্মিত শ্যামসুন্দর মন্দিরগাত্রের চিত্রকলা অনেকাংশে কালীঘাটের পটের পূর্বগ।[৩]

বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে কালীঘাটের পটের সঙ্গে বাংলার মন্দির-টেরাকোটার যোগ একেবারে প্রত্যক্ষ। বাংলার মন্দির টেরাকোটায় দেবদেবী, পশুপাখী (যেমন, হুগলীর গুড়াপের নন্দদুলাল), সাহেব-মেম (যেমন, বীরভূমের হেতমপুরের চন্দ্রনাথ শিব বা সুপুরের আটকোণা দেউল) ও সামাজিক জীবনের (যেমন, বীরভূমের গণপুরের প্রথম চারচালাগুচ্ছ যেটি আসলে ফুলপাথরে টেরাকোটার সমধর্মী কাজ বা হাওড়ার কল্যানপুরের বিনষ্ট নবরত্ন) দৃষ্টান্ত প্রচুর। অনেকে সামাজিক ও সাহেব-মেম পটগুলির জন্য পটুয়াদের উপর ইওরোপীয় প্রভাবের কথা বলেছেন কিন্তু পটুয়াদের তা দরকার হয়নি, তাছাড়া তাঁদের একজনও ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি করতেন না। অনেকে পটুয়াদের প্রথম দিকের অস্বচ্ছ রঙ ছেড়ে পরে স্বচ্ছ রঙ ব্যবহারের মধ্যে ইওরোপীয় প্রভাব দেখতে পেয়েছেন—খরচ কম হওয়ায় পটুয়ারা পরবর্তীকালে তা করেছেন ঠিকই, কিন্তু একটি দৃষ্টান্তেও তা ইওরোপীয় কায়দায় করেননি, করেছেন একেবারে নিজস্ব ঢঙে। কালীঘাটের পট হল একশো ভাগ খাঁটী বাঙালি শিল্প। যাই হোক, ইতোমধ্যেই যেমন দেখা গেছে, কালীঘাটের পট ছিল ক্রেতাদের রুচি ও চাহিদা অনুসারী বিমুক্ত ও লৌকিক 'Public Art', কাজেই খুব সহজেই সাহেব-মেম, ফিটন গাড়ী, ঘোড়দৌড়, বাবু-কালচার, বাববিলাসিনী, স্ত্রৈণ পুরুষ, নারী শিক্ষার কুফল, বাঈজী, ধর্মীয় ভণ্ডামী, নবীন-এলোকেশী, মাধবাগিরি-এলোকেশী প্রভৃতি থেকে জোড়াপায়ড়া, হাতে ধরা গলদাচিংড়ির গুচ্ছ, কপালে বোষ্টম তিলক আর মুখে গলদাচিংড়ি ধরা বিড়ালতপস্বী প্রভৃতি অজস্র বিষয় সম্পদে সমৃদ্ধ হতে পেরেছে কালীঘাটের পট।

নীলমণি দাস, বলরাম দাস, গোপাল দাস, কালীচরণ ঘোষ, নিবারণ ঘোষ প্রমুখ পটুয়াদের কেউই সাধারণ শিল্পী ছিলেন না এবং এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গুণে অসাধারণ ছিলেন। কালীঘাটের পটে সরল, অনাড়ম্বর অথচ বলিষ্ঠ এবং গতিশীল একটি অত্যাশ্চর্য ফর্ম আছে—

১। B. N. Mukherjee, 'Kalighat Patas', Second Edition, Indian Museum, Calcutta, 1998, p.4

২। ঐ, p. 6.

৩। ঐ, p. 7

এই সম্পূর্ণ দেশজ ব্যাপারটিই এখন শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও আদর ও সম্ভ্রম আদায় করেছে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, কালীঘাটের পট যখন উৎকর্ষের শীর্ষে তখন এদেশের শিল্পী ও বিদ্যাসমাজে তা নিকৃষ্ট শিল্পকাজরূপে উপেক্ষিত হয়েছে—এমনকি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতন যাঁরা দেশীয় ঐতিহ্যের মধ্য হতে নিজেদের প্রকাশ করার চেষ্টা করছিলেন, তাঁরাও এই অতি মূল্যবান উৎসের দিকে তাকাননি।

একটি মন্দিরকে কেন্দ্র করেই শুধু অমন একটি বিস্ময়কর শিল্পধারা সৃষ্ট ও বিকশিত হতে পেরেছিল—অন্য কোনোভাবে নয়—এই তথ্যটির ঐতিহাসিক মূল্য বিপুল।

১৮৯। (ক) **গোপালনগর** (পশ্চিমপাড়া), পাঁশকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শিব। (ঘ) নাতিবৃহৎ। ত্রিখিলান। টেরাকোটা। (ঙ) ১৮১০। (চ) কোলাঘাট (হাওড়া-খড়গপুর লাইন) থেকে যশাড়ের বাসে। সরাসরি।

১৯০। (ক) **রাউতাড়া** (ঘরদুবরা), আমতা, হাওড়া।.(খ) শিব/কালী। (গ) পণ্ডিত পরিবার। (ঘ) মাঝারি। সংস্কৃত। সংস্কারে টেরাকোটা লুপ্ত। (ঙ) ১৮১০। (চ) ক্রম ৩৯। কেরাণি-বাটি ও ঘোষপাড়ার মাঝে।

১৯১ (ক) **গুপ্তিপাড়া** (মঠবাড়ি), হুগলি। (খ) বৃন্দাবনচন্দ্র। (গ) নয়নচাঁদ মল্লিক। (ঘ) অতি বৃহৎ (উচ্চতা আণু. ৬০ ফুট)। ত্রিখিলান। প্রতিটি খিলান শিবমন্দিরের টেরাকোটা অনুকৃতি শোভিত। নীচ থেকে উপরে খিলান-পাশের প্রতি খোপে টেরাকোটা পদ্ম। ভিতরের বারান্দা ও গর্ভগৃহের দেওয়ালে রঙীন চিত্র। (ঙ) ১৮১০। (চ) ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইনের গুপ্তিপাড়া স্টেশন থেকে রিক্সা।

১৯২। (ক) **রামজীবনপুর** (নতুনহাট, বুড়োশিবতলা), চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) বুড়োশিব। (ঘ) ছোট নিরলংকার। (ঙ) **১৯ শতকের প্রথম দশক।** (চ) ক্রম ১৮৩।

১৯৩। (ক) **খড়কুসুমা,** গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) ধর্ম। (গ) পণ্ডিত পরিবার। (ঘ) মাঝারি। পঙ্খ ও কাঠের কাজ। (চ) মেদিনীপুর শহর থেকে বাসে গড়বেতা। ট্রেকার।

১৯৪। (ক) **ডিহিগুমাই,** মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর। (খ) দক্ষিণেশ্বর শিব। (ঘ) মাঝারি। সংস্কারে অলংকরণ লুপ্ত। (চ) মেছেদা থেকে বাসে নন্দকুমার। ভ্যানরিক্সা।

১৯৫। (ক) **বাখরপুর** (আধকাটা) পরশুড়া, হুগলী। (খ) শিব-পরিত্যক্ত। (গ) ভট্টাচার্য পরিবার। (ঘ) বৃহৎ (আনু. উচ্চতা ৩০ ফুট)। ত্রিখিলান। টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। (চ) তারকেশ্বর থেকে অমরপুর-খুশীগঞ্জ বাসে/ট্রেকারে ভাঙ্গামোড়া স্কুল স্টপ। সামান্য হাঁটা।

১৯৬। (ক) **মহানাদ** (চৌমাথা), পোলবা, হুগলী। (খ) অগ্নীশ্বর শিব। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) চুঁচুড়া বা পাণ্ডুয়া থেকে বাসে। বাসস্ট্যাণ্ড ঘেষে।

১৯৭। (ক) ঐ। (খ) গোটেশ্বর শিব। (ক) কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) ঐ। অনতিদূরে।

১৯৮। (ক) **কানাইপুর,** বাগনান, হাওড়া। (খ) বিশ্বেশ্বর শিব। (গ) চট্টোপাধ্যায় পরিবার। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বাগনান থেকে শিবগঞ্জগামী বাসে বাঁটুল। ভ্যানরিক্সা।

১৯৯। (ক) **নিজবালিয়া** (ব্রাহ্মণপাড়া), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) শিব। (গ) ভট্টাচার্য পরিবার। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা। (চ) হাওড়া থেকে বাসে পাতিহাল হাটতলা। ভ্যানরিক্সা।

২০০। (ক) **সাহাড়া,** বাগনান, হাওড়া। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) বাগনান থেকে শ্যামপুর-কমলপুর বাসে সরাসরি।

২০১। (ক) **মানসিংপুর** (পণ্ডিতপাড়া), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) ধর্ম। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (ঙ) ১৮১২। (চ) হাওড়া-মুনশীরহাট ইত্যাদি বাসে বড়গাছিয়া ধর্মতলা—ভ্যানরিক্সা।

২০২। (ক) **ভাণ্ডারহাটি** (চৌধুরীপাড়া), ধনিয়াখালি, হুগলী। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা। (ঙ) ১৮১৩। (চ) হরিপাল থেকে ট্রেকারে/বাসে।

২০৩। (ক) **বাখরাহাট** (কাচবাগান, আমতলা), বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। (খ) রাধাবল্লভ। (গ) কৃষ্ণচন্দ্র মণ্ডল—বাওয়ালির মণ্ডল-জমিদারদের জ্ঞাতি। (ঘ) অতিবৃহৎ। উচ্চতা আনু. ৭০/৮০ ফুট। ত্রিখিলান। নিরলংকার। (ঙ) ১৮১৩। (চ) কলকাতা থেকে ৭৬, ৮৩, ৮৩এ এসডি-১৮, এসডি-১০ প্রভৃতি প্রাইভেট বাসে—বা, ধর্মতলা থেকে কাকদ্বীপ, নামখানা, বকখালি, ডায়মণ্ড হারবার, ফলতা, রায়চক, নূরপুর প্রভৃতি এক্সপ্রেস বাসে সরাসরি বিষ্ণুপুর আমতলা স্টপেজ। সহজে।

২০৪। (ক) **চাঁইপাট,** দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শিব। (ঘ) ছোট নিরলংকার। (ঙ) ১৮১৩। (চ) ক্রম ১৫।

২০৫। (ক) **জাড়া** (ময়নাপুকুর), চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) গঙ্গাধর শিব। (গ) রায় পরিবার। (ঘ) মাঝারি। জীর্ণ। (ঙ) ১৮১৪। (চ) ঘাটাল বা চন্দ্রকোণা থেকে ক্ষীরপাই। এখান থেকে রামজীবনপুর বাসে সরাসরি।

২০৬। (ক) **দাসপুর** (পেরালপাড়া), পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) দক্ষিণা কালী। (গ) চক্রবর্তী পরিবার। (ঘ) মাঝারি। সামান্য পঙ্খ। (ঙ) ১৮১৬। (চ) পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে। চুক্তির রিক্সায়।

২০৭। (ক) **তারাপুর (তারাপীঠ), ময়ূরেশ্বর,** বীরভূম। (খ) তারা। (গ) জগন্নাথ রায় (বর্তমান মন্দির)। (ঘ) নাতিবৃহৎ। আনু. উচ্চতা ৩০/৩৫ ফুট। নীচের বৃহৎ চারচালার তুলনায় পরের চারচালাটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ। ম্যাকাচিয়নের শ্রেণিকরণ অনুসারে "Tiny Towered 'Birbhum' Type"[১]। ফুলপাথরের অসাধারণ কাজ উগ্র আধুনিক সংস্কারের প্রলেপে আচ্ছন্ন। (ঘ) ১৮১৮ (বর্তমান মন্দির)। (চ) রামপুরহাট থেকে বাস/অটো/ট্রেকার/রিক্সা। **প্রাসঙ্গীকী** : (i) কিংবদন্তি অনুসারে তারপীঠের তারা-মন্দির প্রথম নির্মাণ করান জয়দত্ত নামে একজন বণিক। দ্বারকা নদের বন্যায় সেই মন্দির বিনষ্ট হলে দ্বিতীয় মন্দির নির্মাণ করান ঢেকার রাজা রামজীবন। দ্বারকার ধ্বসে এটিও বিলীন হলে নিকটবর্তী মল্লারপুরের ব্যবসায়ী জগন্নাথ রায় বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করান। (ii) ম্যাকাচিয়ন এর স্থাপত্যকে ক্ষুদ্রচূড় বীরভূম-রীতি বলেছেন—

১। প্রাগুক্ত 'Late Mediaeval....', p. 40

কিন্তু সমগ্র বীরভূমেই অনুরূপ দৃষ্টান্ত শুধু নিকটবর্তী বীরচন্দ্রপুরের বাঁকা রায় এবং লাভপুরের ফুল্লরা-ক্ষেত্রের শিব মন্দির। একে 'রীতি' না বলে ব্যতিক্রম বলাই বেশি যুক্তিযুক্ত। (iii) তারাপীঠের তারা-মন্দির গাত্রের ফুল-পাথরের কাজ অসাধারণ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, অশ্বত্থামা হত, ভীষ্মের শরশয্যা মহিষাসুরমর্দিনী প্রভৃতি প্যানেলগুলি বিস্ময়কর। মহান কলা-আলোচক কমলকুমার মজুমদার এপ্রসঙ্গে যা লিখেছেন তা এখানে স্মরণযোগ্য—"এখানকার কাজ সম্পূর্ণ (নতুন) রীতির। মহাভারতের কথা মন্দিরগাত্রে খুবই কম। সমস্ত ঘটনাটিতে কত ছাড়াছাড়া ভাব—তবুও সামঞ্জস্য কোথাও হারায়নি। এ কৃষ্ণ এক—অভিনব কল্পনা। এমন লম্বাটে অবয়ব আর কোথাও নেই। বাঙলার দৈনন্দিন জীবনের ছবি অনেক আছে—এখানেও আছে।"[২] এবং, *"তারপীঠ ব্যতীত কৃষ্ণরাধা প্রতিমার প্রায় সর্বত্রই এক ধরণের আভঙ্গ, দ্বিভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ ; রাধার ভাব অসম্ভব বঙ্কিম। তারাপীঠের কৃষ্ণ, রাধা গোপিনীরা সকলেই বিস্ময়করভাবে দীর্ঘ। দেখিলে মনে হয় ইদানীকালের-রাধা ও গোপীবৃন্দের অঙ্গাভরণ সমস্তই এক নতুনভাবে পরিকল্পিত।"[৩] —সংস্কারের নামে ঐ অমূল্যধনের উপর মোটা প্রলেপ পড়েছে। (iii) বাংলার তন্ত্র-সাধনার সম্ভবত শেষ বৃহৎ কেন্দ্র হল তারাপীঠ। প্রাচীন ও প্রামাণ্য তন্ত্রগ্রন্থগুলিতে তারপীঠের নাম নেই, আছে 'শিবচরিতে' কিন্তু গ্রন্থটি অর্বাচীন। তবে, বিভিন্ন প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থে আছে যে বশিষ্ঠ চীনদেশে গিয়ে চীনাচার শিক্ষার পরে বুদ্ধের আদেশে তারপীঠে এসে উগ্রতারার সাধনা করে সিদ্ধ হন—এই মীথের আড়ালে আছে দুটি ঐতিহাসিক সত্য . প্রথমত, সমস্ত প্রামাণ্য তন্ত্রগ্রন্থেই চীনাচারকে শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক আচার বলা হয়েছে। এই 'চীন' হল নেপাল, ভুটান ও তিব্বত অঞ্চল অর্থাৎ যেখানে বৌদ্ধতান্ত্রিক ধারার পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল। বশিষ্ঠ্যের বুদ্ধের আদেশে চীনাচার শিক্ষার পরে তারাপীঠে এসে উগ্রতাবা-সাধনার মীথ হতে বৌদ্ধ তন্ত্রের সাথে তারাপীঠের তন্ত্র-সাধনার গভীর আত্মিক সম্পর্কটি বোঝা যায়। দ্বিতীয়ত, তারাপীঠের তারা যে আদতে বৌদ্ধতন্ত্র হতেই এসেছেন সেই সত্যটিও এই মীথ হতে বোঝা যায়। (vi) তারাপীঠ রাণী ভবাণীর পুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণেব মতন বহু সাধকের সাধন-স্থল ও অনেক সাধকই এখানে সিদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু তারাপীঠকে খ্যাতির শীর্ষে নিযে যান **'বামাক্ষ্যাপা'** নামে পরিচিত **ভৈরবাধূত বামাচরণ** (১৮৩৩-১৯১১)। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড: সুমিত সরকার লিখেছেন: "বামাক্ষ্যাপা ছিলেন বীরভূমের তারাপীঠ শ্মশানের পাগল তান্ত্রিক সাধু—প্রথাগত শিক্ষাহীন আর এক গরিব ব্রাহ্মণ। তিনিও রামকৃষ্ণের মতোই মুক্তমনস্কতার সঙ্গে সঙ্গে গভীর কালী ভক্তিকে মিলিয়েছিলেন। বামাক্ষ্যাপা কলকাতা এড়িয়ে চলতেন এবং দাপটের সঙ্গে রুক্ষ এবং অশ্লীল কথা বলতেন। রামকৃষ্ণ যদি পাগলপর্বের মধ্যেই থাকতেন এবং খাঁটি শহুরে ভদ্রলোক শ্রোতাদের গুরু হওয়াকে অগ্রাধিকার না দিতেন তাহলে তিনি কী হতেন তার একটা আভাস

২। 'বাঙলার মন্দিরের টেরাকোটা, তথ্যচিত্রের ধারাভাষ্য', 'বঙ্গীয় শিল্পধারা ও অন্যান্য প্রবন্ধ', দীপায়ন, ১৪০৫, পৃ. ৯৬

৩। ঐ। 'বাংলার টেরাকোটা।' পৃ. ৫৭।

হয়তো বামাক্ষ্যাপার মধ্যে পাওয়া যায়।"[৪] এই "মুক্তমনস্কতা"-ই আসল কথা। ১৯ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে যখন ব্রিটিশ শাসন জাঁকিয়ে বসেছে, গ্রামাঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফাঁসে যখন গ্রামীণ নিম্নবর্গীয়দের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে, শহরের মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের মধ্যেও যখন বেকারী জনিত হতাশা তীব্র—সেমত পরিস্থিতিতে সবকিছুকে হেলায় অগ্রাহ্য করে, সব রীতি-নীতি-বিধি-বিধানকে স্রেফ গালাগালি দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে বামাক্ষ্যাপা বিশেষত সাধারণ দলিত মানুষদের মধ্যে এক প্রবল আস্থাবোধ-সৃষ্টি করেছিলেন। এই হল কারণ যার জন্য তারাপীঠ পশ্চিম বাংলার জনপ্রিয়তম তীর্থস্থানগুলির অন্যতম হয়ে উঠেছে। প্রায় সমসাময়িক রামকৃষ্ণ ছিলেন কলকাতায়—কেশবচন্দ্র সেনের মত প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহচর্য, 'কথামৃত' গ্রন্থনাকারী মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের মত অনুলেখক, বিবেকানন্দের মত শিষ্য তিনি পেয়েছিলেন, পরে বেলুড় মঠ ও মিশনও রামকৃষ্ণবাদ প্রচারে বৃহৎ ভূমিকা নেয়। অন্যদিকে বামাক্ষ্যাপা ছিলেন এক দূর পল্লীতে, যে পল্লী তাঁর সময়ে অত্যন্ত দুর্গম ছিল, কলকাতায় আসতেন না, কোনো প্রচার পাওয়ার সুযোগও তাঁর মত শ্মশান-তান্ত্রিকের ছিল না। তবুও শুধু সমগ্র রাঢ়-বঙ্গেই নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেই তিনি গভীর শ্রদ্ধেয় ও মহাজনপ্রিয়। গৌড়বঙ্গের সংস্কৃতিতে বামাক্ষ্যাপা হলেন তারাপীঠ মন্দিরের শ্রেষ্ঠ অবদান।

২০৮। (ক) **মহাকালপোতা**, দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) বাণেশ্বর শিব। (ঘ) নাতিবৃহৎ (আনু. উচ্চতা ৩০ ফুট)। ত্রিখিলান। টেবাকোটা। (ঙ) ১৮১৯। (চ) পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে সুলতাননগর। ভ্যানরিক্সা।

২০৯। (ক) **কোলাগাছিয়া**, গোঘাট, হুগলী। (খ) শ্রীধর। (গ) দে পরিবার। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (ঙ) ১৮১৯। (চ) আরামবাগ থেকে বাসে বালিদেওয়ানগঞ্জ। স্থানীয় গাড়ীতে।

২১০। (ক) **শিলদা** (রাজকাছারী), বিনপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) কিশোর-কিশোরী। (গ) রাজা কিশোরমণি? (ঘ) পাথরে নির্মিত। নাতিবৃহৎ। সামান্য পঙ্খ। পাথরের তুলসীমঞ্চ। (ঙ) ১৮২০। (চ) ঝাড়গ্রাম থেকে বাসে। স্টপেজ থেকে ভ্যানরিক্সা।

২১১। (ক) **ঐ** (নতুনবাজার)। (খ) আপালগঞ্জনাথ শিব। (ঘ) ছোট, নিরলংকার। (ঙ) ঐ। (চ) ঐ। দ্বাদশনাথ শিবের চারচালার অদূরে।

২১২। (ক) **মাকরদহ,** ডোমজুড়, হাওড়া। (খ) মাকরচণ্ডী। (গ) রামকান্ত কুণ্ডুচৌধুরী। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৪০ ফুট)। ত্রিখিলান। নিরলংকার। সামনে নাটমণ্ডপ। (ঙ) ১৮২১। হাওড়া-ডোমজুড় বাসে (বা আরও নানা বাসে) সরাসরি। **প্রাসঙ্গিকী** : "ডোমজুড় থানার মাকড়াদহের চণ্ডী অতি প্রাচীন। প্রবাদ যে তিনি চণ্ডীমঙ্গলের শ্রীমন্ত সদাগরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর শিলা মূর্তি। দুটি চোখ মাত্র দেখা যায়। বাকি অংশ ঢাকা থাকে। এখন একটি বড় মন্দিরে তিনি বর্তমান। পুজো করেন গ্রামস্থ চট্টোপাধ্যায় পদবীর ব্রাহ্মণ। তাঁর নিত্যপুজো। যথার্থ শাস্ত্রানুসারে পুজো। বার্ষিকী দোলের সময়। ১৫ দিন ধরে তাঁর মেলা। দোলের আগের দিন 'চাঁচর'। এদিন

৪। 'কলিযুগ, চাকরি, ভক্তি: রামকৃষ্ণ ও তাঁর সময়,' সেরিবাণ, ২০০২, পৃ: ৫২।

বাজি পুড়ে হাজার হাজার। পঞ্চমীতে 'দেবদোল'—আবীর অনুষ্ঠান। দেবীর মন্দিরে মানসিক ছাড়া কোনো বলি চলে না। 'রসবড়া' নামক মিষ্টিই তাঁর প্রধান নৈবেদ্য।''*

২১৩। (ক) **কৃষ্ণনগর** (ভাঙ্গা দালানপাড়া), জাঙ্গীপাড়া, হুগলী। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (ঙ) ১৮২২। (চ) হাওড়া বা হরিপাল থেকে বাসে জাঙ্গীপাড়া। রিক্সা।

২১৪। (ক) **বালি (দেওয়ানগঞ্জ)**, গোঘাট, হুগলী। (খ) দামোদর। (গ) ঘোষ পরিবার। (ঘ) বৃহৎ (আনু. উচ্চতা ৩০/৩৫ ফুট)। টেরাকোটা সমৃদ্ধ। (ঙ) ১৮২২। (চ) আরামবাগ থেকে বাসে বালি-দেওয়ানগঞ্জ—স্ট্যাণ্ড থেকেই চুক্তির গাড়ীতে।

২১৫। (ক) **কলমীজোড়** (পারকলমীজোড়), দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) কাশীনাথ শিব। (গ) সিংহ পরিবার। (ঘ) মাঝারি। সামান্য পঙ্খ। (ঙ) ১৮২৪। (চ) পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে বেলতলা। রিক্সা।

২১৬। (ক) **জাড়া** (শিবতলা), চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) ভুবনেশ্বর ও বাঁকা রায় শিব। (ঘ) দুটিই মাঝারি ও নিরলংকার। (ঙ) ১৮২৪। (চ) ক্রম ২০৫।

২১৭। (ক) **সোনামুই**, দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। অধিকারী পরিবার। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (ঙ) ১৮২৪। (চ) পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে।

২১৮। (ক) **কুলীনপাড়া**, খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগণা। (খ) রাধাকান্ত। (গ) পণ্ডিত নরহরি শিরোমণি। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৩০/৩৫ ফুট। ত্রিখিলান। বারান্দাযুক্ত। নিরলংকার। সামনে ছোট ও চারদিকে ত্রিখিলান নাটমণ্ডপ। (ঙ) ১৮২৬। (চ) ধর্মতলা থেকে বারাকপুরগামী যেকোনো বাসে খড়দহ বলরাম হাসপাতাল স্টপ। রিক্সা। [শ্যাম মন্দিরের দিক হতে—রাসমঞ্চের ধারে গঙ্গাপাড়ের পথে দক্ষিণে, রাস্তার সাথেই ঘুরে।]

২১৯। (ক) **পারগুস্তিয়া**, জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) শিব। (গ) আদক পরিবাব। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (ঙ) ১৮২৭। (চ) হাওড়া-জালালসি ভায়া মনুশীরহাট বাসে সরাসরি।

২২০। (ক) **জোতমুরী**, দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) গঙ্গাধর শিব। (গ) সন্ন্যাসী জানা ও হরিচরণ জানা। কারিগর, হরহরিচন্দ্র মিস্ত্রী, দাসপুর। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা-মণ্ডিত। (ঙ) ১৮২৮। (চ) ক্রম ২১৫-য় বলা কলমীজোড় থেকে ভ্যান-রিক্সায় ৫/৬ কি মি. [বাস্তবে এই অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা যা, পাঁশকুড়া থেকে সারাদিনের চুক্তিতে গাড়ীতে দ্রষ্টব্য গ্রামগুলি ঘোরা সুবিধাজনক।]

২২১। (ক) **মেদিনীপুর শহর** (পাটনা বাজার), পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শীতলানন্দ শিব। (গ) সাউ পরিবার। কারিগর, অমর মিস্ত্রী। (ঘ) নাতিবৃহৎ। নিরলংকার। (ঙ) ১৮২৮। (চ) শহর-রিক্সা।

২২২। (ক) **সত্যপুর** (মাড়োতলা), ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শিবদুর্গা। (গ) সার্থক

* মিহির চৌধুরী কামিল্যা : 'আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি', বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০, পৃ. ২০১।

পাল, কারিগর : কৃষ্ণপ্রসাদ। (ঘ) মাঝারি। শিখর দেউলের মত ত্রিরথ। নিরলংকার। (ঙ) ১৮২০। (চ) পাঁশকুড়া-ট্যাবাগেড়ো বাসে সরাসরি।

২২৩। **চন্দ্রকোণা,** পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) রাধাকান্ত। (গ) চট্টোপাধ্যায় পরিবার। (ঘ) ছোট নিরলংকার। (ঙ) ১৮৩০।

২২৪। (ক) **বেলডাঙা,** দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) মদনগোপাল। (গ) রাজপণ্ডিত পরিবার। কারিগর স্বরূপ মিস্ত্রী, দাসপুর, চেতুয়া। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকাব। (ঙ) ১৮৩২। (চ) ক্রম ২০০-য় বলা চাঁইপাটের লাগোয়া।

২২৫। (ক) **টালিগঞ্জ,** ৭৮ টালিগঞ্জ রোড, কলকাতা। (খ) রাধামদনমোহন। (গ) উদয়নারায়ণ মণ্ডল। (ঘ) অতিবৃহৎ। উচ্চতা আনু. ৭০ ফুট। ত্রিখিলান। নিরলংকার। সামনে প্রস্থে ৫, দৈর্ঘ্যে ৭ খিলান-সম্পন্ন বৃহৎ নাটমণ্ডপ। (ঙ) ১৮৩৪।

২২৬। (ক) **কুশপাতা,** ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) রাধাদামোদর। (গ) মিত্রপরিবার। (ঘ) ছোট। প্রায় বিনষ্ট। (ঙ) ১৮৩৫। (চ) ঘাটাল থেকে রিক্সা/বাস।

২২৭। (ক) **খড়দহ** (গোস্বামীপাড়া), উত্তর ২৪ পরগণা। (খ) মদনমোহন। (গ) প্রাণময়ী দেবী। (ঘ) নাতিবৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৩০/৩৫ ফুট)। সামনে কাঠের জাফ্‌রি-সম্পন্ন বারান্দা। নিরলংকার। (ঙ) ১৮৩৫। (চ) ক্রম ১৫৩। চত্বরে ঢুকতে বাঁয়ে গৃহস্থ বাড়ির ভিতব।

২২৮। (ক) **বীরনগর** (মাঝেরপাড়া), রাণাঘাট, নদীয়া। (খ) শিব। (গ) পণ্ডিত হরচন্দ্র। কারিগর : সত্যস্বরূপ মিস্ত্রী। (ঘ) মাঝারি। সামান্য পঙ্খ। (ঙ) ১৮৩৬। (চ) শিয়ালদহ মেইন (কৃষ্ণনগর) লাইনের বীরনগর থেকে রিক্সা।

২২৯। (ক) **ক্ষীরপাই** (হাটতলা), চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শীতলানন্দ শিব। (গ) অদ্বৈতচরণ পাণি। (ঘ) অতি বৃহৎ। আনু. উচ্চতা ৪৫ ফুট। ত্রিখিলান। সামান্য টেরাকোটা। (ঙ) ১৮৩৯। (চ) পাঁশকুড়া/ঘাটাল/চন্দ্রকোণা থেকে বাসে ক্ষীরপাই। ভ্যানরিক্সা।

২৩০। (ক) **বল্লভপুর** (২২, আক্না চৌধুরী পাড়া লেন), শ্রীরামপুর, হুগলী। (খ) মদনমোহন। (গ) গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। (ঘ) অতিবৃহৎ। উচ্চতা আনু. ৫৫/৬০ ফুট। ত্রিখিলান। নিরলংকার। সামনে লম্বা বারান্দা। ঘেরা ক্ষেত্র। (ঙ) ১৮৪৫। (চ) ক্রম ১০৩। ঐ ঠাকুরবাটি স্ট্রিট ধরে পূবে অর্থাৎ গঙ্গার দিকে হেঁটে শ্রীরামপুর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের আগে বাঁয়ে ঘোরা সরু পথে।

২৩১। (ক) **বাঁকাদহ** (বামুনপাড়া), বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। (খ) রাধা-দামোদর। (গ) গুরুচরণ দাস; কারিগর : নারায়ণ মিস্ত্রী। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা মণ্ডিত। জীর্ণ। বিষ্ণুপুর রীতি। (ঙ) ১৮৪৭। (চ) বিষ্ণুপুর তালডাংরা বাসে। সহজে।

২৩২। (ক) **শ্যামসুন্দর-পাটনা** (সিদ্ধিনাথ মঠ), পাঁশকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শীতলানন্দ শিব। (ঘ) মাঝারি। ত্রিখিলান। সামান্য টেরাকোটা। (ঙ) ১৮৪৭। (চ) পাঁশকুড়া থেকে ট্রেকারে গোবিন্দনগর। কাঁসাই পার হলেই শ্যামসুন্দর পাটনা। ক্ষেত্রে একটি পঞ্চরত্ন।

২৩৩। (ক) **বাঁশবেড়িয়া** (রথতলা), হুগলী। (খ) রাধাকৃষ্ণ। (গ) কুণ্ডু পরিবার। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (ঙ) ১৮৪৯। (চ) চুঁচুড়া-বাঁশবেড়িয়া বাসপথে।

২৩৪। (ক) **উত্তর গোবিন্দনগর,** দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) ভুবনেশ্বর শিব। (গ) লিপিতে প্রতিষ্ঠাতার নাম নেই কিন্তু কারিগর দাসপুরের আনন্দরাম দাসের নাম আছে। (ঘ) নাতিবৃহৎ (আনু. উচ্চতা ৩০/৩২ ফুট)। চমৎকার টেরাকোটা। (ঙ) ১৮৫০। (চ) পাঁশকুড়া থেকে ট্রেকারে।

২৩৫। (ক) **আসণ্ডা,** উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া। (খ) হরসুন্দর শিব। (গ) মাইতি পরিবার। (ঘ) ছোট। পঞ্চ। (ঙ) ১৮৫০। (চ) হাওড়া বা হরিপাল থেকে বাসে উদয়নারায়ণপুর। রিক্সা/ভ্যানরিক্সা। শ্রীধরের নবরত্নের লাগোয়া।

২৩৬। (ক) **ডিঙ্গল,** ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) নরসিংহ শিব। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৩৫ ফুট)। নিরলংকার। ত্রিখিলান। চত্বরে মাকড়া পাথরের একটি অশ্বারোহী মূর্তি ও একটি উৎসর্গ মন্দির। (ঙ) **১৯ শতকের মাঝামাঝি।** (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের রাধামোহনপুর স্টেশন থেকে ভ্যানরিক্সায়।

২৩৭। (ক) **বাড় উত্তর হিংলী,** সুতাহাটা, পূর্ব মেদিনীপুর। (খ) রাজ-রাজেশ্বরী। (গ) পালোধি পরিবার। (ঘ) নাতিবৃহৎ। নিরলংকার। (চ) মেছেদা-হলদিয়া বাসে কালিকাকুণ্ড। ভ্যানরিক্সা।

২৩৮। (ক) **ইসলামপুর** (শিবতলা), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) শিব। (গ) মেটে পরিবার। (ঘ) নাতিবৃহৎ নিরলংকার। (চ) হাওড়া থেকে বাসে ভাণ্ডারগাছা। ভ্যানরিক্সা।

২৩৯। (ক) **টালিগঞ্জ** (ছোট রাসবাড়ির কাছে), ৮৬, টালিগঞ্জ রোড, কলকাতা। (খ) লক্ষ্মীনারায়ণ। (গ) মথুর শা। (ঘ) বৃহৎ। উচ্চতা আনু. ৬০/৭০ ফুট। ত্রিখিলান। নিরলংকার। ঘেরা ক্ষেত্র।

২৪০। (ক) **নিমাবালিয়া,** জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) বুড়োশিব। (ঘ) নাতিবৃহৎ। ক'টি টেরাকোটা পদ্ম। (চ) পাতিহাল থেকে ভ্যানরিক্সা।

২৪১। (ক) **মানিকুরা,** আমতা, হাওড়া। (খ) নরমাধব শিব। (গ) দ্বারী পরিবার। (ঘ) বৃহৎ। দুদিকে জানালা। টেরাকোটা। (চ) হাওড়া থেকে পেঁড়ো (ভায়া মুনশীরহাট)। ভ্যানরিক্সা।

২৪২। (ক) **আমনপুর,** কেশপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) রাধাবল্লভ। (গ) বসু পরিবার। (ঘ) ছোট। সামান্য টেরাকোটা। (চ) চন্দ্রকোণা থেকে বাসে কুঁয়াপুর। ভ্যানরিক্সা।

২৪৩। (ক) **হরিরামপুর,** জাঙ্গীপাড়া,হুগলী। (খ) বুড়ো শিব। (ঘ) মাঝারি। ত্রিখিলান। টেরাকোটা-মণ্ডিত। (চ) জাঙ্গীপাড়া (পূর্বোক্ত) থেকে বাসে।

২৪৪। (ক) **ওড়গোঁদা,** বিনপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। সামান্য টেরাকোটা। (চ) ঝাড়গ্রাম-বাঁকুড়া বাসে।

২৪৫। (ক) **কেরুড়,** সবং, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শিব। (গ) ভট্টাচার্য পরিবার। (ঘ) মাঝারি। ত্রিরথ। নিরলংকার। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বালিচক থেকে বাসে/ট্রেকারে জলচক। ভ্যানরিক্সা : ৬/৭ কি.মি.)।

২৪৬। (ক) **ঐ**। (খ) জয়দুর্গা। (গ) ঐ। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (চ) ঐ।

২৪৭। (ক) **খড়কুসুমা**, গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) বিষ্ণু। (গ) চৌধুরী পরিবার। (ঘ) মাঝারি। ত্রিখিলান। টেরাকোটা। (চ) গড়বেতা (পূর্বোক্ত) থেকে বাসে/নিজ ব্যবস্থায় (৭/৮ কি.মি.)।

২৪৮। (ক) **হরিরামপুর**, দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শীতলানন্দ শিব। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা। (চ) প্রাগুক্ত পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে বকুলতলা থেকে ভ্যানরিক্সা (৫ কি.মি.)।

২৪৯। (ক) **খড়ার** (ব্রাহ্মণপাড়া), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শিব। (গ) বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা দ্বারপাল। (চ) পাঁশকুড়া/ঘাটাল থেকে বাসে। রিক্সা।

২৫০। (ক) **বসনছোড়া** (উত্তরপাড়া), চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শ্রীধর। (গ) সরকার পরিবার। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) ক্রম ২২৩।

২৫১। (ক) **খেলাড়**, খড়গপুর লোকাল, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শম্ভুনাথ শিব। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) খড়গপুর-বেলদা বাসে শ্যামলপুরা—রিক্সা (৫/৬ কি.মি)।

২৫২। (ক) **জনার্দনপুর**, দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) যোগেশ্বর শিব। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) ঘাটাল থেকে বাসে রাধানগর। ভ্যানরিক্সা (অথবা ক্রম ২১১-র কলমীজোড় থেকে ভ্যানরিক্সা)।

২৫৩। (ক) **শ্যামপুর***, তারকেশ্বর, হুগলী। (খ) শিব। (গ) সিংহরায় পরিবার। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা। (চ) হাওড়া-তারকেশ্বর লাইনের বাহিরখণ্ড স্টেশন থেকে ভ্যানরিক্সায় (২/২½ কি.মি.)।

২৫৪। (ক) **ঐ**। (খ) শিব। (গ) হালদার পরিবার। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) ঐ।

২৫৫। (ক) **বালিডাঙ্গা**, ধনিয়াখালি, হুগলী। (খ) পরিত্যক্ত। (গ) ধারা পরিবার। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। (চ) পূর্বোক্ত গুড়াপ স্টেশন থেকে চোপা হয়ে মেমারি যাচ্ছে এমন বাসে সরাসরি।

২৫৬। (ক) **ইসলামপুর** (ধর্মতলা), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) ধর্ম। (গ) মেটে পরিবার। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) ক্রম ২৩৮।

২৫৭। (ক) **পাইকপাড়া** (শিবতলা), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) বুড়ো শিব। (গ) সরকার পরিবার। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) হাওড়া থেকে বাসে মুনশীরহাট। ভ্যানরিক্সা।

২৫৮। (ক) **গোগুলপাড়া**, পাঁচলা, হাওড়া। (খ) চাঁপা রায় ও দামোদর। (গ) ভারতী পরিবার। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা। বৃষবাহন। (ঙ) ১৮৫২। (চ) হাওড়া থেকে উলুবেড়িয়া প্রভৃতি বাসে ধূলাগড়ি মোড়, এখান থেকে গাড়ী বদল করে সরাসরি।

* এখানে ১৭৬৭-তে স্থানীয় ঘোষাল পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও বর্তমানে পরিত্যক্ত একটি টেরাকোটা-মণ্ডিত আটচালা মন্দির আছে।

২৫৯। (ক) **লাভপুর** (ফুল্লরা পীঠ), বীরভূম। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। উপরের চারচালার গলাটি অনুপাতে লম্বা। শাঁকারির শিব মন্দিরের (ক্রম ৯৮)। সঙ্গে মত ম্যাকাচিয়ন এটিকে 'At-chala with heightened facade' (p. 38) বলেছেন। দৃষ্টান্ত অতি কম হওয়ায় আমরা একে 'রীতি' না বলে 'ব্যতিক্রম' বলতে চাই। (ঙ) ১৮৫২। (চ) বোলপুর বা কাটোয়া থেকে বাসে (কাটোয়া থেকেই সুবিধা) বিখ্যাত 'ফুল্লরা' পীঠ। ফুল্লরা মন্দির প্রাঙ্গনে।

২৬০। (ক) **বীরনগর** (উত্তরপাড়া), রাণাঘাট, নদীয়া। (খ) শিব। (গ) রূপনারায়ণ শর্মা। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (ঙ) ১৮৫৩। (চ) ক্রম ২২৮।

২৬১। (ক) **খেমপুর** (পূবপাড়া), উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া। (খ) শান্তিনাথ শিব। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (ঙ) ১৮৫৩। (চ) প্রাগুক্ত উদয়নারায়ণপুর থেকে রিক্সা।

২৬২। (ক) **কামারগেড়ে,** চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) রামেশ্বর শিব। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (ঙ) ১৮৫৪। (চ) পূর্বোক্ত ক্ষীরপাই থেকে রিক্সায় (৬/৭ কি.মি.)।

২৬৩। (ক) **উদয়পুর,** খানাকুল, হুগলী। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (ঙ) ১৮৫৬। (চ) আরামবাগ থেকে 'গড়ের হাট' বাসে খানাকুলে গিয়ে রিক্সায়।

২৬৪। (ক) **ডিহিবায়ড়া** (মায়াপুর), আরামবাগ, হুগলী। (খ) স্বরূপনারায়ণ। (গ) পাল পরিবার। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা মণ্ডিত। (ঙ) ১৮৫৮। (চ) আরামবাগ থেকে রিক্সা/বাস (চার কি.মি.)।

২৬৫। (ক) **আহিরা,** মেমারী, বর্ধমান। (খ) শিব। (গ) সৃষ্টিধর ঘোষ। কারিগর : বিশ্বনাথ মিস্ত্রী। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা-মণ্ডিত। (ঙ) ১৮৫৮। (চ) বর্ধমান মেইন লাইনের মেমারী থেকে মন্তেশ্বরগামী বাসে ঝিকরা। হাঁটা।

২৬৬। (ক) **পারুল,** আরামবাগ, হুগলী। (খ) বিশালাক্ষি। (গ) রণজিৎ রায়। (ঘ) মাঝারি। চমৎকার টেরাকোটা—তবে অকারণে রঙ করে শ্রী-র হানি করা হয়েছে। ঘেরা ক্ষেত্র। (ঙ) ১৮৫৯। (চ) আরামবাগ থেকে বাসে।

২৬৭। (ক) **রামচন্দ্রপুর,** ময়না, পূর্ব মেদিনীপুর। (খ) শিব। (গ) ঘোড়ই পরিবার। (ঙ) বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৩০/৩৫ ফুট)। ত্রিখিলান। টেরাকোটা-সম্পন্ন। (ঙ) ১৮৫৯। (চ) পাঁশকুড়া-তমলুক বাসে প্রতাপপুর। ভ্যানরিক্সা (৬/৭ কি.মি.)।

২৬৮। (ক) **ক্ষীরপাই** (মালপাড়া), চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) যজ্ঞেশ্বর শিব। (গ) গঙ্গাধর দত্ত। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৩০/৩২ ফুট)। টেরাকোটা-মণ্ডিত। (ঙ) ১৮৬১। (চ) ক্রম ২২৯।

২৬৯। (ক) **খালনা** (বারুইপাড়া), আমতা, হাওড়া। (খ) খটেশ্বর শিব। (গ) ত্রৈলোক্যপ্রসাদ রায়। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (ঙ) ১৮৬১। (চ) বাগনান খালনা বাসে।

২৭০। (ক) **কৃষ্ণগঞ্জ** (বদনগঞ্জ-ফুলুই পঞ্চায়েৎ), গোঘাট, হুগলী। (খ) দামোদর (পরিত্যক্ত)। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা অনু. ৩০ ফুট)। সামান্য টেরাকোটা অবশিষ্ট। (ঙ) ১৮৬৫। (চ) আরামবাগ থেকে বাসে পাণ্ডুগ্রাম হয়ে।

২৭১। (ক) **চন্দ্রকোণা** (গোবিন্দপুর পাড়া), পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) খলশা শিব। (গ) 'বিয়াল্লিশগ্রাম' তাম্বুলি বণিক সম্প্রদায়। (ঘ) মাঝারি। ত্রিখিলান। পঙ্খ-সজ্জিত। নাটমণ্ডপ ও নহবৎ-সম্পন্ন। (ঙ) ১৮৬৫। (চ) পাঁশকুড়া/ঘাটাল/মেদিনীপুর শহর থেকে বাসে চন্দ্রকোণা টাউন। রিক্সা।

২৭২। (ক) **ভট্টগ্রাম**, গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) দামোদর। (গ) ভট্টাচার্য পরিবার। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৩৫ ফুট)। টেরাকোটা মণ্ডিত। (ঙ) ১৮৬৬। (চ) ক্রম ১৬২-তে বলা ঝাড়বণী থেকে হেঁটে।

২৭৩। (ক) **পাতিহাল** (রায়পাড়া), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) শ্যাম-সুন্দর। (গ) রামসদয় রায়। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (ঙ) ১৮৬৭। (চ) হাওড়া থেকে বাসে পূর্বোক্ত পাতিহাল। ভ্যানরিক্সা।

২৭৪। (ক) **ইছাপুর** (শিবতলা), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) উমাপতি শিব। (গ) ঘড়া পরিবার। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (ঙ) ১৮৬৭। (চ) ঐ।

২৭৫। (ক) **দেবীপুর**, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া। (খ) কাশীনাথ শিব। (গ) গোবিন্দমণি দাসী। কারিগর: মহেশচন্দ্র সেন (রায়চক) ও রামধন মিস্ত্রী। (ঘ) মাঝারি। সামান্য পঙ্খ। (ঙ) ১৮৬৮। (চ) হাওড়া-গড়ভবাণীপুর-উদয়-নারায়ণপুর বাসে সরাসরি (আমতা থেকেও গড়ভবাণীপুর-বাসে)।

২৭৬। (ক) **বনপাটনা**, খড়গপুর লোকাল, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শিব। (গ) সৎপথী পরিবার। (ঘ) মাকড়া পাথরে নির্মিত। মাঝারি। নিরলংকার। (ঙ) ১৮৬৮। (চ) খড়গপুর-বেলদা বাসপথের শ্যামলপুরা থেকে ভ্যানরিক্সা/হাঁটা (তিন কি.মি.)।

২৭৭। (ক) **রসপুর** (পূবপাড়া), আমতা, হাওড়া। (খ) বুড়ো শিব। (গ) যাদবচন্দ্র রায়। কারিগর: বনমালী দাস (ময়াল, আরামবাগ)। (ঘ) মাঝারি। আমলকযুক্ত। নিরলংকার। (ঙ) ১৮৭০। (চ) হাওড়া থেকে বাসে আমতা। রিক্সা।

২৭৮। (ক) **সেনহাট** (রাজহাটি ২ পঞ্চায়েত)। (খ) কালী। (গ) মিত্র পরিবার। (ঘ) মাঝারি। সামান্য টেরাকোটা। (ঙ) ১৮৭৪। (চ) পূর্বোক্ত খানাকুল থেকে রিক্সায়।

২৭৯। (ক) **কোলাগাছিয়া**, গোঘাট, হুগলী। (খ) রঘুনাথ। (গ) রাণা পরিবার। (ঘ) বৃহৎ (আনু. ৩০/৩২ ফুট. উচ্চতা)। টেরাকোটা। ত্রিখিলান। (ঙ) ১৮৭৫। (চ) ক্রম ২০৯।

২৮০। (ক) **গোপালনগর** (দক্ষিণপাড়া), পাঁশকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শিব। (গ) জনৈক "ধর্মদাস রায়ের বণিতা।" (ঘ) ছোট। ত্রিরথ। নিরলংকার। (ঙ) ১৮৭৫। (চ) ক্রম ১৮৯।

২৮১। (ক) **খড়ার** (রায়পাড়া, ষষ্ঠীতলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) বুড়ো শিব। (গ) রমানাথ চৌধুরী। কারিগর: রামতনু মিস্ত্রী (ক্ষীরপাই) এবং মাহিন্দ্রনাথ মিস্ত্রী (সেনহাটা)। (ঘ) মাঝারি। খিলানশীর্ষে—একসার টেরাকোটা। (ঙ) ১৮৭৮। (চ) ক্রম ২৪৯।

২৮২। (ক) **গোবিন্দপুর**, পাঁশকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) তারকনাথ শিব।

(গ) ভারতচন্দ্র দে; কারিগর উদয়চন্দ্র পতি (রাজহাটি)। (ঘ) নাতিবৃহৎ। টেরাকোটা মণ্ডিত। ত্রিখিলান। (ঙ) ১৮৮১। (চ) পাঁশকুড়া থেকে ট্যাবাগ্যেড়া / ডেবরা প্রভৃতি বাসে রাতুলিয়া বাজার স্টপ—এখান থেকে রিক্সায়।

২৮৩। (ক) **শিবকালীনগর** (৭নং লাট), কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। (খ) বিশালাক্ষি। (গ) ঈশানচন্দ্র কামার। (ঘ) অতিবৃহৎ। ত্রিখিলান। নিরলংকার। (ঙ) ১৮৮২। (চ) ডায়মণ্ডহারবার-কাকদ্বীপ বাসপথের 'কামারের হাট' স্টপেজে নেমে নিজ-ব্যবস্থায়—উল্লেখ্য পাশে ১৯২৮-এ কামার পরিবারেরই নির্মিত ঈশানেশ্বর শিবের বৃহৎ আটচালা মন্দিরটি আছে।

২৮৪। (ক) **দেরিয়াপুর**, গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) নারায়ণ। (গ) বংশীধর বেরা দাস। কারিগর; শঙ্কর দাস (বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া)। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা-সম্পন্ন। (ঙ) ১৮৮২। (চ) গড়বেতা থেকে বাসে আমলাশোল। অল্প হাঁটা।

২৮৫। (ক) **বেলপুকুর,** কুলপী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। (খ) বিশ্বেশ্বর শিব। (গ) মহেন্দ্রনারায়ণ পাত্র ও তাঁর পত্নী বাসমণি দেবী। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা-মণ্ডিত। (ঙ) ১৮৮৩। (চ) ডায়মণ্ডহারবার-কুলপী বাসে। পাশে আরও একটি মন্দির নির্মিত হয়েছে।

২৮৬। (ক) **মেঘুলা,** গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) দামোদর। (গ) ভোলানাথ পাত্র। কারিগর : প্রেমচাঁদ মিস্ত্রী (বৈতল, বাঁকুড়া)। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (ঙ) ১৮৮৬। (চ) গড়বেতা থেকে শিলাবতী পেরিয়ে ভ্যানরিক্সায় (৬/৭ কি.মি.)।

২৮৭। (ক, **বরুইপুর** (শিবতলা), উদয়নারায়ণপুব, হাওড়া। (খ) শিব। (গ) বংশীধর দলুই। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (ঙ) ১৮৮৬। (চ) পূর্বোক্ত উদয়নারায়ণপুর থেকে রিক্সা/ ভ্যানরিক্সা।

২৮৮। (ক) **উত্তর ধানখাল** (মাড়োতলা), দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শিব। (গ) ভুঞা পরিবার। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (ঙ) ১৮৮৮। (চ) পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসপথের টালিভাটা থেকে ভ্যানরিক্সা (৫/৬ কি.মি.)।

২৮৯। (ক) **সাহাচক,** দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) নীলকণ্ঠ শিব। (গ) কারিগর : শিবনারায়ণ দে (দাসপুর)। (ঘ) মাঝারি—সম্মুখগাত্রে টেরাকোটায় পিড়া দেউলের অনুকৃতি—ব্যতিক্রমী। (ঙ) ১৮৮৮। (চ) ক্রম ২০৮—ঐ মহাকালপোতার লাগোয়া।

২৯০। (ক) **খেমপুর** (দক্ষিণপাড়া), উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া। (খ) শীতলা মনসা। (গ) শীতলচন্দ্র মাইতি (সীতাপুর); কারিগর · গোকুল মিস্ত্রী (খেমপুব)। (ঘ) মাঝারি। ক্ষীণশীর্ষ। (ঙ) ১৮৯৪। (চ) ক্রম ২৬১।

২৯১। (ক) **খড়কুসুমা,** গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শ্রীধর। (গ) পান পরিবার। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা। (ঙ) **১৯ শতকের শেষে।** (চ) গড়বেতা থেকে বাস/ট্রেকার।

২৯২। (ক) **বীরসিংহ** (স্থানীয় উচ্চারণে বীরসিং), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) ধর্ম। (ঘ) মাঝারি। কিছু পঙ্খ। (চ) ঘাটাল-খড়ার বাসে।

২৯৩। (ক) **ভৈরবপুর** (উকিলপাড়া), চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) দামোদর। (গ) ঘোষ পরিবার। (ঘ) মাঝারি। সামান্য পঙ্খ। (চ) চন্দ্রকোণা টাউন থেকে বাসে [প্রাগুক্ত বসনছোড়া থেকেও হেঁটে/ভ্যানরিক্সায়]

২৯৪। (ক) **কামারপুকুর,** গোঘাট, হুগলী। (খ) শিব। (গ) যুগী পরিবার। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) তারকেশ্বর থেকে বাসে।

২৯৫। (ক) **কোলাগাছিয়া,** গোঘাট, হুগলী। (খ) ভুবনেশ্বর শিব। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা। (চ) ক্রম ২০৯।

২৯৬। (ক) **মানসিংপুর,** জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) রাধাকান্ত। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (চ) ক্রম ২০১।

২৯৭। (ক) **ঐ**। (খ) রঘুনাথ। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) ক্রম ২০১।

২৯৮। (ক) **রামপুর** (পণ্ডিতপাড়া), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) ধর্ম। (গ) পণ্ডিত পরিবার। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) মুনশীরহাট থেকে ভ্যানরিকসায়।

২৯৯। (ক) **জিবটা,** কোতুলপুর, বাঁকুড়া। (খ) শিব। (গ) জগন্নাথ রায়। কারিগর : পানউল্লা কাজি (তাজপুর)—হিন্দু মন্দির-নির্মাণে মুসলমান স্থপতির বিরল দৃষ্টান্ত। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (চ) জয়রামবাটি থেকে রিক্সায়।

৩০০। (ক) **ঘাটেশ্বর** (স্থানীয় উচ্চারণে ঘাটেশ্বরা), মন্দিরবাজার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। (খ) শিব। (গ) বসু পরিবার। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) শিয়ালদহ দ. শাখার লক্ষ্মীকান্তপুর বা তার আগের স্টেশন মাধবপুর থেকে ভ্যানরিক্সায়। পুকুর ঘাটে।

৩০১। (ক) **ঐ**। (খ) শিব। (গ) ঘোষ-চোধুরী পরিবার। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) ঐ। কিছু এগিয়ে।

৩০২। (ক) **বড়শূল**'দে পাড়া, বর্ধমান। (খ) শিব। (গ) দে পরিবার। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৪৯/৪৫ ফুট)। একসময়ে সামনে তিনদিক ঘেরা ও ছাদসম্পন্ন বারান্দা ছিল—চিহ্ন বর্তমান। একই অধিষ্ঠানে মন্দিরের দুপাশে দুটি ঘর ছিল, ডানেরটি আছে, বাঁয়েরটি পড়ে গেছে। (পাশেই প্রাক্তন জমিদার দে পরিবারের প্রভূত পঙ্খ-অলংকৃত বাড়ির সামনেকার ছোট ঘরে হিমাদ্রি শঙ্কর দে কর্তৃক একক প্রচেষ্টায় পরিচালিত 'শুভেন্দ্র মোহন দে ঐতিহাসিক সংগ্রহালয়!') (ঙ) **১৯ শতক**। (চ) বর্ধমান মেইন/কর্ড লাইনের শক্তিগড় স্টেশন থেকে বাসে/ভ্যান রিক্সায়।

৩০৩। (ক) **ঐ**। (খ) শিব। (গ) নন্দী পরিবার। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (চ) ঐ।

৩০৪। (ক) **মৌখিরা,** আউসগ্রাম, বর্ধমান। (খ) শিভ। (ঘ) মাঝারি। পূর্ণ সংস্কৃত। সংস্কারে অলংকরণ লুপ্ত। নীচু পাঁচিল-ঘেরা ক্ষেত্র। (চ) বোলপুর-পানাগড় বাসপথের বসুধা থেকে ভ্যানরিক্সায়। গ্রামে ঢুকে প্রথমে। বাঁয়ে।

৩০৫। (ক) **ঐ**। (ব্যানার্জিদের বাড়ির পিছনে)। (খ) পরিত্যক্ত। (ঘ) মাঝারি। জীর্ণ কিন্তু সুন্দর। (চ) ঐ। কিছুটা এগিয়ে। বাঁয়ে, কিছুটা তফাতে।

৩০৬। (ক) **ঐ**। (ঐ বাড়ীরই সামনে)। (খ) শিব—দুটি। (ঘ) মাঝারি। অতি জীর্ণ দুটি আটচালা, পরস্পর থেকে সামান্য তফাতে। (চ) ঐ।

৩০৭। (ক) **সিঙ্গারকোণ** (পীরতলা), কালনা, বর্ধমান। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। পঙ্খ-অলংকৃত। অতি জীর্ণ। (চ) বর্ধমান মেইন লাইনের বৈঁচি স্টেশন থেকে বাসে সিঙ্গারকোণ হাটতলা। বিপরীতের পাকা রাস্তায় রাধাকান্তের জোড় বাংলার পথে, পীরতলা ছেড়ে ডানে একটি বাড়ির পাঁচিলের ওপাশে।

৩০৮। (ক) **ঐ**। (রাধাকান্ত মন্দির-ক্ষেত্র)। (খ) শিব। (ঘ) ছোট ও নিরলংকার দুটি আটচালা, পরস্পর হতে কিছু দূরত্বে। (চ) ঐ। দোলমঞ্চের দু দিকে।

৩০৯। (ক) **বালাগড়,** রায়না, বর্ধমান। (খ) শিব। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। পূর্ণ সংস্কৃত। (চ) বর্ধমান (তিনকোণিয়া) থেকে বাসে বোড়গ্রাম। বলরাম মন্দিরের বিপরীত দিক হতে সাদিপুরের দিকের পথে কিছুটা গিয়ে।

৩১০। (ক) **দেবীপুর,** মেমারি, বর্ধমান। (খ) শিব। (ঘ) ছোট। পরিত্যক্ত। জীর্ণ। নিরলংকার। (চ) বর্ধমান মেইন লাইনের দেবীপুর স্টেশন থেকে রিক্সায়/বাসে গ্রাম-দেবীপুর। বাসস্ট্যান্ডেই।

৩১১। (ক) **সাদিপুর** (শিবতলা), জামালপুর, বর্ধমান। (খ) শিব। (ঘ) নাতিবৃহৎ। সামনে বেশ বড়ো নাটমণ্ডপ। (চ) বর্ধমান কর্ড লাইনের মসাগ্রাম থেকে বাসে/ট্রেকারে বটতলা। হেঁটে সাদিপুর ঘাট থেকে (শীত/গ্রীষ্ম বাঁশের সাঁকোয়) দামোদর পেরিয়ে।

৩১২। (ক) **পাতুন,** মন্তেশ্বর, বর্ধমান। (খ) পাত্রেশ্বর শিব। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা। (চ) বর্ধমান (তিনকোণিয়া) বা মেমারি থেকে বাসে কুসুমগ্রাম হয়ে পুটশুড়ি। ভ্যানরিক্সা। **প্রাসঙ্গিকী** : আচার্য বিনয় ঘোষ পাত্রেশ্বর শিবমন্দিরের ভিতরে-বাইরে অনেক মূর্তি (বৌদ্ধ তান্ত্রিক, বিষ্ণু, গণেশ, সূর্য, শিবলিঙ্গ, ধর্মরাজের নানাপ্রকারের কূর্মমূর্তি) দেখেছিলেন ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে—তাঁর মতে দাঁইহাটের মতন পাতুনও একসময়ে ভাস্করদের গ্রাম ছিল।*

৩১৩। (ক) **চোপা,** ধনিয়াখালি, হুগলী। (খ) শিব। (গ) মুখোপাধ্যায় পরিবার (বর্তমানে)। (ঘ) মাঝারি। সামান্য টেরাকোটা অবশিষ্ট। (চ) বর্ধমান কর্ড লাইনের গুড়াপ থেকে বাসে/ট্রেকারে মৌবেশ হাটতলা—এখান থেকে মৌবেশ, চোপা, জেরুর ও গুড়বারির চুক্তির ভ্যান রিক্সায়। এটি গ্রামে ঢোকার মুখে, জোড়া মন্দিরের বিপরীতে।

৩১৪। (ক) **ইলছোবা,** পাণ্ডুয়া, হুগলী। (খ) শিব। (গ) বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। (ঘ) নাতিবৃহৎ। সামান্য টেরাকোটা। (চ) বর্ধমান মেইন লাইনের পাণ্ডুযা বা খন্যান স্টেশন থেকে ভ্যানরিক্সায়।

৩১৫। (ক) **কোঁচমালী,** পাণ্ডুয়া, হুগলী। (খ) শিব। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (চ) বর্ধমান মেইন লাইনের বৈঁচি থেকে রিক্সায়।

৩১৬। (ক) **বাকসা,** চণ্ডীতলা, হুগলী। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) বর্ধমান কর্ড লাইনের জনাই স্টেশন থেকে রিক্সা—রঘুনাথের বিখ্যাত নবরত্ন মন্দিরের পথে।

৩১৭। (ক) **দিগসুই** (মাঝের পাড়া), মগরা, হুগলী। (খ) শিব। (ঘ) দুটি আটচালা। মাঝারি। টেরাকোটা প্রায় লুপ্ত। (চ) বর্ধমান মেইন লাইনের মগরা থেকে কোড়লাগামী বাসে।

* পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ১, পৃ. ১৫৪-৫৭।

৩১৮। (ক) **বসুয়া** (স্থানীয় উচ্চারণে বোসো, বাবুপাড়া), ধনিয়াখালি, হুগলী। (খ) শিব। (গ) সিংহ পরিবার। (ঘ) দুটি আটচালা। মাঝারি। নিরলংকার। (চ) বর্ধমান কর্ড লাইনের শিবাইচণ্ডী স্টেশন থেকে রিক্সায়।

৩১৯। (ক) **বৈদ্যপুর,** তারকেশ্বর, হুগলী। (খ) লোকনাথ শিব। (ঘ) নাতিবৃহৎ। নিরলংকার। সামনে দালান। (চ) তারকেশ্বর লাইনের লোকনাথ স্টেশনের কাছে।

৩২০। (ক) **মলয়পুর,** আরামবাগ, হুগলী। (খ) শিব। (ঘ) ছোট। ব্যতিক্রমী—দেউলের মত 'রথ' ও রত্নমন্দিরের মত চূড়াযুক্ত। (চ) আরামবাগ থেকে ভ্যানরিক্সায়/রিক্সায়।

৩২১। (ক) **মহানাদ** (দক্ষিণপাড়া), পোলবা, হুগলী। (খ) গোটেশ্বর শিব। (গ) নিয়োগী পরিবার। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) পাণ্ডুয়া থেকে বাসে।

৩২২। (ক) **মৌবেশ,** ধনিয়াখালি, হুগলী। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটাসম্পন্ন। (চ) বর্ধমান কর্ড লাইনের গুড়াপ থেকে বাসে/ট্রেকারে মৌবেশ হাটতলা। রিক্সা/ভ্যানরিক্সা।

৩২৩। (ক) **সিঙ্গুর,** হুগলী। (খ) কালী। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) তারকেশ্বর লাইনের সিঙ্গুর স্টেশন থেকে রিক্সা/হাঁটা।

৩২৪। (ক) **হাজিপুর,** ধনিয়াখালি, হুগলী। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা। (চ) গুড়াপ থেকে বাসে/ট্রেকারে।

৩২৫। (ক) **ডিহিমণ্ডলঘাট** (কাছারিতলা), শ্যামপুর, হাওড়া। (খ) কমলেশ্বর শিব। (গ) বিশ্বাস পরিবার। (ঘ) নাতিবৃহৎ। অলংকরণ লুপ্ত। (চ) বাগনান থেকে কমলপুরের বাসে বরদাবাড়। ভ্যানরিক্সা।

৩২৬। (ক) **প্রতাপপুর** (ধর্মতলা), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) শিব (পরিত্যক্ত)। (গ) ভট্টাচার্য পরিবার। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) পাতিহাল হাটতলা থেকে ভ্যানরিক্সা।

৩২৭। (ক) **হাটশেরাণ্ডী,** (দক্ষিণপাড়া), বোলপুর, বীরভূম। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। উপরের চারচালা বিষ্ণুপুরী ঢঙে অনুপাতে ছোট তবে আমলক ও কলস-বিশিষ্ট। (চ) বোলপুর থেকে কাটোয়া/বর্ধমান/বাসাপাড়া/পালিতপুর প্রভৃতি বাসে শেরাণ্ডী। রিক্সা।

৩২৮। (ক) **ঐ** (মাঝের পাড়া)। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। নীচ ও উপরের দুটি চারচালাই অনুপাতে অনেক খাড়া, হয়ত পাশের দেউলটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার প্রয়োজনে। (চ) ঐ।

৩২৯। (ক) **বীরচন্দ্রপুর,** ময়ূরেশ্বর, বীরভূম। (খ) বাঁকা রায়। (ঘ) বৃহৎ উচ্চতা (আনু. ৩৫ ফুট)। নিরলংকার। উপরের চারচালাটি অদূরবর্তী তারাপীঠের ঢঙে অতি ক্ষীণ ও অতি শীর্ণ। সামনে নাট দালান। (চ) রামপুরহাট থেকে মৌড়েশ্বর হয়ে সাঁইথিয়াগামী বাসে, বাস রাস্তার ধারেই।

৩৩০। (ক) **সুরুল** (পশ্চিমপাড়া), বোলপুর, বীরভূম। (খ) শিব। (খ) ত্রিখিলান। নাতিবৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৩০ ফুট)। টেরাকোটা। প্রাঙ্গণে শিবের একটি দেউল। (চ) শান্তিনিকেতন থেকে রিক্সায়—সরকার বাড়ীর আগে, মূল রাস্তা হতে ভিতরে ঢুকে।

৩৩১। (ক) **দাসকলগ্রাম** (পশ্চিমপাড়া), নানুর, বীরভূম। (খ) শিব—দুটি আটচালা। (ঘ) মাঝারি। উপরের চারচালা তারাপীঠ/বীরচন্দ্রপুরের ঢঙে অতি ক্ষুদ্র। টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। (চ) কাটোয়া/আহমদপুর/বোলপুর থেকে বাসে।

৩৩২। (ক) **জলন্দী** (ফৌজদারপাড়া), নানুর, বীরভূম। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা। (চ) বোলপুর থেকে বাসে নানুর। ভ্যানরিক্সা (৭/৮ কি.মি.)। **প্রাসঙ্গিকী :** গবেষক দেবকুমার চক্রবর্তীর অনুমান অনুসারে জলন্দী ধর্মমঙ্গলে কথিত সামন্তশেখর রাজার 'জলন্দার গড়' হতে পারে।*

৩৩৩। (ক) **পাত্রসায়ের (ঘোষালপাড়া),** বাঁকুড়া। (খ) শ্যাম-রঘুবীর। (গ) ঘোষাল পরিবার। (ঘ) পাথরে নির্মিত। মাঝারি। টেরাকোটা-সমৃদ্ধি। বিষ্ণুপুরী। (চ) বর্ধমান (তিনকোণিয়া) থেকেবাসে। (এই প্রসঙ্গে দেখুন ক্রম ৩৮০।)

৩৩৪। (ক) **ঐ।** (দক্ষিণপাড়া, চন্দনতলা)। (খ) পরিত্যক্ত। (গ) কর্মকার পরিবার। (ঘ) পাথরে নির্মিত। মাঝারি। টেরাকোটা ও পঙ্খ। (চ) ঐ।

৩৩৫। (ক) **হাটকৃষ্ণনগর (ময়ড়াপাড়া),** পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া। (খ) দামোদর। (গ) নাগ পরিবার। (ঘ) মাঝারি। পঙ্খ। সামান্য টেরাকোটা। (চ) বর্ধমান (তিনকোণিয়া) থেকে পাত্রসায়ের, সোনামুখী প্রভৃতি বাসে গ্রামের পথেই নামা।

৩৩৬। (ক) **ঐ।** (তাঁতিপাড়া)। (খ) দামোদর। (গ) কুণ্ডু পরিবার। (ঘ) মাঝারি। পঙ্খ। (চ) ঐ।

৩৩৭। (ক) **কোতুলপুর** (জগন্নাথপুর পাড়া), বাঁকুড়া। (খ) ক্ষুদি রায় (ধর্ম)। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (চ) তারকেশ্বর/আরামবাগ/জয়রামবাটি থেকে বাসে (কলকাতা থেকেও সরাসরি বাসে)।

৩৩৮। (ক) **জয়কৃষ্ণপুর,** বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। (খ) রাধাকৃষ্ণ। (গ) বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। (ঘ) নাতিবৃহৎ। নিরলংকার। পূর্ণ সংস্কৃত। (চ) বিষ্ণুপুর থেকে বাসে অতি সহজে। ব্যাসস্ট্যাণ্ডের কাছে।

৩৩৯। (ক) **পাইকপাড়া;** বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। (খ) পরিত্যক্ত। (ঘ) ছোট। বিষ্ণুপুরী। জীর্ণ। (চ) ঐ। জয়কৃষ্ণপুর-অযোধ্যা পথের ধারে, মাঠে।

৩৪০। (ক) **কাগ্রাম,** ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব। (গ) রায়চৌধুরী পরিবার। (ঘ) মাঝারি। পঙ্খ। (ঙ) কাটোয়া থেকে সালারে গিয়ে ভ্যানরিক্সা।

৩৪১। (ক) **নিশিরাগড়,** মেমারি, বর্ধমান। (খ) পরিত্যক্ত। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৩০/৩৫ ফুট)। টেরাকোটা (ক্ষয়িত)। (ঙ) বর্ধমান মেইন লাইনের দেবীপুর স্টেশন থেকে রিক্সায়।

৩৪২। (ক) **আঝাপুর,** জামালপুর, বর্ধমান। (খ) শিব। (গ) মিত্র পরিবার। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা। (চ) বর্ধমান কর্ড লাইনের মসাগ্রাম থেকে রিক্সায়—সাতদেউলিয়ার লাগোয়া।

৩৪৩। (ক) **এরুয়ার** (কালীতলার পথে), ভাতাড়, বর্ধমান। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি।

* 'বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি', প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, প.ব. সরকার, পৃ. ৩৯।

৩৪৪। (ক) **ঐ** (কালীতলা)। (খ) শিব। (ঘ) নাতিবৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৩০ ফুট। উঁচু অধিষ্ঠানের উপর। নিরলংকার। (চ) ঐ।

৩৪৫। (ক) **ঐ** (মহারুদ্রতলা পেরিয়ে)। (খ) শিব। (ঘ) ছোট। কিছু পঙ্খ। (চ) ঐ।

৩৪৬। (ক) **ইলামবাজার** (দালালপাড়া), বীরভূম। (খ) শিব। (ঘ) নাতিবৃহৎ। পূর্ণ সংস্কৃত। প্রাঙ্গণে একটি ত্রিখিলান দুর্গাদালান। (চ) বোলপুর থেকে বাসে সহজে ইলামবাজার। রিক্সায়। বামুনপাড়া (লক্ষ্মীজনার্দনের পঞ্চরত্ন) হতে সোজা গেলে পথের শেষদিকে, ডানে।

৩৪৭। (ক) **ঐ।** (খ) শিব। (ঘ) ঐ, দুর্গাদালানসহ। (চ) ঐ। সামান্য তফাতে, বাঁয়ে।

৩৪৮। (ক) **কাঁকড়াকুলি** (মাঝের পাড়া), ধনিয়াখালি, হুগলী। (খ) পরিত্যক্ত। (ঘ) নাতিবৃহৎ। নিরলংকার। (চ) তারকেশ্বর থেকে বাসে ধনিয়াখালি সিনেমাতলা। রিক্সা/ভ্যানরিক্সা—বিখ্যাত লক্ষ্মী-জনার্দন মন্দিরের পরেই।

৩৪৯। (ক) **ঐ।** (খ) শিব। (ঘ) ছোট। অতি জীর্ণ। (চ) মোড় হতে বাঁয়ের রাস্তায় সামান্য এগিয়ে বাঁয়েই, একটি বাড়ীর প্রাঙ্গণে।

৩৫১। (ক) **চোপা** (প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ), ধনিয়াখালি, হুগলী। (খ) শিব। (খ) ছোট। পূর্ণ সংস্কৃত। নিরলংকার। (চ) ক্রম ৩১৩।

৩৫২। (ক) **জেরুর,** ধনিয়াখালি, হুগলী। (খ) শিব। (ঘ) নাতিবৃহৎ। টেরাকোটাসম্পন্ন। (চ) ক্রম ৩১৩।

৩৫৩। (ক) **গুড়বাড়ি,** ধনিয়াখালি, হুগলী। (খ) শিব। ঘোষ পরিবার। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (চ) ক্রম ৩১৩। (দ্রঃ মন্দিরের সামনে একটি সাম্প্রতিক বয়ানে বলা হয়েছে যে এটি ১১৯৫ বঙ্গাব্দের বহু পূর্বে স্থাপিত—আমাদের কিন্তু এটি ১৯ শতকীয় বলেই মনে হয়েছে, এটির লাগোয়া দুর্গাদালানটি সম্পর্কেও একই কথা।)

৩৫৪। (ক) **ঐ।** (রাধাগোবিন্দের রাসমঞ্চের কাছে)। (খ) শিব। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (চ) ক্রম ৩১৩।

৩৫৫। (ক) **বাখরপুর** (আধকাটা), পুরশুড়া, হুগলী। (খ) শিব। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (চ) তারকেশ্বর থেকে অমরপুরগামী বাসে/ট্রেকারে ভাঙামোড়া স্কুল স্টপ—অদূরে বাখরপুরের বিখ্যাত টেরাকোটা-সজ্জিত আটচালা ও ভগ্ন চারচালার পিছনের চাষমাঠে পেরিয়ে—আশেপাশে কটি লুপ্ত মন্দিরের ঢিবি। (দ্রঃ মূল রাস্তার বিপরীতে একটি বৃহৎ কিন্তু মৃত মন্দির ঘন জঙ্গলে আকীর্ণ হয়ে আছে।)

৩৫৬। (ক) **ভাঙামোড়া** (বাজারপাড়ার পরে), পুরশুড়া, হুগলী। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) ঐ। বাখরপুরের বিপরীতে। বাজারপাড়া হতে শোঙালুক গামী পথে এগিয়ে, ডানে। কিছুটা তফাতে।

৩৫৭। (ক) **ঐ (শুভচণ্ডীতলা)।** (খ) শুভচণ্ডী। (ঘ) নাতিবৃহৎ। নিরলংকার।—পথের বিপরীতে ঘরবাড়ির আড়ালের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি লোকবিশ্বাসে জয়চণ্ডীর শ্বশুরবাড়ি। (চ) ঐ। ভাঙামোড়া-শোঙালুক গ্রামপথের পাশে।

৩৫৮। (ক) **উত্তর বৈকুণ্ঠপুর (বুনিয়াদি বিদ্যালয়),** পুরশুড়া, হুগলী। (খ) শিব। পরিত্যক্ত। (ঘ) মাঝারি। সামান্য টেরাকোটা—সামান্য অবশিষ্ট। (চ) ঐ বাসে/ট্রেকারে বৈকুণ্ঠপুর সমবায় সমিতি স্টপ—সামান্য হেঁটে, বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারের একপাশে বৃহৎ ভগ্ন পঞ্চরত্ন ও অন্যপাশে আটচালাটি।

৩৫৯। (ক) **শিবপুর,** উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া। (খ) রঘুনাথ। (গ) সামন্ত পরিবার। (ঘ) মাঝারি। দুপাশের দেওয়ালে নকল দরজা, কিন্তু সংস্কারে প্রাক্তন টেরাকোটার জায়গায় আধুনিক রঙীন মূর্তি বসানোয় শোভা ক্ষুণ্ণ। (চ) প্রাগুক্ত উদয়নারায়ণপুর হতে রিক্সা/ভ্যানরিক্সা।

৩৬০। (ক) **দিগ্‌নগর** (মুসলমান পাড়ার কাছে), আউসগ্রাম, বর্ধমান। (খ) শিব।। (ঘ) নাতিবৃহৎ (উচ্চতা তিরিশ ফুটের কাছাকাছি)। সামনে টিনের চালের নাটদালান। (চ) বর্ধমান-আসানসোল লাইনের মানকর থেকে. গুসকরার বাসে অভিরামপুর। ভালকি ও দিগ্‌নগর দেখানোর চুক্তিতে ভ্যানরিক্সায়।

৩৬১। (ক) **ভালকি** (অধিকারীপাড়া), আউসগ্রাম, বর্ধমান। (খ) শিব। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৩০ ফুটের বেশি)। টেরাকোটা। প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু অধিষ্ঠান। (চ) ঐ।

৩৬২। (ক) **জগৎবল্লভপুর (সাহাপাড়া),** হাওড়া। (খ) হট্টেশ্বর শিব। (ঘ) ঘেরা ক্ষেত্র। নাতিবৃহৎ। নিরলংকার। সামনে বৃহৎ নাটমণ্ডপ। পাশে ভোগ ঘর। বিপরীতে পুকুরপাড়ে আটচালা ধাঁচের দোলমঞ্চ সংস্কারে আধুনিক স্থাপত্যে পরিণত। (চ) জগৎবল্লভপুর থেকে ভ্যানরিক্সা।

৩৬৩। (ক) **চাঁদুল** (তেলিপাড়া), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) পাতিহাল হাটতলা থেকে ভ্যানরিক্সা।

৩৬৪। (ক) **পারবালিয়া,** জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) শিব। (গ) ঘড়া পরিবার। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (চ) পাতিহাল (হাটতলা) থেকে ভ্যানরিক্সা।

৩৬৫। (ক) **ত্রিপুরাপুর,** জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) শিব—পরিত্যক্ত। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা ৩০ ফুটের মত)। সামান্য টেরাকোটা। (চ) ঐ। মূল পথ হতে ডানে ঘুরে। পথের পাশে।

৩৬৬। (ক) **ঐ**। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) ঐ। এগিয়ে। বাড়ির ভিতরে।

৩৬৭। (ক) **রণমহল,** জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। সামনে আধুনিক নাটমন্দির যুক্ত হয়েছে। (চ) ঐ—একই ভ্যানরিক্সায়।

৩৬৮। (ক) **প্রতাপপুর** (ধর্মতলা), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) পরিত্যক্ত। (ঘ) ছোট। সাধারণ। (চ) ঐ—একই ভ্যানরিক্সায়।

৩৬৯। (ক) **আঁটপুর** (বিবেকানন্দ-সন্ন্যাস গৃহের সামনের পুকুরপাড়ে), জাঙ্গীপাড়া, হুগলী। (খ) শিব। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। সংস্কৃত। (চ) হরিপাল থেকে বাসে।

৩৭০। (ক) **ঐ** (রাধাগোবিন্দ প্রাঙ্গণ, রাসমঞ্চ ও চণ্ডীমণ্ডপের মাঝে)। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। (চ) ঐ।

৩৭১। (ক) **ঐ** (রাধাগোবিন্দের পঞ্চরত্ন দোলমঞ্চের সামনে, বাসরাস্তার কাছে)। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। টেরাকোটা-সমৃদ্ধ ব্যতিক্রমী—সারা সম্মুখগাত্র টেরাকোটা ফুল। (চ) ঐ।

৩৭২। (ক) **শঙ্করপুর,** ধনিয়াখালি, হুগলী। (খ) শিব। (ঘ) বৃহৎ। নিরলংকার। (চ) গুড়াপ থেকে ভ্যানরিক্সায়।

৩৭৩। (ক) **মানকর,** বুদবুদ, বর্ধমান। (খ) শিব। (খ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) বর্ধমান-আসানসোল লোকালে মানকর। রিক্সা—মানিকেশ্বর শিবের বিখ্যাত মন্দিরের পথে।

৩৭৪। (ক) **ঐ** (বিশ্বাসপাড়া)। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকাব। (চ) রেণুবালা দেবীর ভগ্ন কিন্তু দর্শনীয় দুর্গাদালানের সামনেকার বৃহৎ পুকুরের ধারে। (চ) ঐ।

৩৭৫। (ক) **অমরারগড়,** আউসগ্রাম, বর্ধমান। (খ) শিব। (গ) মণ্ডল পরিবাব। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) মানকর থেকে রিক্সায় (বা বাসে)—শিবাখ্যার বিখ্যাত মন্দিরস্থলের অদূরে।

(**অমরারগড়ের** বিভিন্ন পাড়ায় আরও অন্তত তিনটি মাঝারি নিবলংকার আটচালা ও একটি জোড়া আটচালা আছে। দশমন্দির তলার আগে দুটি ক্ষুদ্র আটচালাও আছে। সবই শিবের। দশমন্দিরতলার মন্দিরগুলি গুচ্ছ-রূপে পঙ্‌ক্তিকৃত হয়েছে)।

৩৭৬। (ক) **সরপী** (দশ আনা/ছয় আনা), ফরিদপুর, বর্ধমান। (খ) শিব। (গ) রায়চৌধুরী পরিবার। (ঘ) দুটি (পরস্পর হতে সামান্য তফাতে) আটচালা। মাঝারি। নিরলংকার। (চ) অণ্ডাল থেকে বাসে সবপী মোড়। রিক্সা/হাঁটা—রায়চৌধরীদের দশ আনা/ছয় আনা তরফের দুর্গাদালান, লক্ষ্মীজনার্দনের নবরত্ন প্রভৃতির আগে।

৩৭৭। (ক) **সর,** আউসগ্রাম, বর্ধমান। (খ) শিব—পরিত্যক্ত। (ঘ) ছোট। দ্বারশীর্ষে চমৎকার টেরাকোটা। (চ) বর্ধমান (তিনকোণিয়া) থেকে বাসে (বা বর্ধমান-আসানসোল লোকাল ট্রেনে) গলসী—ভ্যানরিক্সা। সরেশ্বরের সুউচ্চ দেউলের বিপীরেতের সরু পথে। (দ্র: এই পথেই সামান্য এগিয়ে বাঁয়ে একটি আটচালার অবশেষ ও ডানে আরও একটি আটচালা)।

৩৭৮। (ক) **গলসী,** বর্ধমান। (খ) গর্গেশ্বর শিব। (ঘ) নাতিবৃহৎ। নিরলংকার—সামনে সামান্য তফাতে চমৎকার নাটমণ্ডপ। কিছুটা উঁচু ঢিবির মত ক্ষেত্র। (চ) বর্ধমান থেকে ঐ বাসে/ট্রেনে গলসী। ভ্যানরিক্সা। গ্রামের মাঝখানে।

৩৭৯। (ক) **মল্লিকপুর,** গলসী, বর্ধমান। (খ) কাশীনাথ শিব। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। সামনে নাটমণ্ডপ। (চ) বর্ধমান (তিনকোণিয়া) বা গলসী থেকে আদরাহাটি হয়ে বাকতা (গড়ম্বা)-র বাসে। গ্রামের অতীব মান্য ক্ষেত্র।

৩৮০। (ক) **পাত্রসায়ের,** বাঁকুড়া। (খ) বিষ্ণু (শালগ্রাম)। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা আনু. ৪০/৪৫ ফুট)। ত্রিখিলান। পাথরের নির্মাণ। ঘেরা ক্ষেত্র। (চ) ক্রম ৩৩৩-এ কথিত শ্যাম-রঘুবীর ক্ষেত্র হতে ঐ রাস্তা ধরেই থানার দিকে যেতে বাঁয়ে উঁচু চূড়া দেখা যাবে।

৩৮১। (ক) **ছয়ঘরিয়া** (পূবপাড়া), বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা। (খ) শিব—পরিত্যক্ত। (গ) রায়চৌধুরী পরিবার। (ঘ) নাতিবৃহৎ। সামান্য পঙ্খ অবশিষ্ট। জীর্ণ। (চ) শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখার বনগাঁ স্টেশন থেকে রিক্সা/ভ্যানরিক্সায়, বাংলাদেশ-সীমান্তের কাছে—মন্দিরটি রায়চৌধুরীদের বসতবাটির সামান্য তফাতে, বাইরের রাস্তা ঘেষে। (দ্র: পঞ্জিকৃত হওয়ার পরে মন্দিরটির লিপিটি নজরে পড়েছে—লিপিটি হল : "শ্রী দুর্গা/শ্রীচন্দ্র মিস্ত্রী/সাকিন বিরনগর/সন ১২৫৯ সন/সাহা ৩০ চৈত্র তইয়ার"—সুতরাং মন্দিরটি ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। লক্ষণীয় যে লিপিতে প্রতিষ্ঠাতার নাম নেই, কারিগরের আছে; কারিগর হলেন নদীয়ার বীরনগরের শ্রীচন্দ্র মিস্ত্রী।)

৩৮২। (ক) **ঐ**। (খ) দুটি শিব—পরিত্যক্ত। (গ) ঐ। (ঘ) রায়চৌধুরীদের ভিতর বাটির প্রবেশদ্বারের দুপাশে দুটি মাঝারি আটচালা, সামান্য টেরাকোটা অবশিষ্ট। (চ) ঐ। **প্রাসঙ্গিকী** : অবিভক্ত বাংলার যশোহর রোডের লাগোয়া ছয়ঘরিয়া প্রাচীন গ্রাম। রাজা রামচন্দ্র খাঁর জামাতার বংশধর রমাবল্লভ মুখোপাধ্যায়ের ছয় পুত্রের মধ্যে দুজন এই গ্রামের বাসিন্দা হলেও ছয় ভাইয়ের জন্যই গ্রামের নাম নাকি 'ছয়ঘরিয়া' হয়। রায়চৌধুরী এঁদের জমিদারী পদবী। এঁদের হাতেই একদা জঙ্গলাকীর্ণ ও কাপালিক তান্ত্রিকদের সাধনক্ষেত্র বলে পরিচিত গ্রামটির বিকাশ ঘটে এবং চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কৃতী পরিবারও এখানে বসবাস শুরু করেন—সিন্ধু সভ্যতার প্রখ্যাত আবিষ্কারকদের অন্যতম রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক কুল এই গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন।*

চাকদহ-বনগাঁ রোডের **কামালপুর বা ভট্টাচার্য-কামালপুর** একসময় নব্যন্যায় চর্চার শীর্ষে ছিল এবং এখানকার পণ্ডিত সমাজের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাও ছিল দেশব্যাপী। এখানকার গাঙ্গুলী বংশের **রঘুদেব বাচস্পতি** ছিলেন সারা ভারতের গৌরব। তিনি ছাড়াও এখানকার বিদ্যাসমাজে পরপর আবির্ভূত হয়েছেন বহু মহামান্য দিকপাল পণ্ডিত। ভাটপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিত-সমাজ এঁদেরই শিষ্যকুল। এখন তাঁদের চিহ্ন-মাত্রও নেই, তবে দুটি আটচালা মন্দির স্মৃতিভারে জর্জরিত হয়ে আছে। —ঐ একই বাসপথের **শ্রীনগর** একসময় নদীয়ারাজের রাজধানী ছিল। শ্রীনগরের টেরাকোটা-সজ্জিত কয়েকটি মন্দিরের খ্যাতিও ছিল যথেষ্ট, কিন্তু আমরা ওখানে গড়, পরিখা প্রভৃতির অবশেষ দেখতে পেলেও মন্দিরগুলি খুঁজে পাইনি, তবে অনতিদূরের **শিমুলিয়াতে** একটি জোড়া আটচালা ও একটি অর্বাচীন শিব মন্দির (আটচালা, ১৯৬৪) আছে।

৩৮৩। (ক) **দক্ষিণ বাওয়ালি** (চড়িয়াঁল মোড়, তেঁতুলতলা), বজবজ দক্ষিণ ২৪ পরগনা। (খ) শিব। (গ) মণ্ডল পরিবার। (ঘ) বৃহৎ (উচ্চতা, আনু ৪০ ফুট। নিরলংকার। (চ) বজবজ থেকে বাসে। রাধাকান্তের অতি বৃহৎ আটচালার সামনে, ডানে।

৩৮৪। (ক) **ঐ**। (খ) গোবিন্দ। (গ) ঐ। (ঘ) বৃহৎ। নিরলংকার। (চ) ঐ। রাধাকান্তের সামনে, বাঁয়ে।

* নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ইতিহাসের বনগ্রাম', শিস প্রকাশনী, বনগ্রাম, ১৯৮০, পৃ. ৩৫-৪১।

৩৮৫। (ক) **ঐ।** (খ) **লক্ষ্মীনারায়ণ।** (গ) ঐ। (ঘ) বৃহৎ। সামনে বৃহৎ নাটমন্দির। নিরলংকার। (চ) ঐ। গোপীনাথের নবরত্ন ও পুকুরের মাঝের রাস্তায় সামান্য এগিয়ে।

৩৮৬। (ক) **ঐ।** (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) ঐ পথেই এগিয়ে, বাঁয়ে ঘুরে।

৩৮৭। (ক) **কালীঘাট (সদরঘাট),** ২৮০ কালীঘাট রোড, কলকাতা-২৬। (খ) কালী। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) কালীঘাটের বিখ্যাত মন্দিরের অদূরে, আদিগঙ্গার তীরে।

৩৮৮। (ক) **৬৭ চেতলা রোড,** কলকাতা-২৭। (খঘ) শিব। (গ) গণোকচন্দ্র কয়াল। (ঘ) ক্ষুদ্র। নিরলংকার।

৩৮৯। (ক) **মাদরাল** (জয়চণ্ডীতলা), জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা। (খ) জয়চণ্ডী। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। সামনে ছোট নাটমণ্ডপ। সামনে তফাতে দোলমঞ্চ (বর্তমানে মন্দিরে পরিণত)। (চ) শিয়ালদহ-নৈহাটি লাইনের কাঁকিনাড়া থেকে রিক্সা।

৩৯০। (ক) **রহড়া** (মন্দিরপাড়া, ওল্ড ক্যালকাটা রোড), খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা। (খ) শিব (বর্তমানে কালী)। (ঘ) নাতিবৃহৎ। নিরলংকার। (চ) শিয়ালদহ-নৈহাটি লাইনের খড়দহ স্টেশন থেকে রিক্সায়, মিশনপাড়া ও জেলা গ্রন্থাগারের পিছনে।

৩৯১। (ক) **সরিশা,** ডায়মণ্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। (খ) দক্ষিণা কালী। (ঘ) অতি বৃহৎ (আনু. উচ্চতা ৫০ ফুট)। সংস্কারে আদি অলংকরণ লুপ্ত (স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক ১৯৬২ ও ১৯৯২-এ পূর্ণরূপে সংস্কৃত)। (চ) শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ডায়মণ্ড হারবার থেকেবাসে/ট্রেকারে সরিষা বাজার—এখান থেকে ডানে ঢোকা পথে (তবে সরিশা মোড় থেকে চুক্তিব ভ্যানরিক্সায় সরিশা, খোর্দ্দ বাজার, পাটদহ ও কামারপোলের মন্দিরগুলি দেখে নেওয়া সুবিধাজনক)।

৩৯২। (ক) **ঐ।** (খ) মদনগোপাল। (ঘ) অতি বৃহৎ (আনু. উচ্চতা ৫০ ফুট)। পঙ্খ (বিশেষত উপরের চারচালার সামনে দেওয়ালে)। (চ) ঐ। একই পথে কিছুটা এগিয়ে বাঁয়ে, 'বান্ধব সমাজে'র কাছ থেকে ঢোকা সরু পথের শেষে, পুকুরের ওপাশে।

৩৯৩। (ক) **ঐ।** (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি, সংস্কৃত। (চ) ঐ। মদনগোপালের আগে পুকুরটির এপাশে, রাস্তা ঘেষে, সরকারদের দুর্গদালানের লাগোয়া।

৩৯৪। (ক) **কামারপোল,** ডায়মণ্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। (খ) শিব। (ঘ) অতি জীর্ণ। পলেস্তরাহীন। পিছনের ও পাশের দেওয়ালের ইট ভীষণভাবে ক্ষয়িত। অপিচ দৃষ্টি আকর্ষণকারী মাঝারি আটচালা। (চ) ডায়মণ্ড হারবার থেকে নূরপুর/রায়চক বসে। স্টপেজ থেকে গ্রামে ঢোকা ইটের রাস্তায়, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনের জোড়া মন্দির ছেড়ে এগিয়ে বাঁয়ে—ডানে অদূরে রাধাকান্তের বৃহৎ আটচালা।

৩৯৫। (ক) **ভাদুড়া,** ডায়মণ্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। (খ) শিব। (গ) সামন্ত পরিবার। (ঘ) মাঝারি। সংস্কারের টেরাকোটা প্রায় লুপ্ত। (চ) ডায়মণ্ড হারবার থেকে বাসে—সরিশা ছেড়ে।

৩৯৬। (ক) **বাহিরকাঞ্চলি,** মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। (খ) শিব। (গ) মণ্ডল পরিবার। (ঘ) ছোট, নিরলংকার। শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনের মথুরাপুর থেকে অটোয় কাশীনগর। ভ্যান রিক্সা।

৩৯৭। (ক) **ঐ।** (খ) কালী। (গ) ঐ। (ঘ) ঐ। (চ) ঐ।

৩৯৮। (ক) **শোভানগর,** মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। (খ) শিব। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। (চ) ঐ। কাশীনগরের দেড় কি.মি. আগে। পিচ রাস্তার পাশে।

৩৯৯। (ক) **খাড়ি,** মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। (খ) রাধাবল্লভ। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) ঐ। কাশীনগর থেকে ভ্যানরিক্সায়।

(দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আটচালা মন্দির আরো যেসব গ্রামে আছে তার কয়েকটি হল **রাজারামপুর** (বজবজ), **জয়রামপুর** ও **গোবিন্দপুর** (বিষ্ণুপুর), **গাববেড়িয়া** (কুলপী) ও **রাজপুর।** এর কয়েকটি টেরাকোটা-সম্পন্ন। তবে, রাজপুরের ভবানীশ্বর শিবের আটচালা মন্দিরটি বেশি পুরাতন, সম্ভবত ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। প্রসঙ্গত, **রাজপুর-হরিনাভি-চাংড়িপোতা** অঞ্চল মহামান্য বিদ্যাসমাজের জন্য ১৮/১৯ শতকে **'দক্ষিণ-নবদ্বীপ'** বলে পরিচিত ছিল। আচার্য বিনয় ঘোষ-এর চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন।* এখানকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন শ্যামসুন্দর ন্যায়পঞ্চানন, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ধনেশ্বর ন্যায়রত্ন, প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, বাসুদেব বেদান্তবাগীশ প্রমুখ অনেকজন মহাপণ্ডিত। এছাড়া সাহিত্যক্ষেত্রে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রামনারায়ণ তর্করত্ন ও শিবনাথ শাস্ত্রী, রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ছিলেন ১৯ শতকীয় বাংলার উজ্জ্বলনীলমণি বিশেষ।)

৪০০। (ক) **কাঁঠালপাড়া,** নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা। (খ) শিব। (গ) চট্টোপাধ্যায় পরিবার। (ঘ) মাঝারি, নিরলংকার। (চ) সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বসতবাটির পূর্বদিকের সীমানা দেওয়াল ঘেষে—বিপরীতে সামান্য তফাতে বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহদেবতা রাধাবল্লভের দালান-মন্দির। পশ্চিমে রেললাইনের কাছে একটি পঞ্চরত্ন। —শিয়ালদহ মেইন লাইনের নৈহাটি স্টেশনের পূবদিক হতে বেরিয়ে রেল কলোনির ভিতর দিয়ে দক্ষিণে সামান্য হেঁটে।

৪০১। (ক) **পানিহাটি** (ঘোষপাড়া, ত্রাণনাথ ব্যান্যার্জীর গঙ্গাঘাটের কাছে), খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা। (খ) মনস্কামনেশ্বর শিব। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) কলকাতা ধর্মতলা থেকে বারাকপুরের বাসে সোদপুর পিয়ারলেস আবাসনের উত্তর প্রান্তে হরিশ দত্ত রোড স্টপেজে নেমে রিক্সায়, ১২ মন্দিরতলার আগে বাঁয়ে ত্রাণনাথ ব্যানার্জী রোড, ঐ পথে ঐ নামের গঙ্গাঘাটের ঠিক আগে, রাস্তার উপরেই।

৪০২। (ক) **ঐ** (মহাপ্রভুতলা, ত্রাণনাথ ব্যানার্জী রোড)। (খ) জটিলেশ্বর শিব। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (চ) ঐ—আগের পথেই দক্ষিণে কিছু এগিয়ে (অথবা, আগের বাসপথে সোদপুর স্টপে নেমে রিক্সায়)।

---

* 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—৩,' পৃ. ২২০-২২৭।

প্রাসঙ্গিকী

"কথো দিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পানিহাটি— রাঘবমন্দিরে।।
কৃষ্ণকার্যে আছেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত।
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইলা বিদিত।।"
—বৃন্দাবনদাস, 'চৈতন্যভাগবত'।*

রাঘব পণ্ডিত ছিলেন শ্রীচৈতন্যের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ। পানিহাটির মহাপ্রভুতলার কাছে, **মাধবীলতা কুঞ্জে, ছিল রাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট**, এখানেই তাঁর সমাধি এবং এখানে তাঁর পূজিত মদনমোহন বিগ্রহ আজও সেবা পাচ্ছেন। শ্রুতি অনুসারে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ এখানে গঙ্গাতীরের বটবৃক্ষতলে বিশ্রাম করেন—তাই স্থানটির নাম হয়েছে 'মহাপ্রভুতলা।'

৪০৩। (ক) **নাসিগ্রাম,** ভাতাড়, বর্ধমান। (খ) কালী? (ঘ) ছোট, নিরলংকার—একটি উঁচু ঢিবির উপরে। পূর্ণ সংস্কৃত। (চ) বর্ধমান (তিনকোণিয়া) বা ভাতাড় থেকে বাসে। বিখ্যাত বড় রঘুনাথ মন্দিরের আগে, মোড় থেকে বাঁয়ে ঘুরে রাস্তা ঘেষা ঢিবির উপরে, ঘেরা ক্ষেত্রে।

৪০৪। (ক) **গোঁসাইখণ্ড (খটনগর),** আউসগ্রাম, বর্ধমান। (খ) শিব—পরিত্যক্ত। (ঘ) নাতিবৃহৎ। অলংকরণ লুপ্ত। জীর্ণ। তথাপি আকর্ষণীয়। ঘেরা ক্ষেত্রে একটি পরিত্যক্ত দ্বিতল দুর্গাদালান ও একটি রেখ দেউল। (চ) বোলপুর-গুসকরা (ভায়া ভেদিয়া) বাসে উত্তর রামনগর-খটনগর (বাজার), নিমতলা স্টপ থেকে ভ্যানরিক্সা। বোলপুর আগের স্টেশন ভেদিয়া থেকে মোরবাঁধের বাসেও যাওয়া চলে।

৪০৫। (ক) **নাড়াজোল,** দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) মৃত্যুঞ্জয় শিব। (গ) নাড়াজোল রাজ-পরিবার। (ঘ) ছোট। টেরাকোটা ও পঙ্খ। (ঙ) ১৯০৮। (চ) মেদিনীপুর শহর, ঘাটাল, পাঁশকুড়া বা দাসপুর থেকে বাসে নাড়াজোল, হেঁটে রাজবাড়ী (বর্তমানে 'নাড়াজোল রাজ কলেজ')—দুর্গাদালানের সামনে।

(উপরের পঞ্জির বাইরে বেশ কিছু একক আটচালা মন্দির আছে পশ্চিমবাংলায়—যেমন হুগলীর **ভাণ্ডারহাটিতে** আছে আরও কয়েকটি ১৯ শতকীয় আটচালা। প্রকৃতপক্ষে হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমানের অনেক গ্রামে এমন আটচালা মন্দির আছে যেগুলি কোথাও পঞ্জিকৃত হয়নি।)

বি.দ্র. : কলকাতার মন্দিরগুলির পঞ্জিকরণ অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে করেছেন শ্রদ্ধেয় **তারাপদ সাঁতরা।** উপরের পঞ্জিতে তাই কলকাতার কিছু মন্দির শুধু দৃষ্টান্ত হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। কলকাতার আটচালা মন্দিরগুলির তথ্যের জন দেখুন—

তারপদ সাঁতরা : 'কলকাতার মন্দির-মসজিদ, স্থাপত্য-অলংকরণ রূপান্তর,' আনন্দ, ২০২, সারণি ১-৩, পৃ. ৬৮-৭১। বলা বাহুল্য এই বইয়ের পরবর্তী পঞ্জিগুলিতেও একই নীতি অনুসৃত হয়েছে।

* প্রাগুক্ত সংস্করণ, শেষখণ্ড, পৃ. ৩৩৭।

পঞ্জি—৫(ক)

সমতল চাদের আটচালা (দালানের আটচালা-অনুকৃতি) : (ক) **সেলানপুর** (বদনগঞ্জ ফুলুই ২নং পঞ্চায়েৎ), গোঘাট, হুগলী। (খ) দামোদর। (ঘ) ঘোষ পরিবার। (ঘ) আনু. উচ্চতা ২৬/২৬ফুট। সমতল কার্নিশযুক্ত একতলা দালানের উপর আটচালার দ্বিতলের ছোট চারচালার ছাঁদে ছোট দালান। চালা ছাড়া আটচালাও হয় না, তাই একে আটচালার অনুকৃতিতে দালান বলাই মনে হয় ভাল। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) আরামবাগ বা কামারপুকুর থেকে পাণ্ডুগ্রাম ও কৃষ্ণগঞ্জ হয়ে সেলানপুর ১০/১২ কি.মি.—বাস থাকলেও রিজার্ভ গাড়িতে যাওয়া সুবিধাজনক।

পঞ্জি—৫(খ)

আটকোণা মন্দিরের আটচালা অনুকৃতি (১৯ শতক) : আটচালা মন্দিরের ব্যাপক জনপ্রিয়তার জন্যই সম্ভবত অত্যন্ত প্রাচীন ঐতিহ্যজাত হলেও ১৯ শতকে বিরল কিছু ক্ষেত্রে আটকোণা দেউলের আটচালা অনুকরণে প্রথমে একটি বৃহত্তব আটকোণা পিরামিড ও দ্বিতীয়ত তার উপরে ক্ষুদ্রতর একটি আটকোণা পিরামিড বসানো হয়েছে। নীচ ও উপরের উভয় পিরামিডেরই আটটি করে দেওয়ালের শীর্ষভাগ কাস্তের মত বক্র করে আটচালার বক্রচালকে অনুকরণ করা হয়েছে, ফলে নীচ-উপর মিলিয়ে পিরামিড দুটি কার্যত (৮ + ৮) ১৬টি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। দেখে একটা আটচালা-আটচালা ভাব পাওয়া গেলেও এ আসলে প্রাচীন আটকোণা দেউলের রকমফের বলেই মনে হয়। —পশ্চিমবঙ্গে এমন দৃষ্টান্তগুলি (উচ্চতা ১৫ থেকে ২০/২৫ ফুটের মধ্যে) হল :

১। **নাসিগ্রাম** (ভাতাড়, বর্ধমান)—তিনটি। প্রথমটি বিখ্যাত বড় রঘুনাথ মন্দিরের ঘেরা চত্বরে টিনের চালের বৃহৎ নাটমণ্ডপের ডানে। পূর্ণ সংস্কৃত। দ্বিতীয়টি, মণ্ডপটির বাঁয়ে গ্রামের রাস্তার কাছে, জীর্ণ ও গ্রামের রাস্তার ওপাশে ঘর-বাড়ির মধ্যে থাকা তৃতীয়টি অতি জীর্ণ। (বর্ধমান থেকে বাসে)।

২। **মসাগ্রাম**, জামালপুর, বর্ধমান। প্রাণেশ্বরতলার মন্দিবগুচ্ছের দুপাশের দুটি। (বর্ধমান কর্ড লাইনের মসাগ্রাম স্টেশন)। ৩. **পাঁচড়া**, জামালপুর, বর্ধমান। ভট্টাচার্য পরিবার। কাছাকাছি দুটি। (মসাগ্রাম থেকে রিক্সা)। এগুলি ছাড়া বর্ধমানের **রামচন্দ্রপুর** (ভাতাড়; গুসকরার কাছে), হুগলীর **রসুলপুর** (পুরশুড়া; তারকেশ্বর থেকে অমরপুরের ট্রেকারে বা খুশীগঞ্জের বাসে মির্জাপুর, এখান থেকে হাঁটা) ও **রাজবলহাটের** (জাঙ্গীপাড়া; হরিপাল বা জাঙ্গীপাড়া থেকে বাসে) রাজবল্লভী মন্দিরের নাটমণ্ডপের শেষে এ জাতীয় মন্দির-স্থাপত্য আছে। এই অংশে উল্লেখিত সব মন্দিরই শিবমন্দির।

পঞ্জি—৫(গ)

গুচ্ছ আটচালা। ছোট (উচ্চতা ২০ ফুটের কম) বা বৃহৎ (উচ্চতা ৩০ ফুটের বেশি) উল্লেখ না থাকলে মাঝারি। অন্যরকম উল্লেখ না থাকলে : একই অধিষ্ঠানে, পাশাপাশি ও একদুয়ারি। দেবতার উল্লেখ না থাকলে সব সময়েই শিব। সময় উল্লেখ না থাকলে আগেরটির বা আগেরগুলির বা ১৯ শতক।

(ı) **জোড়া আটচালা (জোড়া শিব) : ১। ভাটপাড়া** (বাঁধা ঘাট), জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা। প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত বাণেশ্বর পঞ্চানন। ছোট। ভগ্ন। অতি জীর্ণ। পরিত্যক্ত। অসাধারণ টেরাকোটা। ক্ষয়িত।১৭২৪। (শিয়ালদহ মেইন লাইনের কাঁকিনাড়া স্টেশন থেকে রিক্সা। গঙ্গ তীরে। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় অমরকৃষ্ণ পাঠশালার ঘেরা অঙ্গনে)।

২। **শান্তিপুর** (অদ্বৈত ভবন, হাটখোলাপাড়া), নদীয়া। অদ্বৈত প্রভু মন্দির এবং গোকুলচাঁদ মন্দির—চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের লাগোয়া দুই কোণে—অন্য দুই কোণে দালানরীতির মন্দির ও অদ্বৈতপ্রভু মন্দিরের ডানপাশে, কোণে ভোগ ঘর। উভয় মন্দিরই ত্রিখিলান, অদ্বৈতপ্রভু মন্দিরটি অসামান্য টেরাকোটা-শোভিত। উভয় মন্দিরই বেশ উঁচু অধিষ্ঠান-বেদীর উপরে স্থাপিত। ১৭৪০? (শিয়ালদহ-শান্তিপুর লোকালে শান্তিপুর। রিক্সা)

[**বসতপুর,** বর্ধমান, বর্ধমান, ১৭৪১—তথ্য, ম্যাকাচিযন, p. 37]।

৩। **বাঁকুল** (খাড়াপাড়া), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। প্রতিষ্ঠাতা কবিরাজ পরিবার। টেরাকোটা। ১৭৬০। [পাতিহাল হাটতলা থেকে ভ্যানরিক্সা।]

৪। **মণিরামপুর** (উত্তর বারাকপুর), নোয়াপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা। নিরলংকার। যথাক্রমে ১৭৬৪ ও ১৭৬৫। (শিয়ালদহ মেইন লাইনের বারাকপুর স্টেশন লাগোয়া বাসস্ট্যাণ্ড থেকে ৮১নং বাসের শেষ স্টপ ফিসারি গেট/শেওড়াফুলি ঘাট। রিক্সায় জোড়া মন্দির)।

৫। **দুর্গাপুর,** ধনিয়াখালি, হুগলী। সুর পরিবার। কিছু টেরাকোটা। ১৭৭৯। [গুড়াপ থেকে ট্রেকারে/বাস]।

৬। **পাতিহাল** (মজুমদার পাড়া, মন্দিরতলা), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। মুখোমুখি। সামান্য টেরাকোটা। ১৭৮১। (হাওড়া থেকে সরাসরি বাসে)।

৭। **নিত্যানন্দপুর,** মগরা, হুগলী। সামান্য টেরাকোটা। ১৭৮৩। (ব্যাণ্ডেল কাটোয়া লোকালে কুন্তীঘাট। রিক্সা)

৮। **চন্দননগর** (গোন্দলপাড়া, শহীদ মাখনলাল সরণী, দুমন্দিরতলা। নিরলংকার। প্রতিষ্ঠাতা অভিরাম করণহি। ১৭৮৮। (শিয়ালদহ মেইন লাইনের শ্যামনগর স্টেশনের নিকটবর্তী ঘাট থেকে গঙ্গা পেরিয়ে রিক্সায়)।

৯। **বীরনগর,** রাণাঘাট, নদীয়া। প্রতিষ্ঠাতা, অযোধ্যারাম মিত্রমুস্তৌফি। নাতিবৃহৎ। অতি জীর্ণ। ১৭৯০। (শিয়ালদহ মেইনলাইনের বীরনগর থেকে রিক্সা—বিখ্যাত মুস্তৌফি বাড়ির প্রায় সংলগ্ন)।

১০। **হাটবসন্তপুর,** আরামবাগ, হুগলী। চীনা পরিবার। অতি জীর্ণ। ১৭৯১। (আরামবাগ-তারকেশ্বর বাসে বলরামপুর, হাঁটা/ভ্যানরিক্সা)।

১১। **গোপালপুর,** দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। চক্রবর্তী পরিবার। ছোট। পুকুরঘাটে মুখোমুখি। টেরাকোটা। ১৭৯৫। (পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে বেলিয়াঘাটা। রিক্সা)।

১২। **হরিপাল (রায়পাড়া)** হুগলী। ভড় পরিবার। টেরাকোটা সমৃদ্ধ। দোলমঞ্চ। ১৮ শতক। (হাওড়া-তারকেশ্বর লাইনের হরিপাল স্টেশন থেকে রিক্সা)।

১৩। **ঐ। (ঘোষপাড়া)।** ছোট। নিরলংকার। মুখোমুখি। (উপরের রায়পাড়ার মূল রাস্তা ধরে এগিয়ে বাঁয়ে এক সারিতে চারটি আটচালা মন্দির পেরিয়ে মোড় থেকে বাঁয়ের পথে)।

১৪। **ঐ। (জোড় মন্দিরতলা, বড়বাজার)।** ছোট। নিরলংকার। পূর্ণ সংস্কৃত।

১৫। **ঐ। (রায়পাড়ার শেষে,** বৃহৎ পুকুরপাড়ে), নিরলংকার। (রায়পাড়ার শেষে রাস্তার পূর্ণ বাঁকের মুখে বাঁয়ে বৃহৎ পুকুরের পাড়ে)।

১৬। **চণ্ডীদাস-নানুর,** নানুর, বীরভূম। ক্ষয়িত কিন্তু অত্যন্ত উৎকৃষ্ট টেরাকোটা সমৃদ্ধ। (চণ্ডীদাসের ঢিবি। বাশুলি মন্দিরের মুখোমুখি। দুপাশে ও পিছনে চারচালার গুচ্ছ। —বোলপুর থেকে সরাসরি বাসে)।

১৭। **দাসকলগ্রাম** (পশ্চিমপাড়া), নানুর, বীরভূম। টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। বোলপুর বা কাটোয়া থেকে বাসে কীর্ণাহার। ভ্যানরিক্সা।

১৮। **বোড়াগড়ি,** পাণ্ডুয়া, হুগলী। নাতিবৃহৎ। পঞ্চ। (বর্ধমান মেইন লাইনের বৈঁচি থেকে রিক্সায় বা বর্ধমানমুখী বাসপথের বেলতলা স্টপ—গ্রামে ঢুকলে মোড়ে সামনাসামনি দৃষ্ট হবে)।

১৯। **শুকদেবপুর,** বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। পাল পরিবার। টেরাকোটা দ্বারপাল। ধর্মতলা/বজবজ/ডায়মণ্ড হারবার থেকে বাসে আমতলা হাট। ভ্যানরিক্সা।

২০। **ঐ।** সিংহ (বর্তমানে ঘোষ) পরিবার। নিরলংকার। ঐ।

২১। **সাঁইবন,** খড়দহ,উত্তর ২৪ পরগনা। সম্প্রতি পূর্ণ সংস্কৃত। বিখ্যাত নন্দদুলাল মন্দিরের সামনের পুকুরপাড়ে শিয়ালদহ মেইন লাইনের সোদপুর থেকে ৫৬নং বাসের সাঁইবন স্টপ থেকে সামান্য হাঁটা, বা ঐ লাইনেরই বারাকপুর থেকে বারাসতের বাসে জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউশন স্টপ থেকে হেঁটে/রিক্সায়।

২২। **মজিলপুর** (দত্তপাড়া), জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। দত্ত পরিবার। নিরলংকার। জীর্ণ। ঘেরা ক্ষেত্রে এব সঙ্গে একটি বাসমঞ্চ। (লক্ষ্মীকান্তপুর/কাকদ্বীপ লোকালে জয়নগর মজিলপুর রিক্সা। গোপালের দালান মন্দিরেব কাছে)।

২৩। **সাহাগঞ্জ** (খামারপাড়া, সাহাগঞ্জ মেইন রোড), চুঁচুড়া, হুগলী। নন্দী পরিবার। বৃহৎ। ক্ষেত্রে ছটি গম্বুজাকৃতি মন্দির ও একটি বাসমঞ্চ। (চুঁচুড়া-বাঁশবেড়িয়া বাসপথে)।

২৪। **রাণাঘাট (পালচৌধুরী রোড),** নদীয়া। শম্ভুচন্দ্র পালচৌধুরী। উঁচু অধিষ্ঠান বেদী। টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। ১৮০২। শিয়ালদহ মেইন লাইনের রাণাঘাট স্টেশন থেকে রিক্সায়—ষষ্ঠীতলা ও নিস্তারিণীতলা পেরিয়ে।

২৫। **বাঁশবেড়িয়া** (মাঝপাড়া, আর. বি. নন্দন রোড), হুগলী। নাতিবৃহৎ। গঙ্গাঘাটের দুপাশে দুটি। মুখোমুখি। গঙ্গার দিকেও অতিরিক্ত প্রবেশদ্বার। ১৮০৬। (চুঁচুড়া-বাঁশবেড়িয়া বাসপথে)।

২৬। **বড়বেলুন,** ভাতাড়, বর্ধমান। ভট্টাচার্য পরিবার। নিরলংকার। ১৮১৯। (বর্ধমান তিনকোণিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে ভাতাড় হয়ে)।

২৭। **বালী** (বাঁধাঘাট), হাওড়া। ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গঙ্গাঘাটের দুপশে। ১৮২৮। (হাওড়া-ব্যাণ্ডেল লাইনের বালী স্টেশন—বিবেকানন্দ সেতুর দক্ষিণ-পাশে।

২৮। **ভবানীপুর,** ১৭বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-২৬। বলরাম বসু। বৃহৎ। নিরলংকার। আদি গঙ্গার পাড়ে। ১৮১০।

২৯। **মাকালপুর** (ডাকাতপাড়া), পোলবা, হুগলী। সিংহরায় পরিবাব। নিরলংকার। ১৮৩১। (চুঁচুড়া ঘড়িমোড় থেকে বাসে)।

৩০। **বরুইপুর** (নন্দীপাড়া), উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া। রামচন্দ্র নন্দী, কারিগব রামগোপাল মিস্ত্রী (আঁটপুর)। কিছু পঙ্খ। ১৮৫১। (হাওড়া থেকে মুনশীর হাট হয়ে খিলাহাট, ভ্যানরিক্সা)।

৩১। **বারুইপুর,** দক্ষিণ ২৪ পরগনা। কালীচরণ শর্মা (হালদার)। মুখোমুখি। টেরাকোটা। মাঝে চাতাল। ১৮৫১। (শিয়ালদহ দক্ষিণ থেকে বারুইপুর জংসন, অটো। বা পদ্মপুকুব মোড় থেকে আমতলা বাসে বারুইপুর কলেজ স্টপ)।

৩২। **বিনোদবাটি** (বিশালাক্ষিতলা), উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া। একটি শিব অন্যটি বিশালাক্ষি—ব্যতিক্রমী। পঞ্চানন বেরা। বিশালাক্ষি ছোট, শিব মাঝারি। ১৮৭৯। হাওড়া বা হরিপাল থেকে বাসে উদয়নাবায়ণপুর। রিক্সা।

৩৩। **উদয়নারায়ণপুর,** হাওড়া। একটি যথারীতি শিব অপরটি ধর্ম—ব্যতিক্রমী। নিরলংকার। (ঐ)। **১৯ শতক।**

৩৪। **আমাদপুর,** মেমারি, বর্ধমান। পুকুরঘাটে, দুই মন্দিরের মাঝ দিয়ে ঘাটের পথ। ছোট। নিরলংকাব। (বর্ধমান মেইন লাইনের মেমারি থেকে রিক্সা)।

৩৫। **মৌখিরা,** আউসগ্রাম, বর্ধমান। নিরলংকার। জীর্ণ। (বোলপুর-পানাগড় বাসে বসুধা। ভ্যান-রিক্সা। রাস্তার বাঁয়ে)।

৩৬। **সোমসার,** ইন্দাস, বাঁকুড়া। মুখোপাধ্যায় পবিবার। ছোট। কিছু টেরাকোটা। (বর্ধমান-ইন্দাস বাসে)।

৩৭। **জনাই,** চণ্ডীতলা, হুগলী। কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কিছু পঙ্খ। (বর্ধমান কর্ড লাইনের জনাই স্টেশন থেকে রিক্সায়—বঘুনাথ মন্দিরের পথের পাশে কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিশাল সৌধের প্রবেশ দ্বারের পাশে)।

৩৮। **বাকসা,** চণ্ডীতলা, হুগলী। নিরলংকার, জীর্ণ। (ঐ। রঘুনাথের গলির বিপরীতে)। বসু পরিবার।

৩৯। **বাঁশবেড়িয়া** (জলেশ্বরী ঘাট, আর. বি. নন্দন রোড), হুগলী। নাতিবৃহৎ। গঙ্গাঘাটে। মাঝ দিয়ে পথ। গঙ্গার দিরে বাড়তি দরজা। (চুঁচড়া-বাঁশবেড়িয়া বাসপথে)।

৪০। **পাঁচড়া,** জামালপুর, বর্ধমান। দে পরিবার। নিরলংকার। একটি থেকে অপরটি ৩/৪ ফুট তফাতে—একটি একবাংলা বা দোচালা রীতির তোরণ দিয়ে যুক্ত, তলা দিয়ে গেলে শ্রীধরের দালান। (বর্ধমান কর্ড লাইনের মসাগ্রাম থেকে রিক্সা)।

৪১। **বনকাটি** (অযোধ্যা, কালীতলা), কাঁকসা, বর্ধমান। ছোট। পঙ্খের কাজ। (বোলপুর-পানাগড় বাসপথের '১১ মাইল' স্টপেজ থেকে ইছাই ঘোষের দেউলের পথে রিক্সায়, গ্রামের শেষে—ক্ষেত্রে আরও তিনটি দেউল এবং কালী ও নারায়ণের দালান মন্দির)।

৪২। **বৈদ্যপুর,** কালনা, বর্ধমান। পুকুরপাড়ে। মুখোমুখি। ছোট। টেরাকোটা। সামনে দোলমঞ্চ। (বর্ধমান মেইন লাইনের বৈঁচি স্টেশান থেকে কালনার বাসে বৈদ্যপুর—বাজার, বৃন্দাবনচন্দ্রের রাসমঞ্চ ও কৃষ্ণের দেউল ছেড়ে।)

৪৩। **বর্ধমান।** (সর্বমঙ্গলা-ক্ষেত্র), বর্ধমান। বর্ধমান-রাজপরিবার। বৃহৎ। পরস্পর থেকে সামান্য তফাতে। অত্যন্ত উৎকৃষ্ট টেরাকোটা মণ্ডিত। (বর্ধমান স্টেশন থেকে রিক্সায়, সর্বমঙ্গলার পাশে—পৃথক প্রবেশ পথ আছে)।

৪৪। **গুড়াপ** (জোড়ামন্দিরতলা), ধনিয়াখালি, হুগলী। নাতিবৃহৎ। নিরলংকার। (বর্ধমান কর্ড লাইনের গুড়াপ থেকে রিক্সা)।

৪৫। **চারকলগ্রাম,** নানুর, বীরভূম। চট্টোপাধ্যায় পরিবার। টেরাকোটা—কিছুটা অদ্ভুতদর্শন ঝম্পসিংহ-যুক্ত (বোলপুর থেকে বাসে নানুর—ভ্যানরিক্সা)।

৪৬। **ওরগ্রাম** (ডেটেলপাড়া), ভাতাড়, বর্ধমান। নাতিবৃহৎ। নিরলংকার। (গুসকরা থেকে সহজে বাসে—জোড়া দেউলের সামনের অঙ্গনে)।

৪৬। **খোর্দ্দ,** ডায়মণ্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। বৃহৎ। একই অধিষ্ঠানে উভয় আটচালার মাঝে চণ্ডীর 'থান'। (ডায়মণ্ড হারবার থেকে ফলতার বাসে—পিচ-রাস্তা থেকে ঢোকা গ্রাম্য ইট-বাঁধানো রাস্তায় কিছু গিয়ে। অথবা সরিশা মোড় থেকে ভ্যান রিক্সায)।

৪৭। **কামারপোল** (স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে, বড় পুকুরপাড়ে, বসুপাড়া)। ঐ। বসু পরিবার। পরস্পর থেকে কিছুটা তফাতে। পূণ' সংস্কৃত। (ডায়মণ্ড হারবার থেকে নূরপুর/রায়চক বাসে বা সরিশা মোড় থেকে ভ্যানরিক্সা)।

৪৮। **ভাটপাড়া** (হাজিনগর, খাসবাটি মেইন রোড), জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা। রামগোবিন্দ ঘোষাল। উঁচু অধিষ্ঠানে। বৃহৎ। পঙ্খ। সংস্কৃত। (শিয়ালদহ মেইন লাইনের বারাকপুর/নৈহাটি/কাঁচড়াপাড়া থেকে ৮৫নং বাসে—বাস রাস্তার প্রায় লাগোয়া)।

৪৯। **ঐ** (পাঁচবাটি লেন, পাঁচমন্দির তলা), ঐ। ছোট। পূর্ণ সংস্কৃত। (শিয়ালদহ মেইন লাইনের কাঁকিনাড়া থেকে—পাঁচমন্দিরতলার পূব কোণে)।

৫০। **ঐ।** একটি শিব, অপরটি শীতলা। ছোট। পূর্ণ সংস্কৃত। (ঐ। পাঁচমন্দিরতলার পশ্চিমের সুউচ্চ নবরত্নের পাশ দিয়ে এগোলেই)।

৫১। **চুঁচুড়া** (শ্যামবাবুর ঘাট), হুগলী। (নৈহাটি থেকে গঙ্গা পেরিয়ে)।

৫২। **শেরাণ্ডী** (হাট-শেরাণ্ডী, দক্ষিণপাড়া), বোলপুর, বীরভূম। নাতিবৃহৎ। একটি পশ্চিম ও অন্যটি দক্ষিণ দুয়ারি। একটি মন্দিরের চালা দুটি বেশি প্রশস্ত। (বোলপুর থেকে কাটোয়া, নূতনহাট, বাসাপাড়া প্রভৃতি বাস। রিক্সা)।

৫৩। **পিঙলা** (পশ্চিমপাড়া), পশ্চিম মেদিনীপুর। বসু পরিবার। ছোট। (হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বালিচক থেকে বাস/ট্রেকার)।

৫৪। **গুপ্তিপাড়া,** হুগলী। সেন পরিবার। ছোট। নিরলংকার। (হাওড়া-ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লোকালে গুপ্তিপাড়া। রিক্সা। বিখ্যাত মঠ বাড়ির আগে রাস্তার বাঁয়ে সেনদের সুদৃশ্য ও বৃহৎ দ্বিতল দালান—ঠিক তার আগে ঐ বাড়ির দেওয়াল ঘেষা সরু পথে সামান্য গিয়ে)।

৫৫। **ঝিখিড়া** (ভট্টাচার্য পাড়া), আমতা, হাওড়া। উঁচু অধিষ্ঠান বেদী। ছোট। নিরলংকার। (হাওড়া থেকে সরাসরি বাসে। রাউতাড়া, ঝিখিড়া ও চিংড়াজোলের সব মন্দির দেখানোর চুক্তিতে)।

৫৬। **বেহালা,** বনমালী নস্কর রোড, কলকাতা-৬০। অতি বৃহৎ (আনু. উচ্চতা ৪৫ ফুট)। নিরলংকার। (বেহালা থানা মোড় থেকে বনমালী নস্কর রোড ধরে কিছু গিয়ে)।

৫৭। **ছয়ঘরিয়া,** বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা। সদাশিব চট্টোপাধ্যায়। নাতিবৃহৎ। নিরলংকার। (সম্ভবত ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। —শিয়ালদহ বনগাঁ শাখার বনগাঁ স্টেশন থেকে রিক্সা/ভ্যানরিক্সা। বাংলাদেশ-সীমান্তের কাছে। গ্রামে ঢুকে প্রথমেই)।

৫৮। **ঐ।** বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। উঁচু অধি অধিষ্ঠানে। পূর্ণ-সংস্কৃত। ক্ষেত্রে একটি ছোট দুর্গা দালান। (প্রখ্যাত গবেষক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃকুল ছয়ঘরিয়ার বন্দোপাধ্যায় পরিবারের সদস্য ছিলেন—ঐ। সামান্য গিয়ে)।

৫৯। **এরুয়ার** (রুদ্রদেবতলা), ভাতাড়, বর্ধমান। নাতিবৃহৎ। কিছু পঙ্খ ও টেরাকোটা। (বর্ধমান তিনকোণিয়া বাসস্ট্যান্ড হতে সরাসরি বাস। ভ্যানরিক্সা। রুদ্রদেব মন্দিরের গলির মুখে)।

৬০। **ঐ।** (ভিতরে, রুদ্রদেবের অঙ্গনে)। নাতিবৃহৎ। সামান্য পঙ্খের কাজ। জীর্ণ।

৬১। **ঐ** (সংলগ্ন পাড়া)। ছোট। সামান্য টেরাকোটা ও পঙ্খ। (সামান্য এগিয়ে ঘরবাড়ির আড়ালে, একটি ক্ষুদ্র চারচালা ও একটি আটচালা মন্দিরের পরে)।

৬২। **শ্রীধরপুর** (জোড়মন্দিরতলা), মেমারি, বর্ধমান। মুখোপাধ্যায় পরিবার। ছোট। নিরলংকার। (বর্ধমান মেইন লাইনের মেমারি থেকে বাসে কমলপুর। ভ্যানরিক্সা)।

৬৩। **দাসপুর (পদমপুর পাড়া),** পশ্চিম মেদিনীপুর। পুকুরের স্নানঘাটের দুপাশে দুটি। নাতিবৃহৎ। পঙ্খ-শোভিত। মন্দির দুটির পিছনের দেওয়ালে প্রমাণ মাপের দুটি পঙ্খের বাতায়নবর্তিনী। (পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে দাসপুর। রিক্সায় লাওদা গ্রামস্থ বাঁকা রায়ের নবরত্নের পথে)।

৬৪। **পানিহাটি** (ত্রাণনাথ ব্যানার্জী রোড, জগদ্ধাত্রী মন্দির প্রাঙ্গণ), খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা। ছোট। পূর্ণ সংস্কৃত। উভয় মন্দিরের মাঝে গঙ্গাস্নানঘাট। (কলকাতা ধর্মতলা থেকে বাসে সোদপুরে এসে রিক্সায় পূর্বোক্ত 'মহাপ্রভুতলা', এবার গঙ্গাতীরের রাস্তায় কিছুটা এগোলে ডানে উচ্চমাধ্যমিক পাণিহাটি বালিকা বিদ্যালয়, বিপরীতে গেট দিয়ে ঢুকলে জগদ্ধাত্রীর দালান মন্দির, তার সামনে)।

৬৫। **জগন্নাথ ঘাট, শ্রীরামপুর,** হুগলী। বৃহৎ, রাজসিক ও পঙ্খ-অলংকৃত ঘাটের প্রবেশ পথের দুপাশে দুটি, ঘাটের অনুপাতে ছোট, তথাপি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। গঙ্গা পূবে বেশ খানিকটা সরে যাওয়ায় অসাধারণ ঘাটটি পরিত্যক্ত হয়ে বিনাশের অপেক্ষায়। (হাওড়া-শ্রীরামপুর বাসে শ্রীরামপুরের বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির বা তার সামান্য আগে নেমে এখানকার খেয়াঘাট— ওপারে টিটাগড় বিশালাক্ষিতলা)।

৬৬। **জয়নগর** (রথতলা, নেতাজী সুভাষ রোড), দক্ষিণ ২৪ পরগনা। বৃহৎ। কিছু পঙ্খ। পূর্ণ সংস্কৃত। (শিয়ালদহ দক্ষিণ থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর/কাকদ্বীপ লোকালে জয়নগর-মজিলপুর স্টেশন। রিক্সা/হাঁটা)।

৬৭। **তালপুকুর (গঙ্গোত্রীপাড়া),** বারাণসী ঘোষের ঘাট—'কেষ্ট মুখার্জীর ঘাট' নামে পরিচিত), টিটাগড়, উত্তর ২৪পরগনা। 'পোড়া শিব' নামে কথিত জোড়া-আটচালা। বৃহৎ। অতি সামান্য পঙ্খ অবশিষ্ট। জীর্ণ। বৃক্ষাক্রান্ত। (কলকাতার ধর্মতলা থেকে বারাকপুরের বাসপথের তালপুকুর বা পরের 'বি-এন. বোস হাসপাতাল স্টপ থেকে রিক্সায়, রাসমণির মন্দির বলে পরিচিত অন্নপূর্ণা মন্দিরের লাগোয়া। শিয়ালদহ মেইন লাইনের টিটাগড় বা বারাকপুর স্টেশন থেকেও রিক্সায় আসা চলে)। যাই হোক সম্পূর্ণ সংস্কৃত, অসাধারণ ঘাটটির সামনে হতে ডানে জগদ্ধাত্রীর জরাজীর্ণ দালানের পাশ দিয়ে কয়েক পা ঢুকে দেখা যাবে।

৬৮। **ঐ।** নাতিবৃহৎ। সম্পূর্ণ সংস্কৃত। বর্তমানে শুক্লা পরিবারের অধীনে। (ঐ। জগদ্বাত্রীর ঠিক বিপরীতে। রাস্তার উপরে)।

৬৯। **ঐ।** পরিত্যক্ত। অতি জীর্ণ (ঐ। বাঁয়ে, দক্ষিণ দিকে কিছুটা তফাতে, চারিদিকে গড়ে ওঠা অবাঙালি বসতির মধ্যে চূড়ান্ত অবহেলায়)। (গঙ্গার পাড়ে ঘাটসহ জোড়া আটচালা মন্দির আরো আছে নানা জায়গায়—যেমন হুগলীর শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলির মাঝে **চাতরায়।** এছাড়াও পশ্চিম বাংলার গ্রাম ও শহরেও জোড়া আটচালা মন্দির আছে, যেমন দক্ষিণ ২৪ পরগনার **মহেশতলার** চট্টালিকাপুর ও ব্যানার্জী হাটে)।

(ii) **দুপাশে দুটি আটচালা, মাঝে পঞ্চরত্ন** : **উত্তরপাড়া** (তারামন্দির), হুগলী। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামনারায়ণ মল্লিক। উঁচু বেদীর উপর পাশাপাশি। আনু. উচ্চতা ২০ ফুট করে। ঘেরা ক্ষেত্রে। বর্তমানে একটি সাধক সম্প্রদায়ের অধীনে। ১৭৯৪। হাওড়া ব্যান্ডেল লাইনের উত্তরপাড়া স্টেশন থেকে হেঁটে/রিক্সায়।

(iii) **তিনটি আটচালা** :

১. (ক) **মুড়াগাছা** (সর্বমঙ্গলা-ক্ষেত্র, বাজার), নাকশীপাড়া, নদীয়া। (গ) দেবীদাস মুখোপাধ্যায়। (ঘ) তিনটি সংযুক্ত—নিরলংকার, সামনে নাটমণ্ডপ। (ঙ) ১৭৯০। (চ) শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের মুড়াগাছা স্টেশন থেকে সহজেই রিক্সায়।

২। (ক) **দক্ষিণ বারাসত,** জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। (গ) কৃষ্ণচন্দ্র বসু। (ঘ) পাশাপাশি, নিরলংকার। (ঙ) একটি ১৮০১, একটি ১৮০৯ ও অন্যটি প্রতিষ্ঠালিপিহীন, সম্ভবত সমসাময়িক। (চ) শিয়ালদহ দক্ষিণ থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর/কাকদ্বীপ লাইনের দক্ষিণ বারাসাত থেকে রিক্সা।

৩। (ক) **মধ্যমাজু,** (বসুপাড়া), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (গ) নিমাইচরণ দত্ত। (ঘ) পাশাপাশি। আনু. ২০ ফুট করে। (ঙ) ১৮৪৭। (চ) হাওড়া থেকে সরাসরি বাসে।

৪। (ক) **জয়নগর,** দক্ষিণ ২৪ পরগনা। (ঘ) আনু. ২০ ফুট করে একই বেদীতে। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) পূর্বোক্ত লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালে জয়নগর মজিলপুর। রিক্সা। বিখ্যাত দ্বাদশ শিব মন্দিরের শেষে।

•৫। (ক) **নাসিগ্রাম,** ভাতাড়, বর্ধমান। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। এক বেদীতে পাশাপাশি। (ঙ) ঐ। (চ) বর্ধমান (তিনকোণিয়া) থেকে বাসে—বিখ্যাত 'বড় রঘুনাথে'র পথে।

৬। (ক) **শান্তিপুর,** (সূত্রাগড়, সেনপাড়া) নদীয়া। (ঘ) পাশাপাশি। প্রথম বেদীতে একটি, পরের বেদীতে দুটি। নিরলংকার। (ঙ) ১৮৬০। (চ) শিয়ালদহ থেকে শান্তিপুর লোকাল। রিক্সা।

৭। (ক) **চন্দননগর** (পালপাড়া), হুগলী। (ঘ) এক অধিষ্ঠানে পাশাপাশি,। ছোট। পরস্পরের মধ্যে সংযোগকারী দরজা। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) হাওড়া থেকে ট্রেনে/বাসে চন্দননগরে গিয়ে রিক্সা।

৮। (ক) **সরপী,** ফরিদপুর, বর্ধমান। একই অধিষ্ঠানে পাশাপাশি। বন্দোপাধ্যায় পবিবাব। (অণ্ডাল থেকে বাসে। গ্রামেব মূলবাস্তার পাশে)।

(iv) **তিনটি আটচালা ও একটি পঞ্চরত্ন** .

১। (ক) **হাট শেরাণ্ডী** (পশ্চিমপাড়া), বোলপুর, বীরভূম। (ঘ) পাশাপাশি দুটি বেদীতে—প্রথম বেদীতে একটি নিরলংকার আটচালা (আনু. ১৫ ফুট) ও দিতীয় বেদীতে আনু. ২০ ফুট করে দুটি আটচালার মাঝে একটি পঞ্চরত্ন। সামান্য অলংকরণ অবশিষ্ট। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) বোলপুর থেকে নূতনহাট, পালিতপুর, বাসাপাড়া প্রভৃতি বাসে সবাসবি গিয়ে, রিক্সায।

(v) **চারটি আটচালা** :

১। (ক) **হালিশহর** (বরেন্দ্র গলি), জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা। (খ) নন্দকিশোর। (ঘ) আনু. ১৫ ফুট করে দুটি পশ্চিম ও দুটি পূবমুখী--জোড়ায় জোড়ায় মুখোমুখি। পশ্চিমমুখী প্রথমটি সংস্কৃত এবং অনন্য টোরাকোটা-সমৃদ্ধ। পূবমুখী প্রথমটিও সংস্কৃত ও কিছু টেরাকোটা সম্পন্ন। অন্য দুটি অতিজীর্ণ ও বৃক্ষাক্রান্ত। (ঙ) ১৭৪৩। (চ) শিয়ালদহ-বানাঘাট লাইনের বারাকপুব বা নৈহাটি থেকে ৮৫নং বাসে হালিশহর বরেন্দ্র গলি।

২। (ক) **কলকাতা** (বাগবাজার স্ট্রিট এবং রবীন্দ্র সরণীর সংযোগস্থল)। (গ) বিষ্ণুরাম চক্রবর্তী। (ঘ) ছোট। নিরলংকার। গুচ্ছাকারে। (ঙ) ১৭৭৬।

৩। (ক) **পানিহাটি,** (ত্রাণনাথ ব্যানার্জী রোড), খড়দহ, উত্তব ২৪ পরগনা। (গ) শিবচন্দ্র চৌধুরী। (ঘ) এক বেদীতে পাশাপাশি—সামনে নবচূড় রাসমঞ্চ। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) পূর্বোক্ত 'মহাপ্রভুতলা' থেকে গঙ্গাতীরের রাস্তা ধরে দক্ষিণে কিছু গেলে বাঁয়ে দেখা যাবে। (কলকাতা-বারাকপুর বাসে সোদপুর-পাণিহাটি)।

৪। **হাট শেরাণ্ডী** (উত্তরপাড়া), বোলপুর, বীরভূম। (ঘ) একই মঞ্চের পাশাপাশি। অতিশয় জীর্ণ। সামনেব লম্বা বারান্দারও এক দিক ভগ্ন। আনু. ১৫ ফুট করে উচ্চতা। (ঙ) ঐ। (চ) বোলপুর থেকে নূতনহাট, বাসপাড়া, পালিতপুর প্রভৃতি বাসে সরাসরি গিয়ে রিক্সায়।

৫। (ক) **গোহগ্রাম,** গলসী, বর্ধমান। (ঘ) ছোট। এক সারিতে। কিছু পঙ্খ। (ঙ) ঐ। (চ) বর্ধমান (তিনকোণিয়া থেকে সরাসরি বাসে। রাধা-দামোদরের সুউচ্চ দেউলের পরে, দোলমঞ্চের বিপরীতে)।

৬। (ক) **হরিপাল,** (মালিপাড়া), হুগলী। (ঘ) এক সারি ও অধিষ্ঠানে তিনটি (দুটি ঈষৎ ব্যতিক্রমী)—সামান্য তফাতে একই রেখায় টেরাকোটা সমৃদ্ধ একটি। (ঙ) ঐ। (চ) তারকেশ্বর লাইনের হরিপাল থেকে রিক্সা। রায়পাড়া থেকে ঘোষপাড়া যেতে মূল রাস্তার ডান পাশ ঘেঁষে।

৭। (ক) **চন্দননগর** (চারমন্দিরতলা, গোন্দলপাড়া), শিশুবাবু রোড, হুগলী। (খ) ছোট। এক বেদীতে পাশাপাশি। পূর্ণ সংস্কৃত। (গ) ঐ। (ঘ) পূর্বোক্ত পথে। শিয়ালদহ মেইন লাইনের শ্যামনগর থেকে গঙ্গা পার হলে সুবিধা।

৮। **শুঁড়েকালনা,** জামালপুর, বর্ধমান। মুখোমুখী দুই জোড়া। সিংহরায় পরিবার। ১৯১৩-১৪। তারকেশ্বর থেকে সরাসরি বাসে।*

(vi) **পাঁচটি আটচালা** :

১। (ক) **বেড় জনার্দনপুর,** খড়গপুর লোকাল, পশ্চিম মেদিনীপুর। (গ) প্রতিষ্ঠাতা, জিতরাম মজুমদার। কারিগর, নারায়ণ ছুতার, সাকিন, পাথরা। (ঘ) একই ঘেরা অঙ্গনে, দুই সারিতে। (ঙ) ১৭৮৭। (চ) খড়গপুর থেকে মেদিনীপুর বাসে আমতলা। এখান থেকে ট্রেকারে পাথরায় গিয়ে ওখানকার মন্দিরগুলি দেখে কাঁসাই পেরিয়ে।

২। (ক) **বহড়ু** (বাজার এলাকা), জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। (গ) বসু পরিবার। (ঘ) একই রেখায়—আনু. ২০ ফুট করে উচ্চতা। স্থানীয় জনসাধারণ-কর্তৃক সংস্কৃত। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) শিয়ালদহ (দক্ষিণ) থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালে বহড়ু স্টেশন—সেখান থেকে রিক্সায় অতি সহজে।

(vii) **ছয়টি আটচালা** :

১। (ক) **বাঁশবেড়িয়া,** (দক্ষিণ পাড়া)। (গ) শ্যামরায় ঘোষ। (ঘ) একই বেদীতে একই রেখায় পশ্চিমে গঙ্গামুখী। উত্তরপাশে ইটখোলা ও সামনে গাছপালা জমির পর গঙ্গা। নিরলংকার হলেও প্রাকৃতিক পরিবেশে চমৎকার। আনু. ২০ ফুট করে উচ্চতা। (ঙ) ১৭৪৮। (চ) চুঁচুড়া-খামারপাড়া-বাঁশবেড়িয়া-ব্যান্ডেল বাস পথের বাঁশবেড়িয়া-দক্ষিণপাড়া স্টপেজে নেমে সংস্কৃত পরিষদ ঘেঁষে গঙ্গামুখী গলিপথে সামান্য গেলে ডানদিকে দেখা যাবে।

২। (ক) **বড়িশা, কালিচরণ দত্ত রোড,** কলকাতা। (গ) দত্ত পরিবার। (ঘ) ইংরাজী L-এর মতন অধিষ্ঠানের দুদিকে তিনটি করে আটচালা। ছোট। নিরলংকার। (ঙ) ১৯ শতকের প্রথম অর্ধ। (চ) কলকাতা-ধর্মতলা হতে ডায়মন্ড হারবার রোড ধরে চলা বাসপথের 'সখের বাজার'। কে. কে. রায়চৌধুরী রোড ধরে ঢুকে ব্রজমণি দেব্যারোড শেষে।

* হরিপাল, রায়পাড়ার রাধাগোবিন্দ মন্দিরের বাইরে প্রাঙ্গণে রাসমঞ্চের একপাশে একটি ও অন্যপাশে সামান্য দূরে দূরে আরও তিনটি টেরাকোটা-সমৃদ্ধ ১৯ শতকীয় আটচালা আছে—এগুলিকেও চারটি আটচালার গুচ্ছ বলা যায়।

৩। (ক) **তালপুকুর,** (গঙ্গোত্রী পাড়া), টিটাগড়, উত্তর ২৪ পরগনা। (গ) জগদম্বা বিশ্বাস। (ঘ) নবরত্ন অন্নপূর্ণা মন্দিরের পশ্চিমে গঙ্গাঘাটের পথের দুপাশে তিনটি করে। উচ্চতা আনু. ২৫ ফুট করে, সংস্কৃত। (ঙ) ১৮৭৫। (চ) শ্যামবাজার-বারাকপুর বাসপথের তালপুকুর শীতলা মোড় বা বি. এন বোস হাসপাতাল স্টপেজে নেমে রিক্সায়। বারাকপুর বা টিটাগড় রেলস্টেশন থেকেও রিক্সায় আসা যায় সহজেই।

৪। (ক) **নাড়াজোল,** দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (গ) একই মঞ্চে, একই সারিতে। আনু. ২০ ফুট করে। কিছু পঙ্খের কাজ। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) পাঁশকুড়া বা ঘাটাল থেকে দাসপুর হয়ে বাসে—নাড়াজোল বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সায় বা হেঁটে, এখানকার বিখ্যাত ২৫ চূড়া রাসমঞ্চের কাছে।

৫। (ক) **খড়দহ,** (বীরঘাট, ২৬ মন্দির)। (গ) বিশ্বাস পরিবার। (ঘ) একই মঞ্চে, একই সারিতে। পশ্চিম বা গঙ্গামুখী। আনু. ৩০ ফুট করে। কিছু চুণবালির কাজ। গঙ্গা ঘেঁষে। বৃহৎ। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) শ্যামবাজার-বারাকপুর বাসপথের খড়দহ সন্ধ্যা সিনেমা স্টপেজে নেমে রিক্সায় ২৬ মন্দির। গঙ্গা ঘাটের দক্ষিণে ২০ মন্দির এবং উত্তরে ৬ মন্দির।

৬। (ক) **আগরপাড়া** (গিরিবালা দাসীর রাধাগোবিন্দ কুঞ্জ)। (গ) গিরিবালা দাসী। (ঘ) রাধাগোবিন্দের পঞ্চরত্ন মন্দিরের ঘেরা চত্বরে, গঙ্গাঘাটের দিকের বিশাল সিংহদুয়ারের দুপাশে তিনটি তিনটি করে। পঙ্খের অলংকরণে শোভিত। (ঙ) ১৯১০-১২) (চ) শ্যামবাজার থেকে বারাকপুর বা ঘোলা-সোদপুর প্রভৃতি বাসপথে মোল্লার হাট স্টপেজে নেমে গঙ্গামুখী পথে সোজা হেঁটে বা রিক্সায়।*

(viii) **সাতটি আটচালার গুচ্ছ :**

১। **সিঙ্গুর,** (সাতমন্দিরতলা), হুগলী। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (ঙ) ১৯ শতকের প্রথম অর্ধ। (চ) হাওড়া-তারকেশ্বর লাইনের সিঙ্গুর স্টেশান থেকে রিক্সায়।

২। (ক) **কাঁকড়া,** স্বরূপনগর, উত্তর ২৪ পরগনা। (গ) রায় পরিবার। (ঘ) মাঝারি। জীর্ণ। দুই সারিতে। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) বারাসত থেকে বাসে বেড়াচাঁপার পর লোকনাথ বাবার আশ্রমের জন্য বিখ্যাত কচুয়া স্টপ থেকে ভ্যান/রিক্সা/হাঁটা।

(ix) **নয়টি আটচালার গুচ্ছ :**

১। (ক) ৯৩, টালিগঞ্জ রোড। (খ) শিব। (গ) মণ্ডল পরিবার। (ঘ) পাশাপাশি। (ঙ) ১৮৪৭।

(x) **দশটি আটচালার গুচ্ছ :**

১। (ক) ৯৩, টালিগঞ্জ রোড। (খ) শিব। (গ) মণ্ডল পরিবার। (ঘ) পাশাপাশি। (ঙ) ১৮৪৭।

(xi) **দশটি আটচালা এবং দুটি পঞ্চরত্নের গুচ্ছ :**

১। (ক) **সুখাড়িয়া,** (আনন্দভৈরবীতলা), বলাগড়, হুগলী। (খ) ১০টি আটচালা ও দুটি পঞ্চরত্ন (একটিতে গণেশ)। (গ) মুস্তৌফী পরিবার। (ঘ) আনন্দভৈরবীর ২৫ চূড়া মন্দির

* হুগলী খানাকুল-কৃষ্ণনগরের ঘন্টেশ্বর হতে রঘুনাথ মন্দিরে যাওয়ার পিচের সড়কের ডানে, অদূরে মাঠের মধ্যে এক সারিতে ছটি আটচালা মন্দির পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে আছে।

প্রাঙ্গণে মুখোমুখি দুই সারিতে। উভয় সারিরই প্রথমটি পঞ্চরত্ন। (ঙ) পঞ্চরত্ন গণেশ মন্দিরটি ১৮ শতকের। অন্যগুলি ১৮ শতকের শেষে বা ১৯ শতকের প্রথমে। তবে আনন্দভৈরবীর ২৫ চূড়া মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে। (ঙ) ব্যান্ডেল-কাটোয়া লাইনের সোমড়া বাজার স্টেশন থেকে রিক্সায়, অতি সহজে।

(xii) **এগারোটি আটচালার গুচ্ছ :**

১। (ক) ৯৩, টালিগঞ্জ রোড। (খ) শিব। (গ) মণ্ডল পরিবার। (ঙ) ১৮৪৭।

(xiii) **দ্বাদশ শিব বা বারোটি আটচালার গুচ্ছ :**

১। (ক) **জয়নগর** (মিত্রগঙ্গা, কুলপী রোড, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। (গ) প্রাচীনতম মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা মধুসূদন মিত্র, অন্য মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর উত্তরপুরুষগণ। (ঘ) 'মিত্রগঙ্গা' নামক পুকুরের পশ্চিম দিয়ে প্রথমে একটি বৃহৎ দোলমঞ্চ, এরপর প্রথম আটচালা (পঙ্খের কাজ) + ক্ষুদ্র দালান মন্দির + দ্বিতীয় আটচালা (সমৃদ্ধ পঙ্খের কাজ) + তৃতীয় ও বৃহত্তম আটচালা + চতুর্থ আটচালা (টেরাকোটা পদ্ম) + পঞ্চরত্ন, এরপর পথ + নকল জানালা + ষষ্ঠ আটচালা (সামনের ও দুপাশের দেয়ালে টেরাকোটা পদ্ম) + সপ্তম আটচালা (সামান্য কিছু টেরাকোটা মূর্তি ও পদ্ম) + অষ্টম ও নবম আটচালা (প্রচুর টেরাকোটা পদ্ম) + দশম আটচালা (কিছু টেরাকোটা পদ্ম) + একাদশ আটচালা (নিরলংকার) + সামান্য তফাতে, দ্বাদশ আটচালা। (তৃতীয় আটচালাটি আনু. ৩০ ফুট উচ্চতার, অন্যগুলি ২০-২৫ ফুটের মধ্যে।) (ঙ) প্রাচীনতম মন্দিরটি নির্মিত হয় ১৮ শতকের প্রথম অর্ধে—অন্যানাগুলি যথাক্রমে ১৭৬১, ১৭৯৯ এবং ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে। (পঞ্চরত্ন মন্দিরটি ১৯২৩ সালে ও একাদশতম আটচালাটি সম্প্রতি পুনর্নির্মিত।) (চ) শিয়ালদহ (দক্ষিণ) থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালে জয়নগর-মজিলপুর স্টেশান—সেখান থেকে রিক্সায়।

২। **বেলমুড়ি,** ধনিয়াখালি, হুগলী। (গ) বসু পরিবার। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (ঙ) ১৭৬৬। (চ) হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের বেলমুড়ি স্টেশান থেকে রিক্সায়।

৩। **জকপুর,** খড়গপুর লোকাল, পশ্চিম মেদিনীপুর। (গ) রায় পরিবার। (ঘ) পাঁচটি পুব, পাঁচটি পশ্চিম এবং দুটি উত্তরমুখী। (ঙ) ১৭৭৭। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের জকপুর স্টেশন। ভ্যানরিক্সা।

৪। **বাকসা,** চণ্ডীতলা, হুগলী। (খ) শিব। (গ) ভবানীচরণ মিত্র। (ঘ) ছয়টি ছয়টি করে দুটি ভাগে কিন্তু একই সরল রেখায়। আনু. ২৫ ফুট করে উচ্চতা। নিরলংকার। (ঙ) ১৭৮৯। (চ) হাওড়া-বর্ধমান কর্ডলাইনের জনাই স্টেশান থেকে রিক্সায়।

৫। **বড়িশা,** ৩৫ কে. কে. রায়চৌধুরী রোড, (বড়িশা হাইস্কুলের পাশের মাঠ), কলকাতা। (গ) সাবর্ন চৌধুরী পরিবার। (ঘ) স্কুল ঘেষে ১, লাগোয়া লম্বা বেদীতে ২-৯ এবং টাউন লাইব্রেরী ও রাস্তার বিপরীতে এক বেদীতে ১০-১২। মাঝারি। নিরলংকার। (ঙ) ১৮ শতক। (চ) কলকাতা ধর্মতলা থেকে ডায়মণ্ড হারবার রোড ধরে চলা বাসপথের 'সখের বাজার' স্টপ থেকে কে. কে. রায়চৌধুরী রোড ধরে গিয়ে।

৬। (ক) **চন্দননগর** (দশমন্দিরতলা, নাড়ুয়া), হুগলী। (গ) রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান)। বর্তমান সেবাইত দুলালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (ঘ) মাঝারি, অতি জীর্ণ। (ঙ) আনু. ১৮১০। (চ) পূর্বোক্ত। একই রিক্সায়।

৭। (ক) **গুসকরা,** (চোংদার পাড়া), আউস গ্রাম। (খ) শিব। (গ) চোংদার পরিবার। (ঘ) ঘেরা চত্বরে একই মঞ্চে অনেকটা 'দ' বর্ণের আকারে পাশাপাশি। অতি জীর্ণ কিছু টেরাকোটা। আনু. ১৫ ফুট করে উচ্চতা। (ঙ) ১৮১৪। (চ) বর্ধমান শহর থেকে বাসে বা ট্রেনে গুসকরা থেকে রিক্সা।

৮। (ক) **কোন্নগর,** উত্তরপাড়া, হুগলী। (খ) শিব। (গ) হরসুন্দব দত্ত। (ঘ) গঙ্গাতীরে— মাঝে বাঁধা ঘাট, দুদিকে দুটি ভাগে ছয় ছয় করে বারোটি আটচালা, একই রেখায়। আনু. ২০/২২ ফুট। (ঙ) ১৮২০। (চ) হাওড়া থেকে চন্দননগর বা চুঁচুড়া প্রভৃতি বাসে কোন্নগর বারোমন্দির ঘাট স্টপেজ। অথবা হাওড়া ব্যান্ডেল লাইনের কোন্নগর থেকে রিক্সায়।

৯। (ক) **মাকালপুর,** পোলবা, হুগলী। (খ) শিব। (গ) ঈশ্বর সিংহ। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (ঙ) ১৮২১। (চ) চুঁচুড়া ঘড়িমোড়/ব্যাণ্ডেল/মগবা থেকে বাসে।

১০। (ক) **গোবরডাঙা**, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা। (খ) শিব। (গ) কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। (ঘ) প্রসন্নময়ী কালীর দালানের দুদিকে দুই সারিতে। মাঝারি। নিরলংকাব। (ঙ) ১৮২২। (চ) শিয়ালদহ-বনগাঁ লাইনের মসলন্দপুর অথবা গোবরডাঙা থেকে রিক্সা/ভ্যানরিক্সা।

১১। (ক) **নবদ্বীপ,** (বারোমন্দির তলা), নদীয়া। (খ) গুরুদাস দাস। (গ) আনু. ১৫ ফুট করে—একই বেদীতে ও একই সারিতে। পঙ্খের কাজ। বিশেষত একটি মন্দিরে পঙ্খের বিপুল সজ্জা জীর্ণ হয়ে এলেও আকর্ষণীয়। (ঙ) ১৮৩৫। (চ) বর্ধমান-কাটোয়া লাইনের নবদ্বীপ স্টেশন বা কোলকাতা, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর প্রভৃতি নানা জায়গা থেকে বাসে গিয়ে থেকে রিক্সায় সরাসরি বারোমন্দিরতলা।

১২। (ক) **মাজুক্ষেত্র,** জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) শিব। (গ) চক্রবর্তী পরিবার। (ঘ) আনু. ১৫ ফুট করে। দুই সারিতে, ছটি পূব ও ছটি পশ্চিমমুখী। নিরলংকার। (ঙ) ১৯ শতকের মধ্যভাগ। (চ) হাওড়া স্টেশন চত্বর থেকে আমতাগামী বাসে ভান্ডারগাছা, সেখান থেকেই সহজেই সরাসরি রিক্সায় মাজুক্ষেত্রের বারোমন্দিরতলা।

১৩। (ক) **মলিঘাটি,** ডেবরা, পশ্চিমমেদিনীপুর। (খ) শিব। (গ) কৃষ্ণমোহন চৌধুরী। (ঘ) আনু. ১৩ ফুট করে। নিরলংকার। (ঙ) ১৮৫৫। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের পাঁশকুড়া ট্রেকারে গোবিন্দনগর গিয়ে ভ্যান রিক্সায় মলিঘাটির দ্বাদশ মন্দির। এখন পাঁশকুড়া থেকে জয়কৃষ্ণপুর মলিঘাটি পর্যন্ত ট্রেকার মিলতে পারে।

১৪। (ক) **ইছাপুর (গোপীনাথপুর),** ধনিয়াখালি, হুগলী। রূপনারায়ণ রায়, কারিগর : নিমাইচাঁদ মিস্ত্রি। বন্ধনী চিহ্নের মত বেদীতে ২ + ৬ + আটচালা রীতিরই দোলমঞ্চ + ২ + ২ = আটচালা, ১২টি মন্দির ও একটি দোলমঞ্চ :

দুটি আটচালা | ছয়টি আটচালা | দোল মঞ্চ | দুটি আটচালা | দুটি আটচালা

১৮৬০। তারকেশ্বর থেকে দশঘরার বাসে/ট্রেকারে ইছাপুর হাসপাতাল স্টপ। হাঁটা।

১৫। (ক) **চৈতন্যবাটি**, (বাগনান---গোপীনাথপুর-২ পঞ্চায়েৎ), ধনিয়াখালি, হুগলী। (গ) ঘোষ পরিবার। (ঘ) অতি জীর্ণ। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের বেলমুড়ি স্টেশান থেকে রিক্সায়।

১৬। (ক) **দক্ষিণেশ্বর**, বরানগর, উত্তর ২৩ পরগনা। (খ) শিব (ভবতারিণী কালীসংলগ্ন। (গ) রাণী রাসমণি। (ঘ) ঘেরা চত্বরের মধ্যে গঙ্গাতীরে। দুভাগে ছয়টি ছয়টি করে মাঝে গঙ্গাস্নান ঘাটের চাঁদনী। আনু. ২০ ফুট করে, নিরলংকার। (ঙ) ১৯ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ। (চ) অতি বিখ্যাত— পথনির্দেশ বাহুল্য মাত্র। তথাপি, শিয়ালদহ-ডানকুনি লাইনের দক্ষিণেশ্বর স্টেশান, বা শ্যামবাজার থেকে সরাসরি বাসে কিংবা ডানলপ মোড় থেকে বাস পাল্টিয়ে/অটো-রিক্সায়।

১৭। (ক) **বরানগর**, (গ) জয় মিত্র। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (ঙ) ১৯ শতকের শেষ দিক। (চ) ধর্মতলা/শ্যামবাজার থেকে বাসে দমদম সিঁথি মোড়---রিক্সা।

১৮। (ক) **তারাগুণিয়া**, বাদুড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা। (খ) শিব (কালীদালান সংলগ্ন) (গ) দেবীপ্রসাদ নাগচৌধুরী। (ঘ) মাঝারি। নিরলংকার। (ঙ) ১৯ শতকের শেষদিক। (চ) বারাসাত-বাদুড়িয়া বা ধর্মতলা-বাদুড়িয়া বাসে খোলাপোতা স্টপ। হাঁটা/ভ্যানরিক্সা।

১৯। (ক) **পানিহাটি**, (সুখচর), খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা। (গ) হরিশচন্দ্র দত্ত। (ঘ) মাঝে গঙ্গাঘাট, দুদিকে গঙ্গা বা পশ্চিমমুখী ছয় ছয় দুই ভাগে। আনু. ২৫ ফুট করে। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় গোষ্ঠীরই প্রথম মন্দির দুটির পরস্পরের দিকে (বা ঘাটের পথের দিকে) একটি করে বাড়তি দ্বার আছে, তার দুদিক হতে সুদৃশ্য সিঁড়ি ত্রিভুজাকারে। দক্ষিণগোষ্ঠীর সিঁড়ির দুপাশে বৃহৎ সিংহ ও বৃষমূর্তি, উত্তরের বৃষভগ্ন। (ঙ) ১৯ শতকের শেষ দিকে। (চ) শ্যামবাজার (কলকাতা) বারাকপুর বাসপথে সোদপুর পানিহাটি স্টপেজের সামান্য পরের (পিয়ারলেসের আবাসন শেষ হলে) হরিশচন্দ্র দত্ত রোড স্টপেজে নেমে রিক্সায়।

(xiv) **১২টি আটচালা এবং চারটি পঞ্চরত্নের গুচ্ছ :**

১। (ক) **সুখাড়িয়া**, বলাগড়, হুগলী। (খ) (হরসুন্দরী কালীসংলগ্ন)। (গ) রামনিধি মুস্তৌফী। (ঘ) ঘেরা ক্ষেত্রে—হরসুন্দরীর সামনের অঙ্গনের দুপাশে দুই সারিতে। নাতিবৃহৎ। নিরলংকার। (ঙ) ১৮১৩। (চ) হাওড়া-ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া শাখার সোমড়া বাজার স্টেশান থেকে রিক্সায়।

(xv) **১৩টি আটচালার গুচ্ছ :**

১। (ক) **চন্দ্রভাগ**, বাগনান, হাওড়া। (গ) ছকুরাম চট্টোপাধ্যায়। (ঘ) আনু. ২০ ফুট করে। চারটি পূবমুখী, দুটি পশ্চিমমুখী, দুটি দক্ষিণমুখী এবং পাঁচটি উত্তরমুখী (এই গোষ্ঠীর একটি কার্যত লুপ্ত।) (ঙ) ১৮১১। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বাগনান স্টেশন থেকে বাগনান-শিবগঞ্জ বাসপথে বাঁটুল স্টপেজে নেমে ভ্যান রিক্সায়।

(xiv) **১৪টি আটচালার গুচ্ছ ঃ**

১। (ক) **আমডাঙা,** উত্তব ২৪ পরগনা। (খ) (করুণাময়ী কালীসংলগ্ন)। (গ) দশনামী সম্প্রদায়ের মহান্ত রামানন্দ গিরি। (ঘ) মঠের মধ্যে মহান্তদের সমাধির উপর শিবলিঙ্গ স্থাপন করে পরপর আটচালা। উপর ও নিচের দুটি চারচালাই অপেক্ষাকৃত খাড়া এবং শীর্ণ। আনু. ২০ ফুট করে। (ঙ) ১৮ শতকের মাঝ থেকে ১৯ শতক জুড়ে। (চ) বারাসাত থেকে কৃষ্ণনগর (নদীয়া)-মুখী বাসে আমডাঙা মা করুণাময়ী স্টপেজ।

(xvii) **২০টি আটচালার গুচ্ছ ঃ**

১। (ক) **বীরঘাট**, (ছাব্বিশ মন্দির), শিবালয, পি. কে. বিশ্বাস রোড, খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা। (গ) রামহরি বিশ্বাস ও তস্য পুত্র প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট করে—আয়তাকার একই মঞ্চে, উত্তরের দু-জোড়ার মধ্যবর্তী পথ দিয়ে প্রবেশ করে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে চারদিক ঘুরে সবকটি দেখে নেওয়া যায়। পূবেব গোষ্ঠী ৬টি + পশ্চিমের (গঙ্গা ঘেষে) গোষ্ঠী ৬ + দক্ষিণের গোষ্ঠী ৪ + উত্তরের গোষ্ঠী ৪ = ২০। ঘাটের উত্তরে গঙ্গা ঘেষে ছয়টি আটচালার একটি পৃথক গোষ্ঠী থাকায় আঞ্চলিকভাবে ২৬ মন্দির বলা হয়। বর্তমানে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ কর্তৃক সংস্কার কার্য চলছে। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) শিয়ালদহ-রাণাঘাট লাইনের খড়দহ স্টেশান থেকে রিক্সায়, অথবা, শ্যামবাজার (কোলকাতা) বারাকপুর বাসপথের খড়দহ সন্ধ্যা সিনেমা স্টপেজে নেমে রিক্সায়।

প্রাসঙ্গিকী : খড়দহ 'শিবালয়' বা ২৬ মন্দিরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ছিলেন সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী। আমরা এ বিষয়ে **ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** সম্পাদিত **'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'** (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৭৭), প্রথম খণ্ড থেকে দুটি সংবাদ উদ্ধার করছি :

১১ মার্চ ১৮২০। ২৯ ফাল্গুন ১২২৬

নতুন পুস্তক। ... খড়দহের শ্রীযুতবাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস পশ্চিম দেশীয় একজন পণ্ডিতের দ্বারা নানা জ্যোতিষ গ্রন্থ বিবেচনা করিয়া ব্যবহারোপযুক্ত তাবৎ জ্যোতিষের ব্যবস্থা একত্র সংগ্রহ করিয়া নিরানব্বই পত্রে এক পুস্তক প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিয়াছেন ও সে পুস্তক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগকে বিনা মূল্যে দিয়াছেন সে পুস্তক অতি সমপ্রয়োজনক। (পৃ. ৬২)

১৮ মে ১৮২২। ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯

নূতন পুস্তক। মোকাম খড়দহের শ্রীযুতবাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস বহুবিধ জ্ঞানাপন্ন বহুদর্শী জনদ্বারা নানাবিধ অভিধানের শব্দ সংগ্রহ করিয়া প্রাণকৃষ্ণ শব্দাম্বুধি [শব্দাব্দি] নামে এক গ্রন্থ প্রস্তুত ও ছাপা করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগকে এবং জ্ঞানাপন্ন ভাগ্যবানেরদিগকে বিনা মূল্যে দিয়াছেন অনেক অভিধানের প্রমাণ আছে তাহাতে পণ্ডিতগণের অধিক উপকার হইবেক। (পৃ. ৬৫)।

(xviii) **১০৮ (প্রকৃতপক্ষে ১০৯)-টি আটচালার গুচ্ছ ঃ**

১। (ক) **বর্ধমান,** নবাবহাট, বর্ধমান। (গ) বিষণকুমারী দেবী (বর্ধমানের 'মহারাজ' ত্রিলোক চাঁদের পত্নী ও তেজচন্দ্রের মাতা)—সম্ভবত দশনামী শৈবদের প্রভাবে।

(ঘ) প্রতিষ্ঠালিপিতে বলা হয়েছে 'নির্মায় রাধাহরি প্রীত্যৈ/পূণ্যবতী নবাধিকশতং শ্রীমন্দিরানি স্বয়ম্।' 'নবাধিকশতং' অর্থাৎ এক শতের অধিক নয় = ১০৯। একশত আট পবিত্র সংখ্যা ('অষ্টোত্তর শত নাম'), কিন্তু নাম জপকালে ১০৮-এর পর একটা বড় বীজ দরকার হয় যাতে বোঝা যায় ১০৮ পূর্ণ হল, তাই ১০৮ + ১ = ১০৯। এখানে আয়তক্ষেত্রের চারদিকে ১৫ফুট করে উচ্চতার নিরলংকার আটচালা ১০৮টি এবং পূবে অপেক্ষাকৃত বড় আরও একটি আটচালা। তাই লোকমুখে ১০৮ মন্দির হলেও আসলে ১০৯ মন্দির। (ঙ) ১৭৮৮-৮৯। (চ) বর্ধমান স্টেশান চত্বর থেকে সরাসরি রিক্সায় (তিন কি.মি.)।

২। (ক) **অম্বিকা-কালনা,** নবকৈলাস, বর্ধমান। (গ) বর্ধমানের 'মহারাজা' তেজচন্দ্র। (ঘ) প্রথমেই উল্লেখযোগ্য সাধারণ্যে একশো আট মন্দির নামে পরিচিত হলেও এখানেও মন্দির আছে একশত নয়টি— প্রতিষ্ঠালিপিতেই একথা স্পষ্ট · 'নবাধিকশত শ্রীমন্দিরৈর্মণ্ডলম্'। একই মালা বড় ও ছোট দুটি বৃত্তে ভাঁজ করলে বড় চক্রের ভিতর যেমন ছোট চক্রটিকে দেখা যায়, এই মন্দির সংস্থানে তেমনই আটচালার একটি বৃহৎ চক্রের মধ্যে আচটালারই আর একটি ক্ষুদ্রতর চক্র রয়েছে।

প্রতিষ্ঠালিপি হতে একথাও স্পষ্ট যে প্রতিষ্ঠাতা চান অম্বিকার নামে আখ্যাত নগরে নব কৈলাস প্রতিষ্ঠা করতে 'প্রাকার্যীন্মহদিম্বকাখ্যনগরে কৈলাসমেতং নবম্।' আনু. ১৬ ফুট করে উচ্চতা। নিরলংকার। মন্দির মধ্যে পর্যায় ক্রমে একটি শ্বেত ও একটি কৃষ্ণ শিবলিঙ্গ। (ঙ) ১৮০৯। (চ) হাওড়া-ব্যাণ্ডেল-কাটোযা লাইনের অম্বিকা-কালনা স্টেশন থেকে রিক্সায় বা হেঁটে।

পঞ্জি—৬

বারোচালা

১। (ক) **ইলছোবা,** পাণ্ডুয়া, হুগলী। (খ) শিব। (গ) বন্দ্যোপাধায় পরিবার। (ঘ) আনু ২০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট। সংস্কৃত। নিরলংকার। নিচু পাঁচিল ঘেরা ক্ষেত্রে দুটি আটচালা। (ঙ) ১৮ শতক। (চ) হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনের খন্যান অথবা পাণ্ডুয়া স্টেশান থেকে রিক্সায়।

২। (ক) **চিরুলিয়া,** এগরা, পূর্ব-মেদিনীপুর। (খ) রামচন্দ্র। (গ) পাহাড়ী পরিবার। (ঘ) আনু. ৫০ ফুট বা তারও কিছু বেশী উঁচু। দেউলের মতন ত্রিরথ রীতিতে নির্মিত। পশ্চিমবঙ্গেব বৃহত্তম ও উচ্চতম বারোচালা মন্দির। মন্দিরগাত্র পঙ্খ এবং টোরাকোটার কাজে সমৃদ্ধ। গর্ভগৃহের কাঠেব দরজার পাল্লায় রামায়ণ ও দেবদেবীর দর্শনীয় খোদাই কাজ। (ঙ) ১৮৪৩। (চ) হাওড়া থেকে বাসে কাঁথি বা এগরা—এবার তাজপুর হয়ে চিরুলিয়ার বাসে, বাসস্ট্যাণ্ডের একরকম পাশেই। এগরা/কাঁথি থেকে ঘন-ঘন বাসে তাজপুরে গিয়ে ভ্যানরিক্সাতেও যাওয়া চলে।

৩। **দেউলপুর** (পশ্চিমপাড়া), পাঁচলা, হাওড়া। (খ) শিব। (গ) আনু. ২৫-২৬ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট। ত্রিরথ। ডান, বাঁ ও সামনের দেওয়ালের উপবে ও বাঁকানো চালের নিচে একসারি করে টেরাকোটা অলংকরণ। (ঙ) আনু. ১৮৮০। (চ) হাওড়া থেকে আমতা/বিখিড়া প্রভৃতি নানা বাসে ধূলাগড়ি মোড়—এখানে জাতীয় সড়ক হতে বের হওয়া শাখাপথের বাসে। তবে, জুজারসা, দেউলপুর ও গোগুলপাড়া এই তিন গ্রামের পুরাতন মন্দির দেখতে ধূলাগড়ি থেকে ভ্যানরিক্সা নেওয়া ভাল।

৪। (ক) **জলসরা,** ঘাটাল, পশ্চিম মোদনীপুর। (খ) বুড়ো শিব। (ঘ) আনু. ২২-২৩ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট। ত্রিরথ। আমূল সংস্কৃত। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) ঘাটাল থেকে ক্ষীরপাইগামী বাসে যাত্রা করে জলসরার মন্দিরের পাশেই নামা।

৫। **লালবাগ** (ওমরাহগঞ্জ), মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব। (ঘ) আনু ১৬-১৭ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট। নিরলংকার। গঙ্গার ধারে, দুটি বৃহৎ গাছের শাখার নিচে। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের মুর্শিদাবাদ স্টেশন থেকে রিক্সায়। 'আস্তাবল' এবং পাঁচরাহার নেতাজী মার্কেট ও মোড় ছেড়ে রাস্তার পূর্ণ বাঁকের কোণে, গঙ্গার খেয়া ঘাটের পাশে।

৬। (ক) **সেনহাট,** খানাকুল, হুগলী। (খ) শিব। (ঘ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট নিরলংকার। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) আরামবাগ থেকে 'গড়ের হাট'-গামী বাসে খানাকুল—এখান থেকে রিক্সায়।

৭। **নতুক-জয়কৃষ্ণপুর,** ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) মৃত্যুঞ্জয় শিব। (ঘ) উচ্চতা আনু. ২০ ফুট। ত্রিরথ। সর্বোচ্চ বা তৃতীয় চালাটি এত ক্ষুদ্র যে প্রায় আলংকারিক বলে মনে হয়।

নিরলংকার। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) ঘাটাল থেকে কুশীঘাট (ভায়া, রাধানগর)-গামী বাসে যাত্রা করে নতুক স্টপেজে নেমে গ্রামের শ্রীধরের নবরত্ন মন্দির-এর ঠিক পিছনে, বাগানে।

দ্র. কলকাতার **বেলগাছিয়ার ওলাই চণ্ডীর মন্দিরটি** আদিতে খাঁটি আটচালা—কিন্তু সংস্কারকালে আটচালাটির মাথায় একটা চারকোণা ছোট স্তম্ভের মত অংশ যোগ করে তার উপর একটি সমতল ছাদ দিয়ে, আবার তার উপরে আধুনিক চূড়া যোগ করা হয়েছে—ফলে স্থাপত্যটি আটচালাও রইল না আবার বারোচালাও হল না, কারণ আটচালার উপরের চারচালাটিই তো এখানে নেই তার বদলে আছে ছোট একটি আধুনিক মন্দিরের আদল। **নতুক-জয়কৃষ্ণপুরে** আবার সর্বোচ্চ চারচালাটি এত ক্ষুদ্র যে মন্দিরটিকে আটচালা বলেই মনে হয়।
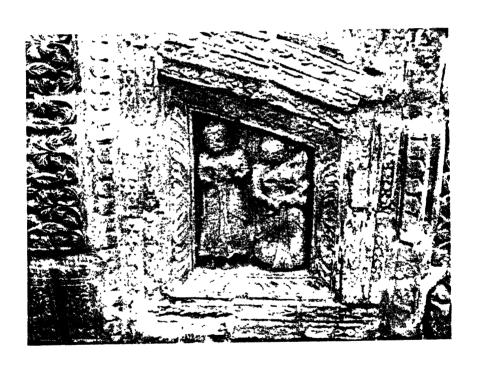
পঞ্জি-৭

[একরত্ন]

১। (ক) **যাদবনগর**, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। (খ) পরিত্যক্ত মন্দির (যাদব রায়?)। (গ) মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ। (ঘ) মাকড়া পাথরে নির্মিত। শিখররীতির বলে ভ্রম হয়। দু/একটি পদ্ম ছাড়া নিরলংকার। (ঙ) ১৬৫০।*

২। (ক) **বিষ্ণুপুর**, (লালবাঁধ এলাকা), বাঁকুড়া। (খ) কালাচাঁদ। (গ) রঘুনাথ সিংহ। (ঘ) মাকড়া পাথরে নির্মিত। চারদিকে ত্রিখিলান দালান। উচ্চতা আনু. ৩৫/৩৬ ফুট। সম্মুখগাত্রে পাথরের খোদাই ভাস্কর্য। (ঙ) ১৬৫৬।

৩। (ক) **বিষ্ণুপুর**, (পাথর দরজার কাছে বা দুর্গ এলাকা), বাঁকুড়া। (খ) লালজী। (গ) দ্বিতীয় বীরসিংহ। (ঘ) আনু. ৩৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও বর্গাকার ভূমিনক্সার উপর। পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ তিনদিকে ত্রিখিলান বারান্দা। নিরলংকার। (ঙ) ১৬৫৮।

৪। (ক) **বিষ্ণুপুর**, (মহাপাত্র পাড়া), বাঁকুড়া। (খ) মুরলী-মোহন। (গ) রাণী চূড়ামণি দেবী (মল্লরাজ বীরসিংহের পত্নী এবং দুর্জন সিংহের জননী)। (ঘ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চতা মাকড়া পাথরে নির্মিত। (ঙ) ১৬৬৫।

৫। (ক) **বাঁশবেড়িয়া**, মগরা, হুগলী। (খ) অনন্ত-বাসুদেব। (গ) রামেশ্বর দত্ত। (ঘ) আনু ৩৫ ফুট উচ্চতা। অসাধারণ টেরাকোটা সজ্জায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ। (ঙ) ১৬৬৯। (চ) হাওড়া-ব্যান্ডেল লাইনের চুঁচুড়া (ঘড়িমোড) বা ব্যান্ডেল থেকে অথবা শিয়ালদহ-রাণাঘাট লাইনের কল্যানী ষ্টেশান-সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে অতি সহজেই—হংসেশ্বরী মন্দিরের স্টপেজে নামা। ঠিক পাশে।

প্রাসঙ্গিকী

পাটুলির জয়ানন্দ দত্তের পুত্র রাঘবেন্দ্র সপ্তগ্রামের কাছে গঙ্গাতীরে ঘন বাঁশবন হাসিল করে কাছারী-বাড়ি নির্মাণ করেন। বাঁশবন কেটে জায়গা করা হয়েছিল বলে স্থাননাম হয় বংশবাটি, বা বাঁশবেড়ে বা বাঁশবেড়িয়া। রামেশ্বরই ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে 'অনন্ত বাসুদেব'—এর আলোচ্য মন্দিরটি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করেন। ভাটপাড়ার বিদ্যাসমাজ গড়ে ওঠার আগেই রামেশ্বর কাশী থেকে রামশরণ তর্কবাগীশের মত মহাপন্ডিতকে আনিয়ে এবং বাঁশবেড়িযাতে বেশ কটি টোল ও চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করে বিদ্যাচর্চার পরিমন্ডল গড়ে তোলেন।

৬। (ক) **উড়িয়াশাই**, (ডাঙ্গাপাড়া), গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) পরিত্যক্ত মন্দির। (গ) মল্লরাজ দুর্জন সিংহ। (ঘ) মাকড়া পাথরে নির্মিত; ভগ্ন। অতি সামান্য অলংকৃত। বৃক্ষাক্রান্ত। (ঙ) ১৬৯০। (চ) ঘাটাল-চন্দ্রকোণা বাসে গুয়েদহ, ভ্যানরিক্সা।

প্রাসঙ্গিকী : আইন-ই-আকবরীতে বগড়ী পরগণাকে জলেশ্বর সরকারের অন্তর্ভূক্ত বলা

* বিষ্ণুপুর পরিধির সব ক্ষেত্রেই শহরের রসিকগঞ্জ বাস-স্ট্যান্ড থেকে সহজে যাওয়া যায়। তাই পথনির্দেশ দরকার নেই।

হয়েছে—এতেই মনে হয় যে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে এখানে উড়িষ্যার রাজাদের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। হয়ত এসময়েই চন্দ্রকোণার অল্পদূরে উড়িষ্যার কিছু সৈন্য এবং মন্দিরাদি নির্মাণের জন্য আগত কিছু মিস্ত্রী ও কারিগর আলোচ্য গ্রামটির পত্তন করেন—একারণেই গ্রামটির নাম হয় 'উড়িয়াশাহি' বা 'উড়িয়া পাড়া', পরে তা লোকউচ্চারণে উড়িয়াশাই হয়েছে।

৭। (ক) **রাণীর বাজার,** ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শ্যামরায়। (গ) (ঘ) জঙ্গলাকীর্ণ ও প্রায় লুপ্তদশাগ্রস্ত—তবে উৎকৃষ্ট টেরাকোটা-সজ্জার কিছু আজও দৃশ্যমান। (ঙ) ১৬৯৩। (চ) ঘাটাল শহরের নবনির্মিত বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সায়।

৮। (ক) **বিষ্ণুপুর,** (মদনমোহনগঞ্জ), বাঁকুড়া। (খ) মদনমোহন। (গ) দুর্জন সিংহ। (ঘ) আনু. উচ্চতা ৩৫ ফুট। চারফুট উঁচু মাকড়া পাথরের বেদীর উপর ইটের নির্মাণ। বিষ্ণুপুর-রীতি। টেরাকোটা-সজ্জার উৎকর্ষে সারা বঙ্গে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। (ঙ) ১৬৯৪।

৯। (ক) **বিষ্ণুপুর,** (লালবাঁধ-এলাকা), বাঁকুড়া। (খ) নন্দলাল। (গ) (ঘ) ৩০ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন। পাথরে নির্মিত। ত্রিখিলান। পাথরখোদাই। (ঙ) ১৭ শতক।

১০। (ক) **মদনপুর-পলাশডাঙা,** সোনামুখী, বাঁকুড়া। (খ) শ্যাম-সুন্দর। (গ) (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উঁচু। বিষ্ণুপুর-রীতি, পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে ত্রিখিলান এবং উত্তরে এক খিলান বারান্দা। (ঙ) ১৭ শতকের শেষে। (চ) দুর্গাপুর থেকে বাসে পাথন্না। রিক্সা।

১১। (ক) **বৈকুন্ঠপুর,** দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) পরিত্যক্ত মন্দির। (গ) (ঘ) আনু ২৫/২৬ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন। টেরাকোটা ফুল-লতা-পাতার নকাশি অলংকরণ। জীর্ণ। (ঙ) ১৮ শতকের শুরুতে। (চ) পাঁশকুড়া থেকে ঘাটালের বাসে সরাসরি বৈকুন্ঠপুর।

১২। (ক) **দাসপুর,** (সিংপাড়া), পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) গোপীনাথ। (গ) সিংহ পরিবার। (ঘ) আনু. ৩৪/৩৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। টেরাকোটা সমৃদ্ধ। প্রাচীর ঘেরা মন্দিরক্ষেত্র। সামনে প্রাচীন তুলসী মঞ্চ। (ঙ) ১৭১৬। (চ) পাঁশকুড়া থেকে ঘাটালের বাসে সরাসরি দাসপুর। চুক্তির রিক্সায়।

১৩। (ক) **সাহারজোড়া,** বড়জোড়া, বাঁকুড়া। (খ) নন্দলাল। (গ) (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও মাকড়া পাথরে নির্মিত। ত্রিখিলান দালানযুক্ত। (ঙ) ১৭২০। (চ) দুর্গাপুর থেকে বাসে।

১৪। (ক) **মাগুরুল,** চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) বিশ্বেশ্বর শিব। (গ) (ঘ) আনু. ২৩/২৪ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট। সংস্কারে টেরাকোটা লুপ্ত। (ঙ) ১৭২৪। (চ) পাঁশকুড়া থেকে বাসে সুলতানপুর—এখান থেকে ভ্যান রিক্সায়।

১৫। (ক) **জোড়-মন্দির,** বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। (খ) বিগ্রহ অপসৃত। (গ) মল্লরাজ গোপাল সিংহ। (ঘ) নাম জোড় মন্দির হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনটি পৃথক মন্দির। সবকটিই মাকড়া পাথরে নির্মিত। উত্তর ও দক্ষিণের দুটি উচ্চতায় ৪০ ফুট ও মাঝেরটি আনু. ২৩/২৪ ফুট উচ্চ। (ঙ) ১৭২৬।

১৬। (ক) **বিষ্ণুপুর,** (লালবাঁধ এলাকা), বাঁকুড়া। (খ) রাধাগোবিন্দ। (গ) কৃষ্ণ সিংহের সময়ে? (ঘ) মাকড়া পাথরে নির্মিত। উচ্চতা আনু. ৩৫ ফুট। ত্রিখিলান। দুই সারি পাথরের ভাস্কর্য। মন্দিরের পাশে একটি চমৎকার পাথরের রথ। (ঙ) ১৭২৯।

১৭। (ক) **ঐ**। (খ) রাধামাধব। (গ) শিরোমণি দেবী (মল্লরাজ বীরসিংহের অন্যতমা পত্নী)। (ঘ) মাকড়া পাথরে আনু. ৩০ ফুট উচ্চতার মন্দির। সামনে ত্রিখিলান বারান্দা খোপে খোপে সাজান ভাস্কর্য। পূর্বদিকে ভোগ মণ্ডপ, দোচালা। (ঙ) ১৭৩৭।

১৮। (ক) **বিষ্ণুপুর,** (শাঁখারিপাড়া), বাঁকুড়া। (খ) রাধাকৃষ্ণ। (গ) কুণ্ডু পরিবার। (ঘ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন নির্মাণে ইট এবং মাকড়া পাথই দুই-ই ব্যবহৃত। (ঙ) .. শতকের প্রথমার্ধের শেষদিক।

১৯। (ক) **পাটপুর,** (কৃষ্ণবাঁধ, পূব-পার), বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। (খ) পরিত্যক্ত মন্দির। (ঘ) প্রায় ৩৫ ফুট উচ্চতার। মাকড়া পাথরে নির্মিত। ত্রিখিলান। প্রবেশদ্বারের দুদিকে দুটি সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি। (ঙ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ।

২০। (ক) **পাত্রসায়ের,** বাঁকুড়া। (খ) কালঞ্জয় শিব। (ঘ) আনু/ ৩৫/৪০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। চারদিক খিলান-সমূহ সহ প্রদক্ষিণ বারান্দা। সামনের বৃহৎ নাটমণ্ডপ পরে সংযোজিত। মন্দিরের একপাশে রক্ষিত একটি পিতলের রথ, অন্যপাশে একটি ছোট শিখর-দেউল। (ঙ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ। (চ) বর্ধমান থেকে পাত্রসায়ের-বালসি পথে বিষ্ণুপুর যাচ্ছে এমন বাসে যাত্রা করে সরাসরি মন্দিরের পাশেই নামা।

২১। (ক) **আলঙ্গিরী,** এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর। (খ) রাধা গোকুলানন্দ। (গ) সম্ভবত স্থানীয় জমিদার নরহরি করমহাপাত্র। (ঘ) আনু. ২৬/২৭ ফুট উঁচু। নিরলংকার। সামনের আটচালা জগমোহনটি সংস্কারে উৎকট রূপপ্রাপ্ত। ঘেরা মন্দির ক্ষেত্র। অঙ্গনের বাইরে সুন্দর রাসমঞ্চ ও রাসমাঠ। (ঙ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ। (চ) হাওড়া থেকে বাসে এগরা। বাস বা ট্রেকারে আলঙ্গিরী। কাঁথি থেকেও সহজে এগরা হয়ে।

২২। **গোপালপুর,** পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর। (খ) রাধামাধব। (গ) চৌধুরী পরিবার। (ঘ) আনু. ৫০ ফুট উচ্চতাসম্পন্ন। পঞ্চরথ শিখর-দেউলের আদলে নির্মিত। কিছু নকাশি কাজ ও একসারি টেরাকোটা। (ঙ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের মেছেদা স্টেশান-সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে বাজকুল হয়ে এগরা যাচ্ছে এমন বাসে যাত্রা করে নতুন পুকুর স্টপেজে নেমে ভ্যান-রিক্সায়।

২৩। (ক) **মোহনপুর,** (হাটতলা), পূর্ব মেদিনীপুর। (খ) জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা। (গ) করমহাপাত্র পরিবার। (ঘ) আনু. ২৫/২৬ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। সামনের দেওয়ালে টেরাকোটা অলংকরণ। সামনে দোচালা জগমোহনটি অভিনব। পাশে লক্ষ্মীজনার্দনের আটচালা। সিংহদরজা শোভিত প্রবেশদ্বার সম্পন্ন প্রাচীর ঘেরা মন্দির ক্ষেত্র। (ঙ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ। (চ) এগরা থেকে বাসে বা ট্রেকারে মোহনপুর থানা স্টপ।

২৪। (ক) **ঐ** (রঘুনাথ ক্ষেত্র) (খ) রঘুনাথ। (ঘ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও নিরলংকার। একদা-চারচালা জগমোহনটি ভেঙে সিমেন্টের সমতল ছাদের বারান্দা নির্মাণে মন্দিরটির শোভা ভীষণই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবে মন্দিরের পিছন হতে অর্ধবৃত্তকারে পর পর ছোট ছোট গম্বুজাকৃতি শিব মন্দিরগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। (ঙ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ। (চ) ঐ।

২৫। (ক) মহানাদ, (ঝাপতলা), পোলবা, হুগলী। (খ) জটেশ্বর নাথ। (ঘ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। খাঁজকাটা রেখ ধরনের সুউচ্চ ছূড়া। নিরলংকার। সংস্কৃত। সামনে অন্নপূর্ণার ক্ষুদ্র জোড়বাংলা রীতির মন্দির। (ঙ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ। (চ) হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনের পান্ডুয়া থেকে বাসে সরাসরি।

প্রাসঙ্গিকী

(i) ১৯৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের পক্ষে মহানাদের 'জটতলা' ঢিবিতে— পরীক্ষামূল খননকার্য চালান। এরপর বিভিন্ন সময়ে খনন এবং অনুসন্ধান চালিয়ে মহানাদ অঞ্চল হতে নানা মূল্যবান পুরাবস্তু মেলে—এর মধ্যে রয়েছে ভূসমতলের ছয় ফুট কয়েকটি ইটের দেওয়ালের অংশ, পাত্রাদি ও খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের রীতিতে পঙ্খের তৈরী মাথা।

(ii) ১৯৩৬-এ শ্রদ্ধেয় ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় তাঁরপ্রতিবেদনে জানান যে মহানাদে কুষাণ ও গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা মিলেছে।*

(iii) প্রাপ্ত সূত্রাদি (যেমন, শিব ও তাঁর 'পূর্ণরূপ' বলে কথিত কালভৈরব. বটুক-ভৈরব, একপাদ-ভৈরব প্রভৃতির প্রাচীন অবস্থান ও মহানাদে প্রাপ্ত প্রাচীন শিবলিঙ্গের সাথে গুপ্তযুগীয় শিবলিঙ্গের সাদৃশ্য প্রভৃতি) হতে মনে করা হয় খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতক হতেই শিব ও শক্তিকে কেন্দ্র করে মহানাদে নাথধর্মেব বিকাশ হয়েছিল।

২৬। (ক) **বলিহারপুর,** (গেঁড়িবুড়িতলা), দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) গেঁড়িবুড়ি (লৌকিক দেবী)। (ঘ) আনু. ৩০/৩২ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। নামমাত্র টেরাকোটা অলংকরণ। (ঙ) ১৭৫৭। (চ) দাসপুর (ক্রমাঙ্ক ১২) থেকে রিক্সায়।

প্রাসঙ্গিকী

(i) ওলাইবুড়ি, চণ্ডীবুড়ি, ঘাগরবুড়ি প্রভৃতি অনার্য প্রভাবিত লৌকিক দেবীর মত গেঁড়িবুড়িও লৌকিক দেবী। মন্দিরে দেবীব ভয়ংকরী মূর্তির পাশে ১৮টি শিলায় ধর্মরাজ। 'পণ্ডিত' উপাধিকারী নমশূদ্র-পূজিত হলেও বর্তমানে উচ্চবর্ণের কাছেও মান্য দেবী পূজায় শারদীয় সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এবং বিজয়া দশমীতে বলিদান হয়। ভাদ্র সংক্রান্তিতে গেঁড়িবুড়ির মেলা। উল্লেখযোগ্য, বরাকরের কল্যাণেশ্বরীর সাঁওতালদের পূজিত গ্রামদেবী ঘাঘরবুড়ির 'বোন' নুনিয়াবুড়ি।

(ii) একজন দস্যু নাকি গেঁড়িবুড়ির প্রতিষ্ঠাতা।

২৭। (ক) **বিষ্ণুপুর,** (পাথর-দরজার কাছে রাজবাড়ি এলাকা), বাঁকুড়া। (খ) রাধাশ্যাম। (গ) মল্লরাজ চৈতন্য সিংহ। (ঘ) আনু. ৩৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও মাকড়া পাথরে নির্মিত। সামনে ডানে ও বামে খোলা। ত্রিখিলান বারান্দা ও পিছনে ঢাকা বারান্দা। পাথরের ভাস্কর্যে

* *'Archaeological Activities in Bengal till 1967', Niranjan Goswami, 'Pratna Samiksha', 2 & 3, Directorate of Archaeology & Museums. Govt. of W Bengal, 1993-94, p. 9-10.*

পঙ্খের প্রলেপ—নকাশি কাজ ও খোপে সাজানো দুসারি মূর্তি ভাস্কর্য। সামনের বারান্দার ভিতরের দেওয়ালে, অর্থাৎ গর্ভগৃহের বাহির-দেওয়ালেও দেবদেবী ও পৌরাণিক মূর্তি ভাস্কর্য।

রাধাশ্যাম মন্দিরের প্রবেশ তোরণটি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আনু. ৩০ ফুট লম্বা, ২৩/২৪ ফুট চওড়া ও ২০/২২ ফুট উঁচু দ্বিতল তোড়ন—প্রবেশ পথের দুদিকে দুটি করে চারটি ঘর। উপরে পাশাপাশি দুটি চারচালা নহবৎ খানা। নহবৎ খানা দুটির সম্মুখভাগে পাঁচখিলান প্রবেশপথ। ঘেরা ক্ষেত্রে ছোট রেখ দেউলাকৃতি তুলসী মঞ্চ। (ঙ) ১৭৫৮।

২৮। (ক) **উদয়রাজপুর,** গোঘাট, হুগলী। (খ) শিব। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতার। বিষ্ণুপুরী ধরণ। নিরলংকার। সামনের নাটমণ্ডপ পরে সংযোজিত। শিখরটি রেখ দেউল-রীতিব এবং খাঁজকাটা। (ঙ) ১৭৬৫। (চ) আরামবাগ বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে বালি-দেওয়ান গঞ্জ। বাসস্ট্যান্ড থেকে উদয়রাজপুর ও বালি দেওয়ানগঞ্জের সব কটি মন্দির দেখানোব চুক্তিতে ট্যাক্সিতে।

২৯। (ক) বলিহারপুর, (রায়পাড়া), দাসপুর, পশ্চিমমেদিনীপুর। (খ) ব্রজরাজ কিশোব। (গ) রায় পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন টেরাকোটা অলংকৃত। নিকটে নবচূড় রাসমঞ্চ। (ঙ) ১৭৭২। (চ) পূর্বোক্ত গেঁড়িবুড়িতলা (ক্রমাঙ্ক ২৬), হতে সামান্য এগিয়ে, বলিহার পুর ডানে।

৩০। (ক) **রাণীর বাজার,** ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) দামোদর। (ঘ) আনু. ২০/২৫ উঁচু। টেরাকোটা অলংকৃত। (ঙ) ১৭৮১। (চ) ক্রমাঙ্ক (৭) দেখুন। ওখানে বলা শ্যামরায মন্দিরের অদূরে, মাঝে একটি পঞ্চরত্ন মন্দিব পড়বে।

৩১। (ক) **হরিপুর,** দাঁতন, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) সিদ্ধেশ্বর শিব। (ঘ) আনু. ২৮/২৯ ফুট উঁচু। রত্ন বা চূড়াটি ছাদের পবিসরের প্রায় সমান হওয়ায় শিখর দেউল বলে মনে হয়। (ঙ) ১৭৯৬। (চ) খড়গপুর-কাঁথি বাসে ব্রাহ্মণখলিশা—ভ্যানরিক্সা।

৩২। (ক) **আনন্দপুর,** কেশপুব, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) রাধামাধব এবং রাজ-রাজেশ্বর। (গ) কুণ্ডু পরিবার। (ঘ) আনু. ২৫/২৬ ফুট উচ্চতাব মাকড়া পাথরের স্থাপত্য। (ঙ) ১৮ শতক। (চ) মেদিনীপুর শহর থেকে আনন্দপুরের বাসে সরাসরি।

৩৩। (ক) **কর্ণগড়,** (রাজার গড়), শালবনী, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) পরিত্যক্ত মন্দির। (ঘ) অন্য সমস্ত অংশ মাকড়া পাথরে নির্মিত হলেও চূড়াব উপরাংশ ইটের তৈরী। জঙ্গলাকীর্ণ। (ঙ) ঐ। (চ) মেদিনীপুর শহর থেকে ভাদুতলা হয়ে কর্ণগড়ের বিখ্যাত দাণ্ডেশ্বর ও মহামায়া মন্দির, এখান থেকে ১½ কি.মি.।

৩৪। (ক) **খানাকুল-কৃষ্ণনগর,** খানাকুল, হুগলী। (খ) রাধাবল্লভ। (গ) চৌধুরী পরিবার। (ঘ) আনু. ৪৭ ফুট দীর্ঘ ও প্রায় ৫০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। চূড়াটি অভিনব পদ্ধতিতে খাঁটি চারচালা ধরনের। মন্দিরে। সামনের ও ডান-বাঁয়ের দেওয়ালে তুলনায় বড় বড় আয়তাকার ফ্রেমে চমৎকার টেরাকোটা নকাশি ফুল লতা-পাতার কাজ। সামনের বারান্দার ভিতর দেওয়ালে বা গর্ভগৃহের দেওয়াল গাত্রে রঙীন পঙ্খের কাজও চোখে পড়ার মত। (ঙ) ঐ। (চ) আরামবাগ থেকে 'গড়ের হাট'-গামী বাসে যাত্রা করে খানাকুল স্টপেজে নেমে রিক্সায়।

৩৫। (ক) **গুপ্তিপাড়া** (মঠ) বলাগড়, হুগলী। (খ) রামচন্দ্র। (গ) হরিশ্চন্দ্র রায় (শেওড়াফুলির রাজা) (ঘ) আনু. ৪১ ফুট দীর্ঘ ও ৪৫ ফুট উঁচু। শিখরটি আটকোণা। মন্দিরগাত্র অপূর্ব টেরাকোটা-সমৃদ্ধ (রামায়ণ, কৃষ্ণলীলা ও ফুল লতাপাতার নকাশি কাজ)। (ঙ) ১৮ শতক। (চ) হাওড়া-ব্যাণ্ডেল কাটোয়া লাইনের গুপ্তিপাড়া স্টেশানে নেমে রিক্সায় সরাসরি। মন্দির ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেই ডানে—এর পাশে বৃন্দাবনচন্দ্র ও বিপরীতে কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, বৃন্দাবনচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রের মাঝের কোণে সর্বপ্রাচীন চৈতন্য মন্দির।

প্রাসঙ্গিকী

বাহ বাহ বলিঞা পড়িঞা গেল সাড়া।
বামে শান্তিপুর যে ডাহিনে গুপ্তিপাড়া।।
—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী*

(i) একদা তারকেশ্বরের দশনামী শৈব মঠের অধীন গুপ্তিপাড়ার মঠের সব মন্দিরই এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক রক্ষিত ও সংস্কৃত।

(ii) গুপ্তিপাড়ার অহঙ্কার তার বিদ্যাসমাজ। সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত বিদ্যাচর্চার বিস্ময়কর ধারা গুপ্তিপাড়ায় অব্যাহত ছিল। রাঘবেন্দ্র শতাবধান, চিরঞ্জীব শতাবধান, মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ দিকপাল মহাপণ্ডিতের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ছিল ভারতজোড়া। গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিত সমাজের, বিশেষত চট্টশোভাকর বংশীয় মহাপণ্ডিতগণের, তন্ত্রসাধনার কথাও ছিল মুখে মুখে। 'বাঁদর, শোভাকর, মদের ঘড়া/তিন নিয়ে গুপ্তিপাড়া।'

৩৬। (ক) **আদাসিমলা**, সবং, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) রুদ্রেশ্বর শিব (পরিত্যক্ত)। (গ) ভূঁইয়া পরিবার। (ঘ) আনু. ২৩/২৪ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। শিখর-দেউল মনে হয়, দাঁতন থানার হরিহরপুর গ্রামের একরত্ন মন্দিরটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বালীচক থেকে দেহাটিগামী বাসে বড়চারা—সেখান থেকে ভ্যান-রিক্সায়।

৩৭। (ক) **খানাকুল-কৃষ্ণনগর**, খানাকুল, হুগলী। (খ) গোপীনাথ। (গ) অভিরাম গোস্বামী (চৈতন্যপার্ষদ) প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ, তবে বর্তমান মন্দির 'চেতুয়া দাসপুর মান্দারণ খানাকুল ও বালীদেওয়ানগঞ্জের ধীবরমণ্ডলী' কর্তৃক নির্মিত। (ঘ) আনু. ৪৫-৫০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। খাঁজকাটা রেখ দেউলের মত অত্যুচ্চ একটি 'রত্ন' বা চূড়া। সামনের বৃহৎ নাটদালান পরে সংযোজিত। পাশের ১৭৭৪-এ নির্মিত গোপীনাথেরই পূর্বতন নবরত্ন মন্দিরটি একন ঝুলন মন্দিররূপে ব্যবহৃত। (ঙ) ১৮১২ (বর্তমান মন্দির)। (চ) ক্রমাঙ্ক ৩৪।

৩৮। (ক) **রাধাকান্তপুর**, দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) গোপীনাথ। (গ) দাস পরিবার। (ঘ) আনু. ২৮-৩০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। টেরাকোটা অলংকরণ ও টেরাকোটাতেই দীর্ঘ প্রতিষ্ঠালিপি যুক্ত। (ঙ) ১৮৪৪। (চ) পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে টালিভাটা। ভ্যানরিক্সায়। হেঁটেও।

* 'চণ্ডীমঙ্গল', প্রাগুক্ত সংস্করণ, পৃ. ২২৬।

৩৯। (ক) **দক্ষিণ সিমুলিয়া**, দীঘা, পূর্ব মেদিনীপুর। (খ) সুবর্ণেশ্বর শিব। (ঘ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। নিরলংকার। (ঙ) ১৯ শতকের মধ্যভাগ। (চ) কাঁথি বা দীঘা থেকে বাসে।

৪০। (ক) **গড়বেতা,** পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) মদনমোহন। (গ) সুকুল পরিবার। (ঘ) মাকড়া পাথরে নির্মিত। নিরলংকার। আনু. ৩০-৩৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। ১৮৮২-তে সংস্কারের লিপি আছে। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) মেদিনীপুর শহর বা চন্দ্রকোণা থেকে বাসে।

৪১। (ক) **ঐ।** (বাজারের কাছে সিংহ পরিবারের ঠাকুববাড়ি)। (খ) লক্ষ্মী জনার্দন। (গ) সিংহ পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০-৩৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। সামান্য টেরাকোটা। ঘেরা মন্দিরক্ষেত্রে এছাড়া ১২টি রেখ দেউল, সতেরো চূড়া রাসমঞ্চ এবং নয়চূড়া দোলমঞ্চ। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) ঐ।

৪২। (ক) **রামপুর,** (বামুনপাড়া), পাত্রসায়েের, বাঁকুড়া। (খ) গোপীনাথ। (গ) গোস্বামী পরিবার। (ঘ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন। সামান্য টেরাকোটা। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) বর্ধমান থেকে বাসে সরাসরি বাঁকুড়ার বিখ্যাত গ্রাম হদলনারায়ণপুর—এখান থেকে রিক্সায় (ভ্যান)।

৪৩। **রাজবলহাট,** জাঙ্গীপাড়া, হুগলী। (খ) নারায়ণ। (গ) কুণ্ডু পরিবার। (ঘ) আনু. ২০-২২ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। সামান্য টেরাকোটা। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) হাওড়া বা হরিপাল থেকে বাসে।

৪৪। (ক) **কানপুর,** আরামবাগ, হুগলী। (খ) কণকেশ্বর শিব। (ঘ) রেখ ধরনের 'রত্ন' শীর্ষদেশ গম্বুজাকৃতি। চারদিকে পাত্রসায়েরের কালঞ্জয় শিবের মন্দিরের মত বহু খিলান ও বক্রচালের বারান্দা। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) আরামবাগ থেকে বাস।

৪৫। (ক) **ভাস্তারা,** ধনিয়াখালি, হুগলী। (খ) স্বয়ম্ভুদেব শিব। (ঘ) সংস্কৃত। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) বর্ধমান কর্ড লাইনের গুড়াপ থেকে বাস/ট্রেকার।

সংযোজন : (i) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ক্ষীরপাই (চন্দ্রকোণা থানা)-এ, ঘাটাল-চন্দ্রকোণা সড়কের ধারে মাকড়া পাথরের একটি সপ্তদশ শতকীয় একরত্ন মন্দির সংস্কারে সম্পূর্ণ রূপ বদল করেছে। অপরদিকে ডেবরা থানার মাড়োতলা/সত্যপুরের নিকটবর্ত পাইকপাড়ি গ্রামের সিংহবাহিনীর পঞ্চরত্ন মন্দিরটি সংস্কারে একরত্ন মন্দিরে পরিণত হয়েছে (চারকোণের চারটি রত্ন ভেঙে ফেলে শুধু মাঝের রত্নটি রাখার ফলে।) আদিরূপের মৌলিক পরিবর্তনের জন্য এদুটিকে সারণিভুক্ত করা হয়নি।

(ii) রেখ বা শিখর দেউল, চারচালা ও আটচালা মন্দিরের গুচ্ছ যথেষ্ট হলেও রত্ন-রীতির মন্দির গুচ্ছ তেমন চোখে পড়ে না। একরত্ন রীতির মন্দিরের একটিই জোড়া আমাদের চোখে পড়েছে (স্মরণীয় বিষ্ণুপুরের 'জোড় মন্দির' আসলে বিস্তৃত ক্ষেত্রে তিনটি পৃথক মন্দির)

১। (ক) **শ্রীপুর,** বলাগড়, হুগলী। (খ) শিব (জোড়া শিব)। (গ) মিত্র মুস্তৌফী পরিবার। (ঘ) একই বেদীতে পাশাপাশি দুটি আনু. ২৫ ফুট উচ্চতার একরত্ন মন্দির। নিরলংকার সামনে নিচু সীমানা প্রাচীর। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) হাওড়া-ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইনের বলাগড় স্টেশানে নেমে রিক্সায় সরাসরি। পাকা রাস্তার বাঁয়ে ছোট মাঠের মত জায়গায় সুদৃশ্য দ্বিতল দোলমঞ্চের নিকট হতে ডানে ঢোকা পথে, গড় এলাকায়—সামান্য তফাতে বিখ্যাত চণ্ডীমণ্ডপ, রাসমঞ্চ, রাধাগোবিন্দের দালান মন্দির প্রভৃতি।

পঞ্জি—৮

পঞ্চরত্ন

অন্যরকম উল্লেখ না থাকলে ঃ উপাদান ইট, ত্রিখিলান, বক্রচাল, সাধারণ।

১. (ক) **গোকুলনগর,** জয়পুর, বাঁকুড়া। (খ) গোকুলচাঁদ। (গ) সম্ভবত মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ (বীর হম্বীরের পুত্র)। (ঘ) ল্যাটেরাইট পাথরে নির্মিত আনু. ৪৫ ফুট, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা, কেন্দ্রীয় চূড়াটি আটকোনা দেউলের মত ও চারকোণের চারটি চূড়া চারকোণা দোলমঞ্চের মত। চারদিকে ত্রিখলান বারান্দা। পূব ও দক্ষিণে ত্রিখিলান প্রবেশপথের দুপাশের দেওয়ালে চারটি করে সারিতে পাশাপাশি তিনটি করে ভাস্কর্যের ফ্রেম। খিলানশীর্ষও অলংকৃত। দেওয়ালের ভাস্কর্যের বিষয় প্রথাগত— দশাবতার ও পৌরাণিক দেবদেবী। একটি কালো পাথরের অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্তি বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদ-কর্তৃক এখান থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল। পাথরের দেওয়াল ঘেরা মন্দির ক্ষেত্রে আরও আছে বিশাল এক অতিথি-শালার (ভোগঘরের?) অবশেষ, এটিও পাথরের। (ঘ) ১৬৩৯ বা ১৬৪৩ (চ) জয়রামবাটি থেকে বিষ্ণুপুরগামী বাসে যাত্রা ক'রে কুম্ভস্থল বা কুম্ভস্থলের পর জয়পুরে নেমে রিক্সায়।

প্রাসঙ্গিকী : গোকুলনগর-সংলগ্ন সলদা গ্রামে ভুবনেশ্বর শিবের দেউলের সামান্য আগে একটি বিদ্যালয়ের প্রবেশপথের মুখে তথা এক বৃহৎ পুকুরের পাড়ে একটি আধুনিক পাকা ঘরে পাথরের দুটি প্রাচীন বৃহৎ মূর্তি পূজিত হচ্ছে— একটি চতুর্ভূজা ও অপরটি বরাহমুখী। চতুর্ভূজা মূর্তিটির পদতলে বোধ হয় মহাকাল। এছাড়াও সলদা গ্রামে আরও বেশ কিছু প্রাচীন মূর্তি বা মূর্তির ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে—এর মধ্যে আছে নরসিংহ, শিব, কতগুলি প্রাচীন জৈন মূর্তি প্রভৃতি। এসবই এই অঞ্চলের প্রাচীনতার সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু এর রহস্য রহস্যই থেকে গেছে।

২. (ক) **বিষ্ণুপুর,** বাঁকুড়া। (খ) শ্যাম রায়। (গ) মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ (বীর হম্বীরের পুত্র) (ঘ) আনু. ৩৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে আনু. ৩৭/৩৮ ফুট। চারদিকের দেওয়াল অনবদ্য টেরাকোটা সমারোহে সুসমৃদ্ধ। চারদিকেই ত্রিখিলান ঢাকা বারান্দা— এগুলির ভিতর দেওয়ালের সম্মুখভাগও টেরাকোটা সমৃদ্ধ। টেরাকোটা অলংকরণ-শিল্পের সর্বোচ্চ পর্যায়ের অন্যতম নিদর্শন এই মন্দিরটি। কেন্দ্রীয় চূড়াটি আটকোণা ও চার কোণের চারটি চূড়া চারকোণা, এদের উপর চালাঘরের মত ঢালু চাল। (ঙ) ১৬৪৩।

৩. (ক) **বৈতল,** (দক্ষিণবাড়—গড়ধার) জয়পুর, বাঁকুড়া। (খ) শ্যামচাঁদ। (গ) মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ (বীর হম্বীরের পুত্র)। (ঘ) প্রায় ৪০ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন এবং দৈর্ঘ্য-প্রস্থে আনু. ৩৬ ফুট। ল্যাটেরাইট প্যাথরে নির্মিত। চারদিকে ত্রিখিলান ঢাকা বারান্দা। মূল বা মাঝের চূড়াটি আটকোণা, খাঁজকাটা ও চারকোণের চারকোণা ও খাঁজকাটা চারটি চূড়ার তুলনায় বিপুল পরিমাণে বৃহৎ। চূড়া পাঁচটির শীর্ষদেশ দেউল-সদৃশ। সামনের দেওয়ালে সামান্য কিছু জ্যামিতিক নক্সা পাথরে খোদিত। গ্রামের পথের ধারে, অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে মন্দিরটির সামনের মাঠে অনুচ্চ টিবি— স্থানীয়রা মনে করেন এখানেই রাজার গড় ছিল, তাই জায়গাটির নাম 'গড়ধার'।

(ঙ) ১৬৬০। (চ) বিষ্ণুপুর থেকে বাসে সরাসরি বা বাঁকাদহের বৈতল মোড় হতে বাস পাল্টিয়ে বৈতলের পাতরপুকুর মোড়ে নেমে ভ্যান রিক্সায। উল্লেখ্য, তারকেশ্বর-বাইপুর, কামারপুকুর-খাতড়া, জয়রামবাটি-খাতড়া প্রভৃতি বাস বৈতল হ'য়ে যায়।

৪. (ক) **বিষ্ণুপুর,** (মাধবগঞ্জ, রথতলা), বাঁকুড়া। (খ) মদন-গোপাল। (গ) রাণী শিরোমণি (মল্লরাজ দ্বিতীয় বীরসিংহের পত্নী)। (ঘ) ল্যাটেরাইট পাথরে পাথরে নির্মিত। আনু. ৪৫ ফুট উচ্চ এবং দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৩৭/৩৮ ফুট। কেন্দ্রীয় চূড়াটি আটকোণা ও চারকোণের চারটি চূড়া বর্গাকার—সবকটি চূড়াই পিড়া রীতির দেউলের ধাঁচের খাঁজবিশিষ্ট। খিলানশীর্ষে দু-চারটি পদ্ম ও পূব খিলান-শীর্ষে সামান্য রামায়ণী প্যানেল। (ঙ) ১৬৬৫।

৫. (ক) **শাঁকারি,** খণ্ডঘোষ, বর্ধমান। (খ) গোবিন্দ। (গ) মজুমদার পবিবাব। (ঘ) সংস্কৃত। (ঙ) ১৬৭৩। (চ) বর্ধমান তিনকোণিয়া বাসস্ট্যাণ্ড থেকে বাসে।

৬ (ক) **মেমানপুর,** গোঘাট, হুগলী। (খ) শ্যামসুন্দব। (ঘ) মাকড়া পাথরে নির্মিত। নিরলংকার। (ঙ) ১৭ শতক। (চ) আরামবাগ থেকে বাসে।

৭. (ক) **হাটগোবিন্দপুর,** (প্রধান রাস্তা বা বাসরাস্তা), বর্ধমান। (খ) শিব। (গ) ১৭ শতকের শেষে। (ঘ) আনু. ২৫/২৬ ফুট উচ্চ ও টেরাকোটা-সম্পন্ন। প্রবেশদ্বার ও দু-একটি চূড়া ভগ্ন। টেরাকোটাও অতি ক্ষয়িত। (ঙ) ১৭ শতকের শেষ দিক। (চ) বর্ধমান শহরের তিনকোনিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে হাটগোবিন্দপুরের 'চড়কতলা'।

৮. (ক) **পালপাড়া,** পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর। (খ) কিশোরজীউ। (গ) রায় মহাপাত্র পরিবার। (ঘ) ১৭ শতকের শেষ দিক। (ঙ) মেছেদা-বাজকুল এগবা বাসে।

৯. (ক) **ত্রিলোচনপুর,** ডেবরা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) শীতলা (গ) প্রায় চারফুট উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর আনু. ২৬/২৭ ফুট উচ্চতার মন্দির—নিরলংকার। (ঘ) ১৭ শতকের শেষ দিক। (ঙ) পাঁশকুড়া স্টেশন-সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে লোয়াদা হ'য়ে ত্রিলোচনপুর।

১০. (ক) **পাকুই,** ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) বৃন্দাবনচন্দ্র। (গ) চৌধুরী পরিবার। (ঘ) আনু. ২৮/ফুট উচ্চতা সম্পন্ন। টেরাকোটা বিনষ্ট। মন্দির আংশিক ভগ্ন। (ঙ) ১৭ শতকের শেষ দিক। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বালিচক ষ্টেশন-সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে মুড়মারীগামী বাসে যাত্রা করে 'গিরিবালা রাইসমিল' স্টপেজে নেমে হেঁটে বা রিক্সায়।

১১. (ক) **সাহাগঞ্জ-খামারপাড়া,** (বকুলতলা) চুঁচুড়া, হুগলী। (খ) শিব। (গ) আনু. ২০/২২ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট। টেরাকোটা অলংকবণ অতি জীর্ণ ও বিনষ্টপ্রায়। এক দুয়ারী। (ঘ) ১৮ শতকের প্রথম দিক। (ঙ) চুঁচুড়া বা ব্যাণ্ডেল থেকে বাঁশবেড়িয়ার বাসে।

১২. (ক) **চিলকিগড়,** জামবনী, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) কনকদুর্গা [বিগ্রহ সামনের আধুনিক মন্দিরে স্থানান্তরিত]। (গ) দেওধবলদেব পরিবার। (ঘ) মাকড়া পাথরের ভিতের উপর ইটের মন্দির। উচ্চতা আনু. ৪০ ফুট। অতি জীর্ণ। পরিত্যক্ত। (ঙ) ১৮ শতকের প্রথম দিক। (চ ঝাড়গ্রাম শহর থেকে অটোরিক্সায়।

১৩. (ক) **নবগ্রাম,** (রায়পাড়া), ঘাটাল, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) সিংহবাহিনী। (গ) রায়পরিবার। (ঘ) আনু. ৩৩/৩৪ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন। টেরাকোটা-সজ্জিত। (ঙ) ১৭০৯। (চ) ঘাটাল থেকে বাসে।

১৪. (ক) **মেট্যালা,** (বাবুপাড়া), গঙ্গাজলঘাটি, বাঁকুড়া। (খ) লক্ষ্মী-নারায়ণ। (গ) তিলক-চন্দ্র রায় (সম্ভবত মল্লরাজাদের সেনাবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী)। (ঘ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন এবং পশ্চিম ছাড়া তিনদিকে ঢাকা বারান্দা। উত্তর, দক্ষিণ ও বিশেষ করে পুব দেওয়াল-গাত্র টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। পাঁচটি চূড়াই চারকোণা এবং খাঁজকাটা রেখ দেউলের মত। (ঙ) ১৭১৮। (চ) বাঁকুড়া-মেজিয়া বাসে অমরকানন হয়ে প্রায় ৫ কি.মি.।

১৫. (ক) **রাধানগর,** ঘাটাল, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) গোপীনাথ (পরিত্যক্ত মন্দির)। (ঘ) মাকড়া পাথরে নির্মিত, উচ্চতা আনু. ৪০/৪২ ফুট। অনেকটা বিষ্ণুপুরী ধাঁচে—মূল রত্ন অতি স্থূল ও বক্রচাল বৃহৎ দেউলের মত। অন্য চারটিও ক্ষুদ্র বক্রচাল দেউলের মত। দেওয়ালে বিপজ্জনক ফাটল। ত্রিখিলান। নিরলংকার। (ঙ) ১৭১৮ (চ) ঘাটাল-কুঠীঘাট (ভায়া, রাধানগর) বাসে রাধানগর।

১৬. (ক) **খাঁদরা,** অন্ডাল, বর্ধমান। (খ) রাধামাধব। (গ) সরকার পরিবার (বড় তরফ)। (ঘ) মাকড়া পাথরে নির্মিত। বৃহৎ ক্ষেত্র—পাথরের দোলমঞ্চ, রাসমন্দির, ঝুলন মন্দির, ভোগঘর। (ঙ) ১৭২১। (চ) অণ্ডাল থেকে বাসে।

১৭. (ক) **সয়লা,** দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) রঘুনাথ। (গ) সিংহ পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০/৩২ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট ও নিরলংকার। (ঙ) ১৭২২। (চ) পাঁশকুড়া থেকে ঘাটালগামী বাসে সুলতাননগর—এখান থেকে রিক্সায় সরাসরি।

১৮. (ক) **বাজবলহাট,** জাঙ্গীপাড়া, হুগলী। (খ) দামোদর। (গ) দত্ত পরিবার। (ঘ) ১৭২৩। (ঙ) হাওড়া-তারকেশ্বর লাইনের হরিপাল ১০ নং বাসে।

১৯. (ক) **দশঘরা,** (বিশ্বাসপাড়া), ধনিয়াখালি, হুগলী। (খ) গোপীনাথ। (গ) সদানন্দ বিশ্বাস। (ঘ) আনু. ৩০/৩২ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন। অত্যন্ত মনোরম টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। সামনের মন্ডপ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সংযোজিত। এছাড়াও চারচালা দোলমঞ্চ, আটকোণা নয়চূড়া রাসমঞ্চ ও একটি দুর্গাদালান এখানে আছে। (ঙ) ১৭২৯। (চ) তারকেশ্বর স্টেশান সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে অতি সহজে বাসে বা ট্রেকারে দশঘরা।

২০. (ক) **উখরা,** অন্ডাল, বর্ধমান। (খ) সীতারাম। (গ) মেরুচন্দ্র রায়। (ঘ) মাকড়া পাথরে নির্মিত। বৃহৎ, নিরলংকাব। (ঙ) ১৭৪০। (চ) বর্ধমান-আসানসোল লাইনের অন্ডাল থেকে বাসে।

২১. (ক) **বালি-দেওয়ানগঞ্জ,** (দালানপাড়া), গোঘাট, হুগলী। (খ) পরিত্যক্ত মন্দির। (গ) অতি জীর্ণদশাগ্রস্ত। তবুও অবশিষ্ট টেরাকোটা ফলকগুলি মুগ্ধ করে। (ঘ) ১৭৪৭। (ঙ) আরামবাগ থেকে বাসে বালি-দেওয়ানগঞ্জে গিয়ে বাসস্ট্যান্ড থেকে চুক্তির ট্যাক্সিতে।

২২ (ক) **নাড়াজোল,** (রাজবাড়ি), দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) জয়দুর্গা। (গ) আনু ২৬/২৭ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। নিরলংকার। (ঘ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ। (ঙ) মেদিনীপুর শহর, ঘাটাল বা দাসপুর থেকে বাসে।

২৩. (ক) **ভট্টবাটি (মাটি),** নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ। (খ) রত্নেশ্বর শিব। (গ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ও দেউলের মত ত্রিরথ রীতিতে নির্মিত। আমাদের বিবেচনায় পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে সুন্দর টেরাকোটা অলংকরণে সজ্জিত দেবালয়গুলির একটি। স্থাপত্য-সৌষ্ঠবেও পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরতম পঞ্চরত্ন মন্দিরগুলির অন্যতম। একদুয়াবী। (ঙ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ?। (চ) শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের মুর্শিদাবাদ স্টেশান থেকে রিক্সায় লালাবাগ সদর ঘাট (আদালত ভবনের পর)— এখান থেকে খেয়া নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে আবার রিক্সায় আন্দাজ পাঁচ কি. মি.। নারিকেলবাগান মোড় থেকে বাঁয়ে চলা পথ দিয়ে গ্রামে ঢুকে বেশ কিছুটা গিয়ে ডানের পথে—৩৯ নং চাড়ালপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় অতিক্রম ক'রেই ডানে।

২৪. (ক) **দিহিবাতপুর,** পুড়শুড়া, হুগলী। (খ) শিব [দ্বিতীয় মন্দিরটি সংস্কারে একরত্নে পরিণত]। (গ) সরকার পরিবাব। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতা। রেখ দেউল ধরণের চূড়া— তবে চারকোণের চারটির তিনটি চূড়া-ই লুপ্ত, একপাশের দেওয়ালে বড় গর্ত, বৃক্ষাক্রান্ত। এক দুয়ারী। টেরাকোটা পদ্ম দুদিকে এক এক সারি ও দ্বারশীর্ষে প্রথাগত টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৫৬। (চ) তারকেশ্বর থেকে অমরপুরের ট্রেকারে বা খুশীগঞ্জের বাসে যাত্রা করে মির্জাপুর স্টপেজে নেমে হাঁটা।

২৫. (ক) **শাঁকারি,** খন্ডঘোষ, বর্ধমান। (খ) সিংহবাহিনী। (ঘ) ত্রিখিলান। আনু. ৩০ ফুটের মত উচ্চতা। অত্যন্ত উৎকৃষ্ট টেরাকোটা-সম্পন্ন। (ঙ) ১৭৬২। (চ) ক্রমিক, ৫ দ্র.।

২৬. (ক) **কোলাগাছিয়া,** গোঘাট, হুগলী। (খ) রঘুনাথ। (গ) দাস পরিবার। (ঙ) ১৭৬২। (চ) আরামবাগ থেকে বাসে।

২৭. (ক) **আকুই,** ইন্দাস, বাঁকুড়া। (খ) রাধাকান্ত। (গ) কানুরাম দাস (রায়)। কারিগর, বহুলাড়া-নিবাসী, ঈশ্বরী। (ঘ) প্রায় ৩৫/৩৬ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও সামনের দেওয়ালে অতি মনোরম টেরাকোটার বিরল ও বিপুল সমাহার নিবদ্ধ—রামায়ণ, কৃষ্ণলীলা ও পুরাণ। (ঙ) ১৭৬৪। (চ) বর্ধমান শহরে তিনকোণিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে সরাসরি আকুই।

২৮. (ক) **চন্দ্রকোণা,** (অযোধ্যা রঘুনাথবাড়ি), পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ)রামেশ্বর শিব। (গ) বর্ধমান-বাজপরিবার? (ঘ) ঝামাপাথরে নির্মিত। আনু. ২৫/২৬ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। (ঙ) ১৭৬৫। (চ) মেদিনীপুর শহর, পাঁশকুড়া অথবা ঘাটাল থেকে সরাসরি বাসে চন্দ্রকোণা টাউন স্টপেজ। এখান থেকে রিক্সায়।

২৯. (ক) **সোমড়া,** বলাগড়, হুগলী। (খ) মহাবিদ্যা। (গ) রামশঙ্কর রায়। (চ) ১৭৬৫। ব্যাণ্ডেল-কালনা ট্রেনে সোমড়া বাজার।

৩০. (ক) **গোপীকান্তবাড়,** পিংলা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) রঘুনাথ। (গ) পাল পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০/৩৫ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন। টেরাকোটার নকাশী অলংকরণ। (ঙ) ১৭৬৮। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বালিচক স্টেশান সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে বা সামান্য এগিয়ে ট্রেকার-স্ট্যান্ড থেকে ট্রেকারে পিংলা— তার লাগোয়া।

৩১. (ক) **শ্যামসুন্দরপুর পাটনা** (নাথযোগী মঠ) পাঁশকুড়া, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) সিদ্ধিনাথ। (গ) আনু. ২৬/২৭ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট। ত্রিখিলান প্রবেশপথের উপব টেবাকোটা অলংকরণ—গর্ভগৃহেব কাঠের দরজার পাল্লাতেও চমৎকার কাজ। (ঙ) ১৭৬৮। (চ) পাঁশকুড়া স্টেশান থেকে ট্রেকারে গোবিন্দপুর—সেখান থেকে কাঁসাই পেরিয়ে।

৩২. (ক) **রাধাকান্তপুর,** (বসুপাড়া), দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) দধি-বামন। (গ) বসু পরিবার। (ঘ) আনু. ২৬/২৭ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট। সামনের দেওয়ালে টেরাকোটা অলংকরণ, গর্ভগৃহের দরজাতে কাঠের কাজ। (ঙ) ১৭৭০। (চ) পাঁশকুড়া স্টেশান-সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে টালিভাটা, এখান থেকে ভ্যানরিক্সায় বা হেঁটে।

৩৩. (ক) **গয়েশপুর,** ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শ্যাম রায়। (গ) টেরাকোটা অলংকৃত ২৪/২৫ ফুট উচ্চতার পরিত্যক্ত মন্দির। (ঘ) ১৭৭০। (ঙ) পাঁশকুড়া থেকে বাসে লোয়াদা— এখান থেকে ভ্যানরিক্সায়, অথবা ২½/৩ কি.মি. হাঁটা।

৩৪. (ক) **কিশোরপুর,** দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) রাধাবল্লভ (গ) গোস্বামী পরিবার। (ঘ) আনু. ৪০/৪৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট— সামান্য টেরাকোটা। (ঙ) ১৭৭২। (চ) পাঁশকুড়া ঘাটাল বাসপথের বেলতলা থেকে ভ্যান-রিক্সায় ৫ কি.মি.।

৩৫. (ক) **গোবরহাটি,** কান্দী, মুর্শিদাবাদ। (খ) বৃন্দাবনচন্দ্র। (গ) ব্রজমোহন দাস (ঘোষ)। (ঘ) আনু. ৪০/৪২ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। খাঁজ-কাটা দেউলের আকারের পাঁচটি চূড়া— মাঝের চূড়াটি আকারে ও উচ্চতায় অতি বৃহৎ। টেবাকোটা শোভিত, (ঙ) ১৭৭২। (চ) শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের বহরমপুর শহরের বাসস্ট্যান্ড থেকে কান্দীগামী বাস-পথের খোশবেশের মোড়ে নেমে চাঁদপাড়াগামী পিচের সড়ক ধ'রে ভ্যানরিক্সায়।

৩৬. (ক) **সাটিথান,** পোলবা, হুগলী। (খ) শিব। (গ) রামচন্দ্র ঘোষ। (ঘ) টেরাকোটা-অলংকৃত। আনু. ২৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। (ঙ) ১৭৭৬। (চ) হাওড়া-ব্যান্ডেল লাইনের চুঁচুড়া শহরের ঘড়িমোড় বাসস্ট্যান্ড থেকে তারকেশ্বরগামী বাসে সরাসরি সাটিথান।

৩৭. (ক) **গোবিন্দনগর** (চেঁচুয়া-গোবিন্দনগর), দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) রাধা-গোবিন্দ। (গ) গোস্বামী পরিবার। কারিগর : সাফল-রামচন্দ্র মিস্ত্রি। (ঘ) আনু. ৩০/৩২ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট ও মনোরম টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। গর্ভগৃহেব দরজাতেও চমৎকার কাঠের কাজ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংস্কৃত ও রক্ষিত। (ঙ) ১৭৮১। (চ) ক্রম ৩৩ দ্র.

৩৮. (ক) **বীরনগর,** (দক্ষিণপাড়া), রাণাঘাট, নদীয়া। (খ) শিব 'ব্রহ্মচারীদের শিবমন্দির' নামে পরিচিত। (গ) অমরনাথ ব্রহ্মচারী ব'লে স্থানীযভাবে কথিত। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। কিছু পঙ্খের কাজ অবশিষ্ট। (ঙ) ১৭৮২। (চ) শিয়ালদহ কৃষ্ণনগর লাইনের বীরনগর স্টেশান থেকে রিক্সায়।

৩৯. (ক) **চুঁচুড়া,** (কনকশালী কদমতলা), হুগলী। (খ) লক্ষ্মী-জনার্দন। (গ) সরকার পরিবার। (ঙ) ১৭৮৩। (চ) শিয়ালদহ মেইন লাইনের নৈহাটি থেকে গঙ্গা পেরিয়ে বা চুঁচুড়া-ঘড়িমোড় থেকে রিক্সা।

৪০. (ক) **কোঙারপুর,** কোতুলপুর, বাঁকুড়া। (খ) রঘুনাথ। (গ) মুখার্জী পরিবার। কারিগর, রামমোহন মিস্ত্রী। (ঘ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট। সামান্য টেরাকোটা। সংস্কৃত। (ঙ) ১৭৮৫। (চ) জয়রামবাটি থেকে রিক্সা।

৪১ (ক) **শ্যামবাজার,** গোঘাট হুগলী। (খ) রাধাদামোদর। (গ) দত্ত পরিবার। (ঘ) টেরাকোটা অলংকৃত। (ঙ) ১৭৯০। (চ) আরামবাগ বা কামারপুকুর থেকে বাসে।

৪২. (ক) **দাসপুর,** (সিংপাড়া), পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) লক্ষ্মী-জনার্দন। (গ) পাল পরিবার। (ঘ) আনু. ২৩/২৪ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও চমৎকার টেরাকোটা সজ্জিত। গর্ভগৃহের কাঠের দরজার পাল্লাতেও খোদাই। ঘেরা মন্দির ক্ষেত্রে পাঁচিল ঘেঁষে জীর্ণ দোলমঞ্চ। (ঙ) ১৭৯১। (চ) পাঁশকুড়া বা ঘাটাল থেকে বাসে দাসপুর— এখান থেকে সব দেখানোর চুক্তিতে রিক্সায়।

৪৩. (ক) **চাউলি,** ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শ্রীধর। (গ) জানা পরিবার। (ঘ) আনু. ২৩/২৪ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন এবং টেরাকোটা অলংকরণ-সমৃদ্ধ। সংলগ্ন রাসমঞ্চটিও সুন্দর টেরাকোটা-মণ্ডিত। (ঙ) ১৭৯৮। (চ) ঘাটাল শহরে নবনির্মিত বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সায়।

৪৪. (ক) **ডিহি-বলিহারপুর,** দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) রাধাগোবিন্দ। (গ) পাঠক-গোস্বামী পরিবার। (ঘ) আনু ২৬/২৭ ফুট উচ্চতার। টেরাকোটা অলংকরণে সজ্জিত। (ঙ) ১৭৯৮। (চ) পাঁশকুড়া বা ঘাটাল থেকে বাসে দাসপুর। দাসপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সায়

৪৫. (ক) **কাদিলপুর,** দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) রঘুনাথ ও গোপাল। (গ) দত্ত পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০/৩২ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন ও টেরাকোটা অলংকৃত। গর্ভগৃহের কাঠের পাল্লাতেও চমৎকার কাঠের কাজ। অদূরে নয় চূড়া রাসমঞ্চ। (ঙ) ১৭৯৯। (চ) পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে যাত্রা ক'রে বেলতলা স্টপেজে নেমে ভ্যানরিক্সায় কলমীজোড় হ'য়ে সরাসরি (আন্দাজ তিন/সাড়ে তিন কি.মি.)।

৪৬. (ক) **কিসমৎ নাড়াজোল,** (বৈষ্ণব অস্থল), দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) মদন মোহন। (গ) শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর পরিচালিত। (ঘ) আনু. ২৫/৩০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন, নিরলংকার। ঘেরা মন্দিরক্ষেত্রে মন্দিরের সামনে বৃহৎ নাটমন্ডপ পরে সংযোজিত। অদূরে বাঁধরাস্তার কাছে একদিকে সুউচ্চ রাসমঞ্চ ও অন্যদিকে আটকোণা ও নয় চূড়া বৃহৎ দোলমঞ্চ (বড়মাপের কিন্তু অতিজীর্ণ টেরাকোটা-সজ্জিত)। (ঙ) ১৮ শতকের শেষ দিক। (চ) মেদিনীপুর শহর থেকে বাসে এসে কিসমৎ নাড়াজোল স্টপেজে নেমে ডান দিকে গ্রামে ঢোকা পথে এগিয়ে অল্প হাঁটা।

৪৭. (ক) **গড়বাড়ি,** ভগবানপুর, পূর্ব মেদিনীপুর। (খ) রঘুনাথ। (গ) রায় পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০/৩৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। (ঙ) ঐ। (চ) মেছেদা (হাওড়া খড়গপুর লাইন) ষ্টেশান-সংলগ্ন বাস-স্ট্যান্ড থেকে এগরার বাসে কাজলাগড়, এর লাগোয়া।

৪৮। (ক) **তালবন্দি,** গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) রাধা-দামোদর। (গ) দে পরিবার। (ঘ) আনু. ২৩/২৪ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও টেরাকোটা অলংকৃত। (ঙ) ঐ। (চ) আপাত দুর্গম গ্রাম। গড়বেতা থেকে হুমগড়গামী বাসে ফতেসিংপুর— এখান থেকে তিন কি.মি. হেঁটে

বগড়ী কৃষ্ণনগর (কৃষ্ণরায় ও নদীর ওপারের রঘুনাথবাড়ি দর্শন), এখান থেকে আবার অন্তত ৬/৭ কি.মি. হাঁটা।

৪৯. (ক) **রাজবল্লভ,** পিংলা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) ভুবনেশ্বরী। (গ) পালিত পরিবার। (ঘ) আংশিক ভগ্ন ও টেরাকোটা বিনষ্ট। (ঙ) ঐ। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বালিচক ষ্টেশান থেকে ময়না যাচ্ছে এমন বাসে ডাঙ্গরা— এর লাগোয়া।

৫০. (ক) **রাণীর বাজার,** ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শীতলা। (গ) অতি জীর্ণ ও ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। (ঘ) ঐ। (ঙ) ঘাটাল-চন্দ্রকোণা বাসে বরদা (তিন কি.মি.)—তার লাগোয়া। ঘাটালের নতুন বাস-স্ট্যান্ড বা শিলাবতী লজের সামনে হ'তে সরাসরি রিক্সায় যাওয়া চলে।

৫১. (ক) **সিংপুর,** সবং, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শ্রীধর। (গ) দে পরিবার। (ঘ) আনু. ২৬/২৭ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। সংস্কারে টেরাকোটা লুপ্ত। (ঙ) ঐ। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বালিচক থেকে দেহাটিগামী বাসে বাদলপুর হ'য়ে আন্দাজ ২/২½ কি.মি.।

৫২. (ক) **সৌলান,** দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শ্যামসুন্দর। (গ) অধিকারী পরিবার। (ঘ) আনু. ২৬/২৭ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট। উৎকৃষ্ট হ'লেও দেওয়ালগাত্রের টেরাকোটা ও দরজার পাল্লার কাঠের কাজ অতি ক্ষয়িত। অত্যন্ত সদাশয় গৃহস্থবাড়ির মধ্যে বাসঘরের সামনেই মন্দিরটি। প্রাচীরঘেরা গৃহাঙ্গন। (ঙ) ঐ। (চ) পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে গৌরা—এখান থেকে বাঁয়ে ভ্যান রিক্সায় সরাসরি যাওয়া সুবিধাজনক।

৫৩. (ক) **গোবর্ধনপুর,** পিংলা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) রত্নেশ্বর শিব। (গ) বসু পরিবার। (ঘ) ২৬/২৭ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। উপরে ও প্রবেশপথের দুদিকে এক সারি ক'রে টেরাকোটা। (ঙ) ঐ। (চ) খড়্গপুর শাখার হাউর স্টেশানে নেমে ভ্যান-রিক্সায় (আন্দাজ ৬/৭ কি.মি.)।

৫৪. (ক) **গড় পঞ্চকোট,** (ধারা পঞ্চায়েৎ ক্ষেত্র), নিতুড়িয়া, পুরুলিয়া। (খ) পরিত্যক্ত মন্দির। (গ) পঞ্চকোট রাজপরিবার। (ঘ) ৩৫/৪০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। ত্রিখিলান। নিরলংকার। অনেকটা বিষ্ণুপুরী ধাঁচে মূল রত্নের উচ্চতা সম্মুখভাগের প্রস্থের মাপের চেয়ে বেশী, তবে তার অবস্থান অনেকটা এগিয়ে। কেন্দ্রীয় বা মূল চূড়াটি অন্য চারটি চূড়ার তুলনায় অতি বিপুল বৃহৎ ও রেখ দেউলের মত। অন্য চারটি চূড়াও ছোট রেখ দেউলের মত। পাহাড়ের নিচে, অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে। (ঙ) ১৮ শতক। (চ) আসানসোল বা বরাকর থেকে বাসে সহজেই ডিসেরগড়। এখান থেকে নবনির্মিত সেতুর উপর দিয়ে নদী পার হ'য়ে পারবেলিয়া, এখান থেকে বাসে গড় পঞ্চকোট স্টপেজ বা পরের স্টপেজ গোবাগে নামা।

৫৫. (ক) **গোপীমোহনপুর,** পাঁশকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) রাধাবল্লভ। (গ) আনু. ৩০/৩২ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। সংস্কারে সামান্য টেরাকোটা অবশিষ্ট। (ঘ) ঐ। (ঙ) পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে কেশাপাট—এখান থেকে সরাসরি ভ্যান রিক্সায় (আন্দাজ ৪/৪½ কি.মি.)।

৫৬. (ক) **সুরুল,** বোলপুর, বীরভূম। (খ) লক্ষ্মী-জনার্দন। (গ) সরকার পরিবার (ঘ) আনু. ২৫/৩০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও টেরাকোটা-সজ্জিত। (ঙ) ঐ। (চ) বোলপুর-শান্তিনিকেতন বা তার আগে ভুবনডাঙা থেকে রিক্সায়।

প্রাসঙ্গিকী

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনের 'ট্রাস্টডীড' করেন ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে. শান্তিনিকেতনের প্রায় সংলগ্ন সুরুল গ্রামের পত্তন তার এক/দেড়শো বছর আগেই হ'য়েছে এমন মনে করার যুক্তি আছে। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মন্-লি-সিনর (Mon-Le-Seigneur) নামে একজন ফরাসী বণিক সুরুল গ্রামে আসেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে জন চীপ আসেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 'কমার্সিয়াল রেসিডেন্ট' বা বানিজ্য প্রতিনিধি হ'য়ে। শোনা যায় যে এঁরা দুজনে বোলপুরের অদূরবর্তী সুপুর গ্রামের বাসিন্দা ও সেকালে প্রভূত খ্যাতিমান আনন্দচাঁদ গোস্বামীর কাছ থেকে কিছু জমি নিয়ে একটি কুঠী স্থাপন করেন। ক্রমে জন চীপই কুঠীটির মালিক হন এবং এটি "চীপ সাহেবের কুঠী" ব'লে পরিচিত হয়। চীপ সাহেব কোম্পানীর ব্যবসা ছাড়াও নিজেও নানা উদ্যোগ নেন—যেমন, তিনিই সম্ভবত সুরুলে নীলচাষ প্রবর্তন করেন এবং তাঁর কুঠীতে স্থানীয় কারিগরদের দিয়ে নানান জিনিয উৎপাদন করিয়ে বিক্রয় করতেন। তাঁর ব্যবসার প্রয়োজনের সম্ভবত তিনি এখানে রাস্তাঘাটেরও উন্নতি ঘটান। সুরুলের কারিগর-শ্রেণী কাজ পেয়ে কৃতজ্ঞ হ'য়ে চীপ সাহেবকে সম্ভ্রমের চোখে দেখতেন আর জমিদার সরকার পরিবার ও অন্যান্য স্বচ্ছল ভদ্রলোকগণ চীপ সাহেবের সঙ্গে কারবার ক'বে বা তাঁর মুৎসুদ্দির কাজ ক'রে মোটা টাকা ক'রতে পেরে তাঁকে সবিশেষ রেয়াত ক'রতেন। মন্দির-ভাস্কর্যে সাহেব-মেমের নানা টেরাকোটা ফলকেও ইংরেজদেব এই প্রভাবের যথেষ্ট ছাপ আছে সুপুব, ইলামবাজার, ঘুরিষা, হেতমপুর ও সুরুলের মত বীরভূমের বিভিন্ন গ্রামে।

৫৭. (ক) **শোঙালুক,** পুরশুড়া, হুগলী। (খ) গোপীনাথ (পুরাতন ও পরিত্যক্ত মন্দির)। (গ) গোস্বামী পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০/৩২ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। খাঁজকাটা রেখ দেউল-সদৃশ চূড়া বা রত্ন। সম্মুখভাগ টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। (ঙ) ঐ। (চ) তারকেশ্বর-অমরপুর ট্রেকারে বা খুশীগঞ্জ বাসে শোঙালুক চৌমাথা স্টপ।

৫৮. (ক) **সাদিপুর,** জামালপুর,বর্ধমান। (খ) রাধা-গোবিন্দ (গ)মিত্র পারিবার (ঘ) আনু.৩০/৩৫ ফুট উচ্চ। রেখ দেউল- সদৃশ চূড়া টেরাকোটার ফুল- লতা- পাতার নকাশী কাজ। (ঙ) ঐ। (চ) হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের মশাগ্রাম থেকে ট্রেকারে সাদিপুর-খেয়াঘাটে এসে দামোদর পার হ'লেই সাদিপুর।

৫৯. (ক) **খটনগর,** আউসগ্রাম, বর্ধমান। (খ) লক্ষ্মী নারায়ণ। (গ) মূলচাঁদ রায়। (ঘ) ঐ। (চ) বোলপুর বা ভেদিয়া থেকে বাসে।

৬০. (ক) **বেগুত,** মেমারী, বর্ধমান। (খ) চণ্ডী। (ঘ) একদুয়ারী। ঐ। (চ) মেমারী থেকে বাসে।

৬১. (ক) **বাঁকুড়া,** (পাঠকপাড়া), বাঁকুড়া। (খ) রাধা-বল্লভ। (গ) পাঠক পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০/৩৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। টেরাকোটা-মন্ডিত। (ঙ) ঐ। (চ) বাঁকুড়া শহরের গোবিন্দনগর বাসস্ট্যান্ড থেকে সরাসরি রিক্সায়।

৬২. (ক) **কোতুলপুর,** (পূবপাড়া) বাঁকুড়া। (খ) বিষ্ণু (শালগ্রাম)। (গ) বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০/৩২ ফুট। জীর্ণ কিন্তু সুন্দর কিছু টেরাকোটা অবশিষ্ট। (ঙ) ১৯ শতকের প্রথম দিক। (চ) আরামবাগ, জয়রামবাটি বা বিষ্ণুপুর বাসে কোতুলপুর মোড় স্টপেজে নেমে রিক্সায়।

৬৩. (ক) **আমড়াকুচি,** কেশপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) কামেশ্বর শিব (ঘ) আনু. ২৫/২৬ ফুট উচ্চতার। কেন্দ্রীয় বা মূল চূড়াটি রেখ দেউলের মত। (ঙ) ঐ। (চ) মেদিনীপুর শহর থেকে কেশপুরের বাসে সরাসরি।

৬৪. (ক) **গোপীকান্তবাড়,** পিংলা, পশ্চিম মেদিনপুর। (খ) শিব। (গ) পাল পরিবার। (ঘ) আনু. উচ্চতা ৩০ ফুট। একদুয়ারী। টেরাকোটার নকাশি অলংকরণ। (ঙ) ঐ। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বালিচক থেকে বাসে/ট্রেকারে পিংলা, তার লাগোয়া।

৬৫. (ক) **বড়িশা,** (পশ্চিমপাড়া), পিংলা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) রাধাবিনোদ। (গ) গোস্বামী পরিবাব। (ঘ) আনু. ২৫/২৬ ফুট উচ্চ। বড় মাপের টেরাকোটা (জীর্ণ)। (ঙ) ঐ। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনেব বালিচক স্টেশান থেকে ময়নাগামী বাসে জলচক, এখান থেকে ভ্যানরিক্সায়।

৬৬. (ক) **বেঙ্দা,** (উত্তরপাড়া), নারায়ণগড়, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) রঘুনাথ। (গ) ঘোষ পরিবার। (ঘ) আনু. ২৬/২৭ ফুট উচ্চ। কেন্দ্রীয় চূড়ায় কৃষ্ণ-বলরামের টেরাকোটা ফলক। মন্দিরগাত্রে পঙ্খের কাজ ও গর্ভগৃহের দরজার কাঠে দশাবতার-এর খোদাই কাজ। (ঙ) ঐ। (চ) খড়গপুর থেকে বাসে বেলদা গিয়ে ভ্যান রিক্সায় (৫/৫½ কি.মি.)।

৬৭ (ক) **মধ্যবাড়,** পিংলা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) লক্ষ্মী জনার্দন। (গ) কুইল্যা পরিবার। (ঘ) আনু. ২০/২২ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন এবং টেরাকোটা-মন্ডিত। (ঙ) ঐ। (চ) পূর্বোক্ত বালিচক ষ্টেশান থেকে দেহাটি-গামী বাসে জামুয়া-—এর লাগোয়া।

৬৮. (ক) **রামজীবনপুর,** (নতুনহাট, বুড়ো শিবতলা) চন্দ্রকোণা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) শিব। শীল পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও টেরাকোটা-মন্ডিত দরজার পাল্লাতেও কাঠের খোদাই কাজ। এক দুয়ারী। (ঘ) ঐ। (ঙ) ক্ষীরপাই থেকে বাসে।

৬৯.(ক) **ঐ (গোকুলবাজার)।** (খ) শিব। (গ) পাল পরিবার। (ঘ) ইত্যাদি, পূর্ববৎ।

৭০. (ক) **বেলুন,** পিংলা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) শ্যামসুন্দর (পরিত্যক্ত)। (গ) ঘোষ পরিবার। (ঘ) আনু. ২৫/২৬ ফুট। নিরলংকার। (ঙ) ঐ। (চ) পূর্বোক্ত বালিচক তেকে বাসে/ট্রেকারে পিংলা-এর লাগোয়া।

৭১. (ক) ঐ। (খ) লক্ষ্মী-জনার্দন। (পরিত্যক্ত)। (গ) ঐ। (ঘ) অত্যন্ত জীর্ণ। ভগ্ন। (ঙ) ঐ। (চ) ঐ।

৭২. (ক) **বাসুদেবপুর** দাসপুর। (খ) দামোদর। (গ) ভট্টাচার্য পরিবার। (ঘ) টেরাকোটা লুপ্ত। (ঙ) ১৮০১। (চ) পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে।

৭৩. (ক) **ময়না,** ময়নাগড়, পূর্ব-মেদিনীপুর। (খ) শ্যামসুন্দর। (গ) বাহুবলীন্দ্র পরিবার। (ঘ) আনু. ২০/২৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন, নিরলংকার। তুলনায় শীর্ণ আকৃতির পাঁচটি চূড়া বা

রত্ন। পরিখার ধারে প্রাচীরঘেরা মন্দিরক্ষেত্র। মন্দির একদুয়ারী। (ঙ) ঐ। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বালিচক ষ্টেশান-সংলগ্ন বাসস্টান্ড থেকে ময়নাগামী বাসে সরাসরি। ভ্যানরিক্সায় ময়নার গড়ের পরিখার পাড়ে এসে নৌকায় পরিখা পেরিয়ে ওপারে উঠে বাঁদিকে চলা পথে সামান্য গেলে পরিখার পারেই দৃষ্ট হবে।

প্রাসঙ্গিকী

"ঘনরামের ধর্মমঙ্গল পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, ময়নানগর রাঢ়ভূমির দক্ষিণে এবং সমুদ্রের একেবারে তীরবর্তী। ঘনরাম চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, 'ময়নানগর বাটি সাগর সমীপ'। ইহা হইতেই মনে হয়, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক মহকুমার দক্ষিণভাগে ময়নানগর অবস্থিত ছিল। তমলুক মহকুমায় ময়না নামক একটি স্থান এখনও আছে। সে সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে।—

'Mayna— A village in the Tamluk Sub-division, situated nine miles south-west of Tamluk. It contains a Police Outpost and an old fort, called Maynagarh, situated on the western bank of the Kasai, a little above its junction with the Kiliaghai. The fort was evidently constructed by excavating two great moats, almost lakes, so that it practically stands on an island within an island. The earth of the first was thrown inwards, so as to form a raised embankment of considerable breadth, which, having become overgrown with dense bamboo clumps, was impervious to any projectile that could have been brought against it 100 years ago. Inside the larger island, the outer edge of which is this embankment, another lake has been excavated with the earth thrown imwards, forming a large and well-raised island about 200 yards square. On this stands the residence of the Mayna raj

According to the family records, the fort was originally constructed by one semi-mythical hero of Midnapur, Raja Lausen, in the days when the district was under the dominion of the kings of Gaur. At the time of the Maratha ascendancy, the descendant of Lausen was ousted, owing to default of payment of usual tribute, and the possession of Mayna was made over to Bahubalendra (বাহুবলেন্দ্র), the founder of the Mayna raj." (*L. S. S. O' Malley Bengal District Gazetters, Midnapur, Calcutta 1911, pp 207-208* —ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস', অষ্টম সংস্করণ, দশম পুনর্মূদ্রণ, ২০০২, পৃষ্ঠা ৭১৩-৭১৪)।

৭৪. (ক) **ডিএরাপুর,** ডেবরা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) রঘুনাথ। (গ) চক্রবর্তী পরিবার। (ঘ) আনু. ২৩/২৪ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন মনোরম টেরাকোটা-সজ্জিত। (ঙ) ১৮০৪। (চ) পাঁশকুড়া বা ডেবরা থেকে মেদিনীপুরগামী বাসে যাত্রা ক'রে অর্জুনি স্টপেজে নেমে ভ্যানরিক্সায়।

৭৫. (ক) **লোয়াদা,** ডেবরা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) রঘুনাথ (গ) আনু. ২৬/২৭ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। উৎকৃষ্ট টেরাকোটা-সজ্জিত। (ঘ) ১৮০৫। (ঙ) পাঁশকুড়া থেকে সরাসরি বাসে লোয়াদা— এখানকার হাই স্কুলের অদূরে।

৭৬. (ক) **হৃদলনারায়ণপুর,** (বড় তরফ), পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া। (খ) রাধা-দামোদর। (গ) মণ্ডল পরিবার। (ঘ) আনু. ২৫/৩০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। টেরাকোটা অল্প কিন্তু কিছুটা ব্যতিক্রমী—মন্দিরের সামনে শিবের দুটি মাঝারি মাপের রেখ মন্দির। চত্বরের শুরুতে সুউচ্চ ও অতি দর্শনীয় ২৫ চূড়া রাসমঞ্চ, পিতলের রথ ও প্রকাণ্ড দুর্গাদালান। (ঙ) ১৮০৬। (চ) বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে সরাসরি বাসে হৃদলনারায়ণপুর— সরাসরি বাস সংখ্যায় কম হওয়ায় না পেলে, সোনামুখীগামী বাসে যাত্রা ক'রে ধাগরিয়া স্টপেজে নেমে ভ্যান-রিক্সায়।

৭৭. (ক) **মামুদপুর,** (শ্যামবাজার পঞ্চায়েত ক্ষেত্র), গোঘাট, হুগলী। (খ) বিষ্ণু। (গ) রায় পরিবার। (ঘ) খাঁজকাটা রেখ দেউল-সদৃশ চূড়া। সম্মুখভাগ টেরাকোটা-মণ্ডিত। (ঙ) ১৮০৬। (চ) কামারপুকুর থেকে বাসে বা ভ্যানরিক্সায়।

৭৮. (ক) **লক্ষ্মীপুর,** চন্দ্রকোণা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) দয়ানাথ শিব। (গ) চৌধুরী পরিবার। (ঘ) আনু. ২৬/২৭ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। টেরাকোটা-মণ্ডিত। (ঙ) ১৮০৭। (চ) ক্ষীরপাই থেকে রামজীবনপুরগামী বাসে শ্রীনগর— এখান থেকে ভ্যান রিক্সায়।

৭৯. (ক) **গৌরহাটি,** আরামবাগ, হুগলী। (খ) দামোদর। (গ) গুহ পরিবার। (ঘ) সামান্য টেরাকোটা। (ঙ) ১৮০৮। (চ) আরামবাগ থেকে বাসে।

৮০. (ক) **সুলতানপুর,** (মন্ডলপাড়া), ঘাটাল, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) লক্ষ্মী-জনার্দন। (গ) মন্ডল পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০/৩৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও টেরাকোটা-মন্ডিত। (ঙ) ১৮০৮। (চ) ঘাটাল থেকে খড়ার হ'য়ে সুলতানপুর বাসে।

৮১. (ক) **রামজীবনপুর,** (নতুন হাট), চন্দ্রকোণা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) পরিত্যক্ত মন্দির। (গ) আনু. ২৫/২৬ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও টেরাকোটা-মন্ডিত। (ঘ) ১৮০৮। (ঙ) ক্ষীরপাই-রামজীবনপুর বাসে।

৮২. (ক) **তিলন্তপাড়া,** সবং, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) জানকী-বল্লভ। (গ) মাইতি পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট। পূব, পশ্চিম ও দক্ষিণ (বা সামনের) দেওয়ালে টেরাকোটার সুবিপুল সমারোহ—পিছনের (বা উত্তরের) সমগ্র দেওয়াল-গাত্রে বিপুল পরিমাণ পঙ্খের কাজ। বিষয় প্রথাগত। সামনের নাটদালান পরে সংযোজিত। এর পাশে অঙ্গনের ধারে পঙ্খের একটি হাতির উপর তুলসী মঞ্চ। (ঙ) ১৮১০। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বালিচক ষ্টেশান থেকে ময়নাগামী বাসে জলচক— এখান থেকে ভ্যানরিক্সায়।

৮৩. (ক) **কলমীজোড়,** দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) শীতলা (গ) আনু. ২৫/৩০ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন। সামান্য টেরাকোটা অবশিষ্ট। (ঘ) ১৮১০। (ঙ) পাঁশকুড়া থেকে ঘাটালগামী বাসে বেলতলা—এখান থেকে ভ্যানরিক্সায়, সহজেই, স্থানীয় পলশপাই খালের পূব পারে মন্দিরটির অবস্থান।

৮৪. (ক) **কোটালপুর,** দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) শ্রীধর। (গ) ভূঁইয়া পরিবাব। (ঘ) আনু. ৩০/৩২ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। উপরে ও দুপাশে একসারি ক'রে টেরাকোটা। অঙ্গনে (ছোট মাঠের মত) প্রবেশের মুখে ডানপাশে নয়চূড়া ও টেরাকোটা-মন্ডিত রাসমঞ্চ। (ঙ) ১৮১৩। (চ) পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে বেলিয়াঘাটা— এখান থেকে রিক্সায়, সরাসরি।

৮৫. (ক) **শ্যামসুন্দরপুর-পাটনা,** পাঁশকুড়া, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) রঘুনাথ। (গ) পাহাড়ী পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০/৩৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। টেরাকোটা-মন্ডিত। দরজার কাঠের পাল্লাতেও খোদাই-কাজ। (ঙ) ১৮১৩। (চ) পাঁশকুড়া থেকে ট্রেকারে।

৮৬. (ক) **উদয়পুর,** খানাকুল, হুগলী। (খ) রঘুনাথ। (গ) দামোদর শেঠ। (ঘ) আনু. ২৪/২৫ ফুট উচ্চতা। একদুয়ারী। প্রবেশদ্বারের দুপাশে টেরাকোটা দ্বারী ভিন্ন নিরলংকার। (ঙ) ১৮১৬ (চ) আরামবাগ থেকে 'গড়ের হাট'-গামী বাসে খানাকুল— এখান থেকে সরাসরি রিক্সায়।

৮৭. (ক) **ক্ষীরপাই,** (মালপাড়া), চন্দ্রকোণা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) রাধা-দামোদর (পরিত্যক্ত)। (ঘ) ২৬/২৭ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট। অত্যন্ত আকর্ষনীয় টেরাকোটা সজ্জিত। তবে মন্দিরটি জীর্ণ-দশা গ্রস্থ। (ঙ) ১৮১৭। (চ) ঘাটাল বা চন্দ্রকোণা থেকে বাসে ক্ষীরপাই— বাস থেকে নেমে ভ্যানরিক্সায়। একটি পুকুরের পাড়ে মন্দিরটির চত্বরে একটি দরিদ্র পরিবার বাস ক'রছেন।

৮৮. (ক) **তিলদাগঞ্জ,** পিংলা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) দামোদর। (গ) ভট্টাচার্য পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০/৩২ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন ও টেরাকোটা-মন্ডিত (প্রবেশদ্বারের উপর ও দুপাশে দুই সারি ক'রে)। (ঙ) ১৮১৭। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বালিচক স্টেশান-সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে ময়নাগামী বাসে জলচক— এখান থেকে ভ্যান রিক্সায় সরাসরি।

৮৯। (ক) **আমেদপুর,** ডেবরা, পশ্চিম- মেদিনীপুর। (খ) রঘুনাথ (গ) ভট্টাচার্য পরিবার। (ঘ) আনু. ২০/২২ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন এবং কিছু টেরাকোটা-বিশিষ্ট। (ঙ) ১৮১৯। (চ) পূর্বোক্ত বালিচক স্টেশান থেকে মেদিনীপুর শহরগামী বাসে বসন্তপুর— এখান থেকে ভ্যান-রিক্সায় সরাসরি (৬/৭ কি.মি.)।

৯০. (ক) **পাঁচখুরি,** মেদিনীপুর সদর, পশ্চিম- মেদিনীপুর। (খ) শীতলানন্দ শিব। (গ) মহাপাত্র পরিবার। (ঘ) আনু. ২৫/৩০ ফুট উচ্চতা ও কিছু টেরাকোটা-সম্পন্ন। (ঙ) ১৮২১। (চ) মেদিনীপুর শহর থেকে কেশপুরের বাসে সরাসরি পাঁচখুরি।

৯১. (ক) **কাঁটাবনি,** পাঁশকুড়া, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) লক্ষ্মী-জনার্দন (পরিত্যক্ত) (গ) জানা পরিবার। (ঘ) ২০/২২ ফুট উচ্চতা। উৎকৃষ্ট টেরাকোটা-সমৃদ্ধ— দরজার পাল্লাতে ও চমৎকার কাঠের কাজ। (ঙ) ১৮২১। (চ) পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে মেছগ্রাম—এখান থেকে ভ্যান-রিক্সায় কালিশ্বর গ্রামের মন্দির ক'টি পথে দেখে (৪ কি.মি.)।

৯২. (ক) **রঘুনাথপুর,** দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) কিশোরমোহন। (গ) গোস্বামী পরিবার। (ঘ) ২৫/২৬ উচ্চতা ও টেরাকোটা-সম্পন্ন। (ঙ) ১৮২২। (চ) পাঁশকুড়া স্টেশান-সংলগ্ন স্ট্যান্ড থেকে ট্রেকারে পূর্বকথিত গোবিন্দনগর— সেখান থেকে হেঁটে বা ভ্যান রিক্সায়।

৯৩. (ক) **গৌরা,** (উত্তরপাড়া), দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) লক্ষ্মী-জনার্দন। (গ) হাঁড়া পরিবার। (ঘ) ২৫/২৬ উচ্চতা এবং টেরাকোটা-সম্পন্ন। (ঙ) ১৮২৪। (চ) পাঁশকুড়া থেকে ঘাটালের বাসে সরাসরি গৌরা।

৯৪. (ক) **দলপতিপুর,** (মিদ্যাপাড়া), ঘাটাল, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) বিষ্ণু। (গ) মিদ্যা-পরিবার। (ঘ) আনু. ২৬/২৭ ফুট উচ্চতা ও টেরাকোটা-সম্পন্ন। দরজার পাল্লাতেও কাঠের কাজ। (ঙ) ১৮২৫। (চ) পাঁশকুড়া-ইড়পালা বাসে দন্দীপুরে গিয়ে ভ্যানরিক্সায় সরাসরি।

৯৫. (ক) **উদয়গঞ্জ,** (কৃষ্ণপুর), ঘাটাল, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) সিংহ-বাহিনী। (গ) হাজরা পরিবার। (ঘ) আনু. ২৪/২৫ ফুট উচ্চতা এবং নামমাত্র টেরাকোটা-সম্পন্ন। (ঙ) ১৮২৭। পাঁশকুড়া বা ঘাটাল থেকে বাসে খড়ার-এ গিয়ে রিক্সায়।

৯৬. (ক) **ওরগ্রাম,** (সুরক্ষণপাড়া), ভাতাড়, বর্ধমান। (খ) শিব। (গ) কর পরিবার। (ঘ) সাধারণ। নিরলংকার। (ঙ) ১৮৩০ (পাবিবারিক সূত্র)। (চ) গুসকরা থেকে .বাস/রিক্সা।

৯৭. (ক) **মাকালপুর,** পোলবা, হুগলী। (খ) শিব। (গ) চিত্র সিংহ। (ঘ) ১৮৩১। (ঙ) , (চ) হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের বেলমুড়ি স্টেশন থেকে রিক্সায়।

৯৮. (ক) **উত্তর ধানখাল,** দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) লক্ষ্মী জনার্দন (গ) ভূঁইয়া পরিবার। (ঘ) ২২ ফুট উচ্চতা এবং পঙ্খের নকাশী কাজ সম্পন্ন। দরজার পাল্লাতেও কাঠের খোদাই কাজ। (ঙ) ১৮৩২। (চ) পাঁশকুড়া-ঘাটালা বাসপথের গঙ্গামাড়ো থেকে ভ্যান-রিক্সায় ৬/৭ কি.মি.।

৯৯. (ক) **বনকাটি,** (বনকাটি-অযোধ্যা), কাঁকসা, বর্ধমান। (খ) শিব। (গ) মুখোপাধ্যায় পরিবার। (ঘ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও মনোরম টেরাকোটা-সজ্জিত। পাশেই একটি উঁচু ঘরে রক্ষিত অপূর্ব কারুকাজ খচিত পিতলের রথটি অতীব-দর্শনীয়। (ঙ) ১৮৩২ (ম্যাকাচিয়ন, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৮)। (চ) বোলপুর বা ইলামবাজার থেকে পানাগড়-গামী বাসে অজয় পেরিয়ে বসুধার পর এগারো মাইল স্টপেজে নেমে বাসরাস্তা হ'তেই যে রাস্তাটি সোজা ইছাই ঘোষের দেউলের দিকে গেছে সেই রাস্তায় রিক্সায় বা হেঁটে— অযোধ্যা গ্রামের দেউলগুচ্ছ অতিক্রম ক'রে— রাস্তার একেবারে ডানেই।

প্রাসঙ্গিকী

মন্দিরগাত্রে এলোকেশী-সম্বাদ ঃ আকর্ষণীয় বিষয় হ'ল রাস্তা থেকে মন্দিরটির দিকে গেলে মন্দিরের যে পার্শ্বগাত্রটি মুখোমুখি পড়ে, সেই দেওয়ালেই তারকেশ্বরের কুখ্যাত মোহন্ত মাধবগিরি ও গৃহবধূ এলোকেশী কান্ডের এলোকেশীকে তার স্বামী নবীন-কর্তৃক বঁটিব কোপ মেরে হত্যা করার দৃশ্যের একটি অতি বিরল টেরাকোটা-ফলক আছে। এলোকেশীকে হত্যা করা হয় ২৭শে মে, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে— সুতরাং ফলকটি তার পরে সন্নিবিষ্ট হ'য়েছে। মন্দিরটি নির্মিত হ'য়েছে এর বেশ আগে।

১৮৭৩-এর জুন-জুলাই থেকে ১৮৭৫-৭৬ পর্যন্ত বঙ্গীয় সমাজে মোহন্ত-এলোকেশী কাণ্ড তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি ক'রেছিল এটি এখন সবার জানা, বনকাটির মন্দির-টেরাকোটায় এর

উপস্থিতি তাই তেমন বিস্ময়কর কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনা নিয়ে অনেক লেখা হ'য়েছিল, অনেক গান বাঁধা হয়েছিল এবং অজস্র 'কালিঘাটের পট' আঁকা ও বিক্রয় হ'য়েছিল— এমন অনুপম কিছু পট দেশবিদেশের সংগ্রহালয়ে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত আছে। অন্যদিকে লক্ষ্মীনারায়ণ দাস নামে এক অখ্যাত নাট্যকারের 'মোহান্তের এই কি কাজ!!' নামে নাটকটি এত বিপুল ব্যবসায়িক সাফল্য পেয়েছিল যে সে সময় (১৮৭৩) মন্দার কবলে পড়া বাংলা পেশাদারী মঞ্চ প্রাণ ফিরে পেয়েছিল। এ বিষয়ের গানগুলিও হ'য়েছিল অসম্ভব জনপ্রিয়। মূল ঘটনাটি হ'ল, তারকেশ্বরের দ্বাদশতম মোহন্ত মাধবচন্দ্র গিরি কর্তৃক এলোকেশী নামে যুবতী গৃহবধূকে প্রলুব্ধ ক'রে লালসার শিকার করা, এই কাজে মাধবের সহায়তা করে এলোকেশীর সৎমা। এলোকেশীর স্বামী নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার কর্মস্থল থেকে ফিরে এ কথা জানতে পেরে ক্রোধান্ধ হ'য়ে বঁটির কোপে স্ত্রীকে হত্যা করেন। বিচারে নবীনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও পরস্ত্রীগমনের অপরাধে মাধব গিরির তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও দুই হাজার টাকা জরিমানা হয়।

যাই হোক, মাধবগিরি তারকেশ্বরের কুখ্যাত মোহান্তদের মধ্যে প্রথম কীর্তিমান নয়— তার কীর্তির ৪৯ বছর আগে লাম্পট্য-ঘটিত খুনের অপরাধে একজন মোহান্তের ফাঁসী হ'য়েছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা", প্রথম খণ্ড (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৭৭, চতুর্থ মুদ্রণ, পৃষ্ঠা ২৮২) থেকে দুটি সংবাদ-মাণিক্য উদ্ধার ক'রছি :

২৭ মার্চ ১৮২৪। ১৬ চৈত্র ১২৩০

তারকেশ্বরের মহন্তের পুণ্য প্রকাশ।— শুনা গেল যে তারকেশ্বনিবাসি শ্রীমর্ন্তগিরি সন্ন্যাসী স্বীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম সংস্থাপনার্থ এক বেশ্যা রাখিয়াছিল তাহাতে জগন্নাথপুরনিবাসি রামসুন্দর নামক এক ব্যক্তি গোপের ব্রাহ্মণ ঐ বেশ্যার সহিত কি প্রকারে আসক্তি করিয়া ছদ্মভাবে গমনাগমন করিত। পরে সন্ন্যাসী তাহা জানিতে পারিয়া ১ চৈত্র শনিবার রাত্রিযোগে সন্ধানপূর্ব্বক হঠাৎ যাইয়া বেশ্যাকে কহিল যে একটু পাণীয় জল আন আমার বড় পিপাসা হইয়াছে তাহাতে বেশ্যা জল আনিতে গেলে সন্ন্যাসী সময় পাইয়া ঐ ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলের উপর উঠিয়া তাহার উদরে এমত এক ছোরার আঘাত করিল যে তাঁহাতে তাহার মঙ্গলবারে প্রাণ বিয়োগ হইল পরে তথাকার দারোগা এই সমাচার শুনিয়া ঐ সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এইমাত্র শুনা গিয়াছে।

১১ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ২৮ ভাদ্র ১২৩১

ফাঁসী।— পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছিল যে তারকেশ্বরের মন্তরাম গিরি এক বেশ্যার উপপতিকে খুন করিয়া ধরা পড়িয়াছিলেন তাহাতে জিলা হুগলির বিচারকর্ত্তারা তাহাকে বিচারস্থলে আনাইয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করাতে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তিনবার অস্বীকার করিলেন কিন্তু ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিপ্রযুক্ত চতুর্থবারে স্বীকার করাতে শ্রীযুক্তেরা বহুতর আক্ষেপপূর্ব্বক ফাঁসী হুকুম দিলেন তাহাতে ১৩ ভাদ্র তারিখে রীত্যনুসারে তাহার ফাঁসী হইয়া কর্ম্মোপযুক্ত ফলপ্রাপ্তি হইয়াছে।

১০০। (ক) **কোতুলপুর,** ভদ্রপাড়া, বাঁকুড়া। (খ) শ্রীধর (শালগ্রাম)। (গ) ভদ্র পরিবার। (ঘ) আনু. ২৫/২৬ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও টেরাকোটা-সজ্জিত। বসত বাড়ি এলাকার মধ্যে ঘেরা মন্দিরক্ষেত্র, সামনে ছোট বর্গাকার অঙ্গন। বাইরে গিরিগোবর্ধন রীতির মন্দির ও রাস্তার বিপরীতে রাসমঞ্চ! রাস্তার উপর নহবৎখানা ও তার সামনে রাস্তার দুপাশে শিখর দেউল। (ঙ) ১৮৩৩। (চ) আরামবাগ বা জয়রামবাটি থেকে বাসে গিয়ে কোতল-পুর ভদ্রপাড়া স্টপেজে নেমে অল্প হেঁটে।

১০১। (ক) **জিবটা,** কোতুলপুর, বাঁকুড়া। (খ) দামোদর। (গ) রায় পরিবার। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চ। সামনের দেওয়ালে টেরাকোটা। (ঙ) ১৮৩৩। (চ) জয়রামবাটি থেকে রিক্সায়—কামারপুকুরের দিকে খানিক গিয়ে ডানের রাস্তা ধরে একটি আধুনিক আশ্রম ছেড়ে একটি আটচালার পর রায়দের বসতবাড়ির ডানে।

১০২। (ক) **কলকাতা, ৭৮, টালিগঞ্জ রোড।** (খ) শিব। (গ) উদয়-নারায়ণ মণ্ডল। (ঘ) ১৮৩৪।

১০৩। (ক) **বীরনগর,** (উত্তরপাড়া), রাণাঘাট, নদীয়া। (খ) শিব। (গ) গঙ্গোপাধ্যায় পরিবার। (ঘ) প্রবেশদ্বারের উপর গণেশ। (ঙ) ১৮৩৬। (চ) শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর লাইনের বীরনগর স্টেশন থেকে রিক্সায়।

১০৪. (ক) **ইয়াকুবপুর,** (পশ্চিমপাড়া), ঘাটাল, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) শ্রীধর। (গ) গড়ুই পরিবার। (ঘ) আনু. ২৫/২৬ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। সামান্য টেরাকোটা। (ঙ) ১৮৩৯। (চ) ঘাটাল থেকে কুঠীঘাট (ভায়া, রাধানগর)-গামী বাসে, সরাসরি ইয়াকুবপুর।

১০৫। (ক) **রামজীবনপুর,** (পুরাতন হাট) চন্দ্রকোণা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) দামোদর। (গ) প্রামাণিক পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট। নিরলংকার। (ঙ) ১৮৪০। (চ) ক্ষীরপাই থেকে বাসে।

১০৬। (ক) **লক্ষ্মীপুর,** গোঘাট, হুগলী। (খ) পরিত্যক্ত মন্দির। (গ) অধিকারী পরিবার। (ঘ) আনু. ২৫/২৬ ফুট উচ্চতার। টেরাকোটা-সম্পন্ন। সমগাত্র রেখ চূড়া। (ঙ) ১৮৪০। (চ) আরামবাগ থেকে রিক্সায় (আন্দাজ চার কি.মি.)।

১০৭। (ক) **মেঘুলা,** গড়বেতা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) দামোদর। (গ) ঘোষ পরিবার। (ঘ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। নিরলংকার। (ঙ) ১৮৪৩। (চ) গড়বেতা শহর থেকে শিলাবতী নদী পেরিয়ে টানা ভ্যান-রিক্সায় (আন্দাজ ৬/৭ কি.মি.)।

১০৮। (ক) **মলিঘাটি,** ডেবরা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) বৃন্দাবনচন্দ্র। (গ) গোস্বামী পরিবার। (ঘ) আনু. ২৫/২৬ ফুট উচ্চতার। নিরলংকার। (ঙ)১৮৪৪-৪৫। (চ) বেলতলা (ঘাটাল-পাঁশকুড়া বাস) থেকে কলমীজোড় হয়ে ট্রেকারে।

১০৯। (ক) **উত্তর গোবিন্দনগর,** দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) দামোদর। (ঘ) আনু. ২৩/২৪ ফুট উচ্চতা। নিরলংকার। (ঙ) ১৮৪৫। (চ) পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসপথের গঙ্গামাড়ো থেকে ভ্যান রিক্সায়।

১১০। (ক) **জয়ন্তীপুর,** চন্দ্রকোণা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) শ্যামচাঁদ। (গ) চৌধুরী পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০/৩৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও টেরাকোটা-সজ্জিত। (ঙ) ১৮৪৫। (চ) ঘাটাল থেকে চন্দ্রকোণাগামী বাসে জয়ন্তীপুর।

১১১। (ক) **ময়নাপুর,** জয়পুর, বাঁকুড়া। (খ) দামোদর। (গ) আনু. ২২/২৪ ফুট উচ্চতা ও টেরাকোটা সম্পন্ন। (ঘ) ১৮৪৫। (ঙ) জয়রামবাটি বা বিষ্ণুপুর থেকে বাসে।

১১২। (ক) **ইলামবাজার,** (বামুনপাড়া) বীরভূম। (খ) লক্ষ্মী-জনার্দন। (গ) আনু. ৩০/৩৫ ফুট উচ্চ, এর সামনের ত্রিখিলান-গাত্র মনোহর টেরাকোটা-শোভিত। (ঘ) ১৮৪৬। (ঙ) বোলপুর থেকে বাসে সহজেই ইলামবাজারে গিয়ে সব দেখানোব চুক্তিতে রিক্সায়।

১১৩। (ক) **দাসপুর,** পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) দধি-বামন (পরিত্যক্ত মন্দির)। (গ) চক্রবর্তী পরিবার। কারিগর : ঠাকুরদাস শীল। (ঘ) আনু. ২২/২৩ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও অসাধারণ টেরাকোটা-মন্ডিত। (ঙ) ১৮৪৬। (চ) পাঁশকুড়া বা ঘাটাল থেকে বাসে সরাসরি দাসপুরে গিয়ে রিক্সায়।

১১৪। (ক) **রাধাকান্তপুর,** (শাঁখারী পাড়া), দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) রঘুনাথ। (গ) দত্ত পরিবার। (ঘ) ২২/২৩ ফুট উচ্চতার টেরাকোটা-মন্ডিত মন্দির। (ঙ) ১৮৪৬। (চ) পাঁশকুড়া থেকে ঘাটালের বাসে টালিভাটায় গিয়ে রিক্সায়, সহজেই।

১১৫। (ক) **দিগসুই,** (শিবতলা), মগরা, হুগলী। (খ) শিব। (ঘ) মাঝারি। (ঙ) ১৮৪৭। (চ) মগরা থেকে কোড়লাগামী বাসে।

১১৬। (ক) **হরিহরধাম,** ৯৩ টালিগঞ্জ রোড। (খ) শিব। (গ) প্যারিলাল ও মণিমোহন মণ্ডল। (ঙা ১৮৪৭।

১১৭. (ক) **দেহাটি,** পাঁশকুড়া, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) গোপীমোহন। (গ) মাইতি পরিবার। কারিগর : গিরিধর মিস্ত্রী। (ঘ) আনু. ২৫/৩০ ফুট উচ্চতার। দেওয়াল-গাত্র নিরলংকার হ'লেও কাঠের দরজায় নকাশি কাজ। অদূরে রাসমঞ্চ। (ঙ) ১৮৪৮। (চ) পাঁশকুড়া থেকে ঘাটালের বাসে মেছগ্রাম গিয়ে ভ্যান-রিক্সায়।

১১৮। (ক) **সুলতানপুর,** (বক্সীপাড়া) ঘাটাল, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) দামোদর। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন, নিরলংকার। (ঙ) ১৮৪৮। (চ) খড়ার থেকে বাসে। পূর্বোক্ত।

১১৯। (ক) **খোর্দা বিষ্ণুপুর,** দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) শিব। (গ) রায় পরিবার। (ঘ) আনু. ২৪/২৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন এবং টেরাকোটা-মন্ডিত। (ঙ) ১৮৪৯। (চ) পাঁশকুড়া থেকে ঘাটালের বাসে বকুলতলা গিয়ে রিক্সায় (আন্দাজ ৬ কি.মি.)।

১২০। (ক) **সুরতপুর,** দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) শীতলা। (গ) শত্রুঘ্ন হাজরা। কারিগর : ঠাকুরদাস শীল। (ঘ) আনু. ২৫/২৬ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও বিপুল টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। (ঙ) ১৮৪৯। (চ) ঐ। খোর্দা-বিষ্ণুপুরের লাগোয়া।

১২১। (ক) **আমোদপুর,** (দক্ষিণ পাড়া), ডেবরা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) রঘুনাথ। (গ) জানা পরিবার। (ঘ) আনু. ২৩/২৪ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট। নিরলংকার। (ঙ) **উনিশ শতকের মধ্য ভাগ**। (চ) বালিচক থেকে মেদিনীপুর শহরগামী বাসে বসন্তপুরে গিয়ে ভ্যানরিক্সায় সরাসরি।

১২২। **পাটতেঁতুল,** গড়বেতা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) রাধাদামোদর। (গ) দাস পরিবার। (ঘ) ২৩/২৪ ফুট উচ্চতা। পঙ্খ। (ঙ) ঐ। (চ) গড়বেতা থেকে বাসে আমলাশোলী। হাঁটা/ভ্যানরিক্সা।

১২৩। (ক) **ঐ** (খ) সীতারাম। (গ) পাল পরিবার। (ঘ) আনু. ২৪/২৫ ফুট উচ্চ ও টেরাকোটা-মন্ডিত। (ঙ) ঐ। (চ) ঐ।

১২৪। (ক) **কোঙ্গারপুর,** (ঘোষ পাড়া), ঘাটাল, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) লক্ষ্মী জনার্দন। (গ) ঘোষ পরিবার। (ঘ) আনু. ২৩/২৪ ফুট উচ্চ ও কিছু পঙ্খের কাজে সজ্জিত। (ঙ) ঐ। (চ) পূর্বোক্ত ঘাটাল-কুঠীঘাট (ভায়া, রাধানগর) বাসে সরাসরি।

১২৫। (ক) **খড়ার,** (ব্রাহ্মণ পাড়া), পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) দামোদর। (গ) বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। (ঘ) আনু. ২৩/২৪ ফুট উচ্চতা এবং সামান্য টেরাকোটা-বিশিষ্ট। (ঙ) ঐ। (চ) ঘাটাল থেকে বাসে খড়ারে গিয়ে রিক্সায় সব দেখানোর চুক্তিতে। পূর্বোক্ত।

১২৬। (ক) **চক্কালন্দি,** (ধাড়াপাড়া), খড়গপুর-লোকাল, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) লক্ষ্মী-বরাহ। (গ) ধাড়া পরিবার। (ঘ) আনু. ২৫/২৬ ফুট। নিরলংকার-গাত্র, দরজায় কাঠের কাজ। (ঙ) ঐ। (চ) খড়গপুর থেকে বেলদা-মুখী বাসে বেনাপুর বাজার— এখান থেকে সরাসরি রিক্সায় (সাত কি.মি.)

১২৭। (ক) **জোতবাণী,** দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) কৃষ্ণ রায়। (গ) গোস্বামী পরিবার। (ঘ) আনু. ৩২/৩৩ ফুট উচ্চতা, পঙ্খের কাজ। (ঙ) ঐ। (চ) পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে বেলতলা (পূর্বোক্ত) গিয়ে রিক্সায়, কলমীজোড় হ'য়ে ৬½ /৭ কি.মি.।

১২৮। (ক) **জোতমুরী,** দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) শীতলা। (গ) আনু. ২০/২২ ফুট। নিরলংকার। (ঘ) ঐ। (ঙ) ঐ লাগোয়া।

১২৯। (ক) **বড়িশা,** (পশ্চিমপাড়া), পিংলা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) রাধাবিনোদ। (গ) গোস্বামী পরিবার। (ঘ) আনু. ২৫/২৬ উচ্চ ও টেরাকোটা-শোভিত। (ঙ) ঐ। (চ) বালিচক থেকে বাসে/ট্রেকারে জলচক গিয়ে রিক্সায়— পূর্বোক্ত তিলদাগঞ্জের লাগোয়া।

১৩০। (ক) **রামদাসপুর,** দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) দধি-বামন। (গ) মাইতি পরিবার। (ঘ) আনু. ২৬/২৭ ফুট উচ্চতা কিন্তু অংশত বিনষ্ট, টেরাকোটাও প্রায় লুপ্ত তবে দরজায় কাঠের কাজ দ্রষ্টব্য। (ঙ) ঐ। (চ) মেদিনীপুর শহর, ঘাটাল বা দাসপুর থেকে বাসে পূর্বোক্ত নাড়াজোলে গিয়ে রিক্সায়— বালিপোতা হ'য়ে চার কি.মি.।

১৩১। (ক) **বালিতোড়া,** দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) শ্রীধর। (গ) চৌধুরী পরিবার। (ঘ) আনু. ২২/২৩ ফুট উচ্চ। নিরলংকার। (ঙ) ঐ। (চ) পাঁশকুড়া থেকে ট্রেকারে গোবিন্দনগর— এখান থেকে ভ্যান-রিক্সায়, জয়কৃষ্ণপুর হ'য়ে আন্দাজ পাঁচ কি.মি.।

১৩২। (ক) **রাধাবল্লভপুর,** চন্দ্রকোণা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) ধনঞ্জয় শিব। (গ) আনু. ২২/২৩ ফুট উচ্চতা ও সামান্য পঙ্খের কাজ। (ঘ) ঐ। (ঙ) চন্দ্রকোণা-কেশপুর বাসে, সরাসরি। মেদিনীপুর শহর-কেশপুর-চন্দ্রকোণা বাসেও সহজে যাওয়া যায়।

১৩৩। (ক) **রাজগ্রাম,** (শ্রীরামপুর পাড়া) বাঁকুড়া, বাঁকুড়া। (খ) বিষ্ণু (শালগ্রাম) (গ) কুন্ডু পরিবার। (ঘ) আনু. ২৫/২৬ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এবং টেরাকোটা-সজ্জিত। (ঙ) ঐ। (চ) বাঁকুড়া শহরের গোবিন্দনগর বাসস্ট্যান্ড থেকে রাজগ্রাম (ভায়া লোকপুর) বাসে সরাসরি।

১৩৪। (ক) **পাহাড়পুর,** ইঁদাস, বাঁকুড়া। (খ) শ্রীধর। (গ) নন্দী পরিবার। (ঘ) আনু ৩০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এবং যুগপৎ টেরাকোটা এবং পঙ্খের কাজে সজ্জিত। (ঙ) ঐ। (চ) বর্ধমান শহরের তিন কোণিয়া বাসস্টান্ড থেকে বাসে ইঁদাস (বা ইন্দাস)-এ গিয়ে রিক্সায় (আন্দাজ ৬/৭ কি.মি.।

১৩৫। (ক) **কামারগেড়ে,** (সামুই পাড়া), চন্দ্রকোণা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) রঘুনাথ। (গ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতা ও পঙ্খের সামান্য নকাশি কাজ। (ঘ) ১৮৫৪। (ঙ) ঘাটাল বা চন্দ্রকোণা থেকে বাসে ক্ষীরপাই-এ গিয়ে রিক্সায় (৬/৭ কি.মি.)।

১৩৬। (ক) **কৃষ্ণনগর,** (বগড়ী-কৃষ্ণনগব), গড়বেতা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) কৃষ্ণ রায়। (গ) যাদবরাম চট্টোপাধ্যায়। কারিগর : সনাতন মিস্ত্রী (বিষ্ণুপুর)। (ঘ) পাঁচ ফুট ভিতের উপর আনু. চল্লিশ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। (ঙ) ১৮৫৫। (চ) গড়বেতা শহর থেকে হুমগড়গামী বাসে ফতেসিংপুরে গিয়ে তিন কি.মি. হেঁটে বা ভ্যান-রিক্সায়।

১৩৭। (ক) **মাঙলই,** পাঁশকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর; (খ) রাধা-দামোদর; (গ) মাইতি পরিবার; (ঘ) আনু ৩০ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট ও সামনের গাত্র অনবদ্য টেরাকোটা মন্ডিত। ঘেরা মন্দির-ক্ষেত্র। বাইরে ছোট মাঠে বড় মাপের টেরাকোটা-মন্ডিত বৃহৎ ১৭ চূড়া রাসমঞ্চ; (ঙ) ১৮৫৬; (চ) পাঁশকুড়া ষ্টেশান-সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড-লাগোয়া ট্রেকারস্ট্যান্ড থেকে ট্রেকারে গোবিন্দনগরে গিয়ে কাঁসাই পেরিয়ে শ্যামসুন্দরপুব পাটনা—এখানে থেকে হেঁটে বা রিক্সায়।

১৩৮। (ক) **সেনহাট,** খানাকুল, হুগলী; (খ) রাজ-রাজেশ্বর; (গ) দত্ত পরিবার; (ঘ) আনু. ২৫/২৬ উচ্চতা ও টেরাকোটা মন্ডিত; (ঙ) ১৮৫৮; (চ) আরামবাগ থেকে গড়ের হাট-গামী বাসে খানাকুলে গিয়ে রিক্সায়।

১৩৯। (ক) **তালবান্দি,** ডেবরা, পশ্চিম-মেদিনীপুব; (খ) রাধা-বল্লভ; (গ) গোস্বামী পরিবার। মিস্ত্রী: ঠাকুরদাস শীল; (ঘ) আনু. ২৫/২৬ ফুট উচ্চতা ও একসারি টেরাকোটা সম্পন্ন; (ঙ) ১৮৬৩; (চ) পাঁশকুড়া ষ্টেশন সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে ট্যাবাগ্যেড়া-গামী বাসে গিয়ে ট্যাবাগ্যেড়া থেকে কাঁসাই পেরিয়ে ভ্যান-রিক্সায় (পাঁচ কি.মি.)।

১৪০। (ক) **ভট্টগ্রাম,** গড়বেতা, পশ্চিম-মেদিনীপুর; (খ) দামোদর; (গ) ভট্টাচার্য পরিবার; (ঘ) ২০ ফুটের কম উচ্চতার, নিরলংকার; (ঙ) ১৮৬৬; (চ) গড়বেতা থেকে গোয়ালতোড়-গামী বাসে ঝাড়বনী—সেখান থেকে ভ্যানরিক্সায়, ব্রাহ্মণগ্রাম হয়ে চার কি.মি.।

১৪১। (ক) **খেলাড়,** খড়গপুর লোকাল, পশ্চিম-মেদিনীপুর; (খ) দামোদর; (গ) বসু পরিবার; (ঘ) আনু. ২৬/২৭ ফুট উচ্চতা, নিরলংকার; (ঙ) ১৮৬৮; (চ) খড়গপুর ষ্টেশন-লাগোয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে বেলদা-মুখী বাসে শ্যামলপুরা—এখান থেকে রিক্সায় (৬ কি.মি.)।

১৪২। (ক) **বনপাটনা,** খড়গপুর লোকাল, পশ্চিম-মেদিনীপুর; (খ) রঘুনাথ; (গ) সৎপথী পরিবার; (ঘ) মাকড়া পাথরে নির্মিত, প্রায় চল্লিশ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন কিছু পঙ্খের কাজ; (ঙ) ১৮৬৮; (চ) ঐ, শ্যামলপুরা থেকে তিন কি.মি., রিক্সায়।

১৪৩। (ক) **আনন্দপুর,** (মধ্যপাড়া), কেশপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর; (খ) দামোদর; (গ) বাগ পরিবার, কারিগর: রাম মিস্ত্রী এবং ভক্তারাম দাস (চন্দ্রকোণা); (ঘ) ৩২/৩৩ ফুট উচ্চতা ও টেরাকোটা-সম্পন্ন; (ঙ) ১৮৬৯; (চ) মেদিনীপুর শহর থেকে আনন্দপুরগামী বাসে, সরাসরি।

১৪৪। (ক) **শ্রীরামপুর,** সবং, পশ্চিম-মেদিনীপুর; (খ) লক্ষ্মী-জনার্দন; (গ) জানা পরিবার; (ঘ) ২৮/৩০ ফুট উচ্চতা এবং টেরাকোটা-বিশিষ্ট; (ঙ) ১৮৭০; (চ) বালিচক থেকে বাসে/ ট্রেকারে যাত্রা করে পিংলা ডাকবাংলা স্টপেজে নেমে রিক্সা (ভ্যান-রিক্সা)য় চার কি.মি.— করকাই সংলগ্ন।

১৪৫। (ক) **চন্দ্রকোণা,** (ইলামবাজার), পশ্চিম-মেদিনীপুর; (খ) রাধা-গোবিন্দ; (গ) চাবড়ি পরিবার; (ঘ) আনু ২৫-২৭ ফুট উচ্চ এবং যুগপৎ টেরাকোটা এবং পঙ্খ-অলংকৃত; (ঙ) ১৮৭০; (চ) পাঁশকুড়া, ঘাটাল বা মেদিনীপুর শহর থেকে বাসে চন্দ্রকোণা টাউন, এরপর রিক্সায়।

১৪৬। (ক) **বেলিয়াঘাটা,** (পূবপাড়া), দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর; (খ) মদন-গোপাল; (গ) অধিকারী পরিবার; (ঘ) আনু. ২৮/৩০ ফুট উচ্চ ও সামান্য পঙ্খ-অলংকৃত; (ঙ) ১৮৭১; (চ) পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসপথে বেলিয়াঘাটা, তবে ঘাটাল থেকে অতি সহজে।

১৪৭। (ক) **ছাতনা,** (রাজগড়), বাঁকুড়া; (খ) বাশুলি; (গ) (ঘ) আনু. ২৪/২৫ ফুট উচ্চ ও কিছু টেরাকোটা-সমন্বিত; (ঙ) ১৮৭১; (চ) বাঁকুড়া শহরের গোবিন্দনগর বাসস্ট্যান্ড থেকে পুরুলিয়া-মুখী বাসে সরাসরি ছাতনা। ট্রেনেও আসা চলে।

প্রাসঙ্গিকী

কি মোর যৌবন ধনে ল বড়ায়ি কি মোর বসতী বাশে।
আন পাণী মোকে একো না ভাএ কি মোর জীবন আশে।।
মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী হুআঁ বেড়ায়িবোঁ নানা দেশে।
বালসীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।।*

(যৌবন-ধনে আমার কি হবে? গৃহে বসতি করেই বা, বড়াই, আমার কি কাজ? অন্ন বা জল কোনো কিছুই আমার ভাল লাগে না. জীবনের আশাও আমার কাছে অর্থহীন। মাথা মুড়িয়ে যোগিনী হয়ে আমি দেশে দেশে ঘুরবো। বাশুলীর চরণ মাথায় রেখে বন্দনা ক'রে বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন।)

বড়ু চণ্ডীদাস কোন গ্রামের কবি বলা শক্ত। ছাতনার হতে পারেন। ছাতনায় 'চণ্ডীদাসের ভিটে'' ব'লে পরিচিত একটি স্থানও আছে।

বেগলারের 'Report', ১৮৭২-৭৩ :

> *"About fourteen miles from Bankura on the old Grand Trunk Road through Hazaribagh to Shaharghati at the village of Chatna are some ruins; the principal consists of some temples and ruins within a brick enclosure; the enlosure and the brick temples that existed having long become mere mounds, while the laterite temples still stand; the bricks used are mostly inscribed, and the inscription gives a name which I read as Konaha Utara Raja, while the pandits read it as Hamira Utara Raja; the date at the end is the same in all, viz., Sake 1476; there are four different varieties of the inscriptions, two engraved and two in relief; the bricks were clearly stamped while still soft and then burnt."***

বেগলার সাহেবের বিবরণীটির লক্ষণীয় বিষয়গুলি হ'ল: (i) ১৮৭২-৭৩-এ বেগলার ছাতনায় কিছু ধ্বংসস্তূপ দেখেছিলেন যার মধ্যে ইটের বেষ্টনীর মধ্যে কয়েকটি মন্দির ছিল—ইটের বেষ্টন ও মন্দিরগুলি তখনই ঢিবিতে পরিণত হ'য়েছিল কিন্তু মাকড়া পাথরের মন্দির কটি তখনও দাঁড়িয়েছিল। (ii) ইটগুলির বেশীর ভাগই ছিল সময় ও লিপিযুক্ত। সময় হ'ল ১৪৭৬ শকাব্দ বা ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। লিপিটির বেগলার-কৃত পাঠ হ'ল 'কোনহ উতর রাজা' কিন্তু পণ্ডিতগণের পাঠ হ'ল 'হমির উতর রাজা।'

১৪৮। (ক) **বীরনগর,** দ:পাড়া, রাণাঘাট, নদীয়া। (খ) শিব। (গ) অমরনাথ ব্রহ্মচারী (?) (ঘ) আনু. ২৪/২৫ ফুট উচ্চ। সংস্কৃত। (ঙ) ১৮৭২। (চ) শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর লাইনের বীরনগর থেকে রিক্সায়।

১৪৯। (ক) **ঝিকুড়িয়া,** ডেবরা, পশ্চিম-মেদিনীপুর; (খ) শীতলা; (গ) ঘোষ পরিবার; (ঘ) আনু. ২০/২২ ফুট, নিরলংকার; (ঙ) ১৮৭৫; (চ) পাঁশকুড়া থেকে ডেবরা হয়ে মেদিনীপুর শহরগামী বাসে অর্জুনি—এখান থেকে খানামোহন হয়ে ভ্যান রিক্সায় (৭/৮ কি.মি.)।

১৫০। (ক) **কঁয়তা,** (রাউতপাড়া), খড়গপুর লোকাল, পশ্চিম-মেদিনীপুর; (খ) লক্ষ্মী জনার্দন (পরিত্যক্ত); (গ) দাস পরিবার; (ঘ) আনু. ২০/২২ ফুট উচ্চতার, নিরলংকার; (ঙ) ১৮৮২; (চ) বালিচক থেকে সবং-দেহাটি বাসে তেমাথানী গিয়ে ভ্যান রিক্সায়।

১৫১। (ক) **খড়ার,** (পূবপাড়া), ঘাটাল, পশ্চিম-মেদিনীপুর; (খ) দামোদর; (গ) মন্ডল পরিবার; (ঘ) আনু. ২৩/২৪ ফুট উচ্চতা, নিরলংকার; (ঙ) ১৮৮৮; (চ) ঘাটাল থেকে বাসে খড়ারে গিয়ে রিক্সায়।

---

* শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, রাধাবিরহ, বড়ু চণ্ডীদাস। (মূল পাঠ, ''বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন,'' সম্পাদনা, আমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৩২৪)

** প্রাগুক্ত Reprint 1966, pp. 198-99

১৫২। (ক) **উত্তর ধানখাল,** (মাড়োতলা), দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর; (খ) শীতলা; (গ) (ঘ) আনু. ১৪/১৫ ফুট উচ্চতা, একদুয়ারী, অল্প টেরাকোটা; (ঙ) ১৮৮৯; (চ) পাঁশকুড়া থেকে ট্রেকারে উত্তর গোবিন্দনগরে গিয়ে ঘাট পেরিয়ে ভ্যানরিক্সায় ৬ কি.মি.।

১৫৩। (ক) **চন্দ্রকোণা, (মিত্রসেনপুর),** পশ্চিম-মেদিনীপুর; (খ) ধর্মরাজ (কলকলি দেবী); (গ) (ঘ) আনু. ২৩/২৪ ফুট উচ্চতা, কিছু পঙ্খের অলংকরণ; (ঙ) ১৮৯০; (চ) পাঁশকুড়া, ঘাটাল বা মেদিনীপুর শহর থেকে বাসে চন্দ্রকোনা টাউন—এখান থেকে সব দেখানোর চুক্তিতে রিক্সায়।

১৫৪। (ক) **আনন্দপুর,** (হেটেলাপাড়া), কেশপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর; (খ) রঘুনাথ; (গ) সরকার পরিবার; (ঘ) আনু. ৩০/৩৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন এবং যুগপৎ টেরাকোটা ও পঙ্খ-অলংকৃত; (ঙ) ১৮৯৩; (চ) মেদিনীপুর শহর থেকে আনন্দপুরের বাসে, সরাসরি।

১৫৫. (ক) **চন্দ্রকোণা,** (ইলামবাজার), পশ্চিম-মেদিনীপুর; (খ) শান্তিনাথ শিব; (গ) (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চ, উৎকৃষ্ট টেরাকোটা ও কিছু পঙ্খের কাজে সজ্জিত; (ঙ) **উনিশ শতক**; (চ) চন্দ্রকোণা টাউন থেকে রিক্সায়, পূর্বোক্ত।

১৫৬। **বাঘমুণ্ডি,** পুরুলিয়া। (খ) নারায়ণ, (গ) বাঘমুণ্ডি রাজপরিবার। (ঘ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতা। নিরলংকার। (ঙ) ঐ। (চ) পুরুলিয়া থেকে বাসে বাঘমুণ্ডি—রাসমঞ্চের পথে, বাঁয়ে।

১৫৭। (ক) **রামদাসপুর,** দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর; (খ) দধিবামন; (গ) মাইতি পরিবার; (ঘ) আংশিক ভগ্ন, টেরাকোটা বিনষ্ট, দরজার পাল্লায় কাঠের কাজ; (ঙ) ঐ; (চ) মেদিনীপুর শহর, ঘাটাল, বা দাসপুর থেকে বাসে নাড়াজোল—তার প্রায় লাগোয়া (১ কি.মি.)।

১৫৮। (ক) **বাঘরুই,** (জানাপাড়া), কেশপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর; (খ) লক্ষ্মী-জনার্দন; (গ) জানা পরিবার; (ঘ) অতি জীর্ণ ও ভগ্ন, চমৎকার টেরাকোটা এখনও অবশিষ্ট; (ঙ) ঐ। (চ) পাঁশকুড়া-ডেবরা-মেদিনীপুর বাসে অর্জুনি, এখান থেকে ট্রেকারে।

১৫৯। (ক) **কাদাশোল,** বড়জোড়া, বাঁকুড়া; (খ) বিষ্ণু, (গ) ঘড়ুই পরিবার; (ঘ) আনু. ৩৫/৩৬ ফুট উচ্চ ও মনোরম টেরাকোটা-মন্ডিত; (ঙ) ঐ। (চ) দুর্গাপুর থেকে মালিয়াড়াগামী বাসে সহজেই কাদাশোল।

১৬০। (ক) **সোনামুখী,** (বাজার পাড়া/ বড়কার্ত্তিকতলা), বাঁকুড়া; (খ) সিদ্ধেশ্বর শিব; (গ) (ঘ) আনু. ৫০ ফুট উচ্চ, নিরলংকার, নতুন নাটমন্ডপ সম্প্রতি যুক্ত, অঙ্গনে দর্শনীয় ১৭ চূড়া রাসমঞ্চ; (ঙ) ঐ; (চ) বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যান্ড বা বিষ্ণুপুরের রসিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে সোনামুখী। ঐ বাসরাস্তারই (বাঁকুড়া রোড) ''চৌমাথা'' হতে বাজারপাড়া পথের 'হাঁড়িহাটতলা'-র বাঁয়ের রাস্তায় ঢুকে ডানে যে সরু গলি দেখা যাবে, তার শেষে।

১৬১। (ক) **রাউতখন্ড,** (নাপিতপাড়া), জয়পুর, বাঁকুড়া; (খ) পরিত্যক্ত মন্দির; (গ) (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চ, প্রথাগত টেরাকোটা ছাড়াও গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের দুপাশে ও বিগ্রহের পিছনের দেওয়ালে ব্যতিক্রমী পটচিত্র—বৃহৎ মাপের গৌর-নিতাই ও হরপার্বতীর চিত্র দুটি দর্শনীয়; (ঙ) **ঐ;** (চ) আরামবাগ থেকে জয়রামবাটি-কোতুলপুর-বিষ্ণুপুর সড়কের

বাসে যাত্রা করে কুম্ভস্থল স্টপেজে নেমে চৌরাস্তার মোড় থেকে ডানের পথে আন্দাজ পাঁচ কি.মি.—ভ্যানরিক্সা না পেলে হাঁটতে হবে।

১৬২। (ক) **সাহারজোড়া,** বড়জোড়া, বাঁকুড়া। (খ) কালাচাঁদ। (ঘ) ভগ্ন। জীর্ণ। (ঙ) ঐ। (চ) দুর্গাপুর-বাঁকুড়া বাসে।

১৬৩। (ক) **মানকর,** (রায়পাড়া), বুদবুদ, বর্ধমান; (খ) শিব; (গ) দত্ত পরিবার; (ঘ) আনু. ২৫/২৬ ফুট উচ্চতা ও উৎকৃষ্ট টেরাকোটা সম্পন্ন; (ঙ) ঐ; (চ) বর্ধমান রেল-স্টেশান থেকে আসানসোল লোকালে, গিয়ে রিক্সায়—মানকর ও অমরারগড়ের দর্শণীয় সমস্ত পুরাতন মন্দির দেখানোর চুক্তিতে।

১৬৪। (ক) **অমরারগড়,** (দশমন্দিরতলা), আউসগ্রাম, বর্ধমান; (খ) শিব; (গ) রায়পরিবার (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চ। নিরলংকার; (ঙ) ঐ, (চ) ঐ।

১৬৫। (ক) **ঐ** (মণ্ডলপাড়া), (খ) নারায়ণ। (গ) মণ্ডল পরিবার, (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চ। নিরলংকার। (ঙ) ঐ। (চ) ঐ।

১৬৬। (ক) **গোবর্ধনপুর,** পিংলা, পশ্চিম-মেদিনীপুর; (খ) রত্নেশ্বর শিব; (গ) বসু পরিবার; (ঘ) আনু. ২৫/২৬ ফুট উচ্চ, দরজার উপরে ও দুপাশে একসারি করে টেরাকোটা; (ঙ) ঐ; (চ) খড়গপুর লাইনের হাউর ষ্টেশনে নেমে ভ্যান-রিক্সায় (সাত কি.মি.)।

১৬৭। (ক) **মৌখিরা,** আউসগ্রাম, বর্ধমান; (খ) লক্ষ্মী-জনার্দন; (গ) রায় পরিবার; (ঘ) আনু. ৪০/৪৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও টেরাকোটা-মন্ডিত; (ঙ) ঐ; (চ) বোলপুর বা ইলামবাজার থেকে পানাগড়-গামী বাসে অজয় পেরিয়ে বসুধা—এখান থেকে ভ্যানরিক্সায় সরাসরি।

১৬৯। (ক) **এরুয়ার,** (মহারুদ্রদেবতলা), ভাতাড়, বর্ধমান; (খ) মহারুদ্রদেব; (গ) (ঘ) বৃহৎ, নিরলংকার। (ঙ) ঐ; (চ) বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে সরাসরি এরুয়ার—বাসস্টপেজ থেকে রিক্সায়।

১৭০। (ক) **ঐ** (বাণীচত্বর); (খ) শিব; (গ) (ঘ) আনু. ২৪/২৫ ফুট উচ্চতা ও সামান্য টেরাকোটা সম্পন্ন। একদুয়ারী; (ঙ) ঐ; (চ) ঐ। মহারুদ্রদেব তলার পথেই—একটি দেউলের সামান্য তফাতে।

১৭১। (ক) **বৈদ্যপুর,** কালনা, বর্ধমান; (খ) শিব; (ঘ) আনু. ১৫/১৬ ফুট উচ্চতার, পূর্ণ সংস্কৃত। বর্তমানে নিরলংকার। একদুয়ারী। (ঙ) ঐ; (চ) হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনের বৈঁচি স্টেশান-সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে কালনাগামী বাসে সহজেই বৈদ্যপুর। বাজার এলাকায়।

১৭২। (ক) **বনকাটি,** কাঁকসা, বর্ধমান; (খ) শিব; (গ) (ঘ) আনু. ১৫/১৬ ফুট উচ্চ, একটি পার্শ্বচূড়া ভগ্ন, সামান্য টেরাকোটা, একদুয়ারী; (ঙ) ঐ; বোলপুর বা ইলামবাজার থেকে পানাগড়গামী বাসে ১১ মাইল—এখান থেকে রিক্সায় বা হেঁটে। পূর্বোক্ত পিতলের রথের পার্শ্ববর্তী পঞ্চরত্নটি অতিক্রম করে।

১৭৩। (ক) **কয়াপাট,** গোঘাট, হুগলী; (খ) (গ) (ঘ) আনু. ২২/২৪ ফুট উচ্চতা ও টেরাকোটা সম্পন্ন; (ঙ) ঐ। (চ) আরামবাগ থেকে পাণ্ডুগ্রাম হয়ে।

১৭৪। (ক) **ভাঙ্গামোড়া,** (বাজার পাড়া), পুরশুড়া, হুগলী; (খ) শিব; (গ) বর্তমানে রাম (সূত্রধর) পরিবারের অধিকারে; (ঘ) আনু. ২০/২২ ফুট উচ্চতার ও টেরাকোটা-মন্ডিত। দ্র: রাস্তার বিপরীতে বাড়ির ভিতরের দ্বারশীর্ষে টেরাকোটা সহ মন্দিরটিও সম্ভবত পঞ্চরত্ন ছিল, তবে পাঁচটি চূড়াই ভেঙ্গে লোপ পাওয়ায় বোঝা যায় না; (ঙ) ঐ; (চ) তারকেশ্বর থেকে অমরপুরগামী ট্রেকারে বা খুশীগঞ্জগামী বাসে।

১৭৫। (ক) **ঐ (শুভচণ্ডীতলা)**; (খ) চণ্ডী; (গ) (ঘ) আনু. ২২/২৩ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। নিরলংকার। সামনে টিনের চালের বারান্দা পরে যুক্ত। স্থানীয় লোক বিশ্বাসে এটি চণ্ডীর শ্বশুরবাড়ি আর রাস্তার ওপারের আটচালাটি চণ্ডীর বাপের বাড়ি; (ঙ) ঐ; (চ) ঐ। বাজারপাড়ার পঞ্চরত্ন ছেড়ে শোঙালুকের দিকে।

১৭৬। (ক) **গুড়াপ,** ধনিয়াখালি, হুগলী; (খ) শিব; (গ) নাগ পরিবার; (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতা। সংস্কারে টেরাকোটা একরকম লুপ্ত; (ঙ) ঐ; (চ) হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে গুড়াপ। নন্দদুলালের দোলমঞ্চ ও বিখ্যাত মন্দির অতিক্রম করলেই দেখা যাবে।

১৭৭। (ক) **গৌরহাটি,** আরামবাগ, হুগলী; (খ) রাম-গোপাল; (গ) মন্ডল পরিবার; (ঘ) টেরাকোটা-অলংকৃত; (ঙ) ঐ। (চ) আরামবাগ থেকে বাসে।

১৭৮। (ক) **বসুয়া,** (স্থানীয় উচ্চারণে, 'বোসো') (সিদ্ধান্ত পাড়া), ধনিয়াখালি, হুগলী; (খ) শিব। (ঙ) ঐ। (চ) হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের শিবাইচণ্ডী স্টেশন থেকে ভ্যানরিক্সায়।

১৭৯।(ক) **বৈকুণ্ঠপুর,** পুরশুড়া, হুগলী; (খ) পরিত্যক্ত মন্দির; (গ) সিংহ-রায় পরিবার; (ঘ) আনু. ৩০/৩৫ ফুট উচ্চ ও জীর্ণদশাগ্রস্ত। প্রবেশপথের খিলান ভগ্ন। একটি পার্শ্বচূড়াও ভগ্ন; (ঙ) ঐ; (চ) তারকেশ্বর থেকে অমরপুরগামী ট্রেকারে বা খুশীগঞ্জগামী বাসে যাত্রা করে দামোদরের বাঁধরাস্তার উপর বৈকণ্ঠপুর সমবায় সমিতি স্টপেজে নেমে এ সমবায় সমিতিরই দেয়াল ঘেঁষে বাঁধরাস্তা হতে নামা পথ ধরে কিছুটা গেলেই উত্তর বৈকুণ্ঠপুর বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের সুবিস্তৃত অঙ্গনের এককোণে একটি আটচালা এবং অন্য কোণে আলোচ্য পরিত্যক্ত পঞ্চরত্নটি।

১৮০। (ক) **সোমসপুর,** (গড়বাড়ি), ধনিয়াখালি, হুগলী; (খ) শিব; (গ) মুখোপাধ্যায় পরিবার। (ঘ) টেরাকোটা মণ্ডিত। (ঙ) ঐ। (চ) তারকেশ্বর থেকে বাসে ধনিয়াখালি গিয়ে ভ্যান-রিক্সায়।

১৮১। (ক) **সুপুর,** বোলপুর, বীরভূম; (খ) শিব; (গ) (ঘ) আনু. ২০/২২ ফুট উচ্চ। সংস্কারে টেরাকোটা লুপ্ত। একদুয়ারী; (ঙ) ঐ; (চ) বোলপুর থেকে সরাসরি বাসে।

১৮২। (ক) **খাঁদরা,** অণ্ডাল, বর্ধমান। (খ) লক্ষ্মী নারায়ণ। (গ) সরকার পরিবার (মেজ তরফ)। (ঘ) বৃহৎ। উচ্চতা আনু. ৩৫/৪০ ফুট। বড় বড় পুতুলের আকারে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ টেরাকোটা। (ঙ) ঐ। (চ) ক্রম ১৬।

১৮৩। (ক) **রাধাকান্তপুর,** (উত্তর পাড়া), দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) শীতলা। (গ) (ঘ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতা ও সামান্য পঙ্খের কাজ যুক্ত। (ঙ) **১৯ শতকের শেষ দিক।** (চ) পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে টালিভাটা, সেখান থেকে সহজেই হেঁটে বা রিক্সায় (পূর্বোক্ত)—রাধাকান্তপুরের উত্তরপাড়ার গোপীনাথপুর এলাকায় মন্দিরটি।

১৮৪। (ক) **শ্রীধরপুর,** দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) রঘুনাথ (গ) সামন্ত পরিবার (ঘ) আনু ২৫/২৬ ফুট উচ্চতা। সামনের দেওয়ালে টেরাকোটা। (ঙ) ঐ (চ) ঐ। রাধাকান্তপুরের প্রায় লাগোয়া।

১৮৫। (ক) **ঐ (বেরাবাগান),** (খ) সীতা-রাম (গ) বেরা পরিবার (ঘ) আনু.২৫/২৬ ফুট উচ্চতা। নিরলংকার। (ঙ) ঐ। (চ) ঐ।

১৮৬। (ক) **গোপালপুর,** ধনিয়াখালি, হুগলী। (খ) শ্রীধর (গ) ঘোষ পরিবার। (ঘ) উৎকৃষ্ট টেরাকোটা-শোভিত। (ঙ) ঐ। (চ) হাওড়া-বর্ধমান লাইনের গুড়াপ থেকে ভাস্তারা হয়ে।

১৮৭। (ক) **শ্যামবাজার,** গোঘাট, হুগলী। (খ) রাধা-দামোদর (গ) দাস পরিবার। (ঘ) (ঙ) ঐ। (চ) আরামবাগ বা কামারপুকুর থেকে নিজ-ব্যবস্থায়।

১৮৮। (ক) **পাঁচড়া,** জামালপুর, বর্ধমান। (খ) শিব (অধুনা পরিত্যক্ত) (গ) ভট্টচার্য পরিবার (অধুনা লুপ্ত) (ঘ) অনু ২০/২২ ফুট উচ্চতা। একদুয়ারী। প্রবেশদ্বারের দুপাশে টেরাকোটা দ্বারী ও দ্বারশীর্ষে টেরাকোটা। অতি জীণ ও ভগ্নদশা। (ঙ) ঐ। (চ) হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের মশাগ্রাম স্টেশান থেকে রিক্সায়—গ্রামের প্রাক্তন জমিদার ভট্টাচার্যদের বড়বাড়ি এলাকায়।

১৮৯। (ক) **পাথরা,** মেদিনীপুর সদর, পশ্চিম মেদিনীপুর, (খ) ধর্ম, (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। নিরলংকার। (ঙ) ঐ। (চ) খড়গপুর থেকে মেদিনীপুর বাসে আমতলায় গিয়ে ট্রেকারে—গ্রামে ঢুকে কাঁসাইযের তীরে প্রথমেই দেখা যাবে।

১৯০। (ক) ঐ, (খ) শিব, (গ) মজুমদার পরিবার। (ঘ) আনু. ২০/২২ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট কিছু টেরাকোটা অবশিষ্ট। (ঙ) ঐ (১৮২৮?), (চ) সামান্য এগিয়ে, নবরত্নের বিপরীতে। বাঁধ রাস্তা ঘেষে।

১৯১। (ক) ঐ, (খ) শিব, (ঘ) আনু. উচ্চতা ২৫ ফুট। নিরলংকার।(ঙ) ঐ। (চ) সামান্য তফাতে— পুকুরপাড়ে।

১৯২। (ক) **চন্দননগর** (মিত্রপাড়া), হুগলী। (খ) শিব। (ঘ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতা। টেরাকোটা সমৃদ্ধ। অতি জীর্ণ। ভগ্ন। (ঙ) ঐ। (চ) চুঁচুড়া ঘড়িমোড় থেকে রিক্সা, বুড়োশিবতলার পরে।

১৯৩। (ক) **নৈহাটি,** (পূর্ব কাঁঠালাপাড়া), (খ) শিব (গ) (ঘ) আনু.২০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। সংস্কৃত। নিরলংকার। অদূরে বঙ্কিমচন্দ্রের বসত-বাড়ির প্রাচীর-লাগোয়া আটচালা শিব ও তার বিপরীতে সামান্য রাধাবল্লভের ১৮ শতকীয় দালান মন্দির। (ঙ) ঐ। (চ) শিয়ালদহ-নৈহাটি লাইনের নৈহাটি ষ্টেশান-এর পূব দিকে— রেল কলোনির মধ্য দিয়ে দক্ষিণে হেঁটে।

১৯৪। (ক) **চারকলগ্রাম** (চ্যাটার্জীপাড়া), নানুর, বীরভূম। (খ) শিব। (গ) চট্টোপাধ্যায় পরিবার। (ঘ) ২০/২২ ফুট উচ্চতাসম্পন্ন। টেরাকোটা-মণ্ডিত। (ঙ) ঐ। (চ) নানুর থেকে ভ্যানরিক্সা।

পঞ্জি—৮(ক)

জোড়া পঞ্চরত্ন এবং অন্যান্য রীতির মন্দিরগুচ্ছের সঙ্গে পঞ্চরত্ন

(ক) জোড়া পঞ্চরত্ন ঃ

১। (ক) **বীরনগর,** মুস্তৌফি পাড়া, রাণাঘাট, নদীয়া; (খ) পরিত্যক্ত। (গ) চিন্তামণি মিত্রমুস্তৌফি। (ঘ) জীর্ণ ও ভগ্ন। (ঙ) ১৭৯৮। (চ) শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর লাইনের বীরনগর থেকে রিক্সায়। সবুজ সঙ্ঘ ক্লাবের লাগোয়া।

২। (ক) **রামজীবনপুর,** (বাজারপাড়া- কালীতলা), চন্দ্রকোণা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) শিব এবং লক্ষ্মী-জনার্দন (গ) হোতা পরিবার (ঘ) আনু.২০ ফুট করে উচ্চতা সম্পন্ন। (ঙ) ১৯ শতকের প্রথম দিক। (চ) চন্দ্রকোণা থেকে ক্ষীরপাই হয়ে বাসে বাসস্ট্যাণ্ড থেকে রিক্সায় সব দেখানোর চুক্তিতে।

৩। (ক) **বোড়াগড়ি,** (খ) শিব (গ) (ঘ) একই বেদীতে, পাশাপাশি। আনু.২২ ফুট। নিরলংকার। একদুয়ারী। (ঙ) ১৯ শতক (চ) হাওড়া বর্ধমান মেইন লাইনের বৈঁচি ষ্টেশান থেকে; সরাসরি রিক্সায়—অথবা বর্ধমানমুখী লোকাল বাসে যাত্রা করে অল্পক্ষণের মধ্যেই বেলতলা স্টপেজে নেমে গ্রামে ঢোকা পথে।

৪। (ক) **হালিশহর,** (রামপ্রসাদের ভিটে-র পথে), (খ) শিব (গ) (ঘ) একই বেদীতে মুখোমুখি। আনু.২০/২২ ফুট করে উচ্চতা-সম্পন্ন। ১৯৯৯-এ আমূল সংস্কৃত। সংস্কারকালে মোটা দাগের কিছু সিমেন্টর ভাস্কর্য, রঙীন ছবি, টালি, অকারণে বসিয়ে গাম্ভীর্যের হানি ঘটানো হয়েছে। একদুয়ারী। (ঙ) ঐ। (চ) শিয়ালদহ-নৈহাটি রাণাঘাট লাইনের নৈহাটি স্টেশানের পাশ থেকে ৮৫ নম্বর বাসে (কাঁচড়াপাড়াগামী) যাত্রা করে অতি সহজেই ।

৫। (ক) **আইশমালী,** (খ) শিব (গ) মুখোপাধ্যায় পরিবার। (ঘ) আনু. ২৭/২৮ ফুট করে উচ্চতা-সম্পন্ন। রেখ দেউলের মত আকৃতির চূড়া। পঙ্খের কিছু নকাশী কাজ। (ঙ) ঐ। (চ) শিয়ালদহ মেইন লাইনের রাণাঘাট জংসন থেকে বনগাঁগামী ট্রেনে যাত্রা করে গাংনাপুর স্টেশানে নেমে নিজব্যবস্থায়।

৬। (ক) **কালীঘাট,** (অঘোর দত্ত ঘাট), ১৬২ কালীঘাট রোড, কলকাতা- (খ) শিব (গ) অঘোর দত্ত (ঘ) আনু.৩৫/৩৬ ফুট করে উচ্চতা-সম্পন্ন। খাঁজকাটা রেখাদেউলের আকৃতির চূড়া। আদিগঙ্গার পারে। (ঙ) ঐ।

৮(খ) : জোড়া পঞ্চরত্ন + একটি আটচালা

(ক) **ইলছোবা,** পাণ্ডুয়া, হুগলী। (খ) শিব, (ঘ) পাশাপাশি একই বেদীতে দুটি আনু.

৩৫/৩৬ ফুট উচ্চকার পঞ্চরত্ন। দুটিই টেরাকোটা (জীর্ণ) সম্পন্ন—একই বারান্দার পূব কোণে একটি নাতি বৃহৎ আটচালা। পঞ্চরত্ন দুটির পশ্চিমেরটি একদুয়ারী। (ঙ) ঐ। (চ) হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনের খন্যান অথবা পাণ্ডুয়া ষ্টেশান থেকে রিক্সায়, সরাসরি।

৮ (গ) : এক সারিতে তিনটি পঞ্চরত্ন

(ক) **পাথরা,** মেদিনীপুর সদর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শিব। (গ) বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। (ঘ) আনু. ২০/২২ ফুট উচ্চতার, তিনটি পাশাপাশি মন্দিরেই টেরাকোটায় বৃহৎ দ্বারপাল। (ঙ) উনিশ শতক। (চ) খড়গপুর-মেদিনীপুর বাসে আমতলা—এখান থেকে ট্রেকার।

৮ (ঘ) : দেউল + পঞ্চরত্ন + আটকোণা দেউল

(ক) **শ্রীবাটী,** কাটোয়া, বর্ধমান, (খ) যথাক্রমে ঃ চন্দ্রেশ্বর, ভোলানাথ এবং শঙ্কর শিব। (গ) চন্দ পরিবার (ঘ) একই ভিত্তিবেদীতে—সামনের তথা চত্বরের প্রবেশপথের দুদিকে ও মাঝে আনু.২৫/২৬ ফুট উচ্চতার তিনটি স্থাপত্য। সামনে দাঁড়ালে বাঁয়েরটি প্রথাগত বীরভূম-বর্ধমানরীতির দেউল, মাঝেরটি পঞ্চরত্ন ও ডানেরটি আটকোণা দেউল। একই সিঁড়ি-দ্বারা পরস্পর-যুক্ত। তিনটি মন্দিরই অপূর্ব টেরাকোটা-শোভিত। পঞ্চরত্ন ভোলানাথ শিব মন্দিরটি ব্যতিক্রমী ত্রিরথ-রীতিতে নির্মিত এবং উচ্চতম। (ঙ) ১৮৩৬ (চ) হাওড়া-কাটোয়া লাইনের কাটোয়া থেকে সিঙ্গি-শ্রীবাটি-ক্ষীরগ্রাম-কৈচর বাসে শ্রীবাটি।

৮ (ঙ) : আটচালা + পঞ্চরত্ন + আটচালা

(ক) **উত্তরপাড়া,** (তারামন্দির) হুগলী। (খ) সিদ্ধিনাথ, পঞ্চানন এবং শঙ্করনাথ শিব। (গ) পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়। (ঘ) একই বেদীতে পাশাপাশি—আনু. ২০/২২ ফুট করে উচ্চতা-সম্পন্ন, নিরলংকার। সাধারণ্যে 'তারামন্দির' নামে পরিচিত। সংস্কৃত। (ঙ) ১৭৯৪-৯৫ (চ) হাওড়া-ব্যাণ্ডেল লাইনের উত্তরপাড়া স্টেশান থেকে রিক্সায় অতি সহজে। আবার হাওড়া থেকে অসংখ্য বাসে—জি.টি, রোডের 'তারামন্দির' স্টপেজ।

৮ (চ) : সরলরেখ ছাদের পঞ্চরত্ন + তিনটি আটচালা

(ক) **পানিহাটি,** (ঘোষপাড়া) ত্রাণনাথ ব্যান্যার্জী রোড, খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা। (খ) ভবানী (ত্রাণনাথ বাবুর কালী বাড়ি)। (গ) ত্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। (ঘ) আনু.৪০/৪৫ ফুট উচ্চতার। সমতল ছাদের রাজসিক ও সুউচ্চ পাঁচ খিলান (চারপাশেই—আটকোণের আটটি খিলান বৃহত্তর) বারান্দা। দ্বিতলে পঙ্খের কাজ রক্ষিত। মাঝের চূড়াটি আটকোনা ও অতি বিপুল পরিধির—খাঁজকাটা শিখার—চারকোণের চারচূড়া তুলনায় ছোট হলেও বিপুল পরিধির ও একই রকম। মন্দিরের সামনে দক্ষিণ পাশে এক সারিতে তিনটি আটচালা। মাঝেরটি বৃহত্তম। গঙ্গাতীরে, অপূর্ব পরিবেশে। (ঙ) ১৯ শতকের শেষে। (চ) কলকাতার চৌরঙ্গী বা শ্যামবাজার থেকে বারাকপুরগামী বাসপথের সোদপুর 'মীনা' স্টপেজ থেকে রিক্সায়।

৮ (ছ) : পঞ্চরত্ন + ছয়টি আটচালা + বৃহৎ নাটমণ্ডপ

(ক) **গিরিবালা দাসীর রাধাগোবিন্দ কুঞ্জ,** (খ) কৃষ্ণ, রাধা গনেশ ও শিব। (গ) গিরিবালা দাসী (রানী রাসমণির দৌহিত্রী)। (ঘ) আনু.৪০ ফুট উচ্চতার ও বিপুল পঙ্খের কাজের সমারোহ শোভিত মূল মন্দির। সামনে করিন্থীয় ধাঁচের ৩২ টি স্তম্ভের বিশাল নাটমন্দির। পশ্চিমে বা গঙ্গার দিকে মাঝে প্রকাণ্ড ঘাটে যাওয়ার জন্য পাশ্চাত্য ধাঁচের বিশাল দ্বার—তার দুপাশে দুটি বেদীতে এক সারে ৩+৩ ছয়টি আটচালা—দক্ষিণেশ্বর, রাজেশ্বর, গোপেশ্বর, তারকেশ্বর, ভুবনেশ্বর ও গিরিশ্বর শিব। সব কটিতেই পঙ্খের ভাস্কর্য সামনে ও পিছনে। দুদিকে সুউচ্চ নহবৎ—উত্তরেরটি জীর্ণ। (ঙ) ১৯১১-১২। (চ) কলকাতা থেকে বারাকপুর বা সোদপুর, খড়দহ গামী বাসে এসে মোল্লার হাট স্টপেজে নেমে পশ্চিম বা গঙ্গামুখী রাস্তায় সোজা—রাস্তা যেখানে গঙ্গাতীরের রাস্তায় মিশবে, ঠিক তার বাঁ কোণে।

৮ (জ) : পঞ্চরত্ন + বৃহৎ নবরত্ন + পঞ্চরত্ন

(ক) **৯৩, টালিগঞ্জরোড** (খ) গোপাল। (গ) প্যারিলাল ও মণিমোহন মন্ডল। (ঘ) (ঙ) ১৮৪৬। (চ) শিয়ালদহ-বজবজ শাখার টালিগঞ্জ স্টেশন থেকে রিক্সায়।

চারচালা + আটকোনা আটচালা + বৃহৎ পঞ্চরত্ন + আটকোণা আটচালা + আটচালা

(ক) **মসাগ্রাম,** প্রাণেশ্বরতলা, বর্ধমান, (খ) প্রাণেশ্বর শিব; (ঘ) সংস্কৃত; (ঙ) ১৯ শতক; (চ) বর্ধমান লাইনের মসাগ্রাম থেকে রিক্সায়।

৮ (ঝ) : সরলরেখ বা সমতল ছাদবিশিষ্ট পঞ্চরত্ন

১। (ক) **হাসিমপুর,** (নুরদীপুর পাড়া), কেশিয়াড়ী, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) রাধাকৃষ্ণ। (গ) সাউ পরিবার। (ঘ) একতলা দালানে পাঁচটি চূড়া। সাকুল্যে উচ্চতা ২৫/২৬ ফুট। নিরলংকার। ব্যতিক্রমী। (ঙ) **১৯ শতক** (চ) হাওড়া থেকে ট্রেণে খড়গপুর। খড়গপুর ষ্টেশান-সংলগ্ন বাসস্ট্যাণ্ড থেকে বাসে কেশিয়াড়ী—এখানে থেকে রিক্সায় সরাসরি।

২। (ক) **মানকর,** বর্ধমান (খ) লক্ষ্মীজনার্দন। (ঘ) দুপাশে ত্রিখিলান প্রবেশ। বৃহৎ রেখ মন্দিরের মত রত্ন। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) বর্ধমান-আসানসোল লাইনের মানকর থেকে রিক্সা—বুড়ো শিবতলার পরের পথে।

৩। (ক) **করন্দা,** মন্তেশ্বর, বর্ধমান। (খ) শিব (গ) (ঘ) আনু.২৮ ফুট উচ্চতা। নিচের চারকোণা দালানটি আনু.১৩/১৪ ফুট উচ্চতার। একদুয়ারী বা এক খিলান দালানের সারা সম্মুখগাত্র টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। রেখ দেউলের আদলে ও তুলনায় দীর্ঘতর পাঁচটি চূড়া। বলা বাহুল্য মধ্যেরটি উচ্চতা ও পরিধিতে বৃহত্তম। (ঙ) ঐ। (চ) হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনের মেমারী ষ্টেশান-লাগোয় বাস-স্ট্যাণ্ড থেকে মন্তেশ্বরের বাসে সরাসরি করন্দা।

৪। (ক) **বেগুনিয়া,** মেমারী, বর্ধমান। (খ) শিব। (গ) চক্রবর্তী পরিবার। (ঘ) আনু.১৮/২০ ফুট

উচ্চতার। নিচের একতলা দালান ১০/১২ ফুটের মত উঁচু। সামান্য টেরাকোটা। (ঙ) ঐ। (চ) [ম্যাকাচিয়ন-প্রদত্ত তথ্য অনুসারে, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫০]

দ্রঃ একটি চমৎকার ও বিশিষ্ট উদাহরণ উত্তর ২৪ পরগণার পানিহাটির 'ত্রাণনাথ ব্যাণার্জীর কালীবাড়ী' সঙ্গে তিনটি আটচালা থাকায় ইতোমধ্যে গুচ্ছ-মন্দির সারণিতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

৮ (ঞ) : একতলা দালানের উপর বসানো পঞ্চরত্ন ঃ

১। (ক) **পাইকভেড়ি,** (গ্রীষ্মাবাস), ভগবানপুর, পূর্বমেদিনীপুর। (খ) শ্যামসুন্দর। (গ) বেরা পরিবার। (ঘ) একতলা দালান ও তার উপরে বসানো পঞ্চরত্ন মিলে উচ্চতা আনু.৪৫/৪৬ ফুট। নিরলংকার। (ঙ) ১৭৩৮। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের মেছেদা ষ্টেশান-সংলগ্ন বাসস্ট্যাণ্ড থেকে ভগবানপুরগামী বাসে বাড়ভাগবানপুর—এখানে থেকে হেঁটে বা ভ্যানরিক্সায়। বেরা পরিবারের শামসুন্দরের শিখর দেউল (শীতাবাস)-এর পাশে।

২। (ক) **ঈশ্বরপুর,** ঘাটাল, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) শ্রীধর। (গ) ঘোষ পরিবার। (ঘ) একতলা দালান ও উপরকার পঞ্চরত্ন উভয়ে মিলে উচ্চতা আনু.৩৫ ফুট। দুপাশে ও কার্ণিশের তলায় একসারি করে জীর্ণ টেরাকোটা। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) ঘাটাল থেকে কুঠীঘাট (ভায়া, রাধানগর)-গামী বাসে গিয়ে সরাসরি ঈশ্বরপুর স্টপেজে নেমে গ্রামে চলা পথে সোজা হেঁটে গেলে দৃষ্ট হবে।

৩। (ক) **বসন্তপুর,** দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) শ্রীধর। (গ) মান্না পরিবার। (ঘ) একতলা দালান ও উপরকার পঞ্চরত্ন মিলে আনু.৩৩/৩৪ ফুট। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) পাঁশকুড়া ঘাটাল বাস পথের বেলতলা থেকে ভ্যানরিক্সা।

৪। (ক) **পিংলা,** পশ্চিম-মেদিনীরপুর। (খ) রাধাকান্ত। (গ) চৌধুরী পরিবার। (ঘ) একতলা দালান ও উপরকার পঞ্চরত্ন মিলে উচ্চতা আনু.৫০ ফুট। দু- একটি চূড়া ভগ্ন। পঞ্চরত্নের সম্মুখগাত্রে কিছু পঙ্খের কাজ। অঙ্গনে প্রবেশের আগে পথের ধারে রাসমঞ্চ। (ঙ) ১৯ শতক (?) (১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত) (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বালিচক ষ্টেশান থেকে বাসে বা ট্রেকারে—গ্রামে ঢোকার মুখে রাস্তার বড় বাঁকের সামান্য আগে, বাসরাস্তা থেকেই দেখা যায়।

৫। (ক) **মনোহরপুর,** ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) লক্ষ্মী-জনার্দন। (গ) সিংহরায় পরিবার। (ঘ) ত্রিখিলান দালানের উপরে পঞ্চরত্ন। জীর্ণ। (ঙ) ঐ। (চ) ঘাটাল থেকে রিক্সা।

৮ (ট) : দ্বিতল পঞ্চরত্ন

(ক) **সোনাডাঙা,** নাকাশীপাড়া, নদীয়া। (খ) অন্নপূর্ণা। (গ) সিংহরায় পরিবার, কারিগর : প্রাণকৃষ্ণ দাস। (ঘ) দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সমান (আনু. ২৪ ফুট) বর্গক্ষেত্রে ত্রিখিলান ও বক্রচাল প্রথম তলের (দ্বিতলের মেঝের জন্য দু পাশ থেকে দেওয়াল তোলা হলেও আলংকারিক বক্রতা

অক্ষুণ্ণ আছে) উপরে ত্রিখিলান বক্রচাল দ্বিতল ও তার উপরে রেখ দেউলের আকারে প্রথাগত পাঁচটি রত্ন, একতলা পঞ্চরত্নে যেমন হয়। মন্দিরটি একতলা হলে খাঁটি পঞ্চরত্ন হত। পশ্চিমবঙ্গে এমন স্থাপত্য দ্বিতীয়টি নেই। সিমেন্টের সূক্ষ্মতাবর্জিত স্থাপত্যগুলি পরে যুক্ত হয়েছে। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের সোনাডাঙা থেকে পশ্চিমে জাতীয় সড়কের উপর. তিনচারা মোড় থেকে সোজা ভিতরপানে হেঁটে। কৃষ্ণনগর বা বেথুয়াডহরী থেকে বাসে এলে ঐ তিনচারা স্টপ।

৮ (ঠ) : দ্বিতল দালানের উপর বসানো পঞ্চরত্ন

বীরলোক, (সিংবাহিনীতলা), খানাকুল, হুগলী। (খ) সিংহবাহিনী। (গ) খান পরিবার। (ঘ) দ্বিতল দালান ও তার উপরে বসানো পঞ্চরত্ন মিলে আনু.৫০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। নিরলংকার। সামনের টিনের চালের বৃহৎ নাটমণ্ডপ পরে যুক্ত। (ঙ) ১৮ শতকের শেষে। (চ) আরামবাগ থেকে 'গড়ের হাট'-গামী বাসে খানাকুল, এখান থেকে রিক্সায়।

৮ (ড) : দ্বিতল দালানের ছাদে পাঁচটি চূড়া বা 'রত্ন'

(ক) **মেদিনীপুর শহর,** (মীরবাজার), পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) রাধাকান্ত (হনুমান মন্দির নামে পরিচিত)। (গ) (ঘ) আনু. ৩০/৩৫ ফুট সাকুল্যে উচ্চতা। উভয় তলই ত্রিখিলান বারান্দা সম্পন্ন। প্রথম তলটি সমতল ছাদের, দ্বিতীয় তল বক্রচাল। রেখ দেউল আকৃতির পাঁচটি চূড়া। মাঝেরটি যথারীতি বৃহত্তর। সামান্য কিছু পঙ্খের কাজ। লক্ষণীয় যে এখানে পূর্বোক্ত বীরলোকের মত দ্বিতল দালানের উপর পঞ্চরত্ন মন্দির বসানো হয়নি—দ্বিতলের বক্রচাল ছাদেরই চারকোণে চারটি ও মাঝে বৃহত্তর একটি, মোট পাঁচটি চূড়া বসানো হয়েছে। (ঙ) ১৮ শতকের শেষে। (চ) মেদিনীপুর স্টেশান/বাসস্ট্যাণ্ড থেকে রিক্সায়।

৮ (ঢ) : মুর্শিদাবাদ-রীতির পঞ্চরত্ন

১। (ক) **কলেশ্বর,** ময়ূরেশ্বর, বীরভূম। (গ) কলেশ্বর শিব। (ঘ) অতি বৃহৎ। উচ্চতা আনু. ৬০ ফুট। পূর্ণ সংস্কৃত। কেন্দ্রীয় চূড়াটি বৃহৎ রেখ দেউলের মত, চারকোণের চারটি তুলনায় অনেক ছোট। ঘেরা ক্ষেত্রে আরও ছটি মন্দির। (ঙ) ১৮ শতক। (চ) মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর বা কান্দী থেকে রামনগরের বাসে কলেশ্বর। রিক্সা।

২। (ক) **যুগশ্বরা,** (স্থানীয় উচ্চারণে যুগসরা), বড়ঞা, মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব। (গ) (ঘ) ত্রিমন্দির। একই বেদীতে। দুদিকে দুটি ছোট চারচালার মাঝে উচ্চ পঞ্চরত্নটি। উচ্চতা ৩০ ফুটের কাছাকাছি।.বৃক্ষাক্রান্ত ও জীর্ণ। সামান্য পঙ্খের কাজের আভাস অবশিষ্ট। একদুয়ারী। (ঙ) ১৮ শতকের শেষে। (চ) শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের বহরমপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে সরাসরি বাসে গিয়ে বড়ঞা থানার সামনে নেমে ভ্যান রিক্সায়।

৩। (ক) **নসীপুর,** লালবাগ (মুর্শিদাবাদ), মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব। (গ) পলাশীর যুদ্ধের বীর মোহনলালের স্ত্রী রাণী স্বর্ণদেবী প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত। (গ) আনু. ২৭/২৮ ফুট উচ্চতা। মূল বৃহৎ চূড়াটি মুর্শিদাবাদে পরিচিত উল্টানো পদ্মের আকৃতির। চারকোণের চারটি ক্ষুদ্র চূড়া ছোট উল্টানো পদ্ম-চূড়াসম্পন্ন মন্দিরের মত। একদুয়ারী। নিরলংকার। (ঙ) ১৮ শতকের শেষে। (চ) শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনে মুর্শিদাবাদ ষ্টেশান থেকে রিক্সায় বা ঘোড়ার গাড়ীতে রামানুজ আখড়ার দেওয়াল-ঘেষা গলিতে।

৪। (ক) **সৈদাবাদ,** মহারাজ নন্দকুমার রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব। (গ) (ঘ) আনু. ১৫/১৬ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। পঙ্খের কাজে সজ্জিত তবে এর অনেকটাই বিনষ্ট। ছোট কিন্তু সুন্দর মন্দির। মাঝের মূল চূড়া উল্টো পদ্মের আকৃতির, চারকোণের চারটি ক্ষুদ্র চূড়াও তাই। (ঙ) ১৮ শতকের শেষে বা ১৯ শতকের গোড়ায়। (চ) শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের বহরমপুর বা কাশিমবাজার ষ্টেশান থেকে রিক্সায়। কৃষ্ণেন্দুহোতা প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ চারচালার—লাগোয়া গলিতে।

৫। (ক) **লালবাগ,** (ইচ্ছাগঞ্জ, মোগল-টুলি), (খ) শিব (পরিত্যক্ত)। (গ) রথবিহারী লালা (বিহার থেকে আগত বণিক)। (ঘ) মূল মন্দির আনু. ৪৫/৪৬ ফুট ও সামনের উল্টো পদ্ম শিখরের জগমোহন আনু. ২৫/২৬ ফুট উচ্চ। চারপাশের বারান্দা ভগ্ন। মূল মন্দিরের সুউচ্চ মাঝের চূড়াটিও উল্টোপদ্ম রীতির। চারকোণের চারটি ক্ষুদ্র চূড়া ভগ্ন। পঙ্খ-অলংকৃত। মৃত্যুপথে এক অসামান্য মন্দির। (ঙ) ১৯ শতকের মধ্যভাগ। (চ) মুর্শিদাবাদ স্টেশান থেকে ইচ্ছাগঞ্জ— মণীন্দ্রমোহন প্রাথমিক বিদ্যালয়-এর বিপরীত দিকের সংকীর্ণ পথে সামান্য দূরত্বে।

৬। (ক) **সাহানগর,** লালবাগ (মুর্শিদাবাদ), (খ) শিব ও সিংহবাহিনী। (গ) বর্ধন পরিবার। (ঘ) আনু. ৪৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। চারদিকে পাঁচ-খিলান প্রদক্ষিণ বারান্দা। আটকোণা মূল চূড়াটি পেঁয়াজকৃতি। চার কোণে চারটি ক্ষুদ্র চূড়ার আদল তুলসী মঞ্চের মত। মূল চূড়ার নিম্নদেশেও নকল পাঁচ খিলান। (ঙ) ১৯ শতকের মধ্যভাগ। (চ) মুর্শিদাবাদ স্টেশন থেকে রিক্সায়—গঙ্গাতীরে চোখা চিমনির মত চূড়ার কালীমন্দির ঘেষা গলির শেষে।

৭। (ক) **লালবাগ,** ইচ্ছাগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব (পরিত্যক্ত) (গ) (ঘ) আনু. ২০/২২ ফুট উচ্চতা। চাবদিকে ত্রিখিলান প্রদক্ষিণ বারান্দা। মূল চূড়া স্থূল পেঁয়াজাকৃতি। চারকোণের চারটি ক্ষুদ্র চূড়া। জীর্ণদশা গ্রস্ত। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) পূর্বোক্ত লালবাগ-নসীপুর পথে 'নবাব বাহাদুর্স ইনষ্টিটিউশান' (স্থানীয়ভাবে 'নবাব স্কুল') অতিক্রম করেই রাস্তার ডান পাশে।

৮। (ক) **খাগড়া,** দেওয়ানগঞ্জ রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। (খ) জোড়া শিব। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) পূর্বোক্ত বহরমপুর বা কাশিমবাজার ষ্টেশান থেকে রিক্সায়।

৯। (ক) **নসীপুর,** লালবাগ (মুর্শিদাবাদ), মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব (পরিত্যক্ত) (গ) (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। মূল চূড়া আটকোণা এবং উল্টো পদ্ম-রীতির। সামনে প্রায় একই রীতির জগমোহন (প্রায় ১৫/১৬ ফুট। পত্রাকৃতি খিলান। চার কোণের চারটি চূড়া লুপ্ত বা

প্রায় লুপ্ত। মৃত্যুদশা প্রাপ্ত। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) পূর্বোক্ত লালবাগ-নসীপুর পথের নসীপুর রাজবাড়ির সামনেকার দ্বিতল নহবৎখানার ঠিক বিপরীতের পাড়ায় ঢোকা পথে সামান্য এগোলেই দেখা যাবে।

১০। (ক) ঐ। (খ) জৈন। (গ) (ঘ) আনু. ৪০/৪৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। মূল বৃহৎ চূড়া পেঁয়াজাকৃতি কিন্তু শীর্ষদেশ চোখা। সামনে সুদৃশ্য একতলা দালানরীতির জগমোহন (বৃহৎ) (ঙ) ১৯ শতক। (চ) পূর্বোক্ত নসীপুর রাজবাড়ির সামনে দিয়ে চলা পথে, 'জগৎশেঠের' দালান ক্ষেত্রে।

১১। (ক) **রোশনিবাগ,** (রাইটনবাগ), মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব। (গ) মহারাষ্ট্রবাসী পণ্ডিত পরিবার। (ঘ) আনু. ২০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন, জীর্ণ হয়ে এলেও এখনও মোটামুটি ভাল অবস্থায়, কিছু পঙ্খের কাজ। (ঙ) গর্ভগৃহের দ্বারশীর্ষের হিন্দী লিপি অনুসারে ১৮৯৩। (চ) মুর্শিদাবাদ স্টেশন থেকে রিক্সায় ওমরাহগঞ্জ বা ইচ্ছাগঞ্জ ঘাট থেকে গঙ্গা পেরিয়ে নবাব সুজাউদ্দীনের মসজিদ ও সমাধিক্ষেত্রের পিছনে।

১২। (ক) **নসীপুর,** মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব। (গ) রায় পরিবার। (ঘ) ৪০/৪৫ ফুট উচ্চতার, মুর্শিদাবাদা-রীতির হলেও তুলনায় বৃহৎ উল্টোপদ্ম শিখর-এর আকৃতির চারকোণে চারটি শিখর—কেন্দ্রীয় শিখরটি বৃহত্তম কিন্তু একই ধারার। —ক্ষেত্রে একটি ভগ্ন চারচালা ও একটি ছোট দেউল। (ঙ) বিশ শতকের প্রথমে। (চ) রাজবাড়ির নহবৎ-খানার বিপরীত পথে ঢুকে ডানের গলি ধরে সামান্য গিয়ে বাঁয়েব গলিতে।

পঞ্জি—৯

নবরত্ন
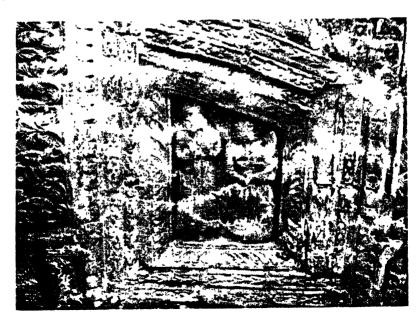
অন্যরকম উল্লেখ না থাকলে ঃ (ক) উপাদান—ইট (খ) বক্রচাল (গ) ত্রিখিলান (ঘ) সচরাচর দৃশ্যমান পশ্চিমবঙ্গীয় রীতি।

(ক) একক বা শুধুমাত্র রাসমঞ্চ-সহ নবরত্ন ঃ

১। (ক) **মালিয়াড়া,** বড়জোড়া, বাঁকুড়া। (খ) সম্ভবত বৈষ্ণব ধারার। (গ) বাসুদেব আধুর্য। (ঘ) পাথরের স্থাপত্য, বর্তমানে গর্ভগৃহের দেওয়াল চিহ্নই দাঁড়িয়ে, ক্ষেত্রে পড়ে থাকা খোদিত পাথরের প্রাচুর্য হতে মনে হয় যথেষ্ট অলংকৃত ছিল। (ঙ) ষোড়শ শতকের শেষে বা সপ্তদশ শতকের গোড়ায়। (চ) দুর্গাপুর থেকে বাসে সরাসরি—রাজনারায়ণ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে।

২। (ক) **ইছাপুর,** গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগণা। (খ) গোবিন্দ। (গ) কুশদ্বীপের অধিপতি রঘুনাথ চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত ও নির্মাতা ঢাকার প্রখ্যাত স্থপতি আসান বক্স। (ঘ) বিভিন্ন সাক্ষ্য হতে জানা যায় যে প্রখ্যাত স্থপতি আসান বক্স কর্তৃক নির্মিত মন্দিরটি ছিল বৃহৎ নবরত্ন ও অসামান্য কারুকার্য শোভিত। ২০০৯-এর গোড়ায় ঢিবির মাটি কেটে পুরাতত্ত্ব বিভাগ দেওয়ালগুলি উন্মুক্ত করায় মনোহর কিছু টেরাকোটা দৃশ্যমান। সামনে ছাড়াও দুপাশে প্রবেশপথ। সুউচ্চ। সবকটি রত্নই লুপ্ত। (ঙ) ষোড়শ শতকের শেষে বা সপ্তদশ শতকের গোড়ায়। (চ) শিয়ালদহ-বারাসাত-বনগাঁ লাইনের মসলন্দপুর অথবা গোবরডাঙ্গা স্টেশন থেকে ভ্যানরিক্সায়।

৩। (ক) **রঘুনাথবাড়ি,** গড়বেতা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) রঘুনাথ। (গ) জনশ্রুতি অনুসারে বগড়ী পরগণার প্রথম রাজা গজপতি সিংহের প্রপৌত্র রঘুনাথ সিংহ। (ঘ) মাকড়া পাথরে নির্মিত মন্দির ৪½/৫ ফুট ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। উচ্চতা আনু. ৪০/৪২ ফুট। সচরাচর দৃশ্যমান নবরত্ন মন্দিরের মত দ্বিতল নয়— একতলার উপরেই নয়টি চূড়া বসানো আছে এইভাবে:

৬ ৭ ৮
৪ ৯ ৫
১ ২ ৩

দুপাশের দুটি চূড়া রেখ দেউলের মত অন্যগুলি (অর্থাৎ ১,৩,৬ এবং ৮) এবং তাদের মাঝের চূড়াগুলি (অর্থাৎ ২,৭,৮ এবং ৫) দোলমঞ্চের মত। কেন্দ্রীয় বা মূল চূড়াটি (৯) অতি বৃহৎ ও আকৃতিতে খাঁজকাটা শিখর-সম্পন্ন রেখ দেউলের মত। একতল বিশিষ্ট হ'লেও বক্রচাল ও ত্রিখিলান। পাথর-খোদাই (পঙ্খের প্রলেপসহ) কাজে সমৃদ্ধ। (ঙ) ১৭ শতকের মধ্যভাগ। (চ) মেদিনীপুর শহর থেকে বাসে গড়বেতায় গিয়ে বাস পাল্টিয়ে ফতেসিংপুর-এর নিকটবর্তী কৃষ্ণনগর থেকে শিলাবতী পেরিয়ে।

৪। (ক) **পালপাড়া, পটাশপুর, পূর্ব** মেদিনীপুর। (খ) কিশোরজীউ। (গ) রায়-মহাপাত্র পরিবার। (ঘ) আনু. ৪৫ ফুট উচ্চতা ও প্রবেশদ্বারের উপর টেরাকোটা-সম্পন্ন। (ঙ) ১৭ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। (চ) হাওড়া-খড়্গপুর লাইনের মেছেদা থেকে বাজকুল-গামী বাসে সরাসরি।

৫। (ক) **জয়দেব-কেন্দুলী,** ইলামবাজার, বীরভূম। (খ) রাধা-বিনোদ (গ) বর্ধমানের মহারাণী নৈরাণী দেবী। (?)। (ঘ) আনু. ৫০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন এবং জীর্ণ হ'লেও অত্যন্ত

আকর্ষণীয় টেরাকোটা-মণ্ডিত সম্মুখভাগ-বিশিষ্ট। (ঙ) ১৬৮৩—১৬৯৪। (চ) বোলপুর থেকে (ইলামবাজার হ'য়ে) জয়দেব-কেন্দুলীর বাসে সরাসরি।

প্রাসঙ্গিকী

(i) জয়দেব-কেন্দুলীর রাধাবিনোদ বিগ্রহ বা মন্দিরের সঙ্গে জয়দেবের কোনও সম্পর্ক নেই। জনশ্রুতি অনুসারে জয়দেব তাঁর পূজিত বিগ্রহ 'রাধামাধব' বৃন্দাবনে নিয়ে যান, বর্তমান রাধাবিনোদ বিগ্রহ ও মন্দির অনেক পরবর্তী কালের। কথিত হয় যে 'রাধাবিনোদ' প্রতিষ্ঠিত ছিলেন অজয় নদের অপর পারে, শ্যামারূপার গড়ে। কালক্রমে শ্যামারূপার গড় জঙ্গলাকীর্ণ হ'য়ে প'ড়লে এবং কেন্দুলী থেকে অজয় পেরিয়ে নিত্য পূজার জন্য শ্যামারূপার গড়ে যেতে সেবায়েৎগণ ঘোর অসুবিধা বোধ করতে থাকলে বর্ধমানের রাজ-পরিবার রাধাবিনোদ বিগ্রহ শ্যামারূপার গড় থেকে আনিয়ে কেন্দুলীতে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসঙ্গত, একটি জনশ্রুতি অনুসারে বিনোদ নামে একজন রাজা আদিতে শ্যামারূপার গড়ে ঐ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন ব'লে বিগ্রহের নাম "রাধাবিনোদ"।

(ii) বর্ধমান-রাজ কীর্তিচাঁদের মাতা নৈরাণী দেবী (মতান্তরে, ব্রজকিশোরী) মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু লিপি-পাঠে বিভিন্ন পন্ডিত বিভিন্ন সিদ্ধান্তে আসায় প্রতিষ্ঠার বৎসররূপে ১৬৮৩, ১৬৮৪, ১৬৯২, ১৬৯৪ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন খ্রীষ্ট-বৎসর মেলে। আমরা ধ'রে নিচ্ছি ১৬৮৩ থেকে ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

(iii) পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের ১৯২৩-২৪-এর বাৎসরিক প্রতিবেদনে বলা হ'য়েছে যে জনশ্রুতি অনুসারে মন্দিরটি জয়দেবের বাস্তুভিটের উপরে নির্মিত এবং ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়াও স্থাপত্যগত ও টেরাকোটা অলংকরণের দিক থেকেও মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে (মূল ইংরাজী প্রতিবেদনের প্রাসঙ্গিক অংশ আচার্য বিনয় ঘোষ কর্তৃক উদ্ধৃত, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', প্রথম খন্ড, ১৯৯৫ মুদ্রণ, পৃ: ২৬০-৬১)।*

৬। (ক) **গোলগ্রাম,** ডেবরা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) সর্বমঙ্গলা। (গ) বাড়ারাম রায় (?) (আঞ্চলিক জমিদার)। (ঘ) আনু. ৫০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন—টেরাকোটা প্রায় লুপ্ত। (ঙ) ১৮ শতকের শুরুতে। (চ) পাঁশকুড়া থেকে বাসে লোয়াদা, সেখান থেকে ত্রিলোচনপুর-গামী বাসে সরাসরি।

৭। (ক) **ইছাপুর** (গোপীনাথপুর), ধনিয়াখালি, হুগলী। (খ) রামনাথেশ্বর শিব। (গ) রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার। (ঘ) মাঝারি। সংস্কারে টেরাকোটা লুপ্ত। (ঙ) ১৮ শতকের শরুতে। (চ) তারকেশ্বর-দশঘরা বাস/ট্রেকারে ইছাপুর হাসপাতাল স্টপ।

৮। (ক) **রাজবল্লভ,** পিংলা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) দধি-বামন। (গ) চন্দ্র পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা। কিছু নকাশী কাজ। দরজার কপাটে কাঠ খোদাই কাজ। (ঙ) ১৭৪০। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বালিচক ষ্টেশন থেকে ময়নাগামী বাসে ডাঙ্গরা— এখান থেকে ভ্যান রিক্সায় বা হেঁটে সরাসরি।

* বীরভূমের নানুর থানার **ব্রাহ্মণডিহির** (বোলপুর-কাটোয়া বাস) প্রায় বিনষ্ট নবরত্নটি সম্ভবত ১৭ শতকের আর এক উদাহরণ।

৯। (ক) **ইন্দাস,** (কৃষ্ণবাটিপাড়া), বাঁকুড়া। (খ) দামোদর (গ) গদাধর দাস। (ঘ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। সংখ্যায় কম হ'লেও ভাল মানের টেরাকোটা দর্শনীয়। (ঙ) ১৭৪৯। (চ) বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যাণ্ড থেকে সরাসরি বাসে।

১০। (ক) **কুশপাতা,** (কায়স্থপাড়া), ঘাটাল, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) লক্ষ্মী-জনার্দন। (গ) পালিত পরিবার। (ঘ) আনু. ৩৪/৩৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। অতি জীর্ণ। কিছু টেরাকোটা অবশিষ্ট। পাশে বড় মাপের রাসমঞ্চ। (ঙ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ। (চ) পাঁশকুড়া থেকে ঘাটালের বাসে যাত্রা ক'রে ঘাটালের সামান্য আগে কুশপাতা স্টপেজে নেমে রিক্সায়। ঘাটাল থেকেও রিক্সায় সরাসরি যাওয়া যায় সহজেই।

১১। (ক) **নারায়ণগড়,** হাঁদলাগড় রাজবাড়ি, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) ব্রজনাগর। (গ) হাঁদলাগড় রাজ-পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০/৩২ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও বহুল সংস্কৃত। (ঙ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ। (চ) খড়গপুর থেকে বেলদাগামী বাসে যাত্রা ক'রে নারায়ণগড় থানা স্টপেজে নেমে ভ্যানরিক্সায়।

১২। (ক) **বাদাড়-গোপীনাথপুর,** কেশপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) জগন্নাথ। (গ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও অত্যন্ত উৎকৃষ্ট টেরাকোটা-সম্ভারে সুসমৃদ্ধ। (ঘ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ। ম্যাকাচিয়ন ১৯ শতক ব'লে সন্দেহ করেছেন (প্রাগুক্ত, পৃ: ৫১)। (ঙ) পাঁশকুড়া থেকে ডেবরা হ'য়ে মেদিনীপুর শহরগামী বাসে যাত্রা ক'রে অর্জুনি স্টপেজে নেমে ভ্যানরিক্সা বা ট্রেকারে খানামোহন (৬ কি.মি.) গ্রামে গিয়ে সেখান থেকে কাঁসাই নদী পেরিয়ে ১½/২ কি.মি. হাঁটা।

১৩। (ক) **চন্দ্রকোণা,** (লালবাজার) পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ)রাধারসিক রায় (গ) আনু. ৫০ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট। দ্বিতলের চারদেওয়ালেই রিলিফ-পদ্ধতিতে অতিরিক্ত রত্ন বা চূড়ার অনুকৃতি। সঙ্গে নহবৎ ও রাসমঞ্চ। (ঘ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ। (ঙ) পাঁশকুড়া, ঘাটাল বা মেদিনীপুর শহর থেকে বাসে চন্দ্রকোণা টাউন স্টপেজ— এখান থেকে চন্দ্রকোণার সমস্ত মন্দিরগুলি দেখানোর চুক্তিতে রিক্সায়।

১৪। (ক) **সবং,** পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) শ্যামচাঁদ। (গ) পাহান পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। অতি জীর্ণ। সামান্য টেরাকোটা অবশিষ্ট। (ঙ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বালিচক ষ্টেশান থেকে বাসে সরাসরি সবং।

১৫। (ক) **ঐ** (খ) রঘুনাথ। (গ) রায় পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা ও টেরাকোটা-সম্পন্ন। (ঙ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ। (চ) ঐ। নিকটে।

১৬। (ক) **গোবিন্দপুর,** জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। (খ) শিব। (গ) জনশ্রুতি অনুসারে বর্ধমানরাজের দেওয়ান হরনারায়ণ বসু। (ঘ) প্রায় ৫০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। ভগ্ন ও লুপ্তপ্রায়। চার-খিলান প্রদক্ষিণ-পথ ও গর্ভগৃহ। প্রদক্ষিণ-পথের চারকোণে চার-গম্বুজ। (ঙ) ১৮ শতকের মধ্যভাগ। (চ) হাওড়া ষ্টেশান চত্বর থেকে বাসে (ঝিখিরা, আমতা প্রভৃতি) বাসে মাজুক্ষেত্রে গিয়ে রিক্সায়।

১৭। (ক) **সোমড়া,** বলাগড়, হুগলী। (খ) জগদ্ধাত্রী। (গ) দেওয়ান রামশঙ্কর রায়। (ঘ) ব্যতিক্রমী স্থাপত্য। ছাদ ক্রমে হ্রস্ব হ'তে হ'তে ধাপে ধাপে উঠেছে উল্টানো নৌকার আকারে। পিরামিডাকার ছাদটি তাই পিড়া-দেউল স্মরণ করায়। মূল ছাড়া বাকী আটটি রত্ন ক্ষুদ্রাকৃতি। (ঙ) ১৭৫৫ [ম্যাকাচিয়নের মতে ১৭৬৫, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৮] (চ) হাওড়া-ব্যান্ডেল-কাটোয়া লাইনের সোমড়া বাজার স্টেশানের সামান্য দূরত্বে।

১৮। (ক) **সুন্দুরুস,** (চিল্লাডাঙ্গি পঞ্চায়েৎ ক্ষেত্র), পুরশুড়া, হুগলী। (খ) লক্ষ্মী জনার্দন। (গ) মান্না পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০/৩২ ফুট উচ্চতা ও টেরাকোটা-সম্পন্ন। (ঙ) ১৭৬৮। (চ) তারকেশ্বর থেকে বাসে পুরশুড়া গিয়ে রিক্সায় (আন্দাজ তিন কি.মি.)।

১৯। (ক) **ক্ষীরকুন্ডী,** পাভুয়া, হুগলী। (খ) শ্রীধর। (গ) পাল পরিবার। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। পাশে খিলান শোভিত কিন্তু লুপ্ত ছাদ ঠাকুরদালান। (ঙ) ১৭৭০। (চ) হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনেব পাভুয়া ষ্টেশান হ'তে হেঁটে বা রিক্সায়।

২০। (ক) **খানাকুল-কৃষ্ণনগর,** হুগলী। (খ) গোপীনাথ (বর্তমানে গোপীনাথের ঝুলনমন্দির-রূপে ব্যবহৃত)। (গ) নসীরাম সিংহ। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট, নিরলংকার। (ঙ) ১৭৭৪। (চ) আরামবাগ থেকে গড়ের হাটগামী বাসে যাত্রা ক'রে খানাকুল স্টপেজে নেমে রিক্সায়— **প্রাসঙ্গিকী** : শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ শিষ্য (দ্বাদশ গোপালের প্রথম গোপাল) অভিরাম গোস্বামী খড়ের ঘরে গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ঠিক সেই জায়গাতেই বাবু নসীরাম সিংহ নবরত্ন মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে (১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে) বিগ্রহটি পাশের সুবৃহৎ একরত্ন মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে নবরত্ন মন্দিরটি গোপীনাথের ঝুলন-মন্দির রূপে ব্যবহৃত হয়।

২১। (ক) **মহিষাদল (সদর)** (পুরাতন গড়বাড়ি), পূর্ব মেদিনীপুর। (খ) গোপাল। (গ) রাণী জানকী। (ঘ) আনু. ৭০ ফুট উচ্চতার এই মন্দিরটি পশ্চিমবাংলার উচ্চতম রত্নমন্দিরগুলির একটি। নামমাত্র অলংকরণ। মন্দিরক্ষেত্রে প্রবেশপথের দুদিকে দুটি নহবৎখানা। (ঙ) ১৭৭৮। (চ) পাঁশকুড়া বা তমলুক থেকে বাসে সরাসরি মহিষাদল সদর।

২২। (ক) **গজা,** উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া। (খ) দামোদর। (গ) কোলে পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা ও দুই টেরাকোটা দ্বারপাল ও টেরাকোটা ফুল-লতা-পাতা বিশিষ্ট। (ঙ) ১৭৮৮। (চ) হাওড়া থেকে সরাসরি বাসে উদয়নারায়ণপুর (হুগলীর তারকেশ্বর লাইনেব হরিপাল ষ্টেশান সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে ১০ নম্বর বাসেও উদয়নারায়ণপুরে যাওয়া চলে) — এখান থেকে রিক্সায় ১½/২ কি.মি.।

২৩। (ক) **আসন্ডা,** উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া। (খ) শ্রীধর। (গ) মাইতি পরিবার। (ঘ) আনু. ৩৫/৩৬ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও টেরাকোটা-সম্ভারে সমৃদ্ধ। (ঙ) ১৭৮৯। (চ) উদয়নারায়ণপুর থেকে রিক্সায়।

২৪। (ক) **দিগসুই,** মগরা, হুগলী। (খ) যাদব রায়। (গ) রামকান্ত সুর। কারিগর : নারায়ণ মিস্ত্রী। (ঘ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চ. (ঙ) ১৭৯১। (চ) ব্যাণ্ডেল-বর্ধমান লাইনের মগরা থেকে কোড়লাগামী বাসে সরাসরি।

২৫। (ক) **বাকসা,** চন্ডীতলা, হুগলী। (খ) রঘুনাথ। (গ) ভ্রুকুটরাম মিত্র। (ঘ) আনু. ৪০/৪৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। সংস্কারে টেরাকোটা বিলুপ্ত। সামনে মিত্র পরিবারের দুর্গা দালান। নবরত্নটির চূড়াগুলি শীর্ণ এবং লম্বাটে। (ঙ) ১৭৯২। (চ) হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের জনাই রোড (ডানকুনি-গোবরা-জনাই) স্টেশান থেকে রিক্সায়।

২৬। (ক) **ঘাটাল,** (কোন্নগর, গোঁসাই পাড়া), পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) বৃন্দাবন চন্দ্র। (গ) গোস্বামী পরিবার। (ঘ) আনু. ৩৪/৩৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। সম্মুখগাত্র প্রচুর টেরাকোটা-শোভিত। শীর্ণ ও লম্বাটে শিখর বা রত্ন-বিশিষ্ট। (ঙ) ১৭৯৪। (চ) হাওড়া থেকে সরাসরি বাসে অথবা পাঁশকুড়া থেকে ঘাটালের বাসে যাত্রা ক'রে ঘাটালের শিলাবতী নদী সেতুর ঠিক আগে নেমে বিপরীত দিকে নদীপারের পথে রিক্সায় বা হেঁটে।

২৭। (ক) **ঝিখিরা,** (সরখেলপাড়া), আমতা, হাওড়া। (খ) গড়চন্ডী, (লৌকিক দেবী)। (গ) আনু. ৩৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। কার্যত নিরলংকার। মন্দির-ক্ষেত্রে প্রবেশ-পথের উপর নহবৎখানা। মন্দিরের সামনে নাটমন্ডপ ও পাশে একটি আটচালা ও একটি ছোট শিখর মন্দির (বিশ্বেশ্বর শিব এবং শালগ্রাম শ্রীধর)। (ঘ) ১৭৯৫। (ঙ) হাওড়া-ষ্টেশান সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে ঝিখিরাগামী বাসে সরাসরি গিয়ে বিখিরা বাসস্ট্যান্ড থেকে ঝিখিরা, রাউতাড়া ও চিংড়াজোলের সব কটি মন্দির দেখানোর চুক্তিতে রিক্সায়।

২৮। (ক) **লস্করদিঘি,** পাঁশকুড়া, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) রঘুনাথ। (গ) পান্ডা পরিবার। (ঘ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চতা ও দুটি টেরাকোটা ফলক (রামসীতা ও কৃষ্ণ) ছাড়া নিরলংকার। (ঙ) ১৭৯৬। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের পাঁশকুড়া ষ্টেশান বা বাজার থেকে সরাসরি রিক্সায়। লস্করদিঘি স্থানীয় উচ্চারণে নস্করদিঘি।

২৯। (ক) **১, মন্ডল টেম্পল লেন কলকাতা।** (খ) রাধাকান্ত। (গ) রামনাথ মন্ডল। (ঘ) ১৭৯৬ [মন্দিরটি এই সময় নির্মিত হ'লেও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয় ১৮০৯-এ] (ঙ) সুদৃশ্য নাট-দালানসহ সুউচ্চ মন্দির। (চ) শিয়ালদহ-বজবজ লাইনের টালিগঞ্জ স্টেশান থেকে খালপাড়— এখান থেকে সেতু পেরিয়ে সামান্য হেঁটে।

৩০। (ক) **বাঁটুল,** (শাঁখারীপাড়া), বাগনান, হাওড়া। (খ) দধি-বামন। (গ) দাস পরিবার। (ঘ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। টেরাকোটা সংস্কারে বিনষ্ট। (ঙ) ১৭৯৬। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বাগনান-ষ্টেশান-সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে শিবগঞ্জগামী বাসে সরাসরি বাঁটুল।

৩১। (ক) **সাহারা,** পিংলা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) রঘুনাথ। (গ) ভট্টাচার্য পরিবার। (ঘ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চতা ও টেরাকোটা-সম্পন্ন। (ঙ) ১৭৯৯। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বালিচক ষ্টেশান-সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে মুন্ডমারী— এখান থেকে ভ্যানরিক্সায় সরাসরি।

৩২। (ক) **কাঁকড়া-শিবরাম,** ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শ্রীধর। (গ) ভূঁইয়া পরিবার। (ঘ) বৃহৎ কিন্তু অতি ভগ্ন— লুপ্তপ্রায়। (ঙ) ১৮ শতকের শেষে। (চ) প্রাগুক্ত পাঁশকুড়া থেকে বাসে লোয়াদায় গিয়ে ভ্যানরিক্সায়।

৩৩। (ক) **সত্যপুর,** (মাড়োতলা), (ব্যানার্জী-পাড়া), ডেবরা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) শীতলানন্দ শিব। (গ) বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। (ঘ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চতা ও সামান্য টেরাকোটা-সম্পন্ন। কাছে নবরত্ন আটকোণা রাসমঞ্চ। (ঙ) ১৮ শতকের শেষে। (চ) পাঁশকুড়া-ট্যাবাগ্যেড়া বাসে সরাসরি।

৩৪। (ক) **বাঘরুই,** কেশপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) লক্ষ্মী-বরাহ। (গ) মাইতি পরিবার। (ঘ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। পূব ও দক্ষিণ দেওয়াল অপূর্ব টেরাকোটা-সমাহারে সুশোভিত। (ঙ) ১৮ শতকের শেষদিক। (চ) পাঁশকুড়া থেকে বাসে অর্জুনি গিয়ে ট্রেকারে।

৩৫। (ক) **কাজলাগড়,** ভগবানপুর, পূর্বমেদিনীপুর। (খ) গোপাল। (গ) চৌধুরী পরিবার (সুজামুঠা রাজবংশ) (ঘ) আনু. ৫০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন, কিছু টেরাকোটা অবশিষ্ট। (ঙ) ১৮ শতক। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের মেছেদা ষ্টেশান থেকে এগরাগামী বাসে সরাসরি কাজলাগড়।

৩৬। (ক) **চন্দননগর,** (উত্তর চন্দননগর), হুগলী। (খ) বুড়ো শিব। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতা ও শীর্ণ তথা লম্বাটে চূড়া বা রত্নবিশিষ্ট। কিছু টেরাকোটা অবশিষ্ট। একদুয়ারী। একমাত্র দুয়ারের দুপাশে দুটি নকল-দরজা। (ঙ) ঐ। (চ) চন্দননগর হ'লেও হাওড়া-ব্যান্ডেল লাইনের চুঁচুড়ার ঘড়িমোড় থেকে, বা, শিয়ালদহ-রাণাঘাট লাইনের নৈহাটি থেকে গঙ্গা পার হ'য়ে, রিক্সায় যাওয়াই প্রশস্ত উপায়।

৩৭। (ক) **খামারপাড়া, বকুলতলা,** চুঁচুড়া, হুগলী। (খ) শিব। (গ) রায় পরিবার। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট। সামান্য টেরকোটা অবশিষ্ট। একদুয়াবী। (ঙ) ঐ; (চ) চুঁচুড়া-বাঁশবেড়িয়া বাসে খামারপাড়ার বকুলতলা স্টপেজ।

৩৮। (ক) **সরপী,** ফরিদপুর, বর্ধমান। (খ) গোপাল। (গ) রায়চৌধুরী পরিবার— দশ আনা তরফ। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট। সংস্কারে সম্মুখভাগের জীর্ণ হ'য়ে আসা টেরাকোটাগুলির জায়গায় একইকায়দা ও রঙের টালি বসানো হ'য়েছে, প্রথম দর্শনে টেরাকোটা বলেই মনে হয়।—সাকুল্যে দুটি আটচালা ও দুটি রেখ শিব, দুটি পাশাপাশি দুর্গাদালান (দশ আনা ও ছয় আনা তরফ), একটি চমৎকার দালান-মন্দির (লক্ষ্মী-জনার্দন) এবং গোপালের নবরত্ন সহ বিশাল মন্দির-ক্ষেত্র। (ঙ) ঐ। (চ) অন্ডাল থেকে পান্ডবেশ্বর-মুখী বাসে দক্ষিণখন্ড, খান্ডরা ও উখরার পর মূল রাস্তায় সরপী মোড়— এখানে রিক্সাচালককে সরপী গ্রামের 'দশ আনা-ছয় আনা' বললেই উনি সরাসরি নিয়ে যাবেন।

৩৯। (ক) **কাঞ্চননগর,** বর্ধমান। (খ)কঙ্কালী বা কঙ্কালেশ্বরী। (ঘ) আনু. ২৫ ফুটের মত উচ্চতা, ও রত্নগুলি রেখ দেউলের মত, নিরলংকার। এখানকার দেবীমূর্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য— একটি বৃহৎ প্রস্তর খন্ডের উপর দেবীর শিরা-উপশিরা কঙ্কালের আকারে পরিস্ফুট— উপরে একটি হাতি এবং দেবীর পদতলে ভৈরব। অষ্টভুজা চামুণ্ডা। কিন্তু মূর্তিটির আকৃতি কঙ্কালাকার হওয়ায় লোকমুখে নাম হয়েছে 'কঙ্কালেশ্বরী' বা 'কঙ্কালী'। (ঙ) (?)। (চ) বর্ধমান শহর থেকে 'টাউন সার্ভিসে'-র বাসে গিয়ে 'রথতলা' স্টপেজে নেমে রিক্সায় (বা হেঁটে)। বর্ধমান ষ্টেশান চত্বর থেকে টানা রিক্সায় সরাসরি যাওয়াই সুবিধাজনক

মনে হয়। **প্রাসঙ্গিকী :** কাঞ্চননগর বর্ধমান শহরের প্রাচীনতর অংশগুলির অন্যতম। একসময়ে বর্ধমানের রাজাদের বাসও এখানে ছিল। একটি ভগ্ন ও প্রাচীন পঞ্চরত্ন, একটি লুপ্তপ্রায় জোড়বাংলা, এক জরাজীর্ণ রাসমঞ্চ প্রভৃতি এর সাক্ষ্য। শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্গী ব'লে কথিত ও 'গোবিন্দদাসের কড়চা'-রচয়িতা গোবিন্দদাস কর্মকারের জন্ম নাকি এই কাঞ্চননগরে—কিন্তু অধিকাংশ পন্ডিতই এবিষয়ে নিঃসংশয় যে কড়চাটি একটি জাল গ্রন্থ, তাই তার সাক্ষ্য মূল্যহীন। কিংবদন্তি যে মূর্তির পাথরটি নদীতীরে উল্টে প'ড়েছিল ও ধোপারা তার উপর কাপড় কাচত—একদিন কোনও ভাবে পাথরটি চিৎ হ'য়ে গেলে কঙ্কালসার চামুন্ডা মূর্তি দৃষ্ট ও মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে মন্দির-সংলগ্ন প্রাচীন পঞ্চমুন্ডীর আসন এখানে তন্ত্র সাধনার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য দেয়।

৪০। (ক) **ধালুয়া,** ভগবানপুর, পূর্ব মেদিনীপুর। (খ) রাধাগোবিন্দ। (ঘ) আনু. ৫০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন— পঙ্খসজ্জা ছাড়াও সামান্য টেরাকোটা। (ঙ) ঐ (১৮৯১—১৯০১-এ সংস্কৃত)। (চ) মেছেদা থেকে হেড়িয়া-মাধাখালি বাসে।

৪১। (ক) **লাওদা,** দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) বাঁকা রায়। (গ) বালিত্তল পরিবার। (ঘ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চতা ও টেরাকোটা-সজ্জিত। (ঙ) ১৮০১। (চ) পূর্বোক্ত পাঁশকুড়া থেকে ঘাটালের বাসে দাসপুরে গিয়ে রিক্সায় (১/১ কি.মি.)— তবে দাসপুরের বিভিন্ন এলাকায় যেহেতু দ্রষ্টব্য পুরাতন মন্দির বহু, তাই রিক্সাচালকের সঙ্গে সব দেখানোর চুক্তিতে ঘোরাই ঠিক।

৪২। (ক) **নিমতলা,** ঘাটাল, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) রঘুনাথ। (গ) টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। (ঘ) ১৮০১। (চ) ঘাটালের লাগোয়া।

৪৩। (ক) **বৈদ্যপুর,** কালনা, বর্ধমান। (খ) শিব। (গ) নন্দী পরিবার। (ঘ) আনু. ৩৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন— টেরাকোটা প্রায় লুপ্ত। পাশেই আটচালা শিব-মন্দির— নবরত্ন ও আটচালার জোড়া শিবমন্দিরও বলা চলে। (ঙ) ১৮০২। (চ) হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনের বৈঁচি ষ্টেশান-সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড কালনাগামী বাসে যাত্রা ক'রে গ্রামে ঢোকা পাকা রাস্তায়।

৪৪। (ক) **কয়াপাট,** গোঘাট, হুগলী। (খ) শ্রীধর। (গ) মন্ডল পরিবার। (ঘ) টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। (ঙ) ১৮০৭। (চ) আরামবাগ বা কামারপুকুর থেকে।

৪৫। (ক) **নজরগঞ্জ,** মেদিনীপুর শহর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) রাধাবল্লভ। (ঘ) সামান্য টেরাকোটা। (ঙ) ১৮০৮। (চ) রিক্সায়।

৪৬। (ক) **আলঙ্গিরী,** এগরা, পূর্ব-মেদিনীপুর। (খ) রঘুনাথ। (গ) দাস পরিবার। (ঘ) আনু. ৪০/৪২ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও সমগ্র সম্মুখভাগ সুবিপুল ও উৎকৃষ্ট টেরাকোটা-সম্ভারে সুশোভিত। দ্বিতল ও ত্রিতলে পঙ্খের কাজ। পার্শ্ব-দেওয়ালে পঙ্খের বাতায়নবর্তিনী। অদূরে টেরাকোটা-মন্ডিত রাসমঞ্চ। (ঙ) ১৮১০। (চ) হাওড়া থেকে সরাসরি বাসে বা কাঁথি থেকে বাসে এগরা—এগরা বাসস্ট্যান্ড থেকে মোহনপুরগামী বাসে বা ট্রেকারে সহজেই গিয়ে আলঙ্গিরী স্টপেজে নেমে ভ্যান-রিক্সায় বা হেঁটে।

৪৭। (ক) **বদনগঞ্জ,** গোঘাট, হুগলী। (খ) দামোদর। (গ) বরাট পরিবার। (ঘ) উৎকৃষ্ট টেরাকোটা-মন্ডিত। (ঙ) ১৮১০। (চ) আরামবাগ থেকে।

৪৮। (ক) **গণেশপুর,** শ্যামপুর, হাওড়া। (খ) লক্ষ্মী জনার্দন। (গ) চৈতন্য-চরণ রায়। কারিগর : রামপ্রসাদ চন্দ্র (রাউতাড়া)। (ঘ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। মুখ্যত পঙ্খ-অলংকৃত হ'লেও কার্নিশের নিচে ও প্রবেশপথের দুপাশে একসারি ক'রে টেরাকোটা-ফলক। (ঙ) ১৮২০। (চ) হাওড়া থেকে ট্রেণে মেছেদা-খড়গপুর লাইনের উলুবেড়িয়া— এখান থেকে বাসে গড়চুমুকে গিয়ে দামোদর পার হ'য়ে ভ্যানরিক্সায় (বা হেঁটে)।

৪৯। (ক) **মুকসুদপুর,** খড়গপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) লক্ষ্মী জনার্দন। (গ) ভূঁইয়া পরিবার। (ঘ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট। টেরাকোটা-মন্ডিত। (ঙ) ১৮২১। (চ) ডেবরা (পূর্বোক্ত) বা মেদিনীপুর শহর থেকে ডেবরা-গামী-বাসে বসন্তপুর— এখান থেকে টানা ভ্যান-রিক্সায় (৭/৮ কি.মি.) সরাসরি। এখন সম্ভবত ট্রেকারও চলে।

৫০। (ক) **হাজিপুর,** গোঘাট, হুগলী। (খ) লক্ষ্মী জনার্দন। (ঘ) একতালার ছাদেই নয়টি চূড়া বা রত্ন বসানো। যুগপৎ টেরাকোটা ও পঙ্খ অলংকৃত। (ঙ) ১৮২৭। (চ) কামারপুকুর থেকে।

৫১। (ক) **চন্দ্রকোণা,** (মিত্রসেনপুর), পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) শান্তিনাথ শিব। (গ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট এবং সমগ্র সম্মুখগাত্র উৎকৃষ্ট টেরাকোটা-শোভিত। (ঘ) ১৮২৮। (ঙ) পাঁশকুড়া, ঘাটাল বা মেদিনীপুর শহর থেকে চন্দ্রকোণাগামী বাসে যাত্রা ক'রে চন্দ্রকোণা টাউন স্টপেজে নেমে সব দেখানোর চুক্তিতে রিক্সায়। দ্রঃ ২২ টি মহল্লার প্রধানদের দ্বারা শান্তিনাথ শিব মন্দির পরিচালিত হ'ত বলে একে 'বাইশি মাড়ো' বলা হয়।

৫২। (ক) **চাঁইপাট,** দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) রাজ-রাজেশ্বর। (গ) মন্ডল পরিবার। (ঘ) আনু. ৩৫/৩৬ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও টেরাকোটা-মন্ডিত। (ঙ) ১৮২৮। (চ) পূর্বোক্ত পাঁশকুড়া ষ্টেশান-সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে গোপীগঞ্জগামী বাসে সরাসরি।

৫৩। (ক) **সিঙ্গি,** কাটোয়া, বর্ধমান। (খ) বুড়োশিব। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট, নিরলংকার, (ঙ) ১৮২৮; (চ) কাটোয়া থেকে বাসে।

৫৪। (ক) **বাসুদেবপুর,** (কামারনালা) দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) মহাপ্রভু। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চ। পঙ্খ-নক্সা সম্পন্ন। (ঙ) ১৮৩৩। (চ) পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে সরাসরি।

৫৫। (ক) **সরবেড়িয়া,** দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) সত্য নারায়ণ। (গ) পন্ডিত পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট। কৃষ্ণ, বলরাম ও তাদের দশ সখার বেশ বড় মাপের টেরাকোটা ফলক ছাড়াও আরও কিছু ফলক। (ঙ) ১৮৩৭। (চ) পাঁশকুড়া থেকে ট্রেকারে গোবিন্দনগরে গিয়ে ভ্যান-রিক্সায়।

৫৬। (ক) **৯৩, টালিগঞ্জ রোড।** (খ) গোপাল। (গ) প্যারিলাল ও মণিমোহন মন্ডল। (ঙ) ১৮৪৬।

৫৭। (ক) **উদয়গঞ্জ,** (মল্লিকপাড়া), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) শ্রীধর। (গ) সাঁতরা পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও সামান্য পঙ্খের কাজ বিশিষ্ট। গর্ভগৃহের

দরজার কপাটে মুখ্যত কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক খোদাই কাজ। (ঙ) ১৯ শতকের মধ্যভাগ। (চ) ঘাটাল থেকে খড়ার বাসে, পাঁশকুড়া থেকেও উক্ত বাস মেলে।

৫৮। (ক) **হাটশেরান্ডী,** (ধর্মতলার অদূরে), বোলপুর, বীরভূম। (খ) বিষ্ণু। (গ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। দ্বিতলহীন — একতলার ছাদেই বৃহৎ মূল চূড়া বা রত্নের চারপাশে অন্য আটটি চূড়া সাজানো। (ঘ) ১৯ শতকের মধ্যভাগ। (ঙ) বোলপুর শহরের প্রধান বাসস্ট্যান্ড থেকে বোলপুর-নূতনহাট (কাটোয়া-বর্ধমান), বোলপুর-বাসাপাড়া, বোলপুর-পালিতপুর প্রভৃতি বাসে সরাসরি শেরান্ডী বা হাটশেরান্ডী— বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সায়।

৫৯। (ক) **হরেকৃষ্ণপুর,** পাঁশকুড়া, পশ্চিম- মেদিনীপুর। (খ) শ্রীধর। (গ) জানা পরিবার। (ঘ) আনু. ৩৫/৩৬ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও টেরাকোটা-মন্ডিত। নিকটে নয়চূড়া রাসমঞ্চ। (ঙ) ১৮৫৪। (চ) ঘাটাল-কুঠীঘাট ভায়া রাধানগর বাসে।

৬০। (ক) **বীরসিংহ,** পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া। (খ) রাধাদামোদর। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা ও টেরাকোটা-মন্ডিত। (ঙ) ১৮৫৫। (চ) বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যাণ্ড থেকে বাসে।

৬১। (ক) **লছিপুর,** ঘাটাল, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) শ্রীধর। (গ) বাগ পরিবার। (ঘ) আনু. ২০/২২ ফুট উচ্চতা ও বড় মাপের কিছু টেরাকোটা। সামনে শিবের দুটি দেউল ও পাশে ১৭ চূড়া রাসমঞ্চ (অনেক চূড়াই ভগ্ন)। মন্দিরের দরজায় কাঠের কাজ। (ঙ) ১৮৫৬। (চ) পূর্বোক্ত 'ঘাটাল-কুঠীঘাট ভোয়া, রাধানগর'-বাসে সরাসরি লছিপুর, স্টপেজে নেমে গ্রামে ঢোকা পথে সোজা গিয়ে ডানে ঘুরতে হবে।

৬২। (ক) **চমকা,** খড়গপুর-লোকাল, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) শ্রীধর। (গ) নাগ পরিবার। কারিগর ঠাকুরদাস শীল। (ঘ) আনু ৩৫/৩৬ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও উৎকৃষ্ট টেরাকোটা মন্ডিত। গর্ভগৃহের কাঠের দরজাতে ও দমৎকার খোদাই কাজ। (ঙ) ১৮৫৬। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের মাদপুর ষ্টেশান থেকে রিক্সায় (৫ কি.মি)।

৬৩। (ক) **মেদিনীপুর শহর,** (মীর্জাবাজার—বকুলগঞ্জ), পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) রাধা-বল্লভ। (গ) ভট্টাচার্য পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট। পঙ্খের কাজ ও কিছু টেরাকোটা। (ঙ) ১৮৫৭। (চ) মেদিনীপুর ষ্টেশান বা বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সায়।

৬৪। (ক) **আলুই,** (ভূঞ্যাপাড়া), ঘাটাল, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) রাধা-দামোদর। (গ) ভূঞ্যা পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট ও টেরাকোটা-সজ্জিত। (ঙ) ১৮৬০। (চ) পাঁশকুড়া বা ঘাটাল থেকে চন্দ্রকোণা অথবা কুঠীঘাটগামী বাসে যাত্রা ক'রে রাধানগরে নেমে ভ্যানরিক্সায় (৪/৫ কি.মি.)।

৬৫। (ক) **করকাই,** পিংলা, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) লক্ষ্মী-বরাহ। (গ) বসু পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা ও টেরাকোটা-সজ্জিত। (ঙ) ১৮৬৭। (চ) হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বালিচক ষ্টেশান-সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে ময়নাগামী বাসে অথবা আরও একটু এগিয়ে ট্রেকারস্ট্যান্ড থেকে ট্রেকারে যাত্রা ক'রে পিংলা ডাকবাংলো স্টপেজে নেমে ভ্যানরিক্সায় সরাসরি।

৬৬। (ক) **আজুড়িয়া,** দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) লক্ষ্মী-জনার্দন। (গ) চরণ পরিবার। (ঘ) অন্ততঃ ৪০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন এবং উৎকৃষ্ট টেরাকোটা-সম্ভারে শোভিত। সামনের বড় মাপের টেরাকোটা-সম্পন্ন ন-চূড়া রাসমঞ্চটি অতি জীর্ণ হ'লেও দ্রষ্টব্য। (ঙ) ১৮৭১। (চ) পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে গৌরা— এখান থেকে ট্রেকারে আজুড়িয়া গিয়ে বাঁয়ে চলা রাস্তায় সোজা গিয়ে গ্রামের মোড় থেকে বাঁয়ে চলা রাস্তায় গেলে একসময় গাছপালার ছায়ায় দেখা যাবে।

৬৭। (ক) **উদয়গঞ্জ,** (কৃষ্ণপুর), ঘাটাল, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) দধিপাবন। (গ) রায় পরিবার। কারিগর : মাহিন্দ্র মিস্ত্রী (সেন-হাটি)। (ঘ) আনু. ৩০ ফুটের কাছাকাছি উচ্চতা ও অল্পস্বল্প টেরাকোটা। (ঙ) ১৮৭৭। (চ) ঘাটাল-খড়ার বাসে।

৬৮। (ক) **মারকুন্ডা,** নারায়ণগড়, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) লক্ষ্মী-জনার্দন. (গ) মারিক পরিবার। (ঘ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চতা ও কিছু পঙ্খের কাজ। (ঙ) ১৮৭৯। (চ) খড়গপুর-ষ্টেশান সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে কেশিয়াড়ী গামী বাসে খাজরা— এখান থেকে ভ্যানরিক্সায় সরাসরি (৬/৭ কি মি)

৬৯। (ক) **আলুই,** (উত্তরপাড়া), ঘাটাল, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) শ্রীধর। (গ) রায় পরিবার। (ঘ) আনু. ৩৫ ফুট উচ্চতা ও কিছু টেরাকোটা ফলক। (ঙ) ১৮৮০। (চ) ক্রমিক ৬৪ দেখুন।

৭০। (ক) **ঝিখিরা,** (গড়চন্ডীর কাছে), আমতা, হাওড়া। (গ) রায় পরিবার। (ঘ) আনু. ৪৫ ফুট উচ্চতা। জীর্ণ। (ঙ) **১৯ শতক**। (চ) হাওড়া থেকে সরাসরি বাসে ঝিখিরা। এখান থেকে সব দেখানোর চুক্তিতে।

৭১। (ক) **চিংড়াজোল,** (ঝিখিরা) আমতা, হাওড়া। (খ) বিষ্ণু। (গ) মন্ডল পরিবার। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতা। নিরলংকার। সামনে রাসমঞ্চ ও তার পাশে নাটদালান। সীমানা-প্রাচীরের ওধারে অন্য একটি রাসমঞ্চ। (ঙ) ঐ। (চ) ঝিখিরার শেষ প্রান্তে ধর্ম ঠাকুরের মন্দিরের আগে হ'তে বাঁয়ের রাস্তায়। ঝিখিরার রিক্সাচালকই নিয়ে যাবেন।

৭২। (ক) **ঐ (ধর্মতলা)**। (খ) দামোদর (?)। (গ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চ ও অতি জীর্ণ— কয়েকটি চূড়া বা রত্নও লুপ্ত। (ঘ) ঐ। (ঙ) ঐ। পূর্বের মন্দির হ'তে বেরিয়ে আবার মূল রাস্তায় সামান্য এগিয়ে ডানে স্থানীয় সবুজ সংঘ ক্লাব ও বাঁয়ে ধর্মের মন্দিরটি রেখে সোজা সামান্য গেলেই রাস্তার ডান ঘেঁষে দেখা যাবে।

৭৩। (ক) **ঐ (পশ্চিমপাড়া, খালপাড়),** আমতা, হাওড়া। (খ) শ্যামসুন্দর। (গ) রায় পরিবার। (স্বয়ম্বর গোষ্ঠী)। (ঘ) আনু. ৩৫/৩৬ ফুট উচ্চ—সামান্য কিছু পঙ্খের কাজ ছাড়া নিরলংকার। সামনে পঞ্চরত্ন রাসমঞ্চ। (ঙ) ঐ। (চ) ঐ। ঝিখিরা গ্রামে প্রবেশের পর রিক্সাচালকই নিয়ে যাবেন। এখানে খালের উপরকার সেতুর সামনে হ'য়ে খালধার দিয়ে অতি সামান্য দূরত্বে— ঐ সেতুর উপর থেকেও সুন্দর দেখা যায়।

৭৪। (ক) **ঐ** (বাসরাস্তার উপরস্থ 'উদয় সঙ্ঘ' ক্লাবের বিপরীত পথে)। (খ) শ্রীধর। (গ) রায় পরিবার (ঘ) আনু. ৩০ ফুট। পঙ্খ-অলংকৃত। সামনে নবরত্ন রাসমঞ্চ।

৭৫। (ক) **বাদাড়-গোপীনাথপুর,** কেশপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) জগন্নাথ। (গ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চতা ও মনোরম টেরাকোটা-সজ্জায় সজ্জিত। (ঘ) ঐ তবে সেবায়েৎগণ দাবী করেন যে মন্দিরটি ১৮ শতকের নির্মিত]। (ঙ) ডেবরা-মেদিনীপুর বাসে (পূর্বোক্ত) অর্জুনি। এখান থেকে ভ্যান-রিক্সায় খানামোহন— এখান থেকে কাঁসাই নদী পেরিয়ে আন্দাজ ২/২½ কি.মি.

৭৬। (ক) **রামচন্দ্রপুর,** ময়না, পূর্ব-মেদিনীপুর। (খ) পরিত্যক্ত মন্দির। (গ) ঘোড়ই পরিবার। (ঘ) আনু. ৫০ ফুট উচ্চতা ও টেরাকোটা সমন্বিত। (ঙ) ঐ। (চ) পাঁশকুড়া-তমলুক বাসে প্রতাপপুরে গিয়ে নদী পেরিয়ে ভ্যানরিক্সায় কেনাসী হ'য়ে ৬/৭ কি.মি.। আবার বালিচক থেকে বাসে ময়না গিয়ে কাঁসাই নদীর বাঁধ-রাস্তায় উত্তরে ৬/৭ কি.মি. রামচন্দ্রপুর। এ পথেও ভ্যান-রিক্সা চলে।

৭৭ (ক) **চন্দ্রকোণা,** (দক্ষিণবাজার), পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) বুড়ো শিব। (গ) আনু. ৫০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। সংস্কৃত। কিছু টেরাকোটা অবশিষ্ট। (ঘ) ঐ। (ঙ) পাঁশকুড়া, ঘাটাল বা মেদিনীপুর শহর থেকে যাত্রা ক'রে চন্দ্রকোণা টাউন স্টপেজে সব দেখানোর চুক্তিতে।

৭৮। (ক) **হরিনাগেড়িয়া,** (স্থানীয়দের মুখে : হরিনগর), ঘাটাল, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) রঘুনাথ। (গ) সিংহ-হাজারী পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট ও যুগপৎ টেরাকোটা ও পঙ্খ-অলংকৃত। (ঙ) ঐ। (চ) পূর্বোক্ত ঘাটাল-কুঠীঘাট (ভায়া রাধানগর) বাসে সরাসরি হরিনগর।

৭৯। (ক) **নাড়াজোল,** (রাজবাড়ি-এলাকা), দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) গোবিন্দ। (গ) নাড়াজোল রাজ পরিবার। (ঘ) আনু. ৪৫/৪৬ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। কার্ণিশের নিচে ও সামনের দেওয়ালের দুপাশে টেরাকোটার বদলে মাঝারি মাপের পাথরের মূর্তি (দশাবতার, দুর্গা ইত্যাদি) বসানো। (ঙ) ঐ [তবে জনশ্রুতি যে এটি নির্মাণ করান রাজবংশের সীতারাম খাঁন— একথা সত্য হ'লে এটি ১৮ শতকের শেষেও প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে থাকতে পারে]। (চ) মেদিনীপুর শহর, ঘাটাল বা দাসপুর থেকে বাসে সরাসরি নাড়াজোল— এখানকার বিখ্যাত রাজবাড়ির (বর্তমানে, নাড়াজোল রাজ কলেজ) লাগোয়া ঘেরা চত্বরের ঠাকুরবাড়িতে।

৮০। (ক) **বিষ্ণুপুর,** (গোয়ালপাড়া/ সুপাড়া—মাধবগঞ্জ-সংলগ্ন) বাঁকুড়া। (খ) শ্রীধর (শালগ্রাম)। (গ) বসু পরিবার। (ঘ) আনু. ৩৫/৩৬ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট ও সম্মুখগাত্র পূর্ণ টেরাকোটা-মন্ডিত। (ঙ) ঐ [কেউ কেউ এর প্রতিষ্ঠাতা বলে কথিত বীরেশ্বর বসুকে মল্লরাজ গোপাল সিংহের সঙ্গে যুক্ত ক'রে প্রতিষ্ঠাকাল ১৮ শতকের প্রথমার্ধে নিয়ে যেতে চান, কিন্তু প্রমাণ নেই]। (চ) বিষ্ণুপুর রসিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড থেকে সরাসরি রিক্সায় মাধবগঞ্জ হ'য়ে।

৮১। (ক) **ঐ (শ্যামরায় বাজার—মিলনশ্রী সিনেমাহলের কাছে)** (ঘ) ৩৪/৩৫ ফুটের মত উচ্চতা। (ঙ) ঐ। (চ) আগের রিক্সাতেই।

৮২। (ক) **হদল-নারায়ণপুর,** পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া। (খ) দামোদর। (গ) মন্ডল পরিবার (ছোট তরফ, পারিবারিক সূত্রানুসারে : বাবুরাম মন্ডল) (ঘ) আনু. ৩৫/৩৬ ফুট উচ্চতা-

সম্পন্ন। অনেকটা গির্জার আদলে। ব্যতিক্রমী। সম্ভবত পাশ্চাত্য প্রভাবে। বাইরে আটকোণা। হ'লেও ভিতরে চারকোণা। খিলানশীর্ষ তিনটিই অপরূপ টেরাকোটা মন্ডিত—বিশেষত মাঝের অর্জুনের লক্ষ্যভেদের ফলকটি অতুলনীয়। সারা সম্মুখগাত্র চমৎকার টেরাকোটা-মন্ডিত। দেওয়ালের কোণের 'মৃত্যুলতা'ও ব্যতিক্রমীভাবে খাড়া না হ'য়ে সমতল। মন্দিরক্ষেত্রে প্রথমে নাটমন্ডপ-সহ দুর্গাদালান, পাশে কালী-দালান— এ দুয়ের মাঝের সংকীর্ণ পথ দিয়ে ঢুকলে নবরত্নটি, তার অঙ্গনে এক পাশে, শিবের দুটি ছোট দেউল—প্রথমটি চারকোণা গর্ভগৃহের উপর পিরামিড-কৃতি শিখর বিশিষ্ট ও পরেরটি সাধারণ আটকোণা। (ঙ) ঐ। (চ) বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে হৃদলনারায়ণপুরের বাসে সরাসরি— অন্যথা বর্ধমান থেকে সোনামুখী হ'য়ে বিষ্ণুপুরে যাচ্ছে এমন বাসে যাত্রা ক'রে ধাগরিয়া (স্থানীয় উচ্চারণে ধাগর বা ধাগরে) স্টপেজে নেমে ভ্যান-রিক্সায়।

৮৩। (ক) **ঐ**। (খ) দামোদর (গ) 'মেজ তরফ'— মন্ডল পরিবার। (ঘ) আনু. ২৫/২৬ ফুট উচ্চতা। তিনটি খিলানশীর্ষেই বেশ বড় মাপের অত্যন্ত মনোরম টেরাকোটা (অনন্তশায়ী বিষ্ণু, লঙ্কাযুদ্ধ, ভীষ্মের শরশয্যা)। পাশের দেওয়ালে চমৎকার একটি বড়মাপের টেরাকোটা পদ্ম। (ঙ) ঐ। (চ) ঐ। ছোট তরফের মন্দিরক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে গ্রামমুখে কয়েক পা গিয়ে সীমানা-প্রাচীরটি পেরুলেই ডানে এক কোণে দেখা যাবে— এই মন্দিরের পাশে দাঁড়ালে সামনে জীর্ণ দ্বিতল-মন্দির ও একটি আটচালা এক প্রাচীরঘেরা ক্ষেত্রে।

৮৪। (ক) **ঐ**। (খ) রাধা-দামোদর। (গ) মেজ তরফ— মন্ডল পরিবার। (ঘ) আনু. ৩৫/৩৬ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট। ব্যতিক্রমী ধরণের না হ'লেও উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ টেরাকোটা-সজ্জিত মন্দিরগুলির একটি। (ঙ) ঐ। (চ) ঐ। সোজা গিয়ে বড় তরফের সুউচ্চ রাসমঞ্চের সামান্য আগে হ'তে বাঁয়ে চলা রাস্তায় সামান্যই গিয়ে বাঁয়ে বর্তমান বংশধরদের বসতবাড়ির ভিতর।

৮৫। (ক) **বামিরা,** পাত্রসায়েব, বাঁকুড়া। (খ) শিব। (ঘ) আনু. ৪০/৪২ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। দুদিকে ঈষৎ বড় মাপের টেরাকোটা। সামনের সুদৃশ্য সম্প্রতি-নির্মিত নাটমন্ডপে দুর্গাপূজা হয়। চৈত্রের সংক্রান্তিতে গাজনও হয়। (ঙ) ঐ। (চ) বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে পাত্রসায়েব হ'য়ে বিষ্ণুপুরে যাচ্ছে এমন বাসে যাত্রা সরাসরি।

৮৬। (ক) **কোতুলপুর**, (উত্তর/বেণেপাড়া), বাঁকুড়া। (খ) দামোদর। (গ) নন্দী পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০/৩৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। নিরলংকার। (ঙ) ঐ। (চ) আরামবাগ থেকে বিষ্ণুপুরের বাসে (কলকাতা থেকেও কোতুলপুর হ'য়ে বিষ্ণুপুরের বাস অনেক) যাত্রা ক'রে কোতুলপুর মোড়ে নেমে সব দেখানোর চুক্তিতে রিক্সায়।

৮৭। (ক) **রাজগ্রাম,** (হাটতলা), বাঁকুড়া, বাঁকুড়া। (খ) শ্রীধর। (গ) অজ্ঞাত। দুটি পৃথক জনশ্রুতি অনুসারে স্থানীয় তসর ও লাক্ষা ব্যবসায়ী চিন্তামণি দত্ত বা ছাতনার রাজ-পরিবার। (ঘ) আনু. ৩৫/৩৬ ফুট উচ্চতা ও টেরাকোটা-সম্পন্ন। (ঙ) ঐ। (চ) বাঁকুড়া শহরের গোবিন্দনগর বাসস্ট্যান্ড থেকে ভায়া লোকপুর রাজগ্রামের বাসে সরাসরি। এই রাজগ্রাম বাঁকুড়া থানাভুক্ত। স্মরণীয়, অন্য রাজগ্রামটি জয়পুর থানা-ভুক্ত এবং কোতুলপুর-বিষ্ণুপুর বাসপথে।

৮৮। (ক) **চারকলগ্রাম,** (মুখার্জীপাড়া), নানুর, বীরভূম। (খ) শিব। (ঘ) ভগ্ন। কেন্দ্রীয় রত্নটি ছাড়া অন্য আটটি রত্নই লুপ্ত বা প্রায় লুপ্ত, ফলে আনু. ৩৫ ফুট উঁচু স্তম্ভের মত দেখায়। নামমাত্র টেরাকোটা অবশিষ্ট। (ঙ) ঐ। (চ) নানুর থেকে ভ্যান-রিক্সা।

৮৯। (ক) **হাটকৃষ্ণনগর,** (তাঁতিপাড়া) পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া। (খ) রাধা-দামোদর। (গ) প্রামাণিক পরিবার। (ঘ) আনু. ৩৫/৩৬ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। দ্বারশীর্ষে কিছু টেরাকোটা। মন্দিরের বাঁ পাশের দেওয়ালে সুন্দর টেরাকোটা দুর্গা। (ঙ) ঐ। (চ) বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে পাত্রসায়েরগামী বাসে যাত্রা ক'রে কাঁকড়ডাঙা মোড় থেকে সামান্য আগে হাটকৃষ্ণনগর-এ নামা।

৯০। (ক) **মৌড়পুর** (মহুরাপুর), ময়ূরেশ্বর, বীরভূম। (খ) শিব। (ঘ) দ্বিতল ছাড়াই বা একতলার উপরে নয়টি চূড়া। (ঙ) ঐ। (চ) রামপুরহাট-সাঁইথিয়া বাসে মৌড়পুর ক্যানেল অফিস মোড় স্টপেজ।

৯১। (ক) **কোলাগাছিয়া,** গোঘাট, হুগলী। (খ) দামোদর (পরিত্যক্ত)। (গ) দালাল পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা ও টেরাকোটা মন্ডিত। (ঙ) ঐ। (চ) আরামবাগ থেকে বাসে বালিদেওয়ান-গঞ্জে গিয়ে, সেখানকার বাসস্ট্যান্ড থেকে ট্যাক্সি (এখানেই অপেক্ষা করে) নিয়ে।

৯২। (ক) **বৈকুণ্ঠপুর,** পুরশুরা, হুগলী। (খ) শ্রীধর (গ) চৌধুরী পরিবার (ঘ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন। টেরাকোটা মন্ডিত। সামনে ভগ্ন নাটদালান কিন্তু সুরক্ষিত মন্দির। বাইরে রাসমঞ্চ। (ঙ) ঐ। (চ) তারকেশ্বর থেকে অমরপুরগামী ট্রেকারে বা খুশীগঞ্জগামী বাসে যাত্রা ক'রে দামোদরের বাঁধের উপরকার পিচ-রাস্তায় রজকপাড়া স্টপেজে নেমে বাঁধ থেকে নামা বাঁদিকের রাস্তায় খানিক হেঁটে।

৯৩। (ক) **গোতান,** রায়না, বর্ধমান। (খ) পুরাতন বিশালাক্ষী। (ঘ) টেরাকোটা-সম্পন্ন। (ঙ) ঐ। (চ) বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যাণ্ড থেকে দামুন্যার বাসে সরাসরি।

প্রাসঙ্গিকী

(ক) আদ্য গাজন শিব বন্দম নিগনে। দক্ষিন ঈশ্বর বানু বন্দিনু রায়ানে॥
টেটেশ্বর গোতেশ্বর বন্দিনু গোতানে। অগ্নিমুখা হর বন্দো বাসি পলাসনে।।
['দিগ্‌দেবতাবন্দনা', 'চন্ডীমঙ্গল', কবিকঙ্কন
মকুন্দরাম চক্রবর্তী, পঞ্চানন মন্ডল
সম্পাদিত 'ভারবি' ১৯৯২ সংস্করন, পৃ : ৪]

(খ) দ্যাম্নিন্যায় দেবতা বন্দিনু চক্রাদিত্য। শিশুকাল হৈতে জার পদ সেবি নিত্য।।
[প্রাগুক্ত, পৃ : ৫]

(গ) নিজগ্রামে বন্দিলাম সিংহবাহিনী। বিষ্ণুপুরে বন্দিলাম প্রত্যক্ষ শিবানী।।
[প্রাগুক্ত, পৃ: ৬]

দামুন্যা-গোতান-চন্ডীবাটি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ছয়-সাত পুরুষের অঞ্চল। চণ্ডীমঙ্গলে প্রদত্ত 'দামুন্যা প্রশস্তি' থেকে জানা যায় কবি গোতানে টেটেশ্বর এবং গোতেশ্বর

শিবের পূজা করতেন, শিশুকাল হ'তে দামুন্যার চক্রাদিত্য শিবের সেবাপূজা করতেন এবং এছাড়াও সিংহবাহিনী পূজা। চক্রাদিত্য শিবের "তত্ত্ব" (মহত্ত্ব) বুঝে ধুষদত্ত তাঁর দেউল দেন। দামুন্যায় অনেক পন্ডিত ও সজ্জনের বাস ছিল— হরিনন্দী শিবকে ভূমিদান ক'রেছিলেন, মাধব ওঝা ছিলেন বিখ্যাত মানুষ, উমাপতি নাগ ছিলেন কলুতরুর মত দানশীল, দত্তবংশ ছিল সত্যবান, বেদান্ত ও নিগমশাস্ত্রে অধিকারী ছিলেন কৃশান পন্ডিত এবং ছিলেন "সুপন্ডিত সুকবি সমাজ"। অন্যদিকে মুকুন্দরামের পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র, পিতা গুণরাজ মিশ্র ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্র। সুপন্ডিত তথা সুকবি বংশ। (প্রাগুক্ত সংস্করণ, পৃ. ৬-৭)

৯৪। (ক) **পাথরা,** মেদিনীপুর সদর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) সংরক্ষিত। (গ) মজুমদার পরিবার। (ঘ) সুবৃহৎ। উচ্চতা আনু. ৪৫ ফুট। সম্পূর্ণ সংস্কৃত। নামে মাত্র টেরাকোটা। রক্ষিত। (ঙ) ঐ। (চ) খড়গপুর থেকে মেদিনীপুরের বাসে আমতলা। এখান থেকে ট্রেকারে। মূল রাস্তার পাশে, কাঁসাইয়ের তীবে।

৯৫। (ক) **ভাটপাড়া,** (ন্যায়ালংকার লেন), জগদ্দল, উত্তর ২৪পরগনা। (খ) শিব। (ঘ) আনু. ৩০/৩৫ ফুট উচ্চ। ত্রিখিলান। সংস্কৃত। (চ) পাঁচমন্দিরতলার সামান্য উত্তরে—রেললাইনের কাছে। শিয়ালদহ মেইন লাইনের কাঁকিনাড়া থেকে রিক্সায়।

৯৬। (ক) **ভদ্রেশ্বর** (পাইকপাড়া), চন্দননগর, হুগলী। (খ) রামসীতা। (ঘ) বৃহৎ। বড়মাপের টেরাকোটা কার্নিশের নীচে এখনো বর্তমান, অন্যথা খুন হওয়া মন্দিরের ধ্রুপদী উদাহরণ। মন্দিরের দেওয়াল থেকে টানা টিনের শেডে বৃহৎ মোষখাটাল—ফল অবর্ণনীয়। তদুপরি বৃক্ষাক্রান্ত মন্দিরটি ক্ষমার অযোগ্য অবহেলায় দীর্ণ। (ঙ) ঐ। (চ) ব্যাণ্ডেল শাখার ভদ্রেশ্বর থেকে রিক্সা।

৯৭। (ক) **কেওড়াতলা,** মহাশ্মশান, টালিগঞ্জ রোড, কলকাতা। (খ) সমাধি মন্দির। (গ) ময়মনসিহের জমিদার পরিবার। (ঘ) Maimensingh Memorial—জেলা ময়মনসিংহ আঠার বাড়ি নিবাসী মহিমাচন্দ্র রায়চৌধুরী—শ্মশান মন্দির॥ বৃহৎ নবরত্ন, উচ্চতা আনু. ৫০ ফুট। (ঙ) ২০ শতকের প্রথমে।

৯৮। (ক) **জয়ন্তী,** আমতা, হাওড়া। (খ) শিব। (ঘ) আনু. ২০ ফুটের মধ্যে। সম্পূর্ণ সংস্কৃত। সামনের দিকের চূড়াগুলি মূর্তি-শোভিত। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে। (ঙ) বিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ের একটি লিপি আছে— তবে স্থানীয় অধিবাসীরা বলেন, মন্দিরটি পুরাতন এবং লিপিটি সংস্কারকালীন। (চ) হাওড়া ষ্টেশান চত্বর থেকে ঝিখিরা/জয়পুর প্রভৃতি বাসে বেতাই বা নারিট—এক কিমি।

৯ (ক) : সোজা কার্নিশ বা সমতল ছাদযুক্ত নবরত্ন
(অন্যরকম উল্লেখ না থাকলে ত্রিখিলান; উপাদান— ইট)

১. (ক) **ঘুরিষা,** (শ্রীপুর) ইলামবাজার, বীরভূম। (খ) লক্ষ্মী-জনার্দন। (গ) ক্ষেত্র নাথ দত্ত। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও সম্মুখগাত্র টেরাকোটা-সম্ভারে সুসজ্জিত। (ঙ) ১৭৩৯। (চ) বোলপুর বা ইলামবাজার থেকে দুবরাজপুর-গামী লোকাল বাসে যাত্রা ক'রে ঘুরিষা।

২. (ক) **ইন্দাস,** (সরকারপাড়া), বাঁকুড়া। (খ) রাধা-দামোদর। (গ) সরকার পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। শুধুমাত্র উপরতলের কার্নিশ সোজা। টেরাকোটা-সজ্জিত। উপরতলে ওঠার সিঁড়ি ভিতর থেকে না হয়ে বাইরে থেকে। (ঙ) ১৭৯৬। (চ) বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যাণ্ড থেকে সরাসরি বাসে।

৩. (ক) **তরুয়াঁ,** নারায়ণগড়, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) গোকুল রায়। (গ) মজুমদার পরিবার। (ঘ) আনু. ৪০/৪২ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। পঙ্খের কাজে অলংকৃত। (ঙ) ১৯ শতকের প্রথমে। (চ) খড়গপুর থেকে এগরাগামী বাসে ঠাকুরচক— সেখান থেকে ভ্যান-রিক্সায় সরাসরি (৬/৭ কি. মি.)।

৪. (ক) **মহানাদ,** (দক্ষিণপাড়া) পোলবা, হুগলী। (খ) ব্রহ্মময়ী কালী। (গ) কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী। (ঘ) আনু. ৫০ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট। পাঁচখিলান হ'লেও দুপাশের দুটি নকল বা রুদ্ধ হওয়ায় কার্যত ত্রিখিলান প্রবেশপথ। রেখ দেউলের মত চূড়াগুলি— কেন্দ্রীয় চূড়াটি সুবৃহৎ, এখানে (ত্রিতলে) হংসেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র মন্দির আমূল সংস্কৃত। প্রাচীর-ঘেরা চমৎকার মন্দির-ক্ষেত্র। (ঙ) ১৮৩০। (চ) হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনের পাণ্ডুয়া ষ্টেশান-সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে/ট্রেকারে মহানাদ।

৫ (ক) **বৈদ্যপুর,** কালনা, বর্ধমান। (খ) বৃন্দাবন চন্দ্র। (গ) শিশু রাম নন্দী। (ঘ) আনু. ৪০/৪৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। পঙ্খের কাজে সুশোভিত। সামনে নাটমন্ডপ। বাইরের মাঠে রাস্তার ধারে দর্শনীয় সুবৃহৎ নবচূড় রাসমঞ্চ। (ঙ) ১৮৪৫-৪৬। (চ) হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনের বৈঁচি ষ্টেশান-সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে কালনাগামী বাসে যাত্রা ক'রে বৈদ্যপুর।)

৬. (ক) **সুখাড়িয়া,** (সোমড়া বাজার) বলাগড়, হুগলী। (খ) নিস্তারিণী কালী। (গ) কাশীগতি মুস্তৌফী। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন। চূড়াগুলি বেলনাকার হ'লেও শীর্ষগুলি গম্বুজাকৃতি। বারান্দার ছাদে অবতলিত টালি বসানো। সামনের নাটমন্ডপ বহুদিন আগেই লুপ্ত, শুধু দু একটি স্তম্ভের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট। সামগ্রিকভাবে জীর্ণদশাগ্রস্ত হ'লেও দর্শনীয়। (ঙ) ১৮৪৭। (চ) ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইনের সোমড়া থেকে রিক্সায়।

৭. (ক) **বরানগর,** ৩৯, হরকুমার ঠাকুর স্ট্রিট। (খ) কৃপাময়ী কালী। (গ) জয় নারায়ণ মিত্র। (ঘ) ১৮৫২।

৮. (ক) **বরানগর,** ২২৫, প্রামাণিক ঘাট রোড। (খ) ব্রহ্মময়ী কালী। (গ) দুর্গাপ্রসাদ ও রামগোপাল দে প্রামাণিক। (ঘ) ১৮৫৩।

৯. (ক) **কুচুট,** মেমারী, বর্ধমান। (খ) লক্ষ্মী নারায়ণ। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা। কিছু টেরাকোটা। (ঙ) উনিশ শতক। (চ) বর্ধমান মেইন্ লাইনের মেমারী থেকে বাসে।

১০. (ক) **রাণাঘাট,** (ষষ্ঠীতলা), নদীয়া। (খ) শিব। (ঘ) আনু. ৪০ উচ্চতা-সম্পন্ন। নিচের দুপাশে ঘোরানো বারান্দায় সুবৃহৎ ও পত্রাকৃতি ত্রিখিলান প্রবেশপথ। নিচের দালান ও বারান্দা প্রশস্ততর হওয়ায় গর্ভগৃহ ও তার উপরকার মন্দিরের অংশ ভিতরপানে বেশ খানিকটা সরানো ব'লে মনে হয়। —একই অঙ্গনে, পাশেই রয়েছে 'ব্রজবল্লভে'র ছোট ত্রিখিলান দালান-মন্দির।

'ব্রজবল্লভে'র দালানটি আংশিক সংস্কৃত হ'লেও শিবের নবরত্নটির জীর্ণ দশা, তথাপি অবশ্য দর্শনীয়। নবরত্নের চূড়াগুলি রেখ দেউলাকৃতি (ঙ) ঐ। (চ) শিয়ালদহ-রাণাঘাট লাইনের রাণাঘাট জংসন ষ্টেশানের এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে রিক্সায় সহজেই।

১১. (ক) **ঐ (নিস্তারিণী তলা)**। (খ) নিস্তারিণী কালী। (ঘ) আনু. ৪০/৪২ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। পাঁচখিলান প্রবেশ-দ্বার। পঙ্খের কাজে সুসজ্জিত। (ঙ) ঐ। (চ) ঐ। ষষ্ঠীতলার নবরত্নটি হ'তে সামান্য এগিয়ে, একই রাস্তায় বাঁ-ঘেষে।

১২. (ক) **নবদ্বীপ,** (বুড়োশিব-তলা), নদীয়া। (খ) বুড়ো শিব। (গ) আনু. ৩৫/৩৬ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট। পাঁচখিলান প্রবেশদ্বার। নিচের দালানটি প্রশস্ততর—এর ছাদের চারকোণে চারটি চারচালা-ধাঁচের চূড়া বা রত্ন এবং সামনের বারান্দার উপর ইটের রেলিঙ। গর্ভগৃহের উপরকার রত্নটিতে বক্রচালের আদল সৃষ্টি করা হ'য়েছে। চারকোণের চারটি চূড়া পিরামিডাকৃতি চাল-বিশিষ্ট। (ঙ) ঐ। (চ) নবদ্বীপ স্টেশান (হাওড়া-কাটোয়া লাইন) বা বাসস্ট্যান্ড বা ঘাট থেকে রিক্সায় সরাসরি। তবে নবদ্বীপের পরের স্টেশান বিষ্ণুপ্রিয়া থেকে কাছে হয়। **প্রাসঙ্গিকী** : নবদ্বীপের 'বুড়োশিবতলা' অত্যন্ত প্রাচীন স্থান। 'বুড়ো শিব' এখানে আসলে একটি প্রস্তরখন্ড যা সম্ভবত চৈতন্যপূর্ব কাল হ'তে পূজিত হ'য়ে আসছে, তবে বর্তমান মন্দিরটি ১৯ শতকীয়।

১৩. (ক) **ভদ্রেশ্বর,** (তেলিনীপাড়া), চন্দননগর, হুগলী। (খ) অন্নপূর্ণা। (গ) বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। (ঘ) আনু. ৫০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। (ঙ) ঐ। (চ) শিয়ালদহ-নৈহাটি লাইনের শ্যামনগর-কালীবাড়ির ঘাট হতে গঙ্গা পেরিয়ে রিক্সায়/হাওড়া-ব্যাণ্ডেল লাইনের ভদ্রেশ্বর ও মানকুণ্ডু থেকেও রিক্সায়।

১৪. (ক) **খড়দহ,** উত্তর ২৪ পরগণা। (খ) মহাপ্রভু। (ঘ) আনু. ৫০ ফুট উচ্চতার সুবিশাল মন্দির। নিরলংকার পশ্চিম ও দক্ষিণে ১৪/১৫ টি স্তম্ভ-শোভিত বারান্দা। গর্ভগৃহ ও দ্বিতল পাঁচ-খিলান। চারকোণা ও পিরামিডাকৃতি শীর্ষের নয়টি চূড়া। বিড়লা ট্রাস্ট কর্তৃক ১৯৬৮ তে সংস্কৃত।— প্রাচীর-ঘেরা। (ঙ) ঐ। (চ) শিয়ালদহ-বারাকপুর লাইনের খড়দহ থেকে রিক্সায়।

১৫. (ক) **চিলকিগড়,** জামবনী, পশ্চিম মেদিনীপুর। (খ) কালাচাঁদ (পরিত্যক্ত)। (গ) দেওধবলদেব পরিবার। (ঘ). সামনে খিলান-শোভিত প্রাকার। নিরলঙ্কার। (ঙ) ২০ শতকের প্রথম। (চ) ঝাড়গ্রাম থেকে অটোয়।

৯ (খ) : মুর্শিদাবাদ-রীতির নবরত্ন (অতি বৃহৎ কেন্দ্রীয় চূড়া ও অতি ক্ষুদ্র আটটি কোণের চূড়া)

১. (ক) **কাশিমবাজার,** (ছোট রাজবাড়ি), বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। (খ) লক্ষ্মী-নারায়ণ। (গ) কাশিমবাজার রাজ-পরিবার। (ঘ) আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। নিরলংকার। সংস্কৃত। (ঙ) ১৯ শতক। (চ) শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের কাশিমবাজার থেকে রিক্সায় বা হেটে।

৯ (গ) : নবরত্ন-কেন্দ্রিক মন্দিরগুচ্ছ

(i) মুর্শিদাবাদ-রীতির নবরত্ন + ১১টি চারচালা + ২ টি আটচালা

(ক) **বাঘডাঙ্গা,** কান্দী, মুর্শিদাবাদ। (খ) কালীশ্বর শিব (স্থানীয়-ভাবে পঞ্চমুখী শিব বলা হয়)। (গ) কালিশঙ্কর রায়। (ঘ) নবরত্ন মন্দিবটি আনু. ৪০/৪২ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। কিছু টেরাকোটা— অল্প কিন্তু উৎকৃষ্ট। এছাড়া পঙ্খের কিছু ফুল-লতাপাতার কাজও আছে। দেখে মনে হয় এগুলি পরে কোনও সময় সংস্কারকালে সন্নিবিষ্ট হ'য়েছে। কালীশ্বর শিবলিঙ্গের পাঁচটি মুখ থাকায় (এমন দৃষ্টান্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় আরও আছে, যেমন বড়নগরে চারবাংলার আগে প্রথম দোচালা মন্দিরে) একে পঞ্চমুখী শিবও বলা হয়। মূল সুউচ্চ মন্দিরের উত্তর-পাশে এক সারিতে চারটি চারচালা ও একটি আটচালা এবং দক্ষিণপাশে এক সারিতে সাতটি চারচালা ও একটি আটচালা শিব মন্দির। ১ (মুর্শিদাবাদী নবরত্ন) + ৪ (চারচালা + ১ (আটচালা) + ৭ (চারচালা) + ১ (আটচালা) = ১৪ টি মন্দিরের দর্শনীয় গুচ্ছ। (ঙ) ১৮ শতক। (চ) শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের বহরমপুর ষ্টেশান থেকে রিক্সায় বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে সেখান থেকে বাসে কান্দী। কান্দীর নবনির্মিত নেতাজী বাস টারমিনাস থেকে রিক্সায় সরাসরি— কান্দীরাজ-পরিবারের ঠাকুরদালান ও রুদ্রপুরের মন্দিরগুলি অতিক্রম ক'রে ...।

(ii) বক্রচাল নবরত্ন + বিভিন্ন সংখ্যক আটচালার গুচ্ছ

১। (ক) **দক্ষিনেশ্বর,** (খ) ভবতারিনী কালী,(শিব,রাধাকৃষ্ণ) (গ) রাণী রাসমণি। (ঘ) আনু. ৪৫ ফুট উচ্চতা। রেখ দেউলের আকৃতির নয়টি রত্ন। বক্রচাল। চারদিকে পাঁচ খিলান প্রদক্ষিণ বারান্দা। সামনে বৃহৎ নাটদালান। পিছনে রাধাকৃষ্ণের সুদৃশ্য দালান। গঙ্গাতীরে উত্তর হতে দক্ষিণে ৬টি করে দুটি গুচ্ছে শিবের ১২টি আটচালা, মাঝে চাঁদনি। এছাড়াও বাইরে নহবৎখানা। (ঙ) ১৮৫০-৫৫।

২। (ক) **কলকাতা ২৫,** বেথুন রো (খ) নিস্তারিনী কালী ও শিব (গ) ঈশ্বরচন্দ্র নান (ঘ) আনু ৩০ ফুটের মত উচ্চতা সম্পন্ন নবরত্ন,দুপাশে দুটি আটচালা।(নবরত্ন)+২(আটচালা) =তিনটি মন্দিরের গুচ্ছ। (ঙ)১৮৬৫

৩। (ক) **তালপুকুর,** (গঙ্গোত্রীপাড়া-রাসমণি ঘাট),টিটাগড়, উত্তর ২৪ পরগনা। (খ) অন্নপূর্না (স্থানীয় ভাবে রাসমণি মন্দির নামে পরিচিত) (গ) জগদম্বা বিশ্বাস (রানী রাসমণির কন্যা) (ঘ) আনু. ৫০ ফুটের মত উচ্চতা সম্পন্ন-পশ্চিমপাশে গঙ্গার স্নান-ঘাটে যাওয়ার পথের 'গেট'-এর দুধারে তিনটি-তিনটি করে ছয়টি আটচালা শিব মন্দির। সিংহদ্বার-সহ বেষ্টিতে মন্দির-ক্ষেত্র। সামনে নাট মন্ডপ। অন্নপুর্নার নবরত্নের একতলার চারদিক পাঁচখিলান-সামনে ও পশ্চিমে দুদিকে দুটি করে নকল ও মাঝে তিনটি করে প্রকৃত দরজা। পূর্ব ও পিছনে শুধুমাত্র মাঝেরটি প্রকৃত দরজা। দ্বিতলও ত্রিখিলান। ত্রিকোন পঙ্খ-অলংকৃত, প্রতিটি খিলান শীর্ষেই পঙ্খের পদ্ম। দ্বিতলের সামনে দুটি মূর্তি। (ঙ) ১৮৭৫ (চ) শিয়ালদহ-নৈহাটি লাইনের টিটাগড় বা বারকপুর ষ্টেশান থেকে রিক্সায় সরাসরি।

৪। (ক) **শ্যামপুকুর,** ২/২এ, বলরাম ঘোষস্টীট, (খ) ভবতারিনী কালী (এবং হরেশ্বর ও

হরপ্রসন্ন শিব) (গ) দয়াময়ী ঘোষ (ঘ) আনু ৩০ ফুট উচ্চতার নবরত্ন ও তার দুটি আটচালা শিব মন্দির। ২ (নবরত্ন) + ২(আটচালা) = ৩টি মন্দিরের গুচ্ছ। (ঙ) ১৮৮৮।

(iii) **জোড়াশিব** (নবরত্ন + আটচালা) : **বৈদ্যপুর,** কালনা বর্ধমান। একই অধিষ্ঠানে সুউচ্চ বক্রচাল নবরত্ন ও মাঝারি আটচালা। ১৯ শতক। বর্ধমান মেইন লাইনের বৈঁচি থেকে বাসে। বাজার এলাকায়।

(iv) সমতল ছাদ \ সোজা কার্নিশযুক্ত নবরত্ন কেন্দ্রিক মন্দির গুচ্ছ

(ক) **বর্ধমান শহর,** (সর্বমঙ্গলা-ক্ষেত্র), বর্ধমান। (খ) সর্বমঙ্গলা, (শিব এবং ধনেশ্বরী)। (গ) বর্ধমান- রাজপরিবার। (ঘ) আনু ৩০\ ৩৫ ফুট উচ্চতা - সম্পন্ন। প্রবেশদ্বারেব উপরে ও দুপাশে এক সারি টেরাকোটা আয়তকার রেখায় সন্নিবিষ্ট। গর্ভেগৃহে অষ্টাদশভূজা মহিষমর্দিনী মূর্তি সর্বমঙ্গলা নামে পূজিতা। এক পাশে নাটমন্ডপ ও সামনে সামান্য তফাতে একই বেদীতে পাশাপাশি তিনটি শিবের মন্দির— দুপাশে দুটি রেখ দেউল এবং মাঝেরটি আটচালা হ'লেও এর নিচের চারচালার উপর চারকোণে চারটি চূড়া বা রত্ন বসিয়ে পঞ্চরত্নের আদল সৃষ্টি করা হ'য়েছে। এদের ঠিক পিছনে পাশাপাশি দুটি বড় মাপের আটচালা শিব মন্দির, দুটিরই ত্রিখিলান-শীর্ষে চমৎকার টেরাকোটা, এছাড়া পূর্বোক্ত রেখ দেউল দুটিও টেরাকোটা-সম্পন্ন। সর্বমঙ্গলা মন্দিরের অপরপাশে রয়েছে ধনেশ্বরী দেবীর নাটদালান-সহ দালানরীতির মন্দির। সমগ্র মন্দিরক্ষেত্রের সামনে অতি-বিশাল দ্বিতল দালান-সহ রাজসিক প্রবেশদ্বার (ধনেশ্বরী মন্দিরের এর বাইরের পাশ ঘেষে)। ১ (নবরত্ন) + ৩ (আটচালা) + ২ (রেখ দেউল) + ১ (দালান) = ৭ টি মন্দিরের গুচ্ছ। সর্বমঙ্গলার নবরত্ন এবং শিব মন্দিরগুলি ১৮ শতকে। ধনেশ্বরীর দালান ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। (চ) বর্ধমান স্টেশান বা তিনকোণিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সায় সরাসরি।

প্রাসঙ্গিকী

বর্ধমানে বন্দি আগে শ্রীসর্বমঙ্গলা।
অসুর বধিয়া জার গলে মুন্ডমালা।।

[— 'চন্ডীমঙ্গল', মুকুন্দরাম চক্রবর্তী,
পঞ্চানন মন্ডল সম্পাদিত 'ভারবি'
১৯৯২ সংস্করণ, পৃ: ৪]

মুকুন্দরাম ছাড়াও রূপরাম চক্রবর্তী এবং মাণিক গাঙ্গুলীর 'ধর্মমঙ্গল' ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর', রামানন্দ যতি-র 'চন্ডীমঙ্গল' প্রভৃতিতে বর্ধমানের সর্বমঙ্গলার উল্লেখ আছে। নিঃসন্দেহেই 'সর্বমঙ্গলা' বর্ধমানের যথেষ্ট প্রাচীন লোকদেবী, এমনকি আজও বর্ধমানের লোকমন ও লোকচেতনায় সর্বমঙ্গলার অধিকারের গভীরতা বিস্ময়কর।

সর্বমঙ্গলা দেবীরূপে প্রাচীন হ'লেও বর্তমান মন্দিরটি অত প্রাচীন নয়। অনুমান করা হয় যে বর্ধমানরাজ কীর্তিচাঁদ রায় (১৭০২-৪০) সর্বমঙ্গলার বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করান, কারণ তাঁর পুত্র রাজা চিত্রসেন রায় (১৭৪০-৪৪)-এর সময় পাশাপাশি থাকা শিবের আটচালা দুটি এবং চিত্রসেনের পুত্র রাজা ত্রিলোকচাঁদ রায় (১৭৪৪-৭০)-এর সময় অন্য তিনটি শিব মন্দির (দুটি রেখ দেউল ও মাঝে পঞ্চরত্নের মত চূড়া বসানো আটচালা) নির্মিত হ'য়েছিল। ধনেশ্বরীর

দালান মন্দিরটি নির্মাণ ক'রেছিলেন রাজা মহতাবচাঁদ (১৮৩৩-৭৯)-এর কন্যা ধনদেয়ী দেবী ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে।

(ক) **সুখাড়িয়া** (সোমড়া বাজার), বলাগড়, হুগলী। (খ) হরসুন্দরী কালী (এবং শিব)। (গ) রামনিধি মুস্তৌফী। (ঘ) ব্যতিক্রমী স্থাপত্যের নবরত্ন। আনু. ৪০/৪৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন নিরলংকার মন্দিরে সামনের দেওয়ালের উচ্চতা অন্তত ২০ ফুট, প্রস্থেও তাই, ফলত প্রায় দুর্গা-প্রাকারের মত দেখায়— আরও এই কারণে যে মাঝে প্রবেশদ্বার বিশাল স্থাপত্যের তুলনায় ছোট ব'লেই মনে হয়। দুদিকের প্রবেশদ্বারের আয়তকার জাফরি দেখে মনে হয় সংস্কারের সময় বসানো। প্রথম তলের চারকোণে চারটি চারচালা দোলমঞ্চের ধরণেব বেশ বড় মাপের চূড়া বা রত্ন। দ্বিতলে ত্রিখিলান রাসমঞ্চের ধরণের রত্ন—রাসমঞ্চে যেমন খিলান-নির্ভর ছাদের নিচে চারদিক উন্মুক্ত থাকে, এক্ষেত্রে তাই। দ্বিতলের ছাদে চারকোণে চারটি শীর্ণকায় কিন্তু একতলার চারকোণের বৃহত্তর ও স্ফীততর চূড়া চারটির মতই চারচালা দোলমঞ্চের ধরণের চূড়া, শীর্ণ হওয়ায় লম্বাটে দেখায়, মাঝে বৃহত্তর ও চারচালা ছত্রীর মত মূল চূড়া— চারদিকের অর্ধবৃত্ত-শীর্ষের এক-খিলানের ভিতর দিয়ে দ্বিতলের ত্রিখিলানের মতনই পিছনের আকাশ দেখা যায়। সামগ্রিক স্থাপত্যে দেশীয় ও ইউরোপীয় স্থাপত্যের অদ্ভুত মিশ্রণ চোখে পড়ার মত। হরসুন্দরী কালীর নবরত্নের সামনের দুপাশে মুখোমুখী দু সারি শিব মন্দির— উভয় সারিরই প্রথম ও শেষ মন্দির দুটি প্রমাণ-মাপের পঞ্চরত্ন। ১ (নবরত্ন) + (২ + ২) ৪ পঞ্চরত্ন + (৫ + ৫) ১০টি আটচালা = ১৫টি মন্দিরের গুচ্ছ। প্রাচীর-ঘেরা। চারটি পঞ্চরত্নই প্রথাগত বক্রচাল। (ঙ) ১৮১৩। (চ) হাওড়া-ব্যান্ডেল কাটোয়া লাইনের সোমড়া বাজার স্টেশান থেকে রিক্সায়, সহজেই।

(ক) **শ্যামনগর, (মূলাজোড়)**, জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগণা। (খ) ব্রহ্মময়ী কালী (শিব, রাধাগোবিন্দ)। (গ) গোপী-মোহন ঠাকুর। (ঘ) আনু. ৪০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন নবরত্ন মন্দিরটিকে মাঝে রেখে উত্তর ও দক্ষিণে একই সরলরেখায় পরপব পাঁচটি ক'রে আটচালা শিব মন্দির ও উভয়ক্ষেত্রেই শেষে একটি ক'রে পঞ্চরত্ন শিব-মন্দির— অর্থাৎ গঙ্গার ধারে মন্দির ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে প্রথমে একটি পঞ্চরত্ন, তারপর পরপর পাঁচটি আটচালা, এরপর সুউচ্চ নবরত্ন, এরপর আবার পরপর পাঁচটি আটচালা এবং শেষে আরেকটি পঞ্চরত্ন (১ + ৫ + ১ + ৫ + ১) = ১৩ টি মন্দিরের গুচ্ছ একই সরলরেখায় এবং একই বেদীতে— সামনে টানা বারান্দা— শুধু ব্রহ্মময়ী কালীর নবরত্নের সামনে বারান্দাটি বাড়িয়ে অর্ধ-গোলাকার ক'রে ১৯ শতকীয় রীতিতে তার ধারে-ধারে পরপর দীপবাহক মূর্তি ও সিঁড়ির দুপাশে দুটি সিংহ। উভয় পঞ্চরত্নেরই ত্রিখিলান শীর্ষে অবক্ষয়িত পঙ্খের কাজ ও টেরাকোটা পদ্ম, আটচালাগুলিতেও টেরাকোটা পদ্ম। নবরত্নের ঠিক পিছনে রাধাগোবিন্দের সুরক্ষিত দালানরীতির মন্দির— আবার মন্দিরচত্বরের ঠিক আগে আনন্দশঙ্কর, গোপীশঙ্কর ও হরিশঙ্কর শিবের একই বেদীতে তিনটি মন্দির— মাঝে খাঁজকাটা রেখদেউলের আকৃতিবিশিষ্ট চূড়া-বিশিষ্ট পঞ্চরত্ন ও দুপাশের দুটি চতুষ্কোণ ভিতের উপর পিরামিডাকৃতি শীর্ষের দেউল। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ১৩ + ১ + ৩ = ১৭ টি মন্দিরের গুচ্ছ। দক্ষিণমুখী রাধাগোবিন্দ ছাড়া বাকী ১৬ টি মন্দিরই পশ্চিমমুখী। দুটি পঞ্চরত্নই প্রথাগত বক্রচাল। (ঙ) ১৮১৩। (চ) শিয়ালদহ-নৈহাটি লাইনের শ্যামনগর স্টেশানের

এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে বাইরে এলেই বাসরাস্তা— এ বার বাস রাস্তার ওপার থেকে যে রাস্তা গঙ্গার দিকে গেছে সেই রাস্তায় সামান্য গেলে ডান দিকে পড়বে।

(vi) দুপাশে দুই পঞ্চরত্ন, মাঝে বৃহত্তর নবরত্ন :

(ক) **কলকাতা** ১৮/১ কেনডার-ডাইন লেন। (খ) ত্রিলোক-রাম পাকড়াশী। (গ) এক দুয়ারী। (ঘ) ১৭৮৫।

(ক) **কলকাতা** ৯৩, টালিগঞ্জ রোড। (খ) গোপাল। (গ) প্যারিলাল এবং মণিমোহন মন্ডল। (ঘ) ১৮৪৬।

(vii) একটি সমতল-চাল নবরত্ন + একটি বক্রচাল পঞ্চরত্ন :

(ক) **ভাটপাড়া** (২/২ ঠাকুরপাড়া, মহামহোপাধ্যায় লেন), জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা। (খ) শিব। (গ) ভট্টাচার্য পরিবার। (ঘ) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতার বক্রচাল পঞ্চরত্ন (সংস্কৃত) এবং পাশে একটি সমতল ছাদের প্রায় একই উচ্চতার জরাজীর্ণ নবরত্ন। (ঙ) উনিশ শতক। শিয়ালদহ-নৈহাটি লাইনের কাঁকিনাড়া থেকে রিক্সায়।

(viii) চারটি নবরত্ন + জোড়া আটচালা

(ক) **ভাটপাড়া** (পাঁচবাটি লেন, পাঁচমন্দিরতলা), জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা। সবকটিই শিব ও বক্রচাল। পশ্চিমমুখী নবরত্ন (আনু. ২৫ ফুট, পঙ্খ-শোভিত, ও দক্ষিণমুখী নবরত্ন (সামনে বক্রচাল বারান্দা, পঙ্খের কাজ। ভাল অবস্থায় কিন্তু চাল বৃক্ষাক্রান্ত), প্রতিষ্ঠাতা রামকান্ত সার্বভৌম ও তাঁর পত্নী, ১৮০৭। উত্তরমুখী নবরত্ন (৩০ ফুট, অতি জীর্ণ), প্রতিষ্ঠাতা ভোলানাথ ঠাকুর, ১৮১২। পূবমুখী নবরত্ন (উচ্চতম, প্রায় ৪০ ফুট, চমৎকারভাবে সংস্কৃত, খিলানশীর্ষে মন্দিরের অনুকৃতি ও টেরাকোটা ফুল-লতাপাতা, দ্বিতলের কক্ষের খিলান শীর্ষে সুন্দর পঙ্খের কাজ), প্রতিষ্ঠাতা, পদ্মলোচন ভট্টাচার্য। পূবকোণে জোড়া আটচালা (খিলান শীর্ষে মন্দিরের অনুকৃতি এবং ফুল-লতা-পাতার কাজ), উনিশ শতক। —শিয়ালদহ-নৈহাটি লাইনের কাঁকিনাড়া থেকে রিক্সায়।

প্রাসঙ্গিকী :

ঠাকুরপাড়া ও পাঁচবাটি লেনের মন্দিরগুলি ভাটপাড়ার মহাশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত-সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং সে হিসাবে পশ্চিমবাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেধাবান যুগ ও অংশের পূণ্য স্মারক। বাংলার পণ্ডিত সমাজের দুটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ এবং ভাটপাড়া (ভট্টপল্লী থেকে ভাটপাড়া না ভাটপাড়া থেকে ভট্টপল্লী বলা শক্ত)। বেদজ্ঞ পণ্ডিত চূড়ামণি, আচার্য ও মহামহোপাধ্যায়গণ এখানে বিদ্যাচর্চার সর্বোচ্চ মান প্রতিষ্ঠা করেন। বহু পণ্ডিত, যেমন হলধর তর্কচূড়ামণি, শিবচন্দ্র সার্বভৌম, পঞ্চানন তর্করত্ন প্রমুখ—ছিলেন বিপুল খ্যাতির অধিকারী। ১৯৫১-৫২-তেও আচার্য বিনয় ঘোষ এখানে এগারো জন দিকপাল পণ্ডিতের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।*

পণ্ডিত-সমাজ-স্থাপিত আরও কয়েকটি মন্দির ভাটপাড়ায় আছে (যেমন, বাণেশ্বর পঞ্চানন-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাঁধাঘাটের জোড়া শিবমন্দির)।

* প্রাগুক্ত 'প. বঙ্গের সংস্কৃতি—৩', পৃ. ১৮৯।

পঙ্ক্তি—১০
১৩ বা তার অধিক রত্ন-বিশিষ্ট

(ক) ত্রয়োদশ রত্ন, বক্রচাল। উপাদান ঃ ইট।

১. (ক) **রামগড়,** বীনপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) কালাচাঁদ। (গ) রামগড়রাজ পরিবার। (ঘ) একতলা, দোতলা ও তিনতলা প্রতি তলের ছাদের চারকোনে চরটি করে (৩ × ৪ = ১২) বারোটি রত্ন ও মূল বা কেন্দ্রীয় রত্ন (১২ + ১ = ১৩) টি রত্ন—এই হল ঐতিহ্যগত এয়োদশ রত্ন। রামগড়ের আলোচ্য মন্দিরে এর উপর দোতলার সামনের দেওয়ালে একটি আটচালার রিলিফ কাজ দৃষ্টিনন্দন। ত্রিখিলান শীর্ষে এবং উত্তর দক্ষিণ দেওয়ালে টেরাকোটা-সজ্জা, লাগোয়া টিনের চালের মণ্ডপের কাঠের খুঁটিতে চমৎকার দারু-ভাস্কর্য। মন্দিরটির উচ্চতা অনু. ৬০ ফুট। (ঙ) ১৮৫৬। (চ) মেদিনীপুর শহর থেকে বাসে।

২. (ক) **খড়ার,** (উদয়গঞ্জ, মাজিপাড়া), ঘাটাল, পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) সীতারাম। (গ) প্রতিষ্ঠাতা ব্রজলাল মাজি। কারিগর (লিপিঅনুসারেঃ "গঠনকারী"): কার্ত্তিক চন্দ্র ও মাহিন্দ (মহেন্দ্র?) চন্দ্র মিস্ত্রী, সাং: জাহানা বাদ। (ঘ) আনু. ৪০/৪২ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট। ত্রিখিলান শীর্ষে কিছু টেরাকোটা—। দরজায় কাঠের কাজ। ঘেরা মন্দির-ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেই পাশে ১৯০৫ এ নির্মিত দুটি আটচালা শিব (শশিশেখর ও মৃত্যুঞ্জয়) মন্দির—এ দুটির দরজাতেও আকর্ষনীয় কাঠের কাজ; এছাড়াও মন্দির-ক্ষেত্রে রয়েছে মাজি পরিবারের পুরাতন দুর্গাদালান ও ঠাকুরবাড়ি। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এটি একটি সুউচ্চ ত্রয়োদশরত্ন, দুটি আটচালা ও একটি দুর্গদালানের গুচ্ছ। (ঙ) ১৮৬৪। (চ) পাঁশকুড়া বা ঘাটাল থেকে সরাসরি বাসে।

(খ) **'দুবরাজপুর রীতির' এয়োদশ-রত্ন** :

১। (ক) **দুবরাজপুর,** মুদীপাড়া, বীরভূম। (খ) শিব। (ঘ) দুদিকে রেখ দেউল মাঝে ত্রয়োদশরত্ন—বক্রচাল একতলার ছাদেই সামনে/পিছনে চারটি করে, দুপাশে মাঝে দুটি করে এবং গর্ভগৃহ-শীর্ষে বৃহৎ মূল রত্ন (৪ × ২ = ৮ + ২ × ২ = ৪ + ১ = ১৩)। (ঙ) উনিশ শতক। (চ) বোলপুর, ইলাম বাজার বা সিউড়ি থেকে বাসে দুবরাজপুব থানা স্টপেজে নেমে রিক্সায়।

২। (ক) **ঐ,** ওঝাপাড়া। (খ) শিব। (ঘ) একই রেখায় প্রথমে জোড়া রেখ দেউল এরপর তৃতীয় দেউল, এরপর উপরের রীতির ত্রয়োদশরত্ন—টেরাকোটা ও পঙ্খের কাজে সমৃদ্ধ, এরপর চতুর্থ দেউল। (ঙ) ঐ। (চ) ঐ।

৩। (ক) **ঐ,** নায়কপাড়া। (খ) শিব, (গ) নায়ক পরিবার। (ঘ) একই রেখায় প্রথমে একটি চারচালা, এরপর একই রীতির ত্রয়োদশরত্ন, সমৃদ্ধ টেরাকোটা ও পঙ্খের কাজ, কিন্তু চারটি রত্ন ভগ্ন। (ঙ) ঐ, (চ) ঐ-ওঝাপাড়ার পাশেই।

(গ) **সপ্তদশরত্ন ঃ**

১. (ক) **চন্দ্রকোণা,** (রঘুনাথপুর), পশ্চিম-মেদিনীপুর। (খ) পার্বতীনাথ শিব। (গ) (ঘ) ত্রিখিলান ও বক্রচাল একতলার ছাদের চারকোণে দুটি করে আটটি (৪ × ২ = ৮) রত্ন। দ্বিতলে কেন্দ্রীয় বা মূল রত্নটিকে ঘিরে আটকোণা স্থাপত্যের আট কোণে আটটি রত্ন এবং বিপুলতর মূল বা কেন্দ্রীয় রত্ন (৮ + ৮ + ১ = ১৭)—মোট সপ্তদশ রত্ন। আনু.৪০ ফুট উচ্চতার সম্প্রতি সংস্কৃত মন্দিরটির দুপাশে খাড়াভাবে দুসারি টেরাকোটা আছে বটে বাকি সমস্তই পঙ্খের মোটা হাঁতের দেবদেবী মূর্তি ইত্যাদি। সব কটি রত্নই খাঁজকাটা শিখর-সম্পন্ন দেউলাকৃতি-বিশিষ্ট। (ঙ) ১৯ শতক [একটি লিপি অনুসারে ১৮২৫-এ কাজ শুরু ও অন্য এক লিপি অনুসারে ১৯০৮-এ শেষ।] (চ) প্রাগুক্ত চন্দ্রকোণা টাউন থেকে রিক্সায়।

২. (ক) **লালবাগ,** (ইচ্ছাগঞ্জ/মোগলটুলি), মুর্শিদাবাদ। (খ) শিব (লালজীর মন্দির নামে পরিচিত)। (গ) লালজী নামে জনৈক বিহারী বণিক। (ঘ) অনু ৫০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। সবকটি চূড়াই মুর্শিদাবাদে জনপ্রিয় আটকোণা রীতির। সুউচ্চ দ্বিতলের দুপাশে তিনটি করে ও পিছনে মাঝে আরও দুটি (৩ + ৩ + ২ = ৮), মোট আটটি চূড়া। মাঝে বৃহৎ আটকোণা দেউলের আকারের মূল বা কেন্দ্রীয় চূড়া ত্রিতলের কাজ করছে—এর নিচে গা ঘেষে দুপাশে ও পিছনে আগের মত আরও আটটি চূড়া (৮ + ৮ + ১= ১৭)। মন্দিরের চারপাশে লুপ্ত-ছাদ ত্রিখিলান প্রদক্ষিণ বারান্দা। গর্ভগৃহের দ্বারের উপর এক বাংলা রিলিফের কাজ, দুপাশে দুই নকল খিলান। এর উপরে দ্বিতলে তিনটি খিলানই নকল, কিন্তু মাঝেরটির উপর পঙ্খের একবাংলা রিলিফ। সমগ্র মন্দিরে জ্যামিতিক পঙ্খের কাজ। অতি জীর্ণ মন্দিরে কষ্টি পাথরের মূল শিবলিঙ্গ ও আরও চারটি কষ্টিপাথরেরই শিবলিঙ্গ নিত্যপূজিত হচ্ছে। (ঙ) ১৯ শতক (দ্বিতীয় অর্ধ)। (চ) শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের মুর্শিদাবাদ ষ্টেশান থেকে রিক্সায়—হাজারদুয়ারি, এবং নবাব বাহাদুর স্কুল ছাড়ালে ইচ্ছাগঞ্জের রাস্তার বাঁয়ে মনীন্দ্রমোহন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিপরীতের রাস্তায়।

(ঘ) **পঞ্চবিংশতিরত্ন ঃ**

১১. (ক) **কালনা,** (অম্বিকা কালনা), বর্ধমান। (খ) লালজী, (গ) বর্ধমানরাজ কীর্তিচাঁদ (স্বীয় জননীর ইচ্ছাপূরণে)। (ঘ) বৃহৎ তিনতলা স্থাপত্যের একতলার ছাদের চারকোণে তিনটি করে চূড়া বা রত্নের গুচ্ছ, (৩ × ৪ = ১২) মোট বারোটি। দ্বিতলের ছাদের চারকোণে দুটি করে (২ × ৪ = ৮) মোট আটটি রত্ন। এর উপর ত্রিতলে একটি প্রথাগত পঞ্চরত্ন অর্থাৎ চারকোণে একটি করে (১ × ৪ = ৪) চারটি ও মাঝে বৃহত্তর মূল বা কেন্দ্রীয় রত্ন। এইভাবে ১২ + ৮ + ৪ + ১ = ২৫টি রত্ন। এ হল রত্ন-মন্দিরের চূড়ান্ত বিবর্তন (একরত্ন/পঞ্চরত্ন/ নবরত্ন/ ত্রয়োদশরত্ন/ সপ্তদশখ রত্ন/ একবিংশতি রত্ন—পশ্চিমবঙ্গে না থাকলেও বর্তমান বাংলাদেশের মৈমনসিংহের বিশোরগঞ্জে এর একদা-অস্তিত্বের কথা জানিয়েছেন ম্যাকাচিয়ন, প্রগুক্ত, 'লেট মিডীভ্যাল....,' পৃ: ৫৫-৫৬/ পঞ্চবিংশতিরত্ন।

(ঘ) আনু.৫০ ফুট উচ্চতার বিশাল স্থাপত্য। টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। সামনে চারচালা জগমোহনটি কিছুকাল পরেও সংযোজিত হয়ে থাকতে পারে। এর আগে সুবৃহৎ চারচালা নাটমণ্ডপ—সামান্য তফাতে লালজী-ক্ষেত্রে প্রবেশমাত্রই বাঁয়ে গিরিগোবর্ধন-রীতির (সম্ভবত) ভোগমন্দির।

সমগ্র লালজীক্ষেত্রে প্রবেশপথের উপর একবাংলা শীর্ষভাগ দূর থেকেই দৃশ্যমান।

প্রকৃতপক্ষে অম্বিকা কালনার আলোচ্যমান অঞ্চলটি একটি অত্যন্ত বিস্ময়কর মন্দিরময় এলাকা। (ঙ) ১৭৩৯। (চ) হাওড়া-ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইনের অম্বিকা-কালনা ষ্টেশান থেকে রিক্সায় ১০৮ শিবমন্দির—এর ঠিক বিপরীতে।

২. (ক) **ঐ।** (খ) কৃষ্ণচন্দ্র। (গ) বর্ধমান রাজ ত্রিলোক চাঁদ। (ঘ) আনু. ৪৫ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন এবং অতি উৎকৃষ্ট মানের টেরাকোটা মণ্ডিত। সামনের চারচালা জগমোহনটিও একই রকম উৎকৃষ্ট পর্য্যায়ের টেরাকোটা সজ্জিত। ঘেরা মন্দিরক্ষেত্রে প্রবেশমাত্র বাঁদিকে 'বিজয়বৈদ্যনাথ' শিবের বৃহৎ আটচালা। (ঙ) ১৭৫১। (চ) ঐ। ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেই ডানে অঙ্গনের শেষে প্রাচীর ঘেরা কোণে দেখা যাবে।

৩. (ক) **ঐ।** (খ) গোপাল (গোপাল বাড়ি নামে পরিচিত)। (গ) কৃষ্ণচন্দ্র বর্মণ (রাজা ত্রিলোক চাঁদের কাছেব লোক)। (ঘ) আনু. ৪৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট। টেরাকোটা মণ্ডিত। সামনে চারচালা জগমোহন এটিও টেরাকোটা মণ্ডিত। (ঙ) ১৭৬৬। (চ) কিছুটা দূরে। বাজার পেরিয়ে। মূল রাস্তার উপরেই।

৪. (ক) **সোমড়া বাজার,** (সুখাড়িয়া), বলাগড়, হুগলী। (খ) আনন্দ ভৈরবী। (গ) বীরেশ্বর মুস্তৌফী। (ঘ) আনু ৪০ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন এবং টেরাকোটা মণ্ডিত। 'আনন্দ ভৈববী'র সামনের দুপাশে মুখোমুখী দুটি সারিতে ছয়টি করে মোট বারোটি গৌণ মন্দির উভয় সারিরই প্রথমটি প্রথাগত বক্রচাল পঞ্চরত্ন, বাকি দশটি আটচালা। আনন্দভৈরবীর বাঁয়ে'র পঞ্চরত্নটি ও দশটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার কিন্তু প্রথাগত আটচালা মন্দিরই শিবের। সুতরাং এটি, একটি বিশাল পঞ্চবিংশতি রত্ন + দুটি পঞ্চরত্ন + দশটি আটচালা = মোট তেরোটি মন্দিরের রাজসিক গুচ্ছ। এছাড়াও ক্ষেত্রের ঠিক বাইরে বড় পুকুর পাড়ে জীর্ণ কিন্তু রাজপ্রাসাদের মত ঠাকুর বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে মুস্তৌফী পরিবারের বিপুল বৈভবের সাক্ষ্যরূপে। ১৮১৩। কাটোয়া লাইনের সোমড়া থেকে রিক্সা।

দ্বিতল ও তুলনায় ছোট পঞ্চবিংশতি রত্ন

১. (ক) **সোনামুখী,** (বাজারপাড়া), বাঁকুড়া। (খ) শ্রীধর (গ) প্রতিষ্ঠাতা—কানাই রুদ্র দাস (তন্তুবায়), স্থপতি—হরি সূত্রধর, গ্রাম, ম্লেচ্ছাবানী। (ঘ) আনু ২৪/২৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন। কালনা-সুখাড়িয়ার পঞ্চবিংশতি মন্দির চারটি সুবৃহৎ এবং ত্রিতল—বিপরীতে পূর্বোক্ত আনন্দভৈরবী মন্দির প্রতিষ্ঠার ৩২ বছর পরে নির্মিত সোনামুখীর শ্রীধর দ্বিতল ও উচ্চতায় কম (প্রকৃতপক্ষে সামান্য বা নামমাত্র দূরের সিদ্ধেশ্বর শিবের পঞ্চরত্নটিও অনেক বেশী উচ্চতা-সম্পন্ন)। প্রথম তলের ছাদের চারকোণে তিনটি করে (৩×৪)=১২) বারোটি এবং দ্বিতলের ছাদেও ঐ একই কায়দায় (৩×৪=১২) বারোটি রত্ন এবং এদের মধ্যবর্তী বৃহত্তম মূল বা কেন্দ্রীয় রত্ন (১২+১২+১=২৫), এইভাবে পঞ্চবিংশতি রত্ন—সবকটি রত্নই খাঁজকাটা দেউলধর্মী।

চার দেওয়ালই বিপুল টেরাকোটা সমৃদ্ধ। (ঙ) ১৮৪৫ (চ) বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যাণ্ড থেকে বাসে সোনামুখী—এখানে বাজার-পাড়ায় নেমে হাঁড়িহাটতলা অথবা বড়কার্ত্তিকতলা থেকে হেঁটে। **প্রাসঙ্গিকী** : (i) সপ্তদশ শতকীয় 'দেশাবলিবিবৃতি' পুঁথিতে জগন্মোহন পণ্ডিত সোনামুখীকে তাঁতিদের গ্রাম বলেছেন (দ্র ঃ অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি", পূর্ত বিভাগ, পঃবঙ্গ সরকার, ১৯৭১, পৃঃ ১২৫-২৬)। কোম্পানীর আমলেও এখানে রেশম, লাক্ষা, নীল, তাঁতবস্ত্র প্রভৃতির সমৃদ্ধ ব্যবসা ছিল। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে একজন তাঁত বাবসায়ী কর্তৃক শ্রীধর মন্দিরের মত বিপুল ব্যয়-সাপেক্ষ ও অতি সমৃদ্ধ অলংকরণ-শোভিত পঞ্চবিংশতি-রত্ন মন্দির নির্মাণ হতে প্রমাণিত হয় যে অন্ততঃ ১৯ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সোনামুখীর তন্তুরায় সমাজের আর্থিক ও সামাজিক প্রাধান্য অব্যাহত ছিল। প্রকৃতপক্ষে এর ঠিক দশ বছর আগে তন্তুরায় সমাজই এখানকার 'গোপালবেড়ে' নির্মাণ করেন গিরিগোবর্ধন-রীতির পঞ্চরত্ন মন্দিরটি, সোনামুখীর বিভিন্ন পাড়ার পুরাতন মন্দির ও রাসমঞ্চগুলির অধিকাংশই তন্তুবায় সমাজেরই প্রতিষ্ঠিত এবং মুখ্যত ১৯ শতকেই। এ দিক হতে দেখলে বোঝা যায় যে বাংলার আর্থিক ও বাণিজ্যিক ইতিহাসে সোনামুখী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু হতে পারে। (ii) সোনামুখী নামটি লৌকিক দেবী স্বর্ণমুখী থেকে হয়েছে। সুবর্ণবনিক থেকেও হতে পারে।

পঞ্জি—১১

দালান

সারা পশ্চিমবঙ্গে, গণনাতীত। দৃষ্টান্ত হিসাবে কিছু উল্লেখিত। অন্য রকম উল্লেখ না থাকলে ইটের নির্মাণ, ত্রিখিলান। বৃহৎ = দৈর্ঘ্য ২২ ফুটের বেশি। মাঝারি = দৈর্ঘ্য ১৭-২২ ফুট। ছোট = দৈর্ঘ্য ১৭ ফুটের কম; কোনো উল্লেখ না থাকলে : মাঝারি। পথনির্দেশ না থাকলে, পূর্বোল্লেখিত।

১। **রাজবলহাট** (জাঙ্গীপাড়া, হুগলী)। রাজবল্লভী। মনে করা হয় যে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬ শতকে—অসম্ভব নয় কারণ ঐ শতকের সূচনায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখেছেন:

"বিশালা বিক্রমপুরের বন্দো গীতনাটে।
বেছ্যা বাড়ি নিল্যে মাতা রাজবলহাটে।।*

কিন্তু বর্তমান মন্দিরটি এত বহুল সংস্কৃত যে প্রাচীনতার চিহ্ন নেই। পাঁচখিলান মন্দির চত্বরে শিবের একটি বৃহৎ আটচালা, তার পাশে তুলনায় ছোট জোড়া আটচালা ও নাটমণ্ডপের পরে একটি আটকোণা মন্দির আছে। সিংহদুয়ার ও নহবৎ সমৃদ্ধ ঘেরা ক্ষেত্র। **কিংবদন্তি:** ত্রয়োদশ শতকে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজা সদানন্দ রায় 'রাজপুর' (বর্তমান রাজবলহাট) প্রতিষ্ঠা করেন ও রুদ্রনারায়ণ রায় ষোড়শ শতকে রাজবল্লভীর মন্দির-প্রতিষ্ঠা করেন।

২। **ডিহি-মণ্ডলঘাট,** শ্যামপুর, হাওড়া। দক্ষিণাকালী। ১৭ শতক? (বাগনান-শ্যামপুর-কমলপুর বাসে বরদাবাড়। ভ্যানরিক্সা)।

৩। **আড়ংঘাটা,** রাণাঘাট, নদীয়া। যুগল কিশোর। পাঁচখিলান দালান ১৭২৮ প্রতিষ্ঠাতা নদীয়া রাজ কৃষ্ণচন্দ্র। (শিয়ালদহ-গেদে বা রাণাঘাট-গেদে লোকালে আড়ংঘাটা স্টেশন। হাঁটা বা ভ্যানরিক্সা)।

৪। **বামনপাড়া,** বর্ধমান, বর্ধমান। প্রথাগত স্তম্ভ। ১৭৪৫। (বর্ধমান শহর-রিক্সা)।

৫। **কালনা,** বর্ধমান। রূপেশ্বর। প্রথাগত স্তম্ভ। টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। বর্ধমান রাজপরিবার। ১৭৬৫ (হাওড়া-ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লোকালে অম্বিকা-কালানা। হেঁটে/রিক্সায়—১০৮ মন্দিরের বিপরীতে। লালজী ও কৃষ্ণচন্দ্রের মাঝে)।

৬। **উচকরণ,** নানুর বীরভূম। ধর্ম (চাঁদ রায়)। প্রতিষ্ঠাতা হৃদয়রাম সৌ (ধর্মঙ্গলের কবি)। পূর্ণ সংস্কৃত। টেরাকোটা-লুপ্ত, কিন্তু দরজার কাঠের ফ্রেমে অসাধারণ কাজ। ১৭৬৮, (নানুর থেকে ভ্যানরিক্সা)।

৭। **কোতুলপুর** (হালদার পাড়া), বাঁকুড়া। দামোদর। হালাদার পরিবার। প্রথাগত স্তম্ভ—কিন্তু সংস্কারে স্তম্ভগুলির দুপাশে ইট গাঁথা হওয়ায় আদিভাবের হানি ঘটেছে। দেওয়ালের দুপাশে ও উপরে একসারি করে কুলুঙ্গিতে পাথরের মূর্তি বসানো। ১৭৬৯। (কলকাতা/আরামবাগ/বিষ্ণুপুর থেকে বাসে। কোতুলপুরের আনাজ বাজারের কাছে বড়কালীতলা (উত্তর বাহিনী)র বড় পুকুর ঘুরে হালদারপাড়ার গলিতে।।

* প্রাগুক্ত সংস্করণ, পৃ. ৪।

৮। **সালেপুর,** আরামবাগ, হুগলী। ধর্ম। ভুক্ত পবিবার। ছোট। ১৭৭৮। (আরামবাগ থেকে অটো/ভ্যানরিক্সা)।

৯। **চন্দ্রকোণা** (মিত্রসেনপুর), পশ্চিম মেদিনীপুর, রাধাবল্লভ। দাসদত্ত পবিবার ঝামাপাথরে **নির্মিত বক্রকার্নিশ**। পঙ্খ অলংকৃত। ১৭৮০।

১০। **জাড়া** (ময়নাপুকুর এলাকা), চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর। রামেশ্বর শিব। রায় পরিবার। ১৭৯৫—ক্ষেত্রে আরও তিন/চারটি প্রায় সমসাময়িক দালান মন্দির আছে। (ক্ষীরপাই থেকে বাসে)।

১১। **ঘাটাল,** পশ্চিম মেদিনীপুর। রঘুনাথ। পঙ্খ-শোভিত। ১৭৯৭। (নতুন বাসস্ট্যাণ্ড হতে হেঁটে/ রিক্সায়)।

১২। **নাড়াজোল,** দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। রঘুনাথ, চুনা-পাথরে নির্মিত। নাড়াজোল রাজপরিবার। **১৮ শতক।**

১৩। **কুমারপাড়া,** বর্ধমান, বর্ধমান, সত্যনারায়াণ। প্রথাগত স্তম্ভ। টেরাকোটা। ছোট।

১৪। **হরিণাখালি,** পুরশুড়া, হুগলী। ধর্ম, সরকার পরিবার, একদুয়ারি। ছোট। তারকেশ্বর-খুশীগঞ্জ বাসে ট্রেকারে দেউলপাড়া। হাঁটা।

১৫। **বাঘডাঙা,** কান্দী, মুর্শিদাবাদ। সিংহবাহিনী, রানী পার্বতী। বৃহৎ, জঙ্গলাকীণ ও লুপ্তপ্রায়।

১৬। **ঐ।** লক্ষ্মী-জনার্দন। বৃহৎ। প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত।

১৭। **কান্দী,** মুর্শিদাবাদ। গোবিন্দ। দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহ। বৃহৎ। পাঁচখিলান। নিরলংকার কিন্তু অতীব সুদৃশ্য। রাজবাড়ির ঠাকুরদালানে প্রবেশের মুখে, বাঁদিকে।

১৮। **মুলুক,** বোলপুর, বীরভূম। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও রাধাকৃষ্ণ। রামকানাই ঠাকুর। বৃহৎ। পাঁচখিলান। নিরলংকার, সামনে বৃহৎ নাটমণ্ডপ। পাশে রামকানাই ঠাকুরের সমাধি। বোলপুর থেকে বাসে/ রিক্সায়।

প্রসঙ্গিকী : চৈতন্য-পরিকর ধনঞ্জয় পণ্ডিতের ছোট ভাই সঞ্জয়ের বংশধারার সাধক রামকানাই ঠাকুর বৈষ্ণব-শাক্ত সমন্বয়ের লক্ষে স্বস্থানে চৈতন্য ও রাধাকৃষ্ণ উপাসনার সঙ্গে রামেশ্বর শিব এবং অপরাজিতা (দুর্গা) পূজা প্রচলন করেন—তাঁর এই উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্য রাজনগরের মুসলমান রাজা তাঁকে বহু জমি দেবোত্তর দেন। এই সমস্ত দিক সম্পর্কে পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছেন তা স্মরনীয় : "শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অনুবর্তিগণের মধ্যে পরবর্তীকালে যাঁহারা হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠায় অগ্রবর্তী হন, তাঁহাদের মধ্যে বীরভূম মঙ্গলডিহির পর্ণগোপাল ঠাকুর প্রধান ছিলেন এবং শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব নিরসনে যাঁহারা মনোনিবেশ করেন, তাঁহাদের মধ্যে মুলুকের রামকানাই ঠাকুর এবং (বর্তমানে) বর্ধমান জেলার অজয়তীরস্থিত কোন্দা গ্রামের ঘনশ্যাম গোস্বামীর নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখযোগ্য।"*

'গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি,' পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯, পৃ. ৮৩।

১৯। **চন্দ্রকোণা (গাজিপুর),** পশ্চিম মেদিনীপুর। রঘুনাথ। ঝামাপাথরে নির্মিত। বক্রকার্নিশ।

২০। **ঐ (রঘুনাথবাড়ি, অযোধ্যা)।** লালজী মন্দিরের ভোগমণ্ডপ। ঝামাপাথরে নির্মিত বক্রকার্নিশ।

২১। **ইঁদাস (বাজারপাড়া),** বাঁকুড়া, নারায়ণ (পরিত্যক্ত)। ছোট। প্রদক্ষিণ-সহ। টেরাকোটা-সজ্জিত। বর্ধমান (তিনকোণিয়া) থেকে সরাসরি বাসে।

২২। **ঐ (হরিপুর-পণ্ডিতপাড়া)।** বাঁকুড়া রায়। সাধাবণ।

২৩। **শোভাবাজার,** কলকাতা। গোবিন্দ/গোপীনাথ। রাজা নবকৃষ্ণ দেব। বৃহৎ। পঙ্খ-শোভিত।

২৪। **নাইকুলি,** জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। বিশালাক্ষী। সাধারণ। ১৮০৩। মুনসীরহাট থেকে হেঁটে। সহজে।

২৫। **কুশপাতা,** ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর। লক্ষ্মী-জনার্দন। রামসুন্দর ঘোষ। ১৮১৪ ঘাটালের লাগোযা।

২৬। **কল্যাণপুর,** বাগনান, হাওড়া। কালী। পাল পরিবার। টেরাকোটা দ্বারপাল ও পঙ্খের কাজ। ১৮২২। বাগনান থেকে বাসে।

২৭। **গোবরডাঙা,** হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা। প্রসন্নময়ী কালী। কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। বৃহৎ। দুপাশে ছয়টি করে শিবের আটচালা ১৮২৩। শিয়ালদহ-বনগাঁ লাইনের মসলন্দপুর বা গোবরডাঙা স্টেশন থেকে ভ্যানরিক্সা।

২৮। **পলাশী,** ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর। লক্ষ্মীজনার্দন। নন্দী পবিবার। টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। অঙ্গনের বাইরে রাসমঞ্চ। হাওড়া-খড়্গপুর লাইনের রাধামোহনপুর স্টেশন থেকে হেঁটে/ভ্যানরিক্সায়।

২৯। **সামাট** (দক্ষিণ পাড়া), দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। মদনগোপাল। রামানুজ সম্প্রদায়। সুবৃহৎ। পাঁচখিলান দুর্গাদালানের মত। কিছু টেরাকোটা। ১৮২৮। পাঁশকুড়া থেকে ঘাটাল বাসপথের বেলতলা থেকে ভ্যানরিক্সায় দীর্ঘপথ যাওয়া সম্ভব হলেও, পাঁশকুড়া থেকে রিজার্ভ গাড়িতে যাওয়াই সুবিধাজনক।

৩০। **রামজীবনপুর** (নতুন হাট), চন্দ্রকোণ পশ্চিম মেদিনীপুর। রাধাকান্ত। ছোট। টেরাকোটা-মণ্ডিত। ১৮২৯। ক্ষীরপাই থেকে বাসে।

৩১। **কুশপাতা,** ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, শীতলা। নিরলংকার ১৮৩২। পূর্বোক্ত, ব্রাহ্মণপাড়ায়।

৩২। **রামজীবনপুর** (দয়াল বাজার)। ছোট। টেরাকোটা-মণ্ডিত। ১৮৩৩।

৩৩। **জাড়া** (ময়না পুকুর), চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর। শিব। ১৮৪২। সামনে শিবের আর একটি দালানও ঐ একই সময়ের, উভয়ই ছোট। কিছু পঙ্খ সম্পন্ন।

৩৪। **দেউচা,** মহম্মদ বাজার, বীরভূম। গোপাল। সালুই পরিবার। ফুলপাথর-অলংকৃত। ১৮৪৩। রামপুরহাট-সিউড়ি বাসে।

৩৫। **সুন্দরনগর,** পাঁশকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর। কৃষ্ণরায়। কিছু পঙ্খ। ১৮৪৬। পাঁশকুড়া থেকে তমলুকের বাসে রঘুনাথবাড়ি গিয়ে ভ্যানরিক্সা।

৩৬। **নবাবগঞ্জ** (ঝুলনতলা, শ্রীধর-বংশীধর রোড),নওয়াপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, গোপীনাথ। ঘেরা ক্ষেত্র। নিবলংকার, ১৮৫০। বাইরের বারান্দার একটি ফলক অনুসারে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী ভারতের তৎকালীন গভর্ণর গিলবার্ট জন এলিয়ট সস্ত্রীক গোপীনাথ দর্শন করতে আসেন। শিয়ালদহ মেইন লাইনের বারাকপুর স্টেশন-সংলগ্ন বাসস্ট্যাণ্ড থেকে ৮৫ নং বাসে ইছাপুর বাদামতলা স্টপ। (পরের পলতা বা ইছাপুর স্টেশন থেকে রিক্সাতেও যাওয়া চলে)।

৩৭। **জাড়া** (সরকারপাড়া), চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর। শিব ও বিষ্ণু। সরকার পরিবার। ছোট। কিছু পঙ্খ। কাছাকাছি আরও দুটি দালান মন্দির। ১৮৫৩।

৩৮। **বাসুদেবপুর,** দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। স্বরূপনারায়ণ ধর্ম। ছোট। ১৮৫৯। পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে—গ্রামের পঞ্চাননতলায়।

৩৯। **রাজনগর,** দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, শীতলা। ছোট। পঙ্খ শোভিত। ১৮৬০। পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাস পথের বকুলতলা থেকে ভ্যানরিক্সা।

৪০। **জাড়া** (ময়নাপুকুর এলাকা), চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর। কাশীনাথ ও পার্বতীনাথ শিব। ছোট। ১৮৬৬।

৪১। **ব্রাহ্মণবসান,** দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। শীতলা। ছোট। পঙ্খ-শোভিত। ১৮৬৭। পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসপথের বেলতলা থেকে ভ্যানরিক্সা।

৪২। **চন্দ্রকোণা** (ঠাকুর বাড়ি বাজার, রাধাকৃষ্ণপুর), পশ্চিম মেদিনীপুর। রামচন্দ্র। দে পরিবার। ছোট। কিছু টেরাকোটা। ১৮৭১।

৪৩। **সরবেড়িয়া** (হাট সরবেড়িয়া), দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, শ্রীধর। ছোট। টেরাকোটা-মণ্ডিত। ১৮৭২। পাঁশকুড়া থেকে রিজার্ভ গাড়িতে বা ঘাটাল বাসের বেলতলা থেকে ভ্যানরিক্সায়।

৪৪। **ডিহি-চেতুয়া** (বলবামবাজার), দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। শীতলা, ছোট। ১৮৮৩। পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসপথের বেলতলা থেকে ভ্যানরিক্সা।

৪৫। **চন্দ্রকোণা** (মিত্রসেনপুর), পশ্চিম মেদিনীপুর, অনন্তদেব। ছোট, টেরাকোটা। ১৮৯৯।

উনিশ শতক : উনিশ শতকের বহু দৃষ্টান্তের প্রতিষ্ঠার বৎসর জানা যায় না, যেমন হুগলীর **দশঘরার** রায় পরিবারের কৃষ্ণ রায়ের চমৎকার ত্রিখিলান দালান; যাইহোক সর্বপ্রথমে উল্লেখ্য নদীয়ার **শান্তিপুরের** দালান মন্দিরগুলি (শিয়ালদহ থেকে শন্তিপুর লোকাল। রিক্সা) :

৪৬। **বড়গোস্বামীপাড়া,** রাধারমণ ঠাকুরবাড়ি, প্রথমে চারটি গুচ্ছ-স্তম্ভের উপর সমতল ছাদের রাসমঞ্চ, পিছনে সামান্য তফাতে দুপাশে দুই গরুড়-স্তম্ভের মাঝে বৃহৎ একখিলান তোরণ, এরপর মাঝে স্তম্ভ-শোভিত নাটমণ্ডপ তাব তিনপাশে তিনটি পাঁচখিলান দালান মন্দির, তিনটিই বৃহৎ ও নিরলংকার, অন্যপাশেও একটি ছোট দালান-মন্দির।

৪৭। **কৃষ্ণরায়** ও কেশবরায় মন্দির। ত্রিখিলান দালান। পাগলা গোস্বামী শাখা ও পাড়া।

৪৮। **মদনগোপাল**, পাঁচখিলান দালান। সামনে রাস্তা ঘেষে আর একটি ত্রিখিলান দালান মন্দির। মদনগোপাল পাড়া।

৪৯। **গোকুলচাঁদ ঠাকুর বাড়ি।** প্রথমে সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ক্ষুদ্র সাধন কক্ষ। এর সামান্য পরে গোকুলচাঁদ ঠাকুরবাড়ির ঘেরা বর্গাকার ক্ষেত্রের প্রবেশ দ্বার, দ্বারের দুপাশে ত্রিখিলান কক্ষ, সামনে বর্গাকার অঙ্গনের শেষে মুখোমুখি গোকুলচাঁদের অসামান্য পাঁচখিলান দালান মন্দির, অঙ্গনের ডানপাশে তুলনায় কম উচ্চতার পাঁচখিলান করে দুভাগে টানা দালান মাঝে এক খিলান প্রবেশ পথ, বাঁ দিকেও দালানের দেওয়াল। গোকুলচাঁদ ঠাকুর লেন।

৫০। **অদ্বৈত ভবন।** প্রথমে রাস্তার উপরে চারটি ঈষৎ মোটা পাইপের মত লোহার স্বম্ভ সহকারে পাঁচটি খিলানে বিভক্ত রাসমঞ্চ। পিছনে সামান্য তফাতে প্রাচীরঘেরা ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশ করলে মাঝে রেলিংঘেরা বর্গাকার অঙ্গন, বাঁয়ে রামচন্দ্রের পাঁচখিলান দালান মন্দির, তার পাশে ত্রিখিলান ভোগ মণ্ডপের দালান, মুখোমুখি অদ্বৈতপ্রভুর টেরাকোটা-মণ্ডিত আটচালা, ডান দিকে গোকুলচাঁদের আটচালা ও অঙ্গনের অপরপাশে অদ্বৈত মন্দিরের মুখোমুখি নাটদালান। মধ্যমগোস্বামী শাখা, গোকুলচাঁদের ঠাকুরবাড়ির অদূরে।

৫১। **বাঁশবুনিয়া** গোস্বামী বাটি—সামনে টালির চালের বারান্দা যোগ করায় দালানটি ঢাকা পড়েছে। কাশ্যপ পাড়া।

৫২। **'ছোটচাকাফেরা'** গোস্বামীবাটি (সীতানাথের বাটি)। রাধাবল্লভের দালান মন্দির সামনে পাঁচখিলান নাটমণ্ডপ ও পাঁচটি জোড়া স্তম্ভের উপর সমতল ছাদের রাসমঞ্চ। প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণনাথ পণ্ডিত। কাশ্যপপাড়া।

৫৩। **রাধারমণ মন্দির।** পাঁচখিলান দালান। বিশ্বাসপাড়া।

৫৪। **পটেশ্বরীর দালান মন্দির।** ছোট। চারটি জোড়া স্তম্ভের উপরে সমতল ছাদ। বারান্দার কার্নিশের তলায় উনিশ শতকীয় রীতিতে কাঠের জাফরি। পটেশ্বরীতলা।—এগুলি ছাড়াও শান্তিপুরে **'শ্যামাচাঁদুনী', 'ঘাটচাঁদুনী', 'সিদ্ধেশ্বরী'** প্রভৃতি নানা লৌকিক কালীর দালান মন্দির—আছে, এমনই একটি হল **'মহিষখাগী'** মন্দির—চারটি সাধারণ 'পিলারে'র উপর সমতল ছাদের বারান্দার পরে প্রথাগত ত্রিখিলান মন্দির, চাঁদুনীপাড়া, সামান্য তফাতে শিবের একটি আটচালা।

৫৫। **সূত্রাগড়ের** সিদ্ধেশ্বরীর দালান মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দুপাশে শিবের দুটি আটচালা এবং ভিতরে সিদ্ধেশ্বরীর পাশে শিবের একটি চারচালা মন্দির রয়েছে। —উল্লেখ্য যে শেষের দুটি ছাড়া শান্তিপুরের দালান মন্দিরগুলি সবসময়েই পাশ্চাত্য ধারার স্তম্ভ ও 'মৌল খিলান' ('True Arch') সমন্বিত। অন্যদিকে খাঁপাড়ার খাঁ বাড়ির গোপীনাথ মন্দিরের পাঁচটি খিলানই সিমেন্ট বালির সংস্কারে আধুনিকতা প্রাপ্ত।

আরও কিছু দালান-মন্দির হল : ৫৬। নদীয়ার ভাইফোঁটার মেলার জন্য বিখ্যাত **বিরহীর** মদনগোপাল মন্দির (শিয়ালদহ মেইন লাইনের মদনপুর স্টেশন থেকে রিক্সা), ঐ লাইনের রাণাঘাটের ৫৭। **সিদ্ধেশ্বরীতলার** সিদ্ধেশ্বরী ও ৫৮। **ষষ্ঠীতলার** ব্রজবল্লভ; পশ্চিম মেদিনীপুরের,

৫৯। **এরেটির** বৃন্দাবনবিহারী (পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে বেলতলা, ভ্যানরিক্সা), ৬০। **ডাঙ্গরার কালী** (খড়গপুর লাইনের বালিচক থেকে বাসে), ৬১। **খাঞ্জাপুর,** বিশালাক্ষী (পূর্বোক্ত এরেটির কাছে), ৬২। **ঐ।** রাধাবল্লভ (ঐ); পাঁচরোলের, ৬৩। **মদনমোহন** ও ৬৪। **ষড়ভুজ, পঙ্খ** অলংকৃত, চারদিকে (দৈর্ঘ্যের দিকে পাঁচ ও প্রস্থের দিকে তিন খিলান প্রদক্ষিণ বারান্দা, (এগ'রা থেকে বাস/ট্রেকারে আলঙ্গিরী। ভ্যানরিক্সা। দাস মহাপাত্র পরিবার, ৬৫। **লালগড়ের সর্বমঙ্গলা** (বক্রচাল, মেদিনীপুর শহর থেকে বাসে), ৬৬। **বারাঙ্গার** রাধাবল্লভরায়, টেরাকোটা সম্পন্ন (দীঘা-পথের রামনগর থেকে এগরার বাসে দেপাল-শাসবাড়, অল্প হাঁটা) ও ৬৭। **হাসিমপুরের** রাম-সীতা, পাথরে নির্মিত (খড়গপুর থেকে বাসে কেশিয়াড়ী, রিক্সা), ৬৮। **ভৈরবপুরের** দামোদর (চন্দ্রকোণা থেকে বাসে); হাওড়া জেলার, ৬৯। **খালনার** ধর্ম (বাগনান থেকে বাসে) , ৭০। **তাজপুরের** ফুলেশ্বর শিব (বাগনান-আমতা বাসে ফতেপুর, হাঁটা), ৭১। **রসপুরের** গড়চণ্ডী.(হাওড়া-ঝিখিরা বাসপথের অমরাগড়ি থেকে ৪ কি.মি.); বাঁকুড়ার, ৭২। **হাড়মাসড়ার** লক্ষ্মীজনার্দন (বাঁকুড়া-বিবরদা-খাতরা বাসে), ৭৩। **মুক্তাতোড়,** নাড়ুগোপাল, টেরাকোটা, (দুর্গাপুর-বাঁকুড়া বাসে, সাহারজোড়ার স্টপ থেকে ভ্যানরিক্সা)। বর্ধমানের **গোহগামের** সুউচ্চ শিখর-দেউলের পিছনে প্রভূত পঙ্খ-অলংকৃত রাধা-দামোদর পরিত্যক্ত, ৭৪। দক্ষিণ ২৪ পরগনার **মজিলপুরের**, ৭৫। গোপাল—গোপালবাড়ি, কিছুকাল আগেও সামনে কাঠের সুউচ্চ ও সুবৃহৎ মণ্ডপ ছিল, এখন চিহ্নমাত্র আছে, গেপালবাড়ির সামনে ঘেরা বর্গাকার অঙ্গনে শিবের জোড়া আটচালা ও দ্বিতল রাসমঞ্চ (জয়নগর-মজিলপুর স্টেশন থেকে রিক্সা, ঠাকুরপাড়া), ৭৬। **জয়নগরের** দুর্গাপুর-উত্তপাড়ার বাসুদেব মন্দির, সঙ্গে ছোট দুর্গা-দালান ও পঞ্চরত্ন দোলমঞ্চ; উত্তর ২৪ পরগনার **ধান্যকুড়িয়ার**, ৭৭। রাধাকান্ত, প্রতিষ্ঠাতা পতিতচন্দ্র সাউ, ৭৮। মদনমোহন, প্রতিষ্ঠাতা রামদেব কাবাসি ও ৭৯। শ্যামসুন্দর, প্রতিষ্ঠাতা ক্ষীরোদপ্রসাদ কাবাসি (বারাসাত বা কলকাতার ধর্মতলা থেকে বারাসাত-টাকি রোড বাসপথের নেহালপুর স্টপেজ থেকে ভ্যানরিক্সায়/হেঁটে); **নৈহাটি কাঁঠালপাড়ার**, ৮০। বিজয় রাধারবল্লভ, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কুলদেবতা, পূর্ণ সংস্কৃত মন্দির, ৮১। **পানিহাটির** চৈতন্যঘাট বা মহাপ্রভুতলার দক্ষিণে দাঁ পরিবারের জগদ্ধাত্রীব ছোট কিন্তু চমৎকার দালানের সামনে স্তম্ভের উপরে রক্ষিত ও গঙ্গার দিকে একচালার মত ঢাল-সম্পন্ন চালের মণ্ডপ ও তারপর গঙ্গাঘাটের দুদিকে যথাক্রমে তারকেশ্বর ও গঙ্গাধর শিবের দুটি আটচালা; আরও কিছু দক্ষিণে পানিহাটি সিদ্ধেশ্বরীতলায়, ৮২। সিদ্ধেশ্বরী কালীর দালান মন্দির; **খড়দহের** গোস্বামীপাড়ায় শ্যামসুন্দরের বিখ্যাত আটচালা মন্দিরের পিছনের গলিতে, ৮৩। শ্রীধরের দালান মন্দির ও তার সামান্য পরে, ৮৪। বৃন্দাবনচন্দ্রের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দালান-মন্দির, ৮৫। শ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের কুঞ্জবাটি বা আদি মন্দির। নিত্যানন্দপ্রভুর বাসস্থান। বসুধা ও জাহ্নবা মাতার লীলাভূমি। তোরণ শোভিত ঘেরাক্ষেত্রে চারিদিকে প্রদক্ষিণ বারান্দা-সহ ত্রিখিলান দালান। সামনের অঙ্গন শেষে দুটি আধুনিক তুলসীমঞ্চ। কুঞ্জবাটির বিপরীতে, ৮৬। গোপীনাথের ছোট ত্রিখিলান দালান—কিন্তু সামনে বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে সমতল ছাদের মণ্ডপ যোগ করায় মন্দির দৃষ্ট হয় না। ঘেরা ক্ষেত্রের দক্ষিণ প্রান্তে আটকোণা দোলমঞ্চের প্রদক্ষিণের আট দিকেই সুদৃশ্য টালির চাল যুক্ত

হয়েছে—উপরের দুটি মন্দিরই শ্যামসুন্দরের উত্তরে, মহাপ্রভুর নবরত্নের আগে। **তালপুকুর** গঙ্গোত্রীপাড়ার শ্মশানঘাট-সংলগ্ন। ৮৭। জগদ্ধাত্রীর একদা অসাধারণ পাঁচখিলান দালানের সামনের বারান্দার পাঁচটি খিলানই পড়ে গেলেও এবং মূল দালানটি ভায়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সেখানে এখনও পূজাপাঠ চালু আছে, **মণিরামপুর,** বারাকপুরের (৮৮) বুড়ো শিবের একদুয়ারি দালান-মন্দির শতাধিক বৎসরের পুরাতন (বারাকপুর স্টেশন-সংলগ্ন বাসস্ট্যাণ্ড থেকে ৮১নং বাসের শেষ স্টপ থেকে রিক্সায়/হেঁটে); বাঁকুড়ার **হদলনারায়পুরের** ব্রহ্মাণী দেবীরূপে প্রভূত মান্য হলেও তাঁর (৮৯) দালানটি সাধারণ; হাওড়ার ঝিখিড়ার সংলগ্ন গ্রাম **চিংড়াজোলে** ধর্মঠাকুরের একটি ছোট (৯০) দালান আছে; বর্ধমান জেলার (৯১) **দক্ষিণখণ্ডে** ধর্মঠাকুরের পূর্ণ সংস্কৃত ত্রিখিলান দালানের অঙ্গনে বর্গরেখাকারে আরও ছয়টি মন্দির রয়েছে—তিনটি সাধারণ চারচালা, দুটি ছোট দালান ও একটি বেশ বড় রেখ দেউল (অণ্ডাল থেকে বাসে, বাসরাস্তার পাশেই); মুর্শিদাবাদ জেলার **লালগোলার** রাজপরিবারের (৯২) 'রামসীতা' (আটটি গোলাকার স্তম্ভ নির্ভর বারান্দাসহ বৃহৎ দালান), লালগোলার মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ 'এই জীর্ণ গৃহের' সংস্কার করেন গত শতকের চল্লিশের দশকে (শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে লালগোলা, রিক্সা। রাজবাড়ি এলাকায় 'মুক্ত সংশোধনাগারে'র পিছনে)। (৯৩) পশ্চিম মেদিনীপুরের **পাথরায়** মজুমদার পরিবারের 'রাধাগোবিন্দ'—বৃহৎ, পাঁচখিলান দালান (পরিত্যক্ত)

উপরে বলা ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও আরও বহু যেসব জায়গায় দালানরীতির মন্দির আছে সেগুলির মধ্যে আছে হুগলীর **পাণ্ডুগ্রাম** (শ্রীধর, বক্রচাল, টেরাকোটা), বর্ধমানের **বাহাদুরপুর** (আউসগ্রাম), ত্রিখিলান কিন্তু দুদিকে দুটি নকল খিলান থাকায় পাঁচখিলান মনে হয় এবং সচরাচর দৃষ্ট হয় এমন দালান-মন্দির আছে পশ্চিম মেদিনীপুরের **লোয়াদা,** (পাঁশকুড়া), **আমনপুর** (কেশপুর), **গোপালপুর** (দাসপুব) প্রভৃতি গ্রামে—বাঁকুড়ার **কোতুলপুর, জয়কৃষ্ণপুর** (বিষ্ণুপুব), **বিক্রমপুর** (ওঁদা), **মাকরকোল** (ওঁদা, বহুলাড়ার পথে, পঙ্খের প্রভূত কাজে সমৃদ্ধ) প্রভৃতি বহু গ্রামে। **কলকাতাতেও** আছে অনেকগুলি দালানরীতির মন্দির (দেখুন **তারাপদ সাঁতরা,** প্রাগুক্ত **'কলকাতার মন্দির-মসজিদ', সারণি-১৪,** পৃ. ৭৬-৭৭)

পঞ্জি ১১(ক) একটি ব্যতিক্রমী দালান মন্দির :

(ক) **বহড়ু,** জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। (খ) শ্যামসুন্দর। (গ) নন্দকুমার বসু। (ঘ) তিন কক্ষের দালান—মাঝে গর্ভগৃহ বা কৃষ্ণ-রাধিকার অধিষ্ঠান কক্ষ, একপাশে শ্যামসুন্দরের শয়নকক্ষ ও অন্যপাশে ভোগঘর। দরজায় কাঠের কাজ। কিন্তু মন্দিরটির আসল বৈশিষ্ট্যটি রয়ে গেছে সম্মুখপাত্রে দুর্গারাম ভাস্কর-কৃত অসাধারণ ফ্রেসকো চিত্র-সমাহারে—এই দিক হতে মন্দিরটি পূর্ণ ব্যতিক্রমী—হুগলীর গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্রের বৃহৎ আটচালা মন্দিরেও চিত্রাঙ্কন আছে কিন্তু তা গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে। ফ্রেসকো চিত্রগুলির বিষয়বস্তু রামলীলা, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি। অঙ্কনশৈলীর দিক থেকে কেউ কেউ এর সঙ্গে কালীঘাটের পটের মিল দেখতে পান। জীর্ণ হয়ে পড়লেও চিত্রগুলি এখনও মুগ্ধ করে। ঘেরা ক্ষেত্রের বাইরের মাঠের দ্বিতল দোলমঞ্চটিও চমৎকার। (ঙ) ১৮২১-২৫। (চ) শিয়ালদহ দক্ষিণ থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর/কাকদ্বীপ লোকালে বহড়ু। হাঁটা/রিক্সা।

পঞ্জি ১১ (খ) : মৃত একটি অনন্য মন্দির :

(ক) **সাদিপুর,** জামালপুর, বর্ধমান। (খ) মদনমোহন। (গ) মিত্র পরিবার, বড়িশা হতে আগত। বর্তমান অধিকারী নীরেন্দ্রমোহন মিত্র ও তাঁর কন্যা রমা মিত্র। (ঘ) সামনে অসাধারণ নাটমণ্ডপ, পলেস্তরা সম্পূর্ণভাবে খলে গেলেও দর্শকের মনে সম্ভ্রম জাগায়। এরপর মূল মন্দির ও তার গর্ভগৃহ জঙ্গলাকীর্ণ, ভগ্ন দেওয়াল, লুপ্ত ছাদ। প্রবেশপথের উপরস্থ পঙ্খের বৃহৎ ময়ূর চূড়ান্ত ধ্বংসাবস্থার মধ্যেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, পাশে ক্ষুদ্র ঘড়িঘর, তার সামনে একটি ছোট কূপ—সবই ঘন জঙ্গলের ভিতর। অনতিদূরে মদনমোহনের রাসমঞ্চটিকে মন্দিরে পরিণত করে মদনমোহন বিগ্রহ সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়েছ—মূল মন্দির বেদনাদায়ক ভাবে মৃত হলেও এখনও অনুভব করা যায় কত মহীয়ান ছিল সাদিপুরের মদনমোহন মন্দির সংস্থান। (ঙ) ১৯ শতক—তবে মদনমোহন-বিগ্রহ এর পূর্ববর্তী। (চ) কর্ড লাইনের মসাগ্রাম থেকে ট্রেকারে সাদিপুর ঘাট —এবার দামোদর পার হলেই সাদিপুর।

পঞ্জি ১১ (গ) : ভক্তগণ কর্তৃক বহুল সংস্কারে কার্যত নবীকৃত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ পুরাতন ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পন্ন কয়েকটি একতলা দালান মন্দির :

১. **কুমারপাড়া,** মুর্শিদাবাদ (লালবাগ), মুর্শিদাবাদ। রাধামাধব। শিয়ালদহ-লালাগোলা লাইনের মুর্শিদাবাদ স্টেশান থেকে রিক্সায়। লালবাগ-বহরমপুর (ভায়া চুনাখালি) বাসে বা ট্রেকারে কুমারপাড়া স্টপেজ।

মন্দির-প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে দুটি মত চলিত আছে। প্রথম, ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে জীব গোস্বামীর শিষ্য হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণী (ইনি প্রকৃতপক্ষে পুরুষ ছিলেন—সখীভাবে সাধনা করতেন বলে এই নাম নিয়েছিলেন) বৃন্দাবন থেকে কষ্টিপাথরের রাধামাধবের বিগ্রহ এনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয়ত ঐ একই সময়ে হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণীর অন্যতম শিষ্য তথা জীব গোস্বামী বংশীয় বংশীবদন গোস্বামী এই মন্দির প্রতিষ্টা করেন। এঁদের দুজনের মধ্যে যিনিই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করে থাকুন, তা তিনি করেছেন সপ্তদশ শতকের শুরুতে।

বর্তমান মন্দিরটি বেশ পরবর্তীকালের। এটি তৈরী দেন নিকটবর্তী চুনাখালির জমিদারগণ সম্ভবত অষ্টাদশ শতকে। এপ্রসঙ্গে খুবই স্মরণীয় যে অষ্টাদশ শতকে চুণাখালি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তারপরেও চারখিলান বারান্দা সহ মন্দিরটি বহুবার সংস্কৃত ও স্থানে স্থানে পুনর্নির্মিত হয়েছে। মন্দিরের সামনের অঙ্গনের তিন দিকে আয়তাকারে সেবায়েৎ ও অতিথিদের জন্য ঘর—অনেক কটিই সাম্প্রতিক কালে নির্মিত বা পুনর্নির্মিত। প্রাচীনতার ছাপ অদৃশ্য।

যাই হোক, মন্দিরের মাধবীকুঞ্জের পর রাধামাধবের গোলাকৃতি, দ্বিতল ও আদি স্নানমন্দিরটি দেখার মত, পিছনে থাকা মোতিঝিল এর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করছে। রাধামাধবের স্নানযাত্রার মেলা একসময় মুর্শিদাবাদ জেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় মেলাগুলির একটি ছিল।

প্রসঙ্গত, মালদহের গৌড়ের রামকেলি মন্দিরক্ষেত্রের পরিচালন-ক্ষমতাও কুমারপাড়ার শ্রীপাট-কর্তৃপক্ষের হাতে ছিল। এ সম্পর্কে কিছুকাল আগে কলকাতা হাইকোর্টে একটা মামলাও হয়েছিল।

২। **সর,** (সরবৃন্দাবন), আউসগ্রাম, বর্ধমান। রাধাবল্লভ। বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে গলসী—এখান থেকে ভ্যানরিক্সায়। অথবা, বর্ধমান স্টেশান থেকে আসানসোল লোকালে ১৬/১৭ মিনিটে গলসী—স্টেশান থেকে ভ্যানরিক্সায়। উভয় ক্ষেত্রেই ৪/৫ কি.মি.। সরগ্রামে ঢোকার মুখে বাঁয়ে এক জোড়া শিখর দেউল দেখা যাবে—এইখান থেকে মূল রাস্তা ছেড়ে বাঁয়ের কাঁচা রাস্তা ধরে গেলে বাঁয়েই পড়বে। ঘেরা চত্বরে প্রবেশদ্বারের দুপাশে দটি বড় মাপের টেরাকোটা ঘোড়া। প্রবেশের পর স্তম্ভের উপর স্থাপিত সমতল ছাদের নাটদালান ও এরপরেই রাধাবল্লভের বর্তমান ত্রিখিলান দালান মন্দিব, দেখে ১৯ শতকে নির্মিত বলেই মনে হয়· তবে এটি বাধাবল্লভের আদি মন্দির নয়, আদি মন্দির বিনষ্ট হলে তার সামান্য তফাতে পুনর্নির্মিত মন্দির। আদি মন্দিরের কোনও চিহ্ন মাটির উপরে এখন নেই, বর্তমান মন্দিরের বাঁয়ে সামান্য তফাতে অঙ্গনে যে ঈষৎ উঁচু জায়গা আছে, সেখানে খনন করলে হয়তো তার ভিৎ পাওয়া যাবে।

প্রাপ্ত সূত্রাদি হতে জানা যায় শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বৈষ্ণব সাধক সাবঙ্গমুবারি সর গ্রামে রাধাবল্লভ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং বর্তমান মন্দিরক্ষেত্র ও শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা করেন (সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে) তাঁর শিষ্য মুরারিমোহন। সর গ্রামের গোস্বামীগণ মুরারিমোহনের বংশধর এবং মন্দিরের বিপরীতে পুরাতন দালানগুলিতে তাঁরা এখনও বসবাস করছেন। সারঙ্গমুরারির আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে কোজাগরী পূর্ণিমার পরের দশদিনব্যাপী মহোৎসব ছাড়াও স্নানযাত্রা এবং দোলযাত্রা উৎসব প্রতি বৎসর নিষ্ঠাব সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। রাধাবল্লভের প্রভাব ও মহিমার জন্যই সর গ্রাম বৈষ্ণব মহলে 'সরবৃন্দাবন' নামে পরিচিত।

৩। **লাভপুর,** বীরভূম। ফুল্লরা। বোলপুর, কাটোয়া বা আহ্‌মেদপুর থেকে বাসে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত "বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি" গ্রন্থে (পৃ: ৮১) দেবকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন :

"সতীর 'ওষ্ঠ' এখানে পতিত হয়। 'পীঠনির্ণয় তন্ত্রে' উল্লিখিত আছে—

'অট্টহাসে চোষ্ঠপাতো দেবী সা ফুল্লরা স্মৃতা।

বিশ্বেশো (পাঠান্তরে বিঘ্নেশো) ভৈববস্তত্র সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়ক' ।।

'জ্ঞানার্নব তন্ত্রে' এই পীঠের উল্লেখ আছে। 'বৃহন্নীলতন্ত্রে' উল্লিখিত এই পীঠের দেবী ভীমকালী নামে পরিচিতা ('অট্টহাসে মহাপীঠে ভীমকালী চ কালিকা')। 'শিবচরিতে'র মতে অট্টহাস 'উপপীঠ' রূপে পরিগণিত, তথায় সতীর 'ওষ্ঠাংশ' পতিত হয় জানা যায় এবং দেবীর নাম 'ফুল্লরা' ও ভৈরবের নাম 'বিশ্বনাথ'। 'প্রাণতোষিণী তন্ত্রের মতে দেবীর নাম 'চামুণ্ডা' বা কোন কোন পুঁথিতে তাঁহাকে 'মহানন্দা' রূপে এবং ভৈরবের নাম 'মহানন্দ'-রূপে উল্লেখ আছে। (Dr. D. C. Sircar প্রণীত 'The Sakta Pithas' প্রবন্ধের ৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) অন্যান্য উপকরণের মধ্যে 'সুরা' না দিলে দেবীর ভোগ হয় না।" দেবীর দালানটি সাধারণ হলেও ক্ষেত্রে শিবের আটচালাটি বৈশিষ্ট্যপুর্ণ।

৪। **দ্বারবাসিনী,** পাণ্ডুয়া, হুগলী। বিষহরি (দ্বারবাসিনী)। হাওড়া-ব্যাণ্ডেল লাইনের চুঁচুড়ার ঘড়িমোড় হয়ে বাসে। আবার, ধনিয়াখালি বা গুড়াপ থেকে আলসিন মোড় পর্যন্ত বাসে এসেও হেঁটে বা রিক্সায় সহজেই দ্বারবাসিনী যাওয়া যায়।

দ্বারবাসিনী প্রাচীন স্থান। এখানে ও সংলগ্ন পুনাজগড়ে পাল সেন আমলের অনেকগুলি মূর্তি পাওয়া গেছে—বিষ্ণু, বরাহ, সূর্য, চণ্ডী প্রভৃতি। মূর্তিগুলি কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম রক্ষিত আছে। এ হতে অনেকে মনে করেন যে মহানাদকে কেন্দ্র করে যে প্রাচীন পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল দ্বারবাসিনী ছিল তার অন্তর্ভুক্ত—এখান থেকে মহানাদ দূরে নয়। কিংবদন্তি অনুসারে দ্বারপাল নামক কোনও গোপরাজার নাম থেকে দ্বারবাসিনী নামটি এসেছে। কেউ কেউ আবার আরও একধাপ এগিয়ে বলতে চান যে দ্বারপাল ছিলেন প্রাচীন পালবংশের একটি শাখা বা উপশাখা বংশের প্রতিনিধি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে দ্বারবাসিনী নীলচাষ ও ব্যবসার বড় কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এখানকার সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ও সে সময় ধন ও প্রতিপত্তিশালী ছিল। জীয়ৎকুণ্ড, সাত সতীনের দীঘি, পাপহরণ প্রভৃতি জলাশয়গুলি এখানকার প্রাচীনতার সাক্ষ্য।

দ্বারবাসিনী নামে পরিচিতা বিষহরির দালান মন্দিরটি ১৯ শতকের, কিন্তু বর্তমানে সিমেন্ট বালির পুনর্নির্মাণে তা সম্পূর্ণ আধুনিক দালানে পরিণত। গ্রামীণ ঐতিহ্য থেকে মনে হয় যে দালান প্রতিষ্ঠার আগেও কেদারমতী তীরের এই স্থানে বাঁশখড়ের ঘরে বিষহরির পূজা চলিত ছিল। দেবী মৃন্ময়ী, দ্বিভূজা ও পাশে দণ্ডায়মান মহাদেব। জ্যৈষ্ঠ মাসের নাগপঞ্চমীতে বিষহরির ঝাঁপান উপলক্ষে মেলা বসে। একই রাস্তার একমুখে সেনেটের বিশালাক্ষী ও অন্য মুখে দ্বারবাসিনীর বিষহরি লোক ঐতিহ্যে দুই বোন রূপে কল্পিতা হন।

৫। **টিটাগড়,** (লক্ষ্মীঘাট), উত্তর ২৪ পরগণা। বিশালাক্ষী। কলকাতার ধর্মতলা থেকে বারাকপুরমুখী যে কোনও বাসে যাত্রা করে টিটাগড় থানা স্টপেজ নেমে রিক্সায় অথবা শিয়ালদহ নৈহাটি লাইনের টিটাগড় স্টেশান থেকে রিক্সা। অটোরিক্সা।

টিটাগড় বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে ঘিঞ্জী, সবচেয়ে গাদাগাদি-ঠাসাঠাসি লোকারণ্যময় শিল্প শহর—দূষণ, কোলাহল এত তীব্র যে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় সারা ভারতবর্ষে তা বিরল। জনসংখ্যার প্রায় সবটাই অবাঙ্গালী। কিন্তু ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের আগেও গ্রাম্য লৌকিক দেবী বিশালাক্ষীকে কেন্দ্র করে টিটাগড় ছিল গঙ্গাতীরের এক অজ পাড়গাঁ—প্রকৃতপক্ষে এই বিশালাক্ষীকে সামনে রেখেই অবাঙ্গালী জনসমুদ্রের মধ্যে ক্ষুদ্র ও প্রাচীন একটি বাঙ্গালী পাড়া আজও এখানে রয়ে গেছে, বেশ বোঝা যায় যে বিশালাক্ষীর প্রভাবেই এই ক্ষুদ্র অঞ্চল তখন ব্রিটিশ সরকার পোষিত ইংরাজ মিল মালিকরা অধিগ্রহণ করতে পারেনি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা", প্রথম খণ্ড, ১৮১৮-১৮৩০ (চতুর্থ মুদ্রণ ১৩৭৭)-এর ৩০৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত একটি সংবাদ আমরা সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি :

৪ অক্টোবর ১৮২৮। ২০ আশ্বিন ১২৩৫

. নূতন পথ। —ভাগীরথীর পূর্ব্ব অংশ টিটাগড় গ্রামে এক ক্ষুদ্র পথ আছে টিটেগড় হইতে সুখচর যাইতে অত্যল্প দূরেই এই রাস্তা পাওয়া যায় ইহার পরিসর বিস্তর নহে কিন্তু পদব্রজে অথবা শকট আরোহণে যাইতে লোকেরদের বিস্তর ক্লেশ হয় বিশেষতঃ বর্ষার সময়ে কর্দ্দমজন্য তাহাতে অত্যন্ত দুর্গম বোধ করেন এমত বিজ্ঞ শ্রীযুত ত্রবর এবং সিক্সিপিয়র সাহেব প্রভৃতি সেই রাস্তা ভাঙ্গিয়া কৃপাপূর্ব্বক বৃহৎ রাস্তা করিবেন কল্প করিয়া কতকগুলিন বন্দুয়ান চোর আনিয়া উদ্যোগ করিয়াছেন ইহা শীঘ্র হইবেক শুনা যাইতেছে আমরা মহাহর্ষপূর্ব্বক লিখিতেছি যে শ্রীযুত সাহেবেরা এরূপ লোকেরদের প্রতি দয়াপ্রকাশে তাঁহারদের প্রতিষ্ঠার সীমা নাই এবং তত্রস্থ লোকেরাও এরূপ ব্যাপার দেখিয়া বহুতর প্রশংসা করিতেছে।

১৮২৮-এর এই অজগ্রামই ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দেশের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শিল্প শহর ও বস্তিতে পরিণত হল—সমগ্র বিষয়টির অর্থনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক অধিক্ষেপ সমূহ নিয়ে গভীরগামী গবেষণা একান্ত জরুরী।

যাই হোক টিটাগড়ের বিশালাক্ষী মন্দিরের দালানটি কিন্তু পুনর্নির্মিত ও সাম্প্রতিক—প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলের অবাঙ্গালী জনসাধারণও বাংলার খাঁটি লৌকিক দেবীকে এত গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আপন করে নিয়েছেন যে ভক্তদের আগ্রহে মন্দিরটির সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের প্রক্রিয়া শতাধিক বছর ধরে প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবেই চলে আসছে. ফলত মন্দিরে প্রাচীনতার চিহ্ন নেই। তবে দেবীর মন্দিরের ডান পাশে দেবীর ভৈরব শিবের মন্দির মূল ভাগের প্রাচীনতা বজায় আছে, যদিও চারকোণের চারদেওয়াল হতে কোণাকুণি খাড়া একটি শিখর পরে সংযোজিত হয়েছে।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ' (পূর্ববঙ্গ রেলপথ)-এর দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ডের ৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ·

"টিটাগড়—কলিকাতা হইতে ১২ মাইল দূর। বহু পাটকল ও কাগজের কলের জন্য এই স্থান বিখ্যাত।

স্টেশন হইতে প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে গঙ্গাতীরে বিশালাক্ষীর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটি আধুনিক হইলেও এই দেবী অতি পুরাতন। দেবী ত্রিনেত্রা, পীতবর্ণা ও চতুর্ভুজা। মন্দিরের নিকটেই গঙ্গাগর্ভে "বিশালক্ষীর দহ" নামে একটি অতি গভীর দহ আছে। স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস দেবীর পূজা না দিয়া নৌকা ছাড়িলে দেবী এই দহ মধ্যে নৌকা ডুবাইয়া দেন। বৈশাখ মাসে দেবীকে গঙ্গাজলে স্নান করাইবার জন্য এখানে বহু নরনারীর সমাগম হয়।"

উকৎট শিল্পায়ণ ও নগরায়ণ সত্ত্বেও এই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। কৃষিভিত্তিক লোকদেবী কিভাবে জনাকীর্ণ ও ব্যস্ততম শিল্প-বস্তির সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মানিয়ে নিলেন, তা গভীর গবেষণার বস্তু।

৬। **কৃষ্ণচন্দ্রপুর,** মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ত্রিপুরাসুন্দরী। শিয়ালদহ দক্ষিণ প্ল্যাটফর্ম থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর বা কাকদ্বীপ লোকালে মথুরাপুর—স্টেশান থেকে বেরিয়ে সামান্য ডানে এগিয়ে অটোস্ট্যান্ড থেকে কাশীনগরগামী অটোয় কৃষ্ণচন্দ্রপুর মোড়।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে'র কোনও কোনও সংস্করণে আছে : ''ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা। / ছত্রভোগে উত্তরিলা অবসান বেলা।।/ ত্রিপুরা পূজিয়া সাধু চলিল সত্বর। / অম্বুলিঙ্গে গিয়া উত্তরিলা সদাগর।।'' প্রকৃতপক্ষে আদিগঙ্গার খাত ও স্রোত যখন অনবরুদ্ধ ছিল তখন বাংলার তীর্থযাত্রী ও বণিক সওদাগরগণ ছত্রভোগে পৌঁছিয়ে ত্রিপুরাসুন্দরী এবং অম্বুলিঙ্গ শিব দর্শন করে সমুদ্রযাত্রা করতেন (বড়াশি মাধবপুরের অম্বুলিঙ্গ শিব প্রসঙ্গে আলোচিত)। পূর্ববঙ্গ রেল প্রকাশিত ''বাংলায় ভ্রমণ''-এ বলা হয়েছে; ''ছত্রভোগের ত্রিপুরাসুন্দরী মূর্ত্তিও অতি সুন্দর' এখানে স্নান যাত্রার সময়ে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। কেব কেহ বলেন যে ত্রিপুরাসুন্দরী একটি শক্তিপীঠ, বড়াশী গ্রামের বদরিকা নাথ মহাদেব ইহার ভৈবব'' (প্রাগুক্ত সংস্করণ ও খণ্ড, পৃ: ১৮৫)।

শ্রদ্ধেয় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''বঙ্গীয় শব্দকোষ'' (সাহিত্য আকাদেমি, ২০০১ মুদ্রণ, প্রথম খণ্ড, পৃ: ১০৬৭) অনুসরণে বলা যায় 'ত্রিপুরা' হলেন 'ত্রিপুর' নামে পরিচিত অসুরত্রয়ের নাশক শিবের ভৈরবী, মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' 'ত্রিপুরা' হলেন দুর্গা এবং ইনিই 'শিবায়ন' কাব্যে 'ত্রিপুরাসুন্দরী'।

যাইহোক। ত্রিপুরাসুন্দরী অত্যন্ত প্রাচীন হলেও তাঁর বর্তমান দালান মন্দিরটি অতি সাধারণ ও পুনর্নির্মিত। ফলে স্থাপত্য নয়, ইতিহাস ও সংস্কৃতিই এখানে গুরুত্বপূর্ণ.

প্রসঙ্গত এই একই ভ্রমণে দেখে নেওয়া যায় ঃ মাইবিবির হাট, খাড়ি, ছত্রভোগ, শাসনপাড়ার ঐতিহাসিক দুই স্থান—গাজী সাহেবের আস্তানা ও নারায়ণী মন্দির (বর্তমানে আধুনিক দালান); রাধাবল্লভের মন্দির; অন্ধমুনিতলা, বড়াশীর বদরিকানাথ এবং সময় থাকলে বাহির কাঞ্চলীর শিব ও কালী মন্দির।

৭। **শিয়াখালা,** চণ্ডীতলা, হুগলী। দেবী উত্তরবাহিনী। কিংবদন্তি অনুসারে প্রায় ৫০০ বছর আগে দেবীর আদি মন্দিরটি নির্মাণ করান গোপীনাথ বসু, সুলতান তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন পুরন্দর খাঁ—ইনিই নাকি আবার অন্যতম আদি বৈষ্ণব পদকর্তা যশোরাজ খান যিনি নাকি আবার গুণরাজ খান নামে পরিচিত 'কৃষ্ণবিজয়' কাব্যের কবি মালাধর বসুর জ্ঞাতি। যাইহোক, দেবীর মন্দির না হলেও দেবী উত্তরবাহিনী যথেষ্ট প্রাচীন। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম লিখেছেন :

''শিয়াখালায় বন্দিব উত্তরবাহিনী।
ভক্তিভাবে ইলিপুরের বন্দিমু রঙ্কিণী।।

(চণ্ডীমঙ্গল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫)

সুতরাং ষোড়শ শতকের সূচনাতেই দেবী উত্তরবাহিনী অতীব ম্যান্যা হয়ে উঠেছিলেন। দেবীর আদি মন্দির বিনষ্ট হলে বর্তমান পাঁচখিলান মন্দিরটি নির্মাণ করান স্থানীয় জনসধারণ। একটি কিংবদন্তি অনুসারে ঘর থেকে বিতাড়িত এক মুর্খ ব্রাহ্মণ নদীজলে ডুবে মরতে গেলে

দৈবাদেশ হয় যে নদীগর্ভ হতে দেবীর একটি ছোট মূর্তি উদ্ধার করে তাঁর সাধনা করলে তিনি সিদ্ধি লাভ করবেন, ব্রাহ্মণ তা-ই করে সিদ্ধ হন। দ্বিতীয় কিংবদন্তি অনুসারে একজন ধনী যখন নৌকা করে যাচ্ছিলেন তখন দেবী সাধারণ নারীর বেশে সেই ধনপতিকে নৌকা থামাতে বলেন, ধনপতি তা গ্রাহ্য না করলে ক্রুদ্ধ দেবী উত্তরদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেন, সঙ্গে সঙ্গে নৌকাটি নিমজ্জিত হয়—মন্দিরের সামনে একটি খাতের চিহ্ন আছে, এটিকে 'ডিঙি ডোবার খাত' বলা হয়। দেবী পীতবর্ণা, রক্তাম্বরী, নৃমুণ্ডমালিনী, দ্বিভুজা—একহাতে খড়্গ ও অন্যহাতে খর্পরধারিণী এবং তাঁর এক পা মহাকালের বুকে এবং অন্য পা বটুক ভৈরবের মাথায়। লোককল্পনায় ইনি অনতিদূরের রাজবলহাটের রাজবল্লভীমাতার বোন—বোঝা যায় যে, হুগলী জেলার এইসব অঞ্চলে তান্ত্রিক আচার ও সংস্কৃতি প্রবল বলশালী ছিল, আজও শারদীয়া একাদশীতে উত্তরবাহিনীর নবঘট পূজায় অসংখ্য নরনারীর সমাগম হয়। (বর্ধমান কর্ড লাইনের জনাই স্টেশন থেকে অটোয় বা ডানকুনি থেকে বাসে)।

পঞ্জি ১১ (ক) ধ্রুপদী ইওরোপীয় স্তম্ভযুক্ত দালান :

লাওদা, দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ভূতনাথ শিব। সুউচ্চ গোলাকার ধ্রুপদী ইওরোপীয় স্তম্ভশ্রেনি-নির্ভর সুবৃহৎ দালান। সামনে টিনের চালের নাটমণ্ডপ। ক্ষেত্রে প্রবেশের পথের উপরে নহবৎ। ১৯ শতকের মাঝে। (দাসপুর থেকে রিক্সা)।

পঞ্জি (খ) : দ্বিতল দালান :

১। **রাউতাড়া (কেরাণীবাটি, ঝিখিরা),** আমতা, হাওড়া। রঘুনাথ। বৃহৎ। দৈর্ঘ্য আনু ৩০ ফুট, উচ্চতা আনু ৩৫/৪০ ফুট। একতলায় দুপাশে দালান ও মাঝে ত্রিখিলান প্রবেশ—পূজার প্রয়োজনে বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহৃত। দ্বিতলে মন্দির। কিছু পঙ্খ। (হাওড়া-ঝিখিরা বাসে, ঝিখিরা বাসস্ট্যাণ্ডের অদূরে)। ১৮ শতকের শুরুতে।

২। **শ্রীবাটি,** কাটোয়া, বর্ধমান। রঘুনাথ। চন্দ পরিবার। নাতিবৃহৎ। ১৭০৫। কাটোয়া থেকে বাসে। গ্রামের বিখ্যাত ভোলানাথ, চন্দ্রেশ্বর ও শঙ্কর শিব মন্দিরের নিকটে।

৩। **গাজীপুর (মজুমদার পাড়া)** আমতা, হাওড়া। গোবিন্দরায়। মজুমদার পরিবার। ত্রিখিলান। একতলাটি দৈর্ঘ্যে আনু ২৫ ফুট, কিন্তু দোতলাটি এর প্রায় অর্ধেক। উচ্চতা ৩০ ফুটের কাছাকাছি। দামোদরের নিকটে হওয়ায় বন্যার সময় বিগ্রহ-রক্ষার প্রয়োজনেই এমন ব্যবস্থা। সংস্কারে টেরাকোটা লুপ্ত। ১৭১৪ (হাওড়া-ঝিখিরা বাসে আমতার পরে দামোদর-সেতু পেরিয়েই বেতাই (নারিট) -এ নেমে রিক্সা/হাঁটা।

৪। **কাটান,** ঘাটাল পশ্চিম মেদিনীপুর। শ্রীধর। প্রামাণিক পরিবার। দৈর্ঘ্যে ১৬ ফুট ও উচ্চতায় ১৭ ফুট। টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। দরজায় কাঠের কাজ। অদূরে ন-চূড়া রাসমঞ্চ। ১৮ শতকের মধ্যভাগ। ঘাটালের লাগোয়া। ঘাটাল-পাঁশকুড়া বাসে নিমতলা। রিক্সা।—ঘাটাল থেকেও শিলাবতীর বাঁধরাস্তা ধরে রিক্সায়/হেঁটে।

৫। **জঙ্গীপুর** (বারুইপাড়া), রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। বৃন্দাবনবিহারী। প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান কীর্তিচন্দ্র। প্রাসাদ তুল্য। বৃহৎ। দ্বিতলে গর্ভগৃহের সামনের বারান্দার সামনে পরপর আটটি

রাজসিক স্তম্ভ। নিচে একতলের সামনে নাটমণ্ডপ। ১৭৬৩। (শিয়ালদহ লালগোলা লাইনের বহরমপুর/জিয়াগঞ্জ/লালগোলা থেকে বাসে। গঙ্গার উপরকার সেতুর সামনে নেমে রিক্সায়—সদরঘাট ও বাবুবাজারের পরে)।

৬। **রঘুনাথগঞ্জ** (বাজার), মুর্শিদাবাদ। তুলসীবিহার। প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান কীর্তিচন্দ্র। সংস্কারে আধুনিক দালানে পরিণত। ১৭৬৩। (আগেরটিতে বলা বাসগুলিতে গঙ্গাসেতু পেরিয়ে গঙ্গাপাড়ের পথে হেঁটে বাজরে বা জঙ্গীপুর সদরঘাট থেকে গঙ্গা পেরিয়ে ঐ একই পথে)।

৭। **জয়পুর** (রায়পাড়া) আমতা, হাওড়া। লক্ষ্মীজনার্দন। প্রতিষ্ঠাতা কালীরাম রায়। নাতিবৃহৎ। দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা কমবেশি ৩০ ফুট। পঙ্খ অলংকৃত। ১৭৭৭। (হাওড়া ঝিখিরা বাসে। বাসস্ট্যাণ্ডের লাগোয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশ থেকে ভ্যানরিক্সায়—এখানকার বিখ্যাত জয়চণ্ডীতলার প্রাথমিব বিদ্যালয়ের পিছনদিকে একটি আধুনিক কালীমন্দিরের সামনের পথ ধরে সামান্য গিয়ে)।

৮। **ভগলপুর,** কোতুলপুর, বাঁকুড়া। কৃষ্ণরায়। প্রতিষ্ঠাতা, নবকৃষ্ণ রায়, কারিগর। ১৭৯৩। (বিষ্ণুপুর বা আরামবাগ থেকে বাসে কোতুলপুরে গিয়ে নিজ ব্যবস্থায়)।

৯। **জঙ্গীপুর,** (বাবুবাজার), মুর্শিদাবাদ। রঘুনাথ। প্রতিষ্ঠাতা খোশাল সিংহ (রানী ভবানীর কর্মচারী)। প্রথম তলের উপরে অর্ধবৃত্তাকার বারান্দা, দুপাশ দিয়ে দুটি সিঁড়ি। বারান্দার পিছনে, দ্বিতীয় তলে গর্ভগৃহ। সামনে টিনেব চালের বৃহৎ নাটমণ্ডপ, এরপরে দ্বিতল অতিথি ভবন। ক্ষেত্রের প্রবেশদ্বারের দুপাশে দুটি ও বিপরীত দিকে একজোড়া—মোট চারটি আটকোণা শিবমন্দির। ১৭৯৪। (ক্রম-৪ সদরঘাটের লাগোয়া বাবুবাজারে)।

১০। **উদয়রাজপুর,** গোঘাট, হুগলী। দামোদর। দাঁ পরিবার। দৈর্ঘ্য আনু ২০/২২ ফুট। উচ্চতা ২০ ফুট (আনু)। কিছু টেরাকোটা। ১৮ শতক। (আরামবাগ থেকে বাসে বালিদেওয়ানগঞ্জ। ট্যাক্সি)।

১১। **গোপালপুর,** খয়রাশোল, বীরভূম। দামোদর (বিষ্ণু)। দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা আনু ২০/২২ ফুট। সংস্কারে অলংকরণ লুপ্ত। দ্বিতীয় তলটি প্রথম তলের চেয়ে ছোট (সিউড়ি বা দুবারাজপুর থেকে বাবাইজোড়গামী বাসে গোপালপুর মোড়। রিক্সা)।

১২। **অযোধ্যা,** বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। দামোদর বংশীগোপাল। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। দৈর্ঘ্যে আনু ১৬ ফুট, উচ্চতা আনু. ২০ ফুট। নিরলংকার। (বিষ্ণুপুর থেকে বাসে জয়কৃষ্ণপুরে গিয়ে রিক্সায়—অযোধ্যা হাইস্কুল মোড় থেকে ঢুকে দ্বাদশ শিব ক্ষেত্র, এখানকার রাসমঞ্চ ইত্যাদির পরে কোণে ঠাকুরবাড়িতে ঢুকেই ডানে, বাঁয়ে দুর্গাঘর)।

১৩। **ঐ**। নারায়ণ। গোস্বামীবৃন্দ। বৃহৎ। দৈর্ঘ্য আনু. ৩৫ ফুট, উচ্চতা আনু. ৩০ ফুট। কিছু পঙ্খ। (গ্রামে ঢুকে যেখানে রাস্তা ১২ শিবের দিকেঁ ঘুরেছে সেখানে থেকে বিপরীত দিকে সামান্য গিয়ে।

১৪। **নতুক জয়কৃষ্ণপুর** (মাঝপাড়া), ঘাটাল, পিশ্চম মেদিনীপুর। শ্রীধর। সাঁতরা পরিবার। দৈর্ঘ্যে আনু. ১৬/১৭ উচ্চতায় আনু. ২৫/২৬ ফুট। নিরলংকার তবে দরজায় কাঠের কাজ। (ঘাটাল-কুঠীঘাট ভায়া রাধানগর বাসে)।

১৫। **লালগড়,** বীনপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। সর্বমঙ্গলা (গ্রীষ্মাবাস)। উপরে-নিচে বৃহৎ ত্রিখিলান। পঙ্খ-সজ্জিত। (মেদিনীপুর শহর থেকে বাসে)।

১৬। **কামারপুকুর,** গোঘাট, হুগলী। বিষ্ণু। লাহা পরিবার। দৈর্ঘ্য/উচ্চতা আনু. ২০ ফুট। দুপাশে ও উপরে একসারি করে টেরাকোটা। (তারকেশ্বর থেকে বাসে, কলকাতা থেকেও সরাসরি বাসে)।

১৭। **নন্দনপুর**। দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। দামোদর। ঘোষ পরিবার। দৈর্ঘ্য ২০/২২ ফুট, উচ্চতা ২৬/২৭ ফুট। পঙ্খ। ১৮৫০। (পাঁশকুড়া থেকে ট্রেকারে গোবিন্দনগর। ভ্যানরিক্সা)।

১৮। **বালিদেওয়ানগঞ্জ,** গোঘাট, হুগলী। কালী। দৈর্ঘ্য/প্রস্থ আনু. ১৬ ফুট, উচ্চতা আনু. ২০ ফুট। পিছন দিক ছাড়া উভয় তলই বাকি তিন দিকেই ত্রিখিলান। (আরামবাগ থেকে বাসে বালিদেওয়ানগঞ্জ। চুক্তির ট্যাক্সি)।

দ্র : বাঁকুড়ার **হদলনারায়ণপুরে** মণ্ডল পরিবারের মেজ তরফের পঞ্চরত্নের পরে একটি দেওয়ালঘেরা ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ দ্বিতল মন্দির আছে। মুর্শিদাবাদের **কাশিমবাজারের** বড় বাজবাড়িতেও একটি বৃহৎ দ্বিতল মন্দির আছে—উভয় ক্ষেত্রেই ভিতরে গিয়ে দেখার অনুমতি মেলেনি। হুগলীর গোঘাট থানার **বদনগঞ্জে** শ্রীধরের একটি দ্বিতল দালান (১৮০৬) আছে।

পঞ্জি ১১ (গ): দ্বিতল দালান + এক বাংলা দীপাগার : গোপালপুর, খয়রাশোল, বীরভূম। 'সুদর্শন' (বিষ্ণু)। নাতিবৃহৎ। প্রস্থে আনু. ২৫ ও উচ্চতায় আনু. ৪০ ফুট। নিরলংকার। দোতলার ছাদের উপরে একটি এক বাংলা বা দোচালা রীতির ক্ষুদ্র কক্ষ— 'দীপাগার'।* ১৮ শতক। (সিউড়ি বা দুবাজপুর থেকে বাবাইজোড়গামী বাসে গোপালপুর মোড়। রিক্সা)।

পঞ্জি ১১ (ঘ) **দালান + রেখ + পিরামিডাকৃতি জগমোহন + নাটমণ্ডপ : পাঁচরোল,** এগরা, পশ্চিম মেদিনীপুর। রাধাবিনোদ। মহাপাত্র পরিবার। আনু. ৩৫ ফুট দীর্ঘ দৈর্ঘ্য ও ২৫ ফুট প্রস্থ-সম্পন্ন দালানের গর্ভগৃহের ছাদের উপর সুউচ্চ, খাঁজকাটা রেখ শিখর বসানো (দুর্ভাগ্যজনকভাবে শিখরটির একপাশ ভগ্ন)—শিখরটির সামনে আবার জগমোহনের কায়দায় পিরামিডাকৃতি মুখমণ্ডপ। দালানের বাকি অংশ বৃহৎ ও ঘেরা মণ্ডপকক্ষ। বাতায়নবর্তিনী প্রভৃতি পঙ্খ-শিল্প। ১৯ শতকের মধ্যভাগ। (এগরা থেকে বাসে/ট্রেকারে আলঙ্গিরী—ভ্যানরিক্সা)।

পঞ্জি ১১ (ঙ) : দালানের উপর চারচালা + শিখর : শান্তিপুর (সূত্রাগড়') নদীয়া। গণেশ। চমৎকার পত্রাকৃতি ত্রিখিলান দালান-মন্দিরের গর্ভগৃহের ছাদে প্রথমে একটি প্রথাগত চারচালা এরপর চারচালাটির উপরে খাঁজকাটা রেখ শিখর। দৈর্ঘ্য/প্রস্থ ২০ ফুট করে (আনু.) উচ্চতা সাকুল্যে ৩০/৩৫ ফুট (আনু.)। ১৯ শতকের শেষে (শান্তিপুর স্টেশন থেকে রিক্সা)।

পঞ্জি১১ (চ) : দালানের উপরে আটচালা :

গড় ময়না, ময়না, পূর্ব মেদিনীপুর। লোকেশ্বর শিব। বাহুবলীন্দ্র পরিবার। দালানের উপরে বসানো আস্ত একটি আটচালা। দৈর্ঘ্য/প্রস্থ আনু. ২৫ ও উচ্চতা আনু. ৩৫/৩৬ ফুট। **কিছু**

* গোপালপুরের লাগোয়া পেরুয়াতে এই রীতির প্রাচীনতর মন্দিরটিকে ভেঙে একটি আধুনিক একতলা দালান হয়েছে।

টেরাকোটা, তবে ম্যাকাচিয়ন মনে করেন যে ওগুলি পূর্বের কোনো মন্দিরের (প্রগুক্ত Late Mediaeval ... p.66)। ১৮ শতকের মধ্যভাগ। (খড়্গপুর শাখার বালিচক স্টেশন থেকে বাস। রিক্সা/হাঁটা, শেষে নৌকায় পরিখা পেরিয়ে)।

পঞ্জি১১ (ছ) : দালানের উপর একরত্ন :

চিলকিগড়, জামবনী, পশ্চিম মেদিনীপুর। শিব। দেওধবলদেব পরিবার। বিশ শতকের শুরুতে। ঝাড়গ্রাম থেকে অটোয়।

পঞ্জি১১ (জ) : দালানের উপর নবরত্ন :

যাদববাটি, জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। শিব (অন্নপূর্ণা)। বিন্দুবাসিনী দেবী। দৈর্ঘ্য ২৮, প্রস্থ ২০ ও উচ্চতায় ৩৫/৩৬ ফুটের মত আকার বিশিষ্ট। পঙ্খের কাজে সুসমৃদ্ধ। একতলা দালানের ছাদের রেলিংয়ের উপর পঙ্খের মূর্তি-ভাস্কর্য। গর্ভগৃহের ছাদের উপরে বসানো নবরত্নটিরও সামনের দিকে এবং দুপাশের দেওয়ালে চিত্তাকর্ষক পঙ্খের কাজ। ১৯০৬। (হাওড়া থেকে বাসে মুনশীরহাটে গিয়ে ভ্যানরিক্সায়)।

পঞ্জি ১১(ঝ) : দালান + নবরত্ন + রত্নরূপী আটচালা :

শান্তিপুর (সূত্রাগড়), নদীয়া। কাশীনাথ শিব। ড. রজনীকান্ত মৈত্র। সুন্দর উদ্যানে পত্রাকৃতি ত্রিখিলানে সুঠাম দালানের ছাদে বসানো সুউচ্চ নবরত্ন—আকর্ষণীয়ভাবে রত্নগুলিকে প্রথাগত খাঁজকাটা রেখ মন্দিরের অনুকৃতি না করে অভিনবভাবে আটচালার আকার দেওয়া হয়েছে। দালান, রত্ন ও আটচালার এ এক আকর্ষক সমন্বয়। দৈর্ঘ্যে/প্রস্থে আনু. ২৫ ফুট ও উচ্চতায় আনু. ৪০ ফুট। ১৯০৮। (শান্তিপুর স্টেশন থেকে রিক্সা)।

দ্র : (i) সারা পশ্চিমবঙ্গের (বিশেষত বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের) গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট (দৈর্ঘ্য/প্রস্থ/উচ্চতায় ১০-১২ ফুট) দালান মন্দির দেখা যায়। এগুলি বেশির ভাগ সময়েই ত্রিখিলান, যেমন **চন্দ্রকোণার মিত্রসেনপুরের শীতলা** বা **ক্ষীরপাইয়ের রাজরাজেশ্বর** শিব, তবে বিরলক্ষেত্রে একদুয়ারিও হতে পারে যেমন, **খানাকুলের** ঘণ্টেশ্বর মন্দিরের অঙ্গনের **ষষ্ঠীর ক্ষুদ্র** দালান। এই তিনটি দৃষ্টান্তের মধ্যে প্রথমটি নিরলংকার, দ্বিতীয়টি ক্ষয়িত হলেও টেরাকোটা-মণ্ডিত এবং তৃতীয়টি প্রভূত পরিমাণে পঙ্খ-শোভিত। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই গর্ভগৃহের সামনে সংকীর্ণ বারান্দা থাকে, আবার এর সঙ্গে কখনো সামনে ছোট চালা (**কোতুলপুরে** গ্রামের শেষে শিব মন্দিরের সামনে টিনের কিন্তু **আটবাইচণ্ডীর** কালী মন্দিরের সামনে খড়ের) থাকতে পারে। এগুলি নমুনামাত্র—সারা পশ্চিমবঙ্গেই এমন দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে।

(ii) জোড়া দালান নজরে পড়ে না, তবে একটি উদাহরণ হল পশ্চিম মেদিনীপুরের **রামজীবনপুরের** শ্রীধর শিব মন্দির—একই অধিষ্ঠানে সংলগ্ন দুটি—একটির শেষ দেওয়াল হল অন্যটির প্রথম দেওয়াল (১৯ শতক, ক্ষীরপাই থেকে বাসে)।

পঞ্জি ১১(ঞ) : ত্রিতল দালান মন্দির : ১. জোকা, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া। ত্রিতলে পাশাপাশি দুটি পৃথক গর্ভগৃহের একটিতে দামোদর ও অন্যটিতে শীতলা-মনসা-ষষ্ঠী। রায় পরিবার। আনু. ৫০ ফুট দীর্ঘ, ২৫ ফুট প্রস্থ-সম্পন্ন ও ৩৫/৪০ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট বৃহৎ ত্রিতল দালান—ত্রিতলে দেব-দেবী প্রতিষ্ঠিত। পঙ্খের কিছু ভাস্কর্য ও নকাশী অলংকরণে সজ্জিত দালান। ১৭৯৭। হাওড়া থেকে ভায়া মুনশীরহাট বাসে জয়নগরঘাট। দামোদর পেরিয়ে হাঁটা।

২. **জঙ্গীপুর** (বাগিচাবাড়ি/গোবর্দ্ধনযাত্রা প্রাঙ্গণ), মুর্শিদাবাদ। রঘুনাথ। **ধ্বংসপ্রাপ্ত, কিন্তু ক্ষেত্র-দর্শন করে অনুভব করা যায় কত বিশাল ও কত আকর্ষণীয় ছিল এই মন্দির-ক্ষেত্রে :**

পাথর কুণ্ড
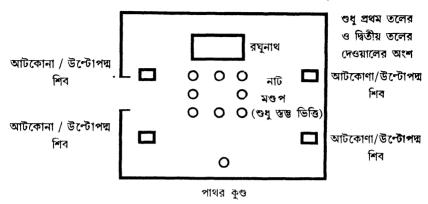
বৃহৎ চারকোণা মাঠের মত ক্ষেত্র, পিছন ঘেষে মধ্যমণি রঘুনাথের বৃহৎ ত্রিতল মন্দির, সামনে আটটি গোলাকার স্তম্ভ নির্ভর নাটমণ্ডপ, চারকোণে চারটি মুর্শিদাবাদ-রীতির আটকোণা বক্রচাল উল্টো-পদ্ম রেখ শিবমন্দির। সামনের সীমানা-রেখার মধ্যবর্তীস্থানে একটি পাথব-কুণ্ড। —এসবের মধ্যে শুধু পঙ্খ-অলংকৃত শিব মন্দির চারটিই অক্ষত আছে। ত্রিতল বৃহৎ রঘুনাথ মন্দির লুপ্ত, শুধু প্রথম তলের দেওয়াল-চারটির অংশ ও দ্বিতলের পিছনের দেওয়ালের খানিকটা আছে, ত্রিতল অনেক আগেই নিশ্চহ্ন। সামনের নাটমণ্ডপের আটটি গোলাকার স্তম্ভের শুধু ভিৎটুকু বোঝা যায়। —তথাপি দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে অত্যন্ত সুচারু পরিকল্পনা ছিল এক অন্তরালে। ১৮ শতকের শেষে বা ১৯ শতকের প্রথমে। ক্রম ১১ (খ)/৫—অল্প এগিয়ে।

পঞ্জি ১১ (ট) **রাজবাড়ি / দুর্গবাড়ি রীতি : নশীপুর,** লালবাগ, মুর্শিদাবাদ। লক্ষ্মী-নারায়ণ। 'রামানুজ আখড়া'—রামানুজ মতালম্বী 'বড়গল' সম্প্রদায়ের লোচনদাস (জয়পুর, রাজপুতানা) প্রতিষ্ঠিত। প্রাকার বেষ্টিত দুর্গবাড়ির মত। ক্ষেত্রদ্বার দিয়ে প্রবেশের পরে একপাশে দালানের সার ও অন্যপাশে মন্দিরের নিরেট দেওয়ালের মাঝ দিয়ে পথ—শেষে চারিদিক হতে সুরক্ষিত বর্গাকার অঙ্গন, এর পূবপাশে রক্ষিত একটি রূপা-নির্মিত রথ ও পশ্চিমপাশের পথটুকু ছাড়া সমস্ত অঞ্চল-জুড়ে মন্দির, মাঝে দ্বিতল, ত্রিখিলান ও মূর্তি-শোভিত প্রবেশদ্বার—ত্রিখিলান হলেও দ্বার শুধু মাঝেরটিতে, অন্য দুটি নিরেট। প্রবেশ করলে বৃহৎ মন্দির-কক্ষের মাঝে—কক্ষের উত্তর ও দক্ষিণপাশে সুরক্ষিত দেব-দেবীদের স্বর্ণ ও মণি-মুক্তা-খচিত বিগ্রহ। ১৭৬১। (মুর্শিদাবাদ স্টেশন থেকে রিক্সা/ঘোড়ার গাড়ি। —মুর্শিদাবাদ জেলায় আরও কটি বৃহৎ আখড়া আছে)। **২. ঐ।** নশীপুর রাজবাড়ি-সংলগ্ন ঠাকুরবাড়ি। রামচন্দ্র মন্দির। প্রতিষ্ঠাতা, রাজা কীর্তিচাঁদ বাহাদুর। ইওরোপীয় স্থাপত্যের বৃহৎ রাজপ্রাসাদের পিছনে প্রথমে পূবে-পশ্চিমে ছয় ও উত্তর-দক্ষিণে তিন খিলান-যুক্ত বৃহৎ নাটমণ্ডপ, এর পরে তুলসীমঞ্চ পূবে-পশ্চিমে আনু. ২০ ফুট এবং উত্তর-দক্ষিণে বা প্রস্থে ১০ ফুট। চারিদিকে শ্বেত পাথরে বাঁধানো বৃহৎ ও

আয়তাকার তিন ফুটের মত উঁচু ফুলের টবের মতন তুলসী মঞ্চটি (দুর্ভাগ্য ক্রমে চারপাশের শ্বেত পাথরের দেওয়াল স্থানে-স্থানে ভগ্ন)—এ ধরণের ও এত বৃহৎ তুলসীমঞ্চ পশ্চিমবঙ্গে আর আছে কিনা সন্দেহ। এরপরে পশ্চিমমুখী সুউচ্চ রামচন্দ্র মন্দির—উচ্চতা ৬০/৭০ ফুট, মূল শিখরের গায়ে ২৪টি অঙ্গ শিখর। এরপরে রামচন্দ্র মন্দিরকে বর্গাকারে ঘিরে সারিবদ্ধ গথিক ও আনু. ২০ ফুট করে উচ্চতার বিপুল স্তম্ভ-শ্রেণি নির্ভর অলিন্দ, মাঝে রামচন্দ্র-মন্দিরের পিছনে চতুষ্কোণ মুক্তাঙ্গন। অলিন্দের পার্শ্ব-দেওয়ালে ছোট-ছোট কুঠুরিতে দেবদেবীর মূর্তি, দুঃখজনক ভাবে কোনটিরই কারিগরী প্রত্যাশিত মানের নয়। গর্ভগহের সামনে অলিন্দের মাঝে শ্বেত পাথর-শোভিত চাঁদনির ঢঙে একটি স্থাপত্য, পিছনের অলিন্দেও অনুরূপ একটি স্থাপত্য—সব মিলিয়ে 'রামানুজ' আখড়ার মত এই বৃহৎ ক্ষেত্রটির সঙ্গে বাংলার মন্দিররীতির সম্পর্ক নেই। ১৯ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ :
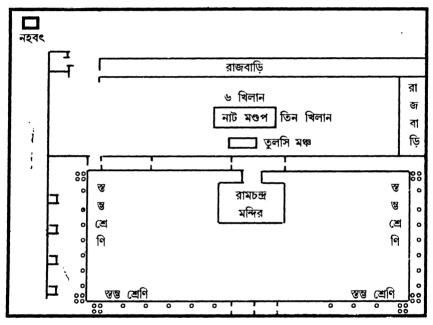
৩। **সোমড়া বাজার (সুখাড়িয়া)**, বলাগড়, হুগলী। রাধাবল্লভ। সুউচ্চ প্রাকার-বেষ্টিত বিশাল ক্ষেত্র। সামনে কয়েকটি দৈত্যাকার স্তম্ভের উপর প্রায় ৩০ ফুট উঁচু ছাদ-বিশিষ্ট বারান্দা। দুপাশে দ্বিতল কক্ষের মাঝ দিয়ে প্রবেশ পথ, ভিতরে দুপাশে অলিন্দ যুক্ত দ্বিতল দালান, অঙ্গনের মাঝে সুদৃশ্য লোহার রেলিং, বাতিদান প্রভৃতিতে ঘেরা আয়তাকার রম্য উদ্যান-ক্ষেত্র ও তার পরে সামনে রাধাবল্লভের সুবিশাল পাঁচখিলান দালান—সব মিলিয়ে একটি বৃহৎ রাজপ্রাসাদ। ১৯ শতক। (হাওড়া-ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া শাখার সোমড়া বাজার স্টেশন থেকে রিক্সা—বিখ্যাত আনন্দভৈরবীর লাগোয়া)। ৪। **হেতমপুর**, দুবরাজপুর, বীরভূম। রাধাবল্লভ।

হেতমপুর রাজপরিবার। ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া সিঁড়ির উপরে গথিক স্তম্ভশ্রেণি-নির্ভর রাজবাড়ি সুলভ স্থাপত্য। ১৯ শতক। (ইলামবাজার-দুবরাজপুর লোকাল বাসে। হেতমপুরের 'হাতিতলা' হতে সামান্য এগিয়ে, পুরাতন রাজবাড়ি, বর্তমানে বিদ্যালয়-সংলগ্ন)। ৪। **জিয়াগঞ্জ (নেহালিয়া, চাউলপট্টি),** মুর্শিদাবাদ। হরিনারায়ণ সিং-এর ঠাকুরবাড়ি। রাজপ্রাসাদ-সদৃশ দালান। বুন্দেলা রাজপুত ধারার প্রবেশ দ্বার—দ্বারশীর্ষ পঙ্খের হরিণ প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত। স্তম্ভ নির্ভর বৃহৎ নাট-দালান। গর্ভগৃহের সামনে একবাংলা ধাঁচের মুখমণ্ডপ। ১৮৪৭। (শিয়ালদহ-লালগোলা শাখার জিয়াগঞ্জ। রিক্সা)। —এগুলি ছাড়াও মুর্শিদাবাদ জেলার **কান্দীর** রাজপরিবারের প্রাসাদোপম ঠাকুরবাড়ির মত পশ্চিমবঙ্গের আরও কিছু স্থাপত্যকে এই তালিকা ভুক্ত করা চলে।

পঞ্জি ১১ (ঠ) : দুর্গাদালান / কালীদালান / ঠাকুরদালান (স্থান সঙ্কুলানের জন্য নমুনা-হিসেবে কয়েকটির সামান্য বিবরণ ও আরও কয়েকটির উল্লেখমাত্র করা হচ্ছে; অন্য উল্লেখ না থাকলে সবই দুর্গাদালান, পূর্বোল্লেখিত স্থানের পথ নির্দেশ থাকছে না) :

(১) **কর্ণগড়,** শালবনী, পশ্চিম মেদিনীপুর। কর্ণগড় রাজ পরিবার। মাকড়া পাথরে নির্মিত আনু. ৩৮ × ৩০ ফুটের সিংহবাহিনীর দালান—পরিত্যক্ত। ১৮ শতকের প্রথমার্ধ। (বিখ্যাত দণ্ডেশ্বর ও মহামায়া মন্দির হতে ১ বা ১½ কি.মি.)। (২) **কৃষ্ণনগর,** নদীয়া। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত। রাজবাড়ি এলাকায় প্রথমে মুসলিম-স্থাপত্যের বৃহৎ চারমিনার তোড়ণ। এরপর দৈর্ঘ্যে সাত ও প্রস্থে পাঁচখিলান পূজামণ্ডপকে মাঝে রেখে সামনে (উভয় পাশে) দশ খিলান ও পিছনে (উভয় পাশে) সাত খিলান টানা দালান। পূজামণ্ডপটি অসামান্যভাবে পঙ্খ-অলংকৃত। পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম দুর্গাদালান। ১৮ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ। (৩) **দশঘরা** (বিশ্বাসপাড়া), ধনিয়াখালি, হুগলী। পুকুরপাড়ে সিংহস্তম্ভ-লাঞ্ছিত পথের প্রান্তে প্রথমে কাছাড়িবাড়ি, এরপর পুকুরের ওপাড়ে নয়চূড়া বৃহৎ রাসমঞ্চ ও তার কিছু তফাতে চারচালা দোলমঞ্চ—এর পরে চমৎকার দুর্গাদালান—প্রবেশ করলে প্রথমে ১৪টি স্তম্ভের উপরে নাটমণ্ডপ ও বাঁয়ের ঝুলন-মন্দির; নাটমণ্ডপের দুপাশে দ্বিতল দালান, সামনে দুর্গামণ্ডপের পাঁচখিলান বারান্দা ও এরপর ত্রিখিলান গর্ভগৃহ, (প্রকৃতপক্ষে পাঁচখিলান—দুপাশের দুটি ভরাট)। দুর্গাবেদীর ডান কোণে বিরজা চণ্ডীর ঘট। **পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে সুন্দরভাবে রক্ষিত** দুর্গাদালানগুলির একটি। ১৮ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ—বহুল সংস্কৃত (তারকেশ্বর বা গুড়াপ থেকে বাসে)। (৪) **অমরারগড়** (দশমন্দিরতলা), আউসগ্রাম, বর্ধমান। ত্রিখিলান। প্রথমে বক্রচাল একবাংলারীতির বারান্দা, পরে বক্রচাল একবাংলা রীতিরই দুর্গামন্দির। বারান্দার সামনের দেওয়াল-শীর্ষে একসারি টেরাকোটা। ছোট কিন্তু অসামান্য। রীতির দিক হতে পশ্চিমবঙ্গে অদ্বিতীয়, যেন খড়ের চালের ঘরটিকেই পাকা ইমারতে ধরা রয়েছে। ১৯ শতক। (বর্ধমান-আসানসোল-শাখার মানকর থেকে বাস/রিক্সা)। (৫) **মৌখিরা (কালিকাপুর),** আউসগ্রাম, বর্ধমান। দুর্গামণ্ডপ। পরমানন্দ রায় প্রতিষ্ঠিত। মহারাজসিক দালান। আনু. ৫০ ফুট বা তার বেশি দৈর্ঘ্য ও সমতল ছাদ-বিশিষ্ট. বৃহৎ পাঁচ-খিলান দালান, সামনের বারান্দার ছাদ ছয়-জোড়া আনু. ২০ ফুটের উচ্চতার গথিক স্তম্ভের উপরে ন্যস্ত। নাটমণ্ডপের ছাদ লুপ্ত হলেও জোড়ায় জোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা ২৩/২৪ ফুট উঁচু বৃহৎ গথিক স্তম্ভগুলি মহাসম্ভ্রম জাগায়। বিশাল এই নাটমণ্ডপটিকে মাঝে রেখে

দুর্গামণ্ডপের বাকি তিনদিকে রয়েছে সুউচ্চ দ্বিতল-দালান, প্রথম তলটি খিলান শ্রেণি নিবদ্ধ কিন্তু দ্বিতীয় তল ১৯ শতকীয়-রীতির বৃহৎ জানালা শ্রেণি শোভিত। দালান শীর্ষে একসারি পঙ্খ অলংকরণ, দুর্গামণ্ডপের বৃহৎ পাঁচটি খিলান শীর্ষও পঙ্খ-মণ্ডিত। ১৮৩৯। (বোলপুর-পানাগড় বাসপথের বসুধা থেকে ভ্যানরিক্সা, জোড়া দেউলের পাশে)। (৬) **মল্লিকপুর,** গলসী, বর্ধমান। চক্রবর্তী পরিবারের 'দুর্গামণ্ডপ'। মাটি থেকে অন্তত ১০/১২ ফুট উঁচু মঞ্চের উপরে (মনে হয় নিকটবর্তী দামোদরের বন্যার আশঙ্কায়) আনু. ২৫ ফুট উচ্চতার বৃহৎ জোড়া স্তম্ভ-যুক্ত পাঁচখিলান-সম্পন্ন সুবৃহৎ এক কক্ষ দালান—স্তম্ভ নির্ভর, দৈর্ঘ্যে আনু. ৪২ ও প্রস্থে আনু. ২৫ ফুট। সব মিলিয়ে উচ্চতা ৩০/৩৫ ফুট। ১৯ শতক। (বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যাণ্ড থেকে গলসী-আদরাহাটি হয়ে বাকতা/গড়ম্বার বাসে)। (৭) **গুসকরা,** বর্ধমান। চোংদার পরিবারের দুর্গাদালান। অতিবৃহৎ। মাঝে আয়তাকার অঙ্গন। তিন দিকে বৃহৎ ত্রিতল দালান—সামনে দুপাশে জোড়ায় জোড়ায় ও মাঝে বৃহৎ ও সুউচ্চ আরও চারটি গথিক স্তম্ভ নির্ভর সমতল ছাদের প্রশস্ত বারান্দা, এরপর পাঁচ-খিলান (মাঝেরটি বৃহত্তম ও উচ্চতম) বিশিষ্ট গর্ভগৃহে—খিলানস্তম্ভগুলি ঘিরে চারদিকে চার জোড়ায় আটটি করে ছোট সরু আলংকারিক স্তম্ভ। এই অতিবৃহৎ দালানের একটি বৈশিষ্ট্য হল কড়িকাঠের বদলে ব্যবহৃত হয়েছে রেলওয়ের লোহার স্লিপার—১৯ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে চোংদারগণ শুধু ৫৭ মহালের জমিদারই ছিলেন না, ঐ অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ কার্যে বড় মাপের কনট্রাক্টরও ছিলেন। ১৯ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ। (৮) **ঐ** ক্ষেত্র ও পরিবার। কালীদালান। উল্টানো ইং 'L' অক্ষরের মত দালান দুটি, ছোট ছোট পাঁচখিলান সরু বারান্দা ও এর পরে টানা সাধারণ দালান। জীর্ণ। অঙ্গনের অন্যপ্রান্তে দুপাশে দুটি আটচালা ও মাঝে একটি বক্রচাল, ত্রিখিলান গম্বুজশীর্ষ মন্দির সব মিলিয়ে পাঁচটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত। (৮) **সুরুল,** বোলপুর, বীরভূম। সরকার পরিবারের বড় তরফ বা বড় বাড়ির দুর্গাদালান। অঙ্গনের মাঝে উঁচু ও বৃহৎ আধুনিক নাটমণ্ডপ এর বাঁ পাশে ও পিছনে দ্বিতল দালান ও সামনে প্রস্থজোড়া সিঁড়ির ধাপশ্রেণির পর অতি সুদৃশ্য পাঁচ খিলান। ১৯ শতকীয় রীতির 'কলাগেছে' থাম (মূলস্তম্ভ ঘিরে কলাগাছের মত গোল কাণ্ডের মত আলংকারিক স্তম্ভ, দেখতে হয় কয়েকটি কলাগাছের গুচ্ছ যেমন দেখায় অনেকটা তেমন)। ১৯ শতক। (শান্তিনিকেতন থেকে রিক্সা)। (৯) **মানকর** (বিশ্বাসপাড়া), বুদবুদ, বর্ধমান। রেণুবালা দেবীর দুর্গাদালান। প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত তথাপি আকর্ষণীয়। অত্যন্ত ব্যতিক্রমী ধরণের প্রবেশপথ—দুদিকে তিনফুট উঁচু অর্ধবৃত্তাকার বারান্দা,এর উপরে দুদিকেই প্রায় ১০ ফুট প্রস্থের অতি বৃহৎ এক খিলান-বিশিষ্ট কক্ষ, মাঝ দিয়ে আনু. ৮ ফুটের বৃহৎ এক খিলান তোড়ণের নিচ দিয়ে পথ, প্রবেশ করলে আয়তাকার অঙ্গন—ডান প্রান্তে বৃহৎ পাঁচখিলান দুর্গাদালান। ১৯ শতক। (১০) **হৃদলনারায়ণপুর,** পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া। মণ্ডল পরিবারেব বড় তরফের দুর্গাদালন। সামনে অত্যুচ্চ ১৭ চূড়া রাসমঞ্চ, অদূরে রাধাকৃষ্ণের ছোট দালান ও পাশে কারুকার্য-খচিত পিতলের রথ রক্ষিত। এবার প্রবেশ করলে মণ্ডলদের বড় তরফের সাতমহলা অট্টালিকার বহির্বাটিতে অর্ধবৃত্তাকার বারান্দা-সহ অতি বৃহৎ দুর্গা মণ্ডপ। ১৯ শতক। (বর্ধমান তিনকোণিয়া থেকে সরাসরি বাসে/সোনামুখী পথের ধাগড়িয়া বা ধাগড়েতে নেমে ভ্যানরিক্সা)। (১১) **ঐ** এবং

ঐ পরিবারেরই ছোট • র ত্রিখিলান দুর্গামণ্ডপ ও কালীর সাধারণ দালান (উভয়ই ১৯ শতকীয়) আছে বড় তরফের সামান্য আগে। (১২) **পানিহাটি**, খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা। ঘোষপাড়ায় ত্রাণনাথ ব্যানার্জির দুর্গাদালান। পরিত্যক্ত ও জীর্ণ। পাঁচখিলান। পঙ্খ-অলংকৃত। ১৯ শতকের শেষে। (কলকাতা-বারাকপুর বাসপথের পানিহাটি হরিশ দত্ত লেনে নেমে রিক্সা)। (১৩) **বারুইপুর,** দক্ষিণ ২৪ পরগনা। রায়চৌধুরী পরিবার। আটটি গথিক স্তম্ভ নির্ভর বারান্দার পরে পাঁচখিলান গর্ভগৃহ। খিলান স্তম্ভগুলিতে আলংকারিক স্তম্ভ। খিলান-শীর্ষ পঙ্খ অলংকৃত। ১৯ শতক। (শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বারুইপুর স্টেশন হতে—এখানকার রবীন্দ্রভবনের বিপরীতে।)

উপরেরগুলি ছাড়াও উল্লেখযোগ্য দুর্গাদালান (সবই ১৯ শতকীয় তিন অথবা পাঁচ খিলান) আছে যে সব জায়গায় সেগুলি হল **হুগলীর জামগ্রাম** (পাণ্ডুয়া, নন্দী পরিবার), **বৈঁচিগ্রাম** (পাণ্ডুয়া, মুখোপাধ্যায় পরিবার), **হরিপাল** (রায় পরিবার), **বেলমুড়ি** (ধনিয়াখালি, বসুরায় পরিবার), **হাটবসন্তপুর** (আরামবাগ, নন্দী পরিবার), **দশঘরা** (রায় পরিবাব), **বাকসা** (কিছু টেরাকোটা, চণ্ডীতলা, মিত্র পরিবার); **বর্ধমানের চকদীঘি** (জামালপুর, সিংহরায় পরিবার), **কামালপুর** (খণ্ডঘোষ, দেবনারায়ণ বসু ট্রাস্ট), **উখরা** (অণ্ডাল, হাণ্ডা পরিবার, চাঁদনীবাড়ি দুর্গা মন্দির), **উত্তর রামনগর** (আউসগ্রাম, চট্টোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার) **সরপী** (ফরিদপুর, রায়চৌধুরী পরিবার, দশ-আনা ছয় আনা দু তরফের পাশাপাশি), **বৈদ্যপুর** (কালনা, বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার) **সর,** (আউসগ্রাম, রায় পরিবার—ছোট দালান কিন্তু অঙ্গনেব এক পাশে দুটি ও অন্য পাশে পাঁচটি শিখর দেউল, **গলসী** (একাধিক পরিবারের); **বীরভূমের ইলামবাজার, নগরী** (সিউড়ি); **হাওড়ার জয়পুর** (আমতা, মণ্ডল পরিবাব), **বাঁকুড়ার বামিরা** (পাত্রসায়ের, মধ্যমপাড়া, গুপ্ত পরিবার, পাশে ১৭ চূড়া রাসমঞ্চ), **অযোধ্যা** (বিষ্ণুপুর, বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার); **দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর** (দুর্গাপুর-পাড়া, সরকার পবিবার, পাশে পঞ্চরত্ন দোলমঞ্চ); **পশ্চিম মেদিনীপুরে রামজীবনপুর** (নতুনহাট, চন্দ্রকোণা, সরকার পরিবার); নদীয়ার **শান্তিপুর** (রামপদ সরণি, সূত্রাগড়, ইন্দ্র পরিবার—ত্রিখিলান, পঙ্খ-সমৃদ্ধ, পরিত্যক্ত); **উত্তর ২৪ পরগণার ধান্যকুড়িয়া** (স্বরূপনগর, যথাক্রমে সাও, গায়েন ও বল্লভ পরিবারের তিনটি অসাধারণ দুর্গাদালান—মাঝে আয়তাকার অঙ্গন রেখে তিনদিকে দ্বিতল দালান ও একদিকে অনুপম খিলান-শ্রেণি মণ্ডিত দুর্গাদালান), **ছয়ঘরিয়া** (বনগাঁ, বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার, ছোট দালান কিন্তু সামনে শিবের জোড়া আটচালা) ছাড়াও **টাকি** (বসিরহাট)-র একাধিক বৃহৎ দুর্গাদালান, প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য যে পশ্চিম মেদিনীপুরের **পাথরা** (মেদিনীপুর সদর), দক্ষিণ পরগণার **ঘাটেশ্বরা** ও **মুর্শিদাবাদের নিয়াল্লিশপাড়ায়** একটি করে অতি বৃহৎ দুর্গাদালানের ভগ্নস্তূপ আছে—এগুলির মধ্যে পাথরায় কেওটিতে গ্রামবাসীরা সার্বজনীন দুর্গাপূজা করে থাকেন ও নিয়াল্লিশপাড়ার ভগ্ন দালানে গ্রামবাসীরা বার্ষিক কালীপূজা করেন। বলা বাহুল্য, **কলকাতা** শহরেও বেশ কয়েকটি বৃহৎ এবং উল্লেখযোগ্য দুর্গাদালান/ঠাকুরদালান আছে (যেমন রানী রাসমনি রোডে রাসমণির অতিবৃহৎ দুর্গাদালান, শোভাজার রাজবাড়ির দুর্গাদালান/ঠাকুরদালান, বাগাবাজারে গোকুল মিত্রের ঠাকুরদালান প্রভৃতি)।

পঞ্জি ১১ (ড) দুর্গাদালান-রীতির মন্দির :

নাড়াজোল, দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। পরিত্যক্ত মন্দির চারখিলান। পঙ্খ ছাড়াও শীর্ষে এক সারি টেরা কোটা। ১৯ শতক।—একই থানা এলাকার ও রীতির **সামাটের** আরও বৃহৎ পাঁচখিলান মদনগোপাল মন্দির ইতোপূর্বে পঞ্জিকৃত।

পঞ্জি ১১ (ঢ) চাঁদনি (স্নানঘাট) : বিশেষত গঙ্গার দুই তীরে অসংখ্য—প্রকৃতপক্ষে এগুলি সম্পূণ পৃথক গবেষণা দাবি করে। তবে এর দুরকম রীতি অধিক জনপ্রিয় ছিল—দালান-মন্দির-রীতি এবং স্তম্ভ-নির্ভর মুক্ত-রীতি। প্রথম-রীতির ঘাটগুলির খিলানগুলি পরিকল্পনা অনুসারে গেঁথে দিলেই দালান-মন্দিরে পরিণত হবে—যেমন উ:২৪ পরগনার **তালপুকুর** গঙ্গোত্রীপাড়ার **বারাণসী ঘোষের ঘাট** (স্থানীয় ভাবে কেষ্ট মুখার্জীর ঘাট নামে পরিচিত, থানা টিটাগড়, ১৭৮০ তে প্রতিষ্ঠিত ও ১৯০৯-এ প্রথম সংস্কৃত) এই রীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, কিছুটা দূর থেকে দেখলে পাঁচখিলানযুক্ত একটি অসাধারণ দালান-মন্দির বলেই মনে হয়, খড়দহ থানা এলাকার **পানিহাটি ১২ মন্দিরতলার ঘাট** (১৯ শতক) বা খড়দহের **ত্রাণনাথ ব্যাণাজীর ঘাট** (১৯ শতকের শেষে) এই রীতির আরও দুটি উদাহরণ তবে শেষেরটির খিলানগুলি প্রথাগত অর্ধবৃত্তাকার না হয়ে পত্রাকৃতি। অনেক সময়ে এই জাতীয় ঘাটের সঙ্গে জোড়া মন্দিরও থাকে, যেমন হুগলীর **বাঁশবেড়িয়ার 'জলেশ্বর ঘাট'** (১৯ শতক), **শ্রীরামপুরের 'জগন্নাথ ঘাট** (১৯ শতক) বা **বালি-উত্তরপাড়ার ঘাটের** দুপাশে দুটি—আবার কলকাতার **ভবানীপুরে** আদিগঙ্গার তীরে '**গোপাল ব্যাণার্জী ঘাটে** (১৮১২) আছে চারটি আটচালা, **'বলরাম বসু' ঘাটে** (১৮১০) আছে জোড়া আটচালা ও **কালীঘাটের** বিখ্যাত মন্দিরের লাগোয়া **সদরঘাটে** (১৯ শতক) আছে একটি আটচালা। পশ্চিম মেদিনীপুরের **ঘাটালের কোন্নগরপল্লীতে** শিলাবতী-তীরের ঘাট (১৮৮০) ও বাঁকুড়ার জয়রামবাটির 'মায়ের দীঘি' নামে পরিচিত পুকুরঘাট (১৯ শতকের শেষে)-ও দালান-মন্দির ধারার চাঁদনি-ঘাট। অন্যদিকে **শুধু স্তম্ভ**-নির্ভর ঘাটের চমৎকার উদাহরণ হল হুগলীর শ্রীরামপুরের **বল্লভপুরের 'রাধাবল্লভের ঘাট'** (১৮ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ) ও উত্তর ২৪ পরগণার **খড়দহের ২৬ মন্দিরের** লাগোয়া **'বীরঘাট'** (১৮২৮)। এমন নানা উদাহরণ সারা বাংলায়।

পঞ্জি ১১ (ণ) দ্বিতল চাঁদনি (স্নানঘাট) : বল্লভবাটি, জগৎ-বল্লভপুর, হাওড়া, ১৯ শতক। দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা আনু. ২০ ফুট, প্রস্থ আনু. ১৫ ফুট। একতলায় বৃহৎ এক-খিলান ঘাট ও আনুষঙ্গিক দালান, দোতলায় সম্ভবত কাপড় বদলানোর ঘর। লক্ষণীয়, ঘাটটির স্থানীয় নাম **'চাঁদনি'** (মুসলমান [illegible] থেকে ভ্যানরিক্সা)।

পঞ্জি—১২
গিরিগোবর্ধন রীতি

১। (ক) **কালনা,** বর্ধমান। (খ) লালজীর ভোগ-মন্দির। (গ) বর্ধমান রাজপরিবার। (ঘ) **একবাংলা বা দোচালা।** সারা বক্রচালে পঙ্খ-পলেস্তারায় নির্মিত পাহাড়-পাথরের আদল ও পশুপাখি। (ঙ) ১৮ শতকের শেষে। (চ) উপাদান : ইট ও পঙ্খ-পলেস্তারা (হাওড়া-ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লোকালে অম্বিকা-কালনা— রিক্সা। ১০৮ মন্দিরের বিপরীতে)।

২। (ক) **রাজগ্রাম,** জয়পুর, বাঁকুড়া। (খ) কৃষ্ণ। (গ) রাহা পরিবার। (ঘ) **আটচালা।** উচ্চতা আনু. ৩০ ফুট। নিচ ও উপরের উভয় চারচালার ছাদেই পঙ্খ-পলেস্তরার পাহাড়, পশু-পাখি ও ফুল। (ঙ) ১৯ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ। (চ) আরামবাগ-বিষ্ণুপুর পথের জয়পুর থেকে গাড়ি বদল করে।)

৩। (ক) কোতুলপুর, **(ভদ্রপাড়া),** বাঁকুড়া। (খ) কৃষ্ণ। (গ) ভদ্র পরিবার। (ঘ) **পঞ্চরত্ন** (রত্ন বা চূড়া পাঁচটিতে) ইট ও পঙ্খ-পলেস্তরায় পাহাড়ের আদল, মধ্যে মধ্যে কিছু জন্তু-জানোয়ার আর চূড়ার মাথায় কয়েকটি বাঁদরের মূর্তি। দেওয়ালের বৃহৎ মূর্তিগুলি হল : দ্বারপাল, ষড়ভুজ, কৃষ্ণকালী, মোহন্ত প্রভৃতি। উচ্চতা : ২০ ফুট। (ঙ) ১৮৩৩ (?) (চ) (তারকেশ্বর/আরামবাগ-বিষ্ণুপুর বাসপথের কোতুলপুর ভদ্রপাড়া স্টপ)।

৪। **সোনামুখী,** (রাণীবাজার—গোপালবেড়), বাঁকুড়া। (ঘ) **পঞ্চরত্ন।** আটখিলান মঞ্চের উপর প্রস্থে আনু. ১৫ ফুট ও উচ্চতায় আনু. ২০ ফুট বক্রচাল স্থাপত্য, একদুয়ারী। ইট ও পঙ্খ-পলেস্তরায় পাথর ও পাহাড়ের আদল—মধ্যে মধ্যে জন্তু-জানোয়ার ও প্রত্যেক চূড়া-শীর্ষে একটি করে সিংহের মূর্তি। পাশের দেওয়ালগুলিতেও বৃহৎ মূর্তির অলংকরণ। (ঙ) ১৮৩৫। (চ) (বর্ধমান-সোনামুখী বাসপথের সোনামুখী রানীবাজার স্টপ)।

৫। (ক) **অযোধ্যা,** বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। (খ) কৃষ্ণ (গিরিগোবর্ধনধারী)। (গ) বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। (ঘ) **পঞ্চরত্ন।** একদুয়াবী। এই রীতির অন্য মন্দিরগুলির ক্ষেত্রে চূড়াগুলিতে এবং সোনামুখীতে তৎসহ কার্নিশের নিকট থেকে পাহাড়ের আদল আনা হয়েছে, কিন্তু অযোধ্যার বর্তমান মন্দিরটিতে তা করা হয়েছে নিচু গোবরাটের উপর থেকেই ফলে গোটা মন্দিরটিতেই পাহাড়ের ভাব এসেছে। (ঙ) ১৯ শতকের. (চ) বর্ধমান-বিষ্ণুপুর বাসে জয়কৃষ্ণপুর। রিক্সা—অযোধ্যা দ্বাদশ শিব ক্ষেত্র।

পঞ্জি—১৩
মুসলিম-প্রভাবিত গম্বুজ-সম্পন্ন মন্দির

১। **কিরীটেশ্বরী,** নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ। কিরীটিশ্বেরী। বর্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠাতা, নিকটবর্তী ডাহাপাড়ার কানুনগো বঙ্গাধিকারী দর্পণারায়ণ। ব্যতিক্রমী—একটি হলঘরের মতন এককক্ষ দালান, উপরে পেঁয়াজাকৃতি বৃহৎ গম্বুজ—স্পষ্টতই মুসলিম-স্থাপত্য-প্রভাবিত। ১৮ শতক। (কাটোয়া-আজিমগঞ্জ লাইনের ডাহাপাড়া ধাম স্টেশন থেকে হেঁটে বা লালগোলা লাইনের মুর্শিদাবাদ স্টেশন থেকে রিক্সায় ইচ্ছাগঞ্জ ঘাট—গঙ্গা পেরিয়ে হাঁটা/ভ্যানরিক্সা (৪ কি.মি.)। **প্রাসঙ্গিকী** : (i) পীঠনির্ণয়তন্ত্র অনুসারে এখানে দেবীর মুকুট পড়েছিল, তাই মহাপীঠ, আবার অঙ্গ না পড়ে ভূষণ, মুকুট, পাড়ায় অনেকের মতে 'উপপীঠ'। (ii) ১৮ শতকের শেষ দিকের 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' অনুসারে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ ও জগৎ শেঠের কোষাগার লুঠ করার আগে বিদ্রোহী আফগান নেতা মীর হাবিব মারাঠা বর্গীদের সাথে কিরীটেশ্বরীতে শিবির স্থাপন করেন এবং 'সিয়ার-উল্ মুতাক্ষরীণ' অনুসারে নবাব মীরজাফর মৃত্যুর আগে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করেন।[১] (iii) ডাহাপাড়ার বঙ্গাধিকারীগণ ছাড়াও রানী ভবানী, রাজা রামকৃষ্ণ, রাজা রাজবল্লভ এমনকি মুর্শিদাবাদের নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় কিরীটেশ্বরীতে বহু মন্দির নির্মিত হয়, অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত। (iv) লিপিসাক্ষ্য অনুসারে কিরীটেশ্বরীর লুপ্ত আদি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১৪০৫ খ্রিস্টাব্দে—আর একটি মন্দিরের (বর্তমানে ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ কর্তৃক রক্ষিত) লিপি হল : 'সাকে সপ্তাষ্ট কালেন্দু সংখে শম্ভুপ্রিয়ে পুরে সভারাম সুতোহকার্ষীদ্রঘুনাথ মঠং শুভং'—অর্থাৎ ১৩৮৭ শকাব্দে ১৪৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সভারামপুত্র রঘুনাথ এই শুভ মন্দির নির্মাণ করেন।[২]

২। **যশোড়া,** চাকদহ, নদীয়া। জগন্নাথ। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতা—চৈতন্যপার্ষদ ও দ্বাদশসখার অন্যতম জগদীশ পণ্ডিত। বৃহৎ পাঁচখিলান দালানের উপরে তিনটি খাড়া গম্বুজ। জগদীশ পণ্ডিত ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন, কিন্তু বর্তমান মন্দির মনে হয় অনেক পরে নির্মিত এবং তারপরেও বহুবার সংস্কৃত। (শিয়ালদহ রানাঘাট লাইনের চাকদহ থেকে রিক্সায়।

৩। **আমঘাটা,** কৃষ্ণনগর, নদীয়া। হরিহর। প্রতিষ্ঠাতা নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। দালানের উপরে হরিহর অভেদ বোঝাতে পাশাপাশি দুটি ছুঁচালো গম্বুজ—প্রসঙ্গত জলঙ্গীর শাখানদী অলকানন্দা (বর্তমানে মজা খাত) তীরের আমঘাটা ছিল মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শেষ বয়সের গঙ্গাবাস এখানেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন (১৭৮২)। মন্দিব প্রতিষ্ঠা ১৭৭৬। (কৃষ্ণনগর থেকে বাসে বা নবদ্বীপ থেকে গঙ্গা পেরিয়ে রিক্সায়—শান্তিপুর/কৃষ্ণনগর থেকে ছোট ট্রেনে আমঘাটা স্টেশনে এসে হেঁটেও যাওয়া যায়।

১ এবং ২ : 'মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়াব', ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্, উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, এবং জেলাশাসক ও সমাহর্তা, মুর্শিদাবাদ, ২০০৩, পৃ: ৬৪২।

পঞ্জি—১৪

তিনটি ব্যতিক্রমী মন্দির

১। **বাঁশবেড়িয়া,** হুগলী। হংসেশ্বরী। রাজা নৃসিংহদের রায় কর্তৃক পরিকল্পিত ও কর্মারম্ভ ও তাঁর পত্নী শঙ্করী কর্তৃক সমাপ্ত ত্রয়োদশ শিখর সম্পন্ন। গর্ভগৃহের সামনে ত্রিখিলান বারন্দা। বারাণসী থেকে নৌকাযোগে আনানো পাথরে নির্মিত। দৈর্ঘ্য আনু. ৫০ ফুট, উচ্চতা আনু. ৭০ ফুট। ছয়টি তলসম্পন্ন। ১৮১৪। (হাওড়া-ব্যাণ্ডেল লাইনের বাঁশবেড়িয়া স্টেশন থেকে হেঁটে/রিক্সায়) **প্রাসঙ্গিকী** : (i) বাস্তুশাস্ত্র-বর্ণিত কোনো প্রকার বা পদ্ধতি অনুসারে নয়া, বাংলার মন্দিরকলার শত শত বৎসরের প্রথা বা ঐতিহ্য অনুসারেও নয়—হংসেশ্বরী মন্দির নির্মিত হয়েছে তন্ত্রসাধনার মূল সূত্রগুলির স্থাপত্যরূপ হিসাবে, শুধু বাংলারাই নয়, সর্বভারতীয় মন্দিরকলাক্ষেত্রে তাই মন্দিরটি অভিনব, অদ্বিতীয় এবং অবিকল্প। হংসেশ্বরী মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতেই এর ইঙ্গিত আছে :

শাকাব্দে রস-বহ্নি-মৈত্রগণিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং।
মোক্ষদ্বার-চতুর্দশেশ্বর-সমং হংসেশ্বরী-রাজিতং।।
ভূপালেন নৃসিংহদেবকৃতিনারদ্ধং তদাজ্ঞানুগা।
তৎপত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী নির্মমে।।

শকাব্দা ১৭৩৬

[চতুর্দশ মোক্ষদ্বাররূপী শিবের সাথে বিরাজিত হংসেশ্বরীর নিমিত্ত ভূপাল নৃসিংহদেব কর্তৃক আরদ্ধ এই শ্রীমন্দির তাঁর আজ্ঞানুগা পত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী ১৭৩৬ শকাব্দে নির্মাণ করলেন।]

চতুর্দশ ভুবনে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাও চতুর্দশ (বেদ ৪, বেদের ষড়ঙ্গ ৬, ধর্মশাস্ত্র-পুরাণ-মীমাংসা-তর্ক-৪)—উভয় ক্ষেত্রেই অধিষ্ঠাতা হলেন শিব, আবার চতুর্দশ বিদ্যাই যেহেতু মোক্ষলাভের উপায় সেই হেতু শিবই মোক্ষদ্বারের অধীশ্বর, 'চতুর্দশেশ্বর'—একারণেই 'হংসেশ্বরী' মন্দিরের শিখর-ভবনগুলিতে চৌদ্দটি শিবলিঙ্গ বিরাজিত আছেন—এই শিখর-ভবনগুলির মধ্যে সংযোগ পথ আছে, এগুলিই শিব-শাসিত 'মোক্ষদ্বার', এবং এই সংযোগ পথগুলি দিয়ে ভিতরে একটি গোলাকধাঁধা তৈরী করা হয়েছে, একবার ঢুকলে বার হওয়া শক্ত। এতে বোঝানো হয়েছে যে সৎগুরুর সাহায্য ছাড়া মোক্ষ লাভ করা যায় না, গুরুই গোলকধাঁধার ভিতর সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন। এই গোলকধাঁধা আবার 'ষটচক্রে'র প্রতীক—ষটচক্রভেদ করে 'কুলকুণ্ডলিনী' শক্তিকে জাগরিত না করলে মোক্ষলাভ হয় না। দেবী হংসেশ্বরী কুলকুণ্ডলিনী শক্তির প্রতীক। ষটচক্ররূপী গোলকধাঁধাটি আছে মানুষের দেহে—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, বজ্রাক্ষ ও চিত্রিনী নামে পাঁচটি নাড়ীর আকারে। হংসেশ্বরী মন্দিরে এই পাঁচটি নাড়ীর প্রতীকরূপে পাঁচটি সোপান আছে। (ii) তন্ত্রসাধনার প্রতীক-সাধন বলেই মন্দির-স্থাপত্যের কোনো ধারার সঙ্গে হংসেশ্বরী মন্দিরের মিল নেই। প্রথাগত রত্নরীতির মন্দিরে চূড়া বা রত্নগুলি বসানো হয় চালা বা চালের কোণগুলিতে ও প্রধান রত্নটি চালের মাঝে, ত্রয়োদশরত্ন মন্দিরে ক্ষেত্রে (যেমন দুবরাজপুরে) চালের কার্ণিশেও রত্ন বসানো যেতে পারে। কিন্তু হংসেশ্বরী মন্দিরে তা নয়—এটি ছ'তালা

শিখরভবনের সমাহার—এদের মধ্যেই আগে বলা গোলধাঁধার মত সংযোগপথগুলি আছে। সুতরাং ১৩টি শিখর থাকলেও শিখরগুলি 'রত্ন' নয়, আবার বিভিন্ন শিখরভবনের সমাহার হলেও এটি কোনোক্রমেই শিখর-দেউলও নয়। এমন স্থাপত্যের মন্দির দেশে নেই। (iii) গুহ্য নিহিতার্থ যাঁদের জানা নেই বা ঐ বিষয়ে যাঁদের আগ্রহ নেই তাঁরাও হংসেশ্বরী মন্দিরের অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন, ঠিক যেমন বাউল সাধনতত্ত্ব বা বাউলদের বাণীর নিহিতার্থ যাঁদের জানা নেই তাঁরাও বাউলগানের কাব্যসৌন্দর্য ও সুরসম্পদে মুগ্ধ হন। দেশ-বিদেশের বহু বিদগ্ধ মানুষ হংসেশ্বরী মন্দির দেখে আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন—যেমন কবি আলেকজান্ডার চ্যাপম্যান তাঁর 'Bansberia Temple' নামক দীর্ঘ কবিতার শেষে লিখেছেন যে দীক্ষিতদের কাছে এই মন্দির মোক্ষের দুয়ার খুলে দেয়, তিনি ঐ শুদ্ধ চিন্তার বাইরে, বিদেশী, কিন্তু অনান্দোলিত নন,

> What did he do ? He built a temple. still
> It stands, and I have seen it; but too ill
> Would words of mine describe it. Inside, out,
> Silent on earth, in pinnacled air a shout,
> It doth reveal what to the initiate
> Figures pure thought. So unto them a gate
> Is opened to deliverance. I outside,
> Alien but not unmoved, untouched, abide.[১]

(iv) বাঁশবেড়িয়ার 'রাজা মহাশয়' (১৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজীব কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি) গণ বিদ্যানুরাগী হিসাবে সুখ্যাত ছিলেন। কুলধর্মে শাক্ত হয়েও রামেশ্বর যেমন 'অনন্ত বাসুদেব' মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তেমনই কাশী, মিথিলা প্রভৃতি স্থান থেকে বিখ্যাত পণ্ডিতদের এনে বাঁশবেড়িয়ায় অনেকগুলি টোল-চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন—শ্রুতি, স্মৃতি, বেদ, বেদান্ত, দর্শন, অলংকার প্রভৃতি ছিল পাঠ্য বিষয়। এইভাবে ভাটপাড়ার আগেই এখানে মহাশ্রদ্ধেয় বিদ্যাসমাজ গড়ে ওঠে। রামভদ্র সিদ্ধান্ত বাঁশবেড়িয়ার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের একজন। হংসেশ্বরী মন্দির যাঁর পরিকল্পনা সেই নৃসিংহদেব নিজেও ছিলেন সুপণ্ডিত। কাশীতে থাকার সময়ে তিনি ভূকৈলাশের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালকে 'কাশীখণ্ড' অনুবাদে সহায়তা করেন ও নিজেও তন্ত্রগ্রন্থ 'উড্ডীশতন্ত্রে'র বঙ্গানুবাদ করেন।

২। **কুলিয়া,** কল্যানী, নদীয়া। গৌরনিতাই—দালানের উপরে দেউল মনে হয় আর নেই, —কথিত হয় যে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য এখানে এসে দেবানন্দ-স্বামীর বৈষ্ণব-অপরাধ মার্জনা করেন। কাঁচড়াপাড়া থেকে বাসে।

৩। **চুঁচুড়া** (খারুয়া বাজার), হুগলী। দয়াময়ী কালী। চারকোণা। খাঁজকাটা চৌখুপী চার

---

১. 'হুগলী জেলার দেবদেউল' (অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯১)-এর ১৪৭ পৃষ্ঠায় সুধীরকুমার মিত্র কর্তৃক উদ্ধৃত।

দেওয়াল দ্রুত হ্রস্বায়মানভাবে শিখর বিন্দুতে মিলেছে। ক্ষেত্রে একই সারিতে ঐ রীতিরই চারটি শিব মন্দির। ১৯ শতক। ঘড়িমোড় থেকে সহজে।

পঞ্জি—১৫

বিভিন্ন রীতির মন্দির সমবায়ে কয়েকটি গুচ্ছ (১৮/১৯ শতক)

১। **অমরার গড়** (দশমিন্দিরতলা), আউসগ্রাম, বর্ধমান। ছয়টি আটচালা দুটি রেখ দেউল, একটি একবাংলা দুর্গাদালান + একটি বৃহৎ পঞ্চরত্ন। শিব :
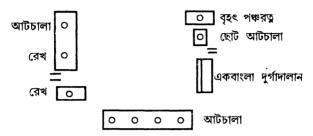
২। **কাশিমবাজার** (দশমন্দিরতলা), বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। ৫টি চারচালা + ৩টি উল্টো পদ্ম + ২টি আটচালা। শিব (কাশিমবাজার রাজপরিবার—লালগোলা লাইনের কাশিমবাজার থেকে রিক্সা, ছোট রাজবাড়ির পরের গলিপথে) :
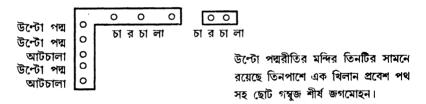
৩। **ছোট রাসবাড়ি, ৭৮ টালিগঞ্জ রোড**, কলকাতা। মণ্ডল পরিবার। ১১টি আটচালা + ১টি নবরত্ন + একটি চারচালা দোলমঞ্চ :
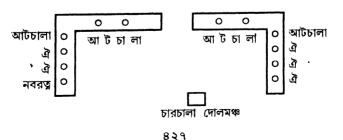
৪। **চকদীঘি,** জামালপুর, বর্ধমান। ১২টি রেখ + দুটি খাঁজকাটা রেখ + নহবৎ। শিব :
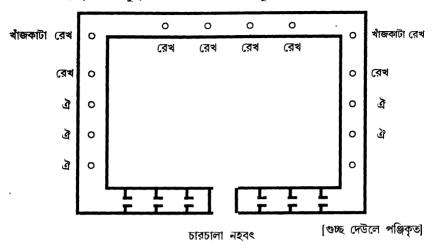
৫। **ঐ (ফকিরতলা)** বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। দালান + ৭টি আটচালা + খাঁজকাটা রেখ + ভোগঘর। কালীদালান, অন্যগুলি শিব।
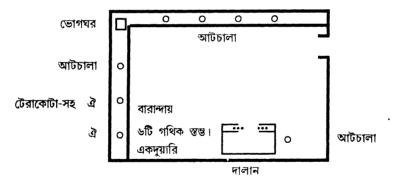
৬। **অমরারগড় (পশ্চিম পাড়া,** শম্ভুনাথ মুখার্জীর বাড়ি) :
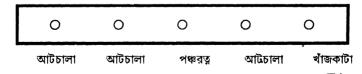
প্রথমটি ছাড়া অন্য চারটি মন্দিরই টেরাকোটা মণ্ডিত। পঞ্চরত্নটির শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় চূড়াটিই অবশিষ্ট।

৭। **মসাগ্রাম** (প্রাণেশ্বরতলা), জামালপুর, বর্ধমান :
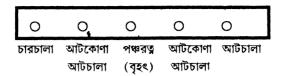
৮। **পাণ্ডবেশ্বর,** অণ্ডাল, বর্ধমান। ৬টি শিব-মন্দির, তিনটি চারচালা, একটি আটকোণা, একটি রেখ ও একটি ক্ষুদ্র চারকোণা। নিম্বার্ক সম্প্রদায় পরিচালিত। (অণ্ডাল/আসানসোল/দুর্গাপুর থেকে বাসে। অণ্ডাল থেকে ট্রেনও আছে। অজয় নদের উপরের সেতুর কাছে, অজয়-তীরে)

টালিগঞ্জের বড় রাসবাড়ি একটি উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুচ্ছ। মণ্ডল পরিবার প্রতিষ্ঠিত এই ১৯ শতকীয় ও বর্গাকারে বিন্যস্ত গুচ্ছের প্রবেশ পথের দুপাশে দুটি ও ক্ষেত্রের দুপাশে চারটি করে আটচালা ও সামনে দুপাশে দুটি পঞ্চরত্নের মাঝে একটি বৃহৎ নবরত্ন মন্দির। 'হরিহর ধাম'। (১০) **নিউ আলিপুর** স্টেশনের কাছে ঐ পরিবারেরই একটি চমৎকার মন্দিরগুচ্ছ (১৯ শতক) আছে। (১১) নদীয়ার **বীরনগরে** ১২ মন্দিরতলায় ১০টি আটচালা শিব, একটি দ্বিতল কালী ও কেন্দ্রীয় চূড়াটি ছাড়া অন্যসব চূড়া লুপ্ত হওয়ায় সুউচ্চ স্তম্ভাকৃতির একটি দুর্গামন্দির আছে (১৮/১৯ শতক। (১২) **চুঁচুড়ার** ষণ্ডেশ্বরতলায় ষণ্ডেশ্বর মন্দিরটি পুনর্নির্মিত হলেও ক্ষেত্রের জোড়বাংলা ধরনের দুর্গামন্দিরটি ১৮/১৯ শতকীয়।

পঞ্জি—১৬

উত্তরবঙ্গের মন্দির (নির্বাচিত)

১। **বিন্দোল,** রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর। ভৈরবী। আনু. ২৫/২৬ বর্গফুট ভিত্তিবেদীর উপরে, মন্দিরশীর্ষ সম্পূর্ণ বৃক্ষাচ্ছাদিত হওয়ায় উচ্চতা আন্দাজ করা শক্ত। গর্ভগৃহ-সংলগ্ন গম্বুজ-শীর্ষ জগমোহনের দুপাশে ও সামনে একখিলান করে প্রবেশ পথ। প্রবেশ করে উপরে তাকালে ঘন্টার তলদেশের মত গম্বুজতল দৃশ্যমান, গর্ভগৃহেও তাই। গম্বুজের ধরণ মসজিদের মত। সামনের দেওয়ালে সুলতানী যুগের মসজিদগুলিতে যে ধরণ দেখা যায়, সেই ধরণের কিছু ক্ষয়িত টেরাকোটা। নির্মিতি ও অলংকরণ উভয়-ক্ষেত্রেই মুসলিম-প্রভাব স্পষ্ট। ১৬ শতক। (কলকাতা/বহরমপুর/মালদহ থেকে বাসে রায়গঞ্জ। রায়গঞ্জ বাসস্ট্যাণ্ড থেকে বিন্দোলগামী লোকাল বাসে। কুলিক পক্ষিনিবাসের পাশ দিয়ে বাস ঘুরবে—বিন্দোল গ্রামের আগে, বাসরাস্তার পাশের মাঠে। উল্লেখ্য, মন্দির জীর্ণ ও বৃক্ষাক্রান্ত হলেও ভৈরবী ঐ অঞ্চলের অতীব মান্য দেবী।)

২। **বাণেশ্বর,** কোচবিহার। বাণেশ্বর শিব। প্রতিষ্ঠাতা সম্ভবত কোচবিহার-রাজ প্রাণনারায়ণ (১৬২৫-৬৫), তবে মন্দিরটিকে ঘিরে কিংবদন্তি বহু, যেমন : (i) পৌরাণিক যুগের বাণাসুর বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন; (ii) জল্পেশ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা জল্পেশ্বর এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন—কিংবদন্তি অনুসারে রাজা জল্পেশ নাকি খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে বর্তমান ছিলেন; (iii) মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন কোচরাজ নরনারায়ণ (১৫৫৫-৮৭) ও পরবর্তীকালে প্রাণনারায়ণ এটি সংস্কার করেন।—ভিতরে-বাইরে চতুষ্কোণ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ৩১ ফুট করে এবং উচ্চতায় ৩৫ ফুটের মত। একদুয়ারি মন্দিরটির খিলানতল হতে চারদেওয়ালেই কিছুটা অন্তর অন্তর পাঁচটি সমান্তরাল পটি আছে যা পার্বত্য ত্রিপুরার রীতিকে মনে পড়িয়ে দেয়।

সর্বোচ্চ পটিটিতে ও দেওয়ালের উপরস্থ কার্ণিশে আলংকারিকভাবে বক্রচালের আভাস আনা হয়েছে। এর উপর থেকে একগম্বুজ মসজিদের মত বৃহৎ গম্বুজ ও তার শীর্ষে রয়েছে পদ্ম, আমলক, কলস এবং দণ্ড। প্রকৃতপক্ষে কোচবিহারের এখনও টিকে থাকা সব মন্দিরেই মুসলিম গম্বুজ ব্যবহৃত হয়েছে, এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ কোচবিহার-রাজকর্তৃক মুসলমান স্থপতি নিয়োগের কথা বলেছেন, আবার কেউ কেউ কোচবিহারে স্বল্পকালীন মুসলমান শাসনের কথা বলেছেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা না চাইলে স্থপতি এমন করতে পারতেন না—যেমন উত্তর ২৪ পরগণার গোবরডাঙার ইছাপুরে আসান বক্স বানিয়েছিলেন নবরত্ন বা বাঁকুড়ার জিবটার রায় পরিবারের দুর্গাদালান বানান পানাউল্লা মিস্ত্রী, আর স্বল্পকালীন মুসলিম শাসন কারণ হলে দীর্ঘকালীন মুসলিম শাসনে থাকা দক্ষিণবঙ্গে আরও বেশি করে অমনটি হওয়া উচিত ছিল কিন্তু সেখানে দেউল, চালা ও রত্নরীতিই ব্যাপক। যাই হোক, ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ভূমিকম্পে বাণেশ্বরের মন্দির একটিকে কিছুটা হেলে গিয়েছিল—এখনও মন্দিরটি সেই অবস্থাতে আছে। মন্দিরের

পাশে মোহনদীঘি, নামে বড় পুকুরে বাণেশ্বরের নিরাপদ আশ্রয়ে বেশ কিছু কচ্ছপ রক্ষিত আছে। (কোচবিহার-নিউ আলিপুর বাসে 'বাণেশ্বর চৌপথী', সামান্য দূরত্বে বিখ্যাত মন্দির)।

৩। **গোঁসানীমারি** (ভিতর কামতা), দিনহাটা, কোচবিহার। কামতেশ্বরী। বর্তমান মন্দির কোচবিহীর-রাজ প্রাণনারায়ণ রায় (১৬২৫-৬৫) কর্তৃক নির্মিত তবে, ক্ষেত্র ও ঐতিহ্য আরও প্রাচীন। পূর্ববঙ্গ রেলপথ কর্তৃক ১৯৪০-এ প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ'-এ বলা হয়েছে :[১]

"....ধরলা নদীর তীরে গোসানীমারি গ্রামে প্রাচীন কামতা রাজ্যের রাজধানী কামতাপুরের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। প্রাসাদ ও গড়ের মৃণ্ময় প্রাকারের কিছু কিছু অংশ ও দুইটি ভগ্ন মন্দির এখনও বর্ত্তমান। ধ্বংসাবশেষটি এখনও রাজপাট নামে পরিচিত। কামতারাজ্য মহাভারতোক্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা কামরূপেরই অংশ বিশেষ ছিল। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক গ্রন্থে যথা, কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে কামরূপের চতুঃসীমা এইভাবে নির্দ্দিষ্ট আছেঃ উত্তরে কাঞ্চনাদ্রি বা কাঞ্চনজঙ্ঘা। পশ্চিমে করতোয়া নদী, পূর্ব্বে দিক্করবাসিনী বা দিক্ষুনদী এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষা নদীর সঙ্গম। এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডের আকার একটি ত্রিভুজের ন্যায় এবং ইহা রত্নপীঠ, কামপীঠ, স্বর্ণপীঠ ও শৌমার পীঠ এই চারি অংশে বিভক্ত। ইহার পশ্চিমাংশ বা শৌমার পীঠ ঐতিহাসিক যুগে কামতা নামে বিখ্যাত হইয়া ছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ অনেক স্থলে কামরূপ ও কামতা শব্দ তুল্যার্থজ্ঞাপক হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে খ্যেনবংশীয় নীলধ্বজ কামতা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কামদা বা কামতাদেবী তাঁহার উপাস্য দেবতা ছিলেন। দেবীর নামানুসারে তিনি রাজ্যের নাম কামতারাজ্য এবং রাজধানীব নাম কামতাপুর রাখেন। সাধারণ লোকে এই দেবীকে গোস্বামিনী সর্ব্বাধিশ্বরী বা গোসানী নামে অভিহিত করিত। এই জন্য পরবর্ত্তীকালে কামতাপুর গোসানীমারি নামে পরিচিত হয়। নীলধ্বজের পর যথাক্রমে চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর কামতারাজ্যের অধীশ্বর হন।"

দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বর্গাকার (চারদিকেই আনু. ২৯ ফুট করে দীর্ঘ) অধিষ্ঠানের উপরে আনু. ৪৫ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন মূল মন্দিরের নিম্নাংশ অনেকটা চারচালা প্রকৃতির ও এর উপরে কোচবিহারে প্রচলিত রীতি অনুসারে মুসলিম মসজিদের আকারে গম্বুজ-এর শীর্ষে যথারীতি আমলক, কলস, পদ্ম ও দণ্ড। অধিষ্ঠানের উপর হতে গম্বুজতল পর্যন্ত চার দেওয়ালের চারকোণে নীচে-উপরে তিনটি করে পাটির গুচ্ছ এবং উভয়গুচ্ছের মাঝে একটি করে উদ্গত পটি। মন্দির একদুয়ারী, যদিও দুপাশের দেওয়ালে দরজার অনুকৃতি আছে। মন্দিরের সামনে থাকা হোমঘরটিও চারচালা প্রকৃতির তবে দোলমঞ্চের মত চারদিকে একটি করে মুক্ত খিলান। এর সামনেকার ধনাগারটি প্রস্থ ও উচ্চতায় আনু. ১৮ ফুট ও দৈর্ঘ্যে আনু. ২৫ ফুট সম্পন্ন দালান, সামনে ও পিছনে মাত্র একটি করে দ্বার, দ্বারেব দুপাশে দুটি ও উভয়পাশের দেওয়ালে দ্বারের সমান মাপ ও আকারের জানালা, দুপাশের চার জানলার মাঝে একটি করে আলঙ্কারিক কুলুঙ্গী। বৃহৎ অঙ্গন,

১। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৩-২৪।

চতুষ্কোণ, চারদিক ঘেরা প্রাকারের চারকোণে চারটি গম্বুজ-শীর্ষ গোল স্তম্ভাকৃতি দ্বিতল স্থাপত্য, নহবৎ-সহ রাজসিক প্রবেশদ্বার। ১৬৬৫।
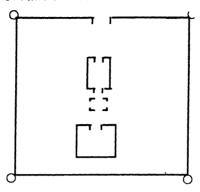
(কোচবিহার থেকে আদাবাড়ি ঘাট বাসে 'গোঁসানিমারি চৌপথী' বা কোচবিহার-দিনহাটা বাসে/ট্রেকারে জামতলা এসে আদাবাড়ি ঘাটের বাসে 'গোঁসানিমারি চৌপথী'—এবার হাই স্কুলের পথে সামান্য হেঁটে, স্কুলের বিপরীত পাশে)।

৪। **গড়তলি জল্পেশ,** ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। জল্পেশ (শিব)। বর্তমান মন্দির কোচবিহার-রাজ প্রাণনারায়ণ (১৬২৫-৬৫) কর্তৃক সংস্কৃত ও ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ভূমিকম্পের পরে 'জল্পেশ টেম্পল কমিটি' কর্তৃক ক্রমে ক্রমে পুনর্নির্মিত।

জল্পেশ মন্দিরের আদি প্রতিষ্ঠাতা কে তা জানা যায় না, এ সম্পর্কে নানা কিংবদন্তি ও অভিমত চলিত আছে, যেমন : (i) খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয়/তৃতীয় শতকের রাজা জল্পেশ্বর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন—কিন্তু এই রাজা সম্পর্কে কিংবদন্তি ছাড়া কোনও তথ্য নেই। (ii) পণ্ডিত অদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'জলপাইগুড়ির মন্দির' নিবন্ধে লিখেছেন :

> "জলপাইগুড়ি জেলার সর্বাপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ দেউল হইতেছে জল্পেশ্বর। এখানে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ কোনও প্রস্তর অথবা ভূমজ্জিত শৈলশিখর। অত্যন্ত নিম্নস্থানে বলিয়া ভূমিতল হইতে উত্থিত জলরাশি দ্বারা নিমজ্জিত। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, পরশুরাম যখন ধরণী নিঃক্ষত্রিয় করিবার জন্য নির্বিচারে তাঁহাদের হত্যা করিতেছিলেন, তখন অনেক ক্ষত্রিয় ম্লেচ্ছরূপে পরিচয় দিয়া জল্পেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।....বৃহৎ নীলতন্ত্রে উল্লিখিত আছে যে জল্পেশ বলিতেছেন—"অহম্-কোচ বোধুপুরে জল্পেশ নামঃ ইতি খ্যাত্"। মন্দিরটির চারিপাশে উচ্চভূমি এবং অর্চনার জন্য সোপানশ্রেণি প্রমাণ করে যে বহু প্রাচীনতর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে অন্তত বর্তমান মন্দিরের কাঠামো কুচবিহারের রাজবংশ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। লোকশ্রুতি অনুসারে ইহা প্রথমে এক

> শৈবমতালম্বী ভূটান নৃপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই মন্দিরের সংস্কার কুচবিহাররাজ কর্তৃক হইয়াছিল।"[১]

(iii) ১৮০৯-এ বুকানন হ্যামিলটন লেখেন যে প্রাণনারায়ণ মন্দিরটি সংস্কার করেন।[২] (iv) ১৯১১-য় জলপাইগুড়ি জেলা গেজেটিয়ারে জন এফ. গ্রুনিং লেখেন যে যোগিনী তন্ত্রে উল্লিখিত তৃতীয় অহোম নৃপতি মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন—পরবর্তীকালে প্রাণনারায়াণ এর সংস্কার শুরু করলেও তা সমাপ্ত করেন তাঁর পুত্র (মোদনারায়ণ) ও দৌহিত্র।[৩] অতএব প্রাণনারায়ণ ১৭ শতকের মাঝামাঝি মন্দিরটি সংস্কার করেন বা সংস্কার কাজ শুরু করেন—এটুকুই শুধু ঈষৎ জোর দিয়ে বলা যায়। কিন্তু মন্দিরটির বর্তমান পাঁচগম্বুজ (পঞ্চরত্নের ধারায়—ছাদের চারকোণে চারটি ও মাঝে দৈত্যাকাব স্তম্ভের মত ঊর্ধ্বগামী শিখরের শীর্ষে একটি) রূপটি ১৮৯৭-এর ভূমিকম্পের পরবর্তীকালের।

মন্দিরের গর্ভগৃহটি বৃহৎ (দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ২৯ ফুট) ও ভূমিসমতলে ১০ ফুট নীচে, সেখানেও শিবলিঙ্গটি রয়েছে ২ ফুট গভীর একটি গর্তের ভিতরে। মন্দিরটি অতিবৃহৎ—১২৪ ফুট দৈর্ঘ্য, ১২০ ফুট প্রস্থ ও গর্ভগৃহের শিবলিঙ্গ থেকে গম্বুজ শীর্ষের ত্রিশূল পর্যন্ত ধরলে ১২৭ ফুট উচ্চ। (জলপাইগুড়ি থেকে বাসে, ময়নাগুড়িতে বাস পাল্টিয়ে/অটোতে/রিক্সায়। কোচবিহার থেকে এলে বাসে ধূপগুড়ি হয়ে ময়নাগুড়ি তারপর আগে বলা পথে)।

৫। **ধলিয়াবাড়ি,** কোচবিহার। সিদ্ধনাথ শিব। বক্রচাল পঞ্চরত্ন। টেরাকোটাসজ্জিত। (জলপাইগুড়ি/কোচবিহারে একমাত্র)। বর্গাকার (দৈর্ঘ্য-প্রস্থ আনু. ২০/২২ ফুট) অধিষ্ঠানের উপরে আনু ৩০ ফুট উচ্চতাসম্পন্ন। চারকোণের চারটি রত্ন মূল মন্দিরটিরই মত বর্গাকার ও দেওয়ালের উপর চোখা শিখর-সম্পন্ন। মাঝেব চূড়াটি বহুকাল আগে লুপ্ত—১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে হ্যামিলটনের দর্শনের সময়েও ছিল না। গর্ভগৃহের দ্বারশীর্ষে পঙ্খ-পলেস্তরায় চারচালা মুখমণ্ডপের অনুকৃতি। দেওয়ালের খোপগুলিতে থাকা টেরাকোটা অলংকরণ ক্ষয়িত। কিন্তু মন্দিরটির আসল বৈশিষ্ট্যটি রয়ে গেছে। উত্তর দেওয়ালে মসজিদের মত 'মিহরাব'-টিতে। এ-বিষয়ে বিশিষ্ট প্রত্নবিদ M.S. Vats যা লিখেছেন তা স্মরণ করা যায় :

> "An interesting feature observed in the temple is that in the north wall there is a tall and deep semi-circular niche covered by a multifoil arch which corresponds to the *mihrab* in Muhammadan mosques. This, however, comes on the north but not the west side which was already pierced by the second door-way. This is so novel in respect of temple architecture that it may be explained on the assumption that for a time during the Muhammadan period this might have been converted

১। তারাপদ সাঁতরা সম্পাদিত 'কৌশিকী' ১৯৭১-৮৮, ১, (পুস্তক বিপণি, ২০০৪), পৃ. ৪১-৪২
২/৩ : তারপদ সাঁতরা, জলপাইগুড়ি জেলার পুরাকীর্তি', প.ব. সরকার (২০০৪), পৃ. ২৬।

into mosque....The niche which is only 26 deep was cut out of the thickness of the wall."[8]

৬। **সিদ্ধেশ্বরী,** কোচবিহার। সিদ্ধেশ্বরী। সম্ভবত কোচবিহাররাজ হরেন্দ্রনারায়ণের আমলে (১৭৮৩-১৮৩৯)। উচ্চতা আনু. ৩০ ফুট। আটকোণা দেওয়ালের (কোচবিহার একমাত্র) উপর বৃহৎ মুসলিম প্রভাবিত গম্বুজ। মন্দিরগাত্রস্থ গোল ইমারতী থাম দেখে কেউ কেউ পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা বলেছেন। (বাণেশ্বর, ক্রম ২, থেকে ভ্যানরিক্সায়)।

৭। **কোচবিহার টাউন (সাগরদীঘি, ভিক্টর প্যালেসের সামনে)।** হিরণ্যগর্ভ শিব। দৈর্ঘ্য/প্রস্থ ১২ ফুট, উচ্চতা ২০/২২ ফুট। চারকোণা—বক্রকার্নিশ। উপরে বৃহৎ গম্বুজ। প্রতিষ্ঠাতা কোচবিহার রাজ হরেন্দ্রনারায়ণ। ১৮২২-২৩।

৮। **ঐ (সুভাষপল্লী)।** শনি। দ্বিতল। আনু. ২৫/২৬ ফুট উচ্চতা। বক্র কার্নিশ। ছাদে বৃহৎ গম্বুজ। পঙ্খ-পলেস্তরার গণেশ, সিংহ ছাড়াও দুটি বিড়াল মূর্তি (ব্যতিক্রমী)। প্রতিষ্ঠাত্রী রানী নিশিময়ী (লোকমতে)। নিকটে অনাথনাথ শিবমন্দির ও পুরানী মসজিদ। ১৮৩০-৪০।

৯। **ঐ (গুঞ্জাবাড়ি)।** 'ডাঙ্গর আয়ী' (বড় রানী) মন্দির। প্রধান বিগ্রহ দুর্গা। চারটি ঘর-বিশিষ্ট একতলা দালান। উঁচু প্রাচীর ঘেরা ক্ষেত্র। দ্বিতল প্রবেশদ্বার—দ্বিতীয় তলটি নহবত। বাঁকানো গম্বুজ-প্রকৃতির চালের উপরে তিনটি চূড়া। প্রতিষ্ঠাত্রী রাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের বড় রানী কামেশ্বরী। ১৮৮৪।

১০। **ঐ (মদনমোহনতলা)।** মদনমোহন। এই মন্দিরটিও কোচবিহারের অন্যান্য মন্দিরের মতন চারকোণা বক্রকার্নিশ দেওয়ালের উপরে বৃহৎ গম্বুজ-বিশিষ্ট কিন্তু চারটি ঘর থাকায় ও সামনে সমতল ছাদের দীর্ঘ বারান্দা থাকায় এক গম্বুজ দালানের ভাবই বেশি। দীর্ঘ বারান্দার দুদিকে পাঁচটি করে অতীব সুদৃশ্য খিলান ও মাঝে মদনমোহনের সামনের ত্রিখিলান বারান্দা পার্থক্য সূচিত করার জন্য কয়েক ফুট এগিয়ে আসা বা অধিক প্রস্থ-সম্পন্ন—এতে রূপ আরও খুলেছে, ৫ + ৩ + ৫ = ১৩ খিলান বারান্দা। কোচবিহার-রাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মন্দির। ১৮৮৯-৯০ (তবে বিগ্রহ প্রাচীনতর ছিল)—মদনমোহনের রাস-উৎসব মনে হয় উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ লোক উৎসব। উল্লেখ্য মদনমোহন-ক্ষেত্র মনোহর উদ্যান-শোভিত, সুদৃশ্য রেলিং-ঘেরা; সুদৃশ্য একতলা দালানের মাঝে বৃহৎ এক খিলান ক্ষেত্র দ্বার, এর উপরে আটকোণা ও তীক্ষ্ণ শীর্ষ পিরামিডাকৃতি চালের অনন্য নহবৎ।

১১। **ঐ (মদনমোহনের পূবে)।** ভবানী। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে আনু. ১৪ ফুট করে ও উচ্চতা আনু. ২৫/২৬ ফুট। চারকোণা বক্রকার্নিশ দেওয়ালের উপরে বড় মাপের গম্বুজ। প্রবেশদ্বারের দুদিকে গোল ছোট থাম। প্রতিষ্ঠাতা সম্ভবত রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ। ১৯ শতক। [উল্লেখ্য মদনমোহন প্রাঙ্গণে আনন্দময়ী কালীরও একটি মন্দির আছে]

৮। District Hand books : Cooch Behar, 1951 by A. Mitra, P. 121-122—'কোচবিহারের ইতিহাস', দে'জ ২০০৬, পৃ. ২৫৫-৫৬য় উদ্ধৃত।

১২। **কলিগ্রাম**, চাঁচল, মালদহ। শিব। প্রতিষ্ঠাত্রী সম্ভবত বিহারের পূর্ণিয়া জেলার সাউরিয়ার রানী ইন্দ্রাবতী (স্থানীয় সাক্ষ্য)—তিনিই মন্দিরের পার্শ্ববর্তী 'রানীর দীঘি' নামে পরিচিত বৃহৎ পুকুরটি খনন করান। দেওয়াল (বাড়) ও তার উপরকার গম্বুজ দুই-ই আটকোণা—দেওয়ালের উচ্চতা অধিষ্ঠান থেকে আনু. ২০ ফুট, কিন্তু আমলক, কলস, দণ্ডসহ শুধু গম্বুজের উচ্চতা তার তুলনায় কিছু কম, ফলে আনু. ৩৫/৩৬ ফুট উচ্চতার মন্দিরটিকে উপর থেকে চাপা দেখায়। এক দুয়ারী কিন্তু বাকি সাত কোণে দরজার আভাস। কোর দেওয়া ঘরের মত বক্ররেখ আটটি খিলানে কিছু পঙ্খের কাজ। আটকোণা দেওয়াল-শীর্ষে পরপর সমান্তরাল কৌণিক খাঁজের প্যাটার্ন। আটভাগে বিভক্ত দেওয়ালের উপর আমলকের ভূমি হতে উল্টানো ছাতার মতন নেমে এসেছে আটকোণা গম্বুজ। ১৯ শতক। (মালদহের ইংলিস বাজার বা রথবাড়ি থেকে গাজোল হয়ে চাঁচল যাচ্ছে এমন বাসে চাঁচল। চাঁচল বাসস্ট্যাণ্ড থেকে রিক্সায়/বাসে কলিগ্রাম। জিন্দাপীরের সমাধি (পঞ্জি-২, একবাংলায় পঞ্জিকৃত) ডানে রেখে মূল রাস্তার সঙ্গে ঘুরলে রাস্তা ঘেষেই দেখা যাবে। পীরের সমাধির বিপরীতের বাজারের মধ্য দিয়ে রানীদীঘির পাড় দিয়ে শর্ট-কাটও হয়)।
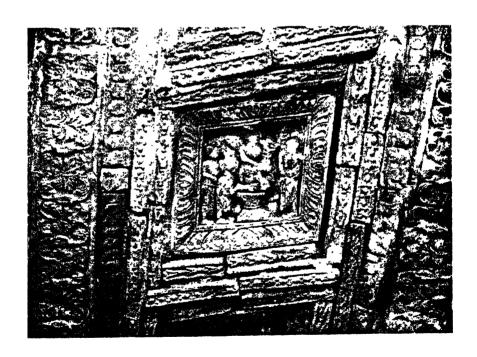
পাঞ্জি—১৭
জগমোহন

(অন্যরকম উল্লেখ না থাকলে, উপাদান : ইট। পথ পূর্বোল্লেখিত)

(ক) রেখ (শিখর) দেউল এবং পিড়া জগমোহন (ওড়িশী ধারা) :

(১) গড়বেতা (পশ্চিম মেদিনীপুর), মাকড়া-পাথর, সর্বমঙ্গলা, ১৬ শতক। **(২) এগরা** (পূর্ব মেদিনীপুর), হটনাগর শিব, ১৬ শতক। **(৩) কেদার** (পিংলা, পশ্চিম মেদিনীপুর), মাকড়া-পাথর, কেদারেশ্বর/চপলেশ্বর শিব, ১৬ শতক। **(৪) তলকুঁয়াই** বা **নেড়াদেউল** (কেশপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর), মাকড়া পাথর, কামেশ্বর শিব, ১৬ শতক। **(৫) দেউলবাড়** (কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর), জগন্নাথ, ১৫৮৪ খ্রী.। **(৬) কর্ণগড়** (শালবনী, পশ্চিম মেদিনীপুর), মাকড়া-পাথর, দণ্ডেশ্বর, ১৭ শতকের মধ্যভাগ। **(৭) ঐ,** মাকড়া-পাথর, মহামায়া, ১৭ শতকের মধ্যভাগ। **(৮) কুমারহাটি** (কেশিয়াড়ী, পশ্চিম মেদিনীপুর), পাথর, জগন্নাথ, (পরিত্যক্ত), ১৭ শতকের মধ্যভাগ। **(৯) বিক্রমপুর** (ওন্দা, বাঁকুড়া), পাথর, রাধাকৃষ্ণ, ১৬৫৩-৫৪ খ্রী.)। **(১০) শিহর** (কোতুলপুর, বাঁকুড়া), পাথর, শান্তিনাথ শিব, ১৭ শতক। **(১১) ধলহরা** বা **কাষ্টখামার** (কেশপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর), মাকড়া-পাথর, বটেশ্বর শিব, ১৮ শতকের শুরুতে। **(১২) চণ্ডীপুর** (খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর), মাকড়া-পাথর বীজেশ্বর শিব, ১৮ শতকের প্রথম দিক। **(১৩) মালঞ্চ** (খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর), মাকড়া-পাথর, নন্দেশ্বর শিব, ১৭১৯ খ্রী.। **(১৪) পঁচেটগড়** (পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর), বক্রচাল, কিশোর রায়, ১৮ শতকের মধ্যভাগ। **(১৫) চন্দ্রকোণা** (পশ্চিম মেদিনীপুর), মাকড়া পাথর, রঘুনাথ ১৮ শতক। **(১৬) বাসুদেবপুর** (এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর), জগন্নাথ, ১৮ শতকের শেষ দিক। **(১৭) মনোহরপুর** (দাঁতন, পশ্চিম মেদিনীপুর), শ্যাম রায়, ১৯ শতকের প্রথম দিক। **(১৮) ঐ,** অনন্তপুরযোত্তম, ১৯ শতক।

বিশেষ উল্লেখ : গড় পঞ্চকোট (নিতুড়িয়া, পুরুলিয়া)

(১) **শ্যাম-রঘুবীর** (পাহাড়ের উপরে)—মূল দেউল (সম্ভবত সুউচ্চ রেখ) প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়লেও সামনের বৃহৎ মুখ মণ্ডপটি (পিড়া রীতির) দর্শনীয়। পাথরের। সামনে ও দুপাশে বৃহৎ খিলান পথ। খিলানগাত্রে পরিমিত পাথর-খোদাই কাজ। ভিতরে মাঝে দাঁড়ালে মাথার উপরে পাথরের গম্বুজের তলার দিকের ঘণ্টাকৃতি ছাদ ও সামনে গর্ভগৃহে প্রবেশের পাথরের অলংকৃত প্রবেশ পথ। রাজসিক। মনে হয় এটিও ছিল পিড়া জগমোহন সহ রেখ দেউল। ১৭ শতক?

(২) পাহাড়ের নীচে পঞ্চরত্নটির ডানে ধ্বংসপ্রাপ্ত জোড়বাংলার পরে পাহাড় ঘেঁষে থাকা একটি তুলনায় ছোট মন্দিরের পিড়া-রীতির জগমোহনটিও দর্শনীয়। এটিও পাথরের। সামনে ও দুপাশে পাথরের খিলানশোভিত প্রবেশ পথ। ভিতরে দাঁড়ালে মাথার উপর ঘণ্টাতল-সদৃশ

ছাদ। কিন্তু বড় দেউল বা মূল মন্দির লুপ্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ। মনে হয় এটিও পিড়া-জগমোহন সহ রেখ দেউল ছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক।

(খ) পিড়া রীতির মন্দির ও পিড়া রীতির জগমোহন :

(১) **সেঁকুয়া** (খড়গপুর লোকাল, পশ্চিম মেদিনীপুর), মাকড়া পাথর, চন্দনেশ্বর শিব, ১৬ শতক।

(২) **কেশিয়াড়ী** (পশ্চিম মেদিনীপুর), ঝামাপাথর, সর্বমঙ্গলা, জগমোহন ছাড়াও একই রীতির বারদুয়ারী, ১৬০৪ খ্রী.।

(৩) **ঐ,** ঝামাপাথর, কাশীশ্বর শিব, ১৭ শতকের শেষে (?)।

(গ) দেউলরীতির মন্দির ও দেউলরীতিরই জগমোহন :

(১) **বৈদ্যপুর** (কালনা, বর্ধমান), কৃষ্ণ, টেরাকোটাসম্পন্ন, ১৫৯৮ খ্রী.।

(২) **মুনিনগর** (বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া), মাকড়া-পাথর, রাধাকান্ত, ১৬৭৮ খ্রী.।

(৩) **খারড়** (খেজুরী, পূর্ব মেদিনীপুর), মহারুদ্রেশ্বর শিব, টেরাকোটাসম্পন্ন, ১৮ শতকের মধ্যভাগ।

(ঘ) বিভিন্ন-রীতির মন্দিরের সঙ্গে একবাংলা (দোচালা) জগমোহন :

(১) **পাঁচড়া** (ভৈরবথান) (খয়রাশোল, বীরভূম), রেখ + একবাংলা, পাথর, শিব, ১৭ শতকের শেষে (?)।

(২) **বোড়গ্রাম** (রায়না, বর্ধমান), কূর্মপৃষ্ঠ রেখ + একবাংলা, বলরাম, ১৭-১৮ শতক।

(৩) **চন্দননগর** (হুগলী), দালান + বৃহত্তর একবাংলা, নন্দদুলাল, ১৭৪০ খ্রী.।

(৪) **বড়নগর** (জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ), আটকোণা + একবাংলা, ইট, পাশাপাশি দুটি শিব, ১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ।

(৫) **মোহনপুর** (হাটতলা) (পূর্ব মেদিনীপুর), একরত্ন + একবাংলা. ইট, জগন্নাথ, কিছু টেরাকোটা, ১৮ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ।

(৬) **ব্যাসপুর** (বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ), ওল্টোপদ্ম শিখর + একবাংলা, ইট, শিব, আকর্ষণীয় টেরাকোটা-সমৃদ্ধ, ১৮১১।

(৭) **দেবীপুর** (গ্রাম দেবীপুর) (মেমারি, বর্ধমান) রেখ + একবাংলা, ইট, লক্ষ্মী-জনার্দন, আকর্ষণীয় টেরাকোটা-সমৃদ্ধ, ১৮৪৪।

(ঙ) বিভিন্ন রীতির মন্দিরের সঙ্গে চারচালা জগমোহন :

(১) **ঘাটাল** (কোন্নগর, কর্মকারপাড়া) (পশ্চিম মেদিনীপুর), চারচালা + চারচালা, সিংহবাহিনী, ১৪৯০ খ্রী.।

(২) **তমলুক** (পূর্ব মেদিনীপুর), রেখ (শিখর) + চারচালা, বর্গভীমা, ১৭ শতকের শুরুতে।

(৩) **ঐ** (হরির বাজারের কাছে), রেখ + চারচালা, জিষ্ণুহরি, ১৭ শতকের শুরুতে।

(৪) **বাঘনাপাড়া** (কালনা, বর্ধমান), আটচালা + চারচালা, কৃষ্ণ-বলরাম, ১৬১৬ খ্রী.।

(৫) **ধসা** (জগৎবল্লভপুর, হাওড়া), আটচালা + চারচালা, গোপীনাথ, ১৭০৮ খ্রী.।

(৬) **পাইকভেড়ি** (ভগবানপুর, পূর্ব মেদিনীপুর), রেখ + চারচালা, শ্যামসুন্দর, ১৭৩০ খ্রী.।

(৭) **কালনা** (বর্ধমান), পঞ্চবিংশতি রত্ন + চারচালা, লালজী, ১৭৩৯ খ্রী.।

(৮) **তমলুক** (হরির বাজার) (পূর্ব মেদিনীপুর), রেখ + চারচালা, রামজীউ, ১৮ শতকের মাঝামাঝি।

(৯) **ঐ** (পদুমবসান, রাজবাড়ি এলাকা), জোড়া রেখ + জোড়া চারচালা, রাধামাধব ও রাধারমণ, ১৮ শতকের মাঝামাঝি।

(১০) **দামোদরপুর** (দাঁতন, পশ্চিম মেদিনীপুর), রেখ + চারচালা। বৃন্দাবনচন্দ্র, ১৮ শতকের মাঝামাঝি।

(১১) **কালনা** (বর্ধমান), পঞ্চবিংশতি রত্ন + চারচালা। কৃষ্ণচন্দ্র। ১৭৫১ খ্রী.।

(১২) **ঐ**, আটচালা + চারচালা, শ্যামচাঁদ। ১৭৫৫ খ্রী.।

(১৩) **ঐ**, পঞ্চবিংশতি রত্ন + চারচালা, গোপাল, ১৭৬৬ খ্রী.।

(১৪) **আঁটপুর** (জাঙ্গীপাড়া, হুগলী), আটচালা + চারচালা, রাধাগোবিন্দ, ১৭৮৬ খ্রী.।

(১৫) **নিজবালিয়া** (জগৎবল্লভপুর, হাওড়া), আটচালা + চারচালা, সিংহবাহিনী, ১৭৯০ খ্রী.।

(১৬) **খানাকুল** (হুগলী), রেখ + চারচালা, ঘণ্টেশ্বর শিব, ১৮ শতক।

(১৭) **বেতড়া** (গোঘাট, হুগলী), মাকড়া পাথর, আটচালা + চারচালা, পরিত্যক্ত মন্দির, ১৮ শতকের শেষে বা ১৯ শতকের প্রথম দিকে।

(১৮) **মীর্জাপুর** (পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর), রেখ + চারচালা, গোপাল, কিছু টেরাকোটা, ১৯ শতকের প্রথমে।

(১৯) **মুকসুদপুর** (খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর), রেখ + চারচালা, কাশীনাথ শিব, ১৯ শতকের প্রথমে।

(২০) **দশঘরা** (ধনিয়াখালি, হুগলী), রেখ + চারচালা, ব্রাডলিবার্ট গেটের সামনে, ১৯ শতক।

(২১) **জয়পুর** (দক্ষিণ পাড়া) (আমতা, হাওড়া), জলেশ্বর শিব, চারচালা + চারচালা, ২০ শতকের শুরুতে।

* পূর্ব মেদিনীপুরের **মোহনপুরের** রঘুনাথের একরত্ন মন্দিরে আগে চারচালা জগমোহন ছিল—বর্তমানে সেটি ভেঙে সিমেন্টের আধুনিক সমতল ছাদের দালান-মুখমণ্ডপ বসানো হয়েছে।

(চ) **আটচালা জগমোহন** :

(১) **আলঙ্গিরী** (এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর), একরত্ন + আটচালা, রাধাগোকুলানন্দ। ১৮ শতকের মধ্যভাগ। তবে বর্তমানে আটচালাটির শীর্ষদেশ ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

(২) **কাটান** (ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর), শিলাবতী নদীর-বাঁধ বা বাঁধরাস্তার অদূরে, আটচালা + আটচালা। জোড়া আটচালার প্রথমটি জগমোহন ও পরেরটি মূল মন্দিব। শিব। ১৯ শতক।

(ছ) **একরত্ন মন্দিরের সঙ্গে আটকোণা জগমোহন** :

কুলিনগ্রাম (জামালপুর, বর্ধমান); মদনগোপাল, ষোড়শ শতক— তবে ম্যাকাচিযন মনে করেন যে "the porch is a plain later addition", (প্রাগুক্ত 'লেট মিডীভ্যাল...'পৃ. ৭২)।

(জ) **দালান-রীতির জগমোহন** :

(১) **উখরা** (অন্ডাল, বর্ধমান); পাথর, চারচালা + দালান, শ্যাম বায়, ১৬৮৬ খ্রী.।

(২) **সোমসার** (ইঁদাস, বাঁকুড়া); রেখ + দালান, সোমেশ্বর শিব, ১৮ শতকেব প্রথমে অর্ধ।

(৩) **আমনপুর** (কেশপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর); বেখ + দালান, বুড়ো শিব, ১৯ শতকের প্রথমে।

(৪) **নসীপুর** (লালবাগ, মুর্শিদাবাদ—রাজবাড়ির সামান পরে উল্টোপদ্ম শিখর + দালান, শিব, ১৯ শতক।

(ঝ) **মুসলিম স্থাপত্য-প্রভাবিত গম্বুজাকৃতি জগমোহন** :

(১) **বিন্দোল** (রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর); মসজিদ ধরনের গম্বুজ-সম্পন্ন মন্দির + একই ধারার জগমোহন। লুপ্তাবশিষ্ট টেরাকোটাও মসজিদ ধাবার। মূল মন্দির শীর্ষ জঙ্গলাকীর্ণ। ভৈরবী। ১৬ শতক।

(২) **ক্ষীরগ্রাম** (মঙ্গলকোট, বর্ধমান); ধাপ কাটা দেউল ধরনের মন্দির + বৃহৎ গম্বুজ-বিশিষ্ট জগমোহন। সামনে সমতল ছাদের নাটদালান। যোগাদ্যা। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ (বর্তমান মন্দির)।

(৩) **সৈদাবাদ** (বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, মহারাজ নন্দকুমার রোডের বৃহৎ চারচালা মন্দিরের পাশের গলিতে)। উল্টোপদ্ম শিখর মন্দির + গম্বুজ-সম্পন্ন জগমোহন।

* মুর্শিদাবাদ জেলার **কাশিমবাজারের** দশমন্দির তলায় ও **নশিপুরে** বেশ কটি মন্দিরের সামনে অনুরূপ জগমোহন আছে।

(ঞ) **রেখ দেউলের সাথে পিরামিডাকৃতি জগমোহন** :

(১) **নৈপুর** (পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর); মদনমোহন, ১৭ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ?

(২) **আদলাবাদ** (এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর); রাধা-মোহন, ১৯ শতকের প্রথমে।

(৩) **মেদিনীপুর শহর** (পশ্চিম মেদিনীপুর); জগন্নাথ (ভীমতলাচক), ১৮৫১ খ্রী.।

(৪) **লোয়াদা** (ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর); রাধাগোবিন্দ (পরিত্যক্ত), ১৮৬০ খ্রী.।

(৫) **বলরামপুর** (ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর); সীতারাম, ১৮৬১ খ্রী.।

(ট) **একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত : পাড়া**, পুরুলিয়া, রঘুনাথ, পাথর, মূল মন্দির-শীর্ষ ঘন লতাপাতায় ছাওয়া। গর্ভগৃহের সামনে 'অন্তরাল' ও তার সামনে কিছুটা উদগত অংশে জগমোহন—দুপাশে ও সামনে বৃহৎ এক খিলান করে প্রবেশ পথ, সামান্য খোদাই কাজ, গম্বুজশীর্ষ। গম্বুজটির বহির্গাত্র খাঁজকাটা হলেও পিড়া রীতির বলা যায় না, বড়জোর পিড়া-ধর্মী। গড় পঞ্চকোটের ইতোপূর্বে উল্লেখিত দৃষ্টান্ত দুটির সাথে এর মিল বেশি। সুপরিকল্পিত ও সুগঠিত অন্তরালটি একে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। সপ্তদশ শতক। (পাড়ার প্রাচীন দুটি দেউল থেকে দেড় কি.মি. ভিতরে)।

পঞ্জি—১৮

দোলমঞ্চ (অন্য উল্লেখ না থাকলে উপাদান : ইট)

(ক) **রেখ, খাঁজকাটা** :

১। **সাত্রাকোণ,** তালডাংরা, বাঁকুড়া। রামকৃষ্ণের দোলমঞ্চ। ১৭ শতকের শেষে। [বিষ্ণুপুর-তালডাংরা বাসে—সাত্রাকোণ স্টপ থেকে তিন কি.মি. হাঁটা। অনবদ্য প্রাকৃতিক পরিবেশে। রামকৃষ্ণের আটচালার বাইরের প্রাঙ্গণে।]

বৈঁচিগ্রাম, পাণ্ডুয়া, হুগলী; ১৭০১। টেরাকোটা-সজ্জিত।

সাতহগাছিয়া, মেমারী, বর্ধমান; ১৭৩২। [মেমারী-কালনা বাসে]। টেরাকোটা-সজ্জিত।

জাড়গ্রাম, জামালপুর, বর্ধমান; ১৭৩৬। [তারকেশ্বর থেকে বাসে/ট্রেকারে দশঘরা, এখান থেকে আবার ট্রেকারে জাড়গ্রাম] শিবসাধন চট্টোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত মাখনলাল পাঠাগারের পুরাতন গৃহের পাশে গোপীনাথের দোলমঞ্চ, দীপাধার/পানীয়াধার পরিবার।

কাঁকড়াকুলি (মাঝেরপাড়া); ধনিয়াখালি, হুগলী। ১৭৫৫। [লক্ষ্মীজনার্দনের আটচালা ও রাসমঞ্চের পরে]

কুচুট, মেমারী, বর্ধমান; ১৮ শতক, টেরাকোটা।

বিজুর, মেমারী, বর্ধমান; ১৮ শতক। টেরাকোটা।

গুড়াপ, ধনিয়াখালি, হুগলী; ১৮ শতক। [নন্দদুলালের দোলমঞ্চ]। টেরাকোটা।

দেবীপুর, মেমারী, বর্ধমান; ১৮ শতকের শেষে। [একই বেদী বা মঞ্চে দুপাশে দুটি আটচালা মন্দিরের মাঝে।]

(খ) রেখ মন্দিরের মত :

বৈদ্যপুর, কালনা, বর্ধমান; ১৯ শতক, বৃন্দাবনচন্দ্রের দোলমঞ্চ (রাসমঞ্চের, সামনে ও নবরত্নের আগে)।

কুলিনগ্রাম, জামালপুর, বর্ধমান; ১৮ শতক (?), সাধারণ রথপগবিশিষ্ট দেউলের মত, আমলক ও মস্তক-শোভিত। গোপালের দোলমঞ্চ।

(ঘ) **রেখ ধরণের, আটকোণা, শীর্ষে একটি মাত্র বৃহৎ রসুনচূড়া** :

গোস্বামী-মালিপাড়া, দাদপুর, হুগলী; ইঁ, ১৮ শতক (?) মদনগোপালের দোলমঞ্চ, নীচে আটকোণা, ৮ ফুট (আনু.) উঁচু আটটি খিলান, এর উপর ৩/৪ ফুট দেওয়াল, এর উপর সোজা খাড়া স্তম্ভাকৃতি স্থাপত্য, শীর্ষে সুবৃহৎ রসুনচূড়া—সাকুল্যে উচ্চতা ৩০/৩২ ফুট। (চুঁচুড়া ঘড়িমোড় থেকে বাসে)।

গোপীনগর, ধনিয়াখালি, হুগলী; উচ্চতা ও স্থাপত্য ঠিক আগেরটির (অর্থাৎ গোস্বামী মালিপাড়ার মত)। ১৯ শতক। কিছুটা জীর্ণ হলেও আকর্ষণীয়। [তারকেশ্বর থেকে দশঘরাগামী বাসে।]

(ঙ) **চারচালা** : **ইছাপুর,** গোবরডাঙা, উত্তর ২৪ পরগনা উঁচু মঞ্চের উপরে। নিরলংকার, সংস্কৃত। ১৮ শতক। [শিয়ালদহ বনগাঁ শাখার গোবরডাঙা থেকে ভ্যানরিক্সা—বিখ্যাত প্রসন্নময়ী কালীবাড়ি ছেড়ে, বাসরাস্তার একরকম ধারেই]।

খান্দরা, অণ্ডাল, রাধামাধবের দোলমঞ্চ। প্রস্তর নির্মিত সরকার পরিবার, বড় তরফ।

বড়শূল, বর্ধমান, বর্ধমান; ১৮ শতক, টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। কৃষ্ণ-বলরামের দোলমঞ্চ, বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। [বর্ধমান মেইন/কর্ড লাইনের শক্তিগড় থেকে বাসে/রিক্সায়।]

দশঘরা, ধনিয়াখালি, হুগলী; ইট, ১৮ শতক, গোপীনাথের দোলমঞ্চ। বিশ্বাস পরিবার।

জাজীগ্রাম, মুরারই, বীরভূম; ইট, ১৮ শতক, গ্রামের স্কুলের নিকটস্থ দোলমঞ্চ। [রামপুরহাট বা নলহাটি থেকে বাসে।]

বীরনগর (মুস্তৌফিপাড়া), নদীয়া। ১৮ শতক।

বাওয়ালি, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। রাধাকান্তের দোলমঞ্চ। ১৯ শতক।

হরিণাভি, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। অতি জীর্ণ। ১৯ শতক। [শিয়ালদহ দক্ষিণ থেকে সুভাষগ্রাম স্টেশন—অটোয় হরিণাভি স্কুল-মাঠ]।

বনপাটনা, খড়গপুর লোকাল, পশ্চিম-মেদিনীপুর; মাকড়া পাথর, ১৮৬৮, রঘুনাথের দোলমঞ্চ। [খড়গপুর-বেলদা বাসে শ্যামলপুরায় গিয়ে হেঁটে বা রিক্সায়, আনু. ৩ কি.মি.]

হরিপাল (রায়পাড়া) হুগলী। উঁচু মঞ্চবেদীর উপর। নিরলংকার।

* বর্ধমানের **কুলীনগ্রাম** থেকে **জৌগ্রামের** পাকা রাস্তার ধারে পরিত্যক্ত দুটি টেরাকোটা মণ্ডিত চারচালা দোলমঞ্চ আছে—দুটিই উঁচু মঞ্চের উপরে ও দর্শনীয়। কলকাতার **টালিগঞ্জের ছোট রাসবাড়ির** মন্দিরগুচ্ছের চারচালা দোলমঞ্চটিও অতি জীর্ণ।

(চ) **আটচালা দোলমঞ্চ :**

হরিপাল, হুগলী; ১৮ শতকের প্রথমে, বিখ্যাত রাধাগোবিন্দ মন্দিরের ঘেরা ক্ষেত্রের বাইরের মাঠে বৃহৎ চতুষ্কোণ মঞ্চবেদীর উপরে, একপাশে দুটি ও অন্যপাশে একটি শিবের আটচালা মন্দির।

কাঁচরাপাড়া (রথতলা), বীজপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, কৃষ্ণরায়ের দোলমঞ্চ (পরিত্যক্ত), ১৮/১৯ শতক। [শিয়ালদহ-রানাঘাট লাইনের কাঁচরাপাড়া থেকে কল্যানীর বাসে—মন্দির ক্ষেত্রের পূবে, মাঠের ধারে, জঙ্গলে]

কুমারচক, খানাকুল, হুগলী; ১৮ শতক, টেরাকোটা-সমৃদ্ধ। [খানাকুল থেকে রিক্সায়।]

খানাকুল-কৃষ্ণনগর, (রাধাবল্লভতলা), খানাকুল, হুগলী; ১৮ শতক, রাধাবল্লভের দোলমঞ্চ। [খানাকুল থেকে রিক্সায়।]

খানাকুল-কৃষ্ণনগর, (রাজা রামমোহন রায় মেমোরিয়াল), খানাকুল, হুগলী; ১৮ শতক, সম্পূর্ণ সংস্কৃত।

গোপীবল্লভপুর, পশ্চিম মেদনীপুর; ১৮ শতক, বিখ্যাত রাধাগোবিন্দের দোলমঞ্চ। [ঝাড়গ্রাম থেকে বাসে।]

শোঙালুক, পুরশুড়া, হুগলী; ১৮ শতক, গোপীনাথের দোলমঞ্চ। [তারকেশ্বর থেকে অমরপুরগামী ট্রেকারে বা খুশীগঞ্জগামী বাসে শোঙালুক-চৌমাথা স্টপেজে নেমে।]

পাতিহাল (রায়পাড়া), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া; শ্যামসুন্দরের দোলমঞ্চ, রায় পরিবার। [হাওড়া-মুন্সীরহাট বাসে পাতিহাল—এরপর রিক্সায়।] ১৮৬৭।

জয়পুর, আমতা, হাওড়া; ১৯ শতক, মণ্ডল পরিবারের দোলমঞ্চ, একপাশে জোড়া শিবের মন্দির, অন্যপাশে দুর্গাদালান। হাওড়া-ঝিখিরা বাসে।

গোপীনগর (ইছাপুর) (দ্বাদশ শিবমন্দিরতলা), ধনিয়াখালি, হুগলী; ১৯ শতক। ১২ শিবমন্দিরের আটচালা মন্দিরসারির মাঝে।

বৈদ্যপুর, কালনা, বর্ধমান। গ্রামের শেষে পুকুরপাড়ের জোড়া-শিবের আটচালা দুটির সামনে। ১৯ শতক।

গজা, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া। ছোট। নিরলংকার। (নবরত্নের সামান্য আগে)।

(ছ) পঞ্চরত্ন : রাউতাড়া (ঝিখিড়া, কেরাণীবাটি), হাওড়া। কেরাণীবাটির সামনের পথে সামান্য গিয়ে। ১৭ শতকের শেষে।

হরিপাল, হুগলী; ১৮ শতকের প্রথমে, রায়পাডার বিখ্যাত বাধাগোবিন্দের মন্দিরের ঘেরা ক্ষেত্রের দোলমঞ্চ।

আলা, ধনিয়াখালি, হুগলী; রাধাগোবিন্দের দোলমঞ্চ, লাহা পরিবার, ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। সংস্কারে পরিবর্তিত। [তারকেশ্বব থেকে বাসে ধনিয়াখালি গিয়ে রিক্সায়।]

গৌরহাটি, আরামবাগ, হুগলী; ১৮ শতকেব দ্বিতীয় অর্ধ, দালাল পরিবার (সংলগ্ন গঙ্গাধর শিব এই পরিবার প্রতিষ্ঠা করেন ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে, দোলমঞ্চটি তার খুব পরবর্তী মনে হয না। [আরামবাগ থেকে বাসে, সহজেই।]

আঁটপুর, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী; বিখ্যাত রাধাগোবিন্দ মন্দিরের দোলমঞ্চ, উক্ত মন্দিরে প্রবেশ পথের সামান্য আগে—আশেপাশে শিবের পাঁচটি আটচালা মন্দির। ১৮ শতকের শেষদিক (১৭৮৮-৯০)।

কালনা, শ্যামচাঁদের দোলমঞ্চ। ১৮ শতকের শেষে।

তালচিনান, (গোস্বামী-মালিপাড়া পঞ্চায়েৎ ক্ষেত্র), দাদপুর, হুগলী; ১৭৯২, টেরাকোটা-সজ্জিত, পাঠক পরিবার। [গোস্বামী-মালিপাড়ার অদূরে।]

সোমড়া, বলাগড়, হুগলী; ১৮ শতকের শেষে, আটকোণা এবং রেখ ধরণের চূড়া, সম্ভবত রামশঙ্কর রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

নাড়াজোল, (রাজবাড়ির কাছে), দাসপুর, পশ্চিম-মেদিনীপুর; ১৯ শতক, দুদিকে টেরাকোটা।

আমরাগড়ি, আমতা, হাওড়া; ১৮/১৯ শতক, রায় পরিবারের দধি মাধবের দোলমঞ্চ, [হাওড়া-ঝিখিরা বাসে]।

ইছাপুর (ঘড়াপাড়া), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া; ১৮/১৯ শতক, ঘড়া পরিবারের দোলমঞ্চ, কিছু নিরেট পোড়ামাটির মূর্তি অবশিষ্ট। [হাওড়া-মুন্সীরহাট বাসে পাতিহাল, সেখান থেকে রিক্সায়।]

জয়নগর (উত্তরপাড়া), দক্ষিণ ২৪ পরগনা; ১৯ শতক, বাসুদেবের **পঞ্চরত্ন** দোলমঞ্চ, একপাশে দালান মন্দির ও অন্যপাশে দুর্গাদালান, সরকার পরিবার। [লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনের জয়নগর-মজিলপুর থেকে রিক্সায়।]

ঝিখিরা (পশ্চিম ঝিখিরা, খালপাড়), আমতা, হাওড়া; ১৯ শতকের শেষে, রায় বংশের নবরত্নের ঠিক সামনে। ব্যতিক্রমী। তিনি দিক ঘেরা পঞ্চরত্ন—[হাওড়া থেকে বাসে ঝিখিরায় গিয়ে ভ্যান রিক্সায়।]

চিলকিগড়, জামবনী, পশ্চিম-মেদিনীপুর; ২০ শতকের প্রথম দিক, চিলকিগড় রাজবাড়ির সামনের প্রাঙ্গণে।

(জ) নবরত্ন ঃ কিসমৎ নাড়াজোল, দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। মদনমোহনের দোলমঞ্চ। বৃহৎ। বড় মাপের টেরাকোটা সম্পন্ন। ১৮ শতকের শেষে। অদূরে বৃহৎ রাসমঞ্চ। [মেদিনীপুর/ঘাটাল/দাসপুব থেকে বাসে নাড়াজোল—হেঁটে, বাঁধের ধারে]।

কোতুলপুর (ভদ্রপাড়া) বাঁকুড়া; গিরিগোবর্ধন মন্দিরের বিপরীতে, বৃহৎ ও আটকোণা, চূড়া নয়টি খাঁজকাটা রেখ দেউলের মত। ভদ্র পরিবার। ১৯ শতক।

আমদাবাদ, কালনা, বর্ধমান; আয়তাকার, ত্রিখিলান, সমতল কার্নিশের ছাদে সেকেলে ফুলদানির ছাঁদের নয়টি চূড়া (মাঝেরটি বৃহত্তম); দে পরিবারের দোলমঞ্চ। **১৯ শতক।** [হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনের বৈঁচি থেকে বাসে বৈদ্যপুর, এখান থেকে রিক্সায়।]

চিংড়াজোল (ঝিখিরা-সংলগ্ন), আমতা, হাওড়া; রথপগ-সম্পন্ন রেখ দেউলের আকারের লম্বাটে শিখর, বিষ্ণু (শালগ্রাম)-র নবরত্নের সংলগ্ন দোলমঞ্চ। মণ্ডল পরিবার। **১৯ শতকের শেষে।** [হাওড়া থেকে বাসে ঝিখিরা—এখান থেকে ভ্যান রিক্সায়।]

শ্রীপুর (গড় এলাকা), বলাগড়, হুগলী; মিত্র মুস্তৌফি পরিবারের রাধাগোবিন্দের দোলমঞ্চ, সেকেলে ফুলদানির মত চূড়া বিশিষ্ট, বৃহৎ, সামনে রাধাগোবিন্দের দালান এবং পাশে শ্রীপুরের বিখ্যাত চণ্ডীমণ্ডপ। **১৯ শতকের শেষে।** [হাওড়া-ব্যান্ডেল-কাটোয়া লাইনের বলাগড় থেকে রিক্সায়।]

(ঝ) **দালান-রীতির দোলমঞ্চ** :

সিঙ্গারকোন, কালনা, বর্ধমান; রাধাকান্তের দোলমঞ্চ, চারদিকে ত্রিখিলান, চাঁদনির মত সমতল ছাদ। গোস্বামী পরিবার। **১৮ শতক?** [বর্ধমান মেইন লাইনের বৈঁচি থেকে কালনার বাসে।]

(ঞ) **দ্বিতল দালান-দোলমঞ্চ** :

(ট) ব্যতিক্রমী : চারচালা ধরনের মঞ্চবেদীর উপর একরত্ন মন্দিরের মত দোলমঞ্চ :

ঝিখিরা (পশ্চিম ঝিখিরা, খাল পেরিয়ে), আমতা, হাওড়া; প্রথমে বক্রচাল চারচালার মত ৮/১০ ফুট উচ্চতার মঞ্চবেদী, এর চারপাশে মন্দিরের আদলে নকল ত্রিখিলান ও প্রতিটি নকল খিলানের দুপাশে শীর্ণ আলংকারিক স্তম্ভ—এভাবে নিরেট মঞ্চবেদীটি চারচালার আদল পেয়েছে; এর উপর চারকোণে চারটি অলংকৃত স্তম্ভের উপর চারচালা দোলমঞ্চ এবং তার উপর আবার আমলক ও কলস সহ বীরভূম-বর্ধমান রীতির দেউলের আকারে রথপগ-সহ অনুপাতে বৃহৎ

একটি চূড়া ফলত দোলমঞ্চটি একরত্ন মন্দিরের মত দেখায়। দোলমঞ্চটির চারদিকের চার-খিলান শীর্ষের দুদিকে টেরাকোটা। পদ্ম তৎসহ কিছু পঙ্খের কাজ। **১৯ শতকের শেষ দিক।**

(ঠ) **দালানের উপর চারচালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা বা জয়নগর-মজিলপুর রীতির দোলমঞ্চ :**

জয়নগর (দ্বাদশ শিবক্ষেত্রের দক্ষিণপাশে), দক্ষিণ ২৪ পরগনা; নীচে ইউরোপীয় ধারার দ্বিতল দালান, পঙ্খের ভেনিসীয় দরজা, ফ্যানলাইট প্রভৃতি অলংকরণ। সমতল ছাদের উপর বেশ বড় মাপের চারচালা দোলমঞ্চ, মধুসূদন মিত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, উচ্চতা আনু. ২০/২২ ফুট, **১৮ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ।** [কাকদ্বীপ বা লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনের জয়নগর-মজিলপুর থেকে রিক্সায়।]

ঘাটেশ্বর, মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা; নীচে চারদিকে ত্রিখিলান, বর্গাকার, প্রতি কোণে তিনটি—মাঝে একটি ও দু কোণে দুটি—করে এবং মাঝের খিলানের দুপাশে দুটি করে গোলাকৃতি স্তম্ভ, সমতল ছাদের উপরে বেশ বড় মাপের চারচালা দোলমঞ্চ, সম্পূর্ণ স্থাপত্য অতিশয় জীর্ণ; পাশে আধুনিক শীতলা-মন্দির, বসু পরিবার, **১৯ শতক।** [লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনের মাধবপুর অথবা পরবর্তী লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে রিক্সায়।]

বহড়ু, জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা; একতলা দালানের উপর চারচালা, অতি সুদৃশ্য, শ্যামসুন্দরের দোলমঞ্চ, বসু পরিবার, **১৯ শতক।** [লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনের বহড়ু]

মজিলপুর, জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা; ত্রিখিলান ও বর্গাকার একতলা দালানের উপর বেশ বড় মাপের চারচালা, সুদৃশ্য, পাশে শিবের জোড়া আটচালা, নীচু রেলিং-ঘেরা মাঠের মত অঙ্গনে, উত্তর পাশে গোপালের দালান, গোপালেরই দোলমঞ্চ। **১৯ শতক।**

জয়নগর (দ্বাদশ শিবক্ষেত্রের উত্তরপ্রান্তে), দক্ষিণ ২৪ পরগনা; নীচে ত্রিখিলান বর্গাকার দালান, প্রত্যেক খিলানের দুপাশে গোলাকৃতি জোড়া আলংকারিক স্তম্ভ, এর উপরে বা ছাদে অনুপাতে বড় ও উঁচু চারচালা দোলমঞ্চ, এর পশ্চিমে দ্বাদশ শিবমন্দির ও পূবে মিত্রগঙ্গার (দীঘি) ধারে একই বেদীতে আরও তিনটি আটচালা শিবমন্দির, মিত্র পরিবার, **১৯ শতক।**

জয়নগর (দুর্গাপুর পল্লী), দক্ষিণ ২৪ পরগনা; বর্গাকার ত্রিখিলান দালান—ছাদে অনুপাতে উঁচু ও বৃহত্তর দোলমঞ্চ, শ্রীরাধার শ্যামসুন্দরের দোলমঞ্চ, সামনে দোল-মাঠ ও পাশে শ্রীরাধার শ্যামসুন্দরের বৃহৎ আটচালা মন্দিরের ঘেরা ক্ষেত্র। ১৯ শতক।

জয়নগর (রাধাবল্লভতলা), দক্ষিণ ২৪ পরগনা; রাধাবল্লভের সুবৃহৎ দোলমঞ্চ, দালানের উপর চারচালা, এর পরই ঘেরা ক্ষেত্রে নাটমণ্ডপসহ রাধাবল্লভের আটচালা মন্দির। মন্দির ও দোলমঞ্চ উভয়ই **আদিতে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে** মধুসূদন মিত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। রাধাবল্লভই জয়নগর মজিলপুরের সর্বপ্রধান বৈষ্ণব-বিগ্রহ, একারণেই পয়লা বৈশাখের গোষ্ঠ যাত্রায় জয়নগর-মজিলপুরের প্রাচীন পরিবার সমূহের বিগ্রহগুলি শোভাযাত্রা সহকারে এই দোলমঞ্চে নিয়ে আসা হয়। এ উপলক্ষে মেলাও হয়।

(ড) **চোখা আটকোণা শিখর-সম্পন্ন মন্দিরের মত :**

খড়দহ (রাসখোলা রোড), উত্তর ২৪ পরগনা।

পঞ্জি—১৯

রাসমঞ্চ (অন্য উল্লেখ না থাকলে উপাদান : ইট)

(ক) বৃহৎ পিরামিডাকৃতি চূড়া ও গর্ভগৃহের চারদিকে খিলানের সারি সহ চারকোণা রাসমঞ্চ :

বিষ্ণুপুর, (রাসতলা), বাঁকুড়া; বীর হম্বীর কর্তৃক **আনুমানিক ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে** প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত।

ঝামা পাথরের সুবিশাল বর্গাকার ও আনু. ৫ ফুট উঁচু মঞ্চবেদীর উপর ইটের বৃহৎ নির্মাণ। পূর্ণ বর্গাকার। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে চারদিক ৮০ ফুট কয়েক ইঞ্চি করে। ভিতর থেকে দেখলে—প্রথমে গর্ভগৃহ ও তার দক্ষিণে দক্ষিণদুয়ারী উপকক্ষ। এরপর প্রতি দিকে ৫টি করে চারদিকে (৪ × ৫) ২০টি খিলান, এরপর প্রতি দিকে ৮টি করে চারদিকে (৪ × ৮) ৩২টি খিলান এবং এরপর প্রতিদিকে ১০টি করে চারদিকে (৪ × ১০) ৪০টি খিলান—ভিতর থেকে বাইরে সর্বমোট (২০ + ৩২ + ৪০) ৯২টি খিলান। ভিতর থেকে দেখলে চারদিকে খিলানের পর খিলানের আলোছায়াময় দৃশ্য সসম্ভ্রম বিস্ময় উদ্রেক করে, বাইরে থেকে দেখলেও 'বড় বিস্ময় লাগে'—বিশেষত যে কোনও কোণের প্রথম দুটি খিলানের সামনে দাঁনিয়ে দৃষ্টি দিলে পর পর দশটি খিলান পেরিয়ে মেঘ ও আকাশের দৃশ্য যেন কোন সুদূরের যাদু নিয়ে আসে। খিলানগুলির সামনে আছে বর্গাকার ও খোলা প্রদক্ষিণ বারন্দা।

খিলান স্তম্ভগুলির নিম্নভাগ সাধারণভাবে বারোকোণা ও দেউল-শীর্ষের মত ক্রম বক্র (curvilinear), এরপর মধ্যস্থলটি শীর্ণতর ও গোল এবং এর উপর হতে বিস্তৃততর চারকোণা খিলান-শীর্ষ। প্রাচীন প্রথাগত খিলান শ্রেণী। চারকোণে চারটি খিলানের উপর চারচালা ছাদ, এরপর চারদিকেই দুদিকে দুটি চারচালা ছাদ ও মাঝে এক সারিতে পর পর চারটি একবাংলা বা দোচালা ছাদ। এর পরেই চারদিক থেকে চারকোণা ও ক্রমহ্রস্বায়মান পিরামিডাকৃতি ধাপকাটা এবং আনু. ৩৫ ফুট উচ্চতার শীর্ষদেশ। অলংকরণ উল্লেখ করতে হলে, পূব দিকে খিলান শীর্ষে রয়েছে কয়েকটি নৃত্য-বাদ্য বিষয়ক টেরাকোটা ও অন্য তিনদিকে খিলান-শীর্ষের দুদিকে টেরাকোটা পদ্ম।

রাসউৎসবের সময় বিষ্ণুপুর ও তার আশপাশের সমস্ত বৈষ্ণববিগ্রহ ঐ রাসমঞ্চে নিয়ে আসার রীতি ছিল—প্রথাটি বহু আগেই পরিত্যক্ত।

এমন স্থাপত্য পশ্চিমবঙ্গ কেন সমগ্র ভারতেও আর নেই বলে ১৯৯২-এ প্রকাশিত ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের পুস্তিকায় ('BISHNUPUR' S. S. Biswas) এটিকে যথার্থ ভাবেই 'বিষ্ণুপুরের গর্ব'' ("pride of Bishnupur"; p 27) বলা হয়েছে, আমাদের মনে হয় এটি সমস্ত বাঙালী জাতিরই গর্ব।

মন্দির ও পুরাকীর্তি বিশেষজ্ঞগণ বিষ্ণুপুরের এই রাসমঞ্চটিকে ব্যতিক্রমী বলেছেন, ডেভিড ম্যাকাচিয়ন বলেছেন নিয়ম ছাড়া রীতির ("Anomalous", প্রাগুক্ত 'লেট মিডীভ্যাল' ....

পৃষ্ঠা ৭৭)। কিন্তু এটিই বাংলার প্রথম রাসমঞ্চ এবং রাসমঞ্চ নির্মাণের কোনও রীতি-ঐতিহ্যই তখনও গড়ে ওঠেনি—কাজেই এটির ব্যতিক্রমী বা নিয়মছাড়া হওয়াব কোনও সুযোগ ছিল না। বরং বলা যেতে পারে যে পরবর্তী রাসমঞ্চগুলি এই বাসমঞ্চটির নির্মাণধারা অনুসরণ করেনি হয়ত নির্মাণ-জটিলতা ও বিরাট ব্যায়ের কারণে।

সমগ্র রাসমঞ্চটিই পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংস্কৃত।

[বিষ্ণুপুর রেলস্টেশন বা বিষ্ণুপব শহরের রসিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সায়।]

অন্যরকম উল্লেখ না থাকলে : রসুন চূড়া ও উপাদান : ইট

(খ) নয় চূড়া (আটকোণা/আট খিলান) :

যশোড়া (স্থানীয় উচ্চারণে যশ্‌ড়া) চাকদহ, নদীয়া; ২১/৩ ফুট উচ্চতার বড় মাপের মঞ্চবেদীর উপর আটকোণা ও আট-খিলান সুবৃহৎ রাসমঞ্চ, আট কোণের উপবকার আটটি রেখ চূড়ার মধ্যে মাত্র একটি অবশিষ্ট—মাঝে অতি বৃহৎ চূড়া আকাবে সেকেলে ফুলদানিব মত, জগন্নাথের রাসমঞ্চ, চৈতন্য-পার্যদ জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে প্রতিষ্ঠিত। **১৮ শতকের শুরুতে।** [শিযালদহ-রানাঘাট লাইনের চাকদহ স্টেশনের ১ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে রিক্সায়।]

তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুব: রেখ ধরনের চূড়া সম্পন্ন, সংস্কৃত, চৈতন্য-সহচব বাসুদেব ঘোষ প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দিরের রাসমঞ্চ। **১৮ শতকের প্রথম দিকে (?)।** [হাওড়া থেকে সরাসরি বা খড়গপুর লাইনেব পাঁশকুড়া স্টেশান-সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে যাত্রা করে তমলুক হাসাপাতাল মোড়ে নেমে রিক্সায়।]

শোঙালুক, পুরশুড়া, হুগলী; গোপীনাথেব পবিত্যক্ত সুবৃহৎ বাসমঞ্চ, অতি জীর্ণ কিন্তু দর্শনীয। আটখিলান-—আটকোণে আটটি ও মাঝে সুবৃহৎ রসুনচূড়া। **১৮ শতকের প্রথমার্ধ।** [পথ-দোলমঞ্চ ক্রমাঙ্ক দেখুন।]

আঁটপুর, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী; রাধাগোবিন্দের বাসমঞ্চ, আট-খিলান ও রেখ চূড়া। **১৮ শতকের শেষ ভাগ।** [তারকেশ্বর লাইনের হরিপাল থেকে বাসে, বিখ্যাত রাধাগোবিন্দ মন্দিব-ক্ষেত্র।]

দশঘরা, (বিশ্বাসপাড়া), ধনিয়াখালি, হুগলী; গোপীনাথের বাসমঞ্চ, আনু. ২০/২২ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন, সেকেলে ফুলদানির মত চূড়া। বিশ্বাস পরিবাব। **১৮ শতকের শেষভাগ।**

পাতিহাল, (সাহাপাড়া), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া; মণ্ডল পরিবারের রাসমঞ্চ, প্রায় ২০ ফুট উচ্চতার রাসমঞ্চ, টেরাকোটা লুপ্ত। **১৯ শতকের প্রথম দিক।** [হাওড়া-মুনশীরহাট বাসে পাতিহাল, এরপর রিক্সায়।]

ঐ; সাহা পরিবারের রাসমঞ্চ। নিবলংকার। **১৯ শতকের প্রথম দিক।** [ঐ]

ঐ; বাঘমুখো বাড়ির রাসমঞ্চ। বৃহৎ। অলংকরণ লুপ্ত। **১৯ শতকের প্রথম দিক।** [ঐ]।

সৌলান, (ব্রাহ্মণপাড়া), দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর; গোপালের রাসমঞ্চ। টেরাকোটা অলংকৃত। ভূঁইঞা পরিবার। **১৮১৭ খ্রী.।** [পাঁশকুড়া থেকে ঘাটালের বাসে গৌরা, সেতুর আগের বা প্রথম স্টপেজে নেমে ভ্যান রিক্সায়।]

দন্দীপুর, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর; বাঙ্গাল পরিবারের রঘুনাথ মন্দিরের রাসমঞ্চ, চৌরাকোটার নিরেট মূর্তি শোভিত, **১৮২৫ খ্রী.**। [পাঁশকুড়া থেকে ইড়পালাগামী বাসে]।

কিসমৎ নানাজোল, দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর; মদনমোহনের 'রেখ' চূড়া-বিশিষ্ট রাসমঞ্চ, উঁচু মঞ্চবেদীর উপর আনু. ৩০ ফুট উচ্চতার বৃহৎ রাসমঞ্চ, আটখিলানের প্রতিটিতে টেরাকোটারা দ্বারপাল। **১৮২৬ খ্রী.**।

পাথরা, মেদিনীপুর সদর, পশ্চিম মেদিনীপুর; বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের রাসমঞ্চ, কিছু পঙ্খ, **১৮৩২**। খড়্গপুর থেকে মেদিনীপুর বাসে আমতলা, ট্রেকার।

বল্লভপুর, শ্রীরামপুর, হুগলী; রাধাবল্লভের রাসমঞ্চ, নাতিবৃহৎ। সুদৃশ্য। **১৮৪০**। [হাওড়া থেকে শ্রীরামপুর। চুঁচুড়া প্রভৃতি বাসে—মাহেশের সামান্য পরে বল্লভপুর স্টপেজে নেমে পূবের রাস্তায় রিক্সায়/হেঁটে রাধাবল্লভ মন্দির অতিক্রম করে গঙ্গাঘাটের সামান্য আগে।]

ভৈরবপুর, (উকিলপাড়া), চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর; দামোদরের রাসমঞ্চ, আটকোণে আটটি টেরাকোটা বাদিকামূর্তি। **১৮৪৫ খ্রী.**। [চন্দ্রকোণা টাউন স্টপেজ থেকে বাসে।]

বৈদ্যপুর, কালনা, বর্ধমান; বৃন্দাবনচন্দ্রের রাসমঞ্চ, সুবৃহৎ লোহার রেলিং-ঘেরা ক্ষেত্রে, সুদৃশ্য ও সংস্কৃত, আট খিলান-শীর্ষে ও আটকোণা ছাদের নীচে পঙ্খের কাজ, সেকেলে ফুলদানির ঢঙে আটকোণে আটটি ও মাঝে অতি বৃহৎ একটি চূড়া, উচ্চতা আনু. ৩০ ফুট। নন্দী পরিবার। **১৮৪৬ খ্রী.**। [হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনের বৈঁচি স্টেশান-সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে কালনাগামী বাসে।]

দেহাটি, পাঁশকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর; গোপীমোহনের রাসমঞ্চ, **১৮৪৮ খ্রী.** মাইতি পরিবার। ১৮৪৮ খ্রী.। [পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে মেছগ্রাম, এখান থেকে ভ্যান-রিক্সায় কলিশ্বর ও কাঁটাবনি হয়ে ৬ কি.মি.]

বালিতোড়া, দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর; শ্রীধরের রাসমঞ্চ, টেরাকোটা অলংকৃত। চৌধুরী পরিবার। **১৮৫২ খ্রী.**।

বাঘমুণ্ডি, (রাজবাড়ি-চত্বর), পুরুলিয়া; রাধাগোবিন্দের মঞ্চ; রেখ চূড়াবিশিষ্ট, আট দিকই টেরাকোটা-অলংকৃত। **১৯ শতক**। [পুরুলিয়া শহরের প্রধান বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে রাজবাড়ির আগে।]

সৌলান, (পূবপাড়া), দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর; শ্যামসুন্দরের রাসমঞ্চ, 'রেখ' চূড়া-বিশিষ্ট, টেরাকোটা-সজ্জিত। **১৯ শতক**।

আলঙ্গিরী, এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর; রঘুনাথের রাসমঞ্চ, টেরাকোটা-সজ্জিত, দাস পরিবার। **১৯ শতক**। [এগরা থেকে বাসে/ট্রেকারে আলঙ্গিরী গিয়ে ভ্যানরিক্সায় বা হেঁটে।]

সত্যপুর, (মাড়োতলা, ব্যানার্জীপাড়া), ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর; বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের রাসমঞ্চ, টেরাকোটা সম্পন্ন। **১৯ শতক**। [পাঁশকুড়া থেকে ট্যাবাগ্যেড়া-গামী বাসে।]

গয়েশপুর, ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর; গোঁসাই পরিবারের রাসমঞ্চ, অলংকরণ লুপ্ত। **১৯ শতক**। [পাঁশকুড়া থেকে বাসে লোয়াদা, এরপর ভ্যানরিক্সায়]।

এরেটি, দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর; বৃন্দাবনবিহারীর রাসমঞ্চ, প্রতি খিলান স্তম্ভে টেরাকোটার বড় মাপের বাদিকামূর্তি, মান্না পরিবার, **১৯ শতক**। [পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে বেলিয়াঘাটা, এরপর রিক্সায় আনু. ৫ কি.মি.]।

হরেকৃষ্ণপুর, পাঁশকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর; শ্রীধরের রাসমঞ্চ, টেরাকোটা-বাদিকামূর্তি সম্পন্ন, জানা পরিবার, **১৯ শতক**। [পাঁশকুড়া থেকে ট্রেকারে শ্যামসুন্দর পাটনা বা অন্য ট্রেকারে গোবিন্দনগর—এখান থেকে কাঁসাই পেরিয়ে শ্যামসুন্দর পাটনা, এরপর ভ্যান রিক্সায় বা হেঁটে—মাংলই গ্রামের লাগোয়া।]

কোণ্ডারপুর, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর; লক্ষ্মীজনার্দনের রাসমঞ্চ, টেরাকোটাবাদিকা মূর্তি সম্পন্ন, ঘোষ পরিবার, **১৯ শতক**। [ঘাটাল থেকে কুঠীঘাটগামী বাসে রাধানগর, এরপর ভ্যান রিক্সায়]।

গোপীবল্লভপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর রাধাগোবিন্দের রাসমঞ্চ, নিরলংকার। **১৯ শতক।**

বালিদেওয়ানগঞ্জ, (পালপাড়া), গোঘাট, হুগলী; আটকোণা মঞ্চবেদীর উপর রাসমঞ্চ, সংস্কৃত, আটকোণে আটটি ও মাঝে একটি বৃহত্তর আকৃতির সেকেলে ফুলদানি ধরনের চূড়া। আটখিলান-শীর্ষেই টেরাকোটার ফুল এবং আটটি খিলান স্তম্ভেই সুবৃহৎ মাপের বাদিকা প্রভৃতি টেরাকোটা মূর্তি—সংস্কারকালে প্রতিটি মূর্তিতে নানা উজ্জ্বল রঙ করা হয়েছে। **১৯ শতক।** [আরামবাগ থেকে বাসে বালিদেওয়ানগঞ্জ—এখান থেকে সব দেখানোর চুক্তির ট্যাক্সিতে।]

অমরাগড়ি, আমতা, হাওড়া, দধিমাধবের রাসমঞ্চ, আটকোণা মঞ্চবেদীর উপর, সেকেলে ফুলদানির মত চূড়া বিশিষ্ট, আটটি খিলানের প্রতিটির দুপাশে শীর্ণকায় দুটি করে আলংকারিক স্তম্ভ, প্রতি খিলান-শীর্ষে লুপ্তপ্রায় কিছু পঙ্খের কাজ। রায় পরিবার। **১৯ শতক।**

চিংড়াজোল (ঝিখিরা-সংলগ্ন), আমতা, হাওড়া; মণ্ডল পরিবারের নবরত্ন মন্দিরের সামনের রাসমঞ্চ, ১২/১৩ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন ও সেকেলে ফুলদানির মত চূড়া-বিশিষ্ট। **১৯ শতক।** [হাওড়া থেকে সরাসরি বাসে ঝিখিড়া, এরপর ভ্যান-রিক্সায়।]

ঐ; মণ্ডল পরিবারের আটচালা মন্দিরের রাসমঞ্চ, আগেরটির তুলনায় বৃহৎ, আনু. ১৫/১৬ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন, আটকোণে আটটি বেশ স্থূল গোলাকৃতি স্তম্ভের উপর স্থাপত্য, প্রতি দুটি স্তম্ভের মাঝে খিলান ও তার উপর দেওয়াল, ছাদে আটকোণে আটটি বেশ লম্বাটে 'রেখ' ধরণের চূড়া ও মাঝে আরও দীর্ঘ ও বৃহৎ কিন্তু একই ধরনের আরও একটি চূড়া। **১৯ শতক।**

জয়পুর, (জয়চণ্ডীতলা), আমতা, হাওড়া; শ্রীধরের রাসমঞ্চ, সেকেলে ফুলদানির মত চূড়া-বিশিষ্ট। দাস পরিবার। **১৯ শতক।** [হাওড়া-ঝিখিরা বাসে যাত্রা করে জয়পুর মোড়ে নেমে রিক্সায়।]

ঝিখিরা, আমতা, হাওড়া; গড়চণ্ডী ও মল্লিকদের আটচালার পরে একটি টেরাকোটা-সম্পন্ন

আটচালা শিবমন্দিরে পাশের রাসমঞ্চ, লম্বাটে রেখ ধরনের চূড়া-বিশিষ্ট। **১৯ শতক**। (হাওড়া থেকে বাসে ঝিখিরায় রিক্সায় (ভ্যান-রিক্সা)]।

আমনপুর, কেশপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর; রাধাবল্লভের রাসমঞ্চ, বসু পরিবার; **১৯ শতক**। [মেদিনীপুর শহর থেকে চন্দ্রকোণাগামী বাসে কুঁয়াপুর—এখান থেকে ভ্যান-রিক্সায়।]

কোতুলপুর (ভদ্রপাড়া), বাঁকুড়া, ভদ্রপরিবারের দুর্গাদালান-ক্ষেত্রের রাসমঞ্চ, **১৯ শতক**। [আরামবাগ, জয়রামবাটি বা বিষ্ণুপুর থেকে লোকাল বাসে যাত্রা করে কোতুলপুর ভদ্রপাড়া স্টপেজে নেমে অল্প হেঁটে।]

কাটান, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর; শ্রীধরের রাসমঞ্চ, প্রামাণিক পরিবার, **১৯ শতক**। [ঘাটালের নতুন বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সায় সরাসরি যাওয়াই সুবিধাজনক।

কুশপাতা, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর; লক্ষ্মীজনার্দনের রাসমঞ্চ, সুবৃহৎ কিন্তু অতি জীর্ণ। পালিত পরিবার। **১৯ শতক**। [ঐ—কাটানগামী রিক্সাতেই।]

জয়নগর (উত্তরপাড়া), দক্ষিণ ২৪ পরগনা; বাসুদেবের রাসমঞ্চ, আটটি পত্রাকৃতি খিলানের উপর আটকোণে আটটি শীর্ণ ও ছোট শিখরের উপর কলস ও তার উপর চূড়া—**১৯ শতক**। [লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনের জয়নগর-মজিলপুর স্টেশান থেকে রিক্সায়।]

ওড়ফুলি, বাগনান, হাওড়া; মাইতি পরিবারের রাসমঞ্চ, বড় মাপের কিছু টেরাকোটা অবশিষ্ট। **১৯ শতক**। [হাওড়া-খড়গপুর লাইনের দেউলটি স্টেশান থেকে রিক্সায় বা হেঁটে।]

কল্যানপুর, বাগনান, হাওড়া, পাল পরিবারের দালানরীতির কালীমন্দিরের সংলগ্ন রাসমঞ্চ,কিছু বড় মাপের টেরাকোটা অবশিষ্ট। **১৯ শতক**। [হাওড়া-খড়গপুর লাইনের বাগনান থেকে বাসে।]

কুমারপুর, জগৎবল্লভপুর, হাওড়া; দ্বাবী পরিবারের রাসমঞ্চ, বেশ বড় আকার-সমন্বিত। **১৯ শতক**; [হাওড়া-মুন্সীরহাট বাসে জগৎবল্লভপুর—এখান থেকে রিক্সায়।]

পানিহাটি (ত্রাননাথ ব্যানার্জী রোড), খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা; রাধাবল্লভের মন্দিরের রাসমঞ্চ, উচ্চ মঞ্চবেদীর উপর বেশ বড় মাপের আটটি খিলান, আটকোণে আটটি রেখ-আকৃতির খাঁজকাটা চূড়া, পিছনে শিবের চারটি আটচালা মন্দিরের সারি, **১৯ শতক**। [কলকাতা থেকে বারাকপুর-মুখী বাসে সোদপুর 'মীনা' স্টপেজে নেমে রিক্সায় 'মহাপ্রভুতলা'—মহাপ্রভুতলা হতে গঙ্গাতীর বরাবর রাস্তা ধরে দক্ষিণে।

দশঘরা, ধনিয়াখালি, হুগলী; রায় পরিবারের রাসমঞ্চ, পঙ্খের কাজে (১৯ শতকীয় রীতিতে ফুল, পরী ইত্যাদি) সমৃদ্ধ। **১৯ শতক**। [তারকেশ্বর থেকে বাসে/ট্রেকারে দশঘরা, এখানকার বিখ্যাত 'ব্রাডলিবার্ট গেট' হয়ে প্রবেশ করে রায় পরিবারে দুর্গা-দালানের সামান্য আগে।]

বাওয়ালি, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। গোপীনাথের রাসমঞ্চ। বৃহৎ। ১৯ শতক। [বজবজ-ডায়মণ্ড হারবার বাস। বাওয়ালি তেঁতুলতলা স্টপ।]

জয়কৃষ্ণপুর, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, ব্যানার্জী পরিবারের রাসমঞ্চ, প্রথাগত এবং **নয়টি** রেখ ধরনের চূড়া-বিশিষ্ট। **১৯ শতক।** [বিষ্ণুপুর থেকে বাসে। গ্রামের মধ্যে। মুখার্জীদের পরিত্যক্ত দ্বিতল বাড়ির আগে।]

কাঞ্চননগর, (তাঁতিপাড়া/মণ্ডপাড়া), বর্ধমান; অতি জীর্ণ ও লুপ্তপ্রায় রাসমঞ্চ আনু. ২৩/২৪ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট. প্রথাগত আটকোণা ও আটখিলান কিন্তু চালামন্দিরের আনুকরণে আটকোণের ছাদই বক্রচাল। **১৯ শতক।** [বর্ধমান-সিটি বাসে রথতলা, এরপব কঙ্কালেশ্বীর মন্দিরের কিছু আগে তাঁতিপাড়া বা মণ্ডলপাড়া মোড় থেকে বিপরীত দিকে।

অবন্তিকা, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া; বৃহৎ জাফরির কাজে সজ্জিত। ১৯ শতক। বিষ্ণুপুর থেকে বাসে অতি সহজে।

দুদিকে দুটি আটচালা মাঝে রাসমঞ্চ :

মণ্ডলাই, পাণ্ডুয়া, হুগলী; গোপালের রাসমঞ্চ. প্রথাগত আটকোণা, নয়-চূড়া, আটকোণের আটটি ও মাঝের বৃহত্তর চূড়ার সবকটিই রসুনাকৃতির, জীর্ণ দশা। একই বেদী ও একই সারিতে আনু. ২০ ফুটের কাছাকাছি উচ্চতার রাসমঞ্চটির দুপাশে দুটি আটচালা শিবমন্দির। **১৮ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ।** [হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনের পাণ্ডুয়া স্টেশান থেকে রিক্সায়।]

সতেরো চূড়া রাসমঞ্চ :

হৃদলনারায়ণপুর, পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া; মণ্ডল পরিবারের বড় তরফরে রাসমঞ্চ, আটকোণা মঞ্চবেদীর উপর আটকোণে আটটি খিলানে প্রথম তল, এর উপর আটটি কোণে আটটি খাঁজকাটা শিখর-সম্পন্ন রেখ দেউলেব মত আটটি চূড়া, এগুলির মাঝ থেকে তুলনায় কম প্রস্থ-সম্পন্ন দ্বিতলের উপর আটকোণে আটটি রেখ চূড়া, এগুলির মাঝ হতে উঠে গেছে তুলনায় বৃহত্তম কিন্তু একই প্রকারের রেখ দেউলের মত কেন্দ্রীয় চূড়া (৮ + ৮ + ১ = ১৭)। টেরাকোটা-সজ্জিত অনুপম রাসমঞ্চ। উচ্চতা আনু. ৪০ ফুট। **১৮৫৪।** [বর্ধমানের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যান্ড হতে কয়েকটি বাস হৃদলনারায়ণপুরে যায়— এই বাসে গেলে রাসমঞ্চটির কাছেই নামা যায়। অন্যথা বর্ধমান-সোনামুখী বাসে ধাগড়িয়া গিয়ে ভ্যান-রিক্সায়।]

মাঙলই, পাঁশকুড়া. পশ্চিম মেদিনীপুর; দামোদরের রাসমঞ্চ, আনু. ৪০ ফুট উচ্চতা-সম্পন্ন এবং রেখ দেউলের মত ১৭টি (প্রথম তলের আটকোণে আটটি + দ্বিতলের আটকোণে আটটি + কেন্দ্রীয় চূড়া) চূড়া-সম্পন্ন। দ্বিতলে ওঠার সিঁড়িও আছে। আট দিকই চমৎকার টেরাকোটা মুখ্যত কৃষ্ণলীলা) সমৃদ্ধ। তবে বেশ কটি চূড়া ইতোমধ্যে ভগ্ন ও অমন সুন্দর টেরাকোটা-সজ্জাও জীর্ণ যেমন প্রতিটি খিলান স্তম্ভে গ্রথিত বড় মাপের মূর্তিগুলি। মাইতি পরিবার। **১৮৫৯।** [পাঁশকুড়া-সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ডের লাগোয়া ট্রেকার-স্ট্যান্ড থেকে ট্রেকারে শ্যামসুন্দর পাটনা, এখান থেকে হেঁটে. সহজে। ট্রেকারে গোবিন্দনগরে গিয়ে কাঁসাই পেরুলেও শ্যামসুন্দর পাটনা।]

অযোধ্যা, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া; গিরিগোর্ধনের রাসমঞ্চ, আটকোণা মঞ্চবেদীর উপর, প্রথম তলের আটটি খিলানের উপরেই পঙ্খের চারচালা ধরনের সুদৃশ্য অলংকরণ। প্রথম তলের উপর আটকোণে আটটি বড় মাপের সেকেলে ফুলদানি ধরনের চূড়া—এদের মধ্য দিয়ে ওঠা প্রস্থে হ্রস্বতর আটকোণা দ্বিতলে আটটি নকল (অর্থাৎ ভিতর থেকে দেওয়াল তোলা) খিলান, দ্বিতলের আটটি কোণে আটটি আগের ধরনের কিন্তু তুলনায় ছোট চূড়া ও এদের মাঝ হতে উঠেছে বৃহত্তর কিন্তু আগের রীতিরই কেন্দ্রীয় চূড়া। সাকুল্যে উচ্চতা ২৪/২৫ ফুট। **১৯ শতক**। [আরামবাগ-জয়রামবাটি-কোতুলপুর হয়ে বিষ্ণুপুর বাসে জয়কৃষ্ণপুর—এখান থেকে রিক্সায়।]

সোনামুখী, (বুড়োশিবতলা), বাঁকুড়া; ঠিক আগে বলা অযোধ্যার রাসমঞ্চের অনুরূপ স্থাপত্য কিন্তু অলংকরণে পার্থক্য আছে। খিলানগুলি প্রস্থে কম, প্রথম তলের আটটি খিলানের উপরেই পঙ্খের ছত্রাকার অলংকরণ, প্রতিটি খিলানেব উপরে ও দুপাশে আয়তাকারে এক সারি করে টেরাকোটা, আটকোণেই উদ্‌গত নকল জোড়া স্তম্ভের অলংকরণ এছাড়াও কার্নিসের নিচে ও কার্নিশে টানা পঙ্খের অলংকরণ আটকোণ ঘিরে। সতেরোটি চূড়ার সবকটির উপরেই মন্দির শীর্ষের মত চক্র-সহ পতাকা দণ্ড, যথারীতি কেন্দ্রীয় চূড়ার উপরেরটি বৃহত্তম। **১৯ শতক**। [**বর্ধমান** শহর বা বিষ্ণুপুর থেকে বাসে সোনামুখী—এখান থেকে রিক্সায়/হেঁটে বুড়োশিবতলা।]

ঐ, (সিদ্ধেশ্বর শিবতলা), বাঁকুড়া; আনু. ৩০ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন ও রেখ ধরনের সতেরোটি চূড়া-সম্পন্ন—হুবহু হদলনারায়ণপুরের রাসমঞ্চটির মত স্থাপত্য। নিরলংকার। **১৯ শতক**। [ঐ। বাজারপাড়ার হাঁড়িহাটতলা থেকে সরু গলিপথে সামান্য ঢুকে ডানের গলির শেষে।]

হাটকৃষ্ণনগর, পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া; দামোদরের রাসমঞ্চ, আনু. ৩০ ফুটের মত, রেখ ধরনের ১৭টি চূড়া—প্রথম তলের উপরে আটটি, দ্বিতীয় তলের উপরে আটটি ও কেন্দ্রীয় চূড়া। জীর্ণ কিনতু অত্যন্ত সুদৃশ্য। কুণ্ডু পরিবার। **১৯ শতক**। [বর্ধমান শহরের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে সোনামুখী বা পাত্রসায়েরগামী বাসে। বাসরাস্তা ধরেই সামান্য এগিয়ে ডানের মোরাম রাস্তায়।]

বামিরা (মধ্যমপাড়া), পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া; হাটকৃষ্ণনগরের রাসমঞ্চটির মতই ১৭টি রেখচূড়া বিশিষ্ট স্থাপত্য। আরও জীর্ণ এবং এবং মনে হয় যেন আরও সুদৃশ্য। গুপ্ত পরিবার। **১৯ শতক**। [বর্ধমানের তিনকোণিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে পাত্রসায়ের ও বালসি মোড় হয়ে বিষ্ণুপুরগামী বাসে, বাসরাস্তার অদূরে।]

রাজগ্রাম, জয়পুর, বাঁকুড়া; গিরিগোবর্ধন ও দামোদরের রাসমঞ্চ, উচ্চতা আনু. ৩৫ ফুট। হদলনারায়ণপুরের মত স্থাপত্য ও 'রেখ' ধরনের ১৭টি চূড়া। নিরলংকর। রাহা-পরিবার। **১৯ শতক**। [আরামবাগ-কোতুলপুর-বিষ্ণুপুর বাসে জয়পুর—এখান থেকে গাড়ি বদল করে।]

লক্ষ্মীপুর, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর; শ্রীধরের রাসমঞ্চ, পূর্ববৎ দ্বিতল ও সতের চূড়া সম্পন্ন আদিতে হলেও বেশ কটি চূড়া এখন ভগ্ন ও লুপ্ত। সেকেলে ফুলদানির মত চূড়াগুলি।

বড় মাপের টেরাকোটা—কিছু অবশিষ্ট। **১৮৬০/৬১।** [ঘাটাল থেকে রাধানগর হয়ে কুঠীঘাটগামী বাসে লছিপুর, এবার মাঠের মধ্য দিয়ে চলা পথে গ্রামে ঢুকে ডানে।]

অনুরূপ রাসমঞ্চ আছে **বেলিয়াতোড়** (বড়জোড়া, বাঁকুড়া), **সারতা** (সবং, পশ্চিম মেদিনীপুর) এবং **গড়বেতা** (বাজার পাড়ার দ্বাদশ শিব-ক্ষেত্র) প্রভৃতি আরও কিছু জায়গায়।

১৭ চূড়া-সম্পন্ন ব্যতিক্রমী রাসমঞ্চ :

খড়দহ, (রাসখোলা), উত্তর ২৪ পরগনা; শ্যামসুন্দরের রাসমঞ্চ। প্রথমে চারফুটের মত উঁচু বৃহৎ আটকোণা মঞ্চবেদী, সামনে মাঝে সিঁড়ি—এর দুপাশ থেকে আটকোণে আটটি খাঁজকাটা রেখ মন্দির ধর্মী চূড়া। এর উপরে তুলনায় ছোট আটকোণা মঞ্চবেদী, সামনে মাঝ দিয়ে আগে বলা সিঁড়িটি গর্ভগৃহের মুখ অবধি উঠে গেছে, এরও দুপাশ থেকে আটকোণে আটটি রেখ চূড়া কিন্তু নীচের চূড়াগুলির মত চারদিকে ছোট খিলানের বদলে এগুলি চারটি করে গোল স্তম্ভ নির্ভর—সর্বোপরি রয়েছে গর্ভমন্দির—আটকোণা আটটি বৃহৎ খিলান ও তাদের শীর্ষে সুউচ্চ তীক্ষ্ণ-শীর্ষ আটকোণা মূল শিখর। (৮ + ৮ + ১ = ১৭ চূড়া)। [কলকাতা-বারাকপুর বাসপথের খড়দা থানা থেকে রিক্সা)।

পঞ্চবিংশতি চূড়ার রাসমঞ্চ :

নাড়াজোল, (রথতলা), দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর; আনু. ৩০ ফুট বা তার কিছু বেশী উচ্চতা-সম্পন্ন, বৃহৎ ও চারকোণা প্রথম তলের চারদিকে পাঁচটি করে খিলান, এর উপর চার দিকে তিনটি করে মোট বারোটি (৩ × ৪ = ১২) বেশ বড় মাপের রেখ-দেউল ধরনের চূড়া, এদের মাঝ থেকে ওঠা দ্বিতলের উপর একই কায়দায় কিন্তু তুলনায় ছোট ও শীর্ণতর বারোটি (৩ × ৪ = ১২) রেখ ধরনের চূড়া এবং এদের মাঝ হতে উঠেছে একই রীতির কিন্তু আকারে বৃহত্তম কেন্দ্রীয় চূড়া—সর্বমোট (১২ + ১২ + ১ = ২৫) পঁচিশটি চূড়া। লক্ষণীয় যে প্রথাগত আটকোণা না হয়ে এই অতিবৃহৎ রাসমঞ্চটি চতুষ্কোণ বা বর্গাকার। এছাড়া প্রতিটি চূড়াই ক্ষুদ্র আমলক ও তার উপর চক্রসহ পতাকা দণ্ড-শোভিত, বলা বাহুল্য, কেন্দ্রীয় চূড়ার আমলক, কলস ও পতাকাদণ্ডটি সর্ববৃহৎ ও সুদৃশ্য। কিছু পঙ্খের কাজের আভাস ছাড়া নিরলংকার। নাড়াজোল রাজপরিবার। সম্ভবত ১৯ শতক। (পাঁশকুড়া বা ঘাটাল থেকে দাসপুর মোড় হয়ে অথবা মেদিনীপুর শহর থেকে সরাসরি বাসে)।

চারকোণা এবং মন্দির-রীতির রাস-মঞ্চ :

(ক) পঞ্চরত্ন :

খান্দরা, অণ্ডাল, বর্ধমান : রাধামাধবের রাসমঞ্চ, ল্যাটেরাইট পাথরে নির্মিত, চারদিকে ও উচ্চতা আনু. ২০ ফুট করে চারদিকে ত্রিখিলান প্রবেশপথ মাঝের প্রতি দুটি খিলানস্তম্ভ গুচ্ছ কলাগাছের মত আলংকারিক স্তম্ভ শোভিত এবং এদের দুপাশের দেয়ালেও এমনই আলংকারিক কলাগেছে থাম। খিলান শীর্ষে সরলরেখ দেওয়াল কিন্তু চারদিকেই চালারীতির মন্দিরের আভাস আনতে ছাদের কার্নিশ আলংকারিকভাবে ঈষৎ বক্র। অবিকল পঞ্চরত্ন মন্দিরের মত চারকোণে

চারটি ও মাঝে তুলনায় বৃহৎ খঁঅজকাটা রেখ দেউল-সদৃশ চূড়া। খাঁটি পঞ্চরত্ন মন্দির-রীতি। সরকার পরিবারের বড় তরফ। **১৮ শতকের শেষে।** [পথ—দোলমঞ্চ দেখুন।]

(খ) নবরত্ন :

হাড়মাসড়া, (বৈদ্যপাড়া), তালডাংরা, বাঁকুড়া; রায় পরিবারের রাসমঞ্চ, আনু. ২০ ফুট উচ্চতাসম্পন্ন। প্রথাগত নবরত্ন মন্দিরের মত প্রথম তলের চারচালার চারকোণে চারটি, দ্বিতীয় তলের চারচালার চারকোণে আরও চারটি এবং এদের মাঝে বৃহত্তম কেন্দ্রীয় চূড়া-বিশিষ্ট। সবকটি চূড়াই রেখ দেউলের মত। ল্যাটেরাইট পাথরে নির্মিত রাসমঞ্চ কিন্তু টেরাকোটা অলংকরণ-সম্পন্ন। **১৯ শতকের শুরুতে।** [বাঁকুড়া শহরের গোবিন্দনগর বাস্যস্টান্ড থেকে তালডাংরা ও বিবর্দা হয়ে খাতবা বা মুকুটমণিপুর যাচ্ছে এমন বাসে যাত্রা করে সরাসরি হাড়মাসড়ার বিখ্যাত জৈন দেউলের (প্রাক্-মুসলিম) সামনে নেমে; গ্রামের বৈদ্যপাড়ায়।]

ডিহিবলিহারপুর, দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর; রাধাগোবিন্দের রাসমঞ্চ। উচ্চতা আনু. ২০/২২ ফুট। নিরলংকার। **১৮২৭ খ্রী.।** [পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে দাসপুর—এ অঞ্চলে দ্রষ্টব্য পুরাতন মন্দির অনেক হওয়ায় সব দেখানোর চুক্তিতে রিক্সায়।]

জামগ্রাম, পাণ্ডুয়া, হুগলী; লক্ষ্মীজনার্দনের রাসমঞ্চ, ব্যতিক্রমী ধরনের নবরত্ন রাসমঞ্চ। আনু. ৩৫ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন। কলাগেছে থামসহ ত্রিখিলান প্রথম তল। সমতল ও সরলরেখ কার্নিশ-বিশিষ্ট। প্রথম তলের চারকোণে চাবটি তুলনায় লম্বাটে ধরনের রেখ চূড়া। এরপর অনেকটা মণ্ডাকৃতি দ্বিতলের চারকোণে চাবটি একই ধবনের চূড়া, এদের মাঝে একটি ব্যতিক্রমী মঞ্চবেদী ও তার উপর বসানো একই বেখ ধরনের বৃহত্তম কেন্দ্রীয় চূড়া। পাশ্চাত্য বা ইউরোপীয় প্রভাব সুস্পষ্ট কিন্তু তথাপি দর্শনীয় তথা আকর্ষণীয়। নন্দী পরিবার। **১৯ শতক।** [হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনের পাণ্ডুয়া স্টেশান থেকে সরাসরি রিক্সায়।]

ধান্যকুড়িয়া, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা; বল্লভ পরিবারের রাসমঞ্চ, আনু. প্রায় ২০ ফুট করে প্রস্থসম্পন্ন চারকোণা প্রথম তলের চারদিকে পাঁচটি করে খিলান, চালারীতির অনুকরণে বক্রচাল ছাদের চারকোণে চারটি বেশ বড় মাপের খাঁজকাটা রেখ চূড়া; প্রথম তলের উপর তুলনায় ছোট মাপের চারদিকে ত্রিখিলান ও প্রথম তলের মতোই বক্রচাল দ্বিতল—এর চার কোণে চারটি পূর্ববৎ রেখ চূড়া ও এদের মাঝে দীর্ঘতম ও বৃহত্তম একই রীতিব কেন্দ্রীয় চূড়া। খাঁটি নবরত্ন মন্দিরের আদল। সাকুল্যে ৩৫ ফুট (আনু.)। ১৯ শতক। [কলকাতা বা বারাসাত থেকে টাকি রোড ধরে বসিরহাটগামী বাসপথের নেহালপুর স্টপেজ। হাঁটা/ভ্যানরিক্সা।]

গোপালপুর, দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর; চক্রবর্তী পরিবারের রাসমঞ্চ, প্রথম তল চারকোণা (চারদিকেই আনু. ১৫ ফুট করে প্রস্থভাগ) ও সমতল তথা সরলরেখ কার্নিশের ছাদ-বিশিষ্ট, প্রথম তলের চারকোণে চারটি রেখ ধরনের চূড়া—কিন্তু এদের শীর্ষদেশ প্রথাগত খাঁজকাটা ধরনের নয, তার বদলে প্রতিটি চূড়ার অগ্রভাগে কিছুটা গম্বুজাকৃতির আলংকারিক বক্রচাল চারচালার ছাদ-এর উপর ক্ষুদ্র আমলক ও দণ্ড। তুলনায় ছোট ও চারদিকে ত্রিখিলান দ্বিতলের ছাদ কিন্তু চারদিকেই চালারীতিব মত বক্র—এরও চারকোণে চারটি তুলনায় ছোট কিন্তু পূর্ববৎ

চূড়া—এদের মাঝে একই পদ্ধতির বৃহত্তম কেন্দ্রীয় চূড়া অনুপাতে ছোট আমলক ও কলস শোভিত। পূর্ণ সংস্কৃত এবং সংস্কারে টেরাকোটা লুপ্ত। সামনে পুকুরপাড়ে জোড়া শিবের জোড়া আটচালা। **১৯ শতক।** [পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসপথের বেলিয়াঘাটায় নেমে রিক্সায়—অটোরিক্সাও আছে।]

জয়কৃষ্ণপুর, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া; বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের রাসমঞ্চ। ধান্যকুড়িয়ার মত কিন্তু তুলনায় অনেক ছোট। **১৯ শতক।** [বিষ্ণুপুর থেকে বাসে]

দ্বিতল ব্যতিরেকেই নবরত্ন রাসমঞ্চ :

কোতুলপুর (ভদ্রপাড়া), বাঁকুড়া; গিরিগোবর্ধনের রাসমঞ্চ, বর্গাকার (১০ ফুট x ৪ ফুট) ও প্রায় তিন ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট মঞ্চবেদীর উপর চারকোণা (চারদিকেই প্রস্থভাগ আনু. ৮ ফুট করে), চারদিকেই একটি করে খিলান, এর উপর সমতল ও সরলরেখ কার্নিশের ছাদ, ছাদের চারকোণে চারটি এবং চারদিকেই মাঝে আরও একটি করে চারটি 'রেখ' দেউল (খাঁজকাটা) ধরনের 'রত্ন'। এইভাবে একতলার ছাদের চারপাশে মোট আটটি (৪ + ৪) রত্নের মাঝে রয়েছে স্থূলতম ও বৃহত্তম রেখ দেউল সদৃশ কেন্দ্রীয় চূড়া; এইভাবে 'নব' (৮ + ১) 'রত্ন'। সামান্য পঙ্খের কাজ। উচ্চতা ২০/২২ ফুট। ভদ্র পরিবার। **১৯ শতক।** [দোলমঞ্চ দেখুন, তার বিপরীতে গিরিগোবর্ধন রীতির মন্দিরের পাশে।]

ছয় কোণা রাসমঞ্চ : **কাঁকড়াকুলি** (মাঝেরপাড়া), ধনিয়াখালি, হুগলী; লক্ষ্মী-জনার্দনের রাসমঞ্চ। ছয়কোণা ও ছয় খিলান। ছয়কোণে ছয়টি ও কেন্দ্রে বৃহত্তম একটি—সাত চূড়া (খাঁজকাটা রেখ)। —বর্তমানে তিন পাশে দেওয়াল তুলে মন্দিরে পরিণত করা হয়েছে। ১৮ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ। [তারকেশ্বর থেকে বাসে ধনিয়াখালি সিনেমাতলা—রিক্সা/ভ্যানরিক্সা]। **চিনপাই** (ধবমতলা), দুবরাজপুর, বীরভূম। প্রায় পাঁচফুট উঁচু অধিষ্ঠানের উপরে, ছয়কোণা, ছয় খিলান রাসমঞ্চ। ১৯ শতক। সিউড়ি-দুবরাজপুর বাসে।

ইছাপুর (ভুঁয়েপাড়া), জগৎবল্লভপুর, হাওড়া; ঘড়া পরিবারের রাসমঞ্চ (পরিত্যক্ত), ছয়কোণে ছটি টেরাকোটা নারীমূর্তি, শীর্ষে টেরাকোটা শিব, উভয়ই বেশ বড় মাপের। খিলানের উপরে ব্যতিক্রমী ধরনের চূড়া। অতি জীর্ণ। ১৯ শতক। [হাওড়া-মুন্সীরহাট বাসে পাতিহাল হাটতলা। ভ্যানরিক্সা।]

গম্বুজশীর্ষ রাসমঞ্চ : **চন্দ্রকোণা** (রঘুনাথবাড়ি/অযোধ্যা, বাইরের রাস্তার পাশে); রঘুনাথের রাসমঞ্চ। আটকোণা কিন্তু আটটি খিলানের বদলে ছোট ছোট নিরেট দেওয়াল ও তার উপরে মসজিদের মতন গম্বুজ। ১৮ শতক। [পাঁশকুড়া, ঘাটাল বা মেদিনীপুর শহর থেকে বাসে চন্দ্রকোনা টাউন]।

তেরোকোণা/গম্বুজশীর্ষ রাসমঞ্চ : মুড়াগাছা, নাকাশীপাড়া, নদীয়া; কৃষ্ণ-রাধারানীর রাসমঞ্চ, প্রতিষ্ঠাতা কাশীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তেরোখিলান—দশটি খোলা ও পিছনের তিনটি নিরেট দেওয়ালে বদ্ধ। খিলানগুলির উপরে বৃহৎ গম্বুজ। ১৯ শতক। [শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের মুড়াগাছা থেকে রিক্সা। কৃষ্ণনগর থেকে বাসে যাত্রা করলে মুড়াগাছা বাজার স্টপ।]

গম্বুজশীর্ষ, আটকোনা :

গুড়াপ, ধনিয়াখালি, হুগলী; নন্দদুলালের রাসমঞ্চ, প্রায় তিন ফুট উঁচু ও আটকোণা মঞ্চবেদীর উপর আটখিলান ও আটকোণা স্থাপত্য (প্রস্থ আনু. ১০/১২ ফুট)—তবে খিলান স্তম্ভের পরিবর্তে কোণাকুনি দেওয়াল ব্যবহৃত। এর উপর সমরেখ আটকোণা কার্নিশের ধার থেকেই সমগ্র ছাদ জুড়ে একটি মাত্র সুবৃহৎ আটকোণা গম্বুজ। **১৯ শতক।** [দোলমঞ্চ দেখুন। ঐ একই পথে—এই রাসমঞ্চটিই প্রথমে পড়বে, রাস্তার ধারেই।]

প্রবেশ দালান ও প্রদিক্ষণ-সহ ব্যতিক্রমী 'রত্ন'-রীতির রাসমঞ্চ : বেগুনকোদর, ঝালদা, পুরুলিয়া; স্থানীয় সাক্ষ্য অনুসারে জমিদার শম্ভুনাথ সিংহ তাঁর দুই স্ত্রী, রাধিকাকুমারী এবং লোচনকুমারীর ইচ্ছায় নির্মাণ শুরু করান কিন্তু কাজটি অসমাপ্ত থেকে যায়। আনু. ৪০ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট ব্যতিক্রমী নবরত্ন, নীচে চারদিকে ত্রিখিলান প্রদক্ষিণ দালান থাকায় মনে হয় দালানের উপরে বসানো। প্রদক্ষিণ দালানের সামনে ঘোরানো বারান্দা—স্তম্ভচিহ্ন দেখে মনে হয় এর উপরেও ছাদ ছিল। রাসমঞ্চটির প্রথম তল চারকোণা, বক্রচাল ও প্রতি কোণে একটি করে রেখধর্মী শিখর, খাঁজকাটা ও আমলক-বিশিষ্ট। এর উপরে ছ'কোণা নিরেট স্তম্ভের মত দ্বিতল—এর উপরে চারদিকে একটি করে খিলান—এর শীর্ষে চারকোণে চারটি ও মাঝে বৃহত্তম একটি আমলক শোভিত রেখধর্মী শিখর—সুতরাং ৪ + ৪ + ১ = ৯টি চূড়া কিন্তু প্রথাগত নবরত্ন নয়। বৃহৎ ঘেরা বর্গাকার ক্ষেত্র—পিছনে উঁচু প্রাকার এবং দুপাশে ও সামনে দুই স্তর পাঁচখিলান দালান। ১৯ শতকের শেষে। [পুরুলিয়া থেকে বেগুনকোদরের বাসে—রাসমঞ্চ-ঘেষেই শেষ স্টপেজ]।

চূড়াযুক্ত দালান রাসমঞ্চ : পলাশী, ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর; লক্ষ্মী জনার্দনের রাসমঞ্চ। আনু. ১৪ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১০ ফুট প্রস্থ-সম্পন্ন দালান, চারদিকই ত্রিখিলান, তার উপর সমতল ছাদ—চারকোণে চারটি ও মাঝে বৃহত্তম একটি উল্টানো পানপাত্রের মত চূড়া। পঙ্খ-অলংকৃত। নন্দী পরিবার। ১৯ শতক। [হাওড়া-খড়গপুর লাইনের রাধামোহনপুর থেকে ভ্যানরিক্সা।]

রাসমঞ্চরূপে ছোট দ্বিতল দালান : শ্রীপুর, বলাগড়, হুগলী। আনু. ১৫ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১২ ফুট প্রস্থ, উচ্চতা আনু. ১৭/১৮ ফুট। নীচের তলটি অধিষ্ঠান ও উপরের তলটি রাসমঞ্চরূপে ব্যবহৃত। মুস্তৌফি পরিবার। ১৯ শতক। [ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইনের বলাগড় থেকে রিক্সায়—গড়বাড়ির রাস্তার মুখে রাসমাঠে।]

শান্তিপুর-রীতি (সব দৃষ্টান্তই ১৯ শতকীয় এবং শিয়ালদহ থেকে শান্তিপুর লোকালে গিয়ে রিক্সায় ঘুরে সবকটিই দেখা যায়) :

শান্তিপুর (হাটখোলাপাড়া), মধ্যমগোস্বামী বাড়ি), নদীয়া। আনু. ২০ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ ফুটের মত চওড়া দালান। লোহার থামের উপর পাঁচ খিলান। সমতল ছাদে রেলিং—পিছনে অদ্বৈত ভবনের জোড়া আটচালা ও দালান মন্দির।

ঐ (কাশ্যপপাড়া)। বাঁশবুনিয়া গোস্বামী বাড়ির রাসদালান। আনু. ২৫ ফুট দৈর্ঘ্য, ১৪ ফুট প্রস্থ, উচ্চতা আনু. ১৬/১৭ ফুট। ছয় জোড়া পাশ্চাত্য ধারার স্তম্ভ (এর মধ্যে দুদিকের পার্শ্ব-দেওয়াল ঘেষে দু জোড়া) নির্ভর দালান। কিছু পঙ্খের কাজ।

ঐ (বড়গোস্বামী পাড়া, রাধারমণ ঠাকুর বাড়ির রাসদালান); স্থাপত্য আগেটির মত— তবে এক্ষেত্রে সমতল ছাদের উপরে নীচু রেলিং।
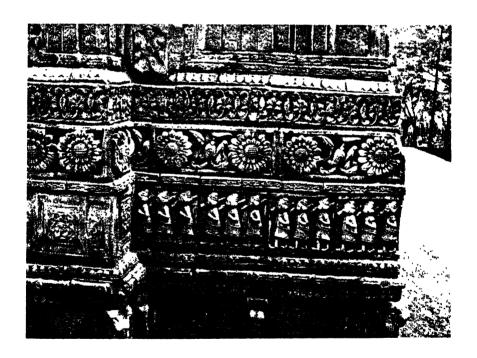
পঞ্জি—২০
গৌণ স্থাপত্য

[(i) স্নানমন্দির/স্নানমঞ্চ, (ii) তুলসীমঞ্চ, (iii) ঝুলনমঞ্চ/ঝুলন মন্দির, (iv) ভোগঘর, (v) বারদুয়ারি, (vi) ক্ষেত্রদ্বার, (vii) তোরণ-শীর্ষরূপে নহবৎ, (viii) নহবৎ, (ix) রথ (রৌপ্য/পিতল) , (x) চণ্ডীমণ্ডপ, (xi) নাটদালান/নাট-মন্দির, (xii) প্রাকার/বেষ্টনী।]

(i) স্নানমন্দির/স্নানমঞ্চ

১। **হরিপাল** (রায়পাড়া), হুগলী। রাধাগোবিন্দের স্নানমন্দির। পাথরে নির্মিত রেখ-দেউলধর্মী স্থাপত্য। নিরলঙ্কার। ১৭ শতক। ২। **শ্রীপাট কুমোরপাড়া,** লালবাগ, মুর্শিদাবাদ। রাধামাধবের স্নানমঞ্চ— পাঁচ ফুটের মত উচ্চতায় ছাদহীন মুক্ত মঞ্চ— ঐতিহাসিক মতিঝিলের পাড়ে। ১৮/১৯ শতক। —হুগলীর **গুপ্তিপাড়ার** মঠে বিগ্রহাদির জন্য একটি স্নানমঞ্চ আছে (১৯ শতক) আছে আবার নদীয়ার **শান্তিপুরের** বিখ্যাত শ্যামচাঁদ মন্দিরের পাশে থাকা দ্বিতল দালানটি (১৯ শতক) বিগ্রহের স্নানমন্দিররূপে ব্যবহৃত হয়।

(ii) তুলসীমঞ্চ

(ক) রেখ : বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া), রাধাশ্যাম মন্দিরের সামনে। ল্যাটেরাইট পাথরে নির্মিত। আটকোণা ভিত্তিস্তম্ভের উপরে আটকোণে আটটি সমরেখ খিলান, ভিতরে সঞ্চিত মাটির মাঝে তুলসী বসানো, শীর্ষে আমলক-কলস শোভিত রেখ মন্দিরধর্মী চূড়া, সাকুল্যে উচ্চতা কমবেশি ১২ ফুট (১৭৫৮)। ২। **চন্দ্রকোণা** (পশ্চিম মেদিনীপুর), লক্ষ্মীনারায়ণের নাটদালানের সামনে, আনু. ১৪/১৫ উচ্চতার ওড়িশী রেখ দেউলের মত (১৮/১৯ শতক)। ৩। **পাথরা** (মেদিনীপুর সদর, পশ্চিম মেদিনীপুর), রেখ মন্দির-রীতি— ১৯ শতক। (বাঁধরাস্তার পাশে)।(খ) চারচালা : **সাহারজোড়া,** বড়জোড়া, বাঁকুড়া। কালাচাঁদের তুলসীমঞ্চ; আনু. ৪ ফুট বর্গাকার অধিষ্ঠানের উপরে, চারদিক চারটি মুক্ত খিলানের উপরে চারচালা রীতির ছাদ। উচ্চতা আনু ১০ ফুট। (১৯ শতক) **আটচালা : গজা,** উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া। কোলে পরিবারের দামোদরের নবরত্নের অদূরে। আনু. উচ্চতা ১০/১২ ফুট। একইভাবে চারদিকে মুক্ত খিলান, ইত্যাদি। (১৯ শতক)। (গ) **পঞ্চরত্ন** ১। **গম্ভীরনগর,** ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর। দে পরিবারের তুলসী মঞ্চ—টেরাকোটা দ্বারপাল ও ফলক-সজ্জিত। আনু. উচ্চতা ১৫/১৬ ফুট। ১৮১২। (ঘাটাল শহরের শিলাবতী নদী ব্রিজ পেরিয়ে বাসস্ট্যান্ড ঘেষে নামা রাস্তায় হেঁটে/রিক্সায়)। ২। **দাসপুর** (হুসনাবাজার), পশ্চিম মেদিনীপুর। প্রতিষ্ঠাতা বৃন্দাদেবী, কারিগর · ঠাকুরদাস শীল। সামান্য টেরাকোটা। ১৮৫৩। —দাসপুরের **সেকেন্দারিতেও** একটি ১৯ শতকীয় পঞ্চরত্ন তুলসী মঞ্চ আছে, আবার পশ্চিম মেদিনীপুরেরই এগরা থানার **পাঁচরোল** গ্রামের রাধাবিনোদ মন্দিরের নাটদালানের পাশে একটি ক্ষুদ্র পঞ্চরত্ন তুলসীমঞ্চ আছে। (ঘ) **হাতির আকারে** তুলসী মঞ্চ : ১। **তিলন্তপাড়া,** সবং, পশ্চিম মেদিনীপুর। মাইতি পরিবারের পঞ্চরত্ন জানকী বল্লভ মন্দিরের তুলসীমঞ্চ— পঙ্খের বৃহৎ হাতির উপরে (১৮১০)। ২। **জয়কৃষ্ণপুর,** বিষ্ণুপুর,

বাঁকুড়া। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ঠাকুর বাড়ির তুলসীমঞ্চ, আগেরটির মত তবে তুলনায় ছোট (১৯ শতক—কোতুলপুর-বিষ্ণুপুর বাসপথের জয়কৃষ্ণপুর স্টপেজের লাগোয়া)। (ঙ) মুর্শিদাবাদের **নসীপুরের** রাজবাড়ির শ্বেত পাথরে বাঁধানো আয়তাকার অতি বৃহৎ তুলসীমঞ্চ (১৯ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ) ইতোপূর্বে বর্ণিত।

(iii) ঝুলন মঞ্চ

অতি বিরল—উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হতে পারত দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ থানার **বাওয়ালির** গোপীনাথের নবরত্ন ও রাধাকান্তের আটচালা মন্দিরের মধ্যবর্তী ঝুলনমঞ্চটি কিন্তু এখন এর শুধু কঙ্কালটুকুই আছে, তবুও সামনে ও পিছনে তিন খিলান এবং উভয় পাশে পাঁচটি করে খিলানের আয়তাকাব স্থাপত্যটি এখনও সম্ভ্রম জাগায়। বাঁকুড়ার প্রাগুক্ত **জয়কৃষ্ণপুরের** বন্দ্যোপাধ্যায়দের ঠাকুরবাড়ির কুব্জপৃষ্ঠ ঝুলন মঞ্চটি এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে (উভয়ই ১৯ শতকের দ্বিতীয় অর্ধের)—প্রাচীনতর ঝুলন-মন্দির (মঞ্চ নয়) আছে বর্ধমানের **খান্দরায়** (অন্ডাল) সরকার পরিবারের বড় তরফের 'রাধামাধব মন্দির ক্ষেত্রে, আবার হুগলীর **দশঘরায়** **বিশ্বাস** পরিবারের দুর্গাদালান প্রাঙ্গণে রয়েছে দ্বিতল ঝুলন মন্দির (উভয়ই, ১৮/১৯ শতক)।

(iv) ভোগঘর

বাঁকুড়ার **বিষ্ণুপুরের** বাধামাধব (১৭৩৭) মন্দিরে রয়েছে একটি দোচালা বা একবাংলা ভোগঘর এবং মদনমোহন মন্দিরের পিছনে বয়েছে অনবদ্য চারচালা ভোগঘর (১৬৯৪), বর্ধমানের প্রাগুক্ত **খান্দরার** প্রাগুক্ত রাধামাধব মন্দিবের পাশে রয়েছে পাথরে নির্মিত ভোগঘর, উত্তর ২৪ পরগণার **কাঁচরাপাড়ার** কৃষ্ণরায়ের বিশাল আটচালা মন্দিরের পিছনে রয়েছে ত্রিখিলান দালান-সম্পন্ন ভোগঘর (১৭৮৫), আবার বর্ধমানের **গুসকরায়** চোংদার পরিবারের দুর্গাদালানের শেষপ্রান্তে রয়েছে সাবিবদ্ধ প্রাচীন উনান ও তার সাথে পরপর ভোগঘর (১৯ শতক)—এমন নানা দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে সারা পশ্চিম বাংলায়।

(v) বারদুয়ারি :

[পশ্চিমবাংলার চারটি মন্দিরক্ষেত্রে এর দৃষ্টান্ত আছে। 'ময়মনসিংহ গীতিকা'-র বারদুয়ারিয়া' ঘর আসলে ছিল অতি সৌখীন ও অন[illegible] শিল্পমণ্ডিত বৈঠকখানা বা বহির্বাটি—এর সঙ্গে মন্দিরক্ষেত্রের বারদুয়ারির সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না, তবে মিল এইটুকু যে বারদুয়ারিও মন্দিরের বহির্ক্ষেত্রের ব্যাপার—জগমোহনের সামনে/ অদূরে চারদিকেই মুক্ত খিলান স্থাপত্য যেখানে ভক্তরা অপেক্ষা করতে পারেন।] পশ্চিম মেদিনীপুরের **এগরার** হটনাগর শিব মন্দিরের (১৬ শতক) সামনে গোলাকারে বিন্যস্ত বার ১২-টি মুক্ত খিলান আছে কিন্তু এদের উপরে ছাদ নেই, **গড়বেতার** সর্বমঙ্গলার (১৬ শতক) ১২ দুয়ারি আসলে ১৪ দুয়ারি একটি কক্ষ, **কেশিয়াড়ির** সর্বসমঙ্গলার (১৬১৫) বারদুয়ারির উপরে রয়েছে পিড়া-রীতির ছাদ, বর্ধমানের **অম্বিকা-কালনায়** প্রতাপেশ্বর ও লালজী মন্দিরের মাঝে রয়েছে গোলাকার ছাদ-বিশিষ্ট বৃহৎ বারদুয়ারি (১৮/১৯ শতক)।

(vi) ক্ষেত্রদ্বার

পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণ ভারতের মত প্রাকার-ঘেরা মন্দির-ক্ষেত্রের ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি, ফলে দক্ষিণভারতের 'গোপুরমে'র মতন কোনো প্রথা এখানে গড়ে ওঠেনি, তবু বৈচিত্র কিছু আছে। কোচবিহার জেলার **গোঁসানিমারির** কামতেশ্বরী (১৬ শতক) ক্ষেত্রে দুর্গদ্বারের মতন বৃহৎ প্রস্তরদ্বার আছে, পূর্বোক্ত **এগরার** 'হটনাগর শিব' ক্ষেত্রের (১৬ শতক) প্রবেশদ্বারশীর্ষটি একরত্ন মন্দিরের মতন, পুরুলিয়ার **গড়পঞ্চকোট** পাহাড়ের উপরে শ্যাম-রঘুবীর (১৭ শতক) ক্ষেত্রে আছে পাথরে নির্মিত রাজসিক তোরণ, বাঁকুড়ার **বিষ্ণুপুরে** রাধাশ্যাম মন্দির (১৭৫৮) ক্ষেত্রে আস্ত একটি ত্রিখিলান ও বক্রচাল তথা বিষ্ণুপুরে সচরাচর দৃশ্যমান মন্দিরের মত স্থাপত্যকে ক্ষেত্রদ্বার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে শুধু শীর্ষে 'রত্ন' না বসিয়ে ছাদের দুপাশে দুটি চারকোণা ও চারদিকে দু-খিলান নির্মাণের উপরে খাঁজকাটা পিরামিডাকৃতি ছাদ বসানো হয়েছে। **বিষ্ণুপুরেরই** বিখ্যাত মদনমোহন মন্দিরের প্রবেশদ্বারটি খাঁটি দোচালা ঘর, বর্ধমানের **ক্ষীরগ্রামের** যোগাদ্যা মন্দির ক্ষেত্রের পূবদিকের বা প্রধান প্রবেশদ্বারটি জোড়বাংলা-রীতির কিন্তু পশ্চিমদ্বারটি একবাংলা বা দোচালা রীতির। পশ্চিম মেদিনীপুরের **কর্ণগড়ের** দণ্ডেশ্বর ও মহামায়া মন্দিরে যোগীখোপ-সহ একটি দ্বিতল স্থাপত্য প্রবেশ তোরণ রূপে ব্যাবহৃত হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার **ভাটপাড়ার** শিবচন্দ্র সার্বভৌম লেনের ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশদ্বারের উপরে একটি আস্ত পঞ্চরত্ন বসানো আছে এবং **তালপুকুরের** অন্নপূর্ণার নবরত্ন মন্দিরক্ষেত্রে প্রবেশের পথে বৃহৎ তোরণের উপর দণ্ডায়মান আছে অতি বৃহৎ একটি সিংহ মূর্তি—এমন সিংহদুয়ার ১৯ শতকে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। বর্ধমানের **বাঘনাপাড়ার** ১৭ শতকীয় কৃষ্ণবলরামের বৃহৎ আটচালার ঘেরা চত্বরের প্রবেশ পথে ১৯ শতকে সংযোজিত হয়েছে খাঁটি পাশ্চাত্য ধারার একটি সুবৃহৎ ও সুউচ্চ তোরণ—দুদিকে দুজোড়া গথিক স্তম্ভ নির্ভর আনু. ১৫ ফুট উচ্চতার দ্বারপথ এবং এর উপরে বা দ্বিতলে আনু. ১৫ ফুট উচ্চতার আটকোণা (চারটি মুক্ত খিলান ও চারটি সম উচ্চতার কিন্তু শীর্ণতর নকল জানালা) পাশ্চাত্য স্থাপত্য (হয়ত নহবৎ)। **বর্ধমান শহরের** সর্বমঙ্গলা ক্ষেত্রে প্রবেশ পথকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়েছে রাজসিক দ্বিতল দালান (১৯ শতক)।

(vii) তোরণের উপর নহবৎ (১৯ শতক)

বর্ধমানের **চকদীঘির** চৌদ্দ দেউলক্ষেত্রের প্রবেশ তোরণের উপরে রয়েছে চারচালা নহবৎ, পশ্চিম মেদিনীপুরের **গোপীবল্লভপুরে** রাধাগোবিন্দ মন্দিরক্ষেত্রে প্রবেশপথের উপরে রয়েছে পঞ্চরত্ন নহবৎ, বীরভূমের **মল্লারপুর** মন্দিরক্ষেত্রের তোরণের উপরে রয়েছে সমতল ছাদের ত্রিখিলান নহবৎ, বাঁকুড়ার **কোতুলপুরে** ভদ্র পরিবারের রেখ দেউল ও উচ্চ তোরণের উপরে সমতল ছাদের নহবৎ বসানো, উত্তরবঙ্গে **কোচবিহারের** মদনমোহন মন্দিরের ক্ষেত্রদ্বারের উপরে আছে আটকোণা নহবৎ ও তার উপরে খড়ের চালের আদলে তীক্ষ্ণচূড় গম্বুজ ও গুঞ্জাবড়ির প্রবেশ পথের দ্বিতলে নহবৎ ও তার উপরে তিনটি শীর্ণ চূড়া-সহ চারচালার ধরনের গম্বুজ। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের **লোয়াদার** ভুতনাথ শিবের চত্বরে প্রবেশ তোরণের উপরেও আছে সমতল ছাদের নহবৎ।

(viii) পৃথক স্থাপত্যরূপে নহবৎ

পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণার **মিত্রসেনপুরে** পথের ধারে একটি শীর্ণ, প্রায় স্তম্ভাকৃতি দ্বিতল নহবৎখানা দৃষ্ট হয় একটি মন্দিরের সামনের প্রাঙ্গনে (১৯ শতকের প্রথম অর্ধ), মুর্শিদাবাদের **নশীপুরের** রাজবাড়ির ঠাকুরদালানের সামনে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বর্গাকারে আনু. ১২ ফুট করে ও ২০ ফুটের মত উচ্চতা-বিশিষ্ট দ্বিতল নহবৎ (১৯ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ) রয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার **খড়দহে** শ্যামসুন্দরের দ্বিতল শীর্ণ নহবতের (১৯ শতক) প্রথম তলটি এক সময় সংস্কৃত শিক্ষার টোল হিসাবে ব্যবহৃত হত. উত্তর ২৪ পরগনার **ধান্যকুড়িয়ায়** গায়েন পরিবারের দুর্গাদালেনের সামনে রয়েছে একটি চমৎকার দ্বিতল নহবৎ এবং অদূরে রাসমঞ্চের কাছে রয়েছে বল্লভ পরিবারের অসাধারণ ত্রিতল নহবৎ (উভয়ই, ১৯ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ)। গোবরডাঙার প্রসন্নময়ী কালীবাড়ির সামনে আছে প্রকাণ্ড দ্বিতল নহবৎ। উত্তর ২৪ পরগনারই **দক্ষিণেশ্বরের** বিখ্যাত মন্দির প্রাঙ্গণে ও **তালপুকুরের গঙ্গোত্রীপাড়ার** অন্নপূর্ণা মন্দিরের পশ্চিমে গঙ্গাতীরে যথাক্রমে উত্তর (বর্তমানে ইটখোলার মধ্যে) ও দক্ষিণ (বর্তমানে পাড়ার মধ্যে) কোণে ব্যতিক্রমী ধরনের নহবৎ দৃষ্ট হয়—ছ-কোণা অধিষ্ঠান ও প্রথম তলের দালানের উপরে চারকোণা ছাদের চারকোণ থেকে চারটি ছোট উদ্গত বারান্দা, এর মাঝ দিয়ে চারদিকে এক খিলান দালানের দ্বিতল ও তার ছাদে ছোট ও এক খিলান চতুষ্কোণ স্থাপত্য ও এর শীর্ষে গম্বুজ; ঐ জেলারই **আগরপাড়ার** মোল্লার হাটের গঙ্গাতীরে গিরিবালা দাসীর 'রাধাগোবিন্দ কুঞ্জে' রয়েছে শীর্ণ, ত্রিতল ও সুউচ্চ দুটি নহবৎ (১৯১১-১২ দক্ষিণেরটি সংস্কৃত)। বর্ধমানের **বৈদ্যপুরে** বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গাদালানের রাস্তার বিপরীতে পুকুরপাড়ে রয়েছে একটি ছোট কিন্তু সুদৃশ্য দ্বিতল নহবৎ।

(ix) রথ (রূপা/পিতল)

কাঠের রথের সঙ্গে আমরা কমবেশি পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে কাঠের তৈরী কয়েকটি প্রাচীন রথ এখন আছে, যেমন, হুগলীর মাহেশ ও গুপ্তিপাড়ার বা পশ্চিম মেদিনীপুরের **নাড়াজোল**— হুগলীর **দশঘড়ার** বিশ্বাস পরিবারের পুরাতন কাঠের রথটি দু'বছর আগে ভস্মীভূত হয়েছে। অনেক সময়েই কাঠের রথগুলিও হয় রত্নরীতির মন্দিরে আদলে, যেমন বাঁকুড়ার **বিষ্ণুপুরের** মাধবগঞ্জের রথটি নির্মিত হয়েছে খাঁটি নবরত্ন মন্দিরের আদলে—প্রকৃতপক্ষে রথ সবসময়েই নির্মিত হয় 'রথমন্দির'-রূপে, ফলত মন্দিরের সঙ্গে তার সাদৃশ্য সবসময়েই থাকে। যাইহোক, এখানে আমাদের লক্ষ্য ধাতব রথ। ১. **নশীপুর** (রামানুজ আখড়া), লালবাগ, মুর্শিদাবাদ। রৌপ্য নির্মিত রথ। স্বর্গের হাতি ঐরাবতের পিঠে তিনটি চূড়া সম্পন্ন ত্রিখিলান বক্রচাল দালানের আদলে—দালানের দু'পাশের শীর্ণ স্তম্ভে দেবকন্যা। সমগ্র রথটিই চমৎকার কারুকর্ম-শোভিত। ১৮/১৯ শতক। ২. **বনকাটি (অযোধ্যা)**, কাঁকসা, বর্ধমান। পিতলে নির্মিত রথ। খাঁটি বক্রচাল পঞ্চরত্ন। সমগ্র সম্মুখগাত্র অপূর্ব কারুকার্য-মণ্ডিত (দশাবতার, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি) । ১৯ শতক। ৩. **হৃদলনারায়ণপুর** (মণ্ডল পরিবারের বড় তরফ), পাত্রসায়েব, বাঁকুড়া। পিতলের রথ। ছোট। পঞ্চরত্নের আদলে নির্মিত। সম্মুখগাত্র ও দুই পাশ মনোরম কারুকার্য

শোভিত। ১৯ শতক। ৪. **জয়দেব-কেন্দুলী,** ইলামবাজার, বীরভূম। সর্ববৃহৎ ও সম্ভবত **সর্বোৎকৃষ্ট কারুকাজ-সম্পন্ন** পিতলের রথ। ১৯ শতক।

(x) চণ্ডীমণ্ডপ

১. **আঁটপুর,** জাঙ্গীপাড়া, হুগলী। কৃষ্ণরাম মিত্র স্থাপিত চণ্ডীমণ্ডপ। বাংলার অপরূপ খড়ের চালের চণ্ডীমণ্ডপের সর্বশ্রেষ্ঠ ধারার এখনও চমৎকারভাবে রক্ষিত একমাত্র উদাহরণ। অসাধারণ কোর দেওয়া হস্তিপৃষ্ঠ দোচালা খড়ো চাল—কাঠের থাম, আড়া, নাগদণ্ড, ফ্রেম—সবই অনন্যসাধারণ খোদাই শিল্পে বিস্ময়করভাবে সমৃদ্ধ। ১৮ শতকের শেষে। ২. **শ্রীপুর,** বলাগড়, হুগলী। মুস্তৌফী পরিবার। দোচালা এবং এক সময় আঁটপুরের মতই কোর দেওয়া খড়ের চাল ছিল কিন্তু বর্তমানে টিনের চাল দেওয়ায় সেই সৌন্দর্য নেই, তথাপি আঁটপুরের মতই এটিরও কাঠ খোদাই শিল্প অশেষ বিস্ময় উদ্রেক করে। কাঠের ফ্রেম, টানা প্রভৃতিতে রয়েছে অনন্য সাধারণভাবে খোদিত দেবদেবী ও পুরাণ কাহিনী। ১৮/১৯ শতক। [শ্রীপুরের মুস্তৌফীরা এসেছিলেন নদীয়ার উলা-বীরনগর থেকে। **উলা-বীরনগরে** খড়ের চালের একটি অসামান্য চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, সেটি এবং 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থে **দীনেশচন্দ্র সেন** বর্ণিত অনুরূপ মণ্ডপ বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়েছে এই বইয়ের প্রথম পবের পরিচ্ছেদ—১-এ।] ৩। **রামগড়,** বীনপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। কালাচাঁদের ১৩ রত্ন মন্দিরের লাগোয়া মণ্ডপটি টিনের চালের হলেও অত্যন্ত আকর্ষণীয় কাঠ খোদাই-শিল্পে সমৃদ্ধ (১৯ শতক)।—খোদাই শিল্প না থাকলেও বৃহৎ মণ্ডপের আরও দু/একটি উদাহরণ হল : বাঁকুড়ার **আটবাইচণ্ডী** গ্রামের কালী মন্দিরের সামনে থাকা খড়ের চালের মণ্ডপ, হুগলীর **কামারপুকুরে** লাহাদের বৃহৎ চালা, বীরভূমের সিউড়ি থানার **নগরী** গ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গাদালানের সামনেকার সুবৃহৎ চালা বা বর্ধমানের **নাসিগ্রামে** বড় রঘুনাথ মন্দিরের সামনে থাকা প্রকাণ্ড চালা—সব কটিতেই একসময় খড়ের চাল ছিল কিন্তু বর্তমানে টিনের।

(xi) নাটদালান/নাটমন্দির

প্রাচীন যুগ থেকেই মন্দিরের সংলগ্ন মহামণ্ডপ, মণ্ডপ, অর্ধমণ্ডপ প্রভৃতি থাকত। উড়িষ্যার অন্তরাল ও জগমোহনের সামনে অনেক সময়ে নাটমণ্ডপ থাকত। বঙ্গভূমিতেও মন্দিরের সামনে খড়ের চালের সুবৃহৎ চারচালা বা আটচালা মণ্ডপ/চণ্ডীমণ্ডপ থাকত—এটা ছিল একাধারে ভক্তদের অপেক্ষাগৃহ; ধর্মালোচনা, ভাগবত পাঠ, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতির জন্য চারদিক খোলা ঘর, আবার কীর্তনগান-নামগান-নৃত্যগীত ও যাত্রানুষ্ঠানের মণ্ডপ। পশ্চিম মেদিনীপুরের **গড়বেতার** ষোড়শ শতকীয় সর্বমঙ্গলা মন্দিরের সঙ্গে (আনু.) ১৭ শতকে সংযোজিত বৃহৎ চারচালা নাটমণ্ডপ, ১৭ শতকেরই শেষদিকে বাঁকুড়ার **বিষ্ণুপুরের** বিখ্যাত মদনমোহন মন্দিরের সামনে নির্মিত অতি অপরূপ চারচালা মণ্ডপ ও ১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বর্ধমানের **অম্বিকা কালনায়** লালাজীর ২৫ রত্ন মন্দিরের সামনে নির্মিত মনোহর চারচালা মণ্ডপটি বাংলার খড়ের চালের মণ্ডপের ঐতিহ্যের সর্বতো সার্থক অনুকৃতি। কিন্তু ১৮ শতকের শেষদিক থেকেই

বিশেষত অতি ধনী পৃষ্ঠপোষকগণ পাশ্চাত্য স্তম্ভ ও খিলান নির্ভর বিলাতি বা ইওরোপীয় ধারায় নাটদালান বা নাটমন্দির নির্মাণের দিকে ঝোঁকেন। ১৭৮৫-তে নির্মিত উত্তর ২৪ পরগনার **কাঁচড়াপাড়ার** কৃষ্ণ রায় মন্দির প্রাঙ্গণের পূব ও পশ্চিমপাশে মুখোমুখি দুটি ত্রিখিলান দালান নির্মিত হয় নাটমণ্ডপের বিকল্প রূপে—উদ্দেশ্য হল, অতিবিশাল আটচালা মন্দিরটি দর্শকের দৃষ্টিপথে অবাধ ও উদ্ভাসিত রাখা, ব্যাপারটি আকর্ষণীয় হলেও দালান থেকে পূজা দেখা না যাওয়ায় জনপ্রিয় হয়নি। অন্যদিকে হুগলীর **গোস্বামী-মালিপাড়ার** ১৭/১৮ শতকীয় মদনগোপাল ও রাধাকান্তের সাধারণ আটচালার সামনের তিনদিক ঘিরে ১৯ শতকে পাশ্চাত্য ধারার এত বৃহৎ নাটদালান নির্মিত হয়েছে যে মূল মন্দির দুটি প্রায় ঢাকা পড়েছে। বর্ধমানের **বাঘনাপাড়ার** কৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরেও নাটদালানের কড়িবরগার ছাদ মন্দিরের এত ঘনিষ্ঠ যে ভিতর থেকে মন্দিরের উপরিভাগ দেখাই যায় না। যাইহোক আমরা নমুনা হিসাবে ১৭৯৬ থেকে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধি স্থানীয় পাঁচটি নাটদালান বা নাটমন্দিরের উল্লেখ করছি : কলকাতার **টালিগঞ্জের** খালের অপর পাড়ে ১নং মণ্ডল টেম্পল লেনের রাধাকান্তের নবরত্ন মন্দিরের বৃহৎ নাটদালানের দৈর্ঘ্যের দিকে উভয় পাশে ৭টি করে ও প্রস্থের দিকে সামনে ও পিছনে ৫টি করে খিলান, ভিতরে দৈর্ঘ্যের দিকে উভয় পাশে ৬টি করে ও প্রস্থের দিকে সামনে ও পিছনে আরও ২টি করে—মোট ১৬টি বিশাল মাপের গথিক স্তম্ভের উপরে ছাদ; দক্ষিণ ২৪ পরগনার **বাওয়ালির** গোপীনাথের পরিত্যক্ত নবরত্নের নাটদালানটি বর্গাকার এবং চারপাশেই ৫টি করে খিলান ও ছাদটি ভিতের তিন সারিতে তিনটি করে পাশ্চাত্য স্তম্ভের উপরে বিন্যস্ত; উত্তর ২৪ পরগনার **তালপুকুরের** অন্নপূর্ণার নবরত্ন মন্দিরের নাটদালানটি সর্বশ্রেষ্ঠ ধারার—দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৩০ ফুট করে বর্গাকার দালানটির চার দিকেই ৫টি করে খিলান এবং ছাদ দালান-মধ্যে পূব-পশ্চিমে ৬টি করে ও উত্তর-দক্ষিণে মধ্যস্থলে আরও ২টি করে মোট ১৬টি গোল পাশ্চাত্য স্তম্ভের উপরে বিন্যস্ত, ভিতরে খিলানশ্রেণির উপরস্থ দেওয়াল পঙ্খের লতা-পাতার কাজে সজ্জিত; তবে এই ধারার চূড়ান্ত বিকাশ দেখা যায় উত্তর ২৪ পরগনার **আগরপাড়ার** গিরিবালা দাসীর রাধাগোবিন্দ কুঞ্জের রাজসিক নাটদালানে (১৯১১-১২) দৈর্ঘ্যে আনু. ৩০ (উত্তর-দক্ষিণ) আনু. ৩০ ও প্রস্থে (পূর্ব-পশ্চিম) আনু. ২৫ ফুট আয়তন সম্পন্ন দালানের চারকোণে চারটি করে বৃহৎ ও বিপুল পাশ্চাত্য স্তম্ভের গুচ্ছ, এদের মাঝে পূবে-পশ্চিমে তিনটি করে জোড়া স্তম্ভ ও উত্তর-দক্ষিণে দুটি করে জোড়া স্তম্ভ। সম্মুখভাগ তথা চারপাশের ভারি কার্নিশ পুরোপুরি পাশ্চাত্য ধারায় অলংকৃত। ছোট নাটদালানের উদাহরণ দেখা যায় উত্তর ২৪ পরগনারই **খড়দহের কুলীনপাড়ার** রাধাকান্তের আটচালার সামনে—মাত্র চৌদ্দ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট, কিন্তু চারপাশেই দুদিকে তিন-কোণা ও মাঝে একটি করে অর্ধবৃত্তাকার খিলান, ক্ষুদ্র কিন্তু দর্শনীয়।—উল্লেখ্য যে, এই ধারার নাটদালানগুলিতে সব সময়েই কড়িবরগার উপরে সমতল ছাদ ব্যবহৃত হয়েছে, ছাদের উপর চারপাশে অনেক সময় সুদৃশ্য রেলিং বসানো হয়েছে ও সম্মুখ ভাগে ত্রিভুজাকৃতি স্থাপত্যশীর্ষে—চূড়া বসানো হয়েছে। যাইহোক, পাশ্চাত্য ধারার বৃহৎ নাটদালানের আরও দুটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল **দক্ষিণেশ্বরের** অতি

বিখ্যাত ভবতারিণী কালীর নবরত্নের সামনে থাকা নাটদালান ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের রাধাবল্লভের আটচালার সামনে থাকা নাটদালান।

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মজিলপুরের দত্তবাটিতে গোপালের ত্রিখিলান দালানের সামনের বৃহৎ অঙ্গনে অল্পকাল আগেও কাঠের স্তম্ভশ্রেণির উপরে বাঁশকাঠেরই ছাউনি সম্পন্ন একটি মণ্ডপ ছিল, বর্তমানে ওটি বিনষ্ট হয়েছে, শুধু কয়েকটি খুঁটি বিসদৃশভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

(xii) প্রকার / বেষ্টনী

মন্দির ক্ষেত্র ঘিরে অত্যুচ্চ গোপুরম্ সহ উচ্চ প্রাকার একান্তভাবে দক্ষিণ ভারতীয় রীতি— উত্তর ভারতে এই রীতি তেমন মান্যতা পায়নি। উড়িষ্যাতেও পুরীর জগন্নাথ ও ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির ছাড়া কোনও প্রাচীন মন্দির ঘিরে উচ্চ প্রাকার দেওয়া হয়নি। কোনারকের মন্দির ঘিরে যে নীচু পাঁচিলের অবশেষ দেখা যায় তাকে রেলিং বললে মারাত্মক ভুল করা হয় না। পশ্চিমবঙ্গেও মন্দির ক্ষেত্র ঘিরে উচ্চপ্রাকার নির্মাণের রীতি গড়ে ওঠেনি। উত্তরবঙ্গের **গোঁসানিমারির** কামতেশ্বরী মন্দির ঘিরে ও পুরুলিয়ার **গড় পঞ্চকোটে** পাহাড়ের উপরের মন্দিরের পাহাড়ের দিকে ছাড়া বাকি তিনদিকে যে প্রাচীর আছে তা ইতোপূর্বে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বাঁকুড়ার **বিষ্ণুপুরের** নন্দলাল মন্দির ঘিরেও প্রাচীর রয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার **কাঁচড়াপাড়ার** কৃষ্ণ রায়ের বিশাল আটচালা মন্দিরের পূব, পশ্চিম ও উত্তর দিক ঘিরে রয়েছে প্রাচীর এবং দক্ষিণ দিকে দুপাশে দুটি দালানের মাঝ দিয়ে বৃহৎ এক খিলান ক্ষেত্র-প্রবেশ পথ— আরও দক্ষিণে কিছুটা ফাঁকা জায়গার পরে দুপাশের দেওয়াল গাত্রে পঙ্খের সিংহ শোভিত এক খিলান তোরণ। —প্রাকার না থাকলেও অনেক সময়ে অন্যান্য মন্দির ও দালান শ্রেণির সাহায্যে মূল মন্দির ঘিরে বেষ্টন করা হয়। হুগলীর **আঁটপুরের** রাধাগোবিন্দের আটচালার দু'পাশ ও সামনের দিকে বর্গাকারে রয়েছে দালান শ্রেণি, সামনের দালানের মাঝ দিয়ে একমাত্র পথ, **টালিগঞ্জের** বড় রাসবাড়িতে সামনেকার দুপাশে দুটি পঞ্চরত্ন ও তার মাঝের নবরত্নটিকে বর্গাকারে ঘিরে রেখেছে শিবের বারোটি আটচালা, **দক্ষিণেশ্বরের** কালী মন্দিরের উত্তর, দক্ষিণ ও পূব পাশে রয়েছে দালান শ্রেণি ও পশ্চিমে রয়েছে দুপাশে ৬টি করে ১২টি আটচালা শিব মন্দিরের মাঝে চাঁদনি, **তালপুকুরের** অন্নপূর্ণা মন্দিরের পূব, উত্তর ও দক্ষিণ পাশে রয়েছে দালান শ্রেণি ও পশ্চিমপাশে রয়েছে দুভাগে তিনটি তিনটি ছ'টি আটচালা শিব মন্দির—পূবে দালানের মাঝে রয়েছে সিংহদুয়ার ও লোহার 'গেট', পশ্চিমেও দুটি আটচালা গুচ্ছের মাঝে দুপাশে দুটি গম্বুজ-শীর্ষ প্রহরী-কক্ষ ও তাদের মাঝে লোহার আরও একটি 'গেট'। ইতোপূর্বেই দেখা গেছে বীরভূমের **নানুর** ও **মল্লারপুর**, বর্ধমানের **চকদীঘি**, বর্ধমানেরই **নবাবহাট**, ও **কালনার** দুটি ১০৮ মন্দিরক্ষেত্র এবং **অমরারগড়ের** দশমন্দিরতলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে মন্দিরগুলি দিয়েই বেষ্টনী তৈরী করা হয়েছে—মল্লারপুর, নানুর ও অমরারগড়ে ব্যাপারটি হয়েছে কালে কালে, বাকি সব জায়গাতেই সুনির্দিষ্ট ও একক পরিকল্পনা অনুসারে। উত্তরবঙ্গে **কোচবিহার** গুঞ্জাবাড়ির ঘেরা-প্রাচীর ও মদনমোহন-ক্ষেত্র-ঘেরা রেলিংও পরিকল্পিত ব্যাপার। বলা বাহুল্য, এমন দৃষ্টান্ত আরও আছে।

ছবি

মন্দির

ও

অলঙ্করণ-শিল্প
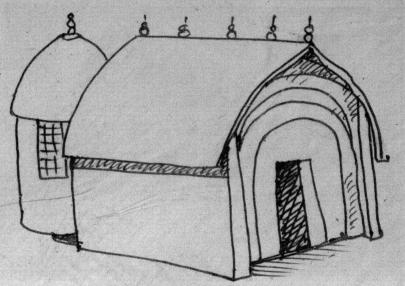
মৌর্য-যুগীয় দোচালা রীতির পাহাড়-কাটা মন্দির।
বরাবর পাহাড়, গয়া—স্কেচ, সুজয় চক্রবর্তী

১৭ নং মঁন্দির, সাঁচি

ভীম রথ। মামল্লপুরম

দ্রৌপদী রথ। মামল্লপুরম
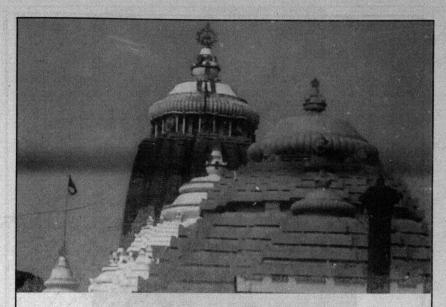
শিখরই মন্দির-রীতির মাপকাঠি। নাগর-রীতি;বক্ররেখ শিখর,
বেকি, আমলক, কলস ও পতাকা—জগন্নাথ মন্দির, পুরী।

দ্রাবিড়-রীতি, 'ক্ষুদ্র অল্প বিমান',—'একাম্বরনাথ' মন্দির, কাঞ্চিপুরম
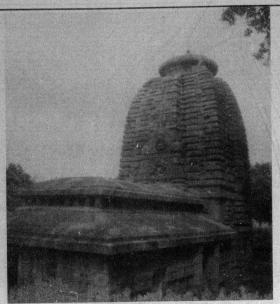
পরশুরামেশ্বর মন্দির, ভুবনেশ্বর
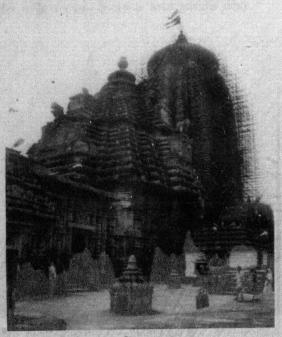
লিঙ্গরাজ মন্দির, ভুবনেশ্বর

কৈলাসনাথ মন্দির, ইলোরা
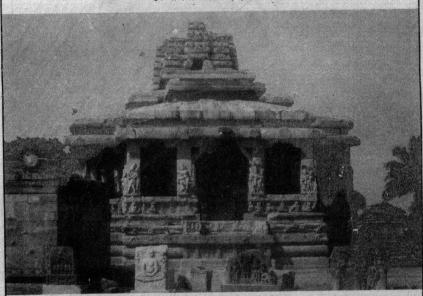
দুর্গ মন্দির, আইহোল

বৃহদীশ্বর (রাজ রাজ) মন্দির, তাঞ্জোর
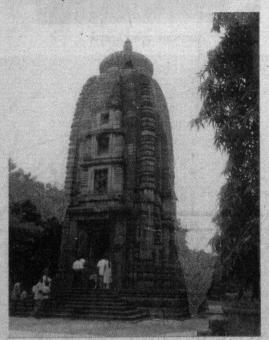
কীচকেশ্বরী মন্দির, খিচিং
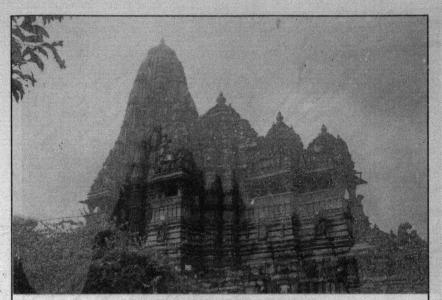
'কন্দরিয় মহাদেব' মন্দির, খাজুরাহো

'লক্ষ্মণ' মন্দির (পঞ্চায়তন), খাজুরাহো

'কর্ণ' মন্দির, অমরকণ্টক

ইন্দ্রলথ মন্দির, রাণিপুর ঝড়িয়াল

'শাস-বহু' মন্দির, গোয়ালিয়র

'তেলী কা মন্দির', গোয়ালিয়র
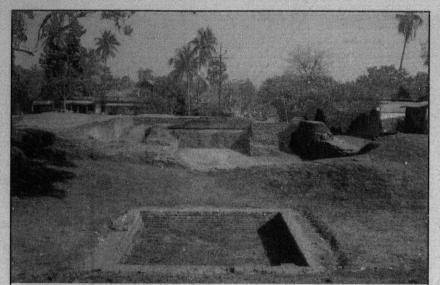
খনা-মিহিরের ঢিপি, প্রধান মন্দিরের অবশেষ, দেবালয়, বেড়াচাঁপা

খনা-মিহিরের ঢিপি, দ্বিতীয় মন্দিরের অবশেষ, দেবালয়, বেড়াচাঁপা

সিদ্ধেশ্বর শিব, বরাকর, বর্ধমান

দুর্গা মন্দির, পাড়া, পুরুলিয়া

বড়াম দেউলঘাট, পুরুলিয়া, মন্দির নং ২
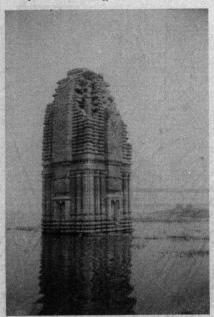
লালপুর, তেলকুপি, পুরুলিয়া
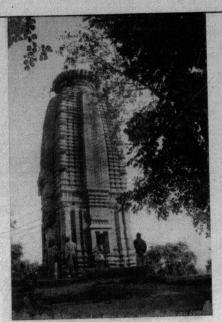
বান্দা, পুরুলিয়া

ঘুটগেড়িয়া, বাঁকুড়া

ইচ্ছাই ঘোষের দেউল, গৌরাঙ্গপুর, বর্ধমান
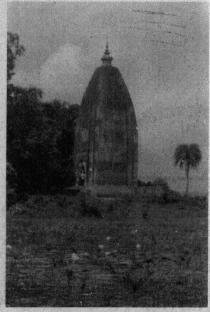
ভাণ্ডীরবন, বীরভূম
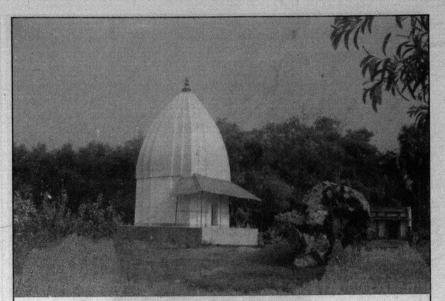
দিগ্‌নগর, বর্ধমান
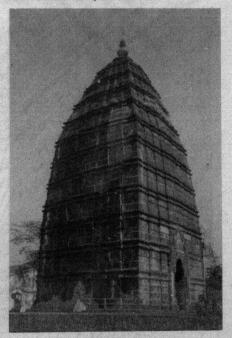
কুমারডিহি, বর্ধমান

এক্তেশ্বর, বাঁকুড়া
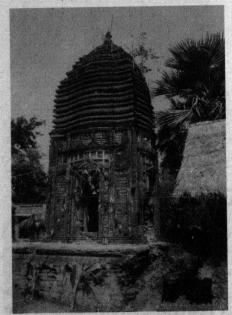
ব্যতিক্রমী দেউল, শিব, মৌখিরা, বর্ধমান

হটনাগর শিব, এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর

কামেশ্বর শিব, কুঁয়াই (নেড়া দেউল), পশ্চিম মেদিনীপুর

সেঁকুয়া, চন্দনেশ্বর শিব, পশ্চিম মেদিনীপুর

কৃষ্ণ, বৈদ্যপুর, বর্ধমান

লক্ষ্মী-জনার্দন, দেবীপুর, বর্ধমান
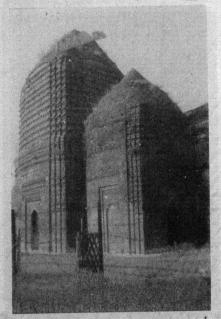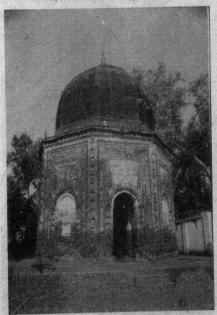
সোমেশ্বর শিব, জজান, মুর্শিদাবাদ

শিব, ব্যাসপুর, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ
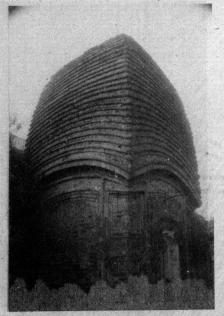
শিব, নন্দী, জামুরিয়া, বর্ধমান

রাধারমণ, আদলাবাদ, পূর্ব মেদিনী-পুর

চন্দ্রনাথ শিব, হেতমপুর, বীরভূম

শিব, ত্রৈকুটক রীতি, নন্দী, বর্ধমান
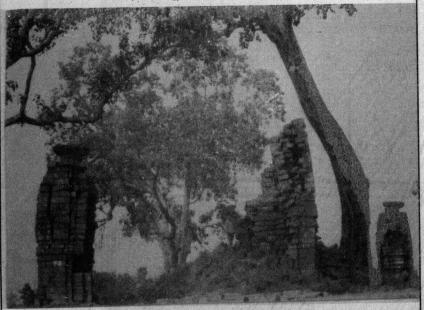
পঞ্চায়তন, সুইসা, পুরুলিয়া
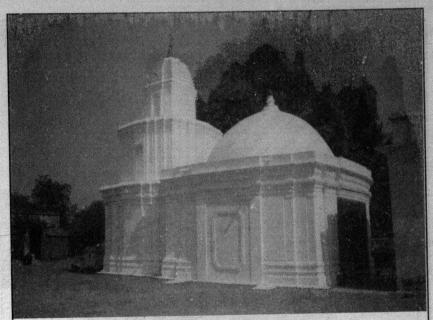
যোগাদ্যা (ধাপকাটা দেউল ও গম্বুজ-শীর্ষ জগমোহন)
ক্ষীরগ্রাম, বর্ধমান

চারবাংলা (উত্তর) মন্দির, বড়নগর, মুর্শিদাবাদ। একবাংলা

নন্দদুলাল, চন্দননগর, হুগলী। একবাংলা
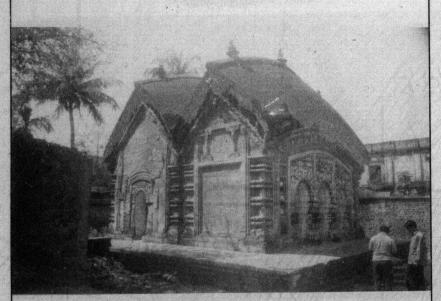
জোড়বাংলা, ছোট দীঘরি, বর্ধমান
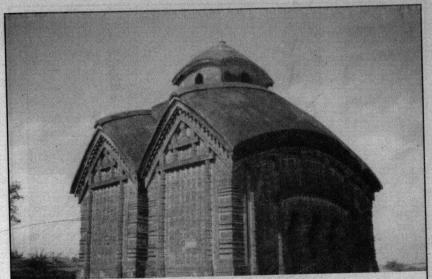
জোড়বাংলা, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া
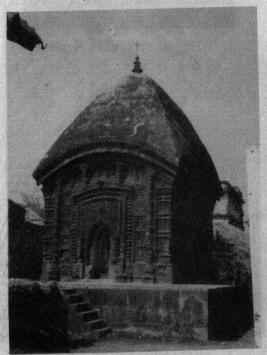
রঘুনাথ (শিব), ঘুরিষা, বীরভূম, চারচালা
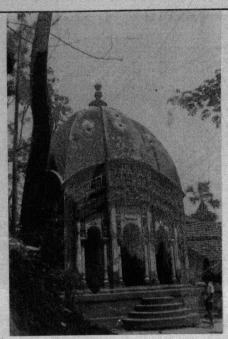
মনসা, আজুড়িয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, চারচালা
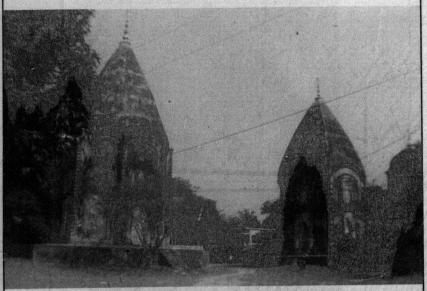
চালা-দেউল, শিবনিবাস, নদীয়া
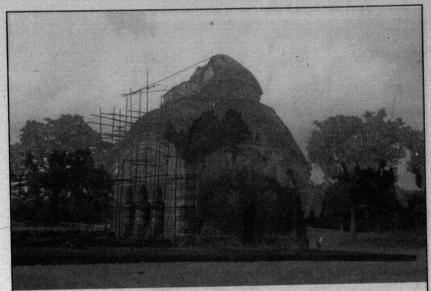
হরিপুরগড়, উড়িষ্যা। আটচালা
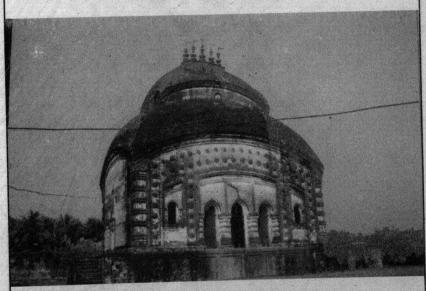
কৃষ্ণরায়, কাঁচড়াপাড়া, নদীয়া, আটচালা
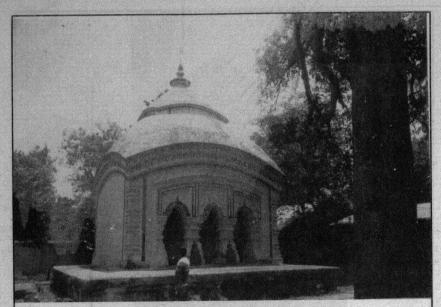
সাত্রাকোণ, বাঁকুড়া, আটচালা

বাঁকা রায়, বীরচন্দ্রপুর, বীরভূম। ক্ষীণশীর্ষ আটচালা

পঞ্চায়তন, কীর্তিশ্বর শিব, গঞ্জ-বৈকুণ্ঠপুর, বর্ধমান

বারোচালা, শিব। ইলছোবা, হুগলী
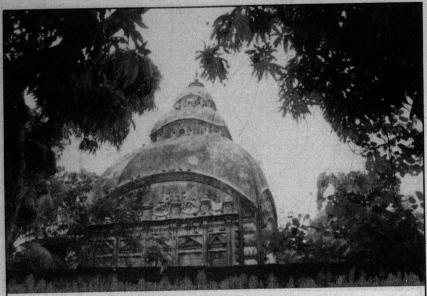
বারোচালা, রামচন্দ্র, চিরুলিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর
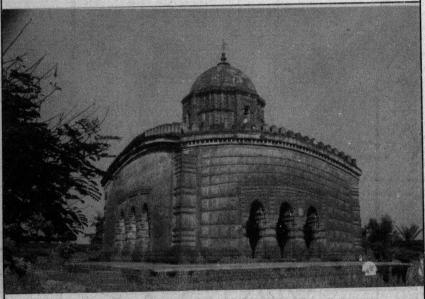
মদনমোহন। একরত্ন। বিষ্ণুপুর। বাঁকুড়া
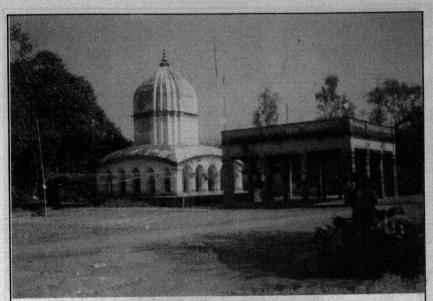
কালঞ্জয় শিব। প্রদক্ষিণ বারান্দা সহ। পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া। একরত্ন
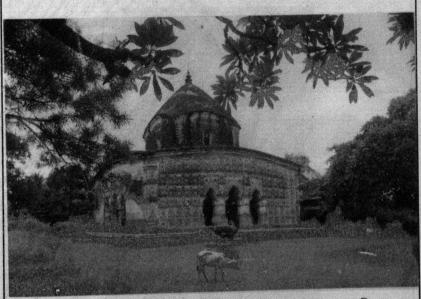
রাধাবল্লভ। একরত্ন, কিন্তু শিখরটি চারচালা। খানাকুল-কৃষ্ণনগর। হুগলী
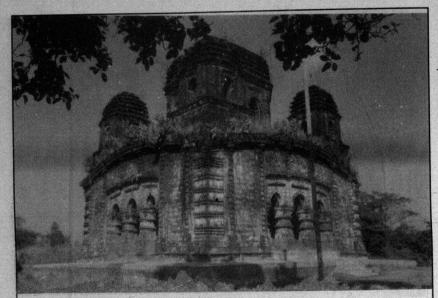
পঞ্চরত্ন। শ্যামচাঁদ। বৈতল। বাঁকুড়া

পঞ্চরত্ন। গোপীনাথ। দশঘরা। হুগলী

পঞ্চরত্ন। বীরনগর। নদীয়া
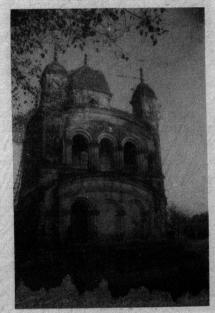
দ্বিতল পঞ্চরত্ন। সোনাডাঙা। নদীয়া
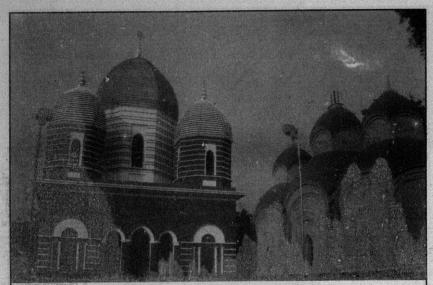
সমতল কার্ণিশযুক্ত পঞ্চরত্ন, ত্রাণনাথ ব্যাণার্জীর কালীবাড়ি, পাণিহাটি

নবরত্ন। আলঙ্গিরি। পূর্ব মেদিনীপুর

নবরত্ন। অন্নপূর্ণা। তালপুকুর। উত্তর ২৪ পরগণা
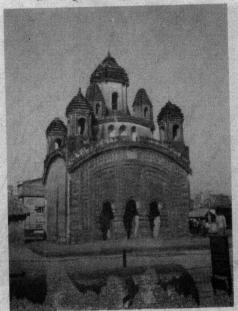
নবরত্ন, রাধাবিনোদ, জয়দেব-কেন্দুলি, বীরভূম

নবরত্ন। গীর্জার ধরণ। হদলনারায়ণপুর, বাঁকুড়া। মণ্ডলদের ছোট তরফ

নবরত্ন। মুর্শিদাবাদ-রীতি। কালীশ্বর শিব। বাঘডাঙা। মুর্শিদাবাদ
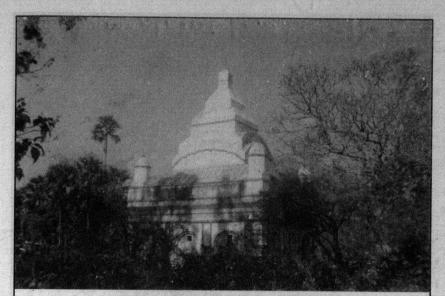
নবরত্ন। ধাপকাটা। জগদ্ধাত্রী। সোমড়া বাজার, হুগলী।

১৩ রত্ন। দুবরাজপুর-রীতি। নায়ক-পাড়া, দুবরাজপুর, বীরভূম
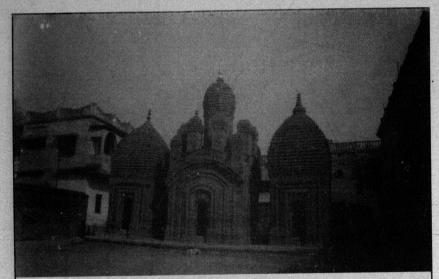
ঐ। বাজার-পাড়া, দুবরাজপুর, বীরভূম

১৩ রত্ন। রত্নচাল। সীতারাম, খড়ার (উদয়গঞ্জ) পশ্চিম মেদিনীপুর

১৭ রত্ন। পার্বতীনাথ। চন্দ্রকোণা। পশ্চিম মেদিনীপুর

২৫ রত্ন। লালজী। কালনা। বর্ধমান
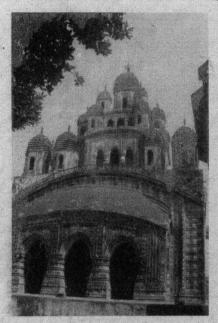
২৫ রত্ন, আনন্দভৈরবী, সোমড়া, হুগলী
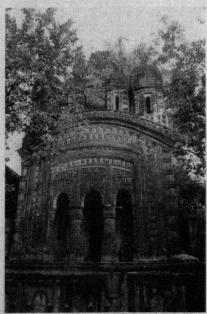
২৫ রত্ন। শ্রীধর। সোনামুখী। বাঁকুড়া

দালান। রূপেশ্বর। কালনা। বর্ধমান

দালান। শ্যামসুন্দর। বহড়ু। দক্ষিণ ২৪ পরগণা
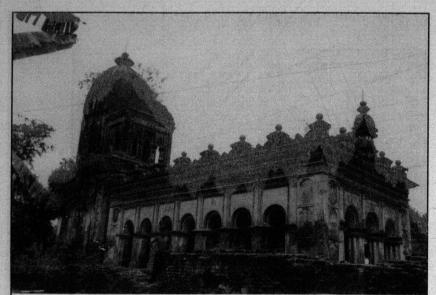
রাধাবিনোদ, দালানের উপরে অন্তরাল-সহ শিখর, পাঁচরোল, পূর্ব মেদিনীপুর

দ্বিতল দালান, শ্রীধর, কাটান, পশ্চিম মেদিনীপুর

রাধাকান্ত, দালানের উপরে পঞ্চরত্ন, পিংলা, পশ্চিম মেদিনীপুর
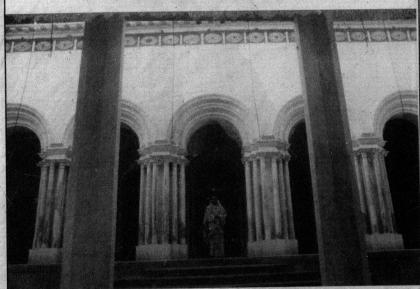
দুর্গাদালান। সুরুল, সরকার পরিবার। বড় তরফ। বীরভূম

দ্বিতল দালানের উপরে একবাংলা 'দীপঘর'। গোপালপুর। বীরভূম। সুদর্শন মন্দির

গিরিগোবর্ধন। পঞ্চরত্ন। অযোধ্যা। বাঁকুড়া।

জোড়বাংলার উপরে নবরত্ন। বালিদেওয়ালগঞ্জ, হুগলী। দুর্গা

দ্বিতল দালানের উপরে পঞ্চরত্ন। বীরলোক, খানাকুল-কৃষ্ণনগর। হুগলী। সিংহবাহিনী
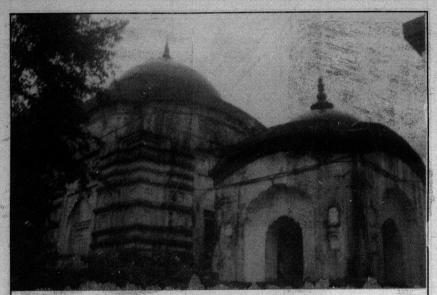
গোঁসানিমারি। কামতেশ্বরী। কোচবিহার

বাণেশ্বর শিব। বাণেশ্বর। কোচবিহার
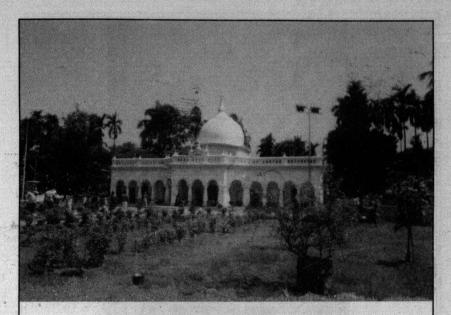
মদনমোহন, কোচবিহার

মুসলিম গম্বুজ। হরিহর। আমঘাটা। নদীয়া।

দোলমঞ্চ। চারচালা। ইছাপুর (গোবরডাঙা)। উত্তর ২৪ পরগণা
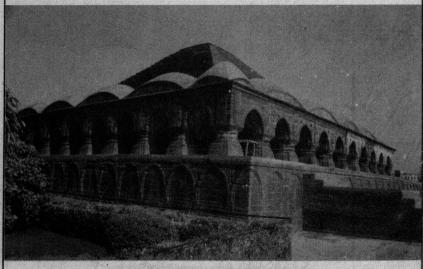
রাসমঞ্চ। বৃহৎ পিরামিডাকৃতি। বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

রাসমঞ্চ। ১৭ চূড়া। হদলনারায়ণপুর। বাঁকুড়া

তুলসী মঞ্চ। গম্ভীরনগর। ঘাটাল। পশ্চিম মেদিনীপুর
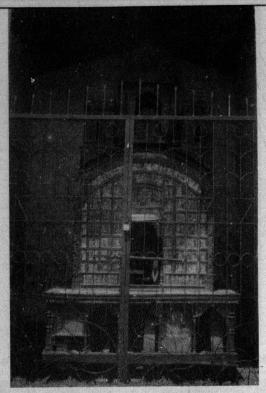
অসাধারণ কারুকাজ সম্পন্ন পিতলের রথ। কনকাটি-অযোধ্যা। বর্ধমান

ঐ রথের কারুমণ্ডিত ফলকের অংশ
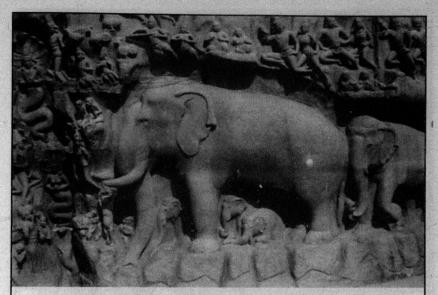
গঙ্গাবতরণ, পাহাড়ের গাত্র খোদাই-শিল্প, মামল্লপুরম

মহিষাসুরমর্দিনী গুহার গাত্র। মামল্লপুরম

পরশুরামেশ্বর (ভুবনেশ্বর) মন্দিরের মণ্ডপগাত্রের একটি ফলক

কার্তিকেয়। উক্ত পরশুরামেশ্বর মন্দিরের পূর্ব দেওয়াল-গাত্রের মূর্তি-শিল্প

উড়িষ্যার কটক জেলার রত্নগিরি মহাবিহারের প্রবেশ-দ্বারের একটি ফলক

খাজুরাহো কন্দরিয় মহাদেব মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্যের অংশ

উড়িষ্যার খিচিংয়ের কীচকেশ্বরী মন্দিরগাত্রের গণেশমূর্তি

তালধ্বজ, গোয়ালিয়র ফোর্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত
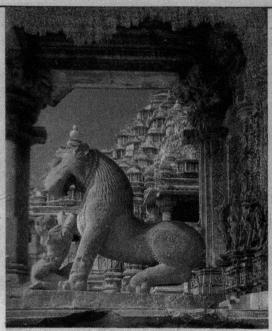
শার্দুল ও সুরসুন্দরী : 'কন্দরিয় মহাদেব', খাজুরাহো
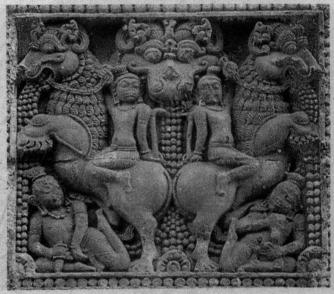
বৈতল দেউলের ভাস্কর্য, ভুবনেশ্বর

বরাকরে সিদ্ধেশ্বর ক্ষেত্রের পশ্চিমে সীতারাম দাস বাবার
আশ্রমে রক্ষিত প্রাচীন প্রস্তর-মূর্তি সমূহের কয়েকটি

বাঁকুড়ার গোকুলনগরের গোকুলচাঁদ মন্দিরগাত্রের অন্যতম প্রস্তর ভাস্কর্য

খড়ার (পশ্চিম মেদিনীপুর)-এর সীতারাম মন্দির-প্রাঙ্গণের
জোড়া শিব মন্দিরের প্রথমটির দরজার পাল্লায় খোদাই শিল্প

ঐ। দ্বিতীয়টির
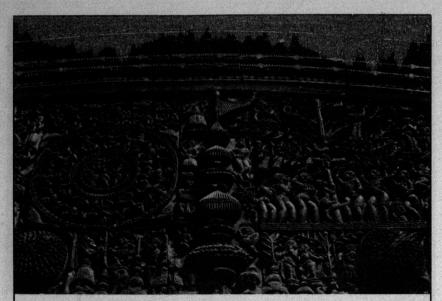
ফুলপাথর : রাসমণ্ডল ও বস্ত্রহরণ। রাধা-দামোদর, সিউড়ি। বীরভূম

'নরনারী-কুঞ্জর।' গণপুর, প্রথম চারচালার গুচ্ছ। বীরভূম

যুগল-অশ্বারোহী। মলুটি, ঝাড়খণ্ড

নৃত্যমান শিব। গণপুর (বীরভূম) কালীতলা

বড়নগর (মুর্শিদাবাদের) চারবাংলা মন্দিরগুচ্ছের পূবেরটির গাত্রের চুন-বালির কাজ

পূর্ববৎ

পূর্ব্ববৎ

শিল্পী পঞ্চানন চক্রবর্তী-কৃত মুর্শিদাবাদের বড়নগরের চারবাংলা মন্দির-টেরাকোটার রেখাঙ্কন

গণেশ-জননী (পশ্চিমবঙ্গের টেরাকোটা)

রাধাকৃষ্ণ

রামচন্দ্র
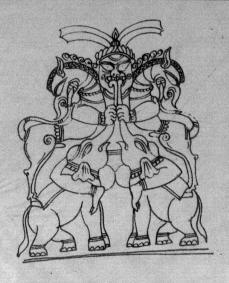
কামলেকামিনী

সূর্যদেবতা
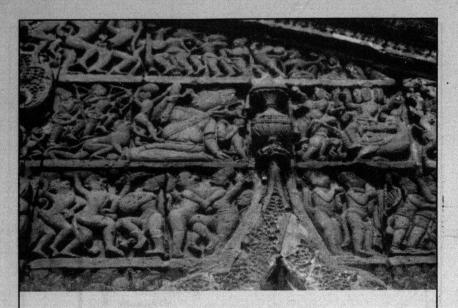
রামায়ণ প্যানেল, সীতারাম মন্দির, ঝিখিরা, হাওড়া

অশোকবনে সীতা ও সীতার অগ্নিপরীক্ষা (ঐ)

অযোধ্যার সিংহাসনে রাম-সীতা, প্রতাপেশ্বর মন্দির; কালনা (বর্ধমান)

মুর্শিদাবাদের ভট্টমাটির পঞ্চরত্নের টেরাকোটা

অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, হদলনারায়ণপুর (বাঁকুড়া), মণ্ডলদের ছোট তরফের নবরত্ন
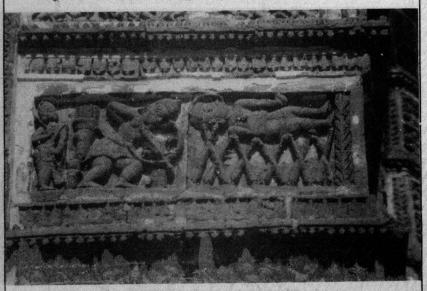
ভীষ্মের শরশয্যা, জোড়বাংলা, বিষ্ণুপুর

১৮টি হাত-বিশিষ্ট দুর্গা, মাঙলই (পশ্চিম মেদিনীপুর) পঞ্চরত্ন

কীর্তন, হদলনারায়ণপুর (বাঁকুড়া), মণ্ডলদের মেজ তরফের পঞ্চরত্ন

ইটাণ্ডা (বীরভূম) জোড়বাংলা, টেরাকোটা

বিষ্ণু, ইছাপুর নবরত্ন (গোবরডাঙা, উত্তর ২৪ পরগণা)—অতি সম্প্রতি পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক টিবির মাটি কেটে উন্মুক্ত

বিষ্ণুপুর, মদনমোহন টেরাকাটা

পেচক, গুড়াপ (হুগলী) নন্দদুলাল

কাটান, দ্বিতল শ্রীধর মন্দিরের টেরাকেটা

অলস কন্যা, ইলামবাজারের দেউল-টেরাকাটা

নবীন কর্তৃক এলোকেশী হত্যা, বনকাটি (বর্ধমান) পঞ্চরত্ন

দ্বারী, দেউল ইলামবাজার (বামুনপাড়া), বীরভূম
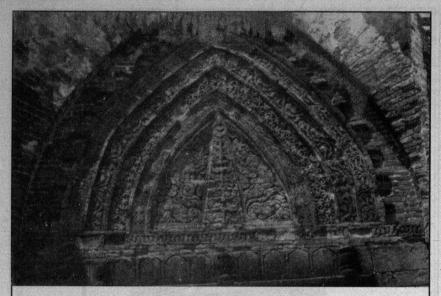
টিম্পানাম, আদিনা মসজিদ, পাণ্ডুয়া, (মালদহ)

মতিচূড়া মসজিদ—টেরাকোটা, (রাজনগর, বীরভূম)
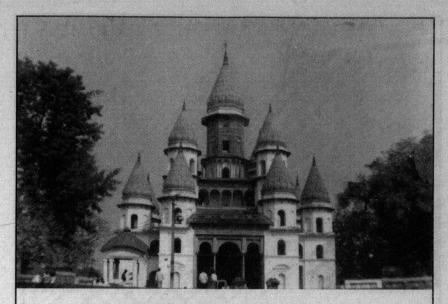
তন্ত্র-সাধনার সূত্রানুসারী স্থাপত্য, হংসেশ্বরী, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী
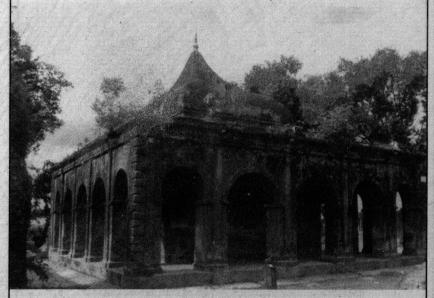
পেঁয়াজাকৃতি শীর্ষ (মুসলিম প্রভাবিত), কিরীটেশ্বরী, মুর্শিদাবাদ

ত্রৈকুটক রীতি, গৌরাঙ্গ মন্দির, চাতরা (দোলতলা), হুগলী
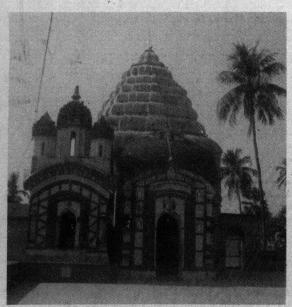
কূর্মপৃষ্ঠ দেউল ও পঞ্চরত্ন, বোড়ো বলরাম, বর্ধমান
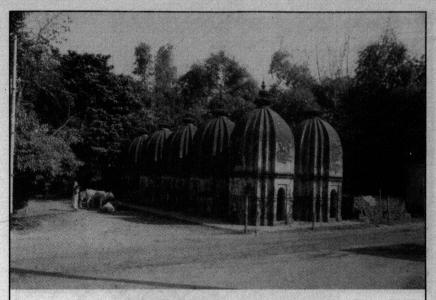
ছয় দেউল (শিব), পাইকপাড়া, বাঁকুড়া

দ্বাদশ দেউল (শিব), অযোধ্যা, বাঁকুড়া

জোড়া আটচালা ও তিন দেউল (শিব), বনকাটি, বর্ধমান

নয়টি চারচালার সংযুক্ত গুচ্ছ (সম্মুখ ভাগ; শিব), দয়ানগর, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ
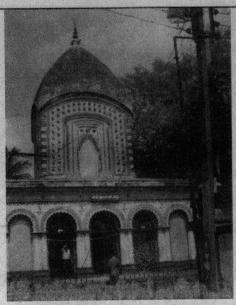
দালানের উপরে চারচালা, আনন্দময়ী কালী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
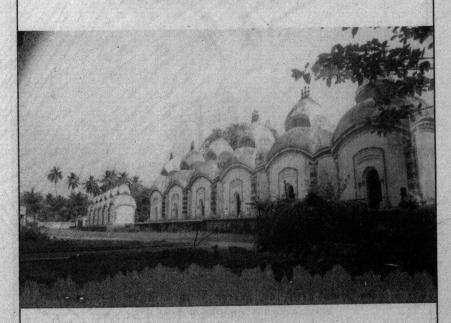
দ্বাদশ আটচালা (শিব), জানাই, হুগলী
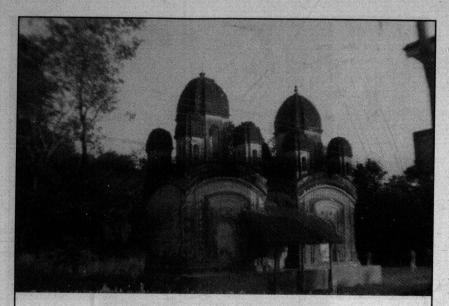
জোড়া পঞ্চরত্ন, বোড়াগড়ি, হুগলী

পাশ্চাত্য-প্রভাবিত দালান-নির্ভর নবরত্ন-ধাঁচের স্থাপত্য
(দুপাশে শিবমন্দির গুচ্ছ), হরসুন্দরী কালী, সুখাড়িয়া, হুগলী

প্রদক্ষিণ-সহ বৃহৎ আটকোণা দেউল, গাত্রে ফাটল,
গুহ্যকালিকা, আকালীপুর (ভদ্রপুর), বীরভূম

আটকোণার আটচালা অনুকৃতি, জোড়া শিব, পাঁচড়া, বর্ধমান
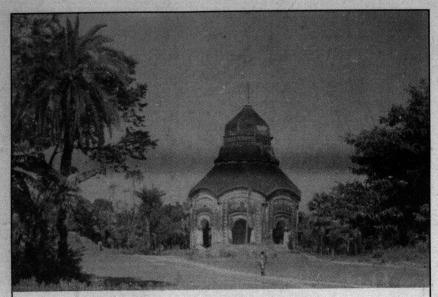
সবদিকে ঢাকা বারান্দা-সহ আটকোণা উল্টোপদ্ম শিখর,
ভবানীশ্বর শিব, বড়নগর, মুর্শিদাবাদ

চৌখুপী ধরণ, দয়াময়ী কালী, খরুয়া বাজার, চুঁচুড়া, হুগলী
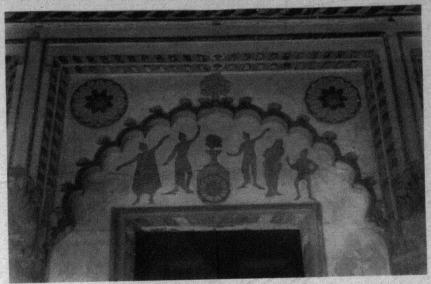
অঙ্কন-শিল্প ঃ বহড়ু (দক্ষিণ ২৪ পরগণা), শ্যামসুন্দর মন্দির

পূর্ববৎ
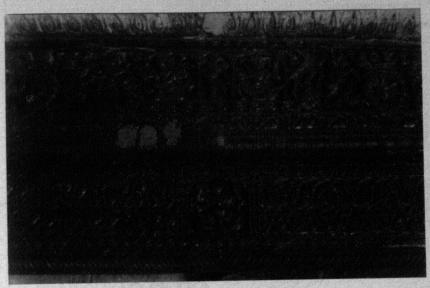
কাঠের কাজ, উচকরণ, ধর্ম-মন্দির (বীরভূম)

খানাকুল-কৃষ্ণনগর (হুগলী)-র রাধাবল্লভ মন্দিরের গর্ভগৃহের বাইরের দেওয়ালের রঙিন পঙ্খের কাজ।